জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1977

ত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাষিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1977

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জানুয়ারী হইতে জুন 1977

চিত্র-সূচী

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1977

ত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-6

ফোন ঃ 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষান্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1977

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1977

চিত্র-সূচী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন—

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা এবং প্রকাশন উপসমিতির সভ্যবৃন্দ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন : 55-0660

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্য পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সহিত উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করিতে পারিবেন। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাইবে; তাঁহার সহিত পূর্বে যোগাযোগ করিয়া পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করিতে পারিবেন। পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই বিষয়ে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে। ইতি

তাং 27.11.76
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন: 55-0660

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করবার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। একারণে দেশের বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ, বিশেষতঃ লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁরা যেন তাঁদের রচিত কিংবা প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন পুস্তকাদি এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-কে দান করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন।

জানুয়ারী, 1977, থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করা হয়েছে। এই বিভাগে নবম শ্রেণী থেকে সুরু করে বি. এস. সি. (পাশ ও অনার্স কোর্স) এম. এস. সি., কারিগরী, মেডিকেল প্রভৃতি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা আছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে নতুন, এমনকি বাড়ীতে অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকাদি দান করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুস্তকাদি প্রেরণ করবার ঠিকানা :
"সত্যেন্দ্র ভবন"
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

মডেল প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়বস্তুর উপর একটিমাত্র পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করে অংশগ্রহণ করতে পারে। পরিষদ থেকে মডেল পরিচালনার জন্যে প্রতিযোগী প্রয়োজনমত 220 ভোল্ট পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। অন্য কিছু প্রয়োজন হলে প্রতিযোগীকেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। বিচারকদের কাছে প্রত্যেক প্রতিযোগিকে তাদের মডেল সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে। মডেলের মৌলিকত্ব, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক (প্রয়োজন ভিত্তিক) উৎকর্ষ, সংগঠন ইত্যাদির উপর প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ভর করবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত আবেদনপত্র সংগ্রহ করবার শেষ তারিখ 15ই ফেব্রুয়ারী, 1977 এবং মডেলসহ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 16ই মার্চ, 1977. প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্যে আবেদনপত্র নিম্নে প্রদত্ত পরিষদের কার্যালয়ের ঠিকানায় বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত পাওয়া যাবে। মডেলও এই ঠিকানায় ঐ সময়ের মধ্যে জমা নেওয়া হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিঃ দ্রঃ (1) পূর্বে অনুষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত মডেল বিবেচিত হবে না।
(2) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র"-এর কোন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

আগামী 30শে জানুয়ারী 1977, রবিবার বিকেল 5টায় পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে" একটি জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণকে উক্ত বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বক্তা : ডঃ শ্যামসুন্দর দে বিষয় : প্লাজমা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

সময় : 30শে জানুয়ারী, 1977, বিকেল—5টা

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম :—1লা জানুয়ারী, 1894 মৃত্যু :—4ঠা ফেব্রুয়ারী 1974

[অশীতিতম জন্মদিবসের প্রাক্কালে আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক অবদানের আলোচনা-চক্রের উদ্বোধনকালে (29শে ডিসেম্বর, 1973) গৃহীত ফটো।]

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মরণে

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ জানুয়ারী, 1977 প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ ত্রিংশত্তম বর্ষে পদার্পণ করলো। এই সাফল্যের জন্যে সহৃদয় জনসাধারণ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুপ্রেরণায় 1948 সালের 25শে জানুয়ারী রামমোহন লাইব্রেরীর বক্তৃতা-কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের পূর্বে এই পরিষদ স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় 18ই অক্টোবর (1947) বিজ্ঞান কলেজে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায়। ঐ সভাতেই 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' নামটি গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, 25শে জানুয়ারী, 1948 সালে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপিত হবে। এই উদ্দেশ্যে তৎকালে প্রচারিত একটি আবেদনে যে উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছিল, এখানে তার পুনরুল্লেখ করছি।

"বর্তমান জগতে জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে; অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে চালিত হচ্ছে না, যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-সম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে পারি, এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ ভারতে নব পটভূমিকায় সৃষ্টি হয়েছে—চারদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে এই প্রধান বাধা দূর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও প্রসারের দ্বারা তাঁদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই।

গত 18ই অক্টোবর (1947) অধ্যাপক সত্যেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয়ের অনুপ্রেরণায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসেবে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপনা করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে।...

আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা জেনেও আমরা

আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে এগিয়ে এসেছি এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার জন্যে। সুধীবৃন্দের সহানুভূতি, সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই এই জাতীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস এবিষয়ে আমরা সবারই অকৃপণ সাহায্য পাব। বিশেষতঃ আমরা আশা করি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য; কারণ আমরা সবাই এই মহান প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ছাত্র বা শিক্ষক। আমরা আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতা। আমরা আশা করি বিশ্বভারতীর সহানুভূতি, কারণ আমাদের প্রধান অগ্রণীর (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর) হাতেই রবীন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়।'"

এই আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীদের একজন হিসাবে—আজ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তথা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশত্তম বর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে ভাবছি—উদ্দেশ্যগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' যথাসাধ্য তার উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান রয়েছে বটে, কিন্তু উনত্রিশতম বর্ষ অতিক্রম করা সত্ত্বেও পূর্ণ সফলতা এখনও অর্জিত হয় নি।

বিজ্ঞান পরিষদ তথা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র কর্মধারা বর্তমানে বহুধা প্রসারিত। প্রথমেই উল্লেখ করি—'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে'র কথা। 'হাতে-কলমে বিভাগের প্রচেষ্টার ফলে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞানানুরাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে; শহর ও গ্রামাঞ্চলে কিশোর-বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী সাধারণ মানুষকেও বিজ্ঞান সচেতন করছে। বিজ্ঞান পরিষদের পাঠাগার ও গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধিসাধনের প্রচেষ্টা চলছে এবং একটি পাঠ্যপুস্তক বিভাগও গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়েছে। এখন আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করছি। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, বহুল অভ্যাসের ফলে লেখক-লেখিকাদের ভাষাও অনেকটা জড়তামুক্ত। পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-লেখকদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়; কিন্তু আজ সে অবস্থা নেই; একাদিক্রমে 29 বছরে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বাংলাভাষাকে বিজ্ঞান প্রচারের সুদৃঢ় ও সুগঠিত মাধ্যমে পরিণত করবার জন্যে যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করে আসছে—তা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলা যায়। ভাষা সাধু অথবা চলিত হবে, সে প্রশ্ন বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না, কিন্তু 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সৌকর্যের খাতিরে ভাষার এক রূপ থাকলেই ভাল হয়। অবশ্য লোকরঞ্জক প্রবন্ধাদির ক্ষেত্রে সাধু বা চলিত ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' কয়েকটি 'ফীচার'ও প্রবর্তিত হয়েছে; আশা করা যায়—পাঠক-পাঠিকাদের তা ভাল লাগবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে ক্রমশঃই তার উদ্দেশ্য-সাধনে অগ্রসর হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিষদের কার্যাবলীর বিশদ আলোচনা করবার অবকাশ বর্তমান নিবন্ধে নেই।

পরিশেষে—আমাদের অসংখ্য গ্রাহক-গ্রাহিকা, পৃষ্ঠপোষক ও প্রবন্ধ লেখকদের নিকট থেকে যে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি—তার জন্যে পুনরায় তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আচার্য বোস ও তাঁর বিভিন্ন স্মারক

শ্রীমহাদেব দত্ত*

জীবে দয়া, মানবতা ও দেশপ্রেম আচার্য বোসের জীবন প্রবাহের মূল উৎস। আচার্য বোসের শৈশব কাটে এমন এক সময়ে—যখন পশ্চিম বাংলায় ধ্বনিত হয় 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। কোন মানবেতর প্রাণীর প্রতি বিন্দুমাত্র নির্দয় হতে আচার্য বোসকে কখন দেখা যায় নি বরং তাঁর আশ্রয়ে বহু বিড়াল, কুকুর সযত্নে প্রতিপালিত হত। তারা তাঁর দৈনন্দিন খাদ্যের অংশীদার ও কেউ কেউ তাঁর রাত্রিকালের শয্যারও অংশীদার ছিল। এ স্বাক্ষর তাঁর মৃত্যুকালীন দৈনন্দিন পত্রিকায় প্রকাশিত আলোকচিত্র বহন করে।

গত শতকে পাশ্চাত্য মানবতাবাদ বাংলার শক্তিশালী লেখকের লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। এর সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের মানব-প্রেমের আদর্শ সংযুক্ত হয়ে মানবতা ও জনদরদের এক অপূর্ব আদর্শ এই শতকের প্রারম্ভেই ফুটে উঠেছিল। জাতীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে এটি এক শক্তিশালী নবরূপ পেয়েছিল। আচার্য বোসের জীবনেও এটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রোগশয্যায় শায়িত হয়েও আচার্য বোস সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িতদের জন্যে যথাসাধ্য সুপারিশ দিয়ে ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের অঙ্গনে যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তখন বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন উত্তাল। এর প্রভাবে দেশপ্রেম তাঁর মজ্জাগত হয়ে উঠে। মৃত্যুবর্ষের সুরুতে তাঁর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রেডিও মারফৎ তাঁর যে বাণী প্রচারিত হয়, তাতে বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর শেষ আবেদন—শক্তিশালী উন্নত ভারত গঠনে বিজ্ঞানীদের সমস্ত প্রয়াস উৎসর্গীত হউক।

মানবতা ও দেশপ্রেম আচার্য বোসকে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয় নি। তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ব্যয়িত হয়েছে জনসাধারণের জন্যে বিজ্ঞান প্রসারে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দেশে দারিদ্র্য ও দুঃখ দূর করে শক্তিশালী দেশ গঠন করতে হলে চাই সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের সম্যক প্রচেষ্টা। চাই—সমাজে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার।

ঢাকা থাকাকালেই তাঁর চেষ্টায় মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে কলকাতায় আসবার কয়েক বছরের মধ্যেই বিদেশী শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে স্থাপিত হল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। মাসে মাসে প্রকাশিত হল এই পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'; যার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য মাতৃভাষায় প্রচারিত হচ্ছে গত 29 বছর ধরে। পরিষদের নিজস্ব ভবন হবার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য বোসের প্রেরণায় ও উপদেশে কাজ সুরু হল—'হাতে-কলমে' বিভাগের, যেখানে নানা ধরণের বিজ্ঞানের মডেল তৈরী হল। আর সেই মডেল দিয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে (শিক্ষিত ও অশিক্ষিত) জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলবার কাজ সুরু হল।

যাঁরা আচার্য বোসকে জানতেন, যাঁরা

* ফলিত গণিত বিভাগ ও সত্যেন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিজ্ঞান পরিষদের কর্মধারার সঙ্গে সুদীর্ঘ দিন পরিচিত, তাঁদের কাছে পরিষদই আচার্য বোসের মানবতা ও দেশপ্রেম থেকে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের নিয়মিত চেষ্টার জলন্ত স্মারক। যাঁরা আচার্য বোসের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন, তাঁদের জন্যে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মকর্তারা আচার্য বোসের নিম্নলিখিত স্মারক গঠনে ব্রতী হয়েছেন :

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের নামকরণ 'সত্যেন্দ্র ভবন';

2. মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে প্রতি বছর লব্ধপ্রতিষ্ঠকর্মীদের ফলক দেবার ব্যবস্থা ও ঐ ফলকের নামকরণ 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি ফলক';

3. আচার্য বোস প্রতিষ্ঠিত 'হাতে-কলমে' বিভাগটির নবরূপায়ণ করে 'সত্যেন্দ্র বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে বিভাগ' প্রতিষ্ঠা। প্রথম স্মৃতি ফলক দেওয়া হয় শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে।

আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের প্রসার শুধুমাত্র মাতৃভাষায় পুস্তকের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ দেশের মাত্র চল্লিশ শতাংশ লোক আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ন। জনজীবনে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে প্রয়োজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, প্রয়োজন ভিত্তিক বিজ্ঞানের উপর হাতে-নাতে মডেল তৈরি ও তা প্রদর্শনীতে পরিবেশন করা ইত্যাদি। এজন্যে রেডিও, টেলিভিসনকে কাজে লাগাতে হবে। এবিষয়ে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহ শালা ও হাতে-কলমে বিভাগ' পথ প্রদর্শক হবে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের ঐকান্তিক কামনা যে, এই বিভাগটি ক্রমশঃ উন্নততর হোক ও দেশে সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। বিজ্ঞান পরিষদের বাইরে আচার্য বোস যে সব সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তারাও আচার্য বোসের স্মারক সম্বন্ধে প্রস্তাব নিয়েছেন। আচার্য বোস যে সমিতিতে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে দেন এবং যার সভায় ঐ প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই সমিতি, কলিকাতা গণিতসমিতি (Calcutta Mathematical Society), তাঁর নামে নিয়মিত স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্যে একটি তহবিল গঠন করেছেন। শীঘ্রই এই বক্তৃতামালা সুরু হবার আশা করা যাচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় অ্যাকাডেমি (INSA), আচার্য বোস যার প্রতিষ্ঠা-সদস্য ছিলেন, সে প্রতিষ্ঠানও তাঁর নামে স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। শীঘ্রই সেখানে প্রথম বক্তৃতাটি দেওয়া হবে—আশা করা যাচ্ছে।

বোস-স্ট্যাটিস্টিক্সের পঞ্চাশতম বর্ষ-পূর্তি উৎসবের জন্যে জাতীয় সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় সংগঠক সমিতির সভার আলোচনায় দেখা যায় যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় তার কোন অধ্যাপকের পদ-কে 'আচার্য সত্যেন বোস অধ্যাপক পদ' হিসাবে রূপান্তরিত করতে প্রস্তাব দিলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তাতে সম্মত হবেন এবং এই ভাবে আচার্য সত্যেন বোস অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হবে। আশা করা যাচ্ছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ একটি পদ-কে শীঘ্রই 'আচার্য সত্যেন বোস অধ্যাপক পদ' বলে ঘোষণা করবে।

আচার্য বোসের স্মারক হিসাবে একটি 'আচার্য সত্যেন বোস স্মারক অতিথি অধ্যাপক পদ' সৃষ্টি করবার প্রস্তাব আছে। ঐ প্রস্তাব অনুসারে প্রতি বছর কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদেশী তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্‌কে তিন মাসের জন্যে এই পদে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তিনি ভারতের কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থেকে বক্তৃতা দেবেন—যা পরে প্রকাশ করা হবে। এই প্রস্তাবটি নানা কারণে সমর্থন-যোগ্য নয়। বোস, সাহা, রামন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ভারতীয় বিজ্ঞানে আত্মবিশ্বাসের প্রতীকস্বরূপ। স্মারক হিসাবে কেবলমাত্র বিদেশী লব্ধপ্রতিষ্ঠিত

বিজ্ঞানীদের দিয়েই বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা স্মৃতির প্রতি অপমানসূচক। এই প্রস্তাব উক্ত জাতীয় সংগঠন সমিতিতে উঠেছিল। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তা এভাবে গৃহীত হবে না।

আচার্যের মৃত্যুর পাঁচ দিনের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে তাঁর সার্থক ছাত্র ও শিক্ষকদের পুরগামী আচার্য বোসের স্মারক হিসাবে ভৌত বিজ্ঞানে আচার্য সত্যেন বোস বিজ্ঞান মন্দির (Satyendranath Bose Institute of Physical Sciences) প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ঐ মাসেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যথাবিহিত সম্যক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ইনষ্টিটিউটে আচার্য বোসের ঘনিষ্ঠ ছাত্র, সহযোগী ও গুণমুগ্ধেরা বিনা বেতনে এ পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। ইনষ্টিটিউটের কর্মধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার পরিষদের সভাপতি অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন, তাই এর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সান্ত্বনার বিষয়, প্রাদেশিক সরকার এই ইনষ্টিটিউটকে সম্যক সাহায্য দানের জন্যে ধীরে ধীরে তৎপর হয়ে উঠছেন। রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ এই বিজ্ঞান মন্দিরকে এই রাজ্যে ভৌত বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এটিকে জাতীয় ইনষ্টিটিউট করবার জন্যে পরি-পরিকল্পনা দিয়েছেন। রাজ্য সরকার এর প্রয়োজনমত জমি দেবারও ব্যবস্থা করেছেন। জানি না এই ইনষ্টিটিউটটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় স্মারক হিসাবে গণ্য হবে কিনা। তবে আচার্য বোসের প্রত্যেক প্রকৃত ছাত্র, সহযোগী ও গুণমুগ্ধদের ঐকান্তিক কামনা: এই ইনষ্টিটিউটের সম্যক উন্নয়ন হোক এবং অদূর ভবিষ্যতে এটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করুক।

তবে অধুনা এই ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে কিছু অযৌক্তিক বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আচার্য বোস তাঁর স্মারক হিসাবে এই ইনষ্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে যান নি, বা এটি কার্যকারী করবার অনুরোধ জানিয়ে যান নি। আচার্য বোস একটি সভায় নূতন ইনষ্টিটিউট স্থাপনের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তাতে তাঁর বক্তব্য ছিল বর্তমানে ভারতে যে ভাবে সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধহীন ইনষ্টিটিউট চলছে এবং ঐ সব ইনষ্টিটিউটে (স্বয়ংপরিচালিত) বিজ্ঞান-কর্মীদের নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের অভাবে যে ভাবে এই দরিদ্র দেশের অর্থের অপচয় ঘটছে—তিনি তার পুনরাবৃত্তির বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কাজেই তাঁর নামে ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় যাঁরা ব্রতী আছেন, তাঁরা যাতে এই স্মারক গতানুগতিক স্বয়ংপরিচালিত ইনষ্টিটিউটগুলি যে ভাবে চলছে, সেদিকে না যায়—তার জন্যে সতর্ক থাকবেন। আর একটা বড় কথা, পৃথিবীতে যে সব মনীষীরা এসেছিলেন, তাঁদের কয়জন তাঁর স্মারক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বা কিভাবে পরিচালিত হবে, তার কি কোন নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন? গত শতাব্দীর রামকৃষ্ণদেব তাঁর স্মারক হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনার প্রকল্প কোথায় রেখে গিয়েছিলেন? শোনা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিসভা করা হোক—এই বিষয়ে অনীহাও দেখিয়েছিলেন। আচার্য সাহা তাঁর নামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনষ্টিটিউট (Nuclear Physics In stitute)-এর নামকরণের কোন পরিকল্পনা রেখে গিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। পশ্চিম জার্মেনী জুড়ে কত মাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck) ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু মাক্স প্লাঙ্ক-এর কোন প্রবন্ধে তো আমরা ইনষ্টিটিউট পরিকল্পনার কথা দেখতে পাই নি! ইটালীর ভেরোনাতে (Verona) ফের্মি ইনষ্টিটিউট (Fermi

Institute)-এর পরিকল্পনা কি ফের্মি করে গিয়েছিলেন? রাশিয়ার স্টেক্লফ্ (Stekloff) বা মেণ্ডেলিয়েভ (Mendeliev) তাঁদের নামে ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন কি? ফ্রান্সে আঁরি পোঁয়াকার (Henri Poincaré), ফুরিয়ে (Fourier) প্রমুখ তাঁদের নামে কি কোন ইনষ্টিটিউট গড়ে রেখে গিয়েছিলেন? প্রচারবিমুখ আচার্য বোস যে তাঁর নামে ইনষ্টিটিউট গঠনের অনুরোধ রেখে যাবেন না, এটাতো খুবই স্বাভাবিক। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠরা জানেন যে, তাঁকে ঘিরে ইনষ্টিটিউট করবার প্রস্তাব তাঁর মৃত্যুর প্রায় 12 বছর আগেও কয়েকবার উঠেছিল। নানা কারণে সেই প্রস্তাব রূপায়ণ করা হয় নি। তবে একথা ঠিক নয় যে, এই বিষয়ে তাঁর আপত্তি ছিল বলে সে প্রস্তাব কার্যকরী হয় নি।

আর একটা প্রশ্ন বড় করে তুলে ধরা হয়েছে যে, তাঁর সাধনার ঐতিহ্য এই ইনষ্টিটিউটে নেই, তাই এই ইনষ্টিটিউট গড়বার সার্থকতা কি? এই কথাটা কি ঠিক? বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তাধারা থাকে তাঁর প্রবন্ধে। তবে বিজ্ঞান-সাধনার যে ঐতিহ্য তাঁকে দিয়ে গড়ে উঠে, তা রূপ নেয়—তাঁর ছাত্র ও তাঁদের ছাত্রদের মধ্য দিয়ে। আচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর গুণমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্র ও গুণমুগ্ধ বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর নামে বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের জন্যে নিজেদের সম্যক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা কি আচার্য বোসের সাধনার ঐতিহ্যের লক্ষণ নয়? ইঁট, পাথরের মধ্য দিয়েই কি তাঁর ঐতিহ্যের ধারা চলবে? এটা সবাই জানেন, আগেও অনেকবার প্রচারিত হয়েছে যে, আচার্য বোস তাঁর যে মৌলিক প্রবন্ধ রেখে গেছেন তার মধ্যেই তাঁর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কারণ তিনি বেশীর ভাগ সময় নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর ছাত্রদের, সহযোগীদের, এমনকি সরকারী সূত্রে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় এমন সব বিজ্ঞানীদের গবেষণার সাহায্য করে এবং তাঁদিকে নূতনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করতে। এই জন্যেই তাঁর ছাত্র, সহযোগী ও গুণমুগ্ধেরা স্বয়ংপ্রণোদিত হয়ে এই বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞান-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ নিজ নামে প্রকাশ না করে বিজ্ঞানের প্রগতির জন্যে তাঁর যে নিরত প্রয়াস ছিল, একদিন তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত বিজ্ঞান মন্দিরের মাধ্যমে ঐ প্রচেষ্টা সার্থক রূপ পাবে—এটা আমাদের দৃঢ় ধারণা।

মানবদরদী সত্যেন্দ্রনাথ

বলাইচাঁদ কুণ্ডু*

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদান সমূহের কথা শুধু বৈজ্ঞানিকগণ নয়, সর্বসাধারণের কাছে সুবিদিত। পদার্থ-বিজ্ঞানের যে অবদানের জন্যে তিনি জগতে বিপুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন, তা 'বোস সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে সকলে প্রায় 'বোস সংখ্যায়ন' ও তাঁর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যতীত সত্যেন্দ্রনাথের আরো অনেক বিষয়ে আগ্রহ ছিল। বাংলা সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য ও সঙ্গীতে তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা অনেকেই জানেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা-দানের তাঁর আদর্শ আজ সর্বসাধারণের কাছে সুবিদিত ও বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গে—ছোট-বড় কোন বিচার নেই, অবাধে মিশতে পারতেন। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, 1974) ওঁর সম্বন্ধে একটি খুব সত্য কথা বলেছেন "সত্যেন্দ্রনাথের মত এমন সব রকম পরিবেশে—যাকে বলে, 'ডালে, ঝোলে, অম্বলে' নিজেকে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে শুধু নয়, সবাইকে নিয়ে জমাট মজলিস তৈরী করতে আমি আর কাউকে দেখি নি।" সত্যি, তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন। সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন ঠিক এই রকম আর কাউকে দেখা যায় না।

1লা জানুয়ারী তাঁর জন্মদিবস। প্রতি বছর সকালে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসতাম। একবার গিয়ে দেখি একটি স্কুলের প্রায় 50-60 জন ছাত্রী ফুলের মালা হাতে তাদের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছে। ছোট ঘরে স্থানাভাব—উনি উঠে এসে প্রত্যেক ছাত্রীকেই আদর করে সুমিষ্ট হাস্যে আশীর্বাদ করলেন এবং সবাইকে মিষ্টি খেয়ে যেতে বললেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কি রকম তাঁকে ভালবাসে। মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রসন্ন সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

1974 সালের 1লা জানুয়ারী—আমার একান্ত দুর্ভাগ্য যে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ওঁর বাড়ীতে যেতে পারি নি। তাই টেলিফোন করে তাঁকে আমার প্রণাম জানালাম। আবার স্ত্রী রক্তের চাপে খুবই অসুস্থ—উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলাই তোমার স্ত্রী এখন কেমন আছেন, ক'দিন আগে শুনেছিলাম তাঁর রক্তের চাপ খুব বেড়েছে।' তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একান্ত অভিভূত হলাম। তিনি যে সকলের জন্যে কত ভাবেন, সকলকে ভালবাসেন, তা আমার জানা ছিল। আজকের দিনে তাঁর ঘরে লোক ভর্তি, কত লোক আসছে অথচ তিনি আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা মনে রেখেছেন। কত রকমে কতবার তাঁর দরদী মনের পরিচয় পেয়েছি।

মানবদরদী এই মহামানবের একটা পরিচয় হয়তো অনেকের জানা নেই। ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের সুযোগ্য পুত্র কুমার প্রমথনাথ রায় 1956 সালে নানাবিধ সৎকার্য, শিক্ষার প্রসার, গরীব দুঃখী আতুরের সেবার জন্যে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্যে ও অন্যান্য নানাবিধ কাজের জন্যে প্রায় এক কোটি টাকার

---

* 332, লেকটাউন, কলিকাতা-55

একটি ট্রাষ্ট গঠন করেন। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অতুল গুপ্ত মহাশয়কে এই ট্রাষ্টের দলিল তৈরী করবার জন্যে বলেন। এই বিপুল অর্থের সদ্ব্যয়ের জন্যে উপযুক্ত ট্রাষ্টি (Trustee) নির্বাচনের জন্যেও তিনি শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয়কে অনুরোধ করেন। কুমার প্রমথনাথ ট্রাষ্ট পরিচালনা করবার জন্যে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথের নাম চিন্তা করে অতুলবাবুকে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সদাব্যস্ত বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী কি এই গুরুদায়িত্ব নেবেন? এই বিষয় তিনি অতুলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁরা উভয়ে অধ্যাপক বসুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই ট্রাষ্ট পরিচালনা করবার জন্যে অনুরোধ করেন। মানবদরদী সত্যেন্দ্রনাথ অতুলবাবুর বিশেষ অনুরোধে ট্রাষ্টি হতে রাজী হলেন। সেখানেই তাঁরা বিখ্যাত ডাঃ নলিনী-রঞ্জন সেনগুপ্ত, ও হাইকোর্টের বিচারপতি বিখ্যাত জনসেবী ব্রজকান্ত গুহকেও এই ট্রাষ্টিবোর্ডে থাকতে অনুরোধ করেন। এছাড়া সমাজসেবী ৺ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও কুমার প্রমথনাথের পুত্র ও দুই জামাতাকেও ট্রাষ্টিবোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ট্রাষ্টের নাম দেওয়া হয়—Kumar Pramathanath Roy Public Charitable Trust.

এই ট্রাষ্টবোর্ডের বিপুল অর্থের কিছু পরিমাণ নানা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত ছিল। তাছাড়া কলিকাতা-স্থিত অনেকগুলি অস্থাবর সম্পত্তি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সবের আনুমানিক মূল্য প্রায় এক কোটি টাকার মত। সত্যেন্দ্রনাথ ট্রাষ্টবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে এই বিরাট সম্পত্তি পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিয়েছিলেন এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, অন্যান্য ট্রাষ্টিদের সহযোগিতায় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করেছিলেন।

বিভিন্ন হাসপাতাল স্থাপন, স্কুল ও কলেজের শিক্ষা, দুঃস্থ নর-নারীর সাহায্যে বহু লক্ষ টাকা দান করা হয়। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে Higher Industrial Research-এর জন্যে একটি High Tension Laboratory এবং একটি Radioactive Chemical Labartoy স্থাপনের জন্যে 5 লক্ষ টাকা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে চার লক্ষাধিক টাকা দেওয়া হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গৃহনির্মাণের জন্যে প্রথম দফায় 50,000 ও দ্বিতীয় দফায় 20,000 টাকা দেওয়া হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের কিছু সময় এই ট্রাষ্ট পরিচালনার জন্যে ব্যয় করতেন। দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের জন্যে হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসারের জন্যে ও আরো নানাবিধ সৎ-কার্যের জন্যে অত্যন্ত যোগ্যতা ও কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ কি ভাবে এই ট্রাষ্ট পরিচালনা করেছিলেন, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। একজন আত্মভোলা ব্যস্ত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এত সব কাজ করা অসম্ভব মনে হয়। তবে এথেকে তাঁর দরদী হৃদয়ের পরিচয় আরো বিশেষভাবে পাই।

আজ আচার্যদেব আর নেই। কিন্তু তাঁর নানাবিধ কীর্তির মধ্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। তিনি চিরদিন আমাদের অনুপ্রেরণা দিবেন, যাতে আমরা আরো কার্যক্ষম হতে পারি। আজ তাঁকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

কিছু স্মৃতি—কিছু শ্রুতি

অরুণকুমার দাশগুপ্ত*

প্রায় 40।50 বছর আগের কথা। গ্রামের স্কুলে পড়ি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বলতে শুধু পি. সি. রায়, সার জগদীশ বোসের নাম জানতাম। পরে যখন 1930 সালে সি. ভি. রামন নোবেল পুরস্কার পান, মনে আছে স্কুল ছুটি হল। আমাদের সে কি উল্লাস, যেন আমাদেরই কোনও গ্রামের বৈজ্ঞানিক এই সম্মান লাভ করেছেন। অঙ্কের মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আর কোনও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কি নোবেল পুরস্কার পেতে পারে। উনি বলেছিলেন মেঘনাদ সাহা পেতে পারেন। সূর্য সম্বন্ধে গবেষণা করে এক নতুন তাপ-তত্ত্ব বের করেছেন, তাই মাত্র 34 বছর বয়সেই এফ. আর. এস হয়েছেন। আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতাম কবে সাহার নাম শুনতে পাব।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে এই সীমিত জ্ঞান নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম কলেজে পড়তে—সেটা 1935 সাল। জগন্নাথ কলেজে পড়বার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান ও ঢাকা হলের প্রোভোষ্ট জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের নাম শুনতে পাই। উনিও নাকি কি একটা নতুন কিছু বের করেছেন, যা রসায়ন-বিজ্ঞানে 'ঘোষের নিয়ম' বলা হয়। ঢাকা হলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ওঁকে দেখবার ও বক্তৃতা শুনবার সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু তখনও সত্যেন বোস নামের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নি বা তাঁকে কোথাও দেখতেও পাই নি। মেঘনাদ ঢাকার ছেলে, তাই একদিন কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মেঘনাদের মত এত বড় বৈজ্ঞানিক ঢাকায় না থেকে এলাহাবাদে কেন? পিতৃদেবের কাছেই প্রথম শুনতে পাই সত্যেন বোসের নাম। তিনি নাকি অনেক উচুদরের বৈজ্ঞানিক, যাঁর নাম আইনষ্টাইনের সঙ্গে যুক্ত, যাঁর আবিষ্কার বসু-আইনষ্টাইন তত্ত্ব নামে পরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেঘনাদের সহপাঠী ছিলেন, ওঁর জন্যে মেঘনাদ কোনও দিন পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেন নি। সেই সত্যেন বোস ঢাকাতে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান—কাজেই মেঘনাদের আসবার প্রয়োজন কি? চমকে উঠলাম—এতবড় বৈজ্ঞানিক, যাঁর নাম আইনষ্টাইনের সঙ্গে যুক্ত! আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটির কথা শুনেছিলাম, যা নাকি নিউটনের সূত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছে—আর সেই বিখ্যাত গল্পও "আমার সঙ্গে 5 মিনিট কথা বললে মনে হবে 1 ঘণ্টা আর বন্ধুর সঙ্গে হলে মনে হবে 1 সেকেণ্ড—এই রিলেটিভিটি" শোনা হয়েছিল। কাজেই বিস্ময়ে অভিভূত হলাম এবং এই বৈজ্ঞানিককে দেখবার জন্যে উৎসুক হলাম। কিন্তু দু-বছরের ভিতর সে সুযোগ আসে নি।

সুযোগ এল 1937 সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম ছিল যে সব ছাত্র অনার্স নিতে ইচ্ছুক, তাদের বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি আনতে হবে ভর্তির ফর্মের সঙ্গে। ওখানে একটা পাঠক্রম ছিল 'গণিত ও পদার্থবিদ্যায়' যুগ্ম-অনার্স। তৃতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের উপর জোর দেবার জন্যে এই বিষয়। এতে একটা সুবিধা ছিল প্রাকৃটিক্যাল নম্বর মাত্র 100 ও তৃতীয় বিষয় রসায়ন পড়তে হবে না। এই দুটি বিষয় এড়ান যাবে বলেই

---

* কমফোর্ট, 2/1/B, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-700029

যুগ্ম-অনার্স নিতে মনস্থির করেছিলাম গণিতের অধ্যাপক নলিনীমোহন বসুর সই নিয়ে কার্জন হলের সেই সুবিখ্যাত কোণের ঘরে সামনে দাঁড়ালাম। চোখে পড়ল এক অপূর্ব মূর্তি। এ সবার চাইতে স্বতন্ত্র। মাথাভর্তি চুলের বোঝা, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, গায়ে পাঞ্জাবী, পরণে ধুতি, হাতে জলন্ত সিগারেট। একমনে খাতায় লিখে যাচ্ছেন, কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। সিগ-রেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে—ছাইগুলি খাতার উপর পড়ছে—এক ধ্যানগম্ভীর স্তব্ধ মূর্তি। দুরু দুরু বক্ষে আর কম্পমান পদে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেয়ারা ইঙ্গিত করল ভিতরে যেতে। সাহস হচ্ছে না, তবু কাছে চলে গেলাম। মুখ না তুলেই বললেন 'কি ভর্তির ফর্ম? এগিয়ে দিলাম। একটু দেখে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন 'দুটো আবার কেন? একটাইতো ভাল।' সত্য জবাব দিতে সাহস হল না। সই করে দিলেন, বেরিয়ে এলাম মনের ভিতর এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি।

উনি আমাদের প্রথম বছরে 'জেনারেল ফিজিক্স' ও পরে থিয়োরী অব ভাইব্রেশন বা স্পন্দন তত্ত্ব পড়াতেন। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ক্লাসে ঢুকতেন। 1 ঘণ্টা অনর্গল পড়িয়ে যেতেন ইংরেজীতে (শুনেছি পরে কলকাতাতে এসে উনি বাংলায় পড়াতেন) আর সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের উপর কঠিন কঠিন ফর্মুলা কষে যেতেন। আমাদের গণিতের জ্ঞান তখন বলতে গেলে কিছুই না। যদিও উনি প্রথমে কিছু পড়িয়ে নিতেন, কিন্তু সত্যি বলতে কি ওঁর বক্তৃতা আমরা বিশেষ কিছুই বুঝতে পারতাম না। 'বুঝি না' একথা বলতেও কারোর সাহস হতো না। আমরা সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে ওঁর কথা শুনতাম। মনে হত উনি কত জানেন কিন্তু এটুকু কি বুঝতে পাচ্ছেন না যে, আমরা কিছুই জানি না। তখন পাঠ্য বইয়েরও বেশ অভাব। যে দু-একখানা ছিল, তার সঙ্গে ওঁর বক্তৃতার মিল পাওয়া শক্ত। তাই আমাদের যেতে হত—হয় কোনও গবেষক-ছাত্রের কাছে বা অন্য কোনও অধ্যাপকদের কাছে নতুন করে বিষয়টা একটু বুঝে নেবার জন্যে। আমাদের মনে হত 'উনি হচ্ছেন অধ্যাপকদের অধ্যাপক'।

এ সময়েই সাহা ও শ্রীবাস্তবের 'Heat' বইতে বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন ও ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন দেখতে পাই। কিছুই বুঝি না বা আমাদের পাঠ্যতালিকাতেও নেই—তবু মনে পড়ে বার বার সেই পৃষ্ঠা দেখেছি এবং গর্বিত ও উল্লসিত হয়েছি বোসের নাম দেখে। যে চারজনের নাম একই সঙ্গে মনে করা হয়, তাঁদের তিন জনই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—বোসই শুধু পান নি—এমন কি এফ-আর-এসও অনেক পরে হয়েছেন।

ছাত্রাবস্থায় ওঁকে সভাসমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অনুষ্ঠানে দেখি নি। একদিন মনে আছে ঢাকা হলের পুকুরে বার্ষিক জলক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে—হঠাৎ রমেশচন্দ্র মজুমদার (তখন উপাচার্য) এসে বললেন 'দেখ কাকে ধরে এনেছি'। দেখি ধুতি পাঞ্জাবী-পরা স্মিত হাস্য সত্যেন্দ্রনাথ। সবাই অবাক বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকল—জলের বুকে সাঁতারের দিকে কারোর মন নেই। উনি কিছুক্ষণ পরেই আস্তে আস্তে চলে গেলেন। দু-তিনটে সভার কথাও মনে পড়ে। মেঘনাদ সাহা সেবার পরীক্ষা নিতে ঢাকায় গেছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষক-ছাত্রেরা এক সভার আয়োজন করেন। সাহা সেখানে 'Upper Atmosphere' সম্বন্ধে বলবেন।

কার্জন হলে গিয়ে দেখি—হল ভর্তি, তিল-ধারণের জায়গা নেই। সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ। সাহাতো অবাক এই জনসমাগম দেখে। উনি বললেন 'আমি ভেবেছিলাম এটা বিজ্ঞানের ছাত্রদের সভা—কিন্তু দেখছি অনেকে এসেছেন, মনে হচ্ছে যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র নন। যাহোক যতটা সম্ভব সাধারণভাবে বলব।' তারপর উনি প্রায় 1 ঘণ্টা ইংরেজীতে এমন সুন্দরভাবে বললেন

সভায় কোনও শব্দ নেই বা কেউ বুঝতে পারছে না বলে বেরিয়েও গেল না। এখানেই সাহা বোর্ডে কি একটা আঁক কষে পাশে চেয়ারে বসা বোসের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন 'আমি আমার বন্ধু বিখ্যাত গণিতবিদ বোসকে এর সমাধান করতে অনুরোধ কচ্ছি।' বোস ভাল করে শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু বয়জ্যেষ্ঠ ছাত্রদের কাছে শুনেছি দু-মাস পরেই নাকি Indian Journal of Physics-এ বোস সমাধান দেন। [এ ঘটনা সতীশরঞ্জন খাস্তগীরও লিখে গেছেন বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে 'আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে]

ওই সভার আরম্ভে সাহা বলেছিলেন 'আমি, সত্যেন, জ্ঞান সবাই ভাইয়ের মত—বছরে একবার অন্ততঃ দেখা না হলে শান্তি পাই না।' সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা গল্প তখন ঢাকায় খুব শুনতাম এবং এখনও অনেকের কাছে শুনতে পাই। বি. এস. সি. পরীক্ষার পর মেঘনাদ ভেবে দেখলেন যে, সত্যেনকে পরীক্ষায় হটান যাবে না। তাই উনি অন্য বিষয় পড়বার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ জানতে পেরে ওঁকে নাকি বলেছিলেন 'পালাবে কোথায় মেঘনাদ, আমিও এই বিষয় পড়ব ও প্রথম হব।' গল্পটা যে সর্বৈব মিথ্যা অনেক দিন পরে জানতে পারলাম। আমার এক তরুণ বন্ধু শ্রীধর রায়ের (বর্তমান নাইজেরিয়াতে গণিতের অধ্যাপক) শখ হল মহাপুরুষদের রস-রসিকতা সংগ্রহ করা। প্রচুর সংগ্রহ করেছেন এবং ঘরোয়া বৈঠকে পড়ে শুনিয়েছেন। বইয়ের আকারে প্রকাশ করবার ইচ্ছা। সকলনে এটি দেবার অনুমতি প্রার্থনা করে সত্যেন্দ্রনাথকে একটি চিঠি দেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ জবাব দেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে। সে চিঠির ভাষা অনেকটা এরকম 'মেঘনাদ চলে গেছেন, আমিও পা বাড়িয়ে আছি। এই বৃদ্ধ বয়সে এসব শুনে অত্যন্ত ব্যথা পাই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি ও মেঘনাদ ভাইয়ের চাইতেও বেশী। আমাদের যুগ্ম কাজ রয়েছে। এসব মিথ্যার বেসাতী নিয়ে আমাদের টেন না—শান্তিতে যেতে দাও।' চিঠিটা রায়ের কাছে মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে।

1939 সালে জ্ঞান ঘোষ ব্যাঙ্গালোরে চলে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা হলের প্রোভোষ্ট হন। পদাধিকার বলে হলের সব অনুষ্ঠানেই তাঁকে থাকতে হত সভাপতি হিসাবে। তখনই তখনই দু-একটা সভায় তাঁকে দেখেছি। কিন্তু বক্তৃতা দেয়া তাঁর স্বভাব ছিল না। সামান্য দু-এক কথা বলতেন। ঘোষের বিদায় সভার তাঁর ভাষণ এখনও মনে আছে। ধীরে ধীরে বললেন. 'আজকে আমার অনেক দিন আগের প্রেসিডেন্সী কলেজের কথা মনে পড়ছে, যখন আমি, মেঘনাদ, জ্ঞান এবং আরও কয়েকজন এক সঙ্গে ছিলাম। আমরা সবাই স্বপ্ন দেখতাম এদেশে বিজ্ঞানের জন্যে কিছু করব। জ্ঞানের এই পদোন্নতিতে সেই স্বপ্ন সফল হবে ভেবে আনন্দ পাচ্ছি···ইত্যাদি'।

রবীন্দ্রনাথের এক স্মৃতিসভায়ও তাঁর ভাষণ শুনেছি। "কবি বিজ্ঞানকে খুব ভালবাসতেন এবং ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানকে সর্বতোভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন—তাই শান্তিনিকেতনের পাশেই শ্রীনিকেতন। আমার উপর তাঁর ছিল অসীম স্নেহ। তাঁর 'বিশ্ব পরিচয়' আশীর্বাদ স্বরূপ প্রদান করে আমাকে চিরদিনের জন্যে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রেখেছেন।" উনি সব সময় অনুচ্চ কণ্ঠে ভাষণ দিতেন। পরবর্তী কালে কলকাতায় তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ছিল, এবং প্রচুর সভাসমিতিতেও যোগ দিতেন। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ঢাকার অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ আর পরবর্তীকালে কলকাতার সত্যেন্দ্রনাথের ভিতর অনেক পার্থক্য। কলকাতার ছাত্রেরা এ বিষয়ে অনেক অনেক বেশী ভাগ্যবান।

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ওঁকে অত্যন্ত পীড়া দিত। একবার ঢাকার কাছে রায়পুরা অঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে পুলিশ ও মিলিটারী কড়া ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সমাজসেবী ছাত্র একটি রিলিফের দল গড়ে ওখানে যায়। ঢাকা হলের প্রোভোষ্ট হিসাবে সমাজসেবার কাজেও ওঁকে নজর রাখতে হত। এক ছাত্রবন্ধুর কাছে শুনেছি সত্যেন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামে ওদের সঙ্গে ত্রাণকার্যের তদারকী করেছেন। ওদের সঙ্গেই ভিক্ষার চালের ভাত খেয়েছেন এবং নানা জায়গায় থেকেছেন। অদ্ভুত তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা। এ যেন আর এক সত্যেন্দ্রনাথ। তখনকার দরদী মনের পরিচয় পেয়ে ছাত্রেরাও অভিভূত ও উৎসাহিত। এই দাঙ্গার কিছু ঘটনা পরে নির্মলকুমারী মহলানবীশকে বলেন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, 1974 দ্রষ্টব্য)।

ততদিনে আমারও একটু সাহস বেড়েছে। কার্জন হলের সেই ঘরে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ি। কখনও দেখতাম একমনে খাতায় আঁক কষছেন। কখনও অধ্যাপক বা ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রায়ই দেখতাম হাসান (ইংরেজী বিভাগের প্রধান ও পরে উপাচার্য), হুসেন (ইতিহাস বিভাগের রীডার পরে পাকিস্তানের মন্ত্রী ও আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেনের ভাই), ওঁর ঘরে বসে গল্প করছেন। কখনও দেখতাম রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছাত্রদের সঙ্গে গবেষণার বিষয় কথা বলছেন।

এই রসায়ন বিভাগের এক অধ্যাপককে নিয়ে ছাত্রমহলে একটি মজার গল্প চালু ছিল। উনি কোন এক সময় মাদাম কুরীর গবেষণাগারে কাজ করেছিলেন এবং ক্লাশে ছাত্রদের কাছে প্রায়ই বলতেন "when I was with Curie......etc. etc..."। এই অধ্যাপক নাকি একটি মৌলিক পদার্থ বের করেছেন, যার নাম দিয়েছেন 'গৌড়িয়াম' অর্থাৎ গৌড়দেশের আবিষ্কার। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুস্থানীয়—তাঁকে দিলেন এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে। সত্যেন্দ্রনাথ বেশ কিছু দিন এটা নিয়ে কাজ করে একদিন test-tube-এ সলিউশন নাড়তে নাড়তে ওঁকে বললেন 'আরে এত কার্বন কম্পাউণ্ড হে...।'

এই বার্মা চুরোটশোভিত অধ্যাপককে দেখলেই আড়ালে এ বিষয়টা নিয়ে উপভোগ করতাম। পরে পরিণত বয়সে মনে হয়েছে এ গল্পটাও সর্বৈব মিথ্যা। সত্যেন্দ্রনাথ যে অন্য সবার চাইতে অনেক বড়, তারই ইঙ্গিত দেয়।

সত্যেন্দ্রনাথকে কেউ কোনও দিন রাগত অবস্থায় দেখে নি কোনও দিন ওঁকে ওঁর সম্বন্ধে বলতেও শোনে নি। কিন্তু একবার নাকি উনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে একটি গল্প তখন শুনেছিলাম। কোন এক ইংরেজ অধ্যাপক নাকি মন্তব্য করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের পি. এইচ.-ডি. ডিগ্রী নেই। সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন 'উনি কোন বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—আমি সবটাতেই রাজী।' এটাও আমার কাছে নিছক গল্প বলে মনে হয়। তবুও অনেক ইংরেজ অধ্যাপক যে ওঁর উপর খুব খুসী ছিলেন না, তা রমেশ মজুমদারের স্মৃতিকথায় কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। ['আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' 31শে মার্চ, 1974 দ্রষ্টব্য]

ওঁর বাড়িতেও ছাত্রাবস্থায় গেছি। ভোরের দিকে উনি হয়ত বাগানে ফুলের তদারকি করছেন বা একটি ছোট ঘরে বই পড়ছেন। একদিন দেখা হল না। শুনতে পেলাম উপরে এক ঘরে এস্রাজ বাজছে। ওঁর ছেলে বলল 'বলুন তো কে বাজাচ্ছে?' 'কে আবার, তোমার কোনও দিদি হয়ত।' ও হাসতে হাসতে বলল 'উহু হল না, বাবা বাজাচ্ছেন।' আমি হতবাক বিস্ময়াভিভূত

হয়ে শুনছি। আমার কাছে এ এক পরম বিস্ময়। তখনই মনে হল আইনষ্টাইনের যথার্থ শিষ্য উনিই।

তাঁর ফুলের প্রীতি সম্বন্ধে একটা কথা শুনেছি। এটি আমার শোনা ওঁর জামাতা দেবপ্রসাদের কাছে। কলকাতায় এক বিদেশী পত্রিকায় 'নীল গোলাপে'র ছবি দেখেন। তৎ-ক্ষণাৎ এর খোঁজখবর নিতে থাকেন। পরে ইজিপ্ট না কোথায় কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই নীল গোলাপ সম্বন্ধে সব খবর আনালেন—তখন তাঁর শান্তি। দেবপ্রসাদ বলছিল "এই বৃদ্ধবয়সেও Zest for life বজায় রেখেছেন।' এই Zest for life বা জীবন-রস-তৃষ্ণা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অটুট ছিল। বৃদ্ধ বয়সে ফরাসী, জার্মান ভাষা থেকে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি অনুবাদ করে বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকায় বের করেছেন। এমনকি মৃত্যুর দু-দিন আগে পর্যন্ত বিখ্যাত Fermat সংখ্যাগুলির গুণনীয়ক দুর্বল হস্তে দৌহিত্রের সাহায্যে নির্ণয় করছিলেন, যার প্রতিলিপি ছাপা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হল। এবারে জীবনযুদ্ধের মুখোমুখী। সে সময় চাকুরী যোগাড় করা বেশ দুঃসাধ্য। তখন ওঁর উৎসাহ ও আশার বাণী অনেক পেয়েছি। একটি ইউরোপীয়ান পরিবারে আমার টিউশনিরও বন্দোবস্ত করে দেন। কিছু দিন পর রেলওয়েতে চাকুরী পেয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে আসি। রেলওয়েতে আমার কাজে Theory of structures, Strength of structures, Foundation engineering এবং সর্বোপরি ইনজিনীয়ারিং নক্সা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমার কারিগরী শিক্ষা না থাকাতে প্রথমে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। অথচ কারোর কাছ থেকে কোনও সাহায্যও বিশেষ পাওয়া যেত না। এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যে, চাকুরীটি বুঝি হারাতে হবে। মনটা সহজেই ভেঙে পড়ে। তখন ওঁকে একটা চিঠি লিখি আমার সমস্যার কথা জানিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর জবাব পাই—আমাকে কি কি জিনিষ পড়তে হবে এবং কি ভাবে চলতে হবে—সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে। চিঠি শেষে লিখলেন, "...Don't hesitate to write to me if you think I may be any use. I shall be very glad to do whatever possible. S. N. Bose. Dacca 28-7-43." মনের হতাশা-জনক অবস্থায় ওঁর চিঠি শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। শেষ দু-লাইন পড়ে সেদিনের নিঃসঙ্গ অবস্থায় চোখের জল সামলান কঠিন হয়ে পড়েছিল।

এরপর যখনই ঢাকায় গেছি জিজ্ঞাসা করতেন কাজকর্ম শিখতে পেরেছি কিনা। এইখানে ওঁর পিতৃদেব সুরেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সুরেন্দ্রনাথ রেলওয়েতে কাজ করতেন। অবসর নিয়ে ঢাকায় ওঁর কাছে থাকতেন। একবার সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে আমার চাকুরীর অসুবিধার কথা বললেন। আমার কথা শুনে সুরেন্দ্রনাথ প্রায় 1 ঘন্টা আমাকে নানা ভাবে উপদেশ দেন। আমার কি কি পঠিতব্য, কি কি করণীয় সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিলেন। আমার ধারণা হল উনি নিশ্চয়ই রেলওয়েতে ইনজিনীয়ার ছিলেন। ওঁর পরিচিত এক এক্সিকিউটিভ ইন্‌জিনীয়ারকে আমার সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখে দিলেন, যার কিছুটা আমার এখনও মনে আছে:—"নির্মল, আমি এখনও বেঁচে আছি। সত্যেনের এক ছাত্র তোমাদের ওখানে কাজ করে। ওর একটু অসুবিধা হচ্ছে—ওকে দেখবে...।" আমি অভিভূত। কর্মস্থলে ফিরে চিঠিটা দিতেই ইন্‌জিনীয়ার মহাশয় অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে।' উনি বলতে থাকলেন 'সুরেন-বাবুর মত এরকম বিচক্ষণ লোক আমি কর্মজীবনে

দেখি নি। উনি সামান্য accounts clerk ছিলেন—কিন্তু ইন্‌জিনীয়ারিং সম্বন্ধে ওঁর আশ্চর্য জ্ঞান। সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। চাকুরী সম্বন্ধে আমার যা কিছু শেখা ও জানা—সবই ওঁর কাছে। আমি খুবই কৃতজ্ঞ।' শেষে বললেন 'তাই না এতবড় ছেলের বাবা হতে পেরেছেন।'

আমার চাকুরী সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ সব সময় খোঁজ নিতেন। শেষে কালক্রমে বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করে সেতু বিভাগের ইন্‌জিনীয়ার হিসাবে যখন আমার পদোন্নতি হয়, উনি আমাকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং যখনই কলকাতাতে বিজ্ঞান কলেজে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, ওঁর কাছে থাকা সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে যেন গর্বের সঙ্গে বলতেন 'এই আমার ছাত্র অরুণ—অঙ্কের ছাত্র হয়েও এখন রেলওয়ের ব্রীজ ইঞ্জিনীয়ার।" আমি লজ্জায়, সঙ্কোচে, আনন্দে আড়ষ্ট।

ঢাকার প্রসঙ্গে আসা যাক। তখন হয় বিশ্ব যুদ্ধ ভারতের দোরগোড়ায় এসে গেছে। চারি দিকে গুজব—জাপানী বোমার আতঙ্ক। তার উপর সর্বনাশা মূল্যবৃদ্ধি। ঢাকাতে শুনেছি চালের দাম 100/120 টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। চারিদিকে হাহাকার। এ রকম সময় একবার ছুটিতে ঢাকায় কার্জন হলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ঘরে তখন অনেকে বসে আছেন—ছাত্রেরা কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। খাদ্যাভাব সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। পাশে বসা একজনকে বললেন 'চেষ্টা করে ত্যাখ না, ঘাস, লতাপাতা থেকে পুষ্টিকর কিছু খাবার বের করতে পারিস কি না।' এই সময় দরজার কাছে বেয়ারা ঝিজুকে দেখে, ওকে ডাকলেন। ঝিজু এলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কি খেয়ে কলেজে এসেছিস ?' ঝিজু বলল। আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'বিকেলে আর রাত্রে কি খাবি, বাড়ীতে ক'জন আছিস ?' ঝিজু ... অবাক। তবু ও বলে যাচ্ছে। আমরা কৌতুহলে লক্ষ্য করলাম উনি কাগজে কি লিখে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন 'Half Starved.' তারপর ঝিজুকে বলে দিলেন ওই খরচায় কি কি খেতে পারে। আমরা একটু কৌতুকের সঙ্গে ব্যাপারটা দেখছি। ঝিজু চলে যাবার পরে উনি আস্তে আস্তে বললেন 'maximum ⅘th of the required calories ও পেতে পারে।' সত্য কথা বলতে কি সেদিন একটু হাসির উদ্রেকই হয়েছিল। কিন্তু পরে মনে হয়েছে কি অসীম দরদী মন ও অনুভূতি থাকলে এ রকম করা সম্ভব এবং ওঁর পক্ষেই সম্ভব। তখনকার ওঁর মনের বেদনা নানাভাবে প্রকাশ পেত। পরবর্তীকালে তাঁর তখনকার চিন্তাধারার কিছু আভাষ "পুরনো দিনের স্মৃতি" প্রবন্ধে লিখে গেছেন ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান', অক্টোবর, 1966)। এর কিছু দিন পরেই উনি 1945 সালে ঢাকা থেকে কলকাতা চলে আসেন।

এর পরে দেশের পরিস্থিতি দ্রুত পালটাতে থাকে। দাঙ্গাহাঙ্গামা—ভারতের স্বাধীনতা লাভ—পাকিস্তানের জন্ম—দেশ বিভাগ—দেশের মানচিত্র বদলে গেল। কলকাতায় শরণার্থীদের ভীড়। দেশ বিভাগ ওঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। বিশেষতঃ জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে এলেন যেখানে, তা এখন পরদেশ, এটা ওঁকে অত্যন্ত পীড়া দিত। শরণার্থীদের উনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের পরিবারের সকলেই ঢাকাতে। ওরাও একদিন কলকাতা চলে এলেন। সে সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের পরিবারের পুনর্বাসনের জন্যে যা করেছেন, সে ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু অস্বীকার করবার ধৃষ্টতা কোনও দিন হবে না।

দেশ বিভাগের জন্যে আমাদের রেলওয়েও ভাগ হয়ে যায়। তাই আমাকে আসাম যেতে হবে। আসাম অপরিচিত জায়গা, কোনও দিন যাই নি।

ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে উনি বললেন 'আরে আসাম চমৎকার জায়গা। কি বিরাট নদী ব্রহ্মপুত্র—আর কি সুন্দর সব পাহাড়। আর তুইতো পাণ্ডুতে থাকবি—কামাখ্যার পাদদেশে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। দেখবি ভাল লাগবে। জানিস আমার ছেলেবেলা কেটেছে আসামের সাপৎগ্রামে। কি ভাল লাগত—মনে আছে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বড় বড় কাঠ ভেসে আসত আর তাই ধরে সব কাঠের গোলা বানাত।' আসামকে উনি সত্যই ভালবাসতেন। ছেলেবেলার সেই সব স্মৃতি প্রায়ই মনে করতেন। 'ছেলেবেলার আসাম বাঘের কাহিনী' লিখে ওঁদের হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'মণীষার' দিয়েছিলেন (সত্যেন্দ্র জয়ন্তী' গিরিজাপতি ভট্টাচার্য—জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জানুয়ারী, 1963)।

আমি আসাম চলে যাবার পর উনি 1949 সালে গৌহাটি যান বঙ্গভাষী ছাত্র সম্মিলনীতে প্রধান অতিথি হয়ে। আমার বাসস্থান থেকে 5/6 মাইল দূরে। আমরা পাণ্ডু থেকে সাটল ট্রেনে গৌহাটি যাতায়াত করতাম। সভায় গিয়ে ওঁকে প্রণাম করতেই কোথায় থাকি, কি করে এলাম, খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হচ্ছে কিনা সব খুঁটিয়ে খবর নিলেন। আমার ফিরে যাবার শেষ গাড়ী রাত 8-30 মিঃ শুনে বার বার বললেন ঠিক সময়ে যেন চলে যাই। ওঁর ভাষণ সেদিন সংক্ষিপ্ত ছিল। উনি বলেছিলেন ছাত্রদের উদ্দেশ করে 'তোমরা যারা আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছ, তোমাদের উচিত এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, যাতে এরা মনে করতে পারে এদের সঙ্গে তোমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। এমনিভাবে প্রদেশে প্রদেশে 'দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে' করলেই জগতের কাছে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারবে—ভারতীয় ঐতিহ্য ও সভ্যতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারবে। নিজেদের কখনই আলাদা করে রাখবে না।'

ওঁর ভাষণ শেষ হতে প্রায় 8-15 মিঃ হয়ে গেল। আমি ফিরে যাই নি দেখে খুবই চিন্তিত হয়েছিলেন। ষ্টেশন কাছে 5 মিনিটের পথ কাজেই কোনও অসুবিধা হবে না। প্রণাম করে চলে এলাম। বার বার মনে হল সভার ব্যস্ততার মধ্যেও আমার যথাসময়ে ফিরে যাবার কথাটুকু মনে রেখেছেন।

এরপর যখনই কলকাতায় গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেছি আসাম সম্বন্ধে সব খবর নিতেন। ওঁর কাছে আমার শেষ যাওয়া 1971 সালের গোড়ার দিকে। আগেই যোগাযোগ করে সন্ধ্যার পর মৃণাল ও আমি ওঁর ঈশ্বর মিলের বাড়ী গেলাম। সাড়া দিতেই ডাক দিলেন, 'চলে আয় ভিতরে।' ঢুকে দেখি তক্তপোষের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বাটিতে করে কি খাচ্ছেন—পাশেই গুরুমা দাঁড়িয়ে। 'মেয়ে বাজার থেকে বেশ ভাল বিলিতি বেগুন এনেছে তাই দিয়ে মুড়ি খাচ্ছি।' বলেই কি সুন্দর শিশুসুলভ তৃপ্তির হাসি হাসলেন। মনে পড়ল কবি বিষ্ণু দের সেই অপূর্ব উক্তি "অসামান্যে সাধারণ / এ জাতক আশৈশব প্রতিভায় অগ্নিময় / সত্তরের জন্মদিনে তাই জরা শুধু কেশাগ্রেই ক্ষান্ত।" সেদিন ওঁর কাছে অনেকক্ষণ থাকতে পেরেছিলাম। নানা বিষয়ে কথা হল। ওঁর প্রিয় বিষয় আসাম সম্বন্ধে সব খবর জানতে চাইলেন। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে এখনও কাঠ ভেসে আসে কিনা, 1950 সালের ভূমিকম্প, আসামের বন্যা, কোথায় কোথায় নতুন রেললাইন পাতা হল, ব্রডগেজ গাড়ী চলছে কিনা, ব্রহ্মপুত্রের উপর রেলপুল কত বড় ইত্যাদি নানা বিষয় যেন ছাত্রসুলভ মন নিয়ে জেনে নিলেন। আসামের যানবাহনের সব উন্নতির খবর শুনে উনি খুবই সুখী হলেন। এর ভিতর মৃণালের কাছ থেকে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছু জানতে চাইলেন। বললেন 'একটা ইটালীয়ান বই পড়ছি এই বিষয়ে, কিন্তু ডিক্সনারী দেখে দেখে এগুতে অসুবিধা হয়।' আমার আবার সেই

জীবন রস-তৃষ্ণার কথা মনে হল। কথায় কথায় আসামের ভাষা দাঙ্গার কথা উঠল। আমি যখন ওঁকে জানালাম যে, এটা খুবই আশার কথা বর্তমানে আসামের ছাত্র ও যুব সমাজ এই সব ভাষা দাঙ্গার বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে সোচ্চার হচ্ছে, উনি খুবই সুখী হলেন। কোনও রকমের অন্তর্বিরোধ উনি মেনে নিতে পারতেন না। ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের উপর ওঁর গভীর আস্থা ও প্রীতি। তখনকার যুব সমাজের অস্থিরতার কথা উঠল। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গার পরিস্থিতিতে উনি খুবই বেদনাবোধ করছিলেন। 'কি যে হচ্ছে আর কি যে হবে, বুঝতে পাচ্ছি না। এইতো কিছুক্ষণ আগে এখানকার এক গবেষণাগারের ছাত্রেরা এসেছিল ইউনিয়ন গড়তে চায় তাই বলতে—বললাম করবে গবেষণা আবার ইউনিয়ন কেন?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন নিজেকেই শোনালেন 'কি আর করবে, পাশ করছে, পি. এইচ. ডি. হচ্ছে—চাকুরী জুটছে না।'

কি গভীর মমত্ববোধ ও বেদনাবোধ থেকে কথা কটি বেরিয়ে এল। উনি অন্যমনস্ক হলেন। রাতও হয়ে গেছল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। শীতের রাত কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট তখন জনবিরল—যানবাহনও বিশেষ নেই। শুধু মাঝে মাঝে রিক্সার টুং টাং শব্দ দূর থেকে ভেসে আসা মন্দিরের ঘন্টাধ্বনির মত কানে বাজছে। মনটা এক অসীম পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তিতে ভরে গেল

ওঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। আশী বছর পূর্তি উপলক্ষে আমার আসামের বাসগৃহে এক অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণী মৃণালকে পাঠিয়েছিলাম ওঁকে দেখাবার জন্যে। উনি খুব খুসী হয়েছিলেন বিশেষত এই খবর জেনে যে, ওখানে বিজ্ঞানের ছাত্রদের চাইতে কলা বিভাগের লোকেরাই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। ভাল লেগেছিল তাঁর অনুষ্ঠানে পঠিত আসামের তরুণ কবিতার কয়েকটি লাইন—"পৃথিবীর সমস্ত নিঃস্বতাকে / ঢেকে দিতে পারত যে মানুষ / গরম কামিজে কিংবা সূর্যের উষ্ণতায় / ভয়ঙ্কর এক নির্লিপ্ততায় পাথরে মুখ ঘষে / পাড়ি জমাল তারা চাঁদের মাটিতে।...অথচ কথা ছিল / ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার।" শুনেছি উনি মানুষের মহাকাশ যাত্রা খুব সুনজরে দেখেন নি। এই অর্থ ও পরিশ্রম পৃথিবীর কাজে ব্যয় করলে অনেক বেশী উপকার হত বলে ওঁর ধারণা।

মৃণালকে বলেছিলেন অনুষ্ঠান-বিবরণী 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' ছেপে দিতে। পরে ছাপাও হয়েছিল (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুলাই-অগাষ্ট 1974)। কিন্তু সেটা উনি ছাপার অক্ষরে দেখে যেতে পারেন নি। এ আক্ষেপ আমার চিরদিন থেকে যাবে।

[প্রবন্ধে আচার্য, স্যার, অধ্যাপক, ডাঃ, শ্রীযুক্ত শব্দ পরিহার করা হয়েছে।—লেখক।]

ফলিত মনোবিদ্যা

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়*

মনকে কেন্দ্র করে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে আবালবৃদ্ধবনিতা অথবা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে কৌতূহল, যে আচার-আচরণ, যে ধ্যানধারণা অথবা ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সে সব বিচার করলে মন যে সত্যই বিশাল, বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময়, সে কথা স্বীকার না করে পারা যায় না। মনের রূপ কি; কিই বা তার উপাদান অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেনই বা তার রহস্যবিজড়িত প্রকাশ, এসব বিষয়ে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, মনোবিদ্ এবং আরও অনেকে নিজ নিজ অভিমতের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করেছেন, বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। সত্যই, মনের সৃজনমূলক অসীম শক্তি, সুদূরপ্রসারী ব্যাপকতা, অন্তহীন গভীরতা এবং তার মূল্যবান সম্পদসম্ভার আমাদের বিস্মিত করে, শিহরণ জাগায়, আবেগে অভিভূত করে তোলে।

মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু কি, সে সম্বন্ধে আজকাল অবশ্য অল্পবিস্তর সকলেরই কিছু না কিছু জানা আছে। এক কথায় এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে অথবা নতুন করে সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মনের উপর রেখাপাত করে অথবা মানসক্রিয়ার মাধ্যমেই কার্যকরী হয়ে থাকে; সে সব কিছুই মনোবিদ্যার আলোচনা বা গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মনোবিদ্যা একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার মত মনোবিদ্যার মান ও অবদান অতি উন্নত অবস্থায় উপনীত হবার এবং বিষয়বস্তুর বিশেষ বিস্তারলাভ করবার ফলে তাকে বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা এবং ফলিত মনোবিদ্যা—এই দুটি শাখায় দ্বিখণ্ডিত না করে উপায় ছিল না। সংক্ষেপে বলতে গেলে—বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হলো মনের বিভিন্ন উপাদান, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং ক্রমবিকাশ ইত্যাদি কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বা সূত্রের নির্দেশ দেওয়া। আর ফলিত মনোবিদ্যার কাজ হচ্ছে—বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার উদ্ভাবিত এই সূত্র বা তত্ত্বগুলিকে মানুষের এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করা। এই ফলিত মনোবিদ্যার বিষয়ে আমি এখন দু-চার কথা বলবো; কারণ সীমিত পরিধির মধ্যে বেশী বলা সম্ভব নয়।

প্রথমেই ধরা যাক, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা, অর্থাৎ কিনা দেহ বা মনের দিক থেকে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সর্বাঙ্গীন মিলের অভাব। শরীরের বৈষম্যগুলি আমরা অবশ্য চাক্ষুষ দেখতে পাই এবং পরিমাপও করতে পারি; কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে; কেউ কালো; কেউ ফর্সা; কেউ আস্তে হাঁটে; কেউ জোরে হাঁটে; কারোর রক্তচাপ কম, কারোর বেশী ইত্যাদি। মনও শরীরের মত বিভিন্ন উপাদানে তৈরী, অর্থাৎ মনেরও বিভিন্ন অবয়ব আছে, যেমন—বুদ্ধি, নৈপুণ্য, সামর্থ্য, মেজাজ, আবেগ ইত্যাদি, যেগুলির প্রকৃতি ও পরিমাণ সব সময়ে প্রত্যক্ষ

* ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়

না হলেও পরোক্ষভাবে অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সে যাই হোক, পরিণত বয়সের এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাব হঠাৎ হয় নি অর্থাৎ কিনা শিশুদের চিন্তাধারা, কল্পনা, বুদ্ধিবৃত্তি, বিভিন্ন প্রবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে আশৈশব ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে স্বাতন্ত্র্যের মূল কারণগুলি ধরা পড়ে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই জ্ঞান আবার শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে অনেক উপকার হয়। যেমন ধরুণ, ক্লাশে কোন একটি ছেলের বুদ্ধি হয়তো অন্য ছেলেদের তুলনায় যথেষ্ট কম। এখন আমরা যদি সকলের জন্যে একই শিক্ষা-ব্যবস্থা দিয়ে বসি অথবা একই শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করি, তাহলে অল্পবুদ্ধি ছেলেটির মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না কি? নিজের শক্তিহীনতার পরিচয় পেয়ে সে হয়তো হীন-মন্যতায় ভুগবে; কোন কাজে উৎসাহ পাবে না, স্কুলকে এড়াবার চেষ্টা করবে; অসৎ সংসর্গের পাল্লায় পড়বে অথবা নীতিবিরুদ্ধ বা অসামাজিক কাজে প্রলুব্ধ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু যদি আগে থেকে তার বুদ্ধির মান এবং অন্যান্য প্রবৃত্তি ও প্রবণতার বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করে সেই অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো, তাহলে হয়তো বিপথগামী না হয়ে সে সমাজে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাই পেত। ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হবার সময় যথোচিত পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মনোজীবনের পটভূমিকার পূর্ণ বিবরণ জেনে নেওয়া উচিৎ এবং প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্তই প্রয়োজন বলে মনে করি।

তেমনি আবার সব লোক সকল প্রকার কর্ম বা পেশার জন্যে সমভাবে নিশ্চয়ই উপযুক্ত নয়। পেশাগত চাহিদার সঙ্গে ব্যক্তিগত গুণাবলীর যদি উপযুক্ত সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে ব্যক্তি বিশেষ নিজের ভারসাম্য রাখতে পারে না। কর্মস্থলে অনুপযুক্ত ব্যক্তি নিজের অক্ষমতার জন্যে অশান্তিভোগ তো করেই উপরন্তু অন্যদের কাছেও একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এখন কে কোন্ পেশা অবলম্বন করলে সাফল্যলাভ করতে পারবে, উপযুক্ত মানসিক পরীক্ষার দ্বারা তা বলে দেওয়া যায়। কোন্ পেশাতে কি কি মানসিক বৃত্তি কি পরিমাণে থাকা প্রয়োজন—পেশাগুলি বিশ্লেষণ করে সে বিষয়ে যেমন মনোবিদেরা কার্যকরী সিদ্ধান্তে এসেছেন, তেমনি আবার সেই বৃত্তিগুলি একজন লোকের মধ্যে কতখানি পরিমাণ আছে, তাও তাঁরা নির্ণয় করে থাকেন। এইভাবে অনেক মানসিক শক্তির বৃথা অপব্যয় যে অনেক অংশে বন্ধ করা যায়, সেটা বলা বাহুল্য মাত্র।

এবার আর একটি ক্ষেত্রের কথা বলবো এবং সেটা হলো মানসিক ব্যাধি। আমাদের দেশে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে জীবনধারণের জন্যে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের সঙ্গে মোকাবিলা করবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি না থাকবার ফলে সংগ্রাম এড়াবার জন্যে বিকল্প অবস্থা অর্থাৎ মানসিক রোগের কবলে পড়তে অনেকে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের মতে পরিণত বয়সে যে সব মানসিক রোগ হয়, তার ভিত্তি শৈশবেই স্থাপিত হয়ে যায়। তা যদি হয়, তাহলে প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ শৈশব থেকেই শিশুদের মানুষ করবার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং এবিষয়ে বাবা-মার ও অভিভাবকের বা শিক্ষকের দায়িত্ব যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মানসিক রোগীরা শুধু নিজেরাই কষ্ট পান না, যে বাড়ীতে তাঁরা থাকেন, সে বাড়ীর লোকেরাও যে কি রকম ভয়ানক অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়, তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। অথচ দেখুন শরীরের কোন রকম অসুস্থতা হলে আমরা যত শীঘ্র সচেতন হই এবং সে বিষয়ে যথাসম্ভব

ব্যবস্থা নিয়ে থাকি, মনের রোগের বেলায়, অজ্ঞতা বা যে কোন কারণেই হোক, ততটা গুরুত্ব দিই না। কখনও কখনও আবার এই রোগের ব্যাপারটি সাধ্যমত গোপন রাখবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অঙ্কুরে বিনাশের জন্যে যা করণীয়, সেটা না করবার ফলে অনেক সময় ব্যাধি বৃদ্ধি পায় এবং অবস্থা আয়ত্তের বাইরে গেলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য না নিয়ে উপায় থাকে না এবং তখন হয়তো খুব দেরীই হয়ে যায়।

গার্হস্থ্য জীবনও মনোবিদ্যা প্রয়োগের আর একটি বিশেষ ক্ষেত্র। অনেক পরিবারেই কোন না কোন ঘটনা নিয়ে কিছু না কিছু অশান্তি থাকেই—এমনকি অনর্থও ঘটে। বলা বাহুল্য, এই সব অশান্তির মূলে থাকে পরস্পরের স্বার্থের কোন না কোন বিষয়ে সংঘর্ষ অথবা হিংসা, দ্বেষ, বঞ্চনাবোধ, হীনমন্যতা প্রভৃতির নির্মম প্রতিক্রিয়া। মনোবিদের সাহায্য নিয়ে অনেক সময়ে এই সব অবস্থার অবসান ঘটিয়ে পরস্পরের মধ্যে একটা সহনশীল এবং প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। তেমনি দাম্পত্য জীবনের কলহ কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অশান্তি ভোগের মধ্যে সীমিত থাকে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার জের পরিবারের সকলকে তো সংক্রামিত করেই, উপরন্তু ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যথেষ্টই ক্ষতিসাধন করে। কি কি কারণে এই কলহ হতে পারে, ভুল বোঝাবুঝি প্রশমনের উপায় কি, মনোবিদেরা তারও নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা একথা অবশ্য বলেন না যে, দাম্পত্য কলহ সংসার থেকে চিরকালের জন্যে বিলোপ করা যায় এবং একথাই ঠিক যে, যাওয়া উচিত নয়, কারণ এই কলহের একটা মধুর অথবা গঠনমূলক দিকও আছে, যেটা অস্বীকার করা যায় না। গোলাপফুলেও কাঁটা আছে, তা বলে কি ভোগ্যবস্তু হিসাবে তাকে অপাংক্তেয় রাখা হবে, দাম্পত্য কলহের ভয়ে কেউ কেউ আবার বিবাহকে এড়িয়ে যাওয়া প্রশস্ত মনে করেন। কিছু মনে করবেন না, সাধারণভাবে এটা মানসিক ভারসাম্যহীনতার বা অসুস্থতার একটি লক্ষণ বলে মনে করা যেতে পারে।

তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদ, যার সংখ্যা ইদানীং-কালে ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে, তার মূলে কি কি কারণ দায়ী সে ব্যাপারে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে। গতানুগতিক যে সব কারণ মুখ্য বলে বিবেচিত হয় অথবা যে সব যুক্তি বা আইনগত সাহায্যের মাধ্যমে বিবদমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে, সেগুলি বিচ্ছেদ ঠেকাবার ব্যাপারে ততটা কার্যকরী হয় না এবং হলেও তার ফল সাময়িক ও সীমিত হয়ে থাকে। আর্থিক অসচ্ছলতা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বঞ্চনা বা অশান্তি, পরস্পরের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, শারীরিক বৈকল্য বা অসুস্থতা ইত্যাদি অসুবিধাগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছেদের কারণ বলে বিবেচিত হলেও অন্তর্নিহিত যে আরও বিচিত্র ও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, সে সবের খবর সকলে এমন কি স্বামী-স্ত্রীর অনেকেই জ্ঞাত থাকেন না এবং জানলেও বিশেষ কারণে প্রকাশ করতে না পারায় গোপনই থেকে যায়। মনোবৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে প্রবৃত্তিমূলক এই শেষোক্ত কারণগুলির উপর আলোকপাত করা যায় এবং তার ফলে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে শান্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। মনোবিদেরা এই প্রমাণও দিয়েছেন যে, আপাতকারণগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ধরণের এবং অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিসঞ্জাত—আসল কারণগুলির প্রকাশে তারা সাহায্য করে মাত্র।

শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, রাজনীতি, ছাত্র-অসন্তোষ ইত্যাদি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত জীবনে

মানবজাতির যে সব বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা বা ব্যবহারের সীমাহীন প্রকাশ ঘটে থাকে, সেগুলি কি ভাবে সুসংহত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহনশীল এবং উন্নত করা যায়, ফলিত মনোবিদ্যার ক্রমবর্ধমান অবদান সে সব বিষয়ে নতুন আশার সঞ্চার ও সমাধান করে চলেছে। মানব বা সমাজ কল্যাণের ব্যাপারে জড়-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অতি মূল্যবান অবদান অনস্বীকার্য; কিন্তু সেগুলিকে উপভোগের মাধ্যম যে মন, সেই মন কি চায়, তার আসল রূপ কি, তার পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সুরু ও শেষ কোথায়, তার কর্মধারা কি নিয়মে চলে—সে বিষয়ে পরীক্ষা বা গবেষণা আরও অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। যুগ যুগ ধরে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে যেমন কৌতূহলী, তেমনি সেই জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করতে সমভাবেই আগ্রহী। কিন্তু মানবগোষ্ঠীর এই কল্যাণ উপভোগের একমাত্র মাধ্যম যে এই মন, তার তুষ্টি বা সন্তোষের জন্যে, তার স্বাস্থ্যের জন্যে তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, বর্তমান প্রগতির যুগে অন্যান্য বিজ্ঞানশাখার চেয়ে যে কোন দিক থেকেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

গবেষণা-সংবাদ

পরিবেশ দূষিতকরণে শব্দের ভূমিকা

মানুষের পরিবেশ সর্বদাই শব্দমুখর। এই শব্দের প্রাবল্য বিশেষ সীমা অতিক্রম করলেই তা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং এইভাবেই শব্দ মানুষের পরিবেশকে দূষিত করে। আলোচনার জন্যে শব্দের ক্ষতিকর প্রভাবকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(1) শারীরিক এবং (2) মানসিক।

শারীরিক প্রভাবের মধ্যে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তা হল অনেক বছর ধরে ক্রমাগত প্রবল শব্দের প্রভাবে মানুষের শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, বিশেষ করে উচ্চ কম্পনাঙ্কের শব্দ শোনবার ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। কথা বলবার সময় মানুষ 100 থেকে 3000 হার্জ কম্পনাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে; অর্থাৎ কথা বলবার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হলে এই বিস্তারের মধ্যে সব কম্পনাঙ্কের শব্দ ঠিকভাবে শোনবার ক্ষমতা থাকা আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন। আমরা যখন কথা বলি, তখন ব্যবহৃত শব্দের (Word) সব অক্ষরগুলির উচ্চারণ একই কম্পনাঙ্কে করি না। উপরিউক্ত শ্রবণশক্তির ক্ষীণতার জন্যে যে অক্ষরগুলি উচ্চ কম্পনাঙ্কে উচ্চারিত হয়, সেগুলি শোনবার ক্ষমতা প্রথমেই লোপ পায়। এই বিষয়ে গবেষণার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে, বিভিন্ন অবস্থায় কথা বলবার সময় বিভিন্ন 'শব্দের' অক্ষরগুলি কি কম্পনাঙ্কে উচ্চারিত হয়, ঐ উচ্চারণের শব্দের প্রাবল্য কত এবং প্রবল শব্দের প্রভাবে অনেক বছর ধীরে ধীরে কিভাবে বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের শব্দ শোনবার ক্ষমতা মানুষের লোপ পায়—এসবের পরিমাপ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, সাধারণ ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এই ধরণের উচ্চ কম্পনাঙ্কের বধিরতার পরিমাণ 10 ডেসিবেল এবং তা সত্তর বছর বয়সে প্রায় 30 ডেসিবেলে দাঁড়ায়। কিন্তু গোড়া থেকেই প্রবল শব্দের প্রভাবে থাকলে প্রায় কুড়ি বছর বয়সেই বধিরতার পরিমাণ দাঁড়ায় 55

ডেসিবেল এবং এই বধিরতা স্থায়ীভাবে সারা-জীবনই থেকে যায়। যে সব কারখানায় যান্ত্রিক শব্দ প্রবল, সেখানকার কর্মীদের সকলেই এইভাবে শব্দ-দূষিত পরিবেশের শিকারে পরিণত হন। পৃথিবীর যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতায় অগ্রগামী দেশ-গুলিতে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে প্রচুর এবং তারই ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র যন্ত্র নির্মাতাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাদের নির্মিত যন্ত্র বিশেষ সীমার প্রাবল্যের উপরে শব্দ সৃষ্টি করতে না পারে। কাজের সময় কর্মীদের শব্দ-নিরোধক মাফলার বা ইয়ারপ্লাগ ব্যবহারের রেওয়াজও চালু হয়েছে।

মানসিক প্রভাবের ব্যাপারে অনেকের ধারণা—স্নায়ুতন্ত্রের বিপর্যয়, হজমশক্তির ক্ষয় এবং নানা রকমের শারীরিক অসুস্থতা, রক্তের উচ্চ-চাপ, হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতা এবং এমনকি উন্মাদ রোগও বিভিন্ন প্রকার অস্বস্তিকর শব্দের প্রভাবে ত্বরান্বিত হয়। অবশ্য এই সব উপসর্গের সঙ্গে শব্দের ক্ষতিকর প্রভাবকে সংযুক্ত করা কিছুটা অবৈজ্ঞানিক। কারণ, এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ কিছু হয় নি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শুধু এইটুকুই জানা গেছে যে, প্রবল শব্দের প্রভাবে কথাবার্তা বলবার অসুবিধা, কোনও বিষয়ে মনঃ-সংযোগে বাধা, ঘুমের অসুবিধা এবং বিরক্তি উৎপাদন ইত্যাদি হয়। বিরক্তি উৎপাদন আবার কতকটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে শব্দে একজন বিরক্ত হন, সেই প্রাবল্যের শব্দে অন্য একজন মোটেই বিরক্তি বোধ করেন না। লণ্ডনের যান-বাহনবহুল অঞ্চলে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে এবং বিমান-বন্দরের কাছাকাছি শহর-তলীতে সমীক্ষা করে উপরিউক্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব সমীক্ষায় ভুক্তভোগী নরনারীর জবানবন্দীই একমাত্র ভরসা। যদিও এই ধরণের সমীক্ষা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে পড়ে, তবুও এটা উল্লেখযোগ্য যে, কোন বিশেষ যান্ত্রিক পরিমাপের দ্বারা উপরিউক্ত তথ্যের মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয় নি। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ গবেষকেরা এই বিষয়ে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

আমাদের দেশে বড় বড় শহরে বহু তলবিশিষ্ট বাসগৃহ তৈরী সুরু হয়েছে। এগুলি অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণেই। এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হিসেবে ইউরোপের শহরগুলির নাম করা যায়। এই বাসগৃহগুলিতে দেয়ালের মধ্য দিয়ে এবং সরাসরি ছাদ থেকে উপর তলার শব্দ নীচের তলায় আসে। এ বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে ঐ বাসগৃহগুলি এক একটি ভয়াবহ শব্দের নিগ্রহ-প্রকোষ্ঠে (Torture chamber) পরিণত হতে পারে। ইউরোপে কোন কোন স্থানে বাসগৃহে ব্যবহৃত ছাদ ও দেয়ালের শব্দ শোষণ ক্ষমতা কত থাকা প্রয়োজন, তা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। গৃহ-নির্মাতারা বিশেষ যান্ত্রিক পরিমাপ পদ্ধতির দ্বারা ছাদ ও দেয়ালের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেন এবং এটা বাধ্যতামূলক। আমেরিকার বড় বড় শহরেও এই ধরণের নিয়ম চালু করা হচ্ছে।

রাস্তার যানবাহন এবং বিমান চলাচলের শব্দ মানুষের সহ্যসীমার মধ্যে আনবার জন্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এই সব যন্ত্রের ডিজাইন নিয়ে গবেষণা চলছে। শহর বিন্যাসের এবং যানবাহন চলাচলের পথ মানুষের বাসস্থান থেকে দূরে থাকে এবং এই দুইয়ের মধ্যে বাফার জোন (Buffer zone) রাখা যায়। আমাদের দেশে চণ্ডীগড় শহর এ বিষয়ে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বিমান ওড়া এবং নামবার সময়ে যে সারকিট ব্যবহার করা হয়, তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান চলাচলের সময় যে কট্‌কা কোট্‌বার মত 'সনিক বুম' শোনা যায়, মানুষের উপর তার প্রভাব এবং কিভাবে এটা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব, সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই

ইউরোপ ও আমেরিকায় গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশে জনসাধারণ শব্দের দ্বারা পরিবেশ দূষিতকরণের বিষয়ে খুব বেশী সচেতন নন। হয়তো এর কারণ দেশের লোকসংখ্যার খুব ছোট একটা অংশ, অর্থাৎ শুধু শহরবাসীরাই এইরকম দূষিত পরিবেশের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু এখন থেকেই গবেষণা স্তরে এ বিষয়ে সচেতন হলে অদূর ভবিষ্যতের অনেক সমস্যাই সহজে সমাধান করা যাবে।

সুনীলকুমার সিংহ*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

জেনে রাখ

বড় পাখী

আফ্রিকার অষ্ট্রিচ পাখী, এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখী। 2·44 মিটার উচ্চতার এই পাখীটির ওজন প্রায় 136 কিলোগ্র্যাম। এই পাখাটি যে ডিম পাড়ে, তা লম্বায় প্রায় 75 সে. মি. হয়ে থাকে, এরকম লম্বা ডিম দেখা যায় না। এর ডিমের ওজন প্রায় 1·36 কিলোগ্র্যাম। উড়তে না পারলেও এটি ঘণ্টায় প্রায় 64·37 কিলোমিটার দৌড়ায়। যেখানে অন্যান্য পাখীদের পায়ে চারটি করে আঙ্গুল থাকে, এর সেখানে আছে মাত্র দুটি—এটি আর একটি বৈশিষ্ট্য।

বড় ফুল

জাভায় রাফ্লেসিয়া নামে এক ধরণের ফুল আছে, যার চেয়ে বড় ফুল পৃথিবীতে নেই। এক একটি ফুলের ওজন প্রায় 10 কিলোগ্র্যাম। এই ফুলের ব্যাস 50 সে. মি. থেকে 70 সে. মি. হয়ে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো—কুঁড়ি থেকে সম্পূর্ণ ফুটতে এর সময় লাগে দেড় বছরের মত। অথচ ফোটবার পর মাত্র দু-তিন দিনের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। ফুলের রাজ্যে এর গন্ধ পচা মাংসের মত। এই ফুলগাছটি কিন্তু পরভোজী; অন্য গাছের শিকড় থেকে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে।

বড় পাতা

ব্রেজিলে একরকম উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়—যার পাতা পদ্ম পাতার মত। এর নাম ভিক্টোরিয়া রিজিয়া। জলে ভাসমান এই পাতার ব্যাস প্রায় 2 মিটার। এই পাতায় থালার কিনারার মত কয়েক সেন্টিমিটার উঁচু কিনারা থাকে। কথিত আছে, কোন উদ্ভিদ উদ্যানের এই গাছের প্রথম ফুল মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়েছিল, তারপর থেকেই মহারাণীর নামে এই নামকরণ হয়;

যুগলকান্তি রায়*

* 43/বি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-37

সত্যেন বসুকে স্মরণ করি কেন ?

আচার্য বসুর মৃত্যুর পর একটি নামকরা বিজ্ঞান পত্রিকায় (Science Reporter) বলা হয়েছিল যে, দু-শ' বছর পরে তখনকার ভারতীয় ছাত্রেরা যদি পদার্থবিদ্যার বই-এ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নাম দেখতে চায়, তবে একজনের নাম পাবেই—তিনি হলেন প্রোফেসর এস. এন, বোস। এমন কি এই নামটিও যদি না থাকে, তবে 'বোসন' কণিকার মাধ্যমে তাঁর নাম বার বার উচ্চারিত হবে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্ অধ্যাপক সাকে ক্রুয়া বলেছেন, মৌল কণিকা নিয়ে পৃথিবীর যে সমস্ত বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন তাঁদেরকে দিনে এক-শ' বার বোসের নাম করতে হয়। সুতরাং আচার্য বসু যে তাঁর অনন্য বৈজ্ঞানিক অবদানের মাধ্যমে বিজ্ঞানজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যারা উচ্চতর বিজ্ঞান বুঝি না, বিজ্ঞানের কথা সাধারণভাবে জানতে চাই, শিখতে চাই এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগে নিজেদের তথা দেশের সমৃদ্ধি বাড়াতে চাই—তাদের কাছে সত্যেন বসুর ভাবমূর্তি কি, সাধারণ মানুষ সত্যেন বসুর কথা কেন ভাববে—আজ তা ভেবে দেখতে হবে।

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বে অনেক বড় বড় নেতা ছিলেন, যাঁরা ব্যক্তিত্বে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় সাহসিকতায় কোন অংশে গান্ধীজীর চেয়ে ন্যূন ছিলেন না। পরাধীন জাতির দুঃখ-দুর্দশা তাঁদেরও অস্থির করে তুলত; তাঁরাও দেশের সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে, দেশকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নানা চেষ্টা করতেন, প্রয়োজনে প্রতিবাদের ঝড় তুলতেন। কিন্তু, তাঁদের ঐ সংগ্রাম নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, দেশের মানুষকে আপন করে নিয়ে, তাদেরকে পাশে নিয়ে তাঁরা চলতে পারেন নি। তাঁদের এই সংগ্রামে সাধারণ মানুষ থাকত তাঁদের থেকে অনেক দূরে; মুক্তির মন্ত্র তাদের কানে পৌঁছয় নি। গান্ধীজী সেই কাজটি করলেন। তাঁর 'স্বরাজ' মন্ত্রে আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠল। ভারতের কোটি কোটি মানুষকে

সঙ্গে নিয়ে, তাদের মধ্যে মিশে গিয়ে ভারতব্যাপী যে জনজাগরণের জোয়ার তিনি আনলেন, তাকে স্বাগত জানাতে লেনিন, হো-চি-মিন প্রমুখ বিপরীত রাজনীতির মানুষেরাও দ্বিধা করেন নি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা আন্দোলনে আচার্য বসুও সেই জনজোয়ার এনেছেন। তাই, এদিক থেকে তাঁকে গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনা করলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না মনে করি।

সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি প্রমুখ ব্যক্তিরা যখন পড়াশুনা করেছেন, তখন দেশে শিকল ভাঙ্গার ডাক এসেছে। সত্যেন বসু ও তাঁর সহপাঠীরা এই ডাকে সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, দেশকে সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হলে বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখা গেল, পরীক্ষা পাশের পর এঁদের কেউই কোন সরকারী চাকরীর পিছনে না ছুটে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করবার জন্যে চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞানের মূল কথাকে ঠিকমত না হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কখনই তাকে জীবনের প্রয়োজনে যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না; ফলে জাতির অগ্রগতি অনেক মন্থর হয়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ বুঝলেন মাতৃভাষায় কোন জিনিষ যত সহজে বোঝা যায় আর কোন ভাষায় তা সম্ভব নয়। তিনি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাতেই পড়াতেন এবং তাঁর চেষ্টাতে ঢাকায় 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বেরিয়েছিল। বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা অক্ষয় দত্ত থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকে বলে গেছেন; অনেক পত্র-পত্রিকাও বেরিয়েছে। এমন কি, 'বিজ্ঞান পরিষদ' নামে একটি সংস্থাও আগে একবার গঠিত হয়েছিল। অক্ষয় দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর থেকে সুরু করে এখন পর্যন্ত বহু ব্যক্তি বিজ্ঞানের কথা সাধারণের জন্যে বাংলাভাষায় এত লিখেছেন যে, সত্যেন্দ্র-নাথের লেখার সংখ্যা বরং সে তুলনায় অনেক কম। তাহলে সত্যেন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে নতুন কি করলেন, যার জন্যে তাঁর কথা ভাবতে হবে? না, তিনি নতুন কিছু করেন নি, বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়েও স্যামসনের শক্তি নিয়ে তিনি পুরনো জগদ্দল পাথরটিকে নড়িয়েছেন; আর সেই নড়ার শব্দে আশে-পাশের মানুষের ঘুম ভেঙ্গে গেছে—এই যা! গান্ধীজীও নতুন কিছু বলেন নি। জনতার জমাট-বাঁধা আবেগকে গলিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মহাত্মা', সুভাষের কাছে 'জাতির জনক'।

যখন সাহেবদের ভাষা, সাহেবদের চালচলনই আমাদের কৌলিন্যের মস্ত বড় পরিচয় ছিল, তখন 'মায়ের ভাষায় শেখো' এই কথাটা বলা দুঃসাহসিকতা ছাড়া আর কি! অক্ষয় দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যক্তি বাংলায় যা লিখতেন, তা

এমন সব পত্র-পত্রিকায় বের হত যা পড়বার সুযোগ সাধারণের থাকত না। উচ্চ শিক্ষিতরাই সে সব পড়তেন। তাঁদের অনেকে এসবের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখালেও ঐসব লেখা এ ব্যাপারে তাঁদের যে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল—তাঁর গুরুত্ব কম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীদের এই কাজকে আরও জোর কদমে এগিয়ে দিলেন। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে বহু বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তির সহযোগিতায় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ গঠনমূলক আন্দোলনের সূচনা করলেন। জনপ্রিয় বক্তৃতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলবার পরিকল্পনা নেওয়া হল। কিন্তু দেশের শিক্ষানীতি তো সাধারণ মানুষ নির্ধারণ করে না। যাঁরা করেন, সেই সমস্ত উচ্চশিক্ষিত মানুষের অনেকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার নামে নাক সিটকাতেন। তাঁদের বোঝাবার ভার নিলেন তিনি নিজেই। বিশ্ববিশ্রুত চিন্তানায়ক মানবেন্দ্র নাথ রায় (যিনি এম. এন. রায় নামে খ্যাত) একটা কথা প্রায়ই বলতেন, 'Educate the educators'—অর্থাৎ জনশিক্ষার প্রসারে যাঁরা শিক্ষা দেবেন, তাঁদের আগে শিক্ষা দাও। এ ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথ যে পথ নিলেন, তা হল 'একলা চল রে'। 1948 থেকে 1974-এর ইতিহাস—তাঁর সেই একলা চলার ইতিহাস। কলকাতা, দিল্লী, গৌহাটি, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের যেখানে যখন আমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি ছুটে গেছেন। বিজ্ঞানের সাধারণ আলোচনা থেকে সুরু করে উচ্চতর গবেষণার আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথাটি বলতে ভুলেন নি। এমন কি, তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁরই আবিষ্কৃত সংখ্যায়ন—'বোস-সংখ্যায়ন'-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছিল, সেখানেও ঐ কথাটি বলেছিলেন। এজন্যে তাঁকে কম সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয় নি! কিন্তু, তিনি অবিচল। তাঁর মত নম্র, বিনয়ী মানুষও পণ্ডিত সমালোচকদের বিরুদ্ধে বহু পূর্বেই গর্জে উঠেছিলেন—"যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না"। আচার্যের নিরলস সংগ্রামে একদিকে যেমন পণ্ডিতদের উন্নাসিকতা কেটেছে, অপরদিকে তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-ও সাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। এমনি করে আচার্য বসুর মাঝে সাধারণ মানুষ তার এক আপনজনকে খুঁজে পেয়েছে। আর, অনেক সাধারণ বাঙ্গালীর কাছেই সত্যেন বসুর অপর নাম 'বাংলায় বিজ্ঞান'। তাই তো তাঁকে আজ স্মরণ করি, শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াই।

যুগলকান্তি রায়*

* 43/বি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-700037

হেন্‌রিখ্‌ রুডল্‌ফ্‌ হার্ট্‌জ্‌

জন্ম—22শে ফেব্রুয়ারী, 1857
মৃত্যু—1লা জানুয়ারী, 1894

"আমার পরীক্ষাগুলি ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অভূতপূর্ব সাফল্য এনেছে"—হার্ট্‌জ্‌। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র এটুকু মন্তব্য যথেষ্ট নয়। হার্ট্‌জের পরীক্ষার বিরাট সাফল্য থেকে স্বভাবতঃই মনে হয়—স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির অবমূল্যায়ন করেছিলেন।

আজকের বেতার ও দূরদর্শনের যুগে অনেকেই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ কি? তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ হলো বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক-ক্ষেত্রের স্পন্দনজনিত তরঙ্গ—যা আলোর বেগে শূন্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই হিসাবে আলোও হলো তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গ যেদিকে প্রবাহিত হয়, তার লম্বভাবে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের স্পন্দন ঘটে। চৌম্বক ক্ষেত্রের তলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত অপর একটি তলে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থাকে। স্ব স্ব তলে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র সব সময়ই স্পন্দিত হচ্ছে এবং এই স্পন্দনের আলোড়ন আলোর বেগে প্রবাহিত হয়। সাধারণ আলো থেকে সুরু করে এক্স-রশ্মি, গামা রশ্মি, রেডিও-তরঙ্গ ইত্যাদি সবই হলো তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। কেবল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অথবা কম্পনাঙ্কের প্রভেদই এদের পরস্পর পরস্পরকে আলাদা করে। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বগত-ভাবে এই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুর প্রায় 7 বছর পরে পরীক্ষার দ্বারা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি ও তার গুণাবলী আবিষ্কার করে এই তরঙ্গতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং ম্যাক্সওয়েলকে বিজ্ঞান জগতে অমর করে রাখবার প্রথম কৃতিত্ব যাঁর, তিনি হলেন—বিজ্ঞানী হেন্‌রিখ্‌ রুডল্‌ফ্‌ হার্ট্‌জ্‌।

জার্মেনীর হামবুর্গ শহরে 22শে ফেব্রুয়ারী, 1857 সালে একটি বর্ধিষ্ণু ও স্বচ্ছল পরিবারে হার্ট্‌জের জন্ম। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি সহজাত আকর্ষণ তাঁকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া থেকে নিবৃত্ত করে। 1878 সালে বার্লিনে গিয়ে তিনি প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী হেলম্‌হোৎজের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

এখানেই হেলম্‌হোৎজ হার্ট্‌জের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তখন থেকে হার্ট্‌জ হেলম্‌হোৎজের সহযোগী হিসাবে কাজ সুরু করেন। পরবর্তীকালে 1885 সালে কার্লস্রুহে পলিটেক্‌নিক স্কুলে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। এরপর তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ অধ্যাপকপদেই বৃত ছিলেন। এই হলো হার্ট্‌জ-এর ছত্রিশ বছরের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের ব্যাপারে হার্ট্‌জের বেশীর ভাগ কাজ কার্লস্রুহে-তে থাকাকালীনই ঘটেছিল। ঐ তরঙ্গ সৃষ্টির জন্যে প্রেরক-যন্ত্র এবং তা নির্ধারণের জন্যে গ্রাহক-যন্ত্র তৈরী করে তিনি দেখালেন, তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ শূন্যে আলোর বেগের সমান। এছাড়াও তিনি দেখান তির্যক তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ আলোর মতই প্রতিফলিত, প্রতিসৃত, সমবর্তিত ইত্যাদি হয়। এসব থেকে একদিকে যেমন সন্দেহাতীতভাবে আলোর তরঙ্গ-সত্বা স্বীকৃতি পেলো, তেমনি অন্যদিকে রেডিও, টেলিভিসন, রেডার প্রভৃতি সৃষ্টির মূল চাবিকাঠি বিশ্বের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছে গেল।

কেমন করে হার্ট্‌জ্‌ তাঁর পরীক্ষায় সাফল্য আনলেন? আগেই জানা ছিল, কোন তড়িদ্বাহী কণা ত্বরিতগতিতে চললে তা শক্তি বিকিরণ করে এবং এই শক্তি তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শক্তির পরিমাণ এবং স্থায়িত্ব এত কম যে, এর গতিবেগ এবং কম্পনাঙ্ক প্রভৃতি পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। হার্ট্‌জ্‌ বৈদ্যুতিক বর্তনীর সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টির পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কোন ধারকে (capacitor) সঞ্চিত তড়িৎ-আধানের মোক্ষণ ঘটিয়ে তিনি স্পন্দনশীল তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করেন—যা চারপাশে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে।

ধাতুর তৈরী একটি দণ্ডের দু-প্রান্তে হার্ট্‌জ্‌ দুটি ধাতব বল লাগান। এই দণ্ডটিকে বাঁকিয়ে এমনভাবে বৃত্তাকার করে তৈরী করা হয় যে, এই অবস্থায় বল দুটি মুখোমুখি থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় বল দুটির মধ্যে দূরত্ব কমানো বা বাড়ানো যায়। এটিকে হার্ট্‌জ্‌ গ্রাহক-যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। অন্ধকার ঘরে প্রেরক-যন্ত্রের কাছাকাছি অঞ্চলে গ্রাহক-যন্ত্রটির অবস্থানের পরিবর্তন করে তিনি বল দুটির ফাঁকের মধ্যে তড়িৎ-মোক্ষণ লক্ষ্য করেন। এথেকে তিনি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গের বেগ নির্ধারণ করেন। চিত্রে হার্টজের তৈরী যন্ত্রটি দেখানো হয়েছে।

[হার্টজের প্রেরক-যন্ত্রে ধারক হলো একই উল্লম্বতলে পরস্পরের কেন্দ্র থেকে প্রায় 60 সে. মি. দূরে থাকা দুটি বর্গাকার পিতলের পাত, যাদের প্রত্যেকের বাহুর দৈর্ঘ্য 40 সে. মি.। এই পাত দুটির সঙ্গে দুটি দণ্ড সংযুক্ত থাকে। এদের প্রত্যেকটির অগ্রভাগে একটি করে মসৃণ পিতলের বল লাগানো হয় (চিত্র)। বিশেষ ব্যবস্থায় এই বল দুটির মধ্যে দূরত্ব পরিবর্তন করা যায়। একটি আবেশ কুণ্ডলীর দ্বারা পাত দুটিকে উচ্চবিভবে তড়িদাহিত করা হয়। পিতলের বল দুটি উচ্চবিভবযুক্ত হওয়ায় বল দুটির মধ্যবর্তী

অঞ্চলের বাতাসে দ্রুত তড়িৎ-মোক্ষণ ঘটে। এর ফলে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা পাশাপাশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে]

হার্ট্জের যন্ত্র
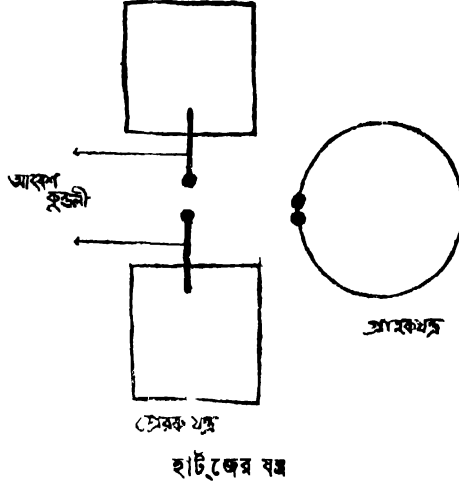
হার্টজীয় তরঙ্গ বিজ্ঞান জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। তিনি যে হ্রস্ব তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 66 সে. মি. (প্রায়)। তবে হার্ট্জের গ্রাহক যন্ত্র ততটা সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল ছিল না, সে কারণে একে উৎসের খুব কাছে স্থাপন করতে হতো। প্রসঙ্গত বলা যায়, পরবর্তীকালে হার্ট্জের মত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ বাড়িয়ে 5 মি. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আধুনিক যুগে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ রেডার, টেলিভিসন ইত্যাদি যন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

হার্ট্জ্ অন্য এক পরীক্ষার দ্বারা দেখান, অতিবেগুনী রশ্মি তড়িদ্দ্বারে পড়লে মোক্ষণ-ফাঁকের (spark-gap) মধ্যে তড়িৎ-মোক্ষণ ত্বরান্বিত হয়। যে কারণে এই ঘটনা ঘটে—পরবর্তীকালে তা হলো—আলোক-তড়িৎক্রিয়া। 1905 সালে আইনষ্টাইন এই আলোক-তড়িৎক্রিয়ায় আলোকের কণাধর্ম বা ফোটন প্রকৃতি আরোপ করে তার ব্যাখ্যা দেন। এথেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আলোর মধ্যে তরঙ্গ এবং কণা—এই দুই ধর্মই বর্তমান। সুতরাং বলা যেতে পারে হার্ট্জ একদিকে আলোর তরঙ্গ-প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অন্যদিকে কণা-প্রকৃতির ধারণা সৃষ্টির সূচনা করেন।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন হার্ট্জ্ স্বল্পচাপে গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ-মোক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। অনেকের মতে, আরও কয়েক বছর জীবিত থাকলে হয়তো এক্স-রশ্মি আবিষ্কারের গৌরবও তিনি অর্জন করতেন।

বেশ কিছুকাল অসুস্থ অবস্থায় কাটিয়ে বন শহরেই 1894 সালের 1লা জানুয়ারী হার্ট্জ অকাল মৃত্যু বরণ করেন।

হেন্‌রিখ হার্ট্‌জের সম্মানে বর্তমানে রেডিও-তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের এককে বলা হয় 'হার্ট্‌জ্'। অধিবেশন সুরুর সময় রেডিও খুললে শোনা যায়, "... কিলো হার্ট্‌জ্-এ প্রচারিত হচ্ছে।" এটাই মনে করিয়ে দেয় রেডিও-বিজ্ঞানের দিগন্ত যিনি প্রথম উন্মোচন করেছিলেন, তিনি হলেন—বিজ্ঞানী হেন্‌রিখ্ রুডল্‌ফ্ হার্ট্‌জ্।

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

অতিতারল্য*

চরম শূন্য তাপমাত্রার কাছে তরল হিলিয়ামের (হিলিয়াম-4) প্রকৃতিতে বেশ কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী কাপিৎজা 1938 সালে প্রথম লক্ষ্য করেন, ঐ তরল হিলিয়াম কোন সান্দ্রতা (viscosity) ছাড়াই প্রবাহিত হয়। এমন ঘটনা পদার্থ-বিজ্ঞানে সচরাচর দেখা যায় না। কাপিৎজা তাই ঐ তরল হিলিয়ামের নাম দিলেন অতিতরল বা সুপারফ্লুইড। শীঘ্রই এই অতিতরলের এমন আরো অনেক আশ্চর্য ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। দেখা গেল, তরল হিলিয়ামপূর্ণ কোন পাত্র থেকে ঐ তরল আপাতভাবে অভিকর্ষকে উপেক্ষা করে পাত্রের গা বেয়ে বেরিয়ে আসে। আরো লক্ষ্য করা গেল, তরল যতই বেরিয়ে যায়, পাত্রের মধ্যেকার বাকি তরল ততই উষ্ণ হতে থাকে। তাছাড়া, কৌশিক নলের মধ্য দিয়ে তরল হিলিয়ামের মুক্ত প্রবাহ দেখে যে সময়ে কাপিৎজা তরল হিলিয়ামকে সান্দ্রতাশূন্য এক অতি-তরল হিসাবে ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়েই (1938 সাল) কীডমে এবং ম্যাকউড নামক দুই বিজ্ঞানী ঘূর্ণায়মান চাকতি-পরীক্ষায় সান্দ্রতা পরিমাপ করে দেখলেন যে, তার মান উপেক্ষণীয় নয়। ক্রমে তরল হিলিয়ামের এই অতিতারল্য এভাবে ব্যাখ্যার অযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

পদার্থের অণু-পরমাণুর মধ্যেকার আকর্ষণ-বিকর্ষণ বলই পদার্থের গঠন-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই আকর্ষণ বল যত অধিক হয়, পদার্থ তত কঠিন হয়। পদার্থের অণু-পরমাণুগুলি সর্বদা সুস্থির অবস্থায় থাকে না। তাপের গতীয় তত্ত্ব বা কাইনেটিক থিওরী অনুযায়ী চরম তাপমাত্রা ভিন্ন যে কোন তাপমাত্রায় অণু-পরমাণুগুলি সর্বদা একটি

---

* গত 16. 5. 76 তারিখে পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা এবং হাতে-কলমে কেন্দ্র' কর্তৃক আয়োজিত জনপ্রিয় বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার।

বিশৃঙ্খল গতীয় অবস্থায় থাকে। তাপমাত্রা যত বাড়ে, অণু-পরমাণুর বিশৃঙ্খল গতিশক্তি ততই বাড়ে এবং তা অণু বা পরমাণুর মধ্যেকার আকর্ষণ বলের মানকে কমিয়ে দেয়। ফলে কাঠিন্য নষ্ট হয়ে যায় এবং পদার্থ ক্রমে কঠিন থেকে তরল এবং শেষে গ্যাসীয় অবস্থায় এসে পৌছয়—যেখানে বিশৃঙ্খলা চরম। লক্ষণীয়, এই বিশৃঙ্খল গতিশক্তিই তাপশক্তি এবং বিষয়টি তাপ-গতিবিদ্যার অন্তর্গত। এই বিশৃঙ্খলার পরিমাপ তাপগতি-বিদ্যায় এন্ট্রপির ধারণা থেকে করা হয়। তাপগতিবিদ্যার মূল নীতি অনুযায়ী যে কোন জাগতিক স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনে শক্তির নিত্যতা অক্ষুণ্ণ রেখে সামগ্রিকভাবে বস্তুতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা বা এন্ট্রপি বাড়বে। অপরপক্ষে অণু-পরমাণুগুলির গতীয় অবস্থা সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল হলে পদার্থ কঠিনই থাকে—কোন অবস্থান্তর ঘটে না এবং সমগ্র বস্তুটি এককভাবে একটি গতি পায়। এই একক গতির বিষয়টি বলবিদ্যার অন্তর্গত।

হিলিয়ামের আন্তর্পারমাণবিক আকর্ষণ বল অত্যন্ত কম। সেজন্যে খুব নিম্ন তাপমাত্রায় (প্রায় 4·2 ডিগ্রী কেলভিন) এটি তরলীভূত হলেও নিম্নতম মাত্রার শক্তি বা জিরো পয়েন্ট এনার্জির জন্যে অত্যধিক চাপ (বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় 25 গুণ) ছাড়া চরম শূন্য তাপমাত্রায়ও এটি কঠিনীভূত হয় না। এই তরল হিলিয়ামকে (হিলিয়াম-4) শীতল করলে 2·2 ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রার কাছে এর ঐ আকর্ষণীয় ধর্মান্তর (দ্বিতীয় মাত্রার) লক্ষ্য করা যায়—তরল হিলিয়াম অতিতরলে পরিণত হয়। এ সময়ে সান্দ্রতা ইত্যাদি ছাড়াও বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, তাপীয় পরিবাহিতা প্রভৃতিতে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

এই যাবতীয় ঘটনাগুলির ব্যাখ্যার জন্যে কাপিৎজা একপ্রকার (ঘটনামূলক) দুই-তরল তত্ত্ব বা টু-ফ্লুইড থিওরী প্রণয়ন করেন। এই তত্ত্ব অতিতারল্যকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেও এটি মৌলিক নয়। তাছাড়া অতি তরলসংক্রান্ত আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলিক ব্যাখ্যা থেকে এই দুই-তরল তত্ত্বের ব্যাখ্যা আজও বিশেষ বিতর্কিত (অনসাগের এবং পেনরোজ 1956)। যাই হোক, কাপিৎজা ধরে নেন 2·2 ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রার নীচে তরল হিলিয়ামকে দুটি তরলের মিশ্রণ বলে ধরা যেতে পারে—একটি সাধারণ, অপরটি অতিতরল। তাপমাত্রা যত কমে, এই অতিতরলের পরিমাণ ততই বেড়ে যায় এবং চরম শূন্য তাপমাত্রায় সমস্ত তরল হিলিয়াম অতিতরলে পরিণত হয়। সাধারণ তরলের প্রকৃতি সাধারণ; কিন্তু অতিতরলের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি অনুমান করেন যে, অতিতরলের পারমাণবিক গ্যাসীয় অবস্থা সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল, অর্থাৎ অতিতরলের এন্ট্রপির মান শূন্য। এই অতিতরল কোন ঘর্ষণ ছাড়াই প্রবাহিত হতে পারে; অর্থাৎ অতিতরলের সান্দ্রতার মান শূন্য।

এই দুই-তরল তত্ত্বের সাহায্যে কাপিৎজা সহজেই তরলের এই অতিতারল্য সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। কৌশিক নলের মধ্য দিয়ে তরল হিলিয়ামের স্বাভাবিক

প্রবাহ লক্ষ্য করে তিনি তরল হিলিয়ামের সান্দ্রতার মান শূন্য পান। অথচ কাউমে এবং ম্যাকউড একটি চাক্তিকে ঐ তরলের মধ্যে ঘূর্ণনকালে কিছু বাধা লক্ষ্য করে সান্দ্রতাঙ্কের শূন্যমান অস্বীকার করেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে কাপিৎজা মত প্রকাশ করেন, কৌশিক নলের পরীক্ষায় নলের মধ্য দিয়ে সাধারণ তরল অল্পই প্রবাহিত হয়েছিল—যেহেতু তার সান্দ্রতা বেশী। নল দিয়ে অধিক প্রবাহিত হয়েছিল সান্দ্রতাশূন্য অতিতরল। তাই তিনি সান্দ্রতাঙ্ক শূন্য পেয়েছিলেন। অপরপক্ষে কীডমে এবং ম্যাকউডের পরীক্ষায় তাঁদের চাক্তিটি সাধারণ এবং অতিতরল—উভয়েরই সংস্পর্শে ছিল। চাক্তিটির ঘূর্ণনে তাই অতিতরল কোন বাধা না দিলেও সাধারণ তরল স্বাভাবিক নিয়মেই বাধা দিয়েছিল। এজন্যে সান্দ্রতাঙ্ক শূন্য হয় নি।

এছাড়া, তরল হিলিয়াম দ্বারা আংশিকভাবে পূর্ণ কোন পাত্রের গায়ে পৃষ্ঠটানের ফলে অন্যান্য তরলের মত একটি পাতলা আস্তরণ তৈরী হয়। এই আস্তরণ অত্যন্ত পাতলা হলেও তরল হিলিয়ামের অতিতরল অংশ সান্দ্রতাশূন্য হওয়ায় সাইফন প্রক্রিয়ায় তা এই আস্তরণের মধ্য দিয়ে পাত্রের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, যা স্যধারণ কোন তরলের পক্ষে অসম্ভব। তরল হিলিয়ামপূর্ণ একটি পাত্র থেকে তরল হিলিয়াম এভাবেই সাইফন প্রক্রিয়ায় পাত্রের বাইরে বেরিয়ে আসে। আবার এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ সাইফন প্রক্রিয়ায় তরল হিলিয়ামের অতিতরল অংশই বাইরে আসবে, কারণ তার সান্দ্রতা শূন্য। কাজেই এভাবে পাত্রের মধ্যে তরল হিলিয়ামে 'সাধারণ' তরলের অনুপাত বেড়ে যাবে। কিন্তু এটি সম্ভব, যদি পাত্রের মধ্যে তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রা বাড়ে। কেননা আগেই বলা হয়েছে, 2·2 ডিগ্রী কেলভিনের নীচে তাপমাত্রা কমলে অতিতরলের পরিমাণ বাড়ে।

এভাবে কাপিৎজার দুই-তরল তত্ত্ব অতিতারল্যের একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই তত্ত্ব মৌলিক নয়। বিশেষতঃ 2·2 ডিগ্রী কেলভিনের নীচে তরল হিলিয়ামের ঐ দুই তরলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং অতিতরল অংশের এন্ট্রপি ও সান্দ্রতার মান শূন্য হওয়া—এদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 1938 সালে বিজ্ঞানী লণ্ডন বলেন, যে সমস্ত গ্যাস বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে, যেমন এই হিলিয়াম, তাদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নীচে সংখ্যায়নের বাস্তব সঙ্গতির কারণে কিছু অণু বা পরমাণুকে ঐ বিশৃঙ্খল শক্তি হারিয়ে শক্তিশূন্য অবস্থায় থাকতে হবে। ঐ তাপমাত্রার নীচে যতই যাওয়া যাবে, শক্তিশূন্য ঐ অণু বা পরমাণুর সংখ্যাও ততই বাড়বে। একে বলা হয় বোস-আইনষ্টাইন কণ্ডেনসেশন। হিলিয়াম গ্যাসের ক্ষেত্রে এই কণ্ডেনসেশন সুরু হওয়ার তাপমাত্রা তিনি দেখালেন 2·8 ডিগ্রী কেলভিন, যা 2·2 ডিগ্রীর খুবই কাছে। তাই লণ্ডন বললেন, অতিতরল হলো বোস-আইনষ্টাইন কণ্ডেনসেশন এবং কাপিৎজার অতিতরল অংশ ঐ শক্তিশূন্য অংশ, বা

স্বাভাবিকভাবেই বিশৃঙ্খলা বা এন্ট্রপি শূন্য এবং তাপমাত্রা হ্রাসের সঙ্গে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া লণ্ডন দেখান, অতিতারল্য শুধু হিলিয়াম-4 এর বেলায় হওয়ার কারণ হলো তা বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে, যেখানে বোস-আইনষ্টাইন কণ্ডেনসেশন সম্ভব। হিলিয়াম-3 ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে, তাই সেক্ষেত্রে অতিতারল্য দেখা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানী লণ্ডনের যুক্তি থেকে অতিতারল্যের সান্দ্রতাশূন্যতার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাছাড়া 1946 সালে বিজ্ঞানী পেশকভের একটি পরীক্ষা লণ্ডনের ব্যাখ্যা সঠিক নয় বলে প্রমাণ করে। তাঁর মতে অতিতারল্য বোস-আইনষ্টাইন কণ্ডেনসেশন নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, তরল হিলিয়াম অতিতরল এবং সাধারণ তরলের মিশ্রণ। কাজেই তরল হিলিয়ামের মধ্য দিয়ে দুই প্রকার স্পন্দনের প্রবাহ চিন্তা করা যেতে পারে। এক ধরণের স্পন্দনে অতিতরল এবং সাধারণ তরল একইভাবে আন্দোলিত হবে। অপরটিতে প্রথমটির তুলনায় তরলটি বেশী আন্দোলিত হবে। প্রথম স্পন্দনকে শব্দ বলা হয়। দ্বিতীয় স্পন্দনের প্রবাহে দুই তরলের অনুপাত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন এবং সময়ের সঙ্গে এই অনুপাত পরিবর্তিত হবে। আগেই বলা হয়েছে, দুই তরলের এই অনুপাতের পার্থক্য তাপমাত্রার ভিন্নতা সৃষ্টি করবে। তাই দ্বিতীয় তরঙ্গকে তাপমাত্রা তরঙ্গ বা দ্বিতীয় শব্দ বলা হয়। এখন লণ্ডনের তত্ত্বানুযায়ী এই দ্বিতীয় শব্দের বেগ তাপমাত্রা হ্রাসের সঙ্গে কমা উচিত, যা পেশকভের পর্যবেক্ষণের ঠিক বিপরীত।

এই অতিতারল্যের সঠিক ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লান্দাউয়ের কাছ থেকে 1941 সালে। তাঁর ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার সহজ পরিবেশন জটিল। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, চরম শূন্য তাপমাত্রা থেকে তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রা যখন বাড়ে, তখন তার মধ্যে তাপীয় শক্তির উদ্ভব হতে থাকে। কিন্তু এটি অবিচ্ছিন্নভাবে নয়, বিচ্ছিন্নভাবে—'কোয়ান্টা' পরিমাণ-মত, যাকে বলা হয় ফোনন বা রোটন। এই কোয়ান্টাগুলি আপাতদৃষ্টিতে গ্যাসের মত ব্যবহার করে। কাজেই তরল হিলিয়ামের প্রবাহ-গতিশক্তি সহজেই তার তাপীয় গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না, যতক্ষণ না প্রবাহ-গতি একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হয়ে কোন কোয়ান্টাম উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। তার আগে পর্যন্ত প্রবাহ-গতিশক্তি তাপীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। তাই প্রবাহে কোন বাধা বা সান্দ্রতা লক্ষ্য করা যায় না। এটিই অতিতারল্যের কারণ। লান্দাউ প্রবর্তিত অতিতারল্যের এই আধুনিক ব্যাখ্যা বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ যদিও সম্পূর্ণ নয়।

বিকাশ চক্রবর্তী*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

ধানগাছের নাইট্রোজেন বন্ধনের সম্ভাবনা

যে কোন গাছের পুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেন একটি প্রধান উপাদান। দানাজাতীয় শস্য, যেমন—ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি-প্রভৃতির চাষের জন্যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে এই উপাদানটি যোগান দেওয়া হয়। শুঁটিজাতীয় শস্য; যেমন—মুগ, কলাই, মটর, মুসুরি প্রভৃতির জন্যে নাইট্রোজেনজাতীয় রাসায়নিক সারের প্রয়োজন নেই, কারণ এরা এক ধরণের ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের অফুরন্ত নাইট্রোজেন ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে। কিছু ব্যাক্‌টিরিয়া আছে, যারা সরাসরি মাটিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বন্ধন করে।

যেদিন থেকে জানা গেছে জৈব পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন বন্ধন—মাটিতে নাইট্রোজেন যোগান দেবার একটা অপরিহার্য পদ্ধতি, সেদিন থেকেই নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় সমস্ত ডালজাতীয় শস্যের জন্যে জীবাণু থেকে তৈরী সার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এ সমস্ত জীবাণু-সার—রাসায়নিক সারের দারুণ অভাবের ফলে যে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার সামান্যই সমাধান করতে পেরেছে। সমস্ত সমস্যার সমাধান তখনই হবে, যখন ধান বা গমগাছও শুঁটিজাতীয় গাছের মত বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন লেবোরেটরীতে চেষ্টা চলছে যাতে জীবাণুর সাহায্য নিয়ে দানাজাতীয় গাছও বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। আর এ যদি সম্ভব হয়, তবে কৃষিক্ষেত্রে যে নতুন বিপ্লবের সৃষ্টি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েক বছরের মধ্যেই যে এটা সম্ভব হবে, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট আশাবাদী। এই প্রবন্ধে এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কাজ কতটা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

নাইট্রোজেন বন্ধন বলতে কি বোঝায়? নাইট্রোজেন বন্ধন (Nitrogen fixation) বলতে বোঝায়—বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাসকে বিজারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করা এবং এই অ্যামোনিয়া দিয়ে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য তৈরী করা। শুঁটিজাতীয় গাছ এই পদ্ধতিতে নিজেদের নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য তৈরী করতে পারে। নাইট্রোজিনেস (Nitrogenase) এনজাইম এই পদ্ধতির জন্যে দায়ী (নাইট্রোজেন বন্ধন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', অগাস্ট 1976 সংখ্যায় লেখকের "নাইট্রোজেন বন্ধন: পশ্চাদপট, পদ্ধতি ও গুরুত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

বিজ্ঞানীদের নতুন প্রচেষ্টা—দানা শস্যজাতীয় গাছ যাতে সরাসরিভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করে, তার জন্যে তিন ধরণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতি (Tissue culture method)

(খ) জিন বদলী পদ্ধতি (Gene transfer method)

(গ) প্রোটোপ্লাষ্ট বিচ্ছিন্নকরণ ও একীভবন পদ্ধতি (Protoplast isolation and fusion method)

(ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতি—এ পর্যন্ত আমরা জানতাম যে, রাইজোবিয়াম (Rhizobium) ব্যাক্টিরিয়া শুঁটিজাতীয় গাছের সঙ্গে মিলিতভাবে গাছের শিকড়ের গুটিতে নাইট্রোজেন বন্ধন করে।

গত বছর অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী চাইল্ড (Child) দেখিয়েছেন, শুঁটিজাতীয় নয় এমন গাছের টিস্যু কালচারে রাইজোবিয়াম ব্যাক্টিরিয়ার সংস্পর্শে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে সক্ষম। গমগাছের টিস্যু কালচারে নাইট্রোজিনেস এনজাইমের সক্রিয়তা দেখা গেছে। এই বছরেই Scowcroft ও Gifson তামাকগাছের টিস্যু কালচারে একই ধরণের সক্রিয়তা লক্ষ্য করেছেন। চাইল্ডের মতে নাইট্রোজিনেস এনজাইম তৈরীর জন্যে দায়ী জিন—'নিফ' (Nif), ব্যাক্টিরিয়ার কোষের মধ্যে থাকে, কিন্তু এই এনজাইমের প্রকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় পদার্থ পোষক (Host) গাছ যোগান দেয়। গবেষণার ফলে আরও জানা গেছে যে, এই দায়ী পদার্থগুলি শুধুমাত্র শুঁটিজাতীয় গাছেই থাকে না, গম বা ধান যে কোন গাছের মধ্যেই আছে। তবে শুঁটিজাতীয় গাছের পদার্থগুলিকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা আছে, গম বা ধানগাছের সেটি নেই। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন গম বা ধানগাছেরও যাতে ক্ষমতা হয় পদার্থগুলিকে কাজে লাগাবার। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে যদিও অনেক গবেষণা ও পরিশ্রম করতে হবে, তবে আশা করা যায়, যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে সফল হতে খুব বেশী দেরী হবে না।

(খ) জিন বদলী পদ্ধতি—নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর কোষে নিফ্ নামে জিন আছে, যা নাইট্রোজিনেস এন্‌জাইম তৈরীর জন্যে দায়ী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে সমস্ত জীবাণুর মধ্যে এই জিন আছে, কেবলমাত্র তারাই নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন গাছের কোষের মধ্যে এই জিন ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। ইতিমধ্যেই নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু Klebsiella pneumonial থেকে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে না এমন ব্যাক্টিরিয়া Escherichia coli-তে 'নিফ্' জিন বদল করে দেখানো হয়েছে Escherichia coli নাইট্রোজেন বন্ধন করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা খুবই আশাবাদী যে, এই জিন গাছের কোষে বদল করবার পর এরা যদি নিজেদেরকে গাছের কোষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে সেই গাছ নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারবে।

(গ) প্রোটোপ্লাষ্ট বিচ্ছিন্নকরণ ও একীভবন—যে কোন গাছকে নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম করে তোলবার জন্যে এটি তৃতীয় প্রচেষ্টা। বিশেষ এনজাইমের সাহায্যে কোষ-প্রাচীর (Cell wall) গলিয়ে নিয়ে প্রোটোপ্লাষ্ট আলাদা করা হয়। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু বা গাছ উভয়ের প্রোটোপ্লাষ্টই এই পদ্ধতিতে আলাদা করা যায়। এখন এই গাছের প্রোটোপ্লাস্ট ও জীবাণুর প্রোটোপ্লাস্ট মিশিয়ে একটা সঙ্কর (Hybrid) প্রোটোপ্লাস্ট তৈরী করা যায়, যার নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষমতা থাকে। এখন যদি এই প্রোটোপ্লাষ্ট থেকে পূর্ণ গাছ তৈরী করা যায় এবং তখনও যদি এই গাছের কোষের 'নিফ্' জিন প্রকাশের ক্ষমতা থাকে, তবে সেই গাছের নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষমতাও যে থাকবে, এটি খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা গাছ ও জীবাণুর প্রোটোপ্লাষ্ট মিশিয়ে সঙ্কর প্রোটোপ্লাষ্ট তৈরী করেছেন এবং তাতে নাইট্রোজিনেস এনজাইমের সক্রিয়তা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এথেকে নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষমতাসমেত পূর্ণ গাছ তৈরী করতে এখনও তাঁরা সফল হন নি। কারণ গাছের কোষে 'নিফ্' জিন ঢোকাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক ভৌত-রাসায়নিক (Physiochemical) বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, যেগুলি আবার গাছের নিজস্ব বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, গাছের বৃদ্ধি অক্ষুন্ন রেখে এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে খুব বেশী সময় লাগবে না।

উপরের প্রচেষ্টাগুলি যদি সফল হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে আমরা ইচ্ছামত যে কোন গাছকে নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম করাতে পারবো। কয়েক বছর আগেও মানুষ ভাবতে পারে নি চাঁদে যাবে, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে। ধানগাছ নাইট্রোজেন বন্ধন করবে—এ ভাবতে এখন একটু অবাক লাগলেও কয়েক বছরের মধ্যে যে এ হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

মণ্টু বসাক*

---

*ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নূতন দিল্লী-110012

মডেল তৈরী

(1)

ভার-উত্তোলক চুম্বক

কোন কাঁচা লোহার গায়ে অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটালে লোহাটি চুম্বকে পরিণত হয়। প্রবাহ বন্ধ করলেই লোহার চুম্বক-ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। এ জাতীয় চুম্বককে বলা হয় তড়িৎ-চুম্বক। তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়িয়ে বা তারের পাকসংখ্যা বাড়িয়ে এই অস্থায়ী তড়িৎ-চুম্বককে ইচ্ছামত শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করা যায়।

বিশেষ আকৃতির শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক তৈরী করে তাকে অনেক ক্ষেত্রে ভার-উত্তোলনের কাজে লাগানো হয়ে থাকে। একটি ছোট ধরণের ভার-উত্তোলক চুম্বক কিভাবে তৈরি করা যেতে পারে—এখানে তা বলা হবে।

এই ব্যবস্থায় চুম্বকটির আকৃতি হবে অনেকটা উপুড় করা গামলার মত (চিত্র)।
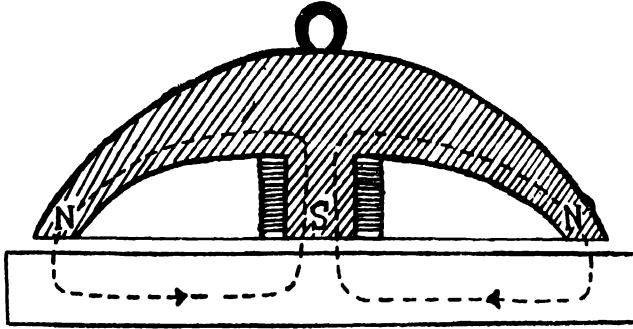
ঐ গামলার ভিতর ঠিক মাঝখানে দণ্ডাকৃতি একটি অংশ থাকে। কাঁচা লোহা ঢালাই করে দণ্ডসমেত পাত্রটি তৈরি করে নিতে হয়। পাত্রটির ব্যাস প্রায় 25 সে. মি, এবং এটি প্রায় 2 সে. মি. পুরু। দণ্ডটির ব্যাস প্রায় 5 সে. মি. এবং এর দৈর্ঘ্য হবে 6 থেকে 8 সে. মি.। 24 বা 26 গেজের তার দিয়ে দণ্ডটিকে প্রায় 500 পাক পেঁচানো হয়। এ অবস্থায় ঐ তারে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটালে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী লোহাটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হবে। এই চুম্বকে দণ্ডটির মুক্ত প্রান্তে S-মেরু ও পাত্রটির বক্র প্রান্ত দুটিতে N-মেরুর সৃষ্টি হবে।

এভাবে তৈরী চুম্বক তার সামনের কোন চুম্বকীয় পদার্থ বা আর্মেচারকে (চিত্রে চুম্বকের নিচের অংশ) ধরে রাখে। চুম্বক ও আর্মেচার পরস্পর দৃঢ়ভাবে

সংবদ্ধ হলে বা চুম্বকীয় শক্তি অন্যভাবে ব্যয়িত না হলে ঐ চুম্বক বেশ বড় আকৃতির ওজনকে ধরে রাখতে পারে, কিন্তু উপরে তুলতে পারে না। গণিতের সাহায্যে তা প্রমাণ করা যায়।

সাধারণতঃ ক্রেনের সাহায্যে মালপত্র স্থানান্তরিত করবার কাজে এ জাতীয় চুম্বক অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে মালপত্র বা ওজন তোলবার দরকার, তার উপর এই চুম্বককে ক্রেন থেকে ঝুলিয়ে সুবিধামত জায়গায় বসানো হয়। এরপর তড়িৎ-প্রবাহ ঘটালে যে শক্তিশালী চুম্বকের সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে ওজনটি আটকে যায় এবং তখন ক্রেনের সাহায্যে তাকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। অন্যান্য কাজেও এজাতীয় চুম্বক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মালপত্র অচুম্বকীয় পদার্থ হলে তার সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় চুম্বকীয় পদার্থ (লোহার প্লেট) লাগিয়ে নেওয়া হয়।

পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শ্রীস্বপনকুমার সিংহরায় ও শ্রীঅভিজিৎ বর্ধন এটি তৈরি করছে।

মহুয়া দে*

*ভি. আই. পি. রোড, গভর্ণমেন্ট হাউসিং এষ্টেট, ব্লক-R, ফ্ল্যাট-6, কলিকাতা-700054.

(2)

গ্যালভানোমিটার

গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে কোন বৈদ্যুতিক বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হচ্ছে কিনা, তা বোঝা যায়। এখানে একটি গ্যালভানোমিটার তৈরী করবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি তৈরী করতে খুবই কম খরচ পড়বে। এর জন্যে নীচের জিনিষগুলির প্রয়োজন :

(i) একটি প্রায় 2 সে.মি. লম্বা চুম্বক-শলাকা ;
(ii) প্রায় 75 গ্রাম অন্তরিত তামার তার (26 SWG) ;
(iii) কিছুটা শক্ত কাগজ ;
(iv) দুটি বন্ধনী স্ক্রু ;
(v) কিছুটা পাকহীন সরু সুতো ;
(vi) হাল্কা এক টুক্রো অ্যালুমিনিয়ামের পাত ;
(vii) 15 সে.মি. × 15 সে.মি.-এর একটি কাঠ (পাতলা)।

প্রথমে শক্ত কাগজ ও আঠা দিয়ে প্রায় 5 সে.মি. ব্যাসের একটি গোলাকৃতি চোঙ তৈরী করা হয়। তারপর অন্তরিত তামার তার চোঙটির উপর জড়িয়ে 250 পাকের একটি কুণ্ডলী তৈরী করে নিতে হবে (চিত্র)। সুতো দিয়ে চোঙটির ঠিক কেন্দ্রে চুম্বক-শলাকাটিকে অনুভূমিক অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অ্যালুমিনিয়ামের পাত থেকে প্রায় 5 সে.মি. লম্বা একটি সূচক (দেখতে তীরচিহ্নের মত) তৈরী করে তার এক দিক চুম্বক-শলাকার কীলকের সোজাসুজি উপরের কাচে অনুভূমিকভাবে আঠা দিয়ে আটকানো হয়। এবার একটি কাচের ফ্রেম তৈরী করে তাতে তার জড়ানো চোঙটি এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে চোঙটিকে উল্লম্ব অক্ষের চারপাশে সহজেই ঘোরানো যায়। কুণ্ডলীর তারের প্রান্ত-দুটিকে ফ্রেমের দুটি বন্ধনী স্ক্রু T_1 ও T_2-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। একটি শক্ত কাগজ থেকে প্রায় 7 সে.মি. ব্যাসের একটি অর্ধবৃত্ত কেটে নিতে হবে। এই অর্ধবৃত্তটিকে সূচকের নীচে অনুভূমিক করে আটকানো হয় (চিত্র)। অর্ধবৃত্তটির কিনারায় এমনভাবে স্কেল এঁকে নিতে হবে যাতে স্কেলের মধ্যবর্তী স্থান শূন্য অবস্থান নির্দেশ করে। সুতোবাঁধা চুম্বক-শলাকাটি সব সময় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে।
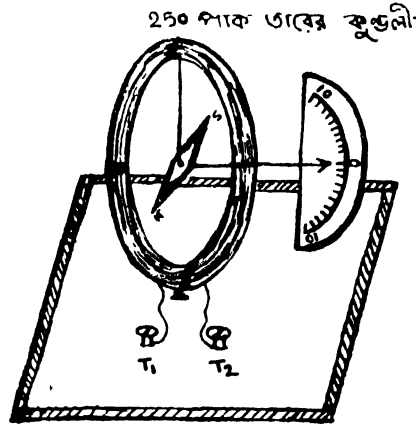
এই যন্ত্রটি ব্যবহারের আগে ঐ চোঙটি ঘুরিয়ে সূচকটিকে স্কেলের শূন্য দাগের সঙ্গে মেলাতে হয়। এখন T_1, T_2 বন্ধনী স্ক্রু দুটি কোন কোষের সঙ্গে যুক্ত করলে চুম্বক-শলাকাটির বিক্ষেপ ঘটবে এবং তার সঙ্গে সূচকটিও বিক্ষিপ্ত হবে। সমগ্র ব্যবস্থাটিকে গ্যালভানোমিটার বলা হয়।

কোন বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটছে কিনা, তা দেখবার জন্যে বর্তনীর দু-প্রান্ত T_1 এবং T_2 স্ক্রু-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তড়িৎ-প্রবাহ ঘটলে সূচকটি বিক্ষিপ্ত হবে; নতুবা তা শূন্য অবস্থান নির্দেশ করবে। কোন কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটালে তার কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্র ও চুম্বক-শলাকার নিজস্ব

চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটে, ফলে শলাকাটি বিক্ষিপ্ত হয়ে সাম্য অবস্থানে গিয়ে স্থির থাকে। প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিক্ষেপের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। তড়িৎ-কোষের মেরু দুটি T_1 ও T_2 বন্ধনীর সঙ্গে উল্টোভাবে লাগালে প্রথমে যে দিকে সূচকটি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার উল্টোদিকে বিক্ষিপ্ত হবে।

তড়িতের পরিমাণ কত, তা $I = 10K \tan\theta$—এই সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা যায়। I, K এবং θ যথাক্রমে প্রবাহমাত্রা, ধ্রুবক ও বিক্ষেপ নির্দেশ করে। K-এর মান অন্যভাবে জেনে নিতে হবে। পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শ্রীটুটুন সোম এটি তৈরী করেছে।

কল্যাণ দাস*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

(3)

রবারের ছিলার সাহায্যে তরল বা কঠিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়

তরল বা কঠিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বের করবার নানা রকম পদ্ধতি পরীক্ষাগারে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে রবারের ছিলা বা দড়ি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তার সাহায্যে সহজে তরলের বা কঠিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বের করা যায়। এখানে তা বর্ণিত হবে।

এই ব্যবস্থায় রবারের ছিলাটির এক প্রান্ত কোন স্থির অবলম্বনের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় (চিত্র)। অন্য প্রান্তে একটি ছোট ভারসমেত হুক A আটকানো থাকে; এর ফলে ছিলাটির দৈর্ঘ্য বাড়ে না অথচ এটি টান হয়ে থাকে। আর একটি অনুভূমিক সরুদণ্ড B-এর সঙ্গে (চিত্র) একটি সূচকের একপ্রান্ত আল্‌গা ভাবে ছোঁয়ানো থাকে। A হুকটি ছিলার নীচের প্রান্তে আটকানো থাকে। সূচকটিকে কাঠের ফ্রেমে এমনভাবে আটকানো হয়, যাতে এটি একটি অর্ধ-বৃত্তাকার অংশাঙ্কন স্কেল বরাবর ওঠা-নামা করতে পারে। যখন উল্লম্ব হুকে কোন ভার চাপানো থাকে না, তখন সূচকটি অনুভূমিক থাকবে এবং শূন্য ডিগ্রী দাগ সূচিত করবে। এখন তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপবার জন্যে একটি প্রায় 200 গ্রাম ওজনের কাচের টুকরা (যেমন পেপার ওয়েট) উল্লম্ব হুক A-এর সঙ্গে ঝোলানো হয়। এতে রবারের ছিলাটি দৈর্ঘ্যে বাড়ে এবং সূচকটি উপরের দিকে উঠে। ধরা যাক, এজন্যে যে কোণ সূচিত হলো, তা θ. এইবার যে তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বের

করতে হবে—কাচের টুকরাটি তার মধ্যে ডোবানো হয়। এতে টুকরাটির ওজনের আপাত হ্রাস হয়। ফলে ছিলাটির আগের তুলনায় বিকৃতি কম হবে এবং সূচকটি অন্য কোণ
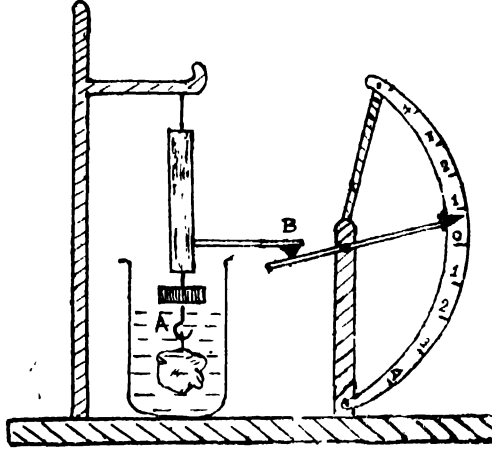
সূচিত করবে (যা আগের চেয়ে কম)। ধরা যাক, এই পাঠ ϕ. যদি তরলের এবং কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব যথাক্রমে ρ এবং ρ' হয় এবং ρ'-এর মান জানা থাকে, তাহলে—

$$\rho=\rho'\frac{\tan\theta-\tan\phi}{\tan\theta}\ldots\ldots(1).$$

যদি ρ'-এর মান জানা না থাকে, তাহলে প্রথমে টুকরাটি জলে ডুবিয়ে নিতে হবে। এতে যদি সূচকের পাঠ Ψ হয়, তবে—

$$\rho'=\frac{\tan\theta}{\tan\theta-\tan\Psi}\ldots\ldots(2)$$

$\rho=1$ ধরা হয়েছে।

অর্থাৎ তরলের ঘনত্ব,

$$\rho=\frac{\tan\theta-\tan\phi}{\tan\theta-\tan\Psi}\ldots\ldots(3)$$

উপরের যে তিনটি সমীকরণ লেখা হল, তা খুব সহজেই পাওয়া যায়।

সমীকরণ (1) অনুযায়ী যদি তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ρ আগে জানা থাকত, তবে ρ' অর্থাৎ বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা সহজ হয়। অবশ্য জল ব্যবহার করে সমীকরণ (2)-এর সাহায্যে ρ' মাপা যেতে পারে, তবে বস্তু জলে দ্রবণীয় হওয়া চলবে না, সেক্ষেত্রে অন্য তরল নিতে হবে।

এইভাবে তরল বা কঠিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব মেপে দেখা যায়, পরীক্ষার ফল

সাধারণতঃ 1·5% থেকে 2%-এর বেশী ত্রুটিযুক্ত হয় না। এভাবে পরীক্ষাটি শেষ করতে সময়ও খুব কম লাগে।

এ পদ্ধতিতে কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে, যা সহজেই বোঝা যায়। যেমন কোন গুঁড়া বা তরলের চেয়ে হাল্‌কা কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব এত সহজে মাপা যায় না। তখন সামান্য পরিবর্তন করে নিতে হয়। তেমনি খুব বেশী ঘনত্বসম্পন্ন তরলের (পারদ) আপেক্ষিক গুরুত্বও এর সাহায্যে মাপা কঠিন হবে। যন্ত্রটিতে রবারের ছিলার বদলে স্প্রিং ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রীসন্দীপকুমার চক্রবর্তী*

*ব্রহ্মানন্দ ভবন, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, 24-পরগণা

ভেবে কর

1. নীচে অঙ্কিত জ্যামিতিক চিত্রটিকে (চিত্র 1) চারটি একই আকৃতির এবং
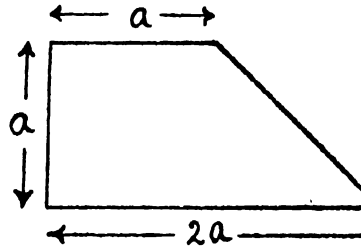
চিত্র-1

সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট অংশে বিভক্ত কর।

2. চিত্র 2-এর মত এক টুক্‌রো কাগজ দেওয়া হয়েছে। এটিকে কেটে তিনটি
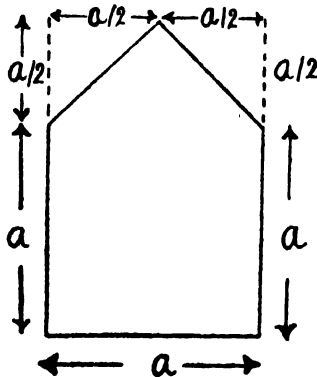
চিত্র-2

এমন টুকরো তৈরী কর, যেগুলিকে জোড়া লাগালে একটি বর্গক্ষেত্র পাওয়া যাবে।

3. এক ভদ্রলোকের একটি 9′×16′ মাপের একটি কার্পেট ছিল। কার্পেটটিকে একটি 12′×12′ ঘরে পাতবার দরকার হলো। এটিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বর্গাকার করে কেটে নিয়ে 12′×12′ ঘরে পাতবার জন্যে অনেকে বুদ্ধি দিল। কিন্তু সাধের কার্পেটটিকে ভদ্রলোক ছুটির বেশী টুক্‌রো করতে রাজী নন। এখন বল—কিভাবে মাত্র ছুটি টুক্‌রো করে জোড়া লাগিয়ে ঐ ঘরে কার্পেটটি পাতা যাবে।

(সমাধান 45 পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)

দেবব্রত সরকার*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

4. প্রত্যেকটির বেলায় শূন্য স্থানে সঠিক উত্তরটি বসাও :

(a) কোন বস্তুকে 980 সে. মি. / সে. বেগে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে তা মাটিতে ফিরে আসবে———— পরে।

(i) 1 সে., (ii) 2 সে., (iii) 4 সে.

(b) কোন্ তরলের সর্বোচ্চ বাষ্প-চাপ———— বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হয়।

(i) 100°C তাপমাত্রায়, (ii) স্ফুটনাংকে, (iii) স্বাভাবিক তাপমাত্রায়

(c) কোন্ দ্রবণের স্ফুটনাংক দ্রাবকের স্ফুটনাংক অপেক্ষা————।

(i) বেশী, (ii) কম (iii) সমান

(d) কিটোন বিজারণে পাওযা যায়————————।

(i) প্রাইমারী অ্যালকোহল, (ii) সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল, (iii) টারশিয়ারী অ্যালকোহল

(e) মিথাইল অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল, প্রোপাইল অ্যালকোহল ইত্যাদি————————।

(i) আইসোমার (ii) হোমোলগাস (iii) ইটোমেরাস

(f) $KMnO_4 + HCl \rightarrow KCl + MnCl_2 + \ldots\ldots + H_2O$

(i) Cl_2 (ii) MnO_2 (iii) KH

(সমাধান পরের সংখ্যায় দেওয়া হবে)

দুলালকুমার সাহা*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

তার নেই তবু জ্বলছে

এই তো কিছুদিন আগে নিবেদিতা জন্মজয়ন্তী কমিটির সহযোগিতায় পরিষদের সত্যেন্দ্র ভবনে তিন তিনটি তলা জুড়ে হয়ে গেল বিরাট বিজ্ঞান প্রদর্শনী। বহু গুণীজন, বিজ্ঞানে উৎসাহী এবং সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিককে। প্রায় শতাধিক মডেলের মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে একটির কথা অনেককে বলতে শুনেছি—"এটা নিশ্চয়ই ম্যাজিক"—না হলে তার নেই, অথচ টিউব লাইট হাতে রেখেই জ্বলছে কি ভাবে? বিজ্ঞানের আসরে যে কোন কিছুই ম্যাজিক নয়, তা বার বার তুলে ধরছিল হাজার লোকের মাঝখানে কল্যাণ দাস, পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে তারই হাতে তৈরী মডেলটি দিয়ে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক—বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কোন স্কুলের বিজ্ঞানের মাষ্টার মশায় হবেন। সঙ্গে তাঁর মেয়ে—দশম শ্রেণীর ছাত্রী। কল্যাণের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা টিউব লাইট কেন এভাবে জ্বলছে—একটু বুঝিয়ে দেবেন।" কল্যাণ একটু হেসে বললো—"নিশ্চয়ই"।

আগে তাহলে আলোচনা করি টিউব লাইট কি করে জ্বলে। টিউব লাইট যা আমরা সাধারণত ব্যবহার করি তার মধ্যে আছে নিম্নচাপে পারদের বাষ্প ও কিছু আর্গন গ্যাস। কাচের টিউবের ভিতরের দিকের দেয়ালে ফ্লুরেসেন্ট রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। টিউবের দু-দিকেই তড়িদ্দ্বার থাকে—যা উত্তপ্ত হলে তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। টিউবের দু-দিক বন্ধ থাকে এবং ঐ বন্ধ স্থানের বাইরের দিকে দুটি করে পিন থাকে। এদের মাধ্যমে বর্তনীর সঙ্গে তড়িদ্দ্বার যুক্ত করা হয়। বর্তনীতে প্রবাহ পাঠালে প্রথমে টিউব লাইট ফিলামেন্ট ষ্টার্টার S-এর (চিত্র-1) মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণের
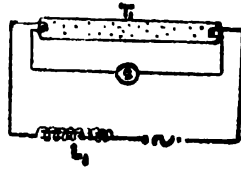
চিত্র-1

জন্যে উত্তপ্ত হয়, ফলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রন। আর ইতিমধ্যে স্টার্টারের মধ্যে যে বাই-মেটাল আছে, সেটা উত্তপ্ত হয়ে বেঁকে গিয়ে তার মধ্য দিয়ে প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যে ইলেকট্রন বেরিয়ে এসেছিল, তারা টিউবের দু-মাথায় দুটি ইলেকট্রোডের তড়িৎ-ক্ষেত্রের মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। চলার পথে এরা টিউবের ভিতরের গ্যাসকে ধাক্কা দেয়; ফলে তড়িৎ-ক্ষেত্রের মধ্যে এই গ্যাসে তড়িৎ-

মোক্ষণ সুরু হয়। অবশ্য প্রথমে আর্গন মোক্ষিত হয়ে, পরে পারদ-বাষ্পকে মোক্ষণ করে। এর জন্যেই আলোর উৎপত্তি হয়। অবশ্য যে আলো টিউব লাইটে পাই, পারদ-বাষ্প সে আলো দেয় না। পারদ-বাষ্প মোক্ষিত হয়ে যে আলো দেয়, তা ফ্লুরোসেণ্ট প্রলেপ শোষণ করে অন্য আলো ছাড়ে, যা আমরা দেখি। ইলেকট্রনের মোক্ষণ তড়িৎ-বিভব প্রয়োজনমত রাখবার জন্যে চোক L_1 ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আমাদের এখানে যেটা আলোচনা করা হচ্ছে, সেখানেও গ্যাসের অণুগুলি বাইরে থেকে শক্তি নেয়, তবে সে শক্তির যোগানটা একটু অন্য পদ্ধতিতে। এখানে শক্তি জোগায় একটি 9 ভোল্টের তড়িৎ-কোষ E_1 (চিত্র-2)। এই কোষটি একটি
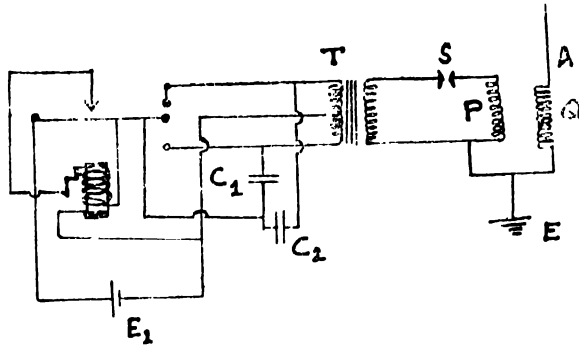
চিত্র-2

বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বর্তনীর সঙ্গে যুক্ত। এই বর্তনীর কুণ্ডলীর উপর আরো একটি কুণ্ডলী তৈরি করা হয়। এর মোট পাকসংখ্যা প্রথমটির তুলনায় বেশী। আসলে এটি একটি 'ষ্টেপ আপ' ট্রান্সফরমার। দ্বিতীয় কুণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি অল্প কয়েক পাকের কুণ্ডলী P. এই বর্তনীতে আরো থাকে একটি স্পার্ক গ্যাপ S. তড়িৎপ্রবাহ যখনই ঘটানো হয়, বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বর্তনী সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে—একবার বর্তনীকে বন্ধ করে, আবার পরক্ষণেই তাকে খুলে দেয়। এভাবে যখন দ্রুতগতিতে বর্তনীটি বন্ধ আর খোলা হতে থাকে, তখন কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবাহ দ্রুতগতিতে বাড়তে এবং কমতে থাকে। এ অবস্থায় কুণ্ডলীর মধ্যে চুম্বকীয় বলরেখা সংখ্যারে বাড়ে ও কমে। এই বাড়া-কমার মধ্যে পড়ে বহু পাকবিশিষ্ট দ্বিতীয় কুণ্ডলাটির হয় নতুন অবস্থা। তার মধ্যে তৈরি হয় উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন আবিষ্ট তড়িৎ-চালক বল। এরও বৈশিষ্ট্য হল কমা ও বাড়া—যা নির্ভর করে প্রথম কুণ্ডলীটির উপর। এই তড়িৎ-চালক বলের উপস্থিতি S অংশে উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ-মোক্ষণ সৃষ্টি করে। P কুণ্ডলীর উপর আর একটি বহু পাকের কুণ্ডলী তৈরি করা হয়—যার এক প্রান্ত 'আর্থ' করে নেওয়া হয় এবং অন্য প্রান্তটি একটি ধাতুর চাকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই চাকৃতিকে অ্যান্টেনা A বলা হয়। P কুণ্ডলীতে উচ্চ কম্পাঙ্কের প্রবাহ Q কুণ্ডলীর

প্রান্তে উচ্চ তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় অ্যান্টেনা থেকে পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এবার যখন তারহীন টিউব লাইটকে এই অ্যানটেনার কাছাকাছি আনা হয়, তখন টিউব লাইটের ভিতরের গ্যাস-অণুগুলি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং নিজেরা উত্তেজিত হয়ে আলো বিকিরণ করে। এভাবেই তার ছাড়াই টিউবলাইট জ্বলে।

বিজয় বল *

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান
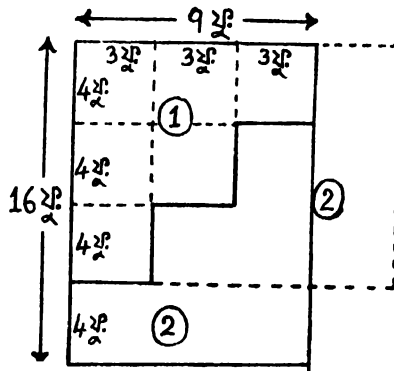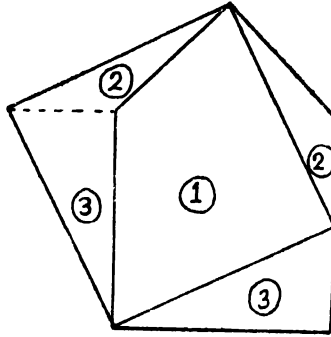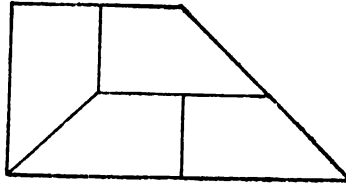
(একটু ভাবলে সবগুলি কিভাবে করা হয়েছে, তা সহজে বোঝা যায়)

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : ভিটামিন-সি কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে পাওয়া যায়? এর প্রয়োজনীয়তা কি? এর অভাবের জন্যে কি হয়? রোজ কতটা ভিটামিন-সি মানুষের প্রয়োজন হয়?

শ্যামলকুমার দত্ত, কলিকাতা-700 006

উত্তর : মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে রয়েছে আমিষ, শ্বেতসার, চর্বি, লবণ, জল ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে অপর একটি বিশেষ উপাদান—যাকে বলা হয় ভিটামিন। এটি খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের কাজে সহায়তা করে এবং এর অভাবে নানারকম রোগ দেখা দেয়। বর্তমানে নানাপ্রকার ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে—যাদের এক একটির অভাবে শরীর বিশেষ বিশেষ রোগের দ্বারা আ ক্রান্ত হয়। সাধারণভাবে বিভিন্ন শাকসব্জী, ফলমূল, প্রাণীদেহের তন্তু ও বিভিন্ন অংশে ভিটামিনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ফলে শাকসব্জী, মাছ, মাংস ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভিটামিনও আমরা গ্রহণ করে থাকি। প্রশ্নানুসারে এখানে কেবলমাত্র ভিটামিন 'সি' সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভিটামিন-সি আপেল, আনারস, টম্যাটো, লেবু, পেঁপে, সজনে ডাঁটা, কপি, কাঁচা লঙ্কা বিভিন্ন শাকসব্জী ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতিতেও ভিটামিন 'সি' কিছু পরিমাণে আছে।

দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় এবং রাসায়নিক কাজে, যেমন—কার্বোহাইড্রেট বিপাকের কাজে, অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিনের উৎপাদন হ্রাস করার কাজে, কলাকোষে জারণ-বিজারণ নিয়ন্ত্রণে, লোহিত কণিকার উৎপাদনে, কোমলাস্থি, অস্থি, দাঁত, ত্বক প্রভৃতির স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে ভিটামিন 'সি' সাহায্য করে। অস্থির মধ্যস্থ প্রোটিনের গঠনে এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের উপস্থাপনে ভিটামিন 'সি'-এর ভূমিকা যথেষ্ট।

ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না, ফলে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। এই ভিটামিনের অভাবে শরীর প্রধানত স্কার্ভি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগে অস্থিকোষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, অন্ত্র বৃক্ক ও ত্বকের নিচে রক্তপাত ঘটে; মাড়ি দিয়েও রক্তক্ষরণ হয়, শরীরে লোহিত ও শ্বেত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং রক্তাল্পতা দেখা দেয়, কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়া যথাযথভাবে সংঘটিত হয় না। এই রোগে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়, গা বমি বমি করে। ভিটামিন সি-এর অভাবে রক্তের কোলেস্টেরল এবং লিপিডের আধিক্য দেখা দেয় এবং এর জন্যে অনেক ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড ইস্কিমিয়া রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে এই ভিটামিন গ্রহণ করলে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ, থ্রম্বোসিস ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে

হ্রাস পায়। শরীরে এই ভিটামিনের উপস্থিতি সর্দিকাশি প্রতিরোধ করতে পারে। ধূমপানকারীদের উপরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, যাঁরা ধূমপান করেন না, তাঁদের তুলনায় ধূমপানকারীদের শরীরে ভিটামিন 'সি'-র পরিমাণ কম হয়ে থাকে।

ভিটামিন 'সি'-এর উপরিউক্ত বহুমুখী কার্যকারিতার জন্যে শিশুকাল থেকে ভিটামিন 'সি' খাওয়া একান্তই আবশ্যক। দেখা গেছে, শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্যে রোজ প্রায় 5 থেকে 7·5 মি. গ্রাম এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে রোজ প্রায় 1 থেকে 2 গ্রাম পরিমাণ ভিটামিন-'সি' দরকার হয়।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স, অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

পরিষদের খবর

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মেলায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের ময়দানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মেলায় 8ই জানুয়ারী থেকে একটি বিরাট বিজ্ঞান প্রদর্শনী সুরু হচ্ছে। পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থাও এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রদর্শনীটি আগামী 4ঠা ফেব্রুয়ারী, 1977, পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল 4টা থেকে রাত 7টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্যে খোলা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

উত্তর কলকাতার আজাদ হিন্দ বাগে অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র-এর পক্ষ থেকে একটি ছোট বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন মডেলের কয়েকটি এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনীটি আগামী 7ই জানুয়ারী, 1977 সাল পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল 4টে থেকে রাত 8·30 মি. পর্যন্ত জনসাধারণের জন্যে খোলা রাখা হচ্ছে। এটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

হাওড়ার জোড়াহাটে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

হাওড়ার আন্দুলের কাছে জোড়হাট-এ 'সায়েন্টিফিক্ সোসাইটি অব্ স্টুডেন্টস্' সংস্থার উদ্যোগে গত 22শে ডিসেম্বর থেকে 26শে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর মোট প্রায় চল্লিশটি মডেল প্রদর্শিত হয়েছিল। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "হাতে কলমে কেন্দ্র"-এর পক্ষ থেকে এই প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীসুব্রত ঘোষ প্রদর্শনীটি পরিচালনা করেছেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এই প্রদর্শনীটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মজয়ন্তী

1লা জানুয়ারী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য বসুর জন্মদিন। এই উপলক্ষে 1লা জানুয়ারী, 1977, পরিষদ ভবনে এক মনোরম পরিবেশে আচার্যের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জ্ঞানী-গুণী এবং বহু বিজ্ঞান অনুরাগীর সমাবেশ হয়। বুলগেরিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ক্রিষ্টভ এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন এবং আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিষদ-সভাপতি অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য বসুর বিশিষ্ট ছাত্র অধ্যাপক নন্দদুলাল সেনগুপ্ত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে আচার্য বসুর জীবনী সম্বন্ধীয় সরকারী চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

অন্যান্য বিজ্ঞান সংস্থার খবর

আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনষ্টিটিউট অব্ ফিজিক্যাল সায়েন্সেস্" এবং ফলিত গণিত বিভাগের 'সেণ্টার অব অ্যাডভান্স্ড্ স্টাডি'-র যৌথ উদ্যোগে গত 27শে ডিসেম্বর 1976 থেকে 1লা জানুয়ারী 1977 পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এর বিষয়বস্তু ছিল—"অ্যাডভানস্ড্ ম্যাথামেটিকেল্ টেকনিক্স্ ইন্ ফিজিক্যাল্ সায়েন্সেস্"। এই আলোচনাচক্রে দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিশেষ বক্তৃতা প্রদান, গবেষণাপত্র পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বহু শিক্ষক ও গবেষক এখানে যোগ দেন। অধুনা এজাতীয় আলোচনাচক্র প্রায় হয় না বলা চলে। খুবই সাফল্যের সঙ্গে এই আলোচনাচক্রটি অতিবাহিত হয়।

বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে "ইলেক্ট্রনিক্স্ ইন্ স্পেস্"—নামক একটি আলোচনাচক্র হয়ে গেল। এই আলোচনাচক্রে বহু শিক্ষক, গবেষক ও বিজ্ঞানী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এটি সুরু হয় 26শে ডিসেম্বর, (1976) এবং শেষ হয়েছিল 27শে ডিসেম্বর (1976)। মহাকাশ গবেষণায় ইলেক্ট্রনিক্সের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা এখানে খুবই প্রাধান্যলাভ করেছিল।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1976-'77 সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী :—

গত 25শে নভেম্বর 1976 বৃহস্পতিবার বিকাল তিন ঘটিকায় পরিষদের সত্যেন্দ্র ভবনে (পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—700006) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1676-'77 সালের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক অধিবেশনটি আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনটি ঐ দিন বিকাল তিন ঘটিকা থেকে সাত ঘটিকা পর্যন্ত চলে। অধিবেশনে উপস্থিত 209 জন সভ্যবৃন্দের নামের তালিকা ও তাঁদের স্বাক্ষর যথাযথ সংরক্ষিত করা হয়।

অধিবেশনের প্রারম্ভে সভাপতি সকল সদস্যের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও সহযোগিতা কামনা করেন।

কর্মসচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রচারিত 14.9.1976 তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্বহযোগ্য কাজের তালিকা অনুযায়ী অধিবেশন আলোচ্য বিষয়সূচী সভাপতির নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 4নং বিষয়সূচীর (বিধি-নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাবের) উপযুক্ত গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং এ বিষয়ে উপস্থিত সভ্যগণের অভিমত নির্ণয় করে, সভাপতি নির্দেশ দেন যে উক্ত বিষয়সূচীটি অন্যান্য আলোচ্য বিষয়সূচীর পর যথাযথ উপস্থাপিত ও আলোচিত হবে। সভাপতির এই নির্দেশ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে সমর্থিত হয়।

বিষয়সূচী :

1. 1975-76 সালের পরিষদের কার্যবিবরণী পাঠ :—

সভাপতির নির্দেশে পরিষদের কার্যকরী সমিতির পক্ষে কর্মসচিব মৃণালকুমার দাশগুপ্ত পরিষদের বিগত বৎসরের কাজকর্ম সম্পর্কে 1975-76 সালের পরিষদের কার্যবিবরণী অধিবেশনে পেশ করেন, তা যথোপযুক্ত ভাবে পঠিত ও আলোচিত হয়, এবং সর্বসম্মতভাবে উল্লিখিত কার্যবিবরণী অধিবেশনে গৃহীত হয়

2. পরিষদের 1975-'76 সালের নিরীক্ষিত হিসাব-নিকাশ, বিবরণী ও হিসাব-পরীক্ষকের মন্তব্য অনুমোদন :—

সভাপতির আহ্বানে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুনীলকুমার সিংহ পরিষদের হিসাব পরীক্ষক : মুখার্জী গুহঠাকুরতা এণ্ড কোং (চাটার্ড অ্যাকাউট্যান্ট) কর্তৃক নিরীক্ষিত পরিষদের বিগত 1975-76 সালের হিসাব-নিকাশ, উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালান্স সীট) বিবরণী ও হিসাব-পরীক্ষকের মন্তব্য অধিবেশনে পেশ করেন, যা পূর্বে নিয়মমাফিক প্রচারিত হয়েছিল। বিভিন্ন সভ্যগণ কর্তৃক তা যথোচিত আলোচিত হয় এবং সভ্যগণ তাঁদের বিবিধ বক্তব্য রাখেন। ঐ হিসাবনিকাশের বঙ্গানুবাদে সামান্য ছাপার ভুল পরিলক্ষিত হওয়ায় তা যথাযথ সংশোধনান্তে, উক্ত নিরীক্ষিত হিসাব-নিকাশ, বিবরণী ও তৎসংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্যাদি অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং নথীভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

3. 1976-'77 সালের হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ :—

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত প্রস্তাব করেন যে, পরিষদের 1976-'77 সালের হিসাব-পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মুখার্জী গুহঠাকুরতা এণ্ড কোং, চাটার্ড অ্যাকাউট্যান্টকে নিয়োগ করা হোক। প্রস্তাবটি শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু কর্তৃক সমর্থিত হয়। সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবটি অধিবেশনে গৃহীত

হয়, অধিবেশনে এও সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিষদের কর্মসচিব কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে উক্ত কাজের জন্য উল্লিখিত হিসাব-পরীক্ষককে দেয় পারিশ্রমিক সভাপতির অনুমোদনসাপেক্ষ স্থির করবেন।

4. 1976-77 সালের ব্যয়বরাদ্দ (বাজেট) আলোচনা ও গ্রহণ—

সভাপতির আহ্বানে কার্যকরী সমিতির পক্ষে কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুনীলকুমার সিংহ পরিষদের 1976-77 সালের সম্ভাব্য ব্যয়বরাদ্দ (বাজেট) অধিবেশনে পেশ করেন, যা পূর্বে সদস্যগণের নিকট যথাযথ ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বিশদ আলোচনান্তে সামান্য সংশোধনসহ উক্ত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অধিবেশনে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

5. সভাপতির অভিভাষণ :—

সভাপতি শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় তাঁর মনোজ্ঞ অভিভাষণে পরিষদের বৃহত্তর স্বার্থে সকল সভ্যগণের আন্তরিক প্রীতি ও সক্রিয় সহযোগিতা আহ্বান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানাচার্য পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আদর্শ, সাধনা ও অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করেন। পরিষদের পক্ষে তিনি বিজ্ঞানাচার্যের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে যথোচিত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে, আচার্য পরিকল্পিত পরিষদের আরব্ধ কাজকর্ম, পরিকল্পনা সমবেত প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে অবিলম্বেই সম্পাদিত হবে এবং পরিষদ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে ও বৃহত্তর পরিকল্পনায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করবার জন্য সচেষ্ট হবে। তিনি আশা রাখেন পরিষদের সভ্যবৃন্দ পরিষদের স্বার্থে ও মঙ্গলে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করবেন। উপস্থিত সকল সভ্যদের তিনি তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের তাঁদের প্রদত্ত আন্তরিক সহযোগিতার জন্যও তিনি ধন্যবাদ দেন। পরিষদের কার্যালয়ের কর্মচারীদের প্রতি তিনি কর্মদক্ষতার আহ্বান জানান ও তাঁদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্বার্থে ও মঙ্গলে সভাপতি শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিয়োগ এবং অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর অনবদ্য অভিভাষণের জন্য উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সভাপতিকে তাঁদের সর্বসম্মত কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান ও অধিবেশনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদন দেন।

6. 1976-77 সালের কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সাধারণ সদস্য নির্বাচন :—

কর্মসচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত 1976-77 সালের জন্য পরিষদের কার্যকরীসমিতির কর্মাধক্ষ্য-মণ্ডলী ও সাধারণ সদস্য নির্বাচনের জন্য নামের তালিকাটি পেশ করেন। উক্ত তালিকানুযায়ী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সাধারণ সভ্যবৃন্দ 1976-'77 সালের জন্য সর্বসম্মতভাবে অধিবেশনে নির্বাচিত হন এবং এই তালিকাটি সভাপতি ও কর্মসচিব কর্তৃক সমর্থিত ও স্বাক্ষরিত হয়।

7. পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাব গ্রহণ :—

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজন সংক্রান্ত যথোচিতভাবে পূর্বপ্রচারিত পরিষদের কার্যকরী সমিতির খসড়া প্রস্তাবটি অধিবেশনে পেশ করার জন্য সভাপতি কর্মসচিবকে নির্দেশ দেন। উক্ত খসড়া প্রস্তাব ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন সভ্যগণ কর্তৃক প্রেরিত মন্তব্য অভিমতাদি অধিবেশনে উপযুক্তরূপে বিশদভাবে আলোচিত হয়। বিভিন্ন সভ্যগণ তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। উক্ত খসড়া সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাবগুলির সঠিক ব্যাখ্যা ও

উপযোগিতা আলোচিত হয়। বিভিন্ন সভ্যগণের কয়েকটি সুচিন্তিত ও বাস্তবমুখী বক্তব্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির পক্ষে কর্মসচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত গ্রহণ করে নিয়ে উক্ত খসড়া সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাব যথোচিত পুনঃসংশোধন-পূর্বক অধিবেশনে পেশ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার পর পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজনের পুনঃসংশোধিত প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারাগুলির সর্বসম্মতভাবে অধিবেশনে যথাযথ অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

৪. বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য-বিবরণীর অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন :—

উক্ত বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীর লিপি-করণাদি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত অনুমোদকমণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

স্বাঃ 1. শ্রীসুনীলকুমার দে
" 2. শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য
" 3. শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
" 4. শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
" 5. শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

বিবিধ :—

বিবিধ কয়েকটি বিষয় আলোচনান্তে অধি-বেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

স্বাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
25/11/96

স্বাঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
কর্মসচিব
25/11/76

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন—

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা এবং প্রকাশন উপসমিতির সভ্যবৃন্দ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন : 55-0660

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
"সত্যেন্দ্র ভবন"
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন: 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্য পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সহিত উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করিতে পারিবেন। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাইবে; তাঁহার সহিত পূর্বে যোগাযোগ করিয়া পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করিতে পারিবেন। পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই বিষয়ে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে। ইতি

তাং 27.11.76
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন : 55-0660

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্ত বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্তে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করবার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। একারণে দেশের বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ, বিশেষতঃ লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁরা যেন তাঁদের রচিত কিংবা প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন পুস্তকাদি এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে দান করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন।

বর্তমান বছর থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করা হয়েছে। এই বিভাগে নবম শ্রেণী থেকে সুরু করে বি. এস. সি. (পাশ ও অনার্স কোর্স) এম. এস. সি., কারিগরী, মেডিকেল প্রভৃতি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা আছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে নতুন, এমনকি বাড়ীতে অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকাদি দান করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুস্তকাদি প্রেরণ করবার ঠিকানা :
"সত্যেন্দ্র ভবন"
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ   ফেব্রুয়ারী, 1977   দ্বিতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞানীর নৈতিকতা

নীতিশাস্ত্রে মানুষকে নীতিপরায়ণ প্রাণী হিসাবে গণ্য করা হয়। ন্যায়-অন্যায় বিচার, সুনীতি-দুর্নীতির ধারণায় মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে বিশিষ্ট করেছে।

এই নৈতিকতার উৎস কি? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় মানুষ জীবন-যুদ্ধের তাগিদে ধীরে ধীরে যখন সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছিল, তখনই পরস্পরের মধ্যে সমঝতা দরকার ছিল। মনে হয় এটাই নৈতিকতার উৎস।

তবে প্রাচীন নানা গ্রন্থে দেখা যায়, এই নীতিশাস্ত্রকে অপৌরষেয় অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা প্রবর্তিত বিধিনিষেধ হিসাবে চালু করবার চেষ্টা করা হয়। যেখানে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সরাসরি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব, সেখানে এটি ঈশ্বরপুত্র মুসা বা ঈশা বা অপর কোন প্রেরিত দূতদ্বারা প্রবর্তিত বলে গণ্য করা হয়।

মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সময় এল, যখন সমাজ ব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধকে অলৌকিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না করে মানবতাবোধ, স্বজন ও প্রতিবেশীর উপর সহানুভূতি ও সহৃদয়তাকে মানুষের নৈতিকতার উৎস হিসাবে দেখা হল।

তারপর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রকট হল। মানুষের জীবনধারণের প্রতিদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ চলল। সভ্যতার উন্নয়নের জন্যে মানুষ বিজ্ঞানের উপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল হল। এ সময়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে মানুষের নৈতিকতা বা নীতিপরায়ণতা উন্মেষে বিজ্ঞানের অবদান কি? উপরেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সমাজবদ্ধতায় নৈতিকতাই মূল ভিত্তি। বিজ্ঞানীও যখন সামাজিক জীব, তখন স্বভাবতই কোন বিজ্ঞানী নৈতিকতার উর্ধ্বে নয়। এখন দেখা যাক, বিজ্ঞানীকে

নীতিপরায়ণ করতে বিজ্ঞান কিভাবে কতটা সাহায্য করে।

1950-51 সালে ষ্ট্যাটিস্টিক্সের আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে অধ্যাপক হলডেন ভারতে আসেন ও ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে বক্তৃতামালা প্রদান করেন, তার প্রথম বক্তৃতায় নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান চর্চা থেকে কিভাবে নীতিজ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তা তিনি আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে কোন কোন হিংস্র প্রাণী ক্ষুধার্ত না হলে প্রাণীবধ করে না। শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেও প্রাণ নাশ করে না। এই শিক্ষা ঐ সকল প্রাণীর থেকে মানুষ গ্রহণ করতে পারে। দলবদ্ধ কোন কোন জীবের মধ্যে দেখা যায়—কোন অধিনায়ককে পরাজিত করলে বিজেতা সেই দলের অধিনায়ক হয় ও বিজিত অধিনায়ক নতুন নায়কের বশ্যতা স্বীকার করে ঐ দলেই থেকে যায় বা দল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনধারণ করে। এই শিক্ষা নীতিজ্ঞান হিসাবে যদি মানুষ গ্রহণ করত তবে সমাজের অনেক জটিলতা দূর হত। বিজ্ঞানীরা একে বিজ্ঞানের নীতিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করলে নিজেদের ও অপরাপর বিজ্ঞানীর সময় ও শক্তির অপব্যবহার না করে নিজেকে বিজ্ঞানের সেবক হয়ে ব্রতী করতে পারত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিজ্ঞানীরা এসব জেনেও কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন না। উপরে জীব-বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের নীতিজ্ঞান শিক্ষায় কিরূপ সহায়ক হয়, অধ্যাপক হলডেনের পদাঙ্কসরণ করে তা আলোচনা করা গেল। এছাড়াও বিজ্ঞানের কতকগুলি বিশেষ দিক আছে। সেগুলি সম্বন্ধে যদি বিজ্ঞানীরা সচেতন থাকেন এবং সেইভাবে চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে তা প্রকৃতিগত করে নেন, তবে বিজ্ঞানীদের নৈতিকতা উচ্চাসের হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক—এর সঙ্গতি (consistency)। সমস্ত গাণিতিক বিজ্ঞানী বর্তমানে সত্য অসত্য বিশ্লেষণ করেন না, আলোচনা করেন না, কোন তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সঙ্গতির উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেন। কোন বিজ্ঞানী যদি সঙ্গতি বজায় রেখে চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেন, তবে তাঁর চরিত্রে চারিত্রিক সঙ্গতি প্রকট হয়ে উঠবে। কিন্তু যখন দেখা যায়, কোন বিজ্ঞানী জীবনে কখন কারো সদুপোদেশ পালন করেন নি কিন্তু হঠাৎ কারোর শেষ ইচ্ছা পালনে (ঐ বিজ্ঞানীর মতে) সম্যক সচেষ্ট হয়ে উঠেন কিম্বা যখন কোন বিজ্ঞানী শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্তব্য পালন না করে—পরীক্ষক হিসাবে তাঁর কর্তব্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমালোচনায় হঠাৎ উদ্যোক্তা হয়ে উঠেন বা যখন কোন বিজ্ঞানী কোন বিষয়ে (ধরা যাক পাঠ্যসূচী প্রণয়নে) ভার পেয়ে পরম উৎসাহে সেটি পালন করে পরে নিজেই তার সমালোচনায় পঞ্চমুখ হন, তখন তাঁদের কার্যকলাপে যে অসঙ্গতি প্রকট হয়ে উঠে—তা দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—এঁরা প্রকৃতই বিজ্ঞানী কি? বর্তমান বিজ্ঞানে আর একটি বড় দিক নির্ভুলতা ও সঠিক সংক্ষিপ্তাকারে মূল তথ্য প্রকাশ। কোন কথাকে নানাভাবে প্রকাশ করে তাকে বিপরীত অর্থে ব্যবহার করবার চেষ্টা বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপন্থী। কোন নীতিপরায়ণ বিজ্ঞানীর এরূপ করা উচিত নয়।

বিজ্ঞান ও নৈতিকতাসম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞানীও সামাজিক জীব। সুতরাং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মত বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সামাজিক নীতি ও দায়িত্ব মেনে চলা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক বিজ্ঞানী সমাজের নিকট প্রাপ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর সমাজকে যা দেবার সে বিষয়েও সজাগ থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ

এবিষয়ে অনেক বিজ্ঞানীর-ই সজাগতা নেই। চরম পরিতাপের বিষয়, আজ কোন কোন তথাকথিত বিজ্ঞানী নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করেন, যে কারণে তাঁরা বেতন পান সেইটুকু কোনরূপে পালন করাই তাঁদের কর্তব্য, কিন্তু সমাজের অপরাপর কর্তব্যের দায়িত্ব (স্বেচ্ছায় বা অন্ত কারণে) তাঁদের উপর এসে পড়লে তা পালন করবার কোন প্রয়োজন থাকে না। যে বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে গিয়ে সমাজ থেকে গবেষণার জন্তে অর্থ পান কিনা হিসাব করেন, তাঁর পক্ষে কি বিজ্ঞানের কোন মৌলিক অবদান রাখা সম্ভব? যে বিজ্ঞানী শিক্ষকতা করতে গিয়ে নিজের মনকে ঐ শিক্ষকতার জন্তে কি প্রাপ্য—এই চিন্তায় মগ্ন রাখেন, তাঁর দ্বারা শিক্ষকতা কিরূপে সম্ভব? সর্বশেষে এটি মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানীরা আজ শুধুমাত্র সমাজের অংশ নয়, সমাজের সর্বাপেক্ষা মননশীল অংশ। তাঁদের উপর সমাজ উন্নয়নের দায়িত্ব সমধিক। এ কারণে বিজ্ঞানীর নৈতিকতার মান সমাজের অপর সকলের অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়া উচিত।

আচার্য বসু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বিজ্ঞানীদের জন্তে যে সমস্ত বাণী ও আবেদন রেখে গেছেন—সেগুলিতে তিনি এবিষয়েই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

"এটাই যথেষ্ট নয় যে, কেউ শুধুমাত্র প্রশংসা পাবার জন্তেই ফলিত বিজ্ঞানে জ্ঞান আহরণ করবে। সমাজের মানুষের জন্তে বিজ্ঞানীর চিন্তা করা উচিত। বিজ্ঞানের সমস্ত উন্নতিই মানুষের ভবিষ্যতের উপর চিন্তা করে হওয়া উচিত। সমাজের বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্তা সামাজিক অধিকারের উপযুক্ত বন্টন......ইত্যাদিও হবে বিজ্ঞানীদের চিন্তা। বিজ্ঞানীর চিন্তাধারা যেন অভিশাপ না হয়ে মানব সভ্যতার আশীর্বাদস্বরূপ হয়। এ সত্যকে বিজ্ঞানী তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে ভুলে গেলে চলবে না।"

"দিনে আমি শতবার মনে করি—আমার জীবনের প্রবাহ স্বতঃই নির্ভর করে অন্যান্ত মানুষের (জীবিত ও মৃত) শ্রমের উপর এবং যা পেয়েছি ও পাচ্ছি, নিজেও অবশ্যই চেষ্টা করব যাতে আমিও অপরের জন্তে যথাসাধ্য দিয়ে যেতে পারি।"

শ্রীমহাদেব দত্ত*

* ফলিত গণিত বিভাগ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

সামুদ্রিক ও মরুভূমির প্রাণীদের পানীয় জলের সমস্যা

শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু*

জলের অপর নাম জীবন। প্রাণীদেহের ওজনের শতকরা 70 থেকে 95 ভাগই হল জল। দেহের মধ্যে বিভিন্ন বিপাকীয়ক্রিয়ায় জল অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাই জীব সব সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় জল দেহের মধ্যে রেখে প্রাণীরা উদ্বৃত্ত জল রেচন পদার্থসহ প্রস্রাব আকারে বের করে দেয়। একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চশ্রেণীর প্রাণী সারাদিনে প্রায় তিন লিটার জল পান করে এবং তার মধ্যে দেড় লিটার প্রস্রাব আকারে বের করে দেয়।

সামুদ্রিক প্রাণীর পানীয় জল সমস্যা—পৃথিবীর উপরিভাগের 4 ভাগের 3 ভাগ স্থান হল জলবেষ্টিত। বিপুল এই জলরাশির অধিকাংশই থাকে সমুদ্রে, যেখানে অজস্র প্রাণী বাস করে। অথচ এই জল একেবারেই অপেয়। কারণ সামুদ্রিক জল লবণাক্ত। এক লিটার ঐ জলে প্রায় 35 গ্রাম লবণ থাকে, যার মধ্যে 27 গ্রাম হল সোডিয়ামঘটিত লবণ। এই জল যদি পান করা হয়, তাহলে প্রতি লিটারে 27 গ্রাম সোডিয়াম লবণ দেহে যাবে এবং অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় (Osmosis) রক্ত ও কলারসে (Tissue fluid) প্রবেশ করবে। এত বেশী লবণ দেহের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কারণ অধিকাংশ প্রাণীর রক্তে অথবা কলারসে সোডিয়ামের পরিমাণ শতকরা 0·5-এর চেয়ে কম। যদি খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করা হয়, তবে পিপাসা পায়। অতিরিক্ত মিঠা জল পানের ফলে ঐ লবণ তরল হয়ে রক্তের লবণের সঙ্গে মেশে। তখন রক্তের অতিরিক্ত জল কিডনীর মধ্যে দিয়ে পাতনপ্রক্রিয়ার (Filtration) মাধ্যমে প্রস্রাব হয়ে বের হয়ে যায়। এই সঙ্গে অতিরিক্ত লবণও বের হয়ে যায়। সুতরাং সমুদ্রের জল পান করলে ঐ লবণকে দেহ থেকে বের না করলে মৃত্যু অনিবার্য এবং ঐ লবণকে তরল করে রক্তের সঙ্গে সমতায় আনতে যে পরিমাণ মিঠা জল পান করতে হবে, তা অকল্পনীয়। সেটা সম্ভবও নয়; কারণ সমুদ্রের মধ্যে মিঠা জল দুষ্প্রাপ্য।

সামুদ্রিক প্রাণীরা কিভাবে পিপাসা মেটায়—সামুদ্রিক প্রাণীদের রক্তে অথবা কলারসে লবণের পরিমাণ পরিবেষ্টিত জলের চেয়ে অনেক কম। অধিকাংশ প্রাণীই প্রাণীভোজী (predators)। সুতরাং বেশীর ভাগ জন্তুই ভক্ষিত প্রাণীদের দেহরস বা রক্ত থেকেই পিপাসা মেটায়। তবে বিভিন্ন জন্তুর লবণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল আছে। মানুষের পক্ষেও সামুদ্রিক প্রাণীর রক্ত বা দেহরস থেকে পানীয় জল আহরণ করা সম্ভব কি? এ প্রশ্ন উঠেছিল অকূল দরিয়ায় ভগ্ন জাহাজের নাবিকদের পিপাসা মেটানোর সমস্যা নিয়ে। ফরাসী চিকিৎসক এ. বম্বার্ড উত্তরের আশায় রবারের নৌকায় চেপে একদিন পাড়ি দিলেন ইউরোপ থেকে আমেরিকায়। সঙ্গে এক ফোঁটাও পানীয় জল নেই। 65 দিন এক ফোঁটাও মিঠা জল না পান করে কেবল সামুদ্রিক প্রাণীর দেহরস ও মাছ খেয়ে পৌঁছলেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

মাছেরা কি জল পান করে—সমুদ্র, নদী, নালা, পুকুর, ডোবা সর্বত্র মাছ বাস করে। খাদ্যের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ জল প্রবেশ করলেও কোন মাছই কখনও তৃষ্ণা অনুভব করে না। মিঠাজলের মাছের ক্ষেত্রে রক্তে এবং কলারসে যে লবণ ও প্রোটিনজাতীয় পদার্থ থাকে, তা লবণবিহীন পরিবেষ্টিত মিঠা জলের সঙ্গে অভিস্রবণ চাপের সৃষ্টি করে। ঐ চাপ 6 থেকে 10 গুণ বায়ুচাপের সমান। ফলে ত্বক এবং মুখবিবরের পাতলা আবরণের মধ্য দিয়ে মিঠা জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এই জন্যেই মাছের জল-পানের প্রয়োজন হয় না। অন্য দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল স্বাভাবিক নিয়মেই কিডনীর দ্বারা পাতনপ্রক্রিয়ায় দেহ থেকে বের হয়ে যায়। এই বের হবার ব্যবস্থা না থাকলে মিঠা জলের মাছ জলের চাপে ফুলে উঠে মারা যেত।

সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা। পরিবেষ্টিত লবণ জলের অভিস্রবণ চাপ দেহের রক্ত ও কলারসের চেয়ে 32 গুণ বায়ুচাপ বেশী। সুতরাং চাপের বৈষম্য অনুযায়ী সামুদ্রিক জল সমস্ত দেহরস শোষণ করে মাছটিকে শুকিয়ে দেবার কথা। কিন্তু তাতো হচ্ছে না!

সামুদ্রিক অস্থিযুক্ত মাছেরা অন্য প্রাণীর দেহরস থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে। এর মধ্যে কিছু সমুদ্রের জলও দেহের মধ্যে যায় এবং অভিস্রবণ চাপের সমতা রক্ষা করে। তবে জলের সঙ্গে যে অতিরিক্ত লবণ প্রবেশ করে, তা বের করে দেবার জন্যে আশ্চর্যজনক পাতনপ্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। এদের ফুল্‌কার মধ্যে আছে এক বিশেষ ধরণের কোষ। ঐ কোষগুলি রক্ত থেকে অতিরিক্ত লবণ ঘনীভূত অবস্থায় শ্লেষ্মার সঙ্গে বের করে দেয়।

কিন্তু হাঙরজাতীয় মাছেরা মোটেই জল পান করে না। যেহেতু এরা সমুদ্রের আদি মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং দীর্ঘদিন যাবৎ সমুদ্রে বাস করছে সেহেতু এরা সমুদ্রের জলের সঙ্গে রক্ত ও দেহরসের অভিস্রবণ চাপের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলও চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে ইউরিয়া (urea) নামক এক রকম রেচন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এটি অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিষাক্ত পদার্থ এবং প্রস্রাবের সঙ্গে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু হাঙরের ক্ষেত্রে যাতে ইউরিয়া বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে ফুল্‌কাগুলি বিশেষ পর্দা দিয়ে ঢাকা। ফলে রক্তে অভিস্রবণ চাপ বেশী হয় এবং সমুদ্রের জল মিঠা জলে মতই ত্বক দিয়ে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত জল কিড্‌নী দিয়ে প্রস্রাব হয়ে বেরিয়ে যায়। অভিস্রবণ চাপের তারতম্যের জন্যেই মিঠা জলের মাছ সমুদ্রে থাকতে পারে না এবং সামুদ্রিক মাছও মিঠা জলে বাঁচে না। কিন্তু ঈল (Eel), ইলিশ প্রভৃতি মাছ জীবনের কিছু সময় উভয় প্রকার জলেই অতি-বাহিত করে। অভিস্রবণ চাপের সমতা রক্ষার জন্যে এদের মধ্যে দু-রকমের অভিযোজন দেখা যায়।

ব্যাঙেরা কি করে—ব্যাঙ উভচর প্রাণী। ব্যাঙ সাধারণতঃ জলপান করে না; মিঠা জলের মাছের মতই ত্বক দিয়ে জল শোষণ করে। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক ধরণের ব্যাঙ দেখা গেছে, যারা মিঠা জলে ডিম পাড়ে, কিন্তু বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হলে সমুদ্রে যায় এবং সেখানেই থাকে। সমুদ্রে যাবার পূর্বে হাঙরের ন্যায় রক্তে ইউরিয়া সঞ্চয় করে রাখে, যার ফলে অভিস্রবণ চাপের সমতা রক্ষা হয়।

সরীসৃপ ও পাখীদের সমস্যা—সামুদ্রিক পাখীরা (অ্যালবাট্রস, করমোর‍্যান্ট, গাল) কিন্তু কখনও মিঠা জল পান করে না। প্রজনন ঋতুতে বছরে কেবল একবার এরা তীরভূমে আসে ডিম পেড়ে বাচ্চা তোলবার জন্যে। বাকী সময় এরা সমুদ্রেই থাকে এবং লবণ-জল পান করে।

সামুদ্রিক সরীসৃপ প্রাণীরাও একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই সব জন্তুর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লবণ নির্গমনের জন্যে দেহের মধ্যে লবণগ্রন্থি থাকে। পাখীদের ক্ষেত্রে এই লবণগ্রন্থি চক্ষুকোটরের উপরিভাগে অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে একটি সরু নালী নাকের মধ্যে উন্মুক্ত হয়। লবণগ্রন্থি রক্ত থেকে উদ্বৃত্ত লবণ সঞ্চয় করে এবং ঐ ঘনীভূত লবণ সর্দির মত নাক দিয়ে ঝরতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, ঐ পুরু 'সর্দি' ঊর্ধ্ব চঞ্চুর উপর ঝুলতে থাকে আর পাখী সেটাকে মাথা নেড়ে ফেলে দেয়। দেখলে মনে হবে, ঠাণ্ডা লেগে ওরা যেন ভয়ানক সর্দিতে ভুগছে।

সামুদ্রিক কাছিম, সাপ, গিরগিটির ক্ষেত্রে লবণগ্রন্থির নালীটি চোখের কোণে উন্মুক্ত হয়। কুমীরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শিকারকে খাবার পর চোখ দিয়ে জল পড়ে। আমাদের দেশে এটি 'মায়া কান্না' বা 'কুম্ভীরাশ্রু' প্রবাদ হিসাবে প্রচলিত। এর অর্থ হল একটা জন্তুকে হত্যা ও গলাধঃকরণ করে তার জন্যে পরে যেন শোক করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি এই 'কুম্ভীরাশ্রু'র বৈজ্ঞানিক সত্য জানা গেছে। শিকারের সময় কুমীর জলের সঙ্গে যে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করে, তা চোখের জলের সঙ্গে বের করে দেয়।

সমস্ত সামুদ্রিক সরীসৃপের ক্ষেত্রেই এই সত্য প্রযোজ্য। সবুজ কাছিমেরা বছরের কোন এক সময়ে তীরে এসে ডিম পেড়ে আবার জলে ফিরে যায়। যাবার আগে প্রচুর চোখের জল ফেলে। দেখলে মনে হবে ভাবী সন্তানদের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে যেতে তাদের কান্না পাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কান্নার মধ্যে দিয়ে লবণগ্রন্থি থেকে তারা প্রচুর লবণ নির্গত করে।

মরুভূমির প্রাণীদের পানীয় সমস্যা—মরুভূমির অর্থ হল বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক জলবায়ুসমন্বিত এলাকা। বছরে 10"-15"-র নীচে যেখানে বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেই মরুভূমির অবস্থা বিদ্যমান। পৃথিবীর $\frac{1}{4}$ স্থলভাগের মধ্যে প্রায় $\frac{1}{6}$ অংশই মরুভূমি। মরুভূমির মোট এলাকা প্রায় 11500000 বর্গ মাইল। এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা (Atacama) মরুভূমিতে কখনই বৃষ্টিপাত হয় না।

কিন্তু মরুভূমি মানেই প্রাণহীন এলাকা নয়। বহু রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রচণ্ড উত্তাপ ও একান্ত জলাভাবের মধ্যেও কঠোর জীবনসংগ্রাম করে মরুভূমিতে বাস করে। এই সব জন্তুর প্রধান সমস্যা হল—পানীয় জল সংগ্রহ, দেহ-মধ্যে জল সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মরক্ষা।

অধিকাংশ প্রাণী উদ্ভিদের রস, শিশিরবিন্দু এবং তাদের খাবারযোগ্য প্রাণীদের রক্ত থেকে পিপাসা মেটায়। কেউ বা মরুভূমিতে কোনও রকমে কিছু জল পেলে তা ভবিষ্যতের জন্যে দেহের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। আর ঘাম হয়ে কিংবা নিঃশ্বাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্প হয়ে জল যাতে বেরিয়ে না যায়, তার জন্যে চামড়ায় কোন ঘর্মগ্রন্থি থাকে না এবং নাকেও বিভিন্ন রকমের অভিযোজন দেখা যায়। কয়েকটি প্রাণীর জল সংগ্রহ পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র।

অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বাস করে ইঁদুরের মত ক্যাঙারু, এরা জল পান করে না। এরা খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করে বিভিন্ন গাছের শুকনো বীজ। মাটির নীচে গর্ত করে এই বীজ বেশ কিছু দিন রেখে দেয়। মাটির গভীরে ঐ বীজ মাটির জলকণা শোষণ করে। দুষ্প্রাপ্য ঐ জলকণা শুকনো বীজের মধ্যে 400-500 বায়ুচাপের সমান অভিস্রবণ চাপের সৃষ্টি করে। যতক্ষণ না বীজগুলি ভিজে নরম হয়, ততক্ষণ সেগুলি ওরা খায় না। এইভাবে মাটির

নীচ থেকে খাদ্যের সঙ্গে ওরা সামান্য জল-গ্রহণ করে।

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে মোলক (Moloch) নামে এক ধরণের গিরগিটি আছে। এদের ত্বক ব্লটিং পেপারের মত বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে। এদের চামড়া কাঁটা এবং ছিদ্রযুক্ত। চামড়ার তলে অসংখ্য সরু সরু জলনালীর জালিকা আছে। এই সব জলনালী মাথার দিকে প্রবাহিত হয়ে মুখের কোণে দুট থলিতে সঞ্চিত হয়। শিশিরবিন্দুর অথবা বৃষ্টির জল ছিদ্র দিয়ে শোষণ করে এবং জলনালী দিয়ে মুখের থলিতে জমা হয়। চোয়াল নাড়লেই থলিতে চাপ পড়ে, আর জল এসে মুখে পড়ে; তাই মোলকের জল পানের দরকার হয় না। কোন জলাশয়ে যদি একবার স্নান করে, তাহলেই অনেক জল দেহের মধ্যে সংগ্রহ করে নিতে পারে।

দেহের মধ্যে জল সৃষ্টি—একেবারে শুক্‌নো মরুভূমিতে কিছু জন্তু (এনটেলাপ, মুস্কি, বিশেষ জাতীয় কচ্ছপ) কখনও জল পান করে না। উদ্ভিদরসই জলের প্রধান উৎস। কিন্তু প্রাণী জগতের অনেকেই দেহের মধ্যে জল উৎপন্ন করতে পারে। দৈনন্দিন জৈবিক কার্যের জন্যে যে শক্তির দরকার, সেটা সৃষ্টি হয় চর্বি অথবা শর্করাজাতীয় সঞ্চিত খাদ্য জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের সৃষ্টি হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃশ্বাসের সময় বের হয়ে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে উৎপন্ন জল প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় না। তা দেহের মধ্যে থেকে দেহের কাজে লাগে। প্রয়োজন মেটায়। 1 গ্রাম শর্করা থেকে 0·56 গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু 1 গ্রাম চর্বি জারিত হয়ে 1·07 গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহে সারাদিনে 300 গ্রাম জল এভাবে পাওয়া যেতে পারে। মরুভূমির বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে এটাই হল পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। Bastards, ভরত পাখী, Gerbils এবং কিছু ইঁদুর এই ভাবেই জল উৎপন্ন করে নেয়। এরা তাই কখনও জল পান করে না। অনেক মরু-প্রাণী সে জন্যে দেহের মধ্যে চর্বি জমা করে রাখে। কিন্তু এই সব প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মে চামড়ার নীচে চর্বি জমা হয় না। তাহলে অতিরিক্ত উত্তাপে চর্বি গলে গিয়ে তাদের মৃত্যুর কারণ ঘটাতে পারে। এদের চর্বি জমাবার বিশেষ স্থান আছে। উটের পিঠে যে কুঁজ আছে, তাতে 110 থেকে 120 কে. জি. চর্বি জমা থাকে। অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে লেজের তলদেশে চর্বি জমা হয়। উট অবশ্য পাকস্থলীর প্রকোষ্ঠেও জল জমা করে রেখে দেয়। যাই হোক, চর্বি-জমানো জন্তুরা খাদ্যের খোঁজে যত বেশী দৌড়াদৌড়ি করে, তত বেশী চর্বি জারিত হয়ে জল উৎপন্ন হয়। জলের খরচ সম্বন্ধেও তারা খুবই সচেতন।

রাসায়নিক শক্তি প্রসঙ্গে

অমলেন্দু ঘোষাল*

'শক্তি' আমাদের একটি অতি পরিচিত শব্দ, সাধারণভাবে শক্তি বলতে আমরা বুঝি, যার দ্বারা কোন কিছু কাজ করা বোঝায়। শক্তির বিভিন্ন রূপের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় আছে। যথা—তাপ, আলোক, শব্দ, তড়িৎ, চৌম্বক, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক শক্তি। শক্তির এই বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে রাসায়নিক শক্তি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খানিকটা অস্পষ্ট। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা রাসায়নিক শক্তি কি এবং সাধারণতঃ কোন্ কোন্ বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি আমাদের ব্যবহারের উপযোগী, তা আলোচনা করব।

এটি আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা যে, যখন কোন বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে থাকে, তখন কিঞ্চিৎ তাপ বিনিময় হয়েই থাকে। একটি পরীক্ষা-নলে সামান্য পরিমাণ পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের দ্রবণ নিয়ে তাতে যদি খানিকটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালা হয়, তবে সেটি এত বেশী গরম হয়ে যায় যে, হাতে ধরে রাখা মুশকিল হয়। উপযুক্ত পরিমাণে সোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লার মিশ্রণে (বারুদ) আগুন দিলে তা থেকে একাধারে তাপ, আলো ও শব্দ-শক্তির নিঃসরণ ঘটে। আবার কয়লা বা পেট্রোলে আগুন দিলে তা থেকেও তাপ ও আলোক-শক্তির নিঃসরণ ঘটে। এখন প্রশ্ন হল—এই সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে শক্তি বের হয়ে আসে, তার উৎস কোথায়? শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী আমরা শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস কিছুই করতে পারি না, যা করতে পারি, তা হল এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন মাত্র। তা হলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে কোন্ শক্তি রূপান্তরিত হয় তাপ, আলো বা শব্দশক্তিতে? এর উত্তর হল—রাসায়নিক শক্তি? প্রত্যেক পদার্থেরই (মৌলিক বা যৌগিক) অভ্যন্তরে তার অণুগুলির গঠনের উপর নির্ভরশীল একপ্রকার শক্তি সঞ্চিত থাকে। এই শক্তি থাকবার জন্যে তাদের মধ্যে স্থিতিশক্তি (potential energy) থাকে, আবার তাদের নিরন্তর গতিশীলতার জন্যে থাকে তাদের মধ্যে গতিশক্তি (kinetic energy)। এছাড়া এদের মধ্যে কম্পনজনিত (vibration), ঘূর্ণনজনিত (rotation) ও এদের ইলেকট্রনগুলির বিভিন্ন স্থানে অবস্থানজনিত শক্তিও সঞ্চিত থাকে। এই সমস্ত শক্তির সমবেত রূপই হল রাসায়নিক শক্তি। আর এই রাসায়নিক শক্তি থাকে বলেই কোন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় (নূতন পদার্থ সৃষ্টি হবার জন্যে এবং সেই সৃষ্ট নূতন পদার্থের ভিন্ন রাসায়নিক গঠনের জন্যে ভিন্ন রাসায়নিক শক্তি থাকে বলেই) শক্তির বিনিময় ঘটে থাকে।

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হল, তা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, এই মহাবিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত রয়েছে। কিন্তু আমাদের আগ্রহ যাবতীয় পদার্থের দিকে নয়, কেবলমাত্র সেই সব পদার্থের দিকে—যাদের রাসায়নিক শক্তি আমরা কাজে লাগাতে পারি। এই সব পদার্থ হল তারাই, যাদের অভ্যন্তরে সঞ্চিত রাসানিক শক্তির পরিমাণ এত বেশী যে, তারা বিয়োজনের (ভেঙে যাওয়া) জন্যে অত্যন্ত আগ্রহী অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী।

---

* রসায়ন বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

আগের পরিচ্ছেদের সমাপ্তি টানা হয়েছে ক্ষণস্থায়ী শব্দ দিয়ে। এখন আমরা পদার্থের স্থায়ীত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা করব। পদার্থের অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তির উপর নির্ভর করে আমরা যাবতীয় পদার্থগুলিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি—এগুলি হল যথাক্রমে (ক) স্থায়ী (stable), (খ) অস্থায়ী (unstable), এবং ক্ষণস্থায়ী (metastable)। সাধারণতঃ স্থায়ী যৌগ বা যৌগ বলতে আমরা বুঝি সেই সব পদার্থগুলি, যেগুলির অভ্যন্তরে অণু-পরমাণুগুলি মোটামুটি সুস্থিত অবস্থায় আছে এবং কোন টান (strain) অনুভব করছে না; অর্থাৎ এর স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন। এর ফলে এদের অভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক শক্তিও কম হয়ে থাকে এবং এদের এই রাসায়নিক শক্তিকে আমাদের প্রত্যাহিক প্রয়োজনে ব্যবহারের প্রচেষ্টা খুব একটা লাভজনক হয় না।

স্থায়ী পদার্থের গঠনের ঠিক বিপরীত গঠন হল অস্থায়ী পদার্থের। অস্থায়ী পদার্থের অভ্যন্তরে পরমাণুগুলি এমনভাবে সাজানো থাকে যে, এগুলি সব সময়েই একটা প্রচণ্ড টান অনুভব করে এবং অতি সামান্য কারণেই এই টান এত তীব্র হয়ে যায় যে, পদার্থটি ভেঙে গিয়ে কম রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন নূতন পদার্থে পরিণত হয় এবং এই পরিবর্তনের সময় বেশ খানিকটা শক্তি বের হয়ে যায়। এই পরিবর্তন ঘটে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে, ফলে প্রয়োজনীয় কাজে ইচ্ছামত শক্তিটাকে কাজে লাগাবার মত সময় পাওয়া যায় না। এই ধরণের অস্থায়ী পদার্থের উদাহরণ হিসাবে আমরা নাইট্রোগ্লিসারিন (ডিনামাইট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়); টি. এন. টি (T. N. T) ইত্যাদির নাম করতে পারি।

স্থায়ী এবং অস্থায়ী—এই দুই পদার্থের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে রয়েছে ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। একটি উদাহরণ দিলে এই পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক্, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পাহাড়ের কথা, যাদের একটির চূড়াটি সোজা উঁচু হয়ে রয়েছে, অন্যটির চূড়াটি একই উচ্চতায় অবস্থিত হলেও চূড়ায় একটুখানি গর্ত রয়েছে। এখন পাহাড়ের পাদদেশে যদি খানিকটা জল রাখা যায়, তবে তার শক্তি সর্বনিম্ন বলে তার মধ্যে কোন গতি দৃষ্ট হবে না—এটিকে যেখানে রাখা হবে, সেখানেই থাকবে, অর্থাৎ স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু যদি দুটি পাহাড়ের চূড়াতেই খানিকটা করে জল রাখা যায়, তবে প্রথম ক্ষেত্রে চূড়া খাড়াই হবার জন্যে জল চূড়ায় থাকবে না, গড়িয়ে পড়বে অর্থাৎ জলের অবস্থান অস্থায়ী হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চূড়ায় গর্ত থাকবার জন্যে খানিকটা জল ওখানে থেকে যাবে, যদিও এই জলের স্থিতিশক্তি প্রথম চূড়ায় অবস্থিত জলের স্থিতিশক্তির সমান (যেহেতু দুটি চূড়াই একই উচ্চতায় অবস্থিত, এবং স্থিতিশক্তি অবস্থানের উপর নির্ভরশীল)। দ্বিতীয় চূড়ায় জলের মধ্যে অধিক শক্তি সঞ্চিত থাকা এবং তার জন্যে কাজ করবার মত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এখানে এর অবস্থানের বিশেষ বিশেষত্ব থাকবার জন্যে জল গড়িয়ে পড়বে না অর্থাৎ কোন কাজ করবে না। অবশ্য যদি গর্তটির মধ্যে সামান্য ছিদ্র করে দেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত জলই বের হয়ে যাবে এবং গড়িয়ে যাবে। এক্ষেত্রে জলের এই অবস্থাকে আমরা ক্ষণস্থায়ী বলতে পারি।

তাহলে আমাদের আলোচনা থেকে এটাই বোঝা গেল যে, ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলতে আমরা সেই সব পদার্থকেই বুঝব, যাদের অভ্যন্তরে রাসায়নিক শক্তির পরিমাণ অস্থায়ী পদার্থগুলির মতই বেশী, কিন্তু তাদের বিশেষ গঠনের জন্যে এই পদার্থটি সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে শক্তির বহিঃ-

প্রকাশ ঘটাচ্ছে না। ওই বিশেষ গুণটি থাকবার জন্যেই এদের মধ্যের রাসায়নিক শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই ধরণের পদার্থের উদাহরণ হিসাবে আমরা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির নাম করতে পারি।

সাধারণভাবে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, রাসায়নিক শক্তির পরিমাণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও কেন ক্ষণস্থায়ী পদার্থগুলি অস্থায়ী পদার্থের মত বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে উত্তেজক শক্তির (activation energy) ধারণা থেকে। স্থায়ী, অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী যে কোন ধরণের পদার্থই হোক না কেন, সেগুলি যখন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তখন সক্রিয় পদার্থগুলি প্রথমে একটি অতি অস্থায়ী জটিল যৌগ (transitional activated complex) গঠন করে, যেটির রাসায়নিক শক্তি অত্যন্ত বেশী এবং গঠন-পদ্ধতি অত্যন্ত অস্থায়ী ধরণের বলে এটি মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে গিয়ে একটি নূতন পদার্থ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস প্রথম অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে, সক্রিয় পদার্থগুলির সমবেত শক্তি একটি নির্দিষ্ট শক্তির বেশী না হলে তারা এই ধরণের জটিল যৌগ গঠন করতে পারে না, অর্থাৎ তাদের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াও হয় না। প্রকৃতপক্ষে যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পাদন করতে হলে সক্রিয় পদার্থগুলিকে বাইরের থেকে এই পরিমাণ শক্তি দিয়ে আগে জটিল যৌগ তৈরির উপযোগী করতেই হবে। এই নির্দিষ্ট শক্তিকেই উত্তেজক শক্তি বলা হচ্ছে। যে সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্তনের উত্তেজক শক্তির পরিমাণ অত্যল্প তারা খুবই সহজসাধ্য বিক্রিয়া,প ক্ষান্তরে যাদের ক্ষেত্রে এই শক্তির পরিমাণ বেশী, সে সব বিক্রিয়া সহজে হয় না।

দেখা গেছে স্থায়ী পদার্থগুলির ক্ষেত্রে পদার্থগুলির রাসায়নিক শক্তি অত্যন্ত কম থাকায় এগুলিকে কোন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করাতে গেলে প্রচুর পরিমাণে উত্তেজক শক্তি লাগে বলে এগুলি রাসায়নিক পরিবর্তনে অনাগ্রহী। পক্ষান্তরে অস্থায়ী পদার্থগুলির ক্ষেত্রে সেগুলির গঠন ও সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি এমনই ধরণের যে, সেগুলি সামান্য পরিমাণ উত্তেজক শক্তি (যেমন একটুখানি চাপ, দেশলাই সামান্য ধাক্কা ইত্যাদি বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে) পেলেই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে রাসায়নিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী পদার্থগুলির ক্ষেত্রে উত্তেজক শক্তির পরিমাণ স্থায়ী পদার্থগুলির তুলনায় অনেক কম হলেও অস্থায়ী পদার্থগুলির তুলনায় বেশী, তাই এগুলি রাসায়নিক পরিবর্তনে ও রাসায়নিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে আগ্রহী হলেও এই পরিবর্তনের জন্যে প্রথমে খানিকটা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশ্য একবার বিক্রিয়া সুরু হয়ে গেলে আর বাইরের থেকে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। আমরা পূর্বেই বলেছি এই ধরণের ঘটনা ঘটে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

সৃষ্টির আদিপর্বে পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুই ছিল অস্থায়ী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সব অস্থায়ী বস্তুর দল নিজেদের অভ্যন্তরস্থ শক্তির নিঃসরণ ঘটিয়ে আজ প্রায় সবাই স্থায়ী অবস্থায় পৌঁছে গেছে। অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে কিছু তেজস্ক্রিয় (radioactive) যৌগ আজও রয়ে গেছে—যারা নিজেদের নিউক্লিয়াসের বিশেষ গঠনের জন্যে অধিক শক্তিসম্পন্ন হবার ফলে অস্থায়ীত্ব পেয়েছে এবং আজও ক্রমাগতই ভেঙে চলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্থায়ী যৌগ সীসায় (lead) তারা সম্পূর্ণরূপে পরিণত হতে পারছে। এদের বাদ দিলে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক অস্থায়ী পদার্থ আর নেই। নাইট্রোগ্লিসারিন বা T.N.T কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অস্থায়ী পদার্থ। কাজেই

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া রাসায়নিক শক্তি আমাদের কাজে লাগাতে গেলে আমাদের দ্বারস্থ হতে হবে ক্ষণস্থায়ী পদার্থগুলির কাছে; যথা—কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি, যাদের সৃষ্টির কারণ সৃষ্টির আদিম যুগে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে—কিছু উদ্ভিদ এবং কিছু জলজ প্রাণীর জীবন্ত সমাধি এবং বাতাসের অনুপস্থিতিতে তাদের ধীরগতিসম্পন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই শেষ হয়ে আসছে এই রাসায়নিক শক্তির ভাণ্ডার। সেদিন হয়ত বা খুব বেশী দূরে নয়, যেদিন রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগাবার যুগ শেষ হয়ে যাবে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অভাবে। কাজেই এই শক্তির বিকল্পের কথা ভাববার সময় এসেছে।

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক কি পরিবর্তনশীল ?

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

ভূমিকা—পদার্থ-বিজ্ঞানের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র এবং নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র। দুটি সূত্রেই বস্তুর ভর ও বলের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী কোন গতিশীল বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল (F), বস্তুর ভর (m) ও বস্তুর ত্বরণের (f) গুণফলের সমান, অর্থাৎ $F=mf$। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রানুযায়ী m ভরের বস্তুর একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (gravitational field) থাকে, যার ফলে তা অন্য একটি বস্তুকে (যার ভর M) এমন বল (F) দ্বারা আকর্ষণ করবে, যা বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতী এবং বস্তু দুটির দূরত্বের (d) বর্গের ব্যাস্তানুপাতী। অর্থাৎ $F=GmM/d^2$, এখানে G একটি ধ্রুবক, যাকে বলা হয় বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (universal gravitational constant)। নিউটনের সূত্র দুটিকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রথম সমীকরণে বস্তুর জড়ত্বীয় ভর (inertial mass) এবং দ্বিতীয় সমীকরণে বস্তুর মহাকর্ষীয় ভর (gravitational mass) একই। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কম ভরসম্পন্ন বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে এই ধারণা ঠিক হলেও বেশী ভরসম্পন্ন বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে নয়।

নিউটনের সূত্রগুলি দীর্ঘ দিন আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তি বলে পরিগণিত হত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নিউটনীয় গতিবিদ্যার কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সূর্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে—যেখানে সূর্যের আকর্ষণ প্রবল—নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সামান্য বিচ্যুতি দেখা যায়। একজন ফরাসী জ্যোতির্বিদ লেভেরিয়ার (Leverrier) বুধ গ্রহের গতিপথ নিয়ে গবেষণা করে দেখেন যে, নিউটনের সূত্রানুযায়ী বুধ গ্রহের অনুসূরের (perihelion) পুরঃসরণ (precession) যা হওয়ার কথা, তা অপেক্ষা প্রতি 100 বছরে 38 সেকেণ্ড (secs. of arc) বেশী। পরবর্তী কালে আরও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফলে এই পার্থক্যের পরিমাণ প্রতি 100 বছরে 43 সেকেণ্ড বলে দেখা যায়। নিউটনীয় গতিবিদ্যার সাহায্যে কোন ভাবেই এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় না। একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী (Hall) এটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বর্গের ব্যাস্তানুপাত সূত্র নাও হতে পারে। তাঁর মতে মহাকর্ষ বল দূরত্বের nতম

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী।

ঘাতের ব্যস্তানুপাতী হতে পারে, যেখানে n-এর মান 2 ± 10^{-2}। কিন্তু সাম্প্রতিক সূক্ষ্ম পরিমাপের ফলে দেখা গেছে যে, (n—2)-এর মান 10^{-8}-এর চেয়ে বেশী হতে পারে না। n-এর এই মান উপরিউক্ত পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। পরবর্তীকালে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Theory of relativity) দ্বারা এর ব্যাখ্যা সম্ভব হয়। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দ্বারা মহাকর্ষসম্পর্কিত বিষয়সমূহ খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দ্বারা সম্ভব নয়।

আইনষ্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের তিনটি পরীক্ষামূলক প্রমাণের কথা বলেন। (1) সূর্যের খুব কাছ দিয়ে কোন আলোক রশ্মি গেলে সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ফলে আলোক রশ্মিটি তার গতিপথ থেকে 1·75 সেকেণ্ড বিচ্যুত হবে। (2) সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী গ্রহ বুধের অনুসূরের পুনঃসরণ নিউটন সূত্রানুযায়ী যা হবার কথা, তা অপেক্ষা প্রতি 100 বছরে 43 সেকেণ্ড বেশী হবে। (3) মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মান যত বেশী হবে, ঘড়ি তত ধীরে চলবে। এর অর্থ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কোন পরমাণু থেকে নির্গত বিকিরণ কিংবা পরমাণু কর্তৃক শোষিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বাইরে ঐ পরমাণু থেকে নির্গত বা পরমাণু কর্তৃক শোষিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক অপেক্ষা কম হবে অর্থাৎ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কোন পরমাণু থেকে নির্গত বিকিরণ বা পরমাণু কর্তৃক শোষিত বিকিরণের লাল অপসারণ (red shift) হবে। উপরিউক্ত তিনটি ঘটনাই পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সাফল্য লাভ করলেও পরবর্তীকালে মহাকর্ষ সম্পর্কে কয়েকটি নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা। এই সব তত্ত্বানুযায়ী G-এর মান ধ্রুবক নয়, সময়ের সঙ্গে G-এর মান অত্যন্ত ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কিছু পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাদি এই তত্ত্বগুলিকে সমর্থন করছে বলে মনে করা হয়, যদিও এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার সময় এখনও আসে নি। যদি সত্যই G-এর মান সময়ের সঙ্গে হ্রাস পায়, তবে পদার্থ-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

G হ্রাস সংক্রান্ত প্রস্তাবনা—মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের হ্রাসসংক্রান্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল 1937 খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবিত পি. এ. এম. ডিরাকের (P. A. M. Dirac) তত্ত্ব। তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বানুযায়ী G সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় (হ্রাস পায়)। ডিরাক কয়েকটি পারমাণবিক ধ্রুবককে পরিমাপের এককরূপে গণ্য করেন; যথা—ইলেকট্রনের ভরকে ভরের একক, হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে দৈর্ঘ্যের একক এবং এই ব্যাসার্ধ অতিক্রম করতে আলোকের সমান বেগসম্পন্ন কোন ফোটনের যে সময় লাগে, তাকে সময়ের এককরূপে গণ্য করেন। এই একক অনুযায়ী G-এর মান হয় প্রায় 10^{-40} এবং ব্রহ্মাণ্ডের বয়স হয় 10^{40}। দেখা যাচ্ছে যে, ডিরাকের একক অনুযায়ী G-এর মান ব্রহ্মাণ্ডের অন্যোন্য (reciprocal)। এটি কি শুধুমাত্র কাকতালীয় (coincidence) অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের সঙ্গে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের কোন অনাবিষ্কৃত সম্পর্ক আছে? ডিরাক দ্বিতীয়টিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। ডিরাক আরও বলেন যে, সে ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম, যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের বয়স সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, G-এর মান সময়ের সঙ্গে হ্রাস পাবে। দ্বিতীয় পারমাণবিক ধ্রুবকগুলি (যা এককরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল) নিজেরাই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ম্যাকের

প্রস্তাবনাও (Mach's principle) মহাকর্ষ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা সমর্থন করে। ম্যাকের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কোন স্থানের ধর্মাবলী নির্ধারিত হয়—ঐ স্থানে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, তার দ্বারা। যদি শূন্য ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তু রাখা হয় তবে তার পরিচিত ধর্মাবলী পরিলক্ষিত হবে না। যদি শূন্য ব্রহ্মাণ্ডে ধীরে ধীরে বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটানো যায় তবে পূর্বোক্ত বস্তুর ধর্মাবলী ফিরে আসতে দেখা যাবে। ম্যাকের প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে মহাকর্ষ সম্বন্ধীয় যে সব তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, সেগুলি অনুযায়ী সময়ের সঙ্গে G-এর মান হ্রাস পাবার কথা। এদের যুক্তি—যেহেতু হাব্‌লের প্রসরণশীল বিশ্ব তত্ত্বানুযায়ী সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি অতি ক্ষুদ্র স্থান থেকে প্রসারিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং প্রসরণ অব্যাহত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পদার্থগুলির পারস্পরিক প্রভাব ক্রমহ্রাসমান, ফলে G-এর মানও হ্রাস পায়।

G-এর পরিবর্তনের হার—কি হারে G-এর মানের পরিবর্তন হচ্ছে, তা গণনায় ব্যবহৃত তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। অবশ্য মোটামুটিভাবে সব তত্ত্ব থেকেই দেখা যায় যে, G-এর পরিবর্তনের হার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসরণের হারের প্রায় অনুরূপ অর্থাৎ প্রতি বছরে 10^{11} ভাগের $5\cdot6\pm\cdot7$ ভাগ। এখন পর্যন্ত এত কম হারের পরিবর্তন পরিমাপ করা সম্ভব হয় নি। তবে বর্তমানে কয়েকটি পরিমাপ পদ্ধতি গবেষণাধীন রয়েছে, যার দ্বারা এই পরিবর্তন পরিমাপ সম্ভব হতে পারে। এগুলির মধ্যে একটি চাঁদ কর্তৃক নক্ষত্রের গ্রহণকে ভিত্তি করে পরিকল্পিত। পদ্ধতিটি ইতিমধ্যেই কিছু প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেছে।

চাঁদ কর্তৃক নক্ষত্রের গ্রহণকে কাজে লাগিয়ে G হ্রাসের হার নির্ণয় করার মূল তত্ত্বটি বেশ সরল। নিজের কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমাকালে চাঁদ অসংখ্য নক্ষত্রকে অতিক্রম করে। যেহেতু চাঁদের নিজস্ব কোন বায়ুমণ্ডল নেই এবং নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত দূরে অবস্থিত বলে তাদের আলোকের বিন্দু উৎসরূপে গণ্য করা যায়। চন্দ্রপৃষ্ঠ কর্তৃক তাদের ঢাকা পড়ে অদৃশ্য হওয়া এবং পরে তাদের পুনরাবির্ভাব—উভয় ঘটনাই তাৎক্ষণিক বলে প্রতীয়মান হবে। G হ্রাসের হার নির্ণয়ের জন্যে এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ যে সময়ের জন্যে চন্দ্র কর্তৃক ঢাকা পড়ে নক্ষত্রটি অদৃশ্য থাকে (একে নক্ষত্রের গ্রহণকাল বলা যেতে পারে) তা ফোটোইলেকট্রিক ফোটোমিটার (Photoelectric photometer) দ্বারা খুব সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা হয়। যদি মহাকর্ষ হ্রাস পায়, তবে চাঁদ অত্যন্ত মন্থর গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবে। ফলে পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের কক্ষপথ এবং তার পর্যায়কাল (orbital period) বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ নিজের কক্ষপথে পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করতে চাঁদের আরও বেশী সময় লাগবে। ফলে স্পষ্টতঃই নক্ষত্রের গ্রহণকাল মহাকর্ষ অপরিবর্তিত থাকলে যা হত, এক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী হবে। মহাকর্ষ অপরিবর্তিত থাকলে কোন নক্ষত্রের গ্রহণকাল কত হবে, তা সহজেই গণনা করা যায়। অতএব নক্ষত্রের গ্রহণকাল পরিমাপ করলে জানা যাবে G-এর মানের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। চাঁদের পর্যায়কালের পরিবর্তন পরিমাপ করতে হলে এমন একটি ঘড়ি ব্যবহার করতে হবে, যা মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মানের উপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ G-এর মান যাই হোক না কেন ঘড়িটি সমভাবে চলে। যদি মহাকর্ষের পরিবর্তনের ফলে ঘড়িটির সময়কালও (time period) চাঁদের পর্যায়কালের সঙ্গে সমহারে পরিবর্তিত হয় তবে চাঁদের পর্যায়কালের পরিবর্তন হলেও

তা ধরা পড়বে না। সাধারণতঃ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার পরিক্রমাকালকে সময়ের প্রামাণ্য (standard) হিসাবে গণ্য করা হয়। ফলে এক্ষেত্রে উপরিউক্ত ঘটনা ঘটবে, কারণ G-এর মান হ্রাস পেলে পৃথিবী, চাঁদ প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগুলির কক্ষপথ একই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে এবং নিজ নিজ কক্ষপথে একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে তাদের যে সময় লাগবে, তার অনুপাত সর্বদাই সমান থাকবে। পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, কারণ পারমাণবিক ঘড়ি নির্দেশিত সময় গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথের উপর নির্ভরশীল নয়। এজন্যে বর্তমান সিজিয়াম পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহৃত হয়।

20 বছর ধরে পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে নক্ষত্রের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করার পর বর্তমানে যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে চাঁদের পর্যায়কালের পরিবর্তন নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে; এর ফলে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মানের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এবং হলে তার পরিমাণ কত, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। নক্ষত্রের গ্রহণসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, চাঁদের পর্যায়কাল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বৃদ্ধির হার বছরে 10^{11} ভাগের মধ্যে $22{\cdot}2 \pm 3{\cdot}5$ ভাগ। তবে চাঁদের পর্যায়কালের বৃদ্ধি শুধুমাত্র G-এর হ্রাসের জন্যে হয় না, অন্য কারণও আছে। তা হল টাইডাল ঘর্ষণ (tidal friction)। টাইডাল ঘর্ষণের জন্যে চাঁদের পর্যায়কাল বৃদ্ধির উপরিউক্ত হার থেকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল থেকে G-এর হ্রাসের হার গণনা করা যায়। স্পষ্টতঃই চাঁদের পর্যায়কালের পরিবর্তনের হার G-এর হ্রাসের উপর নির্ভর করে। যদি সময়ের সঙ্গে শুধুমাত্র G-এর মানের পরিবর্তন হয় তবে চাঁদের পর্যায়কাল বৃদ্ধির নির্ণীত হার থেকে G-এর হ্রাসের যে হার পাওয়া যায়, তা হল বছরে 10^{11} ভাগে $3{\cdot}6 \pm 1{\cdot}8$ ভাগ। আর যদি ডিরাক প্রস্তাবিত ভর, দৈর্ঘ্য ও সময়ের এককগুলি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে ধরা হয়, তবে চাঁদের পর্যায়কালের ঐ একই বৃদ্ধির জন্যে G-এর হ্রাসের হার হয় বছরে 10^{11} ভাগে $7{\cdot}2 \pm 3{\cdot}7$ ভাগ। G হ্রাসের হারের এই মান দুটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের হারের সঙ্গে অনেকাংশে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য উপরিউক্ত গণনায় বেশ কিছুটা ত্রুটি থাকতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, এখন পর্যন্ত নক্ষত্রের গ্রহণসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা G-এর মান হ্রাস পাচ্ছে—এই তত্ত্ব সমর্থন করছে। অবশ্য এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্যে জানা দরকার টাইডাল ঘর্ষণ এবং G-এর হ্রাস ছাড়া অন্য কোন কারণে চাঁদের পর্যায়কালের বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা। সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে সৌরজগতে কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহের প্রভাব, সূর্য থেকে আগত তড়িতাহিত কণাসমূহের ঝঞ্ঝা (wind), সূর্যালোকের বিকিরণ চাপ, উল্কাপাত, চাঁদের কাছ দিয়ে যাওয়া কোন ধূমকেতু এবং গ্রহাণুপুঞ্জের মহাকর্ষীয় প্রভাব প্রভৃতি। এই সব কয়টি কারণের ফলে চাঁদের পর্যায়কালের বৃদ্ধির হারের যে ঊর্ধ্বসীমা হবে বলে আশা করা হয়, তা চাঁদের পর্যায়কাল বৃদ্ধির নির্ণীত হারের তুলনায় খুবই কম। আর একটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা হয়েছে; তা হল সূর্যের ভর হ্রাস। যে কয়টি পদ্ধতিতে সূর্যের ভর হ্রাস পেতে পারে, তাদের সব কয়টির জন্যে সূর্যের মোট ভর হ্রাস এবং ফলে চাঁদের পর্যায়কালের বৃদ্ধি গণনা করলে দেখা যায় যে, তা নক্ষত্রের গ্রহণসংক্রান্ত পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত পর্যায়কালের বৃদ্ধির তুলনায় অন্ততঃ 30 ভাগ কম। সুতরাং আমরা সঙ্গতভাবেই মনে করতে পারি যে, চাঁদের পর্যায়কালের যে বৃদ্ধি পরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা কোন পরিচিত ঘটনার সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নয় এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের হ্রাসই এর কারণ।

G-এর পরিবর্তনশীলতার বিরুদ্ধে—মহাকর্ষ হ্রাস পাচ্ছে—এই তত্ত্বের সমালোচকেরা বলেন যে, যদি মহাকর্ষ সত্যই হ্রাস পায় তবে অতীতে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব অনেক কম ছিল। ফলে তখন পৃথিবীর তাপমাত্রা এখনকার থেকে অনেক বেশী হবার কথা। কিন্তু এমন কোন আস্থার কথা জানা যায় নি।

1918 খৃষ্টাব্দে টেলার প্রথম ডিরাকের মহাকর্ষীয় ধ্রুবক হ্রাস প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেন। ব্রহ্মাণ্ডের বয়স 2 ইকন (1 ইকন $= 10^9$ বছর) ধরে টেলার দেখান যে, তাঁর গণনা অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় $(2-3) \times 10^8$ বছর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছিল জলের স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি। এই অবস্থা প্রাণীর বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ঐ সময়ে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, উক্ত সময়ে পৃথিবীর তাপ-মাত্রা আরও কম ছিল এবং G-এর মানের হ্রাস হয় নি।

টেলারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর জ্যোতির্বিদেরা জানান যে, ব্রহ্মাণ্ডের বয়স 2 ইকন নয় 10 ইকন। বর্তমানে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ধরা হয় 9·25 ইকন। কিন্তু তা হলেও G-এর হ্রাসের তত্ত্ব সমর্থিত হয় না। অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানীও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু সম্প্রতি নাসার (NASA) দুই বিজ্ঞানী চাও-ওয়েন-চিন (Chao-Wen-Chin) এবং রিচার্ড স্টোথারস (Richard Stothers) এঁদের যুক্তির বিরোধিতা করে বলেন যে ডিরাকের তত্ত্বানুযায়ী অতীতে সূর্য এখনকার তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ ছিল, ফলে পৃথিবী তখন সূর্যের অধিকতর নিকটবর্তী হলেও পৃথিবীর তাপ-মাত্রা এখনকার চেয়ে খুব বেশী ছিল না এবং প্রাণীর বসবাসের পক্ষে উপযুক্তই ছিল। সুতরাং টেলার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গণনার ফলে ডিরাকের প্রস্তাবনা ভ্রান্ত বলে গণ্য করা যায় না।

G হ্রাস সংক্রান্ত ডিরাকের প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে। তা হল এই যে, ডিরাকের এই প্রস্তাবনার ফল হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট নিউক্লিয়নের (nucleon) (অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা) ধ্রুবক। এই সংখ্যা হল 10^{80}। এই সংখ্যা ডিরাক প্রস্তাবিত এককে অর্থাৎ পারমাণবিক এককে প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়সের (10^{40}) বর্গের সমান। সুতরাং যে যুক্তিতে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট নিউক্লিয়নের সংখ্যা সময়ের বর্গের সমানুপাতে বৃদ্ধি পাবার কথা। ডিরাক বলেন দু-ভাবে নিউক্লিয়নের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রথমতঃ নতুন নতুন নিউক্লিয়ন সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ নতুন নতুন নিউক্লিয়ন সৃষ্টি হচ্ছে কেবলমাত্র সেখানে, যেখানে পদার্থের উপস্থিতি রয়েছে এবং সৃষ্টির হার উপস্থিতি রয়েছে এবং সৃষ্টির হার উপস্থিত পদার্থের ভরের সমানুপাতী। চাঁদ কর্তৃক নক্ষত্রের গ্রহণ এবং প্রাচীনকালে পৃথিবীর তাপমাত্রার মানসংক্রান্ত তথ্যাদি দ্বিতীয় পদ্ধতিকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। যাই হোক, পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে—এই বিষয়টি ডিরাকের প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি, কারণ পদার্থের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী পদার্থের সৃষ্টি বা বিনাশ হতে পারে না। আর যদিও বা হয়, তবে তার হার সময়ের বর্গের সমানুপাতী কেন? যদি নতুন নতুন নিউক্লিয়ন সৃষ্টি হয়, তবে কেলাসের গঠন অপরিবর্তিত থাকে কিভাবে? এই সমস্যার সমাধানের জন্যে টমাস সি. ভ্যান ফ্লানডার্ণ (Thomas C. Van Flandern) প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যদিও যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, তবুও এ থেকে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে পদার্থের সৃষ্টি না হলেও পদার্থের আপাত সৃষ্টি হতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক বস্তুকণা অন্য বস্তুকণাগুলিকে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রানুযায়ী আকর্ষণ করে এবং বস্তুর জড়ত্বীয় ভর ও মহাকর্ষীয় ভর সমান হয়। ক্লানডার্ণ বলেন ধরা যাক, মহাকর্ষকে কোনভাবে আবদ্ধ (shield) করা যায়; যেমন—যদি কোন বস্তু এত বেশী ঘন হয়ে পড়ে যে, বস্তুকণাগুলির মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বস্তুকে ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না, তবে বস্তুর মহাকর্ষীয় ভর ও জড়ত্বীয় ভর সমান হবে না। এক্ষেত্রে বস্তুর জড়ত্বীয় ভর বস্তুর মোট নিউক্লিনের সংখ্যার সমানুপাতী হবে কিন্তু বস্তুর মহাকর্ষীয় ভর বস্তুর যে অংশ মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে আবদ্ধ করে রেখেছে তার বাইরের অংশে অবস্থিত নিউক্লিয়ন সংখ্যার সমানুপাতী হবে। অবশ্যই সাধারণ বস্তুর ক্ষেত্রে এরকম হয় না, তবে কোন কোন তারকার অভ্যন্তরে হতে পারে। এখন যদি G-এর মান হ্রাস পায় তবে বস্তুর প্রসরণ হবে, কারণ G-এর হ্রাসের ফলে বস্তুর অসংলগ্ন হবার তার হ্রাস পায়। এই প্রসরণের ফলে বস্তুর ঘনত্ব হ্রাস পাবে এবং বস্তুর যে অংশ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রকে আবদ্ধ করে রেখেছিল, তার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বস্তুর মহাকর্ষীয় ভর বৃদ্ধি পাবে। কারণ এক্ষেত্রে বেশী সংখ্যায় নিউট্রন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন পদার্থের সৃষ্টি না হলেও আবদ্ধ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় বস্তুর মহাকর্ষীয় ভর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বস্তুর ভরের বৃদ্ধি ডিরাকের প্রস্তাবনা অনুযায়ী যা হওয়ার কথা অর্থাৎ সময়ের বর্গের সমানুপাতী হবে, কারণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আবদ্ধকারী তলের ক্ষেত্রফল উপরিউক্ত পদ্ধতিতে সময়ের বর্গের সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। স্পষ্টতঃই উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রকৃতপক্ষে নতুন কোন নিউক্লিয়নের সৃষ্টি হচ্ছে না বলে বস্তুর ভরের বৃদ্ধি হলেও কেলাসের গঠনের কোন পরিবর্তন হবে না। ক্লানডার্ণের এই ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এই ব্যাখ্যা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নতুন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া ডিরাকের প্রস্তাবনার অন্যতম অনুসিদ্ধান্ত হওয়ায় শুধুমাত্র কি ভাবে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে না পারার জন্যে ডিরাকের প্রস্তাবনা বাতিল বলে গণ্য করা যায় না।

G হ্রাস পাচ্ছে—এই তত্ত্বের বিরোধীদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল G-এর হ্রাস কি সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আমরা জানি যে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী G-এর মান অপরিবর্তিত থাকে। আমরা দেখেছি যে, মহাকর্ষসম্বন্ধীয় কয়েকটি বিকল্প তত্ত্ব রয়েছে, যেগুলিতে G হ্রাস পাচ্ছে ধরা হয়। এখন প্রশ্ন হল যেহেতু G-এর মান সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী ধ্রুবক, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরিবর্তে অন্য তত্ত্বগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ আছে কিনা? এই সব প্রশ্নের অবসান ঘটবে যদি সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্র সংরক্ষিত রেখেও G-এর মান হ্রাস ব্যাখ্যা করা যায়। 1940 খৃষ্টাব্দের ই. এ. মিলনে (E. A. Milne) এরূপ একটি ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন G-এর মান হ্রাসের ফলে প্রসরণশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং পদার্থের পারমাণবিক গঠনের পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য সব সময় ধরা পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যদি পরমাণুর কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হ্রাস পায় এবং ঘূর্ণনের পর্যায়কালও হ্রাস পায় তবে আমাদের দৈর্ঘ্য ও সময় পরিমাপের এককগুলি এবং ফলে পারমাণবিক ঘড়ি নির্দেশিত সময়ও পরিবর্তিত হবে। এ অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসরণশীল এবং G হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এইভাবে মিলনে G-এর হ্রাস

ও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করেন।

সাম্প্রতিক অভিমত—সাম্প্রতিক কালে হয়েল (Hoyle) সূর্যের প্রারম্ভিক রাসায়নিক গঠন পর্যালোচনা করেন এবং দেখেন যে, তা মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের হ্রাস তত্ত্বকে সমর্থন করে। কয়েকজন জ্যোতির্বিদের মতে মঙ্গল এবং চাঁদের ভূত্বকের (crust) বড় বড় চ্যুতিগুলির (rift faults) কারণ সৃষ্টির পর থেকে এগুলির প্রসরণ, সম্ভবতঃ যখন তাদের অভিকর্ষ মহাকর্ষীয় ধ্রুবক হ্রাসের ফলে হ্রাস পায়।

আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চলে (interstellar space) বহুসংখ্যক যুগ্ম-তারকা (doublestar) রয়েছে। এই সংখ্যা, যুগ্ম-তারকা সৃষ্টির তত্ত্বানুযায়ী যুগ্ম-তারকার যে সংখ্যা হওয়ার কথা, তার চেয়ে বেশী। যদি G-এর হ্রাসের ফলে এই নক্ষত্রগুলির কক্ষপথ কয়েক শত কোটি বছর ধরে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধরা হয় তবে এই অসঙ্গতির একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সম্প্রতি দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী সিংহ ও শিভরাম (Sinha & Sivaram) বলেছেন যে, মহাকর্ষ দুই প্রকার—প্রবল মহাকর্ষ (strong gravity) এবং দুর্বল মহাকর্ষ (weak gravity)। প্রবল মহাকর্ষ পদার্থের পারমাণবিক ধর্মাবলীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। দুর্বল মহাকর্ষ নিউটনের মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G দ্বারা নির্ণীত হয় এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাঁদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময় এই দুই মহাকর্ষ পরস্পর সমান ছিল। তারপর থেকে প্রবল মহাকর্ষ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এবং দুর্বল মহাকর্ষ অর্থাৎ G হ্রাস পেয়েছে।

G পরিবর্তনের হার নির্ণয়—চাঁদ কর্তৃক নক্ষত্রের গ্রহণসংক্রান্ত পরিমাপ ছাড়াও মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের পরিবর্তন নির্ণয়ের জন্যে দুটি পরীক্ষা বর্তমানে করা হচ্ছে। প্রথমটিতে পৃথিবীতে অবস্থিত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে লেসার রশ্মির ঝলক (pulses of laser light) চন্দ্রপৃষ্ঠে অ্যাপোলো মহাকাশযাত্রী কর্তৃক স্থাপিত প্রতিফলকগুলির (retroreflectors) কোন একটির দিকে পাঠানো হয় এবং প্রতিফলিত লেসার রশ্মি ঝলকগুলি ঐ একই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে গ্রহণ করা হয়। পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে চাঁদে অবস্থিত প্রতিফলকের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে লেসার রশ্মি ঝলকের যে সময় লাগে, তার দ্বারা চাঁদের দূরত্ব সরাসরি নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষার দ্বারা একই সঙ্গে চাঁদের পর্যায়কালের পরিবর্তন এবং চাঁদের কক্ষপথের বৃদ্ধি নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষার সাহায্যে শুধু যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যাবে তাই নয়, হয়ত শীঘ্রই এর সাহায্যে G-এর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলির সত্যাসত্য নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটিতে রেডারের সাহায্যে পৃথিবী থেকে বুধ এবং শুক্র গ্রহ দুটির দূরত্ব নির্ণয় করা হবে। প্রথম পরীক্ষার মত এক্ষেত্রেও গ্রহ দুটির পর্যায়কালের পরিবর্তন নির্ণয় করা হবে। এই পরীক্ষার সুবিধা এই যে, যেহেতু পরীক্ষাটিতে চাঁদের কোন ভূমিকা নেই, তাই টাইডাল ঘর্ষণের জন্যে কোন সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য এই পরীক্ষার অসুবিধা হল এই যে, গ্রহগুলির অনিয়মিত গঠনের (irregular topography) জন্যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলগুলির ব্যাখ্যা সংশয়াতীত হয় না।

G-এর পরিবর্তনের হার নির্ণয়ের জন্যে G-এর মান নির্ণয়ের প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতিগুলির ধাঁচে একটি পরীক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছেন রজার্স সি. রিটারের (Rogers C.

Ritter) নেতৃত্বে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী। এই পরীক্ষায় কয়েকটি কম ভরের বস্তু একটি কেন্দ্রীয় দণ্ডের (central shaft) সঙ্গে আটকানো থাকবে। সম্পূর্ণ তন্ত্রটি (assembly) কয়েকটি বেশী ভরের বস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। কেন্দ্রীয় দণ্ডটির সঙ্গে একটি উপযুক্ত তন্ত্র এমনভাবে আটকানো থাকবে যাতে বেশী ভরের বস্তুর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের ফলে কম ভরের বস্তুগুলি স্থানচ্যুত না হতে পারে; কিংবা স্থানচ্যুত হলেও তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে। এই তন্ত্রটি কেন্দ্রীয় দণ্ডটিতে যে বল প্রয়োগ করবে তার দ্বারা কম ও বেশী ভরের বস্তুগুলির মধ্যে পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে। উক্ত তন্ত্রটি কর্তৃক কেন্দ্রীয় দণ্ডটিতে প্রযুক্ত বলের পরিমাণের পরিবর্তন দেখা গেলে বোঝা যাবে যে, কম ও বেশী ভরের বস্তুগুলির পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের পরিবর্তন অর্থাৎ G-এর মানের পরিবর্তন হয়েছে। আশা করা হয় যে, এই পরীক্ষায় সূক্ষ্মতা হবে বছরে 10^{12} ভাগের মধ্যে কয়েক ভাগ মাত্র। এই পরীক্ষাটি বাস্তবে রূপ পেলে তা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবমুক্ত হবে।

উপসংহার—উপরের আলোচনায় দেখা গেল মহাকর্ষসংক্রান্ত নানা তত্ত্ব রয়েছে, যার কোনটি সম্বন্ধেই শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। কোন তত্ত্বই নিঃসংশয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে পারে নি। তাছাড়া এই সব তত্ত্বের কোনটিই কয়েকটি মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। যেমন, কেন দুটি ভর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে? মহাকর্ষকে কি কোন স্থানে আবদ্ধ (shielded) করা যায়? ঋণাত্মক মহাকর্ষের অস্তিত্ব কি সম্ভব? এই সব প্রশ্নের সদুত্তর কোন তত্ত্ব এখনও দিতে পারে নি। তাই মহাকর্ষ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাত্ত্বিক গবেষণা পদার্থ-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে আকর্ষণীয় বলে গণ্য হয়। কয়েক বছরের মধ্যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের পরিবর্তনের হার আরও সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যাবে এই সম্ভাবনা মহাকর্ষসম্পর্কীয় গবেষণার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

রোগ-নির্ণয়ে ট্রেসার পদ্ধতির প্রয়োগ

সত্যনারায়ণ চংদার*

পদার্থ-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিসীম। উদাহরণস্বরূপ রোয়েণ্টগেন (Rontgen)-এর এক্স-রে আবিষ্কারের কথা ধরা যেতে পারে। পদার্থ ও রসায়নবিদ্যায় বিভিন্ন রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রেও এক্স-রে যুগান্তর এনেছে। নিউক্লিয়র ফিশন যেমন হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর প্রলয়ঙ্কর আঘাত হেনেছে তেমনি পারমাণবিক চুল্লী বা নিউক্লিয়র রিয়্যাক্টরের মাধ্যমে এক নতুন শক্তির অনন্ত উৎসের সন্ধান পেয়েছে মানুষ। পদার্থবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ্মপ্রচেষ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব পারমাণবিক চুল্লী এবং ত্বরণযন্ত্র অর্থাৎ পার্টিক্ল্ অ্যাক্সিলারেটর তৈরি হয়েছে, সেগুলির অন্যতম কাজ হল বিভিন্ন রকমের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা। এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে, শিল্পে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় নানাভাবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হল ট্রেসার হিসাবে। চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ট্রেসার হিসাবে ব্যবহার—এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। কিন্তু তার আগে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি।

1940 সালের আগে থেকেই সাইক্লোট্রনের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা সুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় যেসব পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন করা হয়, সেগুলির একটি মুখ্য কাজ হল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন যৌগকে যদি চুল্লীর ভিতর প্রবেশ করিয়ে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয়, তবে তা থেকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এটি উল্লেখ্য যে, চুল্লীতে কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ ধরণের বিক্রিয়াই ঘটানো সম্ভব। সাইক্লোট্রন এবং অন্যান্য ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে যে সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হয়—মানব সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এই ব্যবহারিক প্রয়োগের মূলে আছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের দুটি ধর্ম—(1) তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে যে আল্‌ফা, বিটা অথবা গামা রশ্মি নির্গত হয়, সেগুলি কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কিছুটা শোষিত হয়, কিন্তু অতিসহজেই বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এই সব রশ্মির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণও মাপা সম্ভব; (2) সাধারণ আইসোটোপের যে সব রাসায়নিক ধর্ম আছে, সাধারণতঃ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মধ্যে তার সবগুলি বিদ্যমান, অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়াতে সাধারণ এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ একইভাবে অংশ গ্রহণ করে; কিন্তু তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে গাইগার কাউণ্টার অথবা অন্য কোনরূপ কাউণ্টারের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তরল অথবা গলিত পদার্থের প্রবাহ নির্ধারণে, বিভিন্ন যন্ত্রের ক্ষয়ের পরিমাপ করতে, নল অথবা হাইড্রলিক মেসিনের ছিদ্র বের করতে বিভিন্ন

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

খাদ্য এবং ওষুধ দেহে কিভাবে গৃহীত হচ্ছে অথবা গাছপালা সারের কতটা অংশ নিজের অঙ্গীভূত করছে, তা নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার প্রায় রুটিন কাজে দাঁড়িয়েছে।

ট্রেসার হিসাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক দিন হল চলে আসছে। এই ব্যবহার সাধারণতঃ রোগ নির্ধারণ এবং বিপাক (metabolism) সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রেই ব্যাপক। হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, 1945 সালের পর থেকে শতাধিক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু মাত্র পাঁচটি আইসোটোপ অন্য সমস্ত আইসোটোপের থেকে অনেক বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি হল যথাক্রমে ক্রোমিয়াম-51, আয়োডিন-131, ফসফরাস-32, আয়রন-59 এবং টেকনেসিয়াম-99। বিভিন্ন রোগ নির্ধারণে আইসোটোপ কিভাবে ব্যবহৃত হয় নীচের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে।

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সফল প্রয়োগ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নতুন পথ নির্দেশ করছে। বিশেষতঃ সাধারণ পদ্ধতিতে যেখানে রোগ নির্ণয় দুরূহ হয়ে পড়ে, সেখানে ট্রেসার পদ্ধতির সাফল্য খুবই আশাব্যঞ্জক। দু-একটি উদাহরণ থেকেই হয়তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মনে করা যাক, কোন রোগীর শরীরে রক্ত চলাচলের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন রোগীর বাহুতে শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এই সলিউশনে ট্রেসার হিসাবে দেওয়া হল সোডিয়াম-24, যা থেকে গামারশ্মি নির্গত হয়, একটা গামা-রে কাউন্টার রোগীর একটি পায়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হল। সোডিয়াম-24 থেকে নির্গত গামারশ্মিকে এই কাউন্টার মাপতে সক্ষম। রক্ত চলাচল যদি স্বাভাবিক হয় তবে খুব তাড়াতাড়ি এই কাউন্টার সোডিয়াম-24 থেকে বিকীর্ণ গামারশ্মিকে মাপতে পারবে। কাউন্টারের গণনার রেট খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যেই গণনার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হবে। কিন্তু রক্ত চলাচলে যদি গোলমাল থাকে, তবে কাউন্টারে গণনা খুব আস্তে আস্তে বাড়বে—তা থেকে বোঝা যাবে, রক্তের পায়ে পৌঁছতে অসুবিধা হচ্ছে। তারপর কাউন্টারকে দেহের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে ঠিক কোথায় গোলমালটি হচ্ছে, সেটি বের করা সম্ভব এবং তারপরে যথোপযুক্ত চিকিৎসা। এই পদ্ধতির সামান্য রদবদল করে হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং প্রক্রিয়াও সহজে লক্ষ্য করা যায়।

ট্রেসার আয়রন-59-কে মানুষের রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে লোহা মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে কি ভাবে জমা হয়, তা মজ্জা, প্লীহা ও যকৃৎ থেকে আয়রন-59 সংগ্রহ করে দেখা হয়েছে। রক্তাল্পতা, রক্তে, লোহিত কণিকার সংখ্যাধিক্য ঘটলে দেহের বিভিন্ন স্থানে আয়রনের এই বন্টনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'রিফ্রাক্টরী অ্যানিমিয়া' রোগ মজ্জার অপুষ্টি থেকে জন্ম নেয়। আয়রন-59 ট্রেসারের সাহায্যে দেখা গেছে যে, এই রোগীর লিভারে সাধারণ অবস্থা থেকে বেশী আয়রন পাওয়া যায়, কিন্তু মজ্জা যেখানে লোহিত কণিকার সৃষ্টি হয়, সেখানে লৌহের পরিমাণ কম।

'হোল বডি কাউন্টারে'র সাহায্যে এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, শরীরের ভিতরের লোহা দেহ থেকে খুব ধীরে ধীরে নির্গত হয়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই লৌহের নির্গমন সাধারণতঃ অন্ত্রের দেয়াল থেকে হয় এবং গড়ে এটি এক ঘন সেন্টিমিটার রক্তের সমতুল্য। কিন্তু রক্ত ও অন্ত্রের বিভিন্ন রোগে এই পরিমাণ বেড়ে যায় এবং হোল বডি কাউন্টারের সাহায্যে এই পরিমাণ নির্ণয় করে রোগ নির্ণয় অনায়াসে করা যায়।

ভিটামিন বি-12-এর একটি উপাদান হল

কোবাল্ট। সাধারণতঃ এটি লিভারে সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনমত রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এই ভিটামিনের ভিতরে ট্রেসার কোবাল্ট (কোবাল্ট-58,-57 অথবা-60) ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং 'হোল-বডি কাউন্টারে'র সাহায্যে এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এই পর্যবেক্ষণ থেকে শরীর সাধারণভাবে ভিটামিন বি-12 গ্রহণে সক্ষম না অক্ষম, তা বোঝা যায়। Pernicious anemia রোগনির্ণয় এই উপায়ে খুব সহজেই হয়।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অর্থাৎ রোগগ্রস্ত টিস্যুতে কয়েকটি উপাদানের বণ্টনের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। একে ভিত্তি করে শরীরের কোন স্থানে টিউমার হলে তাকে খুঁজে বের করা এবং ঠিক কোথায় টিউমার হয়েছে, তা গোচরে আনা সম্ভব। আয়োডিন খুব তাড়াতাড়ি থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে শোষিত হয় এবং থাইরক্সিন যৌগ হিসাবে সেখানে সঞ্চিত হয়। কাজেই এই গ্ল্যাণ্ডের কার্যধারা খুব সহজেই নির্দেশ করা যায় যদি সোডিয়াম আয়োডাইড সলিউশন (যাতে ট্রেসার আয়োডিন-131 আছে) শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত গামা-রশ্মি লক্ষ্য করা হয়। Scintillation camera অথবা Scanner-এর সাহায্যে দেখা গেছে যে, যে সব জায়গায় অস্বাভাবিক টিস্যু আছে, সেখানে আয়োডিন শোষিত হয় না। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের যে অংশে আয়োডিনের শোষণ স্বাভাবিক, সেখানে ক্যানসার হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম।

মস্তিষ্কে টিউমার হলে এই রোগ নির্ণয় করা এবং বিশেষতঃ টিউমারটি কোথায় হয়েছে, তা নির্ধারণ করা বেশ কষ্টকর। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, কতগুলি মৌল যেখানে টিউমার হয়েছে, সেখানে বেশী সঞ্চিত হয়। কাজেই এই সব মৌলের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যদি ব্যবহার করা হয়, তবে তার বণ্টন থেকে টিউমারের হদিশ পাওয়া সম্ভব। প্রথম পরীক্ষা করা হয় সিরাম অ্যালবুমিনে ট্রেসার আয়োডিন-131 যুক্ত করে। কিন্তু অনেক ভাল ফল পাওয়া যায় যখন পরবর্তীকালে পারদ-203 neohydrin-এর সঙ্গে ট্রেসার হিসাবে ব্যবহার করা হয় অথবা টেকনিশিয়াম-99 (Technetium-99) ব্যবহার করা হয় Pertechnate আয়ন হিসাবে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে শরীরে প্রবেশ করিয়ে তারপর Scintillation camera অথবা Multiple detector scanner দিয়ে টিউমারের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব।

শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের যেমন লিভার, কিড্নী প্লীহা প্রভৃতির কার্যক্ষমতা অসুস্থ অবস্থায় কিভাবে পরিবর্তিত হয় উপযুক্ত আইসোটোপের ব্যবহারে, তা বের করা সম্ভব। তাই যকৃত পর্যবেক্ষণের জন্যে সাধারণতঃ dye Rose Bengal ব্যবহার করা হয়, যাতে ট্রেসার হিসাবে থাকে আয়োডিন-131। প্লীহা পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ক্রোমিয়াম-51। অগ্ন্যাশয় দেখতে হলে ব্যবহার করা হয় সেলেনিয়াম-75 (Selenium-75)।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন কাজে লাগাবার জন্যে বিভিন্ন চুল্লী এবং ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উৎপাদন বেড়েই চলেছে। এই প্রসঙ্গে দু-একটি সংখ্যার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমে ধরা যাক, ফ্রান্সের কথা। 1967 খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স মোট 3,000,000 ডলার মূল্যের আইসোটোপ বিক্রয় করে এবং এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক বিদেশে রপ্তানী হয়। পূর্ব জার্মেনীর ড্রেসডেনের কাছে যে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কেন্দ্র আছে, সেখান থেকে 1958-68 সালের মধ্যে 30,000 টি মাল সরবরাহ করা হয়। ভারতবর্ষেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের চাহিদা যেমন বেড়ে চলেছে, উৎপাদনও চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। তাই

আমরা দেখতে পাই 1968 সালে বিক্রীত আইসোটোপের মূল্য 2,200,000 টাকা। এগুলির বেশীর ভাগই দেওয়া হয় চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প ও গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে। জাপানে 1959 সালে সেখানে অনুমোদিত সংস্থার সংখ্যা ছিল 50টি, 1968 সালে তা বেড়ে হয় 1540, আর এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই হয় শিল্প-সংস্থা অথবা হাসপাতাল। আমেরিকাতে প্রায় 100টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যারা ওষুধ, বিজ্ঞান ও শিল্পে ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন প্রকার আইসোটোপ সরবরাহ করে, যার মূল্য প্রতি বছর 50,000,000 ডলারেরও অনেক বেশী।

ভারতবর্ষে আইসোটোপ উৎপাদন করা হয় ট্রম্বের দুটি পারমাণবিক চুল্লীতে, যাদের নাম APSARA এবং CIR। এখান থেকে যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হয়, সেগুলি গবেষণা, শিল্প ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে সরবরাহ করা হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে ট্রম্বে থেকে লভ্য আইসোটোপের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী। বিশেষ অসুবিধা না থাকলে প্রয়োজনমত নতুন কোন আইসোটোপ তৈরি করার ভার ট্রম্বে গ্রহণ করে। সাধারণভাবে যে সব আইসোটোপ চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তার অনেকগুলিই ট্রম্বে থেকে পাওয়া যায়। ক্রোমিয়াম-51 পাওয়া যায় সোডিয়াম ক্রোমেট হিসাবে, মার্কারী-203 ট্রেসার পাওয়া যায় neo-hydrin-এ, আয়োডিন-131 পাওয়া যায় সোডিয়াম আয়োডাইড, ইনসুলিন ও রোজ বেঙ্গল হিসাবে। আয়রন-59 পাওয়া যায় ferric citrate হিসাবে, ফসফরাস-32 সরবরাহ করা হয় ফসফোরিক অ্যাসিডে, পটাশিয়াম-82 পটাশিয়াম ক্লোরাইডে, সোডিয়াম-28 সোডিয়াম ক্লোরাইডে এবং কোবাল্ট 58 পাওয়া যায় ভিটামিন বি-12-তে ট্রেসার হিসাবে। কলিকাতায় Variable Energy Cyclotron আর কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে। এই বিরাট প্রকল্পের এক অংশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে নির্দিষ্ট হবে—আশা করা যায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে চিকিৎসাক্ষেত্রে আইসোটোপ ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। মস্তিষ্ক, যকৃৎ, মূত্রাশয়, প্রভৃতি পরীক্ষা করার জন্যে আগে যে সব ট্রেসার ব্যবহার করা হত, তাদের অনেককেই স্থানচ্যুত করেছে স্বল্পস্থায়ী বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় ট্রেসার, যাদের অর্ধ-জীবন (half life) বারো ঘণ্টারও কম। যেমন হাড়ের জন্যে ব্যবহার করা হয় Sr-87, যার অর্ধ-জীবন মাত্র 2·8 ঘণ্টা। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিক ভয়ের ভাব আছে এবং এই ভয় নিতান্ত অমূলক নয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনিষ্টকারী ক্রিয়াকাণ্ডে যে শুধু মানুষের জীবনই বিপন্ন হতে পারে, তা নয়—ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। কাজেই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার অত্যন্ত সতর্ক হয়ে করা প্রয়োজন। আইসোটোপের ডোজ খুবই কম হওয়া উচিত। যে ট্রেসার ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই পদার্থ রোগীর শরীরে প্রবেশ করলে কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, সেদিকে নজর রাখতে হবে। রোগীর আত্মীয়স্বজন বিশেষতঃ সন্তানের—ব্যবহৃত আইসোটোপের বিকিরণে অসুবিধা হবে কিনা, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। যে আইসোটোপ শরীরে প্রবেশ করানো হবে, তার নির্বীজকরণের দিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে ব্যবহার করার জন্যে যে সব অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্রপাতি দরকার হয়, অভিজ্ঞ লোক দিয়ে সেগুলির তত্ত্বাবধান করা একটি অবশ্য কর্তব্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে আরো নানাভাবে আইসোটোপ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হবে আশা করা যায়। বিজ্ঞানের তো সেখানেই সার্থকতা।

গবেষণা-সংবাদ

পরিবেশ দূষিতকরণ

যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতি পৃথিবীকে ক্রমশঃ জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূল করে তুলছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে এসম্বন্ধে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরা নূতন করে চিন্তা করছেন—কিভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। পরিবেশ দূষিতকরণ (environmental pollution) সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী গবেষণায় এই সচেতনতা ও ভাবনার প্রকাশ খুবই লক্ষণীয়। আমাদের দেশে এসম্বন্ধে খুব একটা কিছু কাজ হয়েছে বা হচ্ছে বলে জানা নেই। এ বিষয়ে বোম্বাই-এ ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক বরুণচন্দ্র হালদারের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ—যারা পরিবেশ দূষিতকরণে বিশেষ অংশ নিয়ে থাকে, তাদের মধ্যে পারদ ও পারদঘটিত যৌগগুলি অন্যতম। এদের মধ্যে আবার পারদের জৈব যৌগগুলি বিশেষ ক্ষতিকর। ক্ষার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর পরিমাণে পারদ ব্যবহার করে থাকে এবং তারা কারখানা থেকে যে আবর্জনা নদী বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে থাকে, তার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে পারদঘটিত যৌগ বর্তমান। অধ্যাপক হালদার দেখিয়েছেন যে, বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী সমুদ্রজলে এইভাবে পারদ-ঘটিত যৌগ নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে সামুদ্রিক মাছগুলি এই পারদ গ্রহণ করছে এবং এগুলি ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। সন্দেহ নেই—এই মাছ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে মানুষের দেহেও পারদ সঞ্চিত হচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত এর ফলে সাংঘাতিক কোন মহামারীর সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। তিনি দেখিয়েছেন বেশ কিছু ধরণের মাছে পারদের অস্তিত্বের পরিমাণ আন্তর্জাতিক গ্রহণীয় মাত্রার (প্রতি গ্রাম খাদ্যে 0·4 মাইক্রোগ্রাম পারদ) চেয়ে বেশ বেশী। এই অবস্থা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে মহারাষ্ট্র সরকার ক্ষার শিল্পগুলিকে তাদের আবর্জনা সমুদ্রে নিক্ষেপের পূর্বে পারদমুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর ফলরূপে কারখানাগুলি বেশ কিছু পরিমাণ পারদ ঐ আবর্জনা থেকে সংগ্রহ করছে এবং তা পুনরায় ব্যবহার করছে।

পুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়*

* বিশুদ্ধ রসায়নবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান

চায়ের বা মিষ্টির দোকানের উনুন প্রায় সব সময়েই জ্বলে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উনুনের মুখ (যেখানে আগুন জ্বলে) নীচের মুখের (যে পথে বায়ু প্রবেশ করে) তুলনায় অনেকটা উঁচুতে হয়ে থাকে। অনেক সময় আবার এই দু-মুখকে সোজাসুজি উপর-নীচে না রেখে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। ঐ বিশেষ ব্যবস্থায় নীচের মুখ দিয়ে বায়ু সোজা না ঢুকে সুড়ঙ্গপথে উনুনে প্রবেশ করে। এগুলির বিজ্ঞানসম্মত কারণ হয়তো দোকানীরা জানেন না—তবে এর উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁরা খুবই সচেতন। এখানে এই ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত কারণ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হবে।

নীচের মুখ দিয়ে উনুনে বায়ু প্রবেশ করে। ঐ বায়ুর অক্সিজেনই মূলতঃ দহনক্রিয়ায় সাহায্য করে। উনুনকে তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবে প্রজ্বলিত করতে হলে অক্সিজেনের প্রাচুর্য বিশেষভাবে দরকার হয়। উনুনের দুটি মুখের উচ্চতার পার্থক্য যত বেশী, ঐ দু-মুখের ভিতর বায়ু চাপের পার্থক্যও তত বেশী হয়; ফলে ঐ পথে বায়ুর পরিচলন স্রোতের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। উচ্চ-চাপের অঞ্চল থেকে নিম্ন-চাপের দিকে বায়ু উনুনের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে এবং প্রচুর পরিমাণে ছুটে যায়, যা উনুনের জ্বালানীর দহনক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং জ্বালানীর জ্বলবার মাত্রাকে বৃদ্ধি করে তোলে। মুখ দুটি খুব কাছাকাছি থাকলে, পরিচলন স্রোতের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কমে যায় এবং উনুন তখন আস্তে আস্তে জ্বলে। এ অবস্থায় উনুনের দহনক্রিয়ায় তৈরী কার্বন-ডাই-অক্সাইড উনুনের নীচের মুখের কাছে জমা হয়, ফলে উনুনের ভিতরে মুক্ত বায়ু সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়। নীচের মুখের তাপমাত্রাও আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। মুখ দুটি কাছাকাছি হওয়ায় তাদের ভিতর চাপের পার্থক্য যথেষ্ট কম হওয়ায় পরিচলন স্রোতের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়। তাই নীচের মুখে পাখা দিয়ে হাওয়া দেওয়ার মাধ্যমে বেশী পরিমাণ বায়ু সরবরাহ করে তাড়াতাড়ি উনুন ধরানো বা জোরে জ্বালানোর চেষ্টা হয়। রান্নাঘরের সাধারণ উনুন এভাবেই তাড়াতাড়ি ধরানো হয়। তখন উনুনেও তাপের উৎপত্তি বৃদ্ধি পায়—হাওয়া দেওয়ার জন্যে। এ ঘটনার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত।

তোলা উনুন ধরানোর সময় অধিক বায়ু পাওয়ার জন্যে একে ফাঁকা জায়গায় বসানো হয়। এমন ভাবে বসানো হয় যে, বায়ু প্রবাহ সোজাসুজি উনুনের নীচের মুখে প্রবেশ করে উনুনকে অর্থাৎ উনুনের জ্বালানীকে তাড়াতাড়ি ধরিয়ে যায়। বাইরে বায়ু প্রবাহের মাত্রা বেশী হলে, উনুনে বেশী পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করে এবং তখন উনুন তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রভাব এবং উনুনের উঁচু হওয়ার মাত্রা এড়ানোর জন্যে অথচ জোরে এবং তাড়াতাড়ি উনুন জ্বালাবার জন্যে অনেক সময় নীচের মুখের একই তলে সোজাসুজি এক-দেড় মিটার লম্বা একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়—যা নীচের মুখের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিচলনক্রিয়ায় বায়ু উনুনে ঢোকে।

কলকারখানার চুল্লীতে খুব দীর্ঘ চিমনি ব্যবহার করা হয়। এর কারণ দুটি। প্রথমতঃ এর সাহায্যে চুল্লীতে দহনক্রিয়ায় সৃষ্ট ধোঁয়া ও অন্যান্য গ্যাসকে উপরের বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে

দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয়তঃ এর মাধ্যমে উপরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐ পথে বায়ুর পরিচলন স্রোত বৃদ্ধি করা হয়—যার সাহায্যে জ্বালানী জোরে জ্বলে এবং চুল্লীর তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

বড় বড় বাড়ীতে উনুন ধরানোর সময় এর মুখ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঢেকে দেওয়া হয়। ঐ ব্যবস্থায় ঢাকনির একপ্রান্ত উনুনে এবং অপর প্রান্ত বড় নলের সঙ্গে (যা বাড়ীর ছাদের উপর পর্যন্ত দীর্ঘ) যুক্ত থাকে। ফলে ধোঁয়া ঘরের ভিতর আসে না এবং অন্যদিকে ঐ নলের উপর মুখ ও নীচ মুখের বায়ু-চাপের পার্থক্যের জন্যে বায়ু নীচের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে। নলের উচ্চতা যত বেশী হবে, বায়ু সরবরাহ তত বৃদ্ধি পাবে এবং উনুনের জ্বালানীও তত জোরে জ্বলবে। তবে ঐ নল অনেক বড় হলে তার ভিতর দিয়ে পরিচলন স্রোত সুরু হতে দেরী হবে। একারণে এজাতীয় চুল্লী জ্বালাবার সময় উনুনের মুখ ঢাকা দিয়ে নীচের মুখে কিছুক্ষণ জোরে হাওয়া করতে হয়। একবার পরিচলন স্রোত সুরু হলে সহজে উনুন নিভে যায় না—অবশ্য যদি জ্বালানী মজুত থাকে। মিষ্টির দোকান বা চায়ের দোকানেও উনুন ধরাবার সময় উপর নীচ কাটা কোন ড্রাম বা তেলের টিন উনুনের মুখে বসিয়ে হাওয়া দেওয়া হয়। ঐ ঢাকা দেওয়া অবস্থায় উনুনের মুখের গ্যাস ও কার্বন কণা চারদিকে বেরিয়ে না গিয়ে উপরের দিকে ওঠে। ফলে ঢাকা দেওয়ার ড্রাম বা টিনটির উচ্চতায় বায়ু ও উনুনের নীচের মুখের বায়ুর মধ্যে চাপের পার্থক্য ড্রাম বা টিন না থাকা অবস্থায় উনুনের দু-মুখের মধ্যে চাপের পার্থক্যের তুলনায় বেশী হয়; সেজন্যে নীচের মুখ দিয়ে বেশী পরিমাণে বায়ু উনুনে প্রবেশ করে এবং তখন উনুনটি তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে।

মিষ্টির দোকানে উনুন ব্যবহারের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, মিষ্টি তৈরি করবার সময় উপরের মুখে ঐ মুখের থেকে সামান্য বেশী ব্যাসের একটি লোহার মোটা চাকৃতি রেখে দেওয়া হয়। মিষ্টি তৈরির সময় কড়ার সব জায়গায় সমান তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। একারণে লোহার চাকৃতি দিয়ে উনুনের মুখ ঢেকে রেখে মিষ্টি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন কারণে উনুনের মুখের তাপমাত্রা সব জায়গায় সমান হয় না। তাই সুপরিবাহী অথচ কমদামী ধাতুর (লোহা) তৈরী পাত্‌ দিয়ে উনুনের মুখ ঢেকে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এ অবস্থায় উনুনের জ্বালানী জ্বলবার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন গ্যাস ও কার্বন কণা যাতে ঠিকমত বেরিয়ে যেতে পারে, তার জন্যে লোহার পাতের মাঝখানে একটি বড় ছিদ্র বা বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি ছিদ্র করে দেওয়া হয়।

সারাদিন উনুন জ্বলবার পর কাজের শেষে অনেক সময় উনুনকে না নিভিয়ে উনুনের মুখটি পাশাপাশি 2/3টি ইট দিয়ে চেপে রাখা হয়—ফলে পরের দিন নতুন করে উনুন ধরাতে হয় না। এ ব্যবস্থায় উনুনের আগুন একেবারে নিভে যায় না এবং পরে কম পরিশ্রমে উনুন জ্বালানো যায়। ইট দিয়ে ঢেকে রাখলে উনুনের দু-মুখের মধ্যে পরিচলন স্রোতের মাত্রাও একেবারে কমে যায় এবং ঐ সময় উনুনের জ্বালানী খুবই অল্পমাত্রায় খরচ হতে থাকে। এভাবে খরচ হতে হতে একেবারে শেষ হওয়ার আগেই আবার উনুন জ্বালাবার সময় এসে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উনুনে জ্বালানী জ্বলবার মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি করার জন্যে বা দহনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস ও কার্বন কণাগুলিকে দূরীভূত করার জন্যে যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহারিক জীবনে প্রযুক্ত হয়ে থাকে—সেগুলির প্রত্যের ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা রয়েছে।

বিজয় বল*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

নক্ষত্রের ক্রিয়া-বৈচিত্র্য ও আয়ুষ্কাল

অনেকদিন আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'দেবযান' বইটাতে পড়েছিলাম—যতীন যখন মারা গেল তখন তার পৃথিবীর বন্ধন খসে গেল, সে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ল বিশ্বপরিক্রমায়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, এক নক্ষত্রলোক থেকে অন্য নক্ষত্রলোকে। এস, আমরাও বেরিয়ে পড়ি ঐ রকম এক যাত্রায়।

না, না; বলছি না যে আমাদের সবাইকে মারা যেতে হবে। বলছি, শুধু, আজ চন্দ্রাভিযানের যুগে কল্পনা করতে বাধা নেই যে, আমরা যেন কোন একটা আকাশযানে করে ছুটে চলেছি পৃথিবী ছেড়ে, সৌর জগৎ ছেড়ে, অনেক অনেক দূরে। প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলেছি আমরা; দেখতে দেখতে সূর্য পিছিয়ে পড়তে লাগল আর ছোট হতে লাগল। একটু পরেই সূর্যকে দেখাতে লাগল অন্য যে কোন নক্ষত্রের মতই ছোট। তখন আর দিন রাত্রি বলে কিছুই রইল না; সবটাই শুধু রাত্রি। সেই অখণ্ড নিশ্ছিদ্র রাতে যে দিকে চাই না কেন, শুধু দেখা যাচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্র, যারা সব কবির ভাষায়, "আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী"।

প্রথম নজরে মনে হয় এরা সবাই আলোর বিন্দু, একটা থেকে অন্যটার বিশেষ কোন তফাৎ নেই। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে এদের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। এদের যে দুটি বৈচিত্র্য সবচেয়ে সহজে সাদা চোখে ধরা পড়ে, তা হল—দীপ্তি আর রং। প্রথমে দীপ্তির কথাই ধরা যাক। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে যে সব নক্ষত্রদের দেখা যায়, তারা হল দীপ্তির হিসাবে প্রথম (stars of the first magnitude)। তারপরে ক্রমশঃ যারা ফুটে উঠতে থাকে দীপ্তির বিচারে তারা হল দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি। এইভাবে নক্ষত্রদের যাকে যে শ্রেণীতে ফেলা হল সেটা কিন্তু তার আপাত দীপ্তি। তার প্রকৃত দীপ্তি অন্য রকম হতে পারে, কারণ দীপ্তি নির্ভর করে দুটি জিনিষের উপর—প্রথম সে কতটা আলো দিচ্ছে; আর দ্বিতীয়

সে কতটা দূরে আছে। যে কম আলো দিচ্ছে অথচ খুব কাছে আছে, তার দীপ্তি অনেক বেশী বলে মনে হতে পারে। তাই প্রকৃত দীপ্তি নির্ধারণ করার সময় বিজ্ঞানীরা হিসাব করে নেন যে, সব নক্ষত্রদের যদি পৃথিবী থেকে সমান দূরে রাখা যেত তখন কাকে কতটা উজ্জ্বল দেখাত। আমাদের সূর্য এই হিসাবে কিন্তু পঞ্চম দীপ্তির নক্ষত্র।

দীপ্তির পরে রঙের কথায় আসি। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সব নক্ষত্রের রং সমান নয়—কোনটা একটু বেশী নীলাভ, কোনটা বা একটু লাল্‌চে। আমরা জানি, সব নক্ষত্রই এক একটা সূর্য। সুতরাং আশা করা যেতে পারে, সূর্যের আলো প্রিজ্‌ম দিয়ে ভাঙ্‌লে যেমন রামধনুর সাতটা রং দেখা যায়, নক্ষত্রদের আলোও স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে ভাঙ্‌লে ঐ সাতটা রং-ই দেখা যাবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সাতটা রং আছে ঠিকই, কিন্তু কোনটাতে লাল রঙের জোর একটু বেশী, কোনটাতে কমলা রঙের, কোনটাতে বা নীলের। এর কারণ বুঝতেও খুব অসুবিধা নেই ; আসলে নক্ষত্রদের গায়ের তাপমাত্রা (surface temperature) সমান নয়। কামারশালে যখন লোহার পাত গরম করা হয়, তখন অপেক্ষাকৃত কম গরম অবস্থায় পাতটাকে লাল্‌চে দেখায় ; আরও গরম হলে ক্রমশঃ তাতে কমলা রং, হলদে রং ইত্যাদির ভাগ বাড়ে। নক্ষত্রদের বেলাতেও সেই রকম ঘটে। কাজেই রং দিয়ে তাদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বোঝা যায়। নীলাভ-সাদা নক্ষত্রদের বেলায় এই তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশী, প্রায় 30,000 ডিগ্রীর মত, আর লাল নক্ষত্রদের বেলায় সবচেয়ে কম, প্রায় 3,000 ডিগ্রীর মত।

তোমাদের যতক্ষণ নক্ষত্রদের দীপ্তি ও তাদের বর্ণালীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলাম, ততক্ষণে কিন্তু আমাদের আকাশযান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের লক্ষ্য বৃশ্চিক রাশিতে অ্যানটারেস (Antares) নক্ষত্রটি। এটি বেছে নিয়েছি কারণ যাঁরা আমাদের সূর্যের চেয়ে বড় আর বেশী দীপ্তিমান কিছু ভাবতে পারেন না, তাঁদের এই অ্যানটারেসকে জানা দরকার। অ্যানটারেসের ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে প্রায় চার-শ' গুণ এবং এর দীপ্তি সূর্যের দীপ্তির চেয়ে কয়েক হাজার গুণ। এটিকে বলা হয় একটি লাল অতিদানব (supergiant)।

অ্যানটারেসের কাছে গেলে দেখা যাবে, সে একলা নয়, তার একজন সঙ্গী আছে। নক্ষত্রদের এটাও একটা বৈচিত্র্য। অনেক নক্ষত্রই একলা নয়, জোড়ায় জোড়ায় তারা আকাশে নীড় বেঁধেছে। এদের বলে জোড়া নক্ষত্র (binary)। এই রকম আরেক জোড়া নক্ষত্রের নাম প্লাস্কেট (Plaskett) নক্ষত্র। এদের প্রত্যেকের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে অন্ততঃ 90 গুণ ; নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা 30,000 ডিগ্রীর মত। এদের মাঝের ব্যবধান আমাদের সূর্য ও শুক্রগ্রহের মাঝের দূরত্বের চেয়ে কম। এই রকম দুটি সূর্য পরস্পরের

চারপাশে সেকেণ্ডে 150 মাইলের চেয়েও বেশী গতিতে ঘুরছে। পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে এদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাস, যা পাক খেয়ে খেয়ে এদের চারপাশে একটা ওড়নার মত আবরণের সৃষ্টি করেছে।

প্লাস্কেটের নক্ষত্র ছেড়ে এবার আমরা যাই ডেল্‌টা কেফি (delta cephei -এর দিকে। এটি একটি ভিন্ন জাতের নক্ষত্র—একে বলা হয় পালসেটিং নক্ষত্র (pulsating star)। এটির আকার নির্দিষ্ট নয়, ছোট থেকে একটু একটু করে বাড়ে, আবার বড় থেকে একটু একটু করে ছোট হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে নক্ষত্রটির ব্যাস শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ বাড়ে-কমে। যখন সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এটি আকারে বাড়তে থাকে, তখন এর দীপ্তিও সবচেয়ে বেশী, আর যখন সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এটি আকারে কমতে থাকে, তখন এর দীপ্তি সবচেয়ে কম। এর এই নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যে প্রতিবার সময় লাগে 5 দিন 9 ঘণ্টা।

পরিবর্তনশীল নক্ষত্রদের কথায় মনে পড়ল আর একটির কথা। চল, একেও দেখে আসি। এর নাম অ্যাল্‌গল (Algol), এটি রয়েছে পারসিউস (Perseus) নক্ষত্রমণ্ডলে। ভোরের আকাশে শুকতারা যেমন স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে, অ্যালগলের চাহনী কিন্তু সে রকম নয়। প্রতি 2 দিন 21 ঘণ্টা পরে পরে অ্যালগল একবার করে চোখ টেপে, যেন কি একটা দুরভিসন্ধি আছে ওর মনে। তখন দেখা যায় হঠাৎ এর ঔজ্জ্বল্য কমতে আরম্ভ করেছে; কমতে কমতে এর স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে, তারপর আবার বাড়তে থাকে। এভাবে একবার চোখ টিপতে তার সময় লাগে প্রায় দশ ঘণ্টা। সাদা চোখে একে দেখা যায়। আরবেরা এর নাম দিয়েছিল 'শয়তানের মাথা'। অ্যালগলের কাছে গেলে দেখতে পাবে আসলে এটি একটি দ্বৈত নক্ষত্র। একজন সঙ্গী উজ্জ্বল সাদা রঙের, অপর জন ম্লান লাল রঙের। 2 দিন 21 ঘণ্টা পরপর ম্লান নক্ষত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ও আমাদের মাঝ দিয়ে একবার করে চলে যায়, ফলে সূর্যগ্রহণের মত একটা ব্যাপার ঘটে।

এতক্ষণ আমরা যে সব নক্ষত্রদের দেখছিলাম তারা সবাই সূর্যের চেয়ে অনেক বড়—দানব ও অতিদানব জাতের। এবার শ্বেত বামনদের (white dwarf) কথায় আসি। এদেরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এদের দীপ্তি খুবই কম। আমাদের সূর্য প্রতি মুহূর্তে যতটা তেজ ছড়াচ্ছে, এদের একজন ছড়াচ্ছে তার 50 হাজার ভাগের একভাগ। কিন্তু সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যেখানে 6000 ডিগ্রীর মত, সেখানে এদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 8000 থেকে 9000 ডিগ্রী। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, এদের তেজ কম অথচ তাপমাত্রা বেশী, তার মানে এদের আকার নিশ্চয়ই খুব ছোট; প্রায় আমাদের চাঁদের মত। অথচ অন্য যুক্তি থেকে বোঝা যায়, এদের ভর আমাদের সূর্যের চেয়ে কম হবে না। সব মিলিয়ে মানে দাঁড়াল এই যে, এরা এমন বস্তু দিয়ে তৈরী, যার ঘনত্ব জলের ঘনত্বের কয়েক কোটি গুণ। ভেবে দেখ একবার, লোহা জলের চেয়ে

4 গুণ ভারী, সীসা 11 গুণ ; সোনা 19 গুণ ; কিন্তু জলের চেয়ে কোটিগুণ ভারী কী সে জিনিষ ? পৃথিবীতে এ রকম অতিঘন (hyperdense) কোন বস্তু নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই শ্বেত বামনেরা হল সেই সব নক্ষত্র, যারা পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে অর্থাৎ আমাদের সূর্য যেদিন নিভে আসবে, সেদিন সে হবে একটা শ্বেত বামন ; সেদিন আসতে অবশ্য এখনও প্রায় এক হাজার কোটি বছর বাকী আছে।

এই প্রসঙ্গে নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। প্রথমে বলি— নক্ষত্র জীবনের প্রধান পর্যায়গুলি কি কি। নক্ষত্রের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন এবং সূক্ষ্ম বস্তুকণা মহাকাশে হাল্কা মেঘের আকারে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। কখন কখন তাদের মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন এই হাল্কা মেঘ ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠতে থাকে। তখন বস্তুকণাদের মাঝে অভিকর্ষ, অন্যান্য নক্ষত্রের আলোর চাপ, চৌম্বক শক্তি ইত্যাদির সাহায্যে এই ঘনীভবন (condensation) ক্রমশঃই আরো তাড়াতাড়ি হতে থাকে। এই প্রথম পর্যায়কে বলে দ্রুত ধস্ পর্যায় (rapid collapsing)। এই পর্যায়ে একটি নক্ষত্র খুব দীর্ঘ সময় থাকে না ; কমবেশী বছর দশেক। আমাদের সূর্য যখন এই পর্যায়ের সুরুতে ছিল তখন তার বিস্তৃতি ছিল প্লুটো পর্যন্ত ; শেষে দাঁড়াল বুধগ্রহ পর্যন্ত। সময় লেগেছিল প্রায় বিশ বছর। ধস্ পর্যায়ের শেষে নক্ষত্র বেশ কিছুটা গরম হয়ে ওঠে এবং প্রথমে অদৃশ্য অবলোহিত আলো এবং পরে দৃশ্য আলো ছড়াতে থাকে। দূর থেকে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা দেখেন, অন্ধকার কোন মেঘের মাঝে একটা নতুন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছে।

এরপর সুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের, যার নাম সঙ্কোচন (contraction)। এই পর্ব চলতে থাকে অনেক দিন ধরে। আমাদের সূর্যকে এই সঙ্কোচনের ফলে তার বর্তমান আকারে এসে পৌঁছতে সময় লেগেছিল 5 কোটি বছর। সূর্যের চেয়ে যে নক্ষত্রের ভর 10 গুণ বেশী তার সঙ্কোচন পর্যায়-এ সময় লাগে অনেক কম, এক লক্ষ বছরের মত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে নক্ষত্রের ভিতরের তাপমাত্রা যখন 10 লক্ষ ডিগ্রীর মত দাঁড়ায় তখন তার ভিতরেই পরমাণুচুল্লী জ্বলে ওঠে, সুরু হয় হাইড্রোজেনের পারমাণবিক দহন (nuclear burning)। নক্ষত্র যেন বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করে এবার যৌবনে প্রবেশ করল। নক্ষত্র জীবনের এই হাইড্রোজেন দহনের পর্যায়টাই সবচেয়ে বড়। নক্ষত্রদের মধ্যে যারা একটু হিসাবী, যেমন আমাদের সূর্য, তারা তাদের মজুত হাইড্রোজেন যে হারে খরচ করে তাতে তাদের হাজার কোটি বছরের মত চলে। যেসব নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে আন্দাজ 10 গুণ বেশী, তারা তাদের জ্বালানী বেশীমাত্রায় খরচ করে, ফলে তাদের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি ; প্রায় 1 হাজার কোটির জায়গায় 1 কোটি বছরেই তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

নক্ষত্রের পারমাণবিক শক্তির উৎস যখন ফুরিয়ে আসে, তখন সে খুব জোরে জ্বলে ওঠে এবং আর একবার তার সংকোচন সুরু হয়। তাকে বলে নোভা (nova)। সূর্যের চেয়ে যে সব নক্ষত্রদের ভর অনেক বেশী, তাদের ক্ষেত্রে সুপারনোভা (supernova) বিস্ফোরণ দেখা যায়— যার শেষে সে পরিণত হয় একটা নিউট্রন নক্ষত্রে (neutron star), যার ঘনত্ব শ্বেত বামনের ঘনত্বের চেয়েও বেশী।

আমাদের মহাবিশ্ব পরিক্রমা শেষ হল। এবার আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে যাই। ফেরার পথে যদি কোথাও দেখতে পাও শীতল, কঠিন, প্রায় দীপ্তিহীন, অতিঘন কোন বস্তুপিণ্ড যার ব্যাস কয়েক কিলোমিটারের বেশী নয়, তাহলে জানবে ওটা একটা নিউট্রন নক্ষত্র, একদিন সে ছিল একটা সূর্য, আমাদের সূর্যের চেয়েও অনেক বড়। একদিন তার তেজে হয়ত কোন পৃথিবীতে দিন রাত্রি হত; হয়ত সে সৃষ্টি করেছিল প্রাণ, সৃষ্টি করেছিল সভ্যতা। কে জানে হয়ত আমাদেরই মত মানুষেরা তাদের কয়েক কোটি পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে মহাকাশের বুকে বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেছে।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা-700 009

বাষ্পশক্তির ইতিকথা

সবাই জানে, জেমস ওয়াট 1765 সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। কথিত আছে, তিনি একদিন দেখলেন উনুনে চাপানো কেটলির জল ফুটছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তার ঢাক্‌নাটি গরম বাষ্পের চাপে। প্রচণ্ড শক্তির উৎস নাকি এইভাবেই তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সত্যিই কি তিনি প্রথম মানুষ, যিনি সবার আগে বাষ্পশক্তির স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন? নাকি নিজে একজন শিল্পপতি ছিলেন বলেই সাবেকী ঢিলেঢালা উৎপাদন ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন চেয়েছিলেন?

প্রশ্নটা এজন্যেই মনে জাগে যে, ইতিহাসেরও একটা ইতিহাস থাকে। জেমস ওয়াটের অনেক আগে মহাবিজ্ঞানী নিউটন তৈরি করে গেছেন এক আশ্চর্য বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নকশা, যা দিয়ে অনায়াসে চালানো যেত স্বয়ংক্রিয় চক্রযান।

ভারী সুন্দর নকশা। বয়লারে জমে-ওঠা উচ্চচাপের বাষ্প তীব্রবেগে বেরোতে থাকবে পিছন দিক দিয়ে, গাড়ী ছুটবে উল্টো দিকে, অনেকটা রকেটের কায়দায়। বাষ্প বেরোবার

নলের মধ্যে থাকবে নিয়ন্ত্রক ভাল্‌ব, গাড়ীর গতিবেগ বাড়ানো-কমানোর জন্যে। চিত্রটির (চিত্র-1) সাহায্যে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে।

চিত্র-1—নিউটনের নকশা
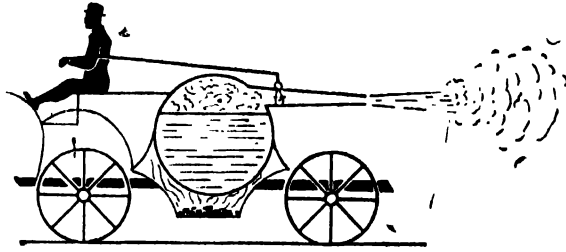
দুঃখের বিষয়, নিউটন পরিকল্পিত ঐ আশ্চর্য ইঞ্জিন আর বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। তবে জেমস ওয়াটের অনেক আগে থেকেই যে বাষ্পশক্তির কথা জানা ছিল, ঘটনাটি তার সাক্ষ্য বহন করছে। নিউটন যখন ঐ নকশাটি তৈরি করেন তখন ওয়াটের জন্মই হয় নি।

কিন্তু নিউটনও পথিকৃৎ নন। আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে আরও বহুযুগ। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হেরন (Heron of Alexandria) তৈরি করেছিলেন একটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। চিত্রটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তার কলাকৌশল (চিত্র-2)।
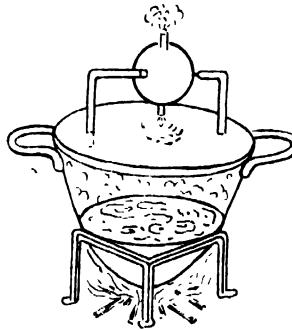
চিত্র-2—হেরনের মেশিন

অনুভূমিক (horizontal) দণ্ডের মাঝখানে একটি ফাঁপা ধাতব গোলক। দু-পাশে খাড়া (vertical) দুটি নলের উপর দণ্ডটি দাঁড় করানো। একটি নল বয়লারের মধ্যে ঢুকানো, তার ভিতর দিয়ে তপ্ত বাষ্প এসে জমছে গোলকে। গোলকটির সরু মুখ দিয়ে ঐ বাষ্প তীব্রবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে সেটি বনবন করে ঘুরছে।

সে যুগে হেরনের এই মেশিনটি ছিল একটি মজাদার খেলনা। সেটাই স্বাভাবিক। অমন একটা চমকপ্রদ আবিষ্কারকে উৎপাদনের কাজে লাগাবার মত সামাজিক পরিস্থিতি

তখন কি করে দেখা দেবে? রোম সাম্রাজ্যে দাসশ্রম এত অঢেল আর সস্তা ছিল যে, বাষ্পশক্তি ব্যবহারের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হল যুগান্তকারী শিল্পবিপ্লবের জয়যাত্রা। অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়ে যেতে লাগল পণ্যের চাহিদা। সাবেকী উৎপাদন পদ্ধতি কিছুতেই সে চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। জেমস ওয়াটের বিরাট কৃতিত্ব এখানেই যে, মানব সভ্যতার ক্রান্তিকালে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তিনি আবিষ্কার করলেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন।

শৈলেশ সেনগুপ্ত*

---

* 20 দাসপাড়া লেন, মোরপুকুর, পোঃ রিষড়া, হুগলী

বরফ

জলকে জমালেই বরফ মেলে। কিন্তু বরফ যে কত অদ্ভুত ব্যবহার করে, তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এবার সে কথাই বলব।

তোমরা জান বরফ জলে ভাসে, কিন্তু কেন ভাসে জান? কারণটা তো খুবই সহজ, বরফ জলের চেয়ে হাল্কা। কিন্তু এটা বরফের এক আশ্চর্য ধর্ম। যে কোন ধাতু গলিয়ে সেই তরলীভূত ধাতুর মধ্যে একটা ধাতুর টুক্‌রো ফেললে টুক্‌রোটা সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায়। এর কারণ হল—যে কোন ধাতুর কঠিন অবস্থার ঘনত্ব, তরল অবস্থার ঘনত্ব অপেক্ষা বেশী—যার ফলে ধাতুটা ডুবে যায়। আর বরফ কঠিন হলে হাল্কা হয়ে যায়।

এখানেই শেষ নয়, বরফ নিয়ে আরও মজা আছে। জল থেকে বরফ হয় তো; আচ্ছা বল তো 0^0 C তাপমাত্রায় 11 C.C. জল জমে কতটা বরফ হবে? কি বললে—11 C. C.-ই হবে? না, আসলে বরফ হবে 12 C.C. আর এই জন্যেই বরফ জলের থেকে হাল্কা।

তোমরা জান বরফ 0^0 C তাপমাত্রায় গলে জল হয়। কিন্তু চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারে এমন এক বরফ তৈরি করেছেন, যা 192^0 C তাপমাত্রায় গলে। অবশ্য এক্ষেত্রে সাধারণ বাতাসের চেয়ে 32,000 গুণ বেশী চাপ দিতে হবে। আচ্ছা এবার তোমরাই বল এই বরফকে আমরা গরম বরফ বলতে পারি না? বরফ গলা নিয়ে আরও মজা আছে। বরফ তো বাতাসে রাখলে আপনিতেই গলে জল হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা কি জান, এক গ্রাম বরফ গলাতে যে তাপ লাগে

তার পরিমাণ, অন্য যে কোন পদার্থের এক গ্রাম গলাতে যে তাপ লাগে তার চেয়ে বেশী? এই তাপ আবার থার্মোমিটারে মাপা যায় না। তাই এই তাপকে বলে লীন তাপ। তাহলে এক কথায় বলা যায়, বরফ গলনের লীন তাপ সবচেয়ে বেশী।

আচ্ছা বল তো, আইসক্রীম খেতে কেন ভাল লাগে? এর কারণ—বরফের একটা নির্দিষ্ট গঠন আছে। যখন বরফ গলে, তখন সেই বরফ-গলা জলের অণুগুলি বরফের অণুর মতই বেশ কিছুক্ষণ সাজানো থাকে। এর ফলে বরফ-গলা জলের স্বাদ এবং উপকারিতা সাধারণ জল অপেক্ষা অনেক ভাল এবং বেশী।

বরফ নিয়ে অনেক কথা বললাম। এবার একটা মজার খেলা শিখিয়ে দিই। দু-টুক্‌রো বরফ দু-হাতে নাও। এবার বরফ দুটিকে খুব জোরে চেপে ধর। এবার চাপ ছেড়ে দাও। দেখবে দু-টুক্‌রা বরফ জুড়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে—তুমি যখন চাপ দিলে তখন বরফের গলনাঙ্ক কমে গেল আর খানিকটা বরফ গলে জল হল। আর যেই চাপ ছেড়ে দিলে, তখন আবার বরফের গলনাঙ্ক বেড়ে গেল আর ঐ জলটা জমে গেল। তার ফলে বরফ দুটি জমে গেল। এই খেলাটা দেখিয়ে তোমরা বন্ধুদের অবাক করে দিতে পার।

অমিতাভ চক্রবর্তী*

---

* গ্রাম+পোঃ কোদালিয়া, 24-পরগণা।

মডেল প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়বস্তুর উপর একটিমাত্র পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করে অংশগ্রহণ করতে পারে। মডেলের মৌলিকত্ব, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক (প্রয়োজনভিত্তিক) উৎকর্ষ, সংগঠন ইত্যাদির উপর প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ভর করবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত আবেদনপত্র সংগ্রহ করবার শেষ তারিখ 28শে ফেব্রুয়ারী, 1977 এবং মডেলসহ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 16ই মার্চ, 1977। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে আবেদনপত্র পরিষদের কার্যালয়ে বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জেনে রাখ

সাগরের জল লোনা কেন ?

সাগরের একেবারে নীচে যে স্তর আছে, তাকে 'সী-ফ্লোর' (Sea Floor) বা 'সাগরের মেঝে' বলা হয়। এই স্তরে সবসময় বিশেষ ধরণের ফাটল হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে লাভার স্তর আছে, তা থেকে গলিত শিলা, গলিত লাভা ও অন্যান্য গলিত পদার্থ ফাটলপথে উপরে উঠে সাগরের জলের সংস্পর্শে আসে। এদের মধ্যে লবণের পরিমাণ অনেক বেশী থাকায় সাগরের জল লোনা লাগে। এই লবণের পরিমাণ শতকরা প্রায় 3 ভাগ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, প্রায় চার কোটি বছর ধরে লবণের এই পরিমাণ বাড়েও নি, কমেও নি। সাগরের জলের উপাদানে শতকরা মোটামুটিভাবে জল—96·5 ভাগ, সোডিয়াম ক্লোরাইড 2·6 ভাগ, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড—0·3 ভাগ, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট—0·29 ভাগ, ক্যালসিয়াম সালফেট—0·13 ভাগ, পটাসিয়াম ক্লোরাইড—0·07 ভাগ, ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড—0·007 ভাগ এবং অবশিষ্ট যা কিছু থাকে, তা হল সিলিকা, আয়োডাইড প্রভৃতি।

সাগর সাতটি—কিন্তু লবণের পরিমাণ কত ?

পৃথিবীতে সাতটি সাগর আছে। এই সাত সাগরের জলে লবণের পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় 50 কোয়াড্রিলিয়ন টন অর্থাৎ 5-এর ডান দিকে 16টি শূন্য বসালে যা হবে, তত টন। এই লবণকে পৃথিবীর উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যদি সম্ভব হত, তাহলে লবণস্তূপের প্রায় 152·4 মিটার নীচে পৃথিবীর সমস্ত শহর, গ্রাম ডুবে থাকত।

সাগরের জলের পরিমাণ কত?

পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল—একথা ছোটবেলা থেকেই আমাদের জানা। সাত সাগরের জলের পরিমাণ কত, তা একটা হিসাব দিলে আন্দাজ করা যাবে। পৃথিবীর সমগ্রতল যদি হঠাৎ কোন কারণে একটি বলের আকার নেয়, তাহলে সমস্ত সাগরের জল তাকে ঢেকে ফেলবে। জলের 3·6 কিলোমিটার নীচে পৃথিবীর স্থলভাগটি ডুবে থাকবে। তাকে দেখাই যাবে না!

যুগলকান্তি রায়

ভেবে কর

1. একটি কারাগারে 100টি ঘরে 100 জন কয়েদী ছিল। রাজার জন্মদিনে তাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে তা কার্যকরী হবে এক অদ্ভুত উপায়ে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে সব কয়টি ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হয়, অর্থাৎ বলা যেতে পারে 1-এর অখণ্ড গুণিতক সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট দরজাগুলি খুলে দেওয়া হল। এরপর 2-এর অখণ্ড গুণিতক সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর 3 দ্বারা অখণ্ড বিভাজ্য সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট দরজাগুলিকে বিপরীত অবস্থায় করে দেওয়া হয়। এভাবে 4, 5, 6,········, 100 পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে দরজাগুলি ক্রমান্বয়ে খোলা বা বন্ধ করা হল। এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত কোন্ কোন্ দরজা খুলে যাবে ; অর্থাৎ কোন্ কোন্ ঘরের কয়েদী ছাড়া পাবে ?

2. মনে কর, কোন এক বিমান বন্দরে কয়েকটি বিমান আছে এবং বিমান চালানোর জন্যে পেট্রল আছে। কিন্তু একটি বিমানে যে পেট্রল ধরে, তা দিয়ে পৃথিবীর মাত্র অর্ধেক পথ পরিক্রমা করা যায়। কিভাবে সাহায্যকারী অন্য বিমান দিয়ে পেট্রল সরবরাহ করলে বিমানটিকে অন্য কোথাও না নামিয়ে পৃথিবীকে দ্রাঘিমা বরাবর একবার পরিক্রমা করা যাবে? সাহায্যকারী বিমানগুলির পক্ষে সেই পরিমাণ পেট্রল সরবরাহ করা সম্ভব, যাতে অবশিষ্ট তেলের সাহায্যে ঐ বিমানগুলি ফিরে আসতে পারে। পরিক্রমারত বিমানটির যতটুকু পেট্রল ফুরিয়েছে, শুধুমাত্র সেটুকু পেট্রল সরবরাহ করা যাবে। ন্যূনতম কয়টি সাহায্যকারী বিমানের দ্বারা এই কাজ সম্ভব হবে?

(1নং প্রশ্নের সমাধান 90 পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে এবং 2নং প্রশ্নের সমাধান পরের সংখ্যায় দেওয়া হবে)

দেবব্রত সরকার*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

3. P ও S দুটি কুণ্ডলী। এদের সাহায্যে দুটি আলাদা বর্তনী দেখানো হয়েছে (চিত্র)। P ও S-কে কাছাকাছি রেখে দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেঞ্জের সূত্রের সাহায্যে রোধ r-এ তড়িৎ-প্রবাহের দিক নির্ণয় কর :

(ক) কুণ্ডলী S-কে P-এর দিকে সরানো হয় ;

(খ) যখন পরিবর্তনীয় রোধ R-এ রোধের পরিমাণ কমানো হয়,

(গ) সুইচ K হঠাৎ খুলে দেওয়া হয়।
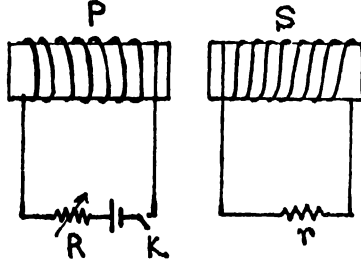
4. একটি মিলি অ্যাম্‌মিটারের রোধ 50Ω. মিটারটির পুরো স্কেলটিতে 50 মিলি-অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত দাগ কাটা আছে। এটি দিয়ে 10 ভোল্ট তড়িৎ-বিভব কি ভাবে মাপা যাবে?

(3নং প্রশ্নের সমাধান পরের সংখ্যায় দেওয়া হবে এবং 4নং প্রশ্নের সমাধান 91 পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে)

দুলালকুমার সাহা*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

গট ফ্রেট্‌ ভিল্‌হেলম্‌ লাইব্‌নিৎস্‌

[গণিত মানুষকে করে তোলে যুক্তিবাদী ও সকল বিষয়ে সুষ্ঠু চিন্তার অধিকারী]

জন্ম: 1লা জুলাই, 1646

মৃত্যু: 14ই নভেম্বর, 1716

মাধ্যমিক পরীক্ষার বেড়াজাল ছিন্ন করে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন উচ্চ-মাধ্যমিক বা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন গণিতের ছাত্র-ছাত্রীর পরিচয় ঘটে সম্পূর্ণ এক নুতন চিন্তাধারার সঙ্গে। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি নিয়েই গণিতের জগৎ নয়, গণিত এক বিরাট মহীরুহ, যার শাখা-প্রশাখার অন্ত

নেই। এই বিরাট মহীরুহের বা আধুনিক গণিতের ভিত্তিমূল হল কলনশাস্ত্র। কলন-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছাড়া উচ্চ-গণিতে, পদার্থবিদ্যায়, রসায়নবিদ্যায়, রাশি-বিজ্ঞানে, অর্থনীতিতে, কারিগরীবিদ্যায়, কম্পিউটার বিজ্ঞানে—এক কথায় আজকের বিজ্ঞান-ভিত্তিক দুনিয়ায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের আবিষ্কারক মহাজ্ঞানী নিউটনের সঙ্গে আর একজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি হলেন গট্‌ফ্রেট্‌ ভিলহেলম্‌ লাইব্‌নিৎস্‌ (Gottfried Wilhelm Leibniz)।

জন্ম 1646 খৃষ্টাব্দের 1লা জুলাই জার্মেনীর লাইপ্‌জিগ্‌ শহরে এবং মৃত্যু 1716 খৃষ্টাব্দের 14ই নভেম্বর, হানোভারে। 12 বছর বয়সেই মধ্যেই তিনি বহুভাষায় পারদর্শী হন এবং অনেকের মতে 15 বছর বয়সেই তাঁর জ্ঞানের পরিধি প্রায় পরিণত বয়সের বিজ্ঞানীদের সমতুল্য হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানী বেল বলেছেন—একজন গণিতজ্ঞ যে নিজের চেষ্টায় সমস্ত বিষয়েই পারদর্শী হতে পারেন, লাইব্‌নিৎস্‌ তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গণিতে, আইনে, ইতিহাসে, সাহিত্যে, ধর্মতত্ত্বে, রাজনীতিতে, ন্যায়শাস্ত্রে, দর্শনে, অধিবিদ্যায়; অর্থাৎ প্রায় সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী। লাইব্‌নিৎসের জীবন তাই চিরকালের এক বিস্ময়। অর্থের জন্যে তিনি একটি রাজ পরিবারের অধীনে প্রায় 43 বছর চাকরী করেন। তাই অনেকে মনে করেন, তিনি ঐভাবে জীবন না কাটালে হয়ত নিউটনের মতই বিজ্ঞান জগতে সম-মর্যাদায় আসীন থাকতেন। লাইব্‌নিৎসের দূরদৃষ্টি ছিল অনেক বেশী। যখন তাঁর বয়স মাত্র 20 বছর তখনই তিনি গণিতের সমস্ত শাখার একটি সার্বিক রূপ দেবার প্রকল্প তৈরি করেন। এই প্রকল্পে তিনি বিজ্ঞানের, বিশেষ করে গণিতশাস্ত্রের যুক্তিনির্ভর বিষয়কে সহজভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

প্যারিসে বিজ্ঞানী হাইগেনের কাছে তিনি গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এর পরেই তিনি বিজ্ঞানী প্যাস্কাল আবিষ্কৃত গণকযন্ত্র অপেক্ষা উন্নত ধরণের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। প্যাস্কালের যন্ত্রে কেবলমাত্র যোগ ও বিয়োগ করা যেত। লাইব্‌নিৎস্‌ আবিষ্কৃত যন্ত্রে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, এমনকি মূলাকর্ষণ-এর কলাকৌশলও জানা সম্ভব হত। 1673 খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে তিনি বিজ্ঞানী মারকেটরের আবিষ্কৃত পরাবৃত্তের বর্গীকরণ সম্পর্কীয় পদ্ধতির সঙ্গে অবহিত হন এবং পরবর্তী কালে এরই ফলস্বরূপ তিনি অসীম শ্রেণীসংক্রান্ত নানা জটিল তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন।

$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots\cdots,$——এটি গ্রেগরি শ্রেণী নামে পরিচিত হলেও আসলে এটি লাইব্‌নিৎস্‌-এর কাজের অংশবিশেষ। শুধুমাত্র এটি π-এর মান নির্ণয়েরই সহজ পদ্ধতি নয়; অযুগ্ম সংখ্যাগুলির সঙ্গে π-এর সম্বন্ধও এই শ্রেণী নির্দেশ করে।

প্যাস্কাল, ফার্মাট প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যে সম্ভাবনা তত্ত্বের অবতারণা করেন, লাইব্‌নিৎস্‌ তার পুনর্বিন্যাস করেন। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় তার সুষ্ঠু প্রয়োগ খুবই সুবিদিত।

লাইবনিৎসের্‌ সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কাজ হল—অনুকলন ও অন্তরকলনের উপর নানা সূত্রের আবিষ্কার। বিভেদক সহগ $\frac{dy}{dx}$ অঙ্কপাতনটি লাইব্‌নিৎসেরই দান। এ সময় থেকেই ইউরোপে বিভিন্ন মনীষীরা লাইব্‌নিৎসের নিয়মাবলীর উপর ভিত্তি করে কলনশাস্ত্রের উন্নতি ও বহুধা প্রয়োগের কথা চিন্তা করে গেছেন।

1700 খৃষ্টাব্দে লাইবনিৎস্‌ বার্লিন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর পুনর্গঠন করেন। তিনি তখন এর সভাপতি হন। বার্নস্‌উইক্‌ (Burnswick) রাজপরিবারের ইতিহাস প্রণয়নে এবং দার্শনিক চিন্তায় তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবদ্দশায় লাইব্‌নিৎসের দূরদর্শিতার প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় নি। আজ তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁকে স্মরণ করি—আধুনিক গণিতের অন্যতম পথপ্রদর্শক ও স্রষ্টা হিসাবে।

শ্রীরতন মোহন খাঁ*

* সিটি কলেজ, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-700 009

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান

1. মৌলিক সংখ্যাবিশিষ্ট দরজাগুলি বন্ধ থাকবে। কেননা, সেগুলিকে মাত্র দু-বার ভাগ করা যায়—1 দ্বারা এবং সেই সংখ্যাটি দ্বারা। সুতরাং প্রথমবার মৌলিক সংখ্যাবিশিষ্ট দরজাগুলি খোলা হবে এবং দ্বিতীয়বার বন্ধ হবে।

যৌগিক সংখ্যাগুলি দুই বা ততোধিক মৌলিক সংখ্যার গুণফল। মনে করা যাক, ab একটি যৌগিক সংখ্যা যা a এবং b—এই দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল। এর চারটি উৎপাদক যথাক্রমে 1, a, b, ab. কাজে কাজেই যৌগিক সংখ্যাবিশিষ্ট দরজাগুলিকে যুগ্ম সংখ্যকবার খোলা এবং বন্ধ করা হবে। সুতরাং ঐ দরজাগুলিও বন্ধ থাকবে।

এখন অবশিষ্ট থাকে সেই যৌগিক সংখ্যাগুলি, যেগুলি কোন মৌলিক বা যৌগিক সংখ্যার বর্গ; যেমন, a^2, $a^2 b^2$, a^4, $a^2b^2c^2$ ইত্যাদি। উপরিউক্ত উপায়ে এই সংখ্যাগুলিকে উৎপাদকে ভাঙলে দেখা যাবে তাদের অযুগ্ম সংখ্যক উৎপাদক আছে। সুতরাং উক্ত দরজাগুলি খোলা থাকবে।

সুতরাং, 1, 4, 9,…………, 81, 100 অর্থাৎ দশটি ঘরের দরজা শেষ পর্যন্ত খোলা থাকবে। অর্থাৎ, দশজন কয়েদী ছাড়া পাবে।

4. যখন মিটারটির মধ্য দিয়ে 1 মিলিঅ্যাম্পিয়ার মাত্রার তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন মিটারটির দুই প্রান্তে বিভব-প্রভেদ

$$\frac{1}{1000}\times 50 \text{ ভোল্ট}$$

এ অবস্থায় মিটারটির সূচক 1 দাগের উপর এসে দাঁড়াবে।

এবার তড়িৎ-বিভব মাপবার জন্যে মিটারটিকে ভোল্টমিটারে পরিবর্তিত করতে হবে। এজন্যে মিটারের সঙ্গে শ্রেণীসমবায়ে এমন মানের একটি নির্দিষ্ট রোধ যুক্ত করতে হবে যে, A এবং B প্রান্তের মধ্যে (চিত্র) 1 ভোল্ট তড়িৎ-বিভব অবস্থায় শুধুমাত্র
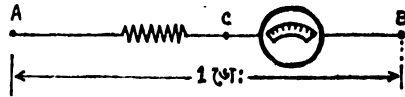
মিটারটির দু-প্রান্তের মধ্যে (B ও C বিন্দু) বিভব-প্রভেদ যেন

$$\frac{1}{1000}\times 50 \text{ ভোল্ট হয়;}$$

মিটারের সূচকটি তখন 1 দাগে গিয়ে দাঁড়াবে। এরূপে মিটারের স্কেলের দাগগুলি মিলিঅ্যাম্পিয়ারের জায়গায় ভোল্ট প্রকাশ করবে। নির্দিষ্ট রোধটির পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানা যায়:

মিটারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ

$$= \frac{\text{মিটারের দু-প্রান্তে বিভব-প্রভেদ}}{50} = \frac{\text{শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত রোধটির দু-প্রান্তের বিভব-প্রভেদ}}{\text{শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত রোধ}}$$

$$\therefore \text{ রোধ } = \frac{50\left(1-\frac{1}{1000}\times 50\right)}{\frac{1}{1000}\times 50}$$

$$= 950\Omega$$

সুতরাং মিটারটির সঙ্গে শ্রেণী সমবায়ে 950 Ω রোধ লাগালে 1 ভোল্ট থেকে 50 ভোল্ট মাপা যাবে। এথেকে সহজেই 10 ভোল্ট মাপা যায়।

জানুয়ারী, 1977, সংখ্যার 'ভেবে কর' প্রশ্নাবলীর 4 নম্বর প্রশ্নের সমাধান:

(a) 2 সে:; (b) স্ফুটনাঙ্কে; (c) বেশী; (d) সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল; (e) হোমোলগাস; (f) Cl_2.

মডেল তৈরি

(1)

কার্ডিওগ্রাফ

জীব-বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিভিন্ন প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দনের পদ্ধতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানার প্রয়োজন হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীর হৃদস্পন্দনকে লেখচিত্রের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব, তার নাম কার্ডিওগ্রাফ। এখানে একটি কার্যোপযোগী কার্ডিওগ্রাফ তৈরির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের দুটি মূল অংশ—(1) ঘুর্ণায়মান ড্রাম ও (2) লেখনী

ঘুর্ণায়মান ড্রাম :

এর জন্যে প্রয়োজন হয়—

(i) 6″ ব্যাসের চ্যাপ্টা টিনের কৌটো—1টি

(ii) 6″×6″×6″ মাপের কাঠের ব্লক—1টি

(iii) 24″ লম্বা এবং $\frac{1}{2}$″ ব্যাসের অ্যালুমিনিয়াম নল—1টি

(iv) 6″ " " $\frac{3}{4}$″ " " "—1টি

চাঁদা ও পেনসিল কম্পাস দিয়ে টিনের কৌটোর ঢাকনা ও তলার কেন্দ্রবিন্দু দুটি নির্ণয় করে ড্রিলের সাহায্যে ঐ কেন্দ্রবিন্দুতে একটি করে $\frac{1}{2}$″ ব্যাসের ছিদ্র করা হল।
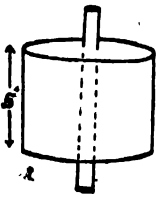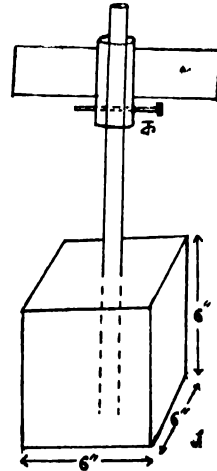
চিত্র 1

চিত্র 2

6″ দৈর্ঘ্যের অ্যালুমিনিয়ামের নলটি ঢাকনা ও তলার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যাতে কৌটোটি নলের সঙ্গে শক্তভাবে এঁটে থাকে (চিত্র 1)।

কাঠের ব্লকের মাঝবরাবর $\frac{1}{8}''$ ব্যাসের একটি ছিদ্র করে সেখানে 24" দৈর্ঘ্যের অ্যালুমিনিয়ামের নলটি লম্বভাবে বসানো হল। নল ও কাঠের ব্লকের মাঝখানে কিছুটা ভেজলিন মাখিয়ে নেওয়া হয়। ফলে নলটি খুব সহজে ঘোরানো সম্ভব হবে। চিত্র1-এর কৌটোটিকে লম্বভাবে বসানো নলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কৌটোর অ্যালুমিনিয়াম নল এবং লম্বভাবে বসানো নলের মধ্যে 1টি লম্বালম্বি ছিদ্র করে চিত্র 2-এর ক অংশের মত একটা নাটবল্টু এঁটে নিতে হবে; ফলে চ্যাপ্টা কৌটোটি লম্বা নলটির সঙ্গে শক্তভাবে এঁটে থাকবে (চিত্র 2)।

লেখনী : চিত্র 3-এর মত করে একটা লিভার তৈরি করা হয়। লিভারের গোড়ার দিকে ছিদ্র করে টিনের তৈরী গ চোঙটিকে (গ চোঙ লম্বা 1", ব্যাস $\frac{1}{4}''$) তার মধ্যে ঢুকিয়ে ঝালাই করা হয়। এ অবস্থায় চোঙটি লিভারের দু-দিকেই $\frac{1}{8}''$ করে বেরিয়ে থাকে। লিভারের ছোট বাহুর উপরের দিকে দুটি ছিদ্র করে রাখা হল। এবার একটি লম্বা সূচের প্রান্তভাগ সামান্য বেঁকিয়ে সেটিকে লিভারের লম্বা বাহুর সঙ্গে সেলোটেপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হল (চিত্র3)।

চিত্র 3
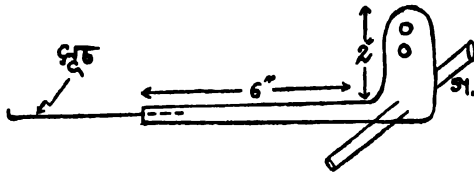
একটা 8"×4" প্লাইউডের টুকরোকে চিত্র4-এর মত করে কেটে নেওয়া হয়। এটির ঘ অংশে 1"×$1\frac{1}{2}''$ মাপের অন্য দুটি প্লাইউড লম্বভাবে পেরেক দিয়ে আটকাতে হবে। শেষোক্ত প্লাইউড দুটির উপরের দিকে $\frac{1}{4}''$ ব্যাসবিশিষ্ট দুটি ছিদ্র করে নেওয়া হল। এখন চিত্র 3-এর লিভারটি চিত্র4-এর লম্বভাবে বসানো প্লাইউড

চিত্র 5
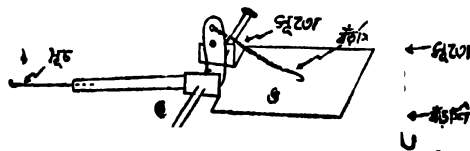
দুটির মাঝে রেখে গ চোঙের মধ্য দিয়ে একটি লম্বা নাটবল্টু এঁটে দেওয়া হল (চিত্র 5)। চিত্র 5-এর ঙ অংশে $\frac{1}{8}''$ পুরু মোমের প্রলেপ দিয়ে নিলে ভাল হয়।

কিভাবে কাজ আরম্ভ করা হবে—

চ্যাপ্টা টিনের কৌটোর গায়ে একটি সাদা কাগজ (পাতলা আর্ট পেপার) এঁটে দিতে হবে। কেবলমাত্র কাগজের শেষ মাথায় আঁঠা লাগানো হয়।

স্পিরিট ল্যাম্পে স্পিরিটের বদলে তার্পিন তেল ভর্তি করে জ্বালালে প্রচুর ধোঁয়াযুক্ত শিখা পাওয়া যায়। কাগজসমেত কৌটোটি এই ধোঁয়ার উপর ঘোরালে কাগজের উপর ঝুলের একটি সুন্দর আবরণ পড়বে। এবার কৌটোটি লম্বভাবে বসানো নলের মধ্যে ঢুকিয়ে এঁটে দেওয়া হল।

ধরা যাক, একটা ব্যাঙের হৃদস্পন্দন রেকর্ড করা হবে। ব্যাঙটিকে অজ্ঞান করে (ক্লোরোফম দিয়ে অথবা মস্তিষ্কে পিন ফুটিয়ে), তাকে লেখনীর মোমের প্লেটের উপর রাখা হল। এবার ব্যাঙের পাগুলি লিভারের দিকে রেখে কাঁচি ও ফরসেফ দিয়ে ব্যাঙের হৃদপিণ্ডটি উন্মুক্ত করে হৃদপিণ্ডের নিলয়ের মাংসপেশীর সঙ্গে চ বঁড়শিটিকে সাবধানে গেঁথে দিতে হবে। বঁড়শির সঙ্গে যুক্ত সুতোটি লিভারের ছোট বাহুর উপরের দিকের যে কোন একটি ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

হৃদপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে নিলয় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ফলে বঁড়শিতে টান পড়বে এবং লিভারের লম্বা বাহুর সঙ্গে যুক্ত সুঁচটি উপর নীচে নড়াচড়া করতে থাকবে।

লিভারসমেত সুঁচটি ঝুলমাখানো ড্রামের গায়ে আলতোভাবে ঠেকিয়ে দিয়ে লম্বা দণ্ডটি আস্তে আস্তে ঘোরালে হৃদ্‌স্পন্দনের একটি লেখচিত্র ঝুলমাখানো কাগজের উপর পাওয়া যাবে। কাজের শেষে কৌটোর গা থেকে ঝুলমাখানো কাগজটা সাবধানে খুলে স্পিরিটের মধ্যে ডুবিয়ে তারপর শুকিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে ঝুলগুলি কাগজের গায়ে পাকাপাকিভাবে এঁটে যাবে।

ব্যাঙের হৃদপিণ্ডকে অনেকক্ষণ কর্মক্ষম রাখবার জন্যে কিছুক্ষণ বাদে বাদেই কয়েক ফোঁটা করে 'নর্মাল স্যালাইন' হৃদ্‌পিণ্ডের উপর দেওয়া হয়। এভাবে পরীক্ষাটি অনেকক্ষণ ধরে দেখানো যেতে পারে।

পূর্ণেন্দু সরকার*

* যুব বিজ্ঞান সংস্থা, গোবরডাঙ্গা, পোঃ ও গ্রাঃ খাটুরা, 24 পরগণা পিন—743 273

ভৌতিক নাচ

তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে ধাতুনির্মিত কোন পাতের বিকর্ষিত হওয়ার ঘটনাটি বিজ্ঞানী এলিহু টম্‌সন্‌-এর আবিষ্কার। বিকর্ষণের সময় পাতটির নড়াচড়াকে বা কম্পনকে তিনি ভৌতিক নাচ (Phantom Dance) বলে অভিহিত করেন। কিভাবে ঐ পরীক্ষাটি করা যায়, তা এখানে বর্ণিত হবে।

(i) একটি ফাঁপা কাঠের চোঙ, 20-25 সে. মি. দৈর্ঘ্য এবং 4-5 সে. মি. ব্যাসবিশিষ্ট ;

(ii) কাঁচা লোহার পাত বা দণ্ড, যা থেকে 30-35 সে. মি. দৈর্ঘ্যের ছোট ছোট দণ্ড কেটে নিতে হবে ;

(iii) একটি ট্রান্সফরমার (220v/90v) ;

(iv) কাঠের তৈরী একটি বোর্ড (25 সে. মি. × 35 সে. মি.) ;

(v) সুতো জড়ানো তার (26 গেজের, প্রায় 750 গ্রাম) ;

(vi) অ্যালুমিনিয়াম পাতের তৈরী একটি চাকৃতি ;

(vii) 30 গেজের তারের 200 পাকবিশিষ্ট দুটি কুণ্ডলী ;

(viii) একটি সাধারণ স্পীকার (8Ω) ;

(ix) একটি 6 ভোল্টের বাতি ;

(x) 220 ভোল্টের মেন থেকে তড়িৎ সরবরাহ।

এছাড়াও স্ক্রু, সুইচ, 5 অ্যাম্‌পিয়ারের কিছুটা তার—যা তৈরি করবার সময় স্বভাবতঃই প্রয়োজন হবে।

পরীক্ষা :

চোঙটিকে প্রথমে কাঠের বোর্ডের উপরে সোজা করে স্ক্রু-এর সাহায্যে শক্ত করে লাগিয়ে তার গায়ে সুতো জড়ানো তার পাকানো হয়। একভাবে প্রায় 3-4টি স্তরে তারটি পাকিয়ে চোঙের গায়ে কুণ্ডলী 'ক' তৈরি করা হয় (চিত্র 1)। চোঙের পাশে ট্রান্সফরমারটি বসানো থাকে। ট্রান্সফরমারের উপকুণ্ডলীর পাকসংখ্যা এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়, যাতে প্রাথমিক কুণ্ডলীতে 220 ভোঃ-এর তড়িৎ-বিভব থাকলে উপকুণ্ডলীর প্রান্তদেশে 90 ভোল্টের মত তড়িৎ বিভব সৃষ্টি হয়। ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক কুণ্ডলীর দু-প্রান্তের সঙ্গে প্রায় 2 মিটার দৈর্ঘ্যের 5 অ্যাম্‌পিয়ার তারের একপ্রান্ত যুক্ত করা হল এবং তারটির অপর প্রান্তে একটি দু-পিনবিশিষ্ট প্লাগ লাগানো হল। ট্রান্সফরমারের উপকুণ্ডলীটির দু-প্রান্তের সঙ্গে চোঙে জড়ানো তারের দু-প্রান্ত সংযুক্ত করা হয়। চোঙের ভিতরের ফাঁপা অংশে যতগুলি দণ্ড প্রবেশ

করতে পারে ঠিক ততগুলি দণ্ড (উপরে বর্ণিত) একত্রিত করে প্রবেশ করিয়ে রাখা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের চাক্‌তিটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে সেটিকে ঐ একত্রিত দণ্ডগুলির বাইরে দৈর্ঘ্য বরাবর সহজে ওঠা-নামা করানো যায়। চাক্‌তিটি চওড়া হবে প্রায় 1 সে. মি.।
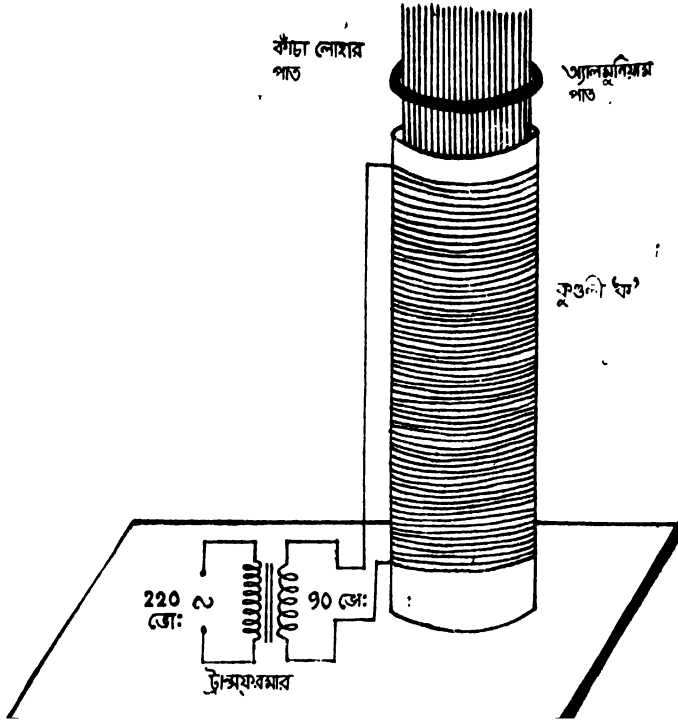
চিত্র 1

চাক্‌তিটিকে দণ্ডগুলির মধ্যে রাখলে সাধারণভাবে তা চোঙের উপরের তলে পড়ে থাকবে। এ অবস্থায় মেন সরবরাহ চালু করলে দেখা যাবে, চাক্‌তিটি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে সেখানে অবস্থান করে কাঁপতে থাকে। এই সঙ্গে একরকম শব্দও শোনা যায়। তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করলে চাক্‌তিটি আবার নীচে পড়ে যায়। খুব দ্রুত গতিতে তড়িৎ-প্রবাহ পর্যায়ক্রমে চালু ও বন্ধ করলে চাক্‌তিটি উপরে উঠবে এবং নীচে পড়ে যাবে। এভাবে দণ্ডের গা বেয়ে ওঠা এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় অবস্থানের সময় চাক্‌তিটিকে কম্পমান দেখেই বিজ্ঞানী এলিহু টম্‌সন্ প্রথমে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা না দিতে পারার জন্যেই সম্ভবতঃ এই ঘটনাকে তিনি ভৌতিক নাচ বলে আখ্যা দেন।

200 পাকের যে দুটি কুণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে—তা তৈরি করে নিতে হবে। এগুলিকে যেন সহজভাবে দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। একটি কুণ্ডলীর প্রান্তদেশে

(কুণ্ডলী 'খ') 6 ভোল্টের একটি বাতি লাগানো হল এবং অপরটির প্রান্তদেশের (কুণ্ডলী 'গ') সঙ্গে একটি স্পীকার সংযুক্ত করা হল (চিত্র 2, 3)। সরবরাহ চালু থাকাকালীন বাতিসমেত কুণ্ডলীটি দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করালে বাতিটি জ্বলে উঠবে। দেখা যাবে, কুণ্ডলীটিকে যত নীচের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, বাতির উজ্জ্বলতাও তত বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র 2 চিত্র 3
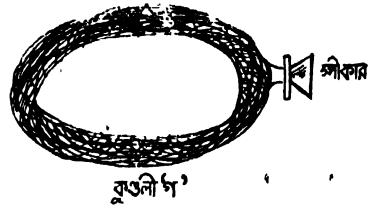
একইভাবে স্পীকারসমেত কুণ্ডলীটিকে দণ্ডের ভিতর প্রবেশ করালে স্পীকারে শব্দ শোনা যায়। এক্ষেত্রেও কুণ্ডলীটিকে ক্রমশঃ নীচের দিকে নিয়ে গেলে স্পীকারে শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যাখ্যা :

চোঙের কুণ্ডলীতে পরিবর্তী প্রবাহ ঘটানোর ফলে এর দু-প্রান্তে পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, যার আবেশের ফলে অ্যালুমিনিয়াম চাকৃতিটির উপর তড়িৎ-চুম্বক বলের উদ্ভব হয়। এই তড়িৎ-চুম্বক বল পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম চাকৃতিটির উপর এডি প্রবাহ (eddy current) ঘটায়।

চাকৃতিটির উপর সৃষ্ট চৌম্বক-ক্ষেত্র এবং কুণ্ডলী 'ক'-এর চৌম্বক-ক্ষেত্র একই পরিবর্তী চক্রে পরস্পর বিপরীতমুখী ; অর্থাৎ কুণ্ডলীর উপর তলে যখন উত্তর মেরু, চাকৃতির নীচের তলে তখন উত্তর মেরুই আবিষ্ট হয়। সমমেরুর মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণের ফলে চাকৃতিটি কুণ্ডলী থেকে দূরে উপর দিকে চলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই পরীক্ষায় তড়িচ্চালক বলের দিক ও চৌম্বক-ক্ষেত্রের দিক পরস্পর সমকোণে আনত থাকে। কিন্তু চাকৃতিটির আবেশী রোধ এবং সাধারণ রোধের মান কম হওয়ায় এডি প্রবাহ ও সৃষ্ট তড়িচ্চালক বল সমদশায় থাকে না। এডি প্রবাহ ও চৌম্বক-ক্ষেত্র প্রায় বিপরীত দশাসম্পন্ন হয়ে পড়ে। ঐ প্রবাহ-ই চাকৃতিটিকে বিকর্ষিত করে ঠেলে উপরের দিকে তুলে দেয়।

যখন চাকৃতিটির উপর অভিকর্ষজ বল ও উপরিউক্ত বিকর্ষণ বল পরস্পর সাম্যাবস্থায় আসে, সেই মুহূর্তে চাকৃতিটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে স্থির থাকে। যেন সরবরাহ থেকে যে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়, তার বিভব প্রভেদ কোন সময়েই 220 ভোল্টে নির্দিষ্ট থাকে

না। প্রতি মুহূর্তেই এই বিভব-প্রভেদ অল্পবিস্তর কম-বেশী হয়ে থাকে। পরিবর্তী প্রবাহের দশাও সর্বদাই বদলায়। এসব কারণে চাক্তিটি কাঁপতে থাকে।

সৃষ্ট পরিবর্তী তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে কোন কুণ্ডলী স্থাপন করলে বা দণ্ডের মধ্যে কোন কুণ্ডলীকে প্রবেশ করালে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের ফলে কুণ্ডলীর দু-প্রান্তে তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি হয়—যার ব্যাখ্যা ফ্যারাডের সূত্র থেকে মেলে। কুণ্ডলীর প্রান্তদেশে সৃষ্ট তড়িৎ-বিভব অল্প ক্ষমতার বৈদ্যুতিক বাতিকে জ্বালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। কুণ্ডলীটিকে যতই দণ্ডের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নামানো যায়, বাতিটির উজ্জ্বলতা ততই বৃদ্ধি পায়। কেননা, নীচের পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা উপরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। অনুরূপভাবে, বাতির পরিবর্তে কুণ্ডলীর দু-প্রান্ত একটি স্পীকারের সঙ্গে যুক্ত করলে শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, যাকে হাম (hum) বলা হয়। এই শব্দের কম্পাঙ্ক কুণ্ডলী 'ক'-এ প্রবাহিত তড়িতের কম্পাঙ্কের সমান। ক্রটিযুক্ত অ্যাম্প্লিফায়ার, রেডিও প্রভৃতি যন্ত্রে হাম শোনা যায়।

পরিবর্তী প্রবাহের কম্পাঙ্ক কয়েক সেকেণ্ডে মাত্র একবার হলে প্রবাহের সময় চাক্তিটিকে লোহার দণ্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর ওঠানামা করতে দেখা যাবে।

গাণিতিক ব্যাখ্যাঃ

ধরা যাক, কুণ্ডলী 'ক'-এ পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা $I = I_0 \sin \omega t$; ω পরিবর্তী প্রবাহের কৌণিক কম্পাঙ্ক। মনে করা যাক, অ্যালুমিনিয়াম পাতের স্বকীয় আবেশক, সাধারণ রোধ এবং কুণ্ডলী 'ক'-এর সাপেক্ষে পারস্পরিক আবেশকের মান যথাক্রমে L, R এবং M.

অ্যালুমিনিয়াম চাক্তিতে সৃষ্ট তড়িৎ-বিভব $= -M \frac{di}{dt}$

$$= -M \frac{d}{dt}(I_0 \sin \omega t)$$
$$= -M\omega I_0 \cos \omega t$$
$$= M\omega I_0 \sin(\omega t - \pi/2)$$

অ্যালুমিনিয়াম চাক্তির মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা

$$= \frac{M\omega I_0}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \pi/2 - \theta)$$

$$\left[\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \right]$$

কুণ্ডলী 'ক' এবং চাক্তিটির উপর যে বল ক্রিয়া করে তা উক্ত কুণ্ডলী ও চাক্তিটির মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রার গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক। অর্থাৎ,

$$F \propto \frac{I_0 \sin \omega t . M\omega I_0 \sin(\omega t - \pi/2 - \theta)}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}}$$

$$\propto \frac{M\omega I_0^2 \sin \omega t [\sin \omega t \cos(\pi/2+\theta) - \cos \omega t \sin(\pi/2+\theta)]}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$$

$$\propto \frac{M\omega I_0^2 \sin^2 \omega t \cos(\pi/2+\theta) - \frac{1}{2} M\omega I_0^2 \sin 2\omega t \sin(\pi/2+\theta)}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$$

একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তী চক্রে $I_0^2\sin 2\omega t$ এবং $I_0^2\sin2\omega t$—এর মান যথাক্রমে শূন্য এবং $\frac{I_0^2}{2}$.

$$\therefore \quad F \propto \frac{\frac{1}{2}M\omega I_0^2\cos(\pi/2+\theta)}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$$

যেহেতু $\theta = \tan^{-1}\frac{\omega L}{R} < \pi/2$, অতএব $\cos(\pi/2+\theta)$ এর মান ঋণাত্মক হবে। এ থেকে বলা যায়, একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তী চক্রে কুণ্ডলী 'ক'-এ এবং অ্যালুমিনিয়াম চাক্তিতে তড়িৎ-প্রবাহের দিক পরস্পর বিপরীতমুখী। কোন চক্রে এদের গড় চৌম্বক ক্ষেত্রও পরস্পর বিপরীতমুখী অর্থাৎ যে সময়ে কুণ্ডলী 'ক'-এর উপরদিকে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয়, তখন চাক্তিটির নীচের তলেও উত্তর মেরুর উদ্ভব হয়ে থাকে। অতএব এ অবস্থায় কুণ্ডলীটি চাক্তিটিকে বিকর্ষিত করবে। এজন্যেই পরীক্ষায় চাক্তিটি উপরে উঠে যায়। অবশ্য বিকর্ষণ বলের মাত্রা চাক্তির ওজনের চেয়ে বেশী হতে হবে। উপরের সমীকরণ থেকে বলা যায়—

I_0, M এবং ω বাড়লে বা L কমলে বিকর্ষণের মাত্রা বাড়বে। আবার R-এর মান কম হলেওবিকর্ষণ বাড়বে। এ অবস্থায় $\left(- \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}\right)$ বেড়ে যায়; সুতরাং $\cos(\pi/2+\theta)$-এর মানও বেড়ে যাবে।

মহুয়া দে*

*ভি. আই. পি. রোড, গভর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেট, ব্লক-R, ফ্ল্যাট-6, কলিকাতা-700 054

(3)

হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপাদন যন্ত্র

কোন ধাতব মূলক সনাক্ত করার সময় হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাসটি প্রায়ই সময় প্রয়োজন হয়। এই গ্যাস সাধারণতঃ কিপ্‌স্ অ্যাপারেটাস্ নামক যন্ত্রে তৈরি করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা চলবার সময় অনেক ছেলেকে প্রায় একসঙ্গে একটি কিপ্‌স্ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় বলে মাঝে মাঝে একটু অসুবিধা হয়। অন্যভাবে একটি যন্ত্র তৈরি করে নিলে তা থেকে

ঐ গ্যাস সহজে পাওয়া যায়—যা উপরিউক্ত পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে। এরকম একটি যন্ত্র তৈরি করতে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দরকার :

(i). একটি ছোট কাচের বোতল (আঠার বোতল হলে ভালই হবে) ;

(ii) একটি শক্ত টেষ্ট টিউব ;

(iii) একটি কর্কের টুকরো (টেষ্ট টিউবের ঢাকনা হবে) ;

(iv) একটি 6—8 সে. মি. লম্বা শক্ত তার ;

(v) একটি কাচের নল (25 সে. মি.)।

এর সঙ্গে আরও দরকার কিছু ফেরাস সালফাইডের (FeS) টুকরো এবং কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)।

প্রথমে টেষ্ট টিউবটি গরম করে তার তলায় একটি ছোট ছিদ্র করে নিতে হবে। এর পর কাচের নলটিকে মোটামুটি 45° কোণ করে বাঁকানো হয়। কাচের নলের বাঁকের এক দিক প্রায় 5 সে. মি. এবং অপর দিকটি প্রায় 15-20 সে. মি. লম্বা হলেই চলবে।
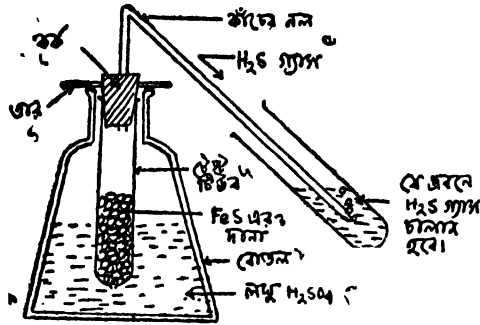
এখন কর্কটির মাঝখানে একটি ছিদ্র করে কাচনলের ছোট দিকটি ঐ ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হল (চিত্র)। এরপর শক্ত তারটি আড়াআড়িভাবে কাচনলের পাশ দিয়ে কর্কের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে তারের দু-মুখ কর্কের ভিতর দিয়ে গিয়ে দু-দিকে সমানভাবে বেরিয়ে থাকে। এখন ঐ টেস্ট টিউবে ফেরাস সালফাইডের দানা ভরে কর্কের ছিপিটি এঁটে দিতে হবে। এ অবস্থায় বোতলের অর্ধেক অংশে লঘু H_2SO_4-এর দ্রবণ ভরা হয়। এখন যন্ত্রটি তৈরির কাজ শেষ হল।

যখন গ্যাস নেবার প্রয়োজন হবে, তখন টেষ্ট টিউবটি বোতলের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়। তাহলে ফেরাস সালফাইডের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় H_2S গ্যাস উৎপন্ন হয়ে কাচের নলের মধ্য দিয়ে বেরোতে থাকবে। যখন গ্যাস নেবার প্রয়োজন হবে না, তখন টেষ্টটিউবটি বোতলের উপর থেকে তুলে নিয়ে টেস্ট টিউব রাখবার ষ্ট্যাণ্ডে রেখে দিতে হবে। এর সাহায্যে ইচ্ছামত H_2S গ্যাস পাওয়া যেতে পারে।

বিশ্বরঞ্জন রায়*

* গান্ধী বিচার পরিষদ, ফুলডাঙা, পোঃ ও জেলা বাঁকুড়া

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1: ফ্যানের রেগুলেটিং সিস্টেম এবং রেডিওর রেগুলেটিং সিস্টেমে কি বিদ্যুৎ খরচ কম-বেশী হয় ?

সভ্য গোস্বামী, আগরপাড়া পীরতলা, 24 পরগণা।

প্রশ্ন 2: বর্তমানে TV সেটের সাহায্যে যুগপৎ দেখা ও শোনা দুই-ই চলছে, তা কি করে সম্ভব ?

শ্রীব্যোমকেশ মাইতি, কাটরংকা, ধীরেন্দ্র বিদ্যামন্দির, মেদিনীপুর

প্রশ্ন 3: সাগরের নীচ থেকে কোন্ কোন্ খনিজ সম্পদের সন্ধান এ পর্যন্ত আমাদের জানা আছে ?

তপনকুমার রায়, হুগলী

উত্তর 1 :—মনে হয় প্রশ্নকর্তা জানতে চান রেগুলেটারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক পাখার বেগ কমিয়ে দিলে বিদ্যুৎ খরচ কম হয় কিনা। রেগুলেটার ব্যবহার করে পাখা কম জোরে চালালে বিদ্যুৎ খরচ অবশ্যই কম হবে। তবে রেগুলেটারের রোধের (resistance) দরুণ কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি তাপশক্তিতে পরিণত হবে এবং সেটি অপচয় হবে। অর্থাৎ পাখা যখন কম জোরে চলছে তখন বিদ্যুৎ খরচ কম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তার কিছু অংশ তাপ হিসাবে অপচয় হচ্ছে।

অনুরূপভাবে রেডিওর ভল্যুম কণ্ট্রোল (volume control) ব্যবহার করে আস্তে বাজানো হলে বিদ্যুৎ খরচ কম হবে।

উত্তর 2 :—টেলিভিশনের কার্যপ্রণালী প্রশ্ন ও উত্তর বিভাগের স্বল্প পরিসরের মধ্যে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এর জন্যে স্বতন্ত্র সচিত্র প্রবন্ধ প্রয়োজন—একথা অবশ্য প্রশ্নকর্তা নিজেই পরে বলেছেন। আপাততঃ সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

টেলিভিশনে শব্দ এবং চিত্র এই দুই-ই বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে পাঠানো হয়। প্রথমে শব্দপ্রেরণের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া ভাল। কথাবার্তা বা গানবাজনা মাইক্রোফোনের সামনে অনুষ্ঠিত হলে মাইক্রোফোন শব্দকে অনুরূপ বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত করে। বেতার প্রেরক ষ্টেশনে উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করে তার কোন একটি বৈশিষ্ট্য (সাধারণতঃ বিস্তার বা amplitude) ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। একে বলা হয় বাহক তরঙ্গ (carrier wave)। এই বেতার-তরঙ্গই বার্তা বহন করে নিয়ে যায়। গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে ঐ বাহক তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছলে গ্রাহক-যন্ত্র বাহক থেকে বার্তাটি আলাদা করে নেয়

এবং প্রেরক স্টেশনের মাইক্রোফোনে যে রকম বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সেইরকম বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করে। এটি করা সম্ভব হয় তার কারণ ঐ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য যেন বাহকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের অনুরূপ শব্দ গ্রাহক-যন্ত্রের লাউডস্পীকারে উৎপন্ন হয়।

এর পর চিত্রের প্রসঙ্গ। টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে কোন দৃশ্য অনুষ্ঠিত হলে ক্যামেরার বিশেষ ধরণের পর্দায় তার একটি চিত্র গঠিত হয়। ঐ ছবির বিভিন্ন জায়গায় আলোছায়ার যে তারতম্য আছে, তার অনুরূপ বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। উজ্জ্বল জায়গার জন্যে জোরালো প্রবাহ এবং স্বল্পালোকিত জায়গার জন্যে কম প্রবাহ। আমরা যখন কোন বইয়ের একটি পাতা পড়ি তখন আমাদের চোখ পাতার প্রথম লাইনের বাঁ-দিক থেকে ডান দিকের শেষ পর্যন্ত যায়। পরমুহূর্তেই পরের লাইনের বাঁ-দিক থেকে ডান দিকের শেষ পর্যন্ত যায়। এইভাবে পাতার শেষ পর্যন্ত পড়া হয়। টেলিভিশনের ক্যামেরার পর্দায় গঠিত ছবিটিকেও অনেকটা সেইরকম ভাবেই যেন পড়া (scanning) হয়। ছবিটিকে অনেকগুলি অনুভূমিক লাইনে ভাগ করে নিয়ে পর পর প্রতিটি লাইনের প্রতি বিন্দুতে আলোছায়ার তারতম্য অনুযায়ী অনুরূপ বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করা হয়—অর্থাৎ শব্দের বাহক এবং চিত্রের বাহক আলাদা। চিত্রের বাহক তরঙ্গের (picture carrier) কোন একটি বৈশিষ্ট্য ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ অনুযায়ী পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাহকের উপর যেন চিত্রের বৈশিষ্ট্যটি ছাপ মেরে দেওয়া হল। TV গ্রাহক-যন্ত্রে ঐ ছাপমারা বাহক (modulated carrier) পৌঁছলে বিশেষ ব্যবস্থায় ঐ বাহক থেকে বার্তাটি আলাদা করে নিয়ে টেলিভিশনের পর্দায় তারই মত আলোছায়ার তারতম্য উৎপন্ন করা হয়। এখানে চিত্রটিকেই বার্তা (signal) মনে করতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে, সব ছবিটি একসঙ্গে পাঠানো হয় নি। পরের পর লাইন হিসাবে পাঠানো হয়েছে। TV গ্রাহক ঠিক তেমনি পরের পর লাইন ছবি পুনর্গঠিত করে যাচ্ছে। এই দুটি ক্রিয়া একেবারে তালে তাল মিলিয়ে করতে হবে। মানুষের চোখ অবশ্য এই ফাঁকি ধরতে পারবে না—তার কাছে সমগ্র ছবিটি একসঙ্গেই প্রতিভাত হবে।

সাধারণতঃ টেলিভিশনে শব্দের বাহক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বার্তার প্রকৃতি অনুযায়ী (অর্থাৎ মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ অনুযায়ী) পরিবর্তিত করা হয় এবং চিত্রের বাহক তরঙ্গের বিস্তার বার্তার (এখানে চিত্রের) প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করা হয়। অর্থাৎ শব্দের জন্যে frequency modulation এবং চিত্রের জন্যে amplitude modulation ব্যবহার করা হয়।

মুক্তিসাধন বসু*

---

* রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর 3: সমুদ্রের উপকূলেই স্থলভাগের শেষ—এমন ধারণাও অনেক সময় পোষণ করা হয়। কিন্তু সমুদ্রের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত এই স্থলভাগ ক্রমশঃ ধাপে ধাপে নেমে যায়। সমুদ্রের অভ্যন্তরে এই স্থলভাগকে বলা হয় মহীসোপান। মহী-সোপান অঞ্চল থেকেই বর্তমানে পৃথিবীর মোট খনিজ তেলের শতকরা 18 ভাগ সংগৃহীত হচ্ছে।

সমুদ্রের তলদেশে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। এগুলির মধ্যে যে সমস্ত খনিজ পদার্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, সেগুলি হল: তামা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, কোবাল্ট, জারকোনিয়াম, মলিব্‌ডেনাম, আকরিক লোহা, টাইটেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সীসা ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতব পাদর্থ—যার পরিমাণ পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে প্রাপ্ত পরিমাণের তুলনায় অনেক গুণ বেশী।

বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান খনিজ পদার্থও সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে সেগুলি সাধারণতঃ অনেক বেশী গভীরতায় থাকে। বিভিন্ন ভারী খনিজ পদার্থ, যেমন—গারনেট, মোনাজাইট, ইল্‌মেনাইট ইত্যাদিরও সন্ধান সমুদ্রগর্ভ থেকে মেলে। বর্তমানে মহীসোপান অঞ্চল থেকে খনিজ পদার্থ ও তেল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সফল হয়েছে।

উপরিউক্ত সম্পদ ছাড়াও মানব সমাজের প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদার বৃহৎ অংশ এখন সমুদ্রের মৎস্যজাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে মেটানো হয়ে থাকে। সমুদ্রগর্ভের নানারকম অফুরন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে পৃথিবীর মানুষ ও জন্তুজানোয়ারদের বিকল্প খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার কথা অনেক দিন আগে থেকেই ভাবা হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে—তা সম্ভব হলে পৃথিবীতে খাদ্যের ক্ষেত্রে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তা থেকে খুব সহজে রেহাই পাওয়া যাবে।

সমুদ্রগর্ভের বহুরকম খনিজ ও প্রাণীজ সম্পদ এখন বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে তা ইচ্ছামত সংগৃহীত হবে এবং মানব জাতির কল্যাণের জন্যে এ সমস্ত সম্পদের চাহিদা পূরণ হবে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পরিষদের খবর

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতিতর্পণ

4ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 'সত্যেন্দ্র ভবনে' আচার্য বসুর স্মৃতি-তর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব অধ্যাপক মহাদেব দত্ত সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। এই উপলক্ষ্যে আচার্য বসুর প্রতিষ্ঠিত পরিষদের গ্রন্থাগারের নব কলেবরে সজ্জিত পাঠ্যপুস্তক বিভাগটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা কমিশনার ও সচিব শ্রীদিলীপকুমার গুহ। এই উপলক্ষে আচার্য বসুর প্রেরণায় ও পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত 'হাতে কলমে বিভাগটির' (যা বর্তমানে তাঁর স্মারক হিসাবে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র' নামে পরিচিত) কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রয়োজনভিত্তিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত মডেল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বোধক শ্রীগুহ বলেন যে, গ্রন্থাগারের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পাঠ্য পুস্তক বিভাগটিকে যথাবিহিত সংস্কার করে নবরূপ দেওয়ায় এটি অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পাঠ কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হবে নিঃসন্দেহে।

হাতে-কলমে কেন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীগুহ বলেন যে, এখানের কর্মধারা জাতীয় উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হবে, বিশেষতঃ কৃষি প্রভৃতি উন্নয়নের দ্বারা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্য পৌর নিয়ামক শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার বলেন—দেশের জন-সাধারণের মধ্যে আচার্য বসুর মাতৃভাষায় মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের আদর্শের বিকল্প কোন পন্থা নেই। তিনি আচার্য বসুর কয়েকটি স্বহস্তে লিখিত পত্রের উপস্থাপনা করে তন্মধ্যে অতি ক্ষুদ্র লিপিতে যে তাঁর মর্মস্পর্শিতার ভাব রয়েছে—সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে —'হাতে-কলমে কেন্দ্রে'র প্রদর্শিত মডেলগুলির প্রশংসা করে বলেন—স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত প্রয়োজন-ভিত্তিক এই মডেলগুলি মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর প্রবর্তিত 'কর্মশিক্ষা' প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই বিষয়ে উদ্যোগী হলে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ঐ প্রশিক্ষণের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে পারে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আচার্য বসুর জীবনের কয়েকটি ছোটখাটো কথার উল্লেখ করে তাতে আচার্য বসুর চরিত্রের স্বাভাবিক সারল্য এবং দেশোন্নয়নের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন ও পাবলিক হেলথ-এর বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের ডঃ পরিতোষ দত্ত (যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য বসুর পরিচালনাধীনে জৈব রসায়ন সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট হন এবং আচার্য বসুর জীবদ্দশায় তাঁর সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রকল্পের জৈব রসায়ন সম্পর্কে গবেষণা করেন) আচার্য বসুর বিজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করে কবিগুরুর 'বিশ্ব পরিচয়' পুস্তকটি আচার্য বসুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ পত্রটি সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ও দরদের কথা উল্লেখ করে ডঃ দত্ত বলেন—ঢাকায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সময় আচার্য বসু জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল ছাত্রকে সাহায্য করতেন। ডঃ দত্ত হাতে-কলমে কেন্দ্রের খাদ্যের ভেজাল ধরবার সহজ ও সরল পদ্ধতি প্রদর্শনে সন্তোষ

প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—খাদ্যে ভেজাল ধরবার সহজ পন্থা বের করবার জন্যে 1952 সালে আচার্য বসু তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

শ্রীধীরাজ বসু সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত করেন এবং তা গৃহীত হয়।

1) বি. টি. রোডের নাম পরিবর্তিত করে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু সরণি' রাখা হউক,

2) 'সত্যেন্দ্র ভবন' বড় রাস্তা থেকে ভিতরের দিকে অবস্থিত হওয়ায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড এবং রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের এবং রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট এবং বিধান সরণির সংযোগস্থলে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' নামাঙ্কিত তীরচিহ্নিতফলক বসাবার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হউক

3) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মূল উদ্দেশ্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রচ্ছদপটে কিংবা পত্রিকার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে নিয়মিত মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হউক।

অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার পর সভার কাজ শেষ হয়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে পরিষদ-সভাপতি অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ

আমাদের পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও বিজ্ঞান পরিষদের কর্মী ও শুভার্থীদের প্রেরণার উৎস আচার্য বসুর স্মৃতি-তর্পণ করি সকলে একটি সভায় সমবেত হয়ে, তাঁর জীবন ও বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে।

এসব সভায় তাঁর কোন প্রাক্তন ছাত্র বা ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাঁর বিজ্ঞান সাধনার ও চরিত্রের কোন কোন দিককে মূল বক্তব্য হিসাবে বিবৃত করেন। 1975 ও 1976 সালে যথাক্রমে অধ্যাপক সুবোধনাথ বাগচী (বর্তমানে কানাডার মন্ট্রিলের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক) ও অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ বসু কর্তৃক স্মৃতি-তর্পণের মাধ্যমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে আচার্য বসুর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবস প্রতিপালিত হয়।

এবার তাঁর ঢাকার রসায়নের ছাত্র ডঃ পরিতোষ দত্ত 'আচার্য বসু ও জৈব রসায়ন' সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করবেন।

এ বছর তাঁর স্মৃতিতর্পণের অঙ্গ হিসাবে আচার্য বসু এই পরিষদ মারফৎ জাতীয় উন্নয়নে আর যে সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন (মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের অতিরিক্ত), তার কোন কোন দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে আচার্য বসু বিজ্ঞানের ছাত্রদের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্যে পরিষদ গ্রন্থাগারের যে পাঠ্যপুস্তক বিভাগ ও সাধারণ শিক্ষিত জনসাধারণকে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে যে পাঠাগার স্থাপনা করেছিলেন, তার নবকলেবরে উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা কমিশনার ও সচিব শ্রীদিলীপকুমার গুহ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিতি পরিষদের সদস্যদের উৎসাহ বর্ধন করবে সন্দেহ নেই।

আচার্য বসু পরিষদ গৃহ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে বিজ্ঞানের 'হাতে-কলমে' বিভাগ সুরু করেন, যেখানে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা জনসাধারণের বিজ্ঞান প্রসারের উপযোগী বিভিন্ন শিক্ষা সম্পূর্ণ করছেন। আজকে আচার্যের মৃত্যুর পর এই বিভাগটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র' এই নামকরণ করা হয়েছে। আজ স্মৃতিতর্পণের অঙ্গ হিসাবে এই বিভাগের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে কয়েকটি মডেল দেখানো হবে। এই বিষয়ে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীদিলীপকুমার গুহ

মহাশয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁদের আর্থিক সাহায্যের জন্যে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের সহযোগিতায় এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আনুকূল্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ একদিন একটি বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হবে এবং জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এই সুযোগে পরিষদের বর্তমান বিভিন্ন কর্মধারা ও তার নানা বাধাবিপত্তির সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং সরকারী ও বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

মাতৃভাষায় পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশন

পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'কে নবরূপায়ণ করে জনপ্রিয় প্রবন্ধাদির সঙ্গে জনজীবনে বিজ্ঞান, মডেল তৈরি, ভেবে কর, প্রশ্ন ও উত্তর প্রভৃতি বিষয় নিত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনমানসে বিজ্ঞান প্রসারে আরো যে সমস্ত বিষয় পরিবেশন করা দরকার, অর্থাভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না।

অর্থাভাবে গত দু-বছর কোন লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। যদিও খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের লিখিত বেশ কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি পরিষদ দপ্তরে অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে।

গত কয়েক বছর পরিষদের গ্রন্থাগারের দুটি বিভাগ (জনপ্রিয় বিজ্ঞান পাঠাগার ও পাঠ্য-পুস্তক বিভাগ) অর্থাভাবে ও উৎসাহী কর্মীর অভাবে প্রকৃতপক্ষে প্রায় অচলাবস্থায় ছিল। বর্তমানে বহু তরুণ কর্মীর উৎসাহে ও পরিষদের সাধ্যানুযায়ী সামান্য অর্থে এবং কিছু সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের দানে গ্রন্থাগারটিকে নবকলেবরে উদ্বোধন করে কাজ সুরু করা হচ্ছে। আশা করি সরকার, পুরসভা প্রভৃতির অর্থানুকূল্যে ও সহৃদয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এবং কর্মীদের প্রচেষ্টায় এটি দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে বিভাগ

এই বিভাগের কর্মীরা (তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা) শতাধিক আকর্ষণীয় বিজ্ঞানের মডেল ও বহু চার্ট তৈরি করেছে। এই মডেলগুলি বিজ্ঞানের কেবল মাত্র চমৎকার দিকগুলি না দেখিয়ে একে জনজীবনে ও মানব সমাজে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর না করে হাতেনাতে কাজ করে বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলির সঙ্গে কিভাবে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়, সে বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই বিভাগটি মধ্য শিক্ষা পর্ষদের ও জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (এন. সি. ই. আর. টি.) প্রভৃতির সংস্থার বহু কর্মধারাকে সক্রিয় সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয়। এবিষয়ে শ্রীদিলীপকুমার গুহ ও সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এই বিভাগের মাধ্যমে শহর ও গ্রামে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে সক্রিয় সাহায্য করা হয়। অর্থানুকূল্য পেলে দেশের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে প্রদর্শনীর আয়োজন করে জনজীবনে বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে এই বিভাগ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গত অক্টোবরে এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত একটি ছোট প্রদর্শনী (ভগ্নী নিবেদিতার জন্ম-উৎসব উপলক্ষে) কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কলিকাতার শেরিফ ও পুর মুখ্য নিয়ামকের (আজ যিনি এখানে উপস্থিত আছেন) নিকট থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। এঁদের অনেকেই এরকম প্রদর্শনীর স্থায়ী রূপ দিতে পারলে তা বিজ্ঞানের ছাত্র ও জনসাধারণের বিশেষ সাহায্য হবে বলে মনে করেন। তাঁরা আরো আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিভাগের মাধ্যমে বিজ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কালেও কিছু আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে পরিষদের পক্ষ থেকে আমার

বলতে চাই যে, সত্যেন্দ্র ভবন সংলগ্ন জমিখণ্ডকে সরকারের মাধ্যমে স্থায়ী সংগ্রহশালার জন্যে অধিগ্রহণ করা হউক। সেখানে স্থায়ী সংগ্রহশালা স্থাপন করে পরিষদের সকল সভ্যের সঙ্গে উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত গুণীজনদের আশা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। এ বিষয়ে জনসাধারণ এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা কামনা করি।

আজ আচার্য বসুর প্রয়াণ দিবসে সংকল্প—আচার্য বসুর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করে আমরা তাঁর স্মৃতিতর্পণ করি

4ঠা ফেব্রুয়ারী, 1977 অসীমা চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

(পরিষদের সভাপতি অনিবার্য কারণবশতঃ সভায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর ভাষণটি পাঠ করা হয়)

বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

গত 23শে জানুয়ারী থেকে 26শে জানুয়ারী পর্যন্ত দমদম অঞ্চলের জপুর রোডের পঞ্চানন তলার 'সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর' পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র' থেকে কিছু মডেল ও চার্ট দিয়ে উক্ত প্রদর্শনীটিকে সহযোগিতা করা হয়। স্থানীয় অঞ্চলে এটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বঙ্গ সংস্কৃতির মেলায় বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

গত 8ই জানুয়ারী, 19,7 তারিখে ময়দানে বঙ্গ সংস্কৃতির মেলা প্রাঙ্গণের 'সত্যেন বসু মণ্ডপে' যে জনপ্রিয় প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছিল, তা গত 3রা ফেব্রুয়ারী, 1977 পর্যন্ত জনসাধারণের জন্যে খোলা ছিল। 4ঠা ফেব্রুয়ারী, 1977 তারিখে আচার্য বসুর প্রয়াণ দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে পরিষদ ভবনে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবেন বা স্মৃতিচারণ করবেন, তাঁদিগকে হাতে-কলমে কেন্দ্রে ছাত্র ছাত্রীদের তৈরী বিভিন্ন মডেল দেখানোর জন্যে নির্ধারিত দিনের দু-দিন আগে ময়দানের উক্ত প্রদর্শনীটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ময়দানের 'সত্যেন বসু মণ্ডপে' এর উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সভাপতিত্ব করেন বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংস্থার প্রধান নিয়ামক শ্রীঅমলেন্দু বসু মহাশয়।

উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ মুখোপাধ্যায় ঐ জাতীয় প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং জনজীবনে বিজ্ঞান-ভিত্তিক মডেল তৈরি ও ব্যাখ্যা দেওয়াই যে সবচেয়ে বেশী উপযোগী, তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। মণ্ডপটির নামকরণের যথার্থতা সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। প্রদর্শনীতে বেশীর ভাগ মডেলই ছিল প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞানের উপর। ডঃ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসু বহু সময় ব্যয় করে প্রদর্শনীটি ভালভাবে দেখেন এবং খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। এজাতীয় প্রদর্শনী শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয়—গ্রামেও যাতে প্রায়ই আয়োজন করা যায়—তার পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

বঙ্গ সংস্কৃতির মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনীটি জনসাধারণের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ, সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব হাওড়া, গোবরডাঙা যুব বিজ্ঞান সংস্থা ঐ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিল।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

গত 30শে জানুয়ারী, 1977 তারিখে পরিষদের

'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে' ডঃ শ্যামসুন্দর দে, 'প্লাজ্মা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা'—বিষয়বস্তুর উপর একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণ উক্ত বক্তৃতা খুবই আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। অনেক দূর থেকে এসে যাঁরা ঐ বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন—তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এজাতীয় বক্তৃতা শহরতলী ও গ্রামে যাতে আয়োজন করা সম্ভব হয়—তার জন্যে অনুরোধ জানান। বক্তৃতার পরে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কীয় আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

শোক-সংবাদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র 15ই জানুয়ারী, 1977 তারিখে পরলোকগমন করেন।

বহুবছর আগে থেকেই তিনি পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন এবং জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গত 20শে জানুয়ারী, 1977 তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু-মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে একটি শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

আগামী 20শে ফেব্রুয়ারী 1977, রবিবার বিকেল 5-30টায় পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে" একটি জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণকে উক্ত বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বক্তা: শ্রীশংকর চক্রবর্তী বিষয়: মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা

সময়: 20শে ফেব্রুয়ারী, 1977, বিকেল 5-30টা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বলুন তো—

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা আজকাল এত জনপ্রিয় কেন??

তবে শুনুন এর কারণ—

—ঃ মাত্র পাঁচ দফা ঃ—

প্রথম দফাঃ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন;

দ্বিতীয় দফাঃ নানান ধরণের আকর্ষণীয় ফিচার সংযোজন;

তৃতীয় দফাঃ "বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর"-এ সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান;

চতুর্থ দফাঃ প্রতি মাসে তিনটি করে "মডেল তৈরি"—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসহ প্রকাশ;

পঞ্চম দফাঃ বিষয়বস্তু নির্বাচনে বহুমুখীনতা।

এছাড়া ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা নিশ্চয়ই রাখে না।

বিজ্ঞান-মানসিকতা উন্মেষের জন্যে একমাত্র মাসিক সচিত্র বিজ্ঞান পত্রিকা—"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"—পড়ুন ও পড়ান।

JNAN-O-BIJNAN   Regd. No. C 3684 (G.P.O. Calcutta.)   February, 1977

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগটি নব-কলেবরে সুসজ্জিত করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে উদ্বোধন করা হয়েছে।

* ১ ১ *

আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা বেলা 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—গুপ্তপ্রেশ, কলিকাতা-700 009   মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন—

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা এবং প্রকাশন উপসমিতির সভ্যবৃন্দ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্য পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবারেন হাজরা ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সহিত উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করিতে পারিবেন। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাইবে; তাঁহার সহিত পূর্বে যোগাযোগ করিয়া পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করিতে পারিবেন। পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই বিষয়ে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে। ইতি

তাং 27.11.76

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন: 55-0660

শ্রীমহাদেব দত্ত

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা :—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
2. প্রকাশনের কাল—মাসিক
3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
5. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক) ভারতীয়, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য
তাং 1-3-77 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন, মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করবার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। একারণে দেশের বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ, বিশেষতঃ লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁরা যেন তাঁদের রচিত কিংবা প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন পুস্তকাদি এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-কে দান করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন।

বর্তমান বছর থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করা হয়েছে। এই বিভাগে নবম শ্রেণী থেকে সুরু করে বি. এস. সি. (পাশ ও অনার্স কোর্স) এম. এস. সি., কারিগরী, মেডিকেল প্রভৃতি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা আছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে নতুন, এমনকি বাড়ীতে অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকাদি দান করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুস্তকাদি প্রেরণ করবার ঠিকানা :
"সত্যেন্দ্র ভবন"
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ মার্চ, 1977 তৃতীয় সংখ্যা

নিরক্ষরতা বনাম বিজ্ঞান প্রচার

আধুনিক যুগে জীবনধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জীবনধারণের মান উন্নয়নে, সমাজ পুনর্গঠনে এবং দেশন্নোয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা সাধারণতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে থাকে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে যতই বিজ্ঞান-মানসিকতা উন্মেষিত হয় এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ততই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে থাকে।

পৃথিবীর উন্নতশীল দেশগুলিতে সাধারণ মানুষ অনেক বেশী শিক্ষিত, বিজ্ঞান-সচেতন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে তাঁরা খুবই পরিচিত। উন্নতশীল দেশে বিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্নভাবে সুদূর অতীতকাল থেকে স্বতঃই করা হচ্ছে। তার ফলস্বরূপ সেদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন অনেক বেশী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক; সেজন্যে সেখানকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সহজেই সফলতা লাভ করে থাকে। আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ধারা উন্নতশীল দেশের তুলনায় অনেক পরে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, প্রবর্তিত হয়। সাধারণ অর্থে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা তখন খুবই কম ছিল এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যে ধারা প্রথম চালু হয়, তা ছিল পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। সে সময় সীমিতসংখ্যক বিজ্ঞানসাধক এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐ শিক্ষা ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। অনেকেই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে আমাদের দেশের সমাজজীবনে বিজ্ঞানের গুরুত্ব ক্রমশঃ স্বীকৃতি পায়; এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আস্তে আস্তে প্রসারিত হতে থাকে। গড়ে ওঠে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন,

বিজ্ঞান মন্দির ইত্যাদি। দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সুরু হল।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও বিজ্ঞানের আলোচনা চলতে থাকে; রচিত হল—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। প্রথম দিকে অবশ্য মিশনারীরাই বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় সাহায্য করেন।

তখনকার ভাষা ছিল অপেক্ষাকৃত জটিল ও কৃত্রিম। ক্রমশঃ ভাষার কৃত্রিমতা দূর হয় ও সহজবোধ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ রচিত হতে থাকে।

অতীতকাল থেকে সুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বহু মনীষী এবং নবীন লেখক বিজ্ঞান গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। বর্তমানে স্নাতকশ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকও মাতৃভাষার মাধ্যমে রচিত হয়েছে এবং তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনজীবনে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের সম্যক পন্থা হিসাবে সাধারণতঃ জনগণের মাতৃভাষার মাধ্যমে পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বক্তৃতা আয়োজনের কথাই এখন ভাবা হয়। এছাড়াও কখন কখন ভাবা হয় সীমিত মাত্রায় কিছু সংখ্যক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর (উদ্দেশ্যহীন) কথা। কিন্তু এসমস্ত পন্থা আমাদের দেশের জনমানসে বিজ্ঞান-মানসিকতা উন্মেষের জন্যে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়।

মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের জনসাধারণের শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী এখনও আক্ষরিক নয়। মাতৃভাষায় পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ আক্ষরিকদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলে এবং তাঁদের বিজ্ঞান চেতনা বিকাশের সহায়ক—এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁরা এখনও নিরক্ষর তাঁদের বিজ্ঞান-মানসিকতা কিভাবে উন্মেষিত হবে? অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে কাজ করে জীবিকা-নির্বাহ করে থাকেন। টিউব-ওয়েল, কর্পোরেশনের জল সরবরাহ ও তাদের মেরামতি কাজে বহু নিরক্ষর লোক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন; রাস্তা মেরামতে, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম তৈরি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, রেডিও ইত্যাদি তৈরিতে, রেলওয়ে ও কলকারখানায় বিভিন্ন বিভাগে নিরক্ষর কর্মী কাজ করে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন।

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানায় অনেক কর্মী আছেন, যাঁরা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে নিজস্ব নিয়মে যন্ত্র চালিয়ে অন্য যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ নিখুঁতভাবে তৈরি করেন। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিখে ঠিকমত যন্ত্র চালিয়ে যন্ত্রাংশ তৈরি করবার প্রধান অন্তরায় নিরক্ষরতা ও যথাযথ শিক্ষণের অভাব। অনেক সুতোর কলের শ্রমিক অপ্রচলিত পদ্ধতিতে, এমনকি উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে, সুতোর মান নির্ণয় করে থাকেন। ঐভাবে নির্ধারিত মান প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণীত মানের চেয়ে তেমন কিছু হেরফের হয় না।

চাষাবাদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের চাষীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাব যে কতটা তা নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের সরকারী সব রকম প্রচেষ্টা একত্রিত করলে চাষীদের চাষ-বাস সংক্রান্ত নানারকম সমস্যার পাঁচ শতাংশও মেটে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে ফসল ফলানো হয়, তা বেশীর ভাগই অবৈজ্ঞানিক। বছরের বিভিন্ন সময়ে চাষের জমির মাটি পরীক্ষা করে ঠিকমত সার নির্ধারণ ও প্রয়োগ; চাষাবাদের উপযুক্ত মাটি, বীজ, সেচ ব্যবস্থা, ফসলের বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্ধারণ ও তার

প্রতিকার—যা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত তা হয় না। এ সমস্ত কিছুই আন্দাজের উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে চলছে; যদিও গত কয়েক বছর ধরে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রকমের জৈব ও অজৈব সার, কীটনাশক ওষুধ, সেচ ব্যবস্থার জন্যে গভীর ও অগভীর নলকূপ চালু হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই এগুলি যথাযথ বৈজ্ঞানিক উপায়ে হচ্ছে না। এর কারণ—সরকারী সীমিত প্রচেষ্টা ও চাষীদের এ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশল না জানা। তাঁদের নিরক্ষরতা না জানার পক্ষে আরও সহায়ক। বর্তমানে তাই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিকে তাঁরা সাধারণ আধাজ্ঞানী ডাক্তারদের "ব্রড্ স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স" প্রয়োগ করার মত ব্যবহার করে কিছু কিছু ফল পেয়েই ক্ষান্ত হন।

এতে পরের ফসলের জন্যে জমির কি অবস্থা দাঁড়াবে, তা ভেবে দেখার মত জ্ঞান তাঁদের নেই। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা উন্নতশীল দেশের চাষীরা এখানের তুলনায় সমপরিমাণ জমিতে অনেক ফলন পেয়ে থাকেন।

অনেকেই মাছ চাষ করে জীবিকানির্বাহ করেন। দেখা যায় কোন কোন পুকুরে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে আবার কোন কোন পুকুরে সে তুলনায় একেবারেই বাড়ে না। কোন কোন জলাশয়ের মাছের রক্ত সাদাও হয়ে যায়। এ অবস্থায় পুকুরে চুন বা খইল আন্দাজমত ঢেলে মাছ চাষের পক্ষে জলাশয়কে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা হয়ে থাকে। অনেক সময় এতে উল্টো ফলও হয়। অস্বাভাবিক অবস্থার বিজ্ঞানসম্মত কারণ জেনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা বেশী ক্ষেত্রেই নেই।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন পেশার কর্মীরা যদিও বিজ্ঞান-কর্মী—বিজ্ঞানের মূল কথার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় খুবই কম। বিজ্ঞানের মূল কথার সঙ্গে তাঁদের যদি পরিচয় করানো সম্ভব হয়, তবে আরও কুশলী কর্মী হিসাবে নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। এজন্যে চাই নিয়মিত বিজ্ঞান-শিক্ষণ, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনী, বিজ্ঞানবিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ, স্লাইড সহযোগে বক্তৃতার আয়োজন ইত্যাদি।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে প্রয়োজন—বিজ্ঞানের নীতি-বিশ্লেষক মডেল, চার্ট প্রভৃতি। প্রদর্শনীর মডেল কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অভাবনীয় অবদানের পরিচয় দেবে না—দেবে প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে। আরও প্রয়োজন হল বিজ্ঞানের সংগ্রহশালা। যেখানে প্রয়োজনসাধনের উপযোগী ভাল মডেল যত্ন করে রাখা থাকবে। সংগ্রহশালার সঙ্গে থাকবে হাতে-কলমে কেন্দ্র—যেখানে বিজ্ঞান-কর্মীরা প্রয়োজনভিত্তিক বিভিন্ন মডেল হাতে-নাতে তৈরি করে বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করবে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন থাকলেও ছাত্রদের মধ্যে তা বিজ্ঞান-চেতনা উন্মেষে খুবই কম সহায়ক। তাছাড়া উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে চলছে যে ছাত্রেরা সাধারণভাবে একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করতে পারে না—যা তাদের মধ্যে বিজ্ঞান-মানসিকতা সৃষ্টির পরিপন্থী। একারণে এদেশের আক্ষরিক লোকেরাও বিজ্ঞানের সাধারণ প্রয়োগ-কৌশলও যথাযথভাবে জানেন না।

আজকাল রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান-প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। টেলিভিশন দেখা সাধারণ লোকের কাছে অভাবনীয়। অন্যদিকে বেশীর ভাগ বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে পাঠ্য-পুস্তকঘেঁষা বা বিজ্ঞানের অভাবনীয় অবদানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মডেল প্রদর্শিত হয়। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তা আনন্দ বা সামান্য জ্ঞানের খোরাক জোগালেও সাধারণ

লোকেদের কাছে, যাদের বেশীর অংশ নিরক্ষর, এগুলি ম্যাজিকের মত মনে হয়। এতে তাদের মধ্যে কোন রকম বিজ্ঞান-চেতনা বা বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে না। কোন বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে LDR, FETE ব্যবহার করে কিছু মডেল বা আর্যভট্ট বা ভাইকিং-এর মডেল দেখানোর চেয়ে জনজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে কিছু মডেল দেখালে তা তাদের মধ্যে বিজ্ঞান-মানসিকতা সৃষ্টি করতে অনেক সহজেই পারে। তবে শহরের প্রয়োজন ও সমস্যা গ্রামের তুলনায় আলাদা। তাই জায়গা বিশেষে মডেলগুলিও বিভিন্ন হওয়া দরকার। তবে প্রয়োজনভিত্তিক মডেলের সঙ্গে কিছু কিছু মডেল উচ্চতর বিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে প্রদর্শন করা উচিত। এতে বৈচিত্র্য বজায় থাকবে।

আজকালের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে এসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে স্বতঃই উপেক্ষা করা হয়ে থাকে—যা খুবই লজ্জার কথা। এসমস্ত আপাতঃ আনন্দদায়ক এবং উদ্দেশ্যহীন বিজ্ঞান প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের পক্ষে নেই। এখন প্রয়োজন দেশের প্রতিটি অঞ্চলে (মহকুমা ভিত্তিক) সেখানকার জনসাধারণের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত বিজ্ঞান-শিক্ষণ, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, সহজ ও সরলভাবে স্লাইড সহযোগে প্রাঞ্চলিক ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, প্রয়োজনভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নিয়মিত তাঁদের মধ্যে প্রদর্শন, রেডিওর মাধ্যমে জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের নিয়মিত আলোচনা, হাতে-কলমে কেন্দ্র, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। তবেই বিজ্ঞান প্রচারে প্রাসঙ্গিকতার (relevancy) সঙ্গে পরিচয় পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বিড়লা কারিগরি সংস্থা, নেহেরু যুব কেন্দ্র ও অন্যান্য বিজ্ঞান সংস্থাগুলিকে এই সমস্ত দিকে নজর রেখেই বিজ্ঞান প্রচারের ব্রতী হতে হবে।

জনমানসে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্যে আচার্য বসু আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশের এবং জনপ্রিয় বক্তৃতাদি ও আলোচনার ব্যবস্থা করেন। পরিষদের গৃহ-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিজ্ঞানের হাতে-কলমে বিভাগের কাজ সুরু করান। পরিষদের এই বিভাগটি নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে জনজীবনে বিজ্ঞান প্রচারে বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণ করছে। তাঁর মৃত্যুর পর পরিষদের এই বিভাগটির নামকরণ হয়েছে—"সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র"। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকেও বহু আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী এই বিভাগে শিক্ষার্থী হিসাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মডেল ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে থাকেন। এখানে প্রয়োজনভিত্তিক মডেলের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষাভিত্তিক মডেল এমনকি উচ্চতর শিক্ষা ও পঠন-পাঠনকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু মডেল তৈরি করা হয়েছে ও হচ্ছে। পরিষদের এই বিভাগের মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং স্লাইড সহযোগে বহু জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে।

সমাজে ও দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে নিরক্ষর ও আক্ষরিক জনসাধারণের পরিচয় ঘটানোর মধ্য দিয়ে। পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি-গুলি যতই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, জনমানসে বিজ্ঞান-মানসিকতা উন্মেষ ততই হবে সম্প্রসারিত।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

উচ্চতর বিজ্ঞানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র

শ্রীমহাদেব দত্ত*

1967 সাল। ভারতে একটি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রশিক্ষণ সংস্থার (Indian Institute of Technology) অধিকর্তার ঘরে উক্ত সংস্থার পত্রিকা প্রকাশনের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্র তাঁর সঙ্গে প্রচ্ছদপট কিরূপ হবে, আলোচনা করছিলেন। অধিকর্তা তাদের উপদেশ দিলেন যে, প্রচ্ছদপটে ঐ কেন্দ্রের মূলগৃহের সমগ্র প্রতিচ্ছবিটি থাকা চাই; যেন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মান নির্ধারিত হবে তার প্রধান গৃহের প্রতিচ্ছবিতে।

1964 সাল। পশ্চিম বাংলার একটি নূতন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (Chancellor) আসবার সম্ভাবনা জানা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কর্মী নিয়োগ করা হল—মেঝের সিঁড়ি প্রভৃতিকে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করে মোজাইক্ করতে। যেন মেঝে ও সিঁড়ি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মান প্রতিফলিত করবে। ঐ সময় ঐ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পঠন-পাঠনের অনেক আবশ্যিক বিষয়েরই যথেষ্ট অভাব ছিল। ঐ একই সময়ে শোনা যায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতিতে সভাপতিত্ব করতে যাওয়ার উপলক্ষ্যে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সিংহাসন (Throne Chair) তৈরি করানো হয়েছিল এবং কোন এক বিখ্যাত নার্শারী থেকে বহু হাজার টাকা খরচ করে বড় বড় সুদৃশ্য গাছ টবে করে নিয়ে গিয়ে মাটিতে রোপণ করে মনোজ্ঞ উদ্যান সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল। এই অর্থ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্যে ব্যয় করলে অনেক উপযোগী হত। যখনই বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থার কথা ভাবা হয়, প্রথমেই চোখে ফুটে উঠে তার গৃহাদি ও উদ্যানের কথা। মনোরম উদ্যান ও সুদৃশ্য গৃহ যে সব সংস্থার নেই, সে সব সংস্থাতো উচ্চতর প্রশিক্ষণ বা গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

1964 সাল। ইংলণ্ডে টপলজি (Topology) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্বন্ধে খবর নিতে ঐ বিষয়ে বিখ্যাত গবেষক ও সমতলীয় সেটের টপলজি (Topology of Same Sets) পুস্তক প্রণেতা জানালেন, কেম্‌ব্রিজে (Cambridge) ডঃ জীম্যান্ (Zeemann) এ বিষয়ে সে সময়ে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও বিখ্যাত গবেষক। কেম্‌ব্রিজে তাঁর খোঁজ করতে দেখা গেল, তাঁকে ঘিরে দেশ-বিদেশের এই বিষয়ে খ্যাতনামা গবেষকদের নিয়ে একটি 9 মাসের আলোচনা-চক্র চলছে কেমব্রিজের একটি ছোট গলির জরাজীর্ণ আস্তাবলের মত বাড়ীতে। ডঃ জীমান্ জানালেন সরকারী অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় জনা 12 টপলজির (Topology) বিখ্যাত গবেষকেরা 9 মাস ধরে ঐ আলোচনা-চক্র চালাচ্ছেন। মস্কোতে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী কলমোগোরভ্ (Kolmogorov), বগলুবভ্ (Bogolubov), ভিনোগ্রাডভ্ (Vinogradov) প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা অ্যাকাডেমির যে বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণারত তার মূল বাড়ীটি মোটেই দৃষ্টি

*ফলিত গণিত বিজ্ঞান ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

আকর্ষণ করার মত নয়। অধ্যাপক ফ্রুমকিন (Frumkin) প্রমুখ গবেষকেরা অ্যাকাডেমির যে গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত—সে বাড়ীটির বাইরের রূপ মোটেই আকর্ষণীয় নয়। গয়টিংগেন (Göettingen) বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থ-বিদ্যার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রটি, যার সঙ্গে অধ্যাপক হুনড্ (Hund), অধ্যাপক বরন্ (Born) প্রমুখ জড়িত, সেটি একটি পুরাতন বাড়ীর এক অংশে অবস্থিত। এই কেন্দ্রে বিশ্ববরেণ্য বহু বিজ্ঞানী কোন না কোন সময়ে গবেষণা করে গেছেন। ইটালীর বহু বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র, যেগুলি জাতীয় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্ররূপে পরিচিতি পেয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

এদেশের বড় বড় বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের বড় বড় অধ্যাপকেরা অনেক সময় বক্তৃতায় তাঁদের কেন্দ্রে কত কোটি টাকা খরচ করে যন্ত্রপাতি কিনে গবেষণা হয়েছে, এর বিবরণ যতটা দেন, তাঁরা ঠিক কি করছেন বা নূতন কি তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিশ্ববিজ্ঞানে কতটা স্থান পেলেন, তার বিবরণ দেন না। আমাদের অনেক বড় বড় পরিচিত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞান-কর্মীরা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির সমালোচনায় যতটা তৎপর, তাঁরা নিজেরা কি করছেন, তার পরিচয় দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে ততটা আগ্রহী নন। উচ্চহারে বেতন, ভাল গ্রন্থাগার, বহুমূল্য গবেষণা যন্ত্রাদির সুযোগ পেয়েও তাঁরা বিশ্বের বিজ্ঞানের দরবারে নিজেরা বিজ্ঞানে কতটা পরিচিতি লাভ করেছেন ও তার বিষয়-বস্তু কি তা জানালে অপরাপর গবেষকেরা উপকৃত হতেন।

বহু অর্থব্যয়ে পরিচালিত এই সব বিশেষ পরিচিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থার বড় বড় বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে এমন প্রচার করে বসেন যে, তাঁদের নিজেদেরই অসারতা প্রতিপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 1974 সালের কাছা-কাছি উপরিউক্ত ধরণের একটি গবেষণা সংস্থার একটি বিভাগের প্রধান ঘোষণা করলেন, ভারতে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর বিষয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণার মান অত্যন্ত নিম্নমানের এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রস্তাব যে—একটি ঐ বিষয়ে উচ্চ প্রশিক্ষণের কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে যেখানে সমস্ত ভারত থেকে বিশেষভাবে নির্বাচন করে প্রতিভাবান ছাত্রদের দু'বছরের জন্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐ ছাত্রদের মধ্যে যাদের গবেষক হিসাবে প্রতিভার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে, তাদের প্যারিস বা নিউইয়র্কে পাঠিয়ে গবেষণা প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করানো হবে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে ঐ বিভাগীয় প্রধান যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত, যার জন্যে এই দরিদ্র দেশ গত 30 বছর ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে, সেই সংস্থায় তাঁর থাকার সার্থকতা কি—যদি ছাত্রদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে প্যারিস বা নিউইয়র্কে পাঠাতে হয়।

পরাধীন থাকাকালীন এদেশে কয়েকটি বিজ্ঞানের উচ্চ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তখন বিদেশী শাসকদের প্রচার ছিল—এদেশে উচ্চ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা নিরর্থক। এদেশের লোকেদের বিজ্ঞানচর্চার যোগ্যতা নেই। এজন্যে সে সময়ে যখন কোন গবেষণা ও উচ্চ প্রশিক্ষণ সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা ও দেশের নানাদিকে প্রতিভাধর ব্যক্তিরা ঐ সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' স্থাপনের জন্যে যখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্যোক্তা হয়েছিলেন তখন তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন দেশের কোন কোন বিত্ত-শালী ব্যক্তির এবং রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, শিল্পী নন্দলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের। কাজেই

ঐ সব প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রগুলি অতি সুন্দর গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনোত্তর কালে যে সমস্ত বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, সেগুলি প্রধানতঃ সরকারী পরিকল্পনায় ও সহযোগিতায়। এজন্যে সাধারণতঃ বিজ্ঞানের উচ্চ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় সুরম্য গৃহ ও প্রয়োজনাতিরিক্ত বহু ব্যবস্থা সমন্বিত কয়েকটি গৃহ চোখে ভাসে। কিন্তু এদেশে, এই কলকাতা শহরেও কয়েকটি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে খুব সাধারণ অবস্থার মধ্য দিয়ে এবং সে সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ কোন কোন বিজ্ঞানের গবেষক বিশ্ববিজ্ঞানে নিজেদের প্রতিভার সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইরূপ একটি সংস্থা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (Indian Statistical Institute) প্রতিষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান-গবেষক দ্বারা। 1934 সালের কাছাকাছি এই সংস্থা প্রকাশ্যে কাজ সুরু করে এর প্রধান উদ্যোক্তা অধ্যাপক মহলানবিশের (Prof. Mahalanobis) কারু-শালার এক অংশে। প্রায় 10/12 বছর এই সংস্থার যে সম্প্রসারণ হয় তা মূলতঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারের (Laboratory) এক অংশে। কিন্তু এ সময়ে এখানে গবেষণা করে জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন অধ্যাপক রাজচন্দ্র বসু, সমর রায় প্রমুখ অধ্যাপকগণ। আজ এই সংস্থার শাখা-উপশাখা ভারতের প্রায় সকল প্রধান শহরে বিস্তৃত এবং এখন এই সংস্থা পৃথিবীর বিজ্ঞান সভায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

আজও এই বিশাল দেশে বিজ্ঞানের উচ্চ মানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই জন্যে নূতন নূতন সংস্থা স্থাপিত হওয়া উচিত। তবে এই দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের এই সব সংস্থা স্থাপনের জন্যে বিরাট বিরাট ব্যয়বহুল অট্টালিকা, উচ্চহারে বেতনভুক্ কর্মী, কোটি কোটি টাকার বাজেট প্রভৃতি প্রারম্ভিক প্রয়োজন ভাববার সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নতির প্রয়োজনে বিজ্ঞানের সংস্থা গঠনে বিজ্ঞানের উচ্চমান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞানীদের বিশেষ পরিশ্রম করা (এমনকি অবৈতনিক ভাবেও) আবশ্যক। আচার্য বসু তাঁর জীবন সায়াহ্নে 1974 সালে নানা সভা-সমিতি ও রেডিওতে যে আবেদন রেখে গেছেন, তাতে এবিষয়ে সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছেন। আমরা—বিজ্ঞানীরা, অন্য উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়ে এই আবেদনকে যেন অগ্রাহ্য না করি।

ভাসমান সচল মহাদেশ

সুখেন্দু দত্ত*

মহাদেশগুলি বিভিন্ন দিকে ভেসে যাচ্ছে; বছরে কয়েক সেন্টিমিটার হারে। প্রায় বিশ কোটি বছর আগে; মহাদেশগুলি একত্রে যুক্ত এক অখণ্ড অতিমহাদেশ (supercontinent) আকারে ছিল, যাকে বলা হয় প্যানজিয়া (Pangaea)। এই অখণ্ড স্থলভাগ ক্রমে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে বিগত বিশ কোটি বছরে ভেসে এসে অবশেষে আমাদের পরিচিত মহাদেশ আকারে বর্তমান অবস্থানে পৌঁচেছে। উল্লিখিত অতিমহাদেশটিও ভেসে-আসা কতকগুলি পৃথক ভূখণ্ড একত্রিত হয়েই গঠিত হয়েছিল। এই ভূখণ্ডগুলির ভৌগোলিক চিত্র বর্তমান মহাদেশগুলির মত ছিল না। বর্তমান মহাদেশগুলিও ভেসে গিয়ে কোন স্থানে সুদূর ভবিষ্যতে আবার জড় হবে। 460 কোটি বছরের ভূতত্ত্বীয় ইতিহাসে এরূপ ভেঙে ছড়িয়ে পড়া এবং একত্র যুক্ত হবার লীলাখেলা ঘুরেফিরে কতবার পূর্ণ হয়েছে, তা জানা যায় নি।
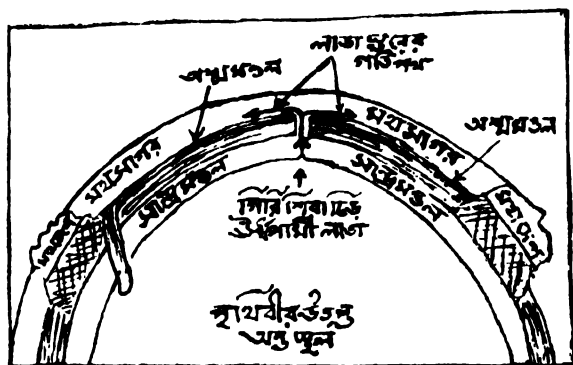
ভূত্বকের বিশেষ ধরণের গঠনের জন্যেই মহাদেশগুলি ভাসমান। ভূত্বকের শিলীভূত মণ্ডল বা অশ্মমণ্ডল অখণ্ড নয় (অনেকটা ফুটবলের খোলের গঠনের মত)। বিভিন্ন আকারের কতকগুলি প্রস্তরপাত বা প্লেট (50 কিলোমিটার থেকে 150 কিলোমিটার পুরু) সাজিয়ে তৈরী বা সংগঠিত। এগুলি ভেসে আছে অর্ধগলিত প্রস্তরের একটা চট্‌চটে বা সান্দ্রমণ্ডলের উপর। সান্দ্রমণ্ডলের নীচে রয়েছে তরল লাভাস্রোত। ভাসমান প্লেটগুলির উপর সওয়ারী হয়ে আছে মহাদেশ ও মহাসাগর। মহাদেশবাহী প্লেট গুরুভার বোঝা নিয়ে কি প্রক্রিয়ায় ভেসে যাচ্ছে; তার ব্যাখ্যা পেতে হলে মহাসাগরের তলাকার প্লেটে কি ঘটছে, তা লক্ষ্য করতে হবে।

মহাসাগরের তলে আছে এক অবিচ্ছিন্ন 7500 কিলোমিটার লম্বা গিরিশিরা। এই গিরিশিরা এঁকেবেঁকে টেনিস বলের উপরকার শিরার

চিত্র 1—মহাদেশ সঞ্চরণ প্রক্রিয়া

* "সুবর্ণা" বলাইবাবু রোড, মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা

মত মহাসাগরতল বেষ্টন করে আছে। শিরার মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি গভীর চিড় বা ফাটল। এই ফাটল দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে তরল লাভা অবিরাম বেরিয়ে এসে ফাটলের দু-পাশে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রতলের প্লেটের উপর স্তরের পর স্তর তৈরি করছে। লাভাস্তর হাজার হাজার কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে মহাদেশের কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে। সম্ভবত এই অতি মন্থরগতি লাভাস্তরের সমষ্টিই মহাদেশবাহী প্লেটকে সঞ্চালিত করছে (চিত্র 1)।

সম্মিলিত মহাদেশের কল্পনা নূতন নয়। দক্ষিণ-আমেরিকা ও আফ্রিকার মানচিত্র পাশাপাশি সাজালে পার্শ্বরেখা মিলে গিয়ে এই দুই মহাদেশও এক ভূখণ্ডের মত দেখায়। এটা কৌতূহলী ভূগোল-শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করে এসেছেন এবং আফ্রিকার গিনি উপসাগরের শিলাস্তরের বয়স ও গড়নের অভিন্নতা এবং দক্ষিণ-আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও সুদূরে অবস্থিত ভারত-বর্ষের শিলীভূত উদ্ভিদ ও মিষ্টি জলের প্রাণীর অভিন্ন রূপ থেকে এই শতাব্দীর গোড়াতেই অনুমান করা হয়েছিল যে, এই মহাদেশগুলি নিশ্চয়ই কোন এককালে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু মহাদেশ সঞ্চরণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা জানা না থাকায়, তখন এই ধারণা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি।

মহাসাগরতলের বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ করে এখন স্তরের বয়স, গতিমুখ ও বেগ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। অনেক নীচের (16 কোটি বছরের পুরনো) স্তরের নমুনাও সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা থেকে কোন্ মহাদেশ, কত বেগে, কোন্ পথে ভেসে এসেছে, তা জানা যাচ্ছে। বিশ কোটি বছর আগে, এরা একত্রিত অবস্থায় বর্তমান দক্ষিণ আটলান্টিকে বিষুবরেখায় কেন্দ্র করে ছিল। ভারতবর্ষ কুমেরু এবং জাপান সুমেরু অঞ্চলে ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা-আফ্রিকা এবং অ্যানটার্কটিকা-অষ্ট্রেলিয়া এই দুই ভূভাগের মধ্যে বিশ কোটি বছর আগে প্রথম বিচ্ছেদ সুরু হয়। পরে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরে সরে আসতে থাকে। উত্তর আমেরিকা চলে উত্তর-পশ্চিমে। ইউরেশীয় প্লেট উত্তরে এবং তার পিছনে চলে আফ্রিকার প্লেট। দক্ষিণ আমেরিকা পশ্চিমে সরে যায়। গ্রীণল্যাণ্ড ও উত্তর ইউরোপ পরস্পরকে ছেড়ে চলে। সবার শেষে বিচ্ছেদ ঘটে অ্যানটার্কটিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে।

চিত্র 2—বিশ কোটি বছর আগে　　চিত্র 3—দুই কোটি বছরে পরিবর্তন

ভূগোলকের সমগ্র ইতিহাস চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কুচিত করে দেখলে অতিমহাদেশের অখণ্ড প্লেটে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বর্তমান অবস্থানে ভেসে আসতে সময় লেগেছে মাত্র এক ঘণ্টার কিছু বেশী। ভূতত্ত্বীয় বিচারে বিশ কোটি বছর বিশেষ কিছুই নয়। (চিত্র—2, 3, 4 এবং 5-এ বিভিন্ন সময়ে মহাদেশগুলির অবস্থান দেখানো হয়েছে) ভাসমান সচল প্লেটের ধারণা থেকে

অনেক ভূতত্ত্বীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। বিভিন্ন পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি ও আগ্নেয়দ্বীপের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিধ্বংসী ভূমিকম্পের মূল কারণ বোঝা যাচ্ছে। এ সমস্তই সচল প্লেট-গুলির মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ফল।

হচ্ছে। এক্ষেত্রে মহাদেশ ও মহাসাগরবাহী প্লেটে সংঘর্ষ চলছে। প্রশান্ত মহাসাগরের শিলাস্তর ও তলানি স্তূপীকৃত হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যানডিজ (Andes), উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের পর্বতমালা, অ্যালুসিয়ান্স (Aleutians) দ্বীপমালা

চিত্র 4—তের কোটি বছরে পরিবর্তন

চিত্র 5—বর্তমান অবস্থান

ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে।

এমন কতক পর্বত আছে, যা বিশ কোটি বছরের অধ্যায়ে সৃষ্টি হয় নি। আনুমানিক ত্রিশ কোটি বছর আগে রাশিয়াবাহী ও সাইবেরিয়াবাহী প্লেটের সংঘর্ষে ইউরাল্‌সের (Urals) উৎপত্তি হয়েছিল।
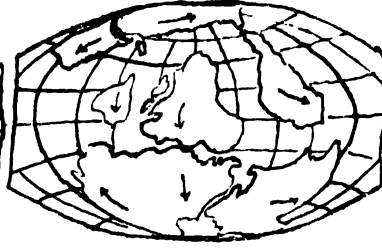
আফ্রিকাবাহী প্লেট এগিয়ে ইউরোপবাহী প্লেটে ধাক্কা দিলে পিরেনিজ (Pyrenees), অ্যাপিনিজ (Apennies) এবং আল্পসের (Alps) উৎপত্তি ঘটে। ইটালীর সাম্প্রতিক (মে '76) ভূমিকম্প অ্যাড্রিয়াটিক বেল্টের উপর আফ্রিকাবাহী প্লেটের চাপের ফলেই ঘটেছে। আফ্রিকা পশ্চিম এশিয়ার উপরও চাপ দিচ্ছে।

ভারতবর্ষবাহী প্লেট সবচেয়ে বেশী পথে চলে এসেছে। 18 কোটি বছর 8800 কিলোমিটার অর্থাৎ গড়ে পাঁচ সেণ্টিমিটার অতিক্রম করে এশিয়াবাহী প্লেটের দক্ষিণ সীমানায় পৌঁচেছে। এই দুই প্লেটের মুখোমুখি সংঘর্ষে জন্ম নিল পর্বত গোষ্ঠীর সর্বকনিষ্ট বংশধর গিরিরাজ হিমালয়। গৌরীশঙ্করের সুউচ্চ শীর্ষে আরোহণের অর্থ, আগেকার সমুদ্রতলে পদার্পণ। হিমালয়ে সামুদ্রিক জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আটলান্টিক ক্রমশঃ প্রশস্ত হচ্ছে ও প্রশান্ত মহাসাগর ছোট হচ্ছে। দুই আমেরিকা এক দিক থেকে এবং এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া অন্য দিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর ক্রমশঃ গ্রাস করে, নিকটবর্তী

পূর্ব এশিয়ায় বারবার ভূমিকম্প হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলও অব্যাহতি পাচ্ছে না। সম্প্রতি (জুলাই-অগাষ্ট 1976) চীনে, জাপানে এবং ফিলিপাইনে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট ও ভারতবর্ষের প্লেট ক্রমাগত সাইবেরিয়া ও চীনবাহী প্লেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দুই দিক থেকে চাপের ফলে প্লেটে প্লেটে ঠোকাঠুকি চাপাচাপি হচ্ছে। তা থেকেই এই বিপর্যয় ঘটছে।

ভাসমান প্লেটগুলির বর্তমান সঞ্চরণ বেগ বজায় থাকলে আগামী পাঁচ কোটি বছরের সম্ভাব্য পরি-বর্তনের সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাস হল—ভারত মহাসাগরের এবং আটলান্টিকের পরিধি বেড়ে চলবে। প্রশান্ত মহাসাগর আয়তনে ক্রমে ছোট হবে। আফ্রিকা আরও এগিয়ে ভূমধ্যসাগরের কতকাংশ গ্রাস

করবে। হিমালয়ের উচ্চতা ও বিস্তার বাড়বে। অষ্ট্রেলিয়া উত্তরে এগিয়ে বিষুব রেখায় স্থান করে নেবে। দুই আমেরিকা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যাবে। লস্ এঞ্জেলস্ শহর নিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ার কতকাংশ আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। এক কোটি বছরে উক্ত শহর এবং সানফ্রান্সিসকো শহর পাশাপাশি আসবে। সানফ্রান্সিসকো মূল ভূখণ্ডেই থাকবে।

কর্পূরের উপকারিতা

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

সাম্প্রতিককালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কর্পূরের ব্যবহারের কথা শোনা যাচ্ছে। আগেও শিল্পে এবং ওষুধে এর যে ব্যবহার হত না তা নয়, তবে ততটা আধুনিক উপায়ে নয়। কর্পূর বলতে আমরা সাধারণতঃ জাপান-কর্পূরকেই বুঝি। ক্যাম্ফর গাছ (সিনামোনাম ক্যাম্ফরা) থেকে। ক্যাম্ফর বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে আহরণ করা হত। এই সব গাছ সাধারণতঃ জাপান, ফরমোসা এবং চীনেই অনেকাংশে বেশী জন্মায়। এই সব গাছের যে কোন অংশ থেকেই পাতনক্রিয়ার সাহায্যে কর্পূর তৈরি করে নেওয়া হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় কর্পূর পেতে হলে একে আবার ঊর্ধ্বপাতন করিয়ে নিতে হয়। ভারতের দেরাদুনে, শোহারামপুরে এবং কলকাতায় কিছু কিছু কর্পূর গাছ চাষের ব্যবস্থা আছে। দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বর্তমান সময়ে তুলসী থেকে ক্যাম্ফর (কর্পূর) সংগ্রহ করার জন্যে একটি কারখানা গড়ে তুলেছে। তুলসী চাষের নব্বই দিনের মধ্যেই কর্পূর এবং কর্পূর-তেল এই গাছ দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। তামিলনাড়ুর বনেও সে রকম চেষ্টা চলছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমে বাংলায় এইরূপ কিছু উদ্ভিদের প্রবল এখনও কিছু হয় নি।

ক্যাম্ফর (camphor) হল সেই পুরাতন টার্পিন। এটি একটি কঠিন পদার্থ, এর গলনাঙ্ক 179°C। এটি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কিন্তু প্রকৃতিতে (+) কিংবা (–) দুই-ই পাওয়া যায়। জাপান-ক্যাম্ফর হচ্ছে (+)। অপরটি খুবই বিরল, লিভো-বর্নিয়োল (levo-borneoi) কে জারিত করেই অপরটি সংগৃহীত হয়।

ব্যবহার—কেউ কেউ মনে করেন যে, কর্পূরের রক্তপাত (ক্যাপিলারি ব্লিডিং) বন্ধের কাজে একটি প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা কর্পূরের জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতার পরিচয় পান।

বিগতকালে কর্পূর মিষ্ট জাতীয় পদার্থ তৈরির কাজে সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হত। পানীয় জলকে বিশুদ্ধ করতেও কর্পূর অপরিহার্য। কর্পূর থেকে বিভিন্ন অ্যাণ্টিসেপটিক এবং অ্যানস্থেটিক পদার্থ তৈরি করা হয়। এটি একটি বেদনানাশক বস্তু। কোন কোন বস্তুর আণবিক ওজন নির্ণয়ের কাজে কর্পূরকে দ্রাবক হিসাবে ক্রায়োস্কোপিক (cryoscopic method) ব্যবহার করা হয়। সেলুলয়েড কিংবা ধূম্রবিহীন পাউডার (somoke less powder) তৈরি করার জন্যে কর্পূর দরকার (plasticizer)।

---

* রসায়ন বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

সংশ্লেষিত (synthetic) **কর্পূর**—টারপেনটাইনে (turpentine) যা আছে, তাতে হয় আল্‌ফা পাইনিন, না হয় বিটা-পাইনিন (α or β pinene)। এই আল্‌ফা পাইনিন কিংবা বিটা-পাইনিন উপাদানের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটলে বোর্নাইল ক্লোরাইড (bornyl chloride) নামক অন্য একটি পদার্থের সৃষ্টি হয়। এর পর এই বোর্নাইল ক্লোরাইড থেকে আইসোবোর্নাইল অ্যাসিটেট (isobornyl acetate), আইসো-বোর্নিয়ল (isoborneol) এবং অবশেষে আইসো-বোর্নিয়লের জারণক্রিয়ায় তৈরি হয় কর্পূর। ইদানীং চিরপাইন টারপেনটাইন থেকে (chirpine turpentine) উত্তরপ্রদেশ সংশ্লেষিত কর্পূর তৈরি করছে, তবে পরিমাণে তা খুবই নগণ্য। সংশ্লেষিত আর প্রাকৃতিক কর্পূর দুই-ই ধর্মে এক, তবে এটি অপ্‌টিক্যালি ইন-অ্যাকটিভ।

মন্তব্য—যদিও কর্পূর রক্তপাত বন্ধ করতে পারছে, তবুও ঐ কর্পূর কোন্‌টি সংশ্লেষিত না প্রাকৃতিক, তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। আশা করা যায়, দুয়ের মধ্যে ধর্মের বিশেষ তফাৎ না থাকায় দুটিরই কাজ একই রকমের হবে। তবুও বিষয়টি আরো ভালভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন নয় কি? ইদানীং প্রাকৃতিক সূত্র ভিন্ন যাতে কর্পূর মিলে, তার জন্যে ভারতও ব্যগ্র। চিরপাইন টারপেনটাইন থেকে সংশ্লেষিত কর্পূর পাওয়ার জন্যে ভারতের প্রয়াস চলছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত. উত্তরপ্রদেশের ঐ উপাদানের মধ্যে আলফা পাইনিন এতই কম, যার ফলে বাণিজ্যিক আকারে উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণতঃ যে সব টারপেনটাইনে শতকরা 70 থেকে 90 ভাগ আলফা-পাইনিন থাকছে, তার থেকেই সংশ্লেষিত কর্পূর তৈরি করা হয়।

সংশ্লেষিত কর্পূর রেসেমিক (racemic)। তাছাড়া ধর্মের দিক দিয়ে প্রাকৃতিক কর্পূর আর সংশ্লেষিত কর্পূরের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য নেই। আশা করা যায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই কর্পূরের অজ্ঞাত আরো অনেক ধর্ম ও তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

সমসাময়িকতা ও গতিসীমা

সৌরেন্দ্র দাশ*

পৃথক পৃথক স্থানে সংঘটিত দুটি ঘটনা তাদের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে একই সময়ে দৃষ্টিগোচর হলে ঘটনা দুটি সমসাময়িক বলে বিবেচিত হয়। ভূপৃষ্ঠস্থিত পর্যবেক্ষকদের অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে স্থির এমন পর্যবেক্ষকদের পক্ষে সমসাময়িকতার এই সংজ্ঞা বেশ সন্তোষজনক। কিন্তু যখন বিভিন্ন পর্যবেক্ষক পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল, তখনই অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

মনে করা যাক, একটি রেলগাড়ী সমগতিতে সরল রেখায় চলছে। আরও মনে করা যাক, রেলগাড়ীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত কোন উৎস থেকে আলোকরশ্মি রেলগাড়ীর সম্মুখ ও পিছনের কামরায় অবস্থিত দুটি স্বয়ংক্রিয় দরজায় পৌঁছনো মাত্র দরজা দুটি খুলে যাবে।

মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষা অনুযায়ী রেলগাড়ী সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে আলোকরশ্মি সব দিকেই একই গতিতে অর্থাৎ সেকেণ্ডে 3,00,000 কিলোমিটার গতিতে চলে। অতএব রেলগাড়ীর সম্মুখের ও পিছনের কামরায় আলোকরশ্মি একই সময়ে পৌঁছবে। আবার স্টেশন প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কেও আপেক্ষিকভাবে রশ্মি ওই একই গতিতে চলে। স্টেশনে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে পিছনের কামরা আলোকরশ্মি যে দিকে চলছে, তার বিপরীত দিক থেকে এসে আলোকরশ্মিকে ধরবে এবং সম্মুখের কামরাকে স্পর্শ করতে আলোক রশ্মিকে পিছন দিক থেকে ছুটে গিয়ে ধরতে হবে।

স্টেশনে অপেক্ষমান পর্যবেক্ষকদের কাছে আলোকরশ্মি পিছনের কামরায় আগে ও সামনের কামরায় পরে পৌঁছবে। অতএব আলোর স্পর্শে সম্মুখ ও পিছনের দরজা খুলে যাওয়া—এই ঘটনাদ্বয় রেলগাড়ীর যাত্রীদের কাছে একই সময়ে ঘটবে এবং স্টেশনে অপেক্ষমান পর্যবেক্ষকের কাছে বিভিন্ন সময়ে ঘটবে।

পৃথিবী সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে রেলগাড়ী যতখানি গতিশীল, রেলগাড়ী সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে পৃথিবীও ঠিক ততখানি গতিশীল। পৃথিবী অপেক্ষা রেলগাড়ীর গতিশীলতা যে অধিকতর বাস্তবানুগ, তা বলা যায় না। পৃথিবী ও রেলগাড়ীর মধ্যে কে বাস্তবিকই গতিশীল—এই বিতর্ক একেবারেই নিরর্থক। কারণ নিরপেক্ষ গতি একটি অলীক কল্পনা এবং সমস্ত গতিই আপেক্ষিক।

দূরবর্তী ঘটনাদ্বয়ের ঠিক মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে ঘটনাদ্বয় একই সময়ে দৃষ্টিগোচর হলে ঘটনা দুটিকে সমসাময়িক ধরা হয়।

এই মধ্যবিন্দুর অবস্থিত নিরূপণে পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন্‌টিকে বেছে নেওয়া হবে—এ বিষয়ে কোন নিয়ামক নীতি নেই। এগুলির যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। যেমন আলোচ্য দৃষ্টান্তে রেলগাড়ী বা স্টেশনের যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন বস্তুর পক্ষে দুটি ঘটনা সমসাময়িক হলেও এমন আরও বস্তু পাওয়া যাবে যাদের সম্পর্কে ঘটনাদ্বয়ের প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা পূর্বে সংঘটিত হবে। ঠিক

* 3/3ই, ডি. গুপ্ত লেন, কলিকাতা-700 050

এমনি করেই অপর আরও বস্তুর পক্ষে দ্বিতীয়টি প্রথম ঘটনা অপেক্ষা পূর্বে সংঘটিত হবে। অতএব দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় না যে দুটি দূরবর্তী ঘটনা সমসাময়িক। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষকের পক্ষেই এই ধরনের বক্তব্যের একটা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

দুটি ঘটনা সমসাময়িক কিনা এই সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যে কারণে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, ঠিক সেই কারণেই দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কেও মতপার্থক্য ঘটে। আমাদের হিসাবে মঙ্গলগ্রহে সংঘটিত যে দুটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান এক ঘণ্টা আমাদের সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল, অপর একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে সেই একই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান এক ঘণ্টার বেশী বা কম হতে পারে।

প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের বিচারে ঘটনাসমূহের একটা বিশেষ পরম্পরা রয়েছে এবং সেই পরম্পরার উপর ভিত্তি করে উক্ত পর্যবেক্ষকের পক্ষে প্রযোজ্য সময় নিরূপণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। আমাদের নিজস্ব সময় নিরূপণ পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আমাদের অভিজ্ঞতা। ভূপৃষ্ঠে আমরা সকলেই পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে প্রায় স্থির অর্থাৎ আমাদের পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিক গতি এত বেশী নয় যে, একের সময় নিরূপণ পদ্ধতি অন্যের সময় নিরূপণ পদ্ধতি অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যরূপে ভিন্ন হতে পারে। তাই আমাদের সকলের সময় নিরূপণ পদ্ধতি অভিন্ন এবং সেই অভিন্ন পদ্ধতিতে নিরূপিত কোন ঘটনার সময়ও সকলের পক্ষে অভিন্ন। এই সিদ্ধান্ত শুধু বৃহৎ বস্তুর পক্ষে প্রযোজ্য; পরীক্ষাগারে অতি প্রচণ্ড গতিতে চলমান ক্ষুদ্র বিটা কণার পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপতে হলে পর্যবেক্ষক তাঁর সঙ্গে সমভাবে গতিশীল ফুটরুল ব্যবহার করেন। নির্দেশের দৈর্ঘ্যের দু-প্রান্তের উপর ফুটরুলের উপর যে দুটি বিন্দুকে একই সময়ে স্থাপিত করা যায়, ফুটরুলের উপর অবস্থিত সেই বিন্দুদ্বয়ের ব্যবধানকে নির্দেশের দৈর্ঘ্য হিসাবে ধরা হয়। নির্দেশের দৈর্ঘ্যের দুই প্রান্তের উপর ফুটরুলের দুটি বিন্দু একই সময়ে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। অতএব দেখা যাচ্ছে নির্দেশের দৈর্ঘ্যের এক প্রান্তের উপর ফুটরুলের একটি বিন্দু স্থাপিত হওয়া এবং অপর প্রান্তের উপর ফুটরুলের অপর একটি বিন্দু স্থাপিত হওয়া—এই ঘটনাদ্বয়ের সমসাময়িকতার উপর দৈর্ঘ্য পরিমাপের পদ্ধতি অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল। ফুটরুলের কোন্ দুটি বিন্দু নির্দেশের দৈর্ঘ্যের দুই প্রান্তের উপর একই সময়ে স্থাপিত হবে, তা নির্ভর করে যে বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে, তার সম্পর্কে ফুটরুল তথা পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির উপর। অতএব দেখা যাচ্ছে কোন পর্যবেক্ষকের দ্বারা নির্ণীত কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে—ঐ বস্তু সম্পর্কে পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির উপর।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট বলের প্রভাবে বস্তুর উৎপন্ন গতিবেগ বল প্রয়োগের সময়ের অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নির্দিষ্ট বলের প্রভাবে কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট গতিবেগ প্রদানের সময় বস্তুর ভরের সমানুপাতিক। কিন্তু বস্তু যখন প্রচণ্ড গতিতে চলে তখন এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। তখন বস্তুর উপর কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় অর্থাৎ বস্তুকে বিশেষ গতিবেগ প্রদানের সময় পর্যবেক্ষকের সম্পর্কে বস্তুর আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে। অতএব দেখা যাচ্ছে বস্তুর ভরও পর্যবেক্ষক সম্পর্কে বস্তুর আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করছে।

দূরত্ব, সময় ও ভর নিরূপণে যে মৌলিক প্রত্যয় আমরা অত্যন্ত স্বভাবজাতভাবে প্রয়োগ করি, তা হল সমসাময়িকতার প্রত্যয়।

বাস্তবিকই যদি আমরা অসীম গতিতে নির্দেশ পাঠাতে পারতাম, তা হলে পর্যবেক্ষক-নিরপেক্ষভাবে দুটি ঘটনা সমসাময়িক হত। তখন দুটি ঘটনা থেকে অসীম গতিতে ধাবমান নির্দেশ যে কোন স্থানে একই সময়ে পৌঁছলে ঘটনা দুটিকে সমসাময়িক বলা হত। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সময় পর্যবেক্ষক-নিরপেক্ষ নয়। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, কোন নির্দেশ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে তা অন্য স্থানে পৌঁছতে পারে না। অর্থাৎ এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর ব্যবধান অতিক্রম করবার গতি অসীম হতে পারে না। যেহেতু এই গতি অসীম হতে পারে না, সেহেতু এর একটা সীমা থাকবে এবং এটাই গতিসীমা।

পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল পর্যবেক্ষকের পক্ষে নৈসর্গিক নিয়মাবলী একই। অতএব পর্যবেক্ষকের পক্ষে গতিসীমা একই। আবার আলোর গতি সমস্ত পর্যবেক্ষকের পক্ষে সমান। অতএব আলোর গতিই গতিসীমা বলে বিবেচিত হয়।

সময় নিরূপণে সমসাময়িকতার যে প্রত্যয় প্রয়োগ করা হয়, তার অনিবার্য ফল হল পর্যবেক্ষকের গতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিরূপিত সময়ের পরিমাপেরও পরিবর্তন। সমসাময়িকতার এই প্রত্যয় অনুযায়ী দুটি ঘটনা যখন তাদের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের দ্বারা একই সময় দৃষ্টিগোচর হয়, তখন ঘটনা দুটিকে সমসাময়িক বলা হয়। যেহেতু আলোর একটা সসীম গতি আছে, সেহেতু দুটি ঘটনা কোন বিশেষ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সমসাময়িক হলেও পর্যবেক্ষকের সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল অপর একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সমসাময়িক হবে না। পর্যবেক্ষকের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ সময়ের পরিমাপের পরিবর্তনের মূলে এটিই কারণ। আদিমকাল থেকে প্রচলিত অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে সমসাময়িকতার এই প্রত্যয় আমরা ব্যবহার করে আসছি। যখন আমরা কোন বস্তু দেখি, তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকতাবেই তার আকার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হয়। এখানেও আমরা স্বভাবজাতভাবেই আলোর গতির উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার এই প্রত্যয়কে প্রয়োগ করি। অতএব পরস্পরের সম্পর্কে গতিশীল বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে একই বস্তুর আকার অসমান হয়। দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বা কোন বস্তুর আকার নিরূপণে আমরা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ব্যবহার করি। অতএব আলোর গতির উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার প্রত্যয়কে স্বাভাবিকভাবে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই আলোর গতির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পর্যবেক্ষকের গতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষক কর্তৃক নিরূপিত সময়ের বা কোন বস্তুর আকারের পরিমাপের পরিবর্তন আলোর গতির সসীমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ থেকে কি সত্যই প্রমাণিত হয় যে, কোনও সংকেত আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে চলতে পারে না?

সসীম গতিতে প্রবহমান আলোর গতির উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সময় ও দূরত্ব পরিমাপের পদ্ধতিতে আমরা আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতি পেতে পারি না।

আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতি পেতে হলে অনুরূপ গতি বা তদপেক্ষা আরো দ্রুততর গতিতে প্রবহমান সংকেতের উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার ভিত্তির উপর সময় ও দূরত্ব পরিমাপের পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

আলোর গতির উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতি সম্ভব নয়।

যে সমস্ত মৌলিক প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে আইনস্টাইনের প্রখ্যাত সমীকরণ

$$Mv = \frac{M_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আলোর গতির উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার প্রত্যয় সেগুলির অন্যতম। এই সমীকরণ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, C অর্থাৎ আলোর গতি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে কোন বস্তু চলতে থাকলে তার ভর কাল্পনিক হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িকতার প্রত্যয় যদি ভিন্ন হত অর্থাৎ আলো অপেক্ষা কোন দ্রুততর গতিতে ধাবমান দুটি ঘটনার সংকেত ঐ ঘটনা দুটির ঠিক মাঝখানে অবস্থিত কোন ব্যক্তির কাছে যুগপৎ পৌঁছলে ঘটনা দুটি যদি সমসাময়িক বিবেচিত হত তবে পূর্বোক্ত সমীকরণে উপনীত হওয়া যেত না এবং আলো অপেক্ষা দ্রুততর অথচ পূর্বোক্ত সংকেতের গতি অপেক্ষা কম গতিতে ধাবমান বস্তুর ভর যে কাল্পনিক—এরূপ সিদ্ধান্ত করা যেত না।

নির্দিষ্ট বলের প্রভাবে বস্তুর উৎপন্ন গতিবেগ বল প্রয়োগের সময়ের অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নির্দিষ্ট বলের প্রভাবে কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট গতিবেগ প্রদানের সময় বস্তুর ভরের সমানুপাতিক। কিন্তু বস্তু যখন প্রচণ্ড গতিতে চলে তখন বস্তুর উপর কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় অর্থাৎ এখানে বস্তুকে বিশেষ গতিবেগ প্রদানের সময় পর্যবেক্ষকের সম্পর্কে ঐ বস্তুর আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভরশীল। অতএব বস্তুর ভরও পর্যবেক্ষক সম্পর্কে বস্তুর আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে পর্যবেক্ষক সম্পর্কে বস্তুর আপেক্ষিক গতি বৃদ্ধি পেলে পর্যবেক্ষকের বিবেচনায় বস্তুর ভরও বৃদ্ধি পায়। তাই নির্দিষ্ট বলের প্রভাবে বস্তুর গতিবেগ যতই বৃদ্ধি পায়, বস্তুর ভরও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় এবং বস্তুর ভর যত বৃদ্ধি পায় বস্তুর বেগবৃদ্ধির হারও তত হ্রাস পায়। বস্তুর বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেগ বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার ফলে বস্তুর বেগ গতিসীমা তথা আলোর গতিকে অতিক্রম করতে পারে না।

কোন বলের প্রভাবে বস্তু যে সর্বাধিক গতিবেগ পেতে পারে তা আলোর গতিকে অতিক্রম করতে পারে না—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমসাময়িকতার প্রচলিত ধারণাকে একটা মৌলিক প্রত্যয়রূপে মেনে নেওয়া হয়েছে।

সমসাময়িকতার ধারণা যদি ভিন্ন হত অর্থাৎ আলোর গতি অপেক্ষা দ্রুততর গতির উপর নির্ভরশীল হত, তাহলে কোন বস্তু হয়ত আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতি পেতে পারত।

সময়, দৈর্ঘ্য ও ভর নির্ণয়ে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ব্যবহার করি। সুতরাং এই কাজে অনিবার্যরূপে আলোর গতির উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার ধারণাকে প্রয়োগ করতে হয়।

আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে ভ্রাম্যমান সংকেত সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল সমসাময়িকতার ভিত্তিতেই কেবল বাস্তবায়িত হতে পারে আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতি।

কোন বস্তু যদি আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে ভ্রমণ করত, তবে সেই বস্তু অদৃশ্য হয়ে যেত কারণ তার পরিমাপ, তার উপর সংঘটিত কোন ঘটনার সময় বা তার ভর প্রচলিত সমসাময়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পরিমাপ পদ্ধতি অনুসারে কাল্পনিক হয়ে দাঁড়াত।

যে গতির উপর সমসাময়িকতার মাপকাঠি নির্ভরশীল সেই গতির চেয়ে দ্রুততর গতি সমসাময়িকতার উক্ত মাপকাঠির উপর প্রতিষ্ঠিত পরিমাপ পদ্ধতি অনুসারে পাওয়া অসম্ভব। যে যুক্তিতে অর্থাৎ পরিমাপ পদ্ধতিতে আলোর গতিকে গতিসীমা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সেই পদ্ধতির মূল ভিত্তির ফলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে।

তাই আলোর গতিই গতিসীমা—এই তত্ত্বকে একটা প্রাকৃতিক তত্ত্ব বলা যায় কি এবং আলো অপেক্ষা দ্রুততর গতি কি সত্যই অসম্ভব?

জীবাণু ও আমরা

অশোককুমার সরকার*

বিচিত্র এই জীবজগতের মধ্যে এমন কিছু জীবের কথা আজকের যুগে প্রায় সকলেই শুনেছে, খালি চোখে যাদের দেখা যায় না, দেখতে গেলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়, এরাই হল জীবাণু। এই সব জীবাণু প্রথম আবিষ্কার করেন অ্যাণ্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক, (1632-1723)। তিনি একটি সরল (অর্থাৎ একটি মাত্র লেন্সযুক্ত) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক ফোঁটা জল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তাতে এরকম অজস্র অতি ক্ষুদ্র জীবের সন্ধান পান। পরবর্তীকালে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের (1822-1895) গবেষণায় এই সব জীবাণুর প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়। জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ্ প্রথম এদেরকে রোগের কারণ হিসাবে নির্দেশ করেন। প্রকৃত পক্ষে এই সব জীবাণু সর্বব্যাপী, এরা ছড়িয়ে আছে জলে, বাতাসে, মাটিতে, খাবারের মধ্যে, আবর্জনার স্তূপে, এমনকি আমাদের তথা সকল প্রাণীর দেহের বহির্ভাগে ও সেই সঙ্গে অন্তর্ভাগে; একদিকে বদ্ধপুকুর, অন্যদিকে বেগবতী নদী, একদিকে মাটির নীচের সুগভীর পেট্রোলিয়াম খনি, অন্যদিকে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ—সর্বত্রই এদের দেখা মিলবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু সর্বদাই এদেরকে ভয়ের চোখে দেখে রোগের কারণ হিসাবে। আসলে কিন্তু অধিকাংশ জীবাণুই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, বরং বহু জীবাণুই আমাদের পক্ষে পরম উপকারী এবং শুধু আজ নয় স্মরণাতীত কাল থেকে এরা মানুষের অনেক উপকারই করে আসছে মানুষের অজ্ঞাতসারে। যেমন ধরা যাক, মদ্যজাতীয় পানীয়ের কথা, বৈদিক যুগে যাকে বলা হত সোমরস। অন্ততঃ দশ হাজার বছর ধরে মানুষ আঙুরের রস থেকে এই সব পানীয় তৈরি করে আসছে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। শত বছর আগেও মানুষের জানা ছিল না যে, ঐ আঙুরের রস বাতাসে ফেলে রাখলে বাতাসে ভাসমান ইষ্ট নামে এক ধরণের ছত্রাক তাতে বাসা বাঁধে, যার ফলে তা অ্যালকোহলে পরিণত হয়। প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরই প্রথম 1860 সালে প্রমাণ করেন যে, এই ঘটনা ইষ্ট নামক এক ধরণের জীবন্ত কোষের দ্বারা সংঘটিত হয়। পরবর্তীকালে 1897 সালে বুকনার প্রমাণ করেন যে, ইষ্ট নয়, ইষ্টের দেহনিঃসৃত একরকম কোষবিহীন জলীয় দ্রবণই এই কাজ করতে সক্ষম। ঐ তরল পদার্থটিকে গরম করলে কিন্তু তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে সিদ্ধান্ত হল এই যে, ইষ্টকোষ থেকে একরকম অনুঘটক তৈরি হয়, যা উচ্চতাপে নষ্ট হয়ে যায়। আজকের যুগে জীবদেহ থেকে পাওয়া এই ধরণের অনুঘটকগুলিকে আমরা এনজাইম বলেই জানি। ইষ্টকোষ থেকে এরকম বহু এনজাইম নিঃসৃত হয়, যার মধ্যে একটি হল জাইমেজ, যা এক্ষেত্রে আঙুরের রসের গ্লুকোজকে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত করে।

ঠিক এইরকমভাবে আর একটি শিল্প—ভিনিগার তৈরিতে আমাদের সাহায্য করে আসছে অ্যাসিটোব্যাক্টার অ্যাসেটি নামে একধরণের ব্যাক্টিরিয়া যারা মদ্যজাতীয় পানীয়ের মধ্যেকার

* 12B/1, ইন্দ্ররায় রোড, কলিকাতা-700 025

ইথাইল অ্যালকোহলকে অ্যাসেটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে থাকে।

প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে সমকক্ষ আর একটি ক্ষেত্র হল দুধ থেকে দই তৈরি—স্ট্রেপ্টোকক্কাস ল্যাকটিস নামক ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে।

এই সব পদ্ধতি মানুষ কবে থেকে ব্যবহার করে আসছে তার কোন লেখাজোখা নেই। হয়ত যখন থেকে মানুষ পশুপালন করতে শিখেছে, তখন থেকেই সুরু হয়েছে এই অদৃশ্য জীবাণুদেরকেও নিজের অজ্ঞাতসারে পালন করা।

কিন্তু বর্তমানকালে আমরা এই সব অদৃশ্য বন্ধুদের চিনেছি; তাই আজকের যুগে আমরা প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে থাকি না। তার বদলে এই সব জীবাণুকে লালনপালন করা হয় পরীক্ষাগারে। বাছাই করে নেওয়া হয় কর্মিৎকর্মা জাতগুলিকে এবং তাদেরকে রক্ষা করা হয় অন্য জাতের জীবাণুর আক্রমণ থেকে। প্রয়োজনমত এই সব পালিত জীবাণুদের ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট পরিমাণে, সুনির্দিষ্টকাল যাবৎ তারা কাজ করে চলে বিভিন্ন পদার্থের উপর, ঘটায় নানা রাসায়নিক পরিবর্তন তাদের দেহের এনজাইমের সাহায্যে। সম্পূর্ণ পদ্ধতিটাই সুনিয়ন্ত্রিত করা হয় প্রয়োজনমত।

কিন্তু কেন এই জীবাণুদের সাহায্য নেওয়া? তার কারণ বহু পদার্থ আছে, যেগুলি রাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরি করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য। তাছাড়া তৈলসঙ্কটের যুগে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজিষ্ট চান শিল্পের কাঁচামাল এই সব ক্ষুদে বন্ধুদের হাতে তুলে দিতে। তারা তাদের দেহের জৈব অনুঘটক দিয়ে বদল দেবে এই কাঁচামালের রাসায়নিক গঠন, পাওয়া যাবে আমাদের অভীষ্ট বস্তুটি খুব সহজে স্বল্প ব্যয়ে। এটিই হল বর্তমান যুগের 'বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং'—যার প্রভাব আগামী দিনগুলিতে খুব গভীরভাবেই অনুভূত হবে। একে ফার্মেন্টেশান টেকনোলজিও বলা হয়। অন্ততঃপক্ষে 1300 রকমের একধাপ রাসায়নিক পরিবর্তন এর আওতায় পড়ে।

প্রথমেই ধরা যাক, ইষ্টের কথা। যে অ্যালকোহল তৈরিতে এরা সাহায্য করে তার ব্যবহার শুধুমাত্র পানীয় হিসাবে নয়। বরং তার বৃহত্তর ব্যবহার হল শিল্পক্ষেত্রে অন্যান্য পদার্থ উৎপাদনের জন্যে। শিল্পে ব্যবহার্য এই অ্যালকোহল তৈরির জন্যে প্রথমে আলু, ভুট্টা প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় শস্যকে অটোক্লেভে (প্রেসার কুকারের মত) সিদ্ধ করে তাতে যোগ করা হয় অঙ্কুরিত বার্লি মল্ট, যাতে আছে অ্যামাইলেজ নামে এনজাইম। এই অ্যামাইলেজ শ্বেতসারের অতিকায় অণুকে টুকরো টুকরো করে তৈরি করে মলটোজ নামক ডাইস্যাকারাইড অণু। তখন এতে ইষ্ট দিলে তার কোষনিঃসৃত আর এক এনজাইম মলটেজ কাজ করতে সুরু করে মলটোজের উপর। প্রতিটি মলটেজ অণুকে ভেঙ্গে দুটি গ্লুকোজ অণু তৈরি করে। এই গ্লুকোজের উপর আবার ক্রিয়া করে জাইমেজ এনজাইমটি। ফলে তৈরি হয় অ্যালকোহল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড।

মলটেজ

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \longrightarrow 2C_6H_{12}O_6$$

(মলটোজ) (গ্লুকোজ)

জাইমেজ

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 \uparrow$$
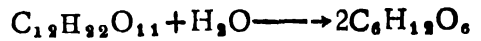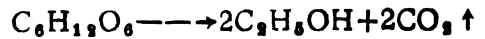
(ইথাইল অ্যালকোহল)

এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছোট ছোট বুদ্বুদের আকারে বেরিয়ে পুরো জিনিসটাকে ফুলিয়ে তোলে। একেই বলে গাঁজানো। এই পদ্ধতিতে কাঁচা মাল হিসাবে চিটেগুড়ও ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে সরাসরি ইষ্টের সাহায্যে ফার্মেন্টেশান সুরু করা হয়। এই পদ্ধতির উপজাত পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল কার্বন ডাই

অক্সাইড গ্যাস (যাকে কঠিনীকৃত করে তৈরি করা হয় শুষ্ক বরফ শীতলীকরণ কার্যে ব্যবহারের জন্তে), অ্যামাইল অ্যালকোহল, আইসো-অ্যামাইল অ্যালকোহল ইত্যাদি।

ভিন্ন রকমের ফার্মেন্টেশানে ইষ্টের থেকে আরও নানা পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। যার মধ্যে অন্ততম হল গ্লিসারিন।

পাঁউরুটি তৈরির বেকারীতেও অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশানের সাহায্য নেওয়া হয়। সেখানে অবশ্য উৎপন্ন অ্যালকোহলের চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডটাই বেশী প্রয়োজনীয়। ময়দায় সামান্য পরিমাণে শর্করাজাতীয় পদার্থ আছে (2·5%)। তাই ময়দার তালে ইষ্ট যোগ করলে এই সামান্য পরিমাণ শর্করার উপর ইষ্টের এনজাইম ক্রিয়া করে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে তা ময়দার তালকে ফাঁপিয়ে তুলতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে উৎপন্ন অ্যালকোহল উনুনের তাপে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়।

এই দুই প্রকার শিল্পেই যে ধরণের ইষ্ট ব্যবহার করা হয়, তার বৈজ্ঞানিক নাম হল স্যাকারোমাইসিস সিরিভিসিয়া। আবার বিয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত ইষ্টের নাম স্যাকারোমাইসিস কার্লসবার্জেনসিস। ওয়াইন ও শেরী তৈরিতে লাগে স্যাকারোমাইসিস বায়ানাস। কিন্তু এসবেরও বাইরে ইষ্টের আর এক ব্যবহার বর্তমান কালে মাথা চাড়া দিচ্ছে। সেটি হল খাদ্য হিসাবে ইষ্টের ব্যবহারযোগ্যতা। ইষ্টে আছে প্রায় 50-60% প্রোটিন; তাছাড়াও প্রতি 100 গ্রাম ইষ্টে আছে—

থায়ামিন (ভিটামিন B_1)—36 মিলিগ্রাম পর্যন্ত
রিবোফ্ল্যাভিন (,, B_2)—7·5 ,, ,,
নিকোটিনিক অ্যাসিড বা
নায়াসিন —100 ,, ,,
প্যান্টোথেনিক
অ্যাসিড (B_3)— 35 ,, ,,
প্যারাঅ্যামাইনো বেনজোয়িক
অ্যাসিড — 18
পাইরিডক্সিন (ভিটামিন
B_6)— 10 ,, ,,
ইনোসিটল —500 ,, ,,
ফোলিক অ্যাসিড — 8 ,, ,,
বায়োটিন (ভিটামিন H)—অত্যল্প পরিমাণে

এই সব ভিটামিন থাকার জন্তে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের অনেকগুলি ভিটামিনেরই ভেষজ উৎস হল ইষ্ট; যেমন, B_1, B_2, B_3, B_6, নায়াসিন প্রভৃতি। এছাড়া ইষ্টে আছে এরগোষ্টেরল যার উপরে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে তৈরি হয় ভিটামিন D.

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সম্পূর্ণ ইষ্টকেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের প্রচলন করে জার্মেনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে এটি আরো বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঐ সময় বৃটিশ সরকারও জামাইকাতে একটি খাদ্য ইষ্ট তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। আমাদের মত খাদ্যাভাবগ্রস্ত দেশে এই ইষ্ট খাদ্যজগতে এক নতুন উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

পূর্বে বর্ণিত স্যাকারোমাইসিস গণভুক্ত ইষ্ট খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের অসুবিধা হল সেগুলির বিশ্রী গন্ধ। সেজন্তে ক্যানডিডা ইউটিলিস, টরিউলা ইউটিলিস প্রভৃতি ইষ্ট খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

1958 সালে ফরাসী কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আলফ্রেড শ্যাম্পাগন্যাট মার্সাইয়ের কাছে ল্যাভেরা পেট্রোলিয়াম শোধনাগারে আবিষ্কার করেন, কিভাবে পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় ইষ্ট; তার পুষ্টির জন্তে যোগান দেওয়া হয়, পেট্রোলিয়ামজাত হাইড্রোকার্বন। সেই সঙ্গে নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে দেওয়া হয় অ্যামোনিয়াম লবণ; পটাসিয়াম ও ফসফরাসের উৎস

হিসাবে সাধারণ সার। এছাড়া দেওয়া হয় অত্যন্ত অল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ ও ভিটামিন।

1 কিগ্রা শর্করা থেকে যেখানে পাওয়া যায় 500 গ্রাম ইষ্ট, সেখানে প্রতি কিগ্রা হাইড্রোকার্বন থেকে মিলবে 1 কিগ্রা ইষ্ট, অর্থাৎ উৎপাদন হবে দ্বিগুণ হারে।

বিশুদ্ধ হাইড্রোকার্বনের চেয়ে অবিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ামের অংশবিশেষ এই বিষয়ে বেশী উপযোগী—যেমন গ্যাস অয়েল, যা পেট্রোলিয়াম পাতনের সময় পাওয়া যায় কেরোসিন ও পিচ্ছিলকারী তৈলের (lubricating oil) মধ্য-অংশ হিসাবে। অবশ্য মিথানল বা ইথানলও ইষ্টের পুষ্টি জন্যে ব্যবহার করা যায়। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, সেগুলি জলের সঙ্গে মিশ্রণীয়।

উৎপন্ন ইষ্ট হল গন্ধহীন, স্বাদহীন, ময়দার মত দেখতে। এর নাম এককোষী প্রোটিন (single cell protein)। এর আর এক নাম টোপ্রিনা। এতে আছে 65% প্রোটিন, যেখানে সয়াবীনে আছে মাত্র 45%। কিন্তু এই প্রোটিন ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হল উচ্চ পরিমাণ নিউক্লিক অ্যাসিডের উপস্থিতি এবং কোষের চারদিকে দৃঢ় কোষপ্রাচীর থাকায় অত্যন্তরস্থ কোষপ্রাচীরকে চূর্ণ করে তারপর নিউক্লিয়েজ নামক এনজাইম দিয়ে নিউক্লিক অ্যাসিডের মাত্রা কমান দরকার।

শূকর, গরু, মুরগী প্রভৃতিদের কয়েক পুরুষ ধরে এই খাবার খাইয়ে কোন ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নি। ঐ সকল মুরগীর মাংস ও ডিম ইঁদুরদের খাইয়েও কোন খারাপ ফল দেখা যায় নি। এই প্রোটিনের একমাত্র নিকৃষ্টতা হল যে, এতে মিথায়োনিনের পরিমাণ অনেক কম (সয়াবীনের মত)। কিন্তু উচ্চ পরিমাণে লাইসিন থাকার জন্যে এটি চাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যের (যাতে লাইসিনের অভাব) পরিপূরক।

বিশেষজ্ঞদের মতে 2000 সালে যখন প্রতি বছর প্রোটিনের চাহিদা $3\frac{1}{2}$ কোটি টন করে বাড়বে অথচ কৃষিজাত দ্রব্য থেকে মাত্র $1\frac{1}{2}$ কোটি টন মেটান যাবে, তখন এই ইষ্টজাত প্রোটিন যে পৃথিবীর প্রোটিনের অভাব পূরণে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া সয়াবীনের ক্রমবর্ধমান দামের কথা বিচার করলে দেখা যাবে হয়ত কয়েক বছর বাদে এই ইষ্টজাত প্রোটিন সয়াবীনের সঙ্গে দামের দিক দিয়ে অন্ততঃ পাল্লা দিতে পারবে। তাই ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের মত আমাদের দেশেও এ বিষয়ে গবেষণা চলছে। দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পেট্রোলিয়ামে একটি পাইলট প্ল্যান্টও বসান হয়েছে, যার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা 50 কিগ্রা। এক্ষেত্রে যে ইষ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, তার বৈজ্ঞানিক নাম হল ক্যানডিডা ট্রপিকোলিস।

কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের জন্যে শুধু ইষ্ট কেন, সেক্ষেত্রে আমরা আরও নানা জীবাণু ব্যবহার করতে পারি, যা কৃষি ও শিল্পের নানা আবর্জনাকে সুস্বাদু খাবারে পরিণত করতে সাহায্য করবে। তাতে একদিকে যেমন খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে, সেই সঙ্গে ঐ সব আবর্জনাও আর পরিবেশকে দূষিত করতে সুযোগ পাবে না।

কিন্তু ইষ্ট বাদেও ছত্রাক জগতেরই এক পরিচিত সভ্য মানুষের কাছে সুস্বাদু খাদ্যরূপে পরিচিত—সেটি হল ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম। অবশ্য আমাদের দেশে এই খাদ্যের প্রচলন নেই; আছে বিদেশে, যথা সোভিয়েট ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্যাঙের ছাতাও ছত্রাক তথা জীবাণু গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এর কারণ এদের যদিও খালি চোখেই

দেখা যায়, তথাপি এদের মধ্যে নানা জাত আছে। এক জাত থেকে অন্য জাতের পার্থক্য হল বংশবৃদ্ধির পদ্ধতিতে; আর সেই পার্থক্য অনুধাবন করতে গেলে প্রয়োজন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের। তাই এরাও হল জীবাণু।

যাই হোক, এই ব্যাঙের ছাতার বৈশিষ্ট্য হল যে, এরা শর্করা, শ্বেতসার বা সেলুলোজ—সবরকম কার্বোহাইড্রেটকেই জীবননির্বাহের জন্যে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, যা ইষ্ট পারে না (ইষ্টের জন্যে দরকার একমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্য)। ফলে এই সব ব্যাঙের ছাতাকেও ব্যবহার করা যায় একই সঙ্গে আবর্জনাসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেই সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে। অবশ্য মুক্ত প্রকৃতিতে যত ব্যাঙের ছাতা জন্মায় তখন তাদের অনেকেই বিষাক্ত, খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত। কিন্তু অভিজ্ঞ চোখ সহজেই এদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিতে পারে খাদ্যোপযোগীগুলিকে। এই সব ভোজ্য ব্যাঙের ছাতায় যে সব পলিস্যাকারাইড আছে, তাদের অনেকে ক্যান্সার রোধেও সক্ষম। আবার রক্তে কোলেষ্টেরলের পরিমাণ হ্রাস করে হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা হ্রাস করে এমন পদার্থও আছে এই ব্যাঙের ছাতায়। এমন কি, যারা খাদ্য হিসাবে অযোগ্য তাদের থেকেও পাওয়া যায় চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় নানা উপক্ষার বা অ্যালকালয়েড; যেমন,—সিলোসাইবিন (psilocybin) মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তাই বহু দেশে এই ব্যাঙের ছাতার চাষ নিয়ে গড়ে উঠেছে বহু কুটির শিল্প আমাদের দেশেও সরকারী তত্ত্বাবধানে এর চাষ হচ্ছে নানান জায়গায়।

আগে পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন তৈরির যে কথা বলা হয়েছে, তারই মত নতুন আর এক পদ্ধতি হল পেট্রোলিয়াম হজমকারী সিউডোমোনাস জাতের ব্যাক্টিরিয়ার ব্যবহার। সমুদ্রে যখন জাহাজ যায় তখন জলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে যায় পাতলা তেলের স্তর, যা সামুদ্রিক জীবের জীবনধারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে ঐসব সিউডোমোনাসজাতীয় ব্যাক্টিরিয়া ব্যবহার করা যায় সমুদ্রের জলকে তৈলমুক্ত করার জন্যে। দেখা গেছে যে, নানান ধরণের ব্যাক্টিরিয়া নানান হাইড্রোকার্বনকে হজম করে। আমরা জানি যে, জীব দেহের গুণাগুণগুলির বংশানুক্রমিক ধারক ও বাহক হল জীন, যা প্রকৃতপক্ষে DNA অণুর এক একটি অংশে। ঐ সব DNA অণু থাকে আবার ক্রোমোজোমে। ব্যাক্টিরিয়ার দেহে একটিমাত্র ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু ঐ ক্রোমোজোমের বাইরে অনেক সময় থাকে একটি বলয়াকৃতি DNA, যা বিশেষ বিশেষ কিছু গুণ বহন করে। একে বলে প্লাজমিড। বছর খানেক আগে আমেরিকাবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর আনন্দমোহন চক্রবর্তী এমন একটি তৈল হজমকারী সিউডোমোনাস জাতের ব্যাক্টিরিয়া তৈরি করেছেন, যার মধ্যে তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন চার ধরণের প্রাকৃতিক সিউডোমোনাস থেকে পাওয়া চারটি প্লাজমিড। ফলে উৎপন্ন ব্যাক্টিরিয়াটিতে সমাবেশ ঘটেছে অনেক রকম হাইড্রোকার্বন হজম করার গুণ। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উৎপন্ন জীবাণুটির বংশবৃদ্ধি ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ডক্টর চক্রবর্তী সেই সমস্যা দূর করেছেন। তিনি ঐ সব প্লাজমিডকে অতিবেগুনীরশ্মির সাহায্যে জুড়ে দিয়েছেন মূল ব্যাক্টিরিয়ার DNA অণুর সঙ্গে। ফলে জনন ক্ষমতা রয়েছে অবিকৃত। এরকম "সুপার মাইক্রোব" সৃষ্টিকে বিজ্ঞানের নব-উদীয়মান শাখা 'জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং'-এরই এক ধাপ বলা যেতে পারে। আর এজন্যেই আমেরিকান পত্রিকা "ইনডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-"এর পক্ষ থেকে ডক্টর চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়েছে "Scientist of the year 1975" উপাধি।

এবার আবার ছত্রাকদের কথায় ফেরা যাক। ইষ্টের পরেই শিল্পের দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নীল বা সবুজ ছত্রাকেরা—যেমন পেনিসিলিয়াম, অ্যাসপারগিলাস প্রভৃতি। অবশ্য এদের সবাই নীল বা সবুজ নয়। যেমন শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ "অ্যাসপারগিলাস নিগার" নামক ছত্রাকটিরই রং গাঢ় বাদামী বা কালো)।

1928 সালে এই রকমই একটি সবুজ ছত্রাক পেনিসিলিয়াম নোটেটাম থেকে স্যার আলেক জাণ্ডার ফ্লেমিং (1881—1955) প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। ফ্লেমিং তখন লণ্ডনের সেন্ট মেরী হাসপাতালে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস (যাতে ফোঁড়া হয়) নামক ব্যাক্টিরিয়া নিয়ে অনেকগুলি পেট্রিডিসে রাখা কাল্চার মিডিয়ামে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছিলেন। এক দিন তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, একটি পেট্রিডিসে একরকম সবুজ ছাতা জন্মানোয় তার চারদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে ব্যাক্টিরিয়ারা সম্পূর্ণ মরে গেছে। তিনি তখন ঐ ছত্রাকটিকে নিয়ে আরও পরীক্ষা করে সেটিকে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম বলে সনাক্ত করেন এবং প্রমাণ করেন যে, সেটি এক প্রকার পদার্থ নিঃসরণ করছে, যা ঐ সব পেট্রিডিসের ব্যাক্টিরিয়াকে মেরে ফেলেছিল। ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংসকারী এই পদার্থটির নামক দেওয়া হল পেনিসিলিন। তিনি কিন্তু চিকিৎসার্থে রোগজীবাণু মারতে এটিকে ব্যবহার করেন নি। তিনি এটিকে কেবলমাত্র জীবাণুবিদ্যায় পরীক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করেন।

এর পর যুদ্ধের তাগিদে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্লোরি ও চেনের অধীনে পেনিসিলিন তৈরির কাজ সুরু হল 1939 সালে। তখন কয়েকটি ক্ষেত্রে যুদ্ধে আহতদের উপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করে যে অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়। তারই ভিত্তিতে আরো বেশী পরিমাণে আরো বেশী বিশুদ্ধ পেনিসিলিন তৈরির জন্যে গবেষণা চলতে লাগল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই গবেষণার পথে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। ফলে ঐ গবেষকদল চলে গেলেন আমেরিকার ইলিনয়েস রাজ্যের পেয়োরিয়া শহরে অবস্থিত নর্দার্ণ রিজিওনাল রিসার্চ লেবোরেটরীতে (NRRL)। সেখানে 1941-এর গ্রীষ্মে সুরু হল অ্যাংলো আমেরিকান সহযোগিতায় পেনিসিলিনের উপর গবেষণা। খোঁজ সুরু হল পেনিসিলিয়াম জাতের অন্য কোন প্রজাতি থেকে আরো বেশী পেনিসিলিন পাওয়া যায় কি না। এই পেনিসিলিয়াম জাতের ছত্রাক প্রায়ই ফলের উপর বা মাটিতেও পাওয়া যায়। তাই যেখানেই ফলের উপর কোন ছত্রাক পাওয়া গেল, তখনই তাকে নিয়ে চলল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবেদন জানান হল সমস্ত গৃহবধূদের কাছে এই ধরণের ছত্রাকের সন্ধান দিতে। সাড়াও পাওয়া গেল প্রচুর। নমুনা আসতে লাগল মধ্যপ্রাচ্যের এমনকি অষ্ট্রেলিয়ার মাটি থেকেও। শেষ পর্যন্ত কিন্তু অভীষ্ট বস্তুটি পাওয়া গেল একেবারে ঘরের কাছেই; ঐ পেয়োরিয়ারই এক বাজারে পাওয়া এক ছাতা-ধরা ক্যান্টালুপের গায়ে মিলল একধরণের পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম। এটির সুবিধা হল এটিকে প্রচুর কাল্চার মিডিয়ামে নিমজ্জিত অবস্থায় অনবরত নাড়াচাড়া করিয়ে বা অক্সিজেনের বুদ্বুদ পাঠিয়ে বৃদ্ধি ঘটানো যায়। একে বলে Submerged Culture Production। এতে প্রচুর পেনিসিলিন মাত্র 3-4 দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। আগের Surface Culture পদ্ধতিতে 15-20 দিনে অল্প পেনিসিলিন পাওয়া যেত। পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনামের জাতটির নাম দেওয়া হল NRRL 1951। আবার এদের মধ্যে থেকেই পৃথক করা গেল 2½ গুণ বেশী পেনিসিলিন

উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এক উপজাত NRRL 1951 B25। আবার এক্স-রশ্মি বা অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে আরো উন্নত শ্রেণীর ছত্রাক পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির নাম মিউটেশন। 1944 সাল থেকে এই কাজ সুরু হল আমেরিকার চারটি স্থানে। এদের মধ্যে কার্নেগী ইনষ্টিটিউশনে NRRL 1951 B-25-এর উপর এক্স-রশ্মির ক্রিয়ায় পাওয়া গেল X-1612 নামে দ্বিগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ছত্রাক। আবার উইসকনসিনের বিজ্ঞানীরা এর উপর অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে এর পেনিসিলিন উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ করে তুললেন। তাঁদের তৈরী জাতটির নাম দেওয়া হল Q-176। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক কোম্পানীই তাদের নিজস্ব ধরণের ছত্রাক উৎপাদন করেছেন জীন মিউটেশনের দ্বারা।

এইভাবেই পেনিসিলিনের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার ফলেই তা আজ যথেষ্ট সস্তায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে এটি সূচনা করল অ্যান্টিবায়োটিক যুগের। সাধারণভাবে এই অ্যান্টিবায়োটিক বলতে আমরা বুঝি এমন সব পদার্থ, যা কোন জীবাণু থেকে পাওয়া যায় এবং অন্য জীবাণুকে ধ্বংস করতে কাজে লাগে। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর চারদিকে চলল আরো নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান।

এরই ফলস্বরূপ 1944 সালে ওয়াক্স্‌ম্যান আবিষ্কার করলেন দ্বিতীয় প্রধান অ্যান্টিবায়োটিক ষ্ট্রেপটোমাইসিন — ষ্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস নামক ছত্রাকের দুটি জাত থেকে। একটি পাওয়া গিয়েছিল মাটি থেকে আর অন্যটি মুরগীর গলা থেকে। এই ষ্ট্রেপটোমাইসিন এমন সব ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে, যাদেরকে পেনিসিলিন দিয়ে মারা যায় না। এদের মধ্যে অন্যতম হল যক্ষ্মারোগের ব্যাক্‌টিরিয়া 'মাইকো-ব্যাক্‌টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস। তাই ষ্ট্রেপটো-মাইসিন আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে যক্ষ্মারোগের ভয়াবহতাকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে। আবার এই ষ্ট্রেপটোমাইসিন শিল্পেরই উপজাতি হিসাবে পাওয়া যায় ভিটামিন B_{12}, যা একধরণের অ্যানিমিয়া রোধ করে।

এই ষ্ট্রেপটোমাইসিস জিনাসেরই আরো নানা প্রজাতি থেকে পাওয়া যায়—আরো অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক; যেমন—1947 সালে ভেনে-জুয়েলাতে এরলিশ ও তাঁর সহযোগীরা মৃত্তিকা-বাসী ষ্ট্রেপটোমাইসিস ভেনেজুয়েলি থেকে পান ক্লোরামফেনিকল বা ক্লোরোমাইসিটিন। 1948 সালে ষ্ট্রেপটোমাইসিস অরিয়োফেসিয়েন্‌স্‌ থেকে ডুগার আবিষ্কার করলেন অরিওমাইসিন বা ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন। 1950 সালে ফিনলে ও তাঁর সহযোগীরা ষ্ট্রেপটোমাইসিস রিমোসাস থেকে পেলেন টেরামাইসিন অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। 1952 সালে এই দুই অ্যান্টিবায়োটিকের রাসায়নিক গঠন নির্ণীত হয় ও সেই সঙ্গে সংশ্লেষিত হয় একই ধরণের তৃতীয় অ্যান্টিবায়োটিক টেট্রাসাইক্লিন। এই চারটি অ্যান্টিবায়োটিকই 'ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক' নামে পরিচিত, কারণ এরা বহু ধরণের জীবাণু, যথা—বড় আকারের ভাইরাস রিকেটসিয়া, কিছু প্রোটোজোয়া ও নানাধরণের ব্যাকটিরিয়াকে মারতে পারে, যা পেনিসিলিন বা ষ্ট্রেপটোমাইসিন পারে না।

(বাকী অংশ এপ্রিল '77 সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)

গবেষণা-সংবাদ

(1) অন্ধত্ব ঘোচাতে নতুন টম্যাটো

ভিটামিন-'এ'-র অভাব হলে অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। অথচ, সুলভে ভিটামিন-'এ' যুক্ত খাবার পাওয়াও একটা সমস্যা। সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্স এই সমস্যার একটা সমাধান করতে পেরেছেন বলে জানা গেছে। উক্ত ইনষ্টিটিউটের জীব-রসায়ন বিভাগের একদল গবেষক একটি নতুন জাতের টম্যাটো উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন যার মধ্যে প্রচুর ভিটামিন-'এ' আছে। তাঁদের মতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রতিদিন যে পরিমাণ ভিটামিন-'এ' দরকার, তার সবটাই ঐ ধরণের দুটি টম্যাটো থেকে পাওয়া যাবে। তাঁদের মতে সাধারণ গরীব মানুষেরা এই টম্যাটো থেকে ভিটামিন-'এ'-র অভাব পূরণ করতে পারেন। ভিটামিন গবেষণা ক্ষেত্রের অন্যতম পুরোধা এবং লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. এ. মর্টন এই গবেষণার প্রশংসা করে বলেছেন, "ব্যাঙ্গালোরের বিজ্ঞানীরা একটি মহৎ কাজ করেছেন।" এই জাতের টম্যাটোর চাষ বাড়ানোর জন্যে তিনি সকলের কাছে আবেদন করেছেন।

(2) অল্প ঝাল-মশলা খাওয়া ভাল

ঠাণ্ডা লাগলে, গলা খুসখুস করলে অনেকে আদা-মরিচ খেতে বলেন। কিন্তু পেটের গণ্ডগোলের ভয়ে অনেকে ঝাল-মশলা দেওয়া খাবার খেতে চায় না। একেবারে ঝাল-মশলা না খেলে শরীরে অন্য রোগ হতে পারে এরকম একটি গবেষণার খবর পাওয়া গেছে।

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, ব্রঙ্কাইটিসসহ শ্বাসনালীর অন্যান্য রোগের নিরাময়ের জন্যে ঝাল-মশলার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। বৃটেনের মানুষ ঝাল-মশলা গরম খাবার খান না বললেই চলে। ঐ গবেষণা পত্রিকায় জানানো হয়েছে, ইংরেজদের মধ্যে ব্রঙ্কাইটিস রোগীর প্রাধান্যের হেতু হয়তো ঝাল-মশলা না খাওয়া। লঙ্কা, হলুদ, আদা, মরিচ, গরম মশলা মানুষের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণে আরও সক্রিয় করে তোলে যা দেহের বিভিন্ন রোগের দ্রুত নিরাময় ঘটায়। ঝাল-মশলার প্রভাবে নিঃসৃত গ্রন্থিরস ব্রঙ্কাইটিস রোগকে সারিয়ে তোলে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

যুগলকান্তি রায়

মানবদেহে নিকোটিনের প্রভাব

তামাক পাতা ধূমপানের কাজে বোধ হয় প্রথমে কলম্বাস আবিষ্কৃত 'ইণ্ডিয়া'র লোকেরাই ব্যবহার করত; তারা তখন 'Y' আকৃতির পাইপ ব্যবহার করত—একে বলা হত 'Tobacos'। এথেকেই তামাক অর্থাৎ 'Tobacco' কথাটা এসেছে। পর্তুগালে ফরাসী রাষ্ট্রদূত Jean Nicot তাঁর দেশে প্রথম তামাক চাষ প্রচলন করেন 1560 সালে এবং এর নাম দেন নিকোটিয়ানা (Nicotiana)। আর এথেকেই তামাকের বৈজ্ঞানিক নাম এবং পাতায় প্রাপ্ত উপক্ষার নিকোটিনের নাম হ'য়েছে। ইংল্যাণ্ডে Walter Raleigh সর্বপ্রথম পাইপ খাওয়া প্রবর্তন করেন। কথিত আছে যে, তাঁকে ধূমপান করতে দেখে তাঁর চাকর তাঁর গায়ে আগুন লেগেছে মনে করে জল ঢেলে দেয়।

যাই হোক, এখন তামাক সবদেশেই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে—ব্যবহৃত হচ্ছে সিগারেট, চুরুট, পাইপ, জর্দা, দোক্তা, বিভিন্ন তামাক-মিশ্রিত মাজন, নস্যি ইত্যাদিতে। তবে এর বহুল ব্যবহারের ফল কি অথবা তামাক পাতার নিকোটিন দেহের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে, এখানে আমরা তা দেখব—নিরপেক্ষভাবেই।

যাঁরা তামাক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, তাঁদের এটা ছাড়া চলে না, এটা তাঁদের পক্ষে অন্যান্য খাদ্যের মতই দরকারী—কিন্তু কেন? এটা অন্যান্য খাদ্যের মত স্বাস্থ্যকর কিছুই যোগায় না, গঠন করে না দৈহিক কলাতন্তু—উৎপন্ন করে না তাপ-শক্তি অথবা সাহায্য করে না খাদ্যকে সরল করে পাচিত করতে। তবে সত্যই কি এটা ক্ষতিকর অথবা কোন কাজই করে না?

তামাকের নিকোটিন তামাক গাছের বর্জ্য পদার্থ। দেখা গেছে যে, $\frac{1}{8}$ গ্রেন নিকোটিন একটা পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষকে মারবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে রসায়নে এ জাতীয় বিষ খুব বেশী পাওয়া যায় না; তবে ধূমপানের ফলে যে পরিমাণ নিকোটিন রক্তে মিশ্রিত হয়, তার পরিমাণ খুবই কম। এখন একটা প্রশ্ন উঠতে

পারে যে, ধূমপানের সময় আদৌ নিকোটিন দেহের অভ্যন্তরে যায় কি? ওটা হয়ত উত্তাপের ফলে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। কিন্তু সমজাতীয় উপক্ষার মরফিন, স্ট্রিকনিন ইত্যাদি থেকে নিকোটিনকে পৃথক করার মত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিকোটিনের উদ্বায়ী ধর্ম। সুতরাং ধূমপায়ীরা যে সদাসর্বদাই ধোঁয়ার সঙ্গে গ্যাসীয় নিকোটিন মুখে নিচ্ছেন তাতে আর সন্দেহ কি? তাঁদের রক্তে এই বিষাক্ত নিকোটিনের পরিমাণের উপরই ধূমপানের নেশা নির্ভর করে। বলা প্রয়োজন যে, এই নেশা মরফিন বা অ্যাল-কোহলের নেশার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ধূমপানের ফলে রক্তে কিভাবে নিকোটিন যায়, তা দেখা যাক। মুখ দিয়ে ধোঁয়া নিয়ে তা নাক দিয়ে বের করলে নিকোটিনপূর্ণ ধোঁয়া শ্লেষ্মাঝিল্লিতে যায় এবং সেখানেই অসংখ্য রক্তনালীর সংস্পর্শে আসে নিকোটিন। আর ধোঁয়া নিঃশ্বাসের মত ফুসফুস অবধি টেনে নেওয়ায় আরো বেশী পরিমাণ নিকোটিন শোষিত হয় এবং এতে মানুষের শ্বাসনালী এবং ফুসফুসের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্যে জানা গেছে যে পূর্ণবয়স্ক ধূমপায়ীর ফুসফুস তার স্থিতিস্থাপকতা গুণ হারিয়ে ফেলে—তার তাজা লাল রং হারিয়ে কালো হয়ে পড়ে, ফলে খুব দ্রুত নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হয়, বা সহজে দম ফুরিয়ে যায়। এসব কথার প্রমাণ খুব সহজেই করা যায়। একটি রুমালের উপর কেবল মুখে-নেওয়া তামাকের ধোঁয়া এবং ফুসফুস-ফেরত ধোঁয়া ফেললে দেখা যাবে যে, উভয় ক্ষেত্রেই রুমালের উপর কালচে হলুদ দাগ পড়লেও প্রথম ক্ষেত্রে তা অনেক বেশী গাঢ়।

ধূমপান যে কেবল ফুসফুসের ক্ষতি করে তা নয়, সেই সঙ্গে তা স্বরযন্ত্রেরও প্রচণ্ড ক্ষতি করে। নিত্য নিকোটিন গ্রহণে স্বরযন্ত্রের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে গলা ভেঙ্গে যায়, স্বর কর্কশ হয়ে পড়ে। এজাতীয় গলার রোগ ওষুধ প্রয়োগে নাও সারতে পারে, যদি না ঐ নিকোটিন বর্জন করা হয়। অবশ্য এটা একটা স্নায়ু-বিষ, তাই এটা অভ্যাস করলে বর্জন করা খুবই কঠিন। তামাককে বিষ বলার বিরুদ্ধে অনেক ধূমপায়ী থাকলেও আজ সবাই এটা স্বীকার করছেন। কোকেন, মরফিন, আফিং ইত্যাদি স্নায়ু-বিষের মতই তামাকের নিকোটিনও খুবই বিষাক্ত। অনেকে বলতে পারেন যে, ধূমপান করলেই তাঁদের বুদ্ধি খোলে, খাবার হজম হয়, ক্লান্তি দূর হয়। কিন্তু তাঁরা এটা চিন্তা করেন না যে, ধূমপানে উত্তেজিত না হলে তাঁরা মোটেই সুস্থ থাকেন না, মন অবসাদগ্রস্ত হয়—কোন অঙ্গই যথাযথভাবে কাজ করতে চায় না। তাছাড়া যেসব মহিলারা মা হতে যাচ্ছেন, তাঁদের ধূমপান তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সন্তানদেরও স্নায়ু অতিমাত্রায় দুর্বল করে দেয়, রক্তে বাড়িয়ে দেয় নিকোটিন—ফলে নানাজাতীয় শিশুরোগ দেখা দেয়।

নিকোটিন সম্বন্ধে আমেরিকায় 'বয়-স্কাউট'দের নিয়ে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, নিকোটিন গ্রহণে হৃৎপিণ্ড খুবই অসুস্থ হয়ে যায়। 18 ইঞ্চি উঁচু একটা দণ্ডের উপর দিয়ে 20 বার লাফানোর পর দেখা গেল 74 জন সাধারণ যুবার মধ্যে 72 জনের হৃৎপিণ্ড 5 মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে গেল, কিন্তু ধূমপানের পর 118 জনের মধ্যে 74 জনের হৃৎপিণ্ড 15 মিনিট পরেও স্বাভাবিক হয় নি; তখন পর্যন্ত তা 11·2 গুণ বেশী দ্রুত চলছিল। এটা শারীরিক অসুস্থতারই লক্ষণ। তাছাড়া স্নায়বিক পেশীর উপর নিকোটিন কি প্রভাব বিস্তার করে, তাও জানা গেছে। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের $\frac{3}{16}$ ইঞ্চি তফাতে আঁকা দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে বক্ররেখা আঁকতে দেওয়া হয়েছিল এবং 15 ইঞ্চি ব্যাসের একটা কাঁধ সমান উঁচুতে রাখা লক্ষ্যবস্তুতে বর্শাজাতীয় জিনিস দিয়ে সোজা হাতে আঘাত করতে দেওয়া হয়েছিল। দেখা যায় যে, ধূমপানের পরই ধূমপায়ীরা বেশী সাফল্যলাভ করে—তবে তারা শারীরিক ও স্নায়বিক কোন দিকেই সুস্থ ছিল না। স্নায়বিক দৌর্বল্য সামলে উঠতে তাঁদের প্রচুর সময় লেগেছিল।

তাছাড়া নিকোটিন আরও নানারকম রোগের জন্যে দায়ী। দেখা যায় যে, অতিরিক্ত ধূমপায়ীর আঙুল বা হাত অনবরত কাঁপে, অনেকের চোখের রেটিনার আলোক-সংবেদনশীলতা কমে যায় বা হারিয়ে যায়। এজাতীয় রোগগুলি Tobacco Heart, Tobacco Blindness ইত্যাদি নামে পরিচিত। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক রোগ তামাক সেবনে হতে পারে। যাঁরা তামাক পাতা বিভিন্ন রকমে মুখে দেন অথবা চুরুট খান, তাঁদের নীচের ঠোঁটে ক্যান্সার হতে দেখা যায়। জিভের তলার দিকের ক্যান্সারের জন্যেও নিকোটিনই দায়ী হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। মুখের ভিতর দিকের অংশের অন্যান্য রোগও অতিরিক্ত নিকোটিন গ্রহণের জন্যে হতে পারে।

সুতরাং নিকোটিন বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে ধূমপান সবচেয়ে কম ক্ষতিকর হলেও এই অভ্যাস ত্যাগ করাই উচিত। যদিও Thackery লিখেছেন "The pipe draws wisdom from the lips of a philosopher ahd shuts up the mouths of the foolish; it generates a style of conversation contemplative, thoughtful, benevolent and unaffected." তবুও যাঁরা এই অভ্যাস ত্যাগ করতে চান অথচ নেশার জন্যে পারছেন না, তাঁদের চিকিৎসকেরা তামাক সেবন বন্ধ করে দিয়ে 'টিনচার নাক্সভমিকা' প্রয়োগ করে তাঁদের পূর্বে সঞ্চিত স্নায়ু-বিষ নিকোটিনের কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করে বেশ সুফল পেয়েছেন। অতএব নিকোটিন যে প্রাণীদেহে অপকারই করে—সেকথা স্মরণে রেখেই তামাক সেবন বর্জন করতে হবে।

সৌমেন দাস*

* বি. এস. মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া

সময় কি পিছু হটে* ?

সময় পিছু হটে না, তবে পর্যবেক্ষকদের আপেক্ষিক গতির জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে একই "সময়" বিভিন্ন বলে মনে হয়। বস্তুর আপেক্ষিক গতি হচ্ছে অন্য কোন বস্তুর তুলনায় ঐ বস্তুটির গতিবেগ কত, তা। মনে করা যাক, s একটি ত্রিমাত্রিক স্থির নির্দেশ-ফ্রেম এবং s′ অন্য একটি চলমান ত্রিমাত্রিক নির্দেশ-ফ্রেম। s′-এর গতিবেগ s-এর তুলনায় v সে.মি. /সে. এখন ধরা যাক s′ নির্দেশ-ফ্রেমে কোন একটি ঘটনা ঘটল এবং s নির্দেশ-ফ্রেমে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষক ঐ ঘটনার সুরু ও শেষ মুহূর্তের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাপ করে দেখল তার পরিমাপ t এবং s′-এ দাঁড়িয়ে অপর একজন পর্যবেক্ষক পূর্বোক্ত ঘটনার সুরু এবং শেষ মুহূর্তের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাপ করে যা পেল তার পরিমাণ t_0। এখন দেখা যাবে যে, t এবং t_0 সমান নয়; t_0, t অপেক্ষা সামান্য কম। t এবং t_0-এর মধ্যে যে সম্পর্ক তা Lorentz-এর অক্ষান্তরীকরণ সমীকরণের সাহায্যে পাওয়া যায়। তা হল $t = \frac{t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$, এখানে c হচ্ছে আলোর গতিবেগ, t, t_0 এবং v-এর বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্থিরাক্ষস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে তার নিজের ঘড়ি অপেক্ষা চলমান অক্ষস্থিত ঘড়ি একটু পিছু চলে বলে মনে হয়। আর এটা হল দুই নির্দেশ-ফ্রেমের মধ্যে আপেক্ষিক গতি v-এর জন্যে। এখন যদি $v=0$ হয়, তবে $t=t_0$ হবে এবং উভয় নির্দেশ-ফ্রেমের ঘড়ি সমানে চলছে বলে উভয় অক্ষের যে কোন পর্যবেক্ষকের নিকট মনে হবে। আপেক্ষিক গতিতত্ত্বে এই ব্যাপারটাকে বলা হয় টাইম ডাইলেশন (Time dilation).

এই টাইম ডাইলেশন-এর সাহায্যে μ মেসন সম্পর্কে এক মজার কাণ্ড পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। মহাবিশ্ব থেকে আগত কিছু কণা বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘাতের ফলে μ মেসন সৃষ্টি করে। μ মেসনের জীবনকাল হল অতি অল্প, 2×10^{-6} সেকেণ্ড মাত্র। মাত্র এইটুকু সময় μ মেসনের অস্তিত্ব, তারপর ওটা ভেঙে ইলেকট্রন, নিউট্রিনো এবং বিপরীতনিউট্রিনো নামক অন্য মৌলিক কণায় পরিণত হয়ে যায়। লক্ষ্য করা গেছে, এসব μ মেসন $2{\cdot}994\times10^8$ মি./সে. গতিবেগে ভূপৃষ্ঠে ছুটে আসে—যা আলোর গতিবেগের 0·998-এর সমান। অতএব এ সময়ে μ মেসনের মাত্র

---

* এই প্রবন্ধটি শ্রীদুলালকুমার সাহা ও শ্রীস্বপনকুমার সিংহরায়, (কলিকাতা-700 030) মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন ছিল: "সময় কি পিছু হটে? সময়ের পিছু হটা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।"

($2.994\times10^8\times2\times10^{-6}$ 600 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার কথা। তারপর তার অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়। পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে জানা গেছে, μ মেসন 600 মিটারের প্রায় দশগুণ উচ্চে সৃষ্টি হয়। কিন্তু তবুও ভূপৃষ্ঠে μ মেসনের আগমন পর্যাপ্ত পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় কেন ? এই অদ্ভুত ব্যাপারটি বস্তুর আপেক্ষিক গতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়। মনে করা যাক ভূপৃষ্ঠে স্থির নির্দেশ-ফ্রেম s-এ কেউ অবস্থান করছে। চলমান s′ নির্দেশ-ফ্রেমস্থিত μ মেসন 0·998c গতিবেগে তার দিকে ছুটে আসছে। এখানে মনে রাখতে হবে μ মেসনের জীবনকাল কিন্তু আপেক্ষিক গতির কোন প্রভাবে পড়ছে না। ভূপৃষ্ঠে স্থির নির্দেশ-ফ্রেম s-এ μ মেসনের জীবনকাল আপেক্ষিক গতিবাদের জন্যে বর্ধিত হয়ে 31.7×10^{-6} সে. হয়ে যায়। নিম্নলিখিত নিয়মে তা পাওয়া যায়—

$$t=\frac{t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{2\times10^{-6}}{\sqrt{1-\frac{(0.998c)^2}{c^2}}}=\frac{2\times10^{-6}}{0.063}\text{ সে.}$$

$$=31.7\times10^{-6}\text{ সে.}$$

অর্থাৎ এই সময়টা μ মেসনের আপন চলমান নির্দেশ-ফ্রেমে পরিমাপকৃত জীবনকাল অপেক্ষা 16 গুণ বেশী। যদি ধরা হয়, μ মেসনের সৃষ্টিস্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে y_0 দূরত্বে আছে, তবে—

$$y_0=vt=2.994\times10^8\times31.7+10^{-6}$$
$$=9500\text{ মিটার}$$

অতএব μ মেসনের অস্তিত্ব বিলোপের পূর্বে তা 9500 মিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। তাই 6000 মিটার উচ্চে সৃষ্টি হলেও তার ভূপৃষ্ঠে পৌঁছান সম্ভব। এখানে আরও কৌতুহলের ব্যাপার হল ভূপৃষ্ঠ থেকে যে দূরত্বকে 9500 মিটার মনে করা হয়, মেসন সেটিকে দেখছে 6000 মিটারের মত।

কোন পর্যবেক্ষকের নিকট দুটি ঘটনা সমকালীন হলেও অন্য পর্যবেক্ষকের নিকট তা সমকালীন মনে নাও হতে পারে, আর তা নির্ভর করবে পর্যবেক্ষকদ্বয়ের নিজস্ব নির্দেশ-ফ্রেমের আপেক্ষিক গতির উপর। অতএব স্থির নির্দেশ-ফ্রেমের কোন পর্যবেক্ষকের নিকট তার ঘড়ি অপেক্ষা অন্য কোন চলমান নির্দেশ-ফ্রেমস্থিত ঘড়ি সর্বদা চলে বলে মনে হবে।

শ্রীসুভাষচন্দ্র চৌধুরী*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান

(1) শিশু ও শর্করাজাতীয় খাদ্য

শর্করা হজম করবার জন্যে প্রধানতঃ যে উৎসেচকটি প্রয়োজন তার নাম প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ (pancreatic amylase)—প্রাপ্তিস্থান প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়। এটির অভাবে শর্করা সঠিকভাবে হজম হতে পারে না। ছ'মাসের কম বয়সের শিশুদের পৌষ্টিকনালীতে এই উৎসেচকটি থাকে না। ফলে তারা শর্করা-জাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে না। শিশুর ছ'মাস বয়সের পর থেকে অগ্ন্যাশয় এই উৎসেচকটি যথাযথ পরিমাণে তৈরি করতে থাকে এবং তখন শর্করা হজমে কোন গণ্ডগোল হয় না। সম্ভবতঃ এই জন্যেই আমাদের দেশে ছ'মাস বয়সে "মুখে ভাত"-এর প্রথা প্রচলিত আছে।

অনেক মা আজকাল শিশুদের বুকের দুধের বদলে কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানো (bottle feeding) পছন্দ করেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কৃত্রিমভাবে দুধখাওয়ানো মা ও শিশু উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। এতে শিশু যেমন পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, মায়েরও নানা ধরণের শারীরবৃত্তিক (physiological) অসুবিধার সূত্রপাত হয়। বস্তুতঃ শিশুদের পক্ষে মায়ের দুধের পরিপূরক আর কিছুই হতে পারে না। তবুও কখন কখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন শিশুকে গরুর দুধ খাওয়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

সে ক্ষেত্রে গরুর দুধকে যতদূর সম্ভব মায়ের দুধের সমতুল্য করে খাওয়ানো উচিত। তার জন্যে গরু দুধে দ্বিগুণ পরিমাণ জল এবং পরিমাণমত চিনি মিশিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়া, একটু মাখন, কয়েকটি ভিটামিন (মুখ্যতঃ ভিটামিন C) এবং সামান্য লোহাও (লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য, টনিক বা ট্যাবলেট) মেশানো প্রয়োজন।

মায়ের দুধে শিশুদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপাদানই উপযুক্ত পরিমাণ থাকে। কেবলমাত্র লোহা, সি, ডি, এবং বি গ্রুপের কয়েকটি ভিটামিন অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় থাকে। শিশুদের যকৃতে যে পরিমাণ লোহা সঞ্চিত থাকে তাতে বড়জোর মাস তিনেক চলতে পারে। সুতরাং তিন মাসের পর থেকেই শিশুকে লোহাযুক্ত খাবার (ডিম, মেটে, ফল…ইত্যাদি) খেতে দেওয়া উচিত। নতুবা শিশু রক্তাল্পতা (anaemia) রোগে ভুগতে পারে। প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলোও নিয়মিত স্বল্পমাত্রায় (কমলালেবু টম্যাটো কিম্বা আমের রস) খেতে দেওয়া ভাল।

(2) সূর্যের আলোয় ঘুরে বেড়ান

রোজ অন্ততঃ আধ ঘন্টা সকালের নির্মল সূর্যের আলোয় ঘুরে বেড়ান উচিত। এর ফলে চামড়া জীবাণুমুক্ত থাকবে। তাছাড়া সূর্যের আলোর প্রভাবে দেহের কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ (প্রোভিটামিন-ডি) ভিটামিন-ডিতে পরিণত হয়—যা দেহের পক্ষে খুবই উপকারী।

এই ভিটামিনটির অভাবে শিশুদের হাতের যথাযথ গঠন ও বৃদ্ধি হতে পারে না। পায়ের হাড় ও মেরুদণ্ড বেঁকে যায়, দাঁতের সজ্জা এলোমেলো হয়ে যায়, বুকের খাঁচার (rib case) গঠন হয় অস্বাভাবিক—অসুখটির নাম 'রিকেট'। শিশুদের দৈনিক 400-800 I.U. [(ভিটামিনের আন্তর্জাতিক একক) এবং বড়দের 400 I.U. পরিমাণ ভিটামিন-ডি দরকার হয়। এর অনেকটাই পাওয়া যায় নিয়মিত সূর্যের আলোর প্রভাবে। এছাড়াও কড্ লিভার ও অন্যান্য কিছু জৈব তৈল, মাখন, ডিম প্রভৃতিতে এই ভিটামিনটি পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে।

অশ্বিনী কুমার*

* মেডিকেল ছাত্রবাস, 22, গিরিবাবু লেন, কলিকাতা-700 012

জল ও জীবন

জীবনধারণের জন্যে আমরা যত কিছু প্রকৃতি থেকে আহরণ করি, তার মধ্যে জল ও বায়ুই সবচেয়ে সহজলভ্য। নদী-নালা, সমুদ্রের জল বাষ্পায়িত হয়ে মেঘ হয়। আবার তার পরিণতি ঘটে জলে।

শাস্ত্রমতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের দ্বারা মানব শরীর গঠিত। জল দেহের একটি উপাদান। মানব দেহে জলের পরিমাণ দেহের ওজনের তিন ভাগের দু-ভাগ। অর্থাৎ দেহের ওজন 150 পাউণ্ড হলে দেহস্থ জলের ওজন হবে 100 পাউণ্ড। প্রাকৃতিক জগতের মতই এই দেহের ভিতরেও অনবরত জলচক্র সংঘটিত হচ্ছে।

প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ জল আমাদের দেহ থেকে নানা ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রস্রাব ও মলের সঙ্গে যথেষ্ট জল দেহ থেকে নির্গত হয়। গ্রীষ্মকালে বা অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে আমাদের দেহত্বকের লোমকূপ থেকে হয়ে প্রচুর ঘাম বের হয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গেও বাষ্পাকারে বেশ কিছুটা জল দেহ থেকে নির্গত হয়। চক্ষু ও নাসিকাপথেও সময় সময় কিঞ্চিৎ জল নির্গত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রত্যহ প্রায় দুই থেকে তিন লিটার জল দেহ থেকে নির্গত হয়।

কলেরা রোগীর ভেদ ও বমির মাধ্যমে প্রচুর জল দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। ফলে শরীরের রক্তের জলের পরিমাণ তখন কমে যায়। সে জন্যে কলেরা রোগীর প্রস্রাবও বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া বেশী পরিমাণ জল নির্গত হবার ফলে দেহ-কোষগুলিও জলশূন্য হতে থাকে। যার ফলে শরীরের খিঁচুনী বা ক্র্যাম্প্‌স্‌ দেখা দেয়। এটি কলেরা রোগের মারাত্মক লক্ষণ। তখন লবণ-জল বা স্যালাইন শিরাপথে রোগীর দেহে প্রচুর পরিমাণে দেওয়াই প্রচলিত মতে প্রধান চিকিৎসা হয়ে দাঁড়ায়।

এই রকম নানা ভাবে দেহ থেকে প্রচুর জল বের হওয়াতেই দেহে জলের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে আমাদের জল পান করতে হয়। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রত্যহ তিন থেকে চার লিটার জল পান করা দরকার। অবশ্য নানা রকম শাক-সব্জী ফল দুধ ইত্যাদি খাদ্যের মাধ্যমে বেশ কিছু জল আমরা খেয়ে থাকি।

জল হচ্ছে উত্তম দ্রাবক। পান-করা জলের সঙ্গে পাকস্থলীর জীর্ণ খাদ্যগুলি মিশে একটি সহজ দ্রবণ তৈরি হয়। এই দ্রবণ খাদ্যনালী বাহিত হয়ে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণে শোষিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

খুব ভোরে খালি পেটে এক গ্লাস জল পান করলে পাকস্থলীর অজীর্ণ খাদ্য দ্রবীভূত হয়ে অন্ত্রমধ্যে বাহিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং পাকস্থলীর অতিরিক্ত অম্লরস দূর হয়। প্রচুর জলপান কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হতে সাহায্য করে।

প্রচুর পরিমাণে জল পান করার ফলে রক্তেও জলের মাত্রাধিক্য ঘটে। মাত্রাতিরিক্ত জল সর্বদাই প্রস্রাব ও ঘামের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। অতএব জল সর্বদাই মূত্র বৃদ্ধিকারক এবং যেহেতু জল একটি উত্তম দ্রাবক, সেহেতু এটি দেহস্থ বিষাক্ত পদার্থ প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে আনে।

জল দেহের এত প্রয়োজনীয় হলেও খাওয়ার সময় অতিরিক্ত জল পান করা ক্ষতিকর। কারণ খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের সঙ্গে ঘন ঘন জল পান করলে পাকস্থলীর এনজাইমগুলি বেশী তরলায়িত হয়ে হজমের খুবই ক্ষতি করে। তাছাড়া অতিরিক্ত জলপান বমনোদ্রেকের কারণ হয়।

জল শুধু আমাদের দেহের আভ্যন্তরিক প্রয়োজনেই লাগে না; এর বাহ্যিক প্রয়োজনও যথেষ্ট। দেহের উপরিস্থিত ত্বকের প্রয়োজন সাধন ও ক্লান্তিনাশের জন্যে স্নান বা দেহ ধৌত করার জন্যে জলের একান্ত দরকার। শীতল জলে স্নান করলে দেহে সুস্থতা ও স্নিগ্ধতাবোধ জাগে। শীতল জল দেহের ত্বকের তাপ শুষে নেয় বলেই অত্যধিক জ্বরের সময় কোল্ড বাথ বা মাথায় আইস্‌ব্যাগ দেওয়া হয়। দেহস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর উপরেও শীতল জলের স্পর্শের স্নিগ্ধকর প্রভাব ঘটে। গরম জলের

সেক বাতজনিত মাংসপেশীর ব্যথায় উপকারী। তাছাড়া উষ্ণজলে স্নান আরামদায়ক ও হাঁপা প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একান্ত দরকার। আর সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ জল। যেহেতু জীবনধারণের পক্ষে জল একান্ত প্রয়োজনীয়, তাই প্রত্যেক নাগরিকের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া পুরকর্তাদের একটি প্রধান কাজ।

জল-চিকিৎসা বা হাইড্রোপ্যাথীর সাহায্যে অনেক রোগ নিরাময় করা যায়। অনেক রোগের শুধু জলই যে একটি ওষুধ তা হাইড্রোপ্যাথি চিকিৎসা যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা বুঝবেন। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই হাইড্রোপ্যাথী চিকিৎসার পরীক্ষা চালিয়েছেন। আফ্রিকায় বাসকালে অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামতকে অগ্রাহ্য করে তিনি স্ত্রী কস্তুরবার অসুখে নিজে হাইড্রোপ্যাথী পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন।

আমরা জলজ না হলেও জল আমাদের জীবনের অঙ্গ। যে বায়ুর শ্বাসগ্রহণ করে আমরা বেঁচে আছি, সেই বায়ুর অন্যতম উপাদান অক্সিজেনও জলের দ্বিতীয় উপাদান।

মাধব পাল*

* ই. এস. আই. হাসপাতাল, কামারহাটি, কলিকাতা-700 058

শব্দকূট

নীচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে শব্দকূট-টির সমাধান কর

1	X	2	3	4	X	5	6	7
8					X	9		
10		X		X	11	X		
	X	12				X	X	
X	13		X	X	14			X
15			X	16			X	17
		X	18					
	X	19			X	20		
21			X	22				X

পাশাপাশি

(8) তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবার যন্ত্রাংশ।

(9) নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রখ্যাত ইংরাজ পদার্থ-বিজ্ঞানী।

(10) সাধারণভাবে এক হাজার ভাগের এক ভাগ বোঝাতে যে কথাটি ব্যবহৃত হয়।

(12) জিহ্বা মূলের দু-পাশে অবস্থিত দুটি ক্ষুদ্র গ্রান্থিকে এক কথায় যা বলা হয়।

(14) উদ্ভিদের বিবর্তনবাদ সম্পর্কীয় গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানী।

(15) যা দিয়ে ভাগ করা হয়।

(16) একনালী দেহী ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণী।

(18) জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত দূরত্বের এককের ইংরেজি নাম।

(20) পদার্থের যে সমস্ত মৌল কণিকা 'বোস সংখ্যায়ন' মেনে চলে।

(21) যে চতুর্ভুজের বাহুগুলি পরস্পর সমান কিন্তু কোণগুলি সমকোণ নয়।

(22) বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ, টি. এন. টি. প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

উপর থেকে নীচে

(1) এই পদার্থ জীবদেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(2) মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানী।

(3) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে যে তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

(4) ইংল্যাণ্ডীয় ওজনের একটি একক।

(5) পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা ও আইসোটোপ সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে যিনি 1921 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী।

(6) সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ যা কাচশিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(7) সৈন্ধব লবণের ইংরেজি নাম।

(11) যে কঠিন স্ফটিকাকার খনিজ পদার্থ দিয়ে প্রস্তর গঠিত হয়।

(12) স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকারী ঔষধকে সাধারণভাবে যা বলা হয়।

(13) রক্তের বর্ণহীন তরল অংশকে যা বলা হয়।

(18) সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবনকারী বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী।

(16) জলের মাধ্যমে রাসায়নিক সংযোগে স্ফটিকাকারের গঠিত যৌগিক পদার্থ।

(17) একটি মৌলিক পদার্থ।

(18) শৈশবে মশামাছি প্রভৃতির দেহকে যা বলা হয়।

(19) বৃত্তের মধ্যে দীর্ঘতম জ্যাকে যা বলা হয়।

[সমাধান, এপ্রিল '77 সংখ্যায় প্রকাশিত হবে]

শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী*

* ব্লক 2, ফ্ল্যাট, 10, 247, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-33

মধ্য-ছেদনের প্রসারণ

একটি সরলরেখা AB একটি বিন্দু D-তে তখনই মধ্য-ছেদন-এ (medial section) বিভক্ত হয় যখন $AD^2 = AB.BD$. নিম্নলিখিত উপায়ে এটি করা সম্ভব (চিত্র 1)।
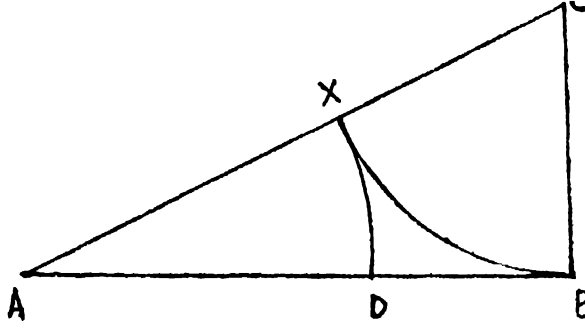
চিত্র 1

AB-এর উপর BC লম্ব টানা হল যাতে $BC = \frac{1}{2}AB$. AC যোগ করা হল। CA সরলরেখার উপর C বিন্দুকে কেন্দ্র করে CB ব্যাসার্ধ নিয়ে CX অংশ কেটে নেওয়া হল। এবার A বিন্দুকে কেন্দ্র করে AX ব্যাসার্ধ নিয়ে AD অংশ কেটে নেওয়া হল। তাহলে D বিন্দুতেই AB সরলরেখাটি মধ্য-ছেদনে বিভক্ত হয় এবং

$$AD^2 = AB \,.\, BD \cdots\cdots\cdots (1)$$

আরও দেখান যেতে পারে যে, AC এবং BC-এর উপর যথাক্রমে E এবং F যদি এমন দুটি বিন্দু হয় যাতে $ED \perp AB$ এবং $EF \perp BC$, তাহলে E এবং F যথাক্রমে AC এবং BC সরলরেখাদ্বয়কেও মধ্য-ছেদনে বিভক্ত করে (চিত্র 2)। এটি প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হবে

$$BF^2 = BC \,.\, CF \text{ এবং } AE^2 = AC \,.\, CE$$
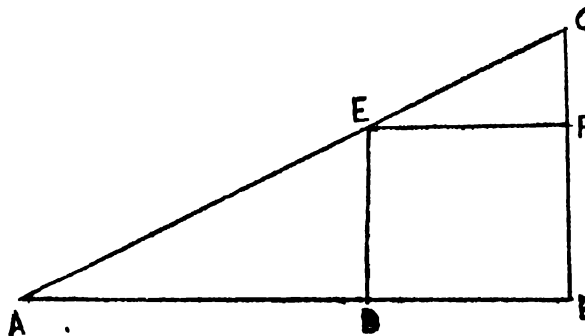
চিত্র 2

এখন, $\frac{AB^2}{BD^2}=\frac{AC^2}{CE^2}$ [$\because DE \parallel BC$]

বা, $\frac{4BC^2}{BD^2}=\frac{5BC^2}{CE^2}$ [$\because AC^2=AB^2+BC^2$; $AB=2BC$]

$\therefore$ $5BD^2=4CE^2$.........(2)

আবার $\frac{CE^2}{AC^2}=\frac{CF^2}{BC^2}$ [$\because EF \parallel AB$]

বা, $\frac{CE^2}{5BC^2}=\frac{CF^2}{BC^2}$ $\therefore CE^2=5CF^2$.

বা, $\frac{5BD^2}{4}=5CF^2$ $\therefore BD^2=4CF^2$ [(2) থেকে $5BD^2=4CE^2$]

বা, $BD=2CF$.........(3)

আবার, $\frac{AD}{AB}=\frac{DE}{BC}$ $\therefore AD=2DE$ ....(4)
[$\because AB=2BC$]

এখন, $AD^2=AB.BD$ [(1) থেকে]

বা, $4DE^2=2BC \,.\, 2CF$. বা, $DE^2=BC.CF$.

বা, $BF^2=BC.CF$ [$\because DE=BF$].........(5)

সুতরাং F, BC রেখাটিকে মধ্য-ছেদনে বিভক্ত করে।

এখন, $AC=\sqrt{5}BC$, $CE=\sqrt{5}CF$.

$\therefore$ $AC.CE=\sqrt{5}BC.\sqrt{5}CF=5BC.CF$.

এখন, $AE^2=5DE^2=5BF^2$ [$\because DE=BF$].

কিন্তু, $BF^2=BC.CF$ [(5) থেকে]

$\therefore$ $AE^2=AC.CE$.

সুতরাং AC সরলরেখাটিকে E বিন্দুটি মধ্য-ছেদনে বিভক্ত করে।

দেবাশীষ দাশগুপ্ত*

*আকতাব মসক্ লেন (তিনতলা) কলিকাতা-700 027

জন্ম : 1707 খৃষ্টাব্দ
মৃত্যু : 1778 খৃষ্টাব্দ

ক্যারোলাস্ লিনিয়াস্

> দ্বিনামকরণ প্রণালী উদ্ভাবন করে লিনিয়াস আধুনিক সুসংবদ্ধ জীবন-বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপকার হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত।

এই পৃথিবীতে যে অজস্র উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে—তা একজন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এই সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে আকারে কেউ বা আদিম এককোষী, কেউ বা বিরাট, বিশাল। কেউ বা বাস করে জলে, কেউ বা বাস করে স্থলে, আবার কোন কোন প্রাণী আকাশে উড়তেও পারে। কোন কোন উদ্ভিদ ফুল ও ফলে সজ্জিত হয়, আবার কারো ফুল ও ফল কিছুই হয় না। উদ্ভিদের মধ্যে কেউ স্বভোজী, কেউ পরজীবী। প্রাণীরা সবাই পরজীবী হলেও কেউ মাংসাশী, আবার কেউ উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করে। পরিচিত একটি গাছকে বা প্রাণীকে যে নামে একজন চেনে, আর একজন ভিন্নভাষী লোক সে নামে তাকে চেনে না। অর্থাৎ সাধারণভাবে দেখলে মনে হয় যেন সমগ্র জীবজগতের মধ্যে রয়েছে একটা বিশৃঙ্খলা। কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানিগণ সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে শ্রেণী-বিভাগ করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এবং একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর নামকরণ করেন, যাতে অতি সহজেই তাঁরা কোন গাছকে কিংবা প্রাণীকে সনাক্ত করতে পারেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই নির্দিষ্ট নিয়মে শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং নামকরণকেই সুসংবদ্ধ জীব-বিজ্ঞান বলা হয়। সুইডেননিবাসী ক্যারোলাস্ লিনিয়াস্-কে (Carolus Linnaeus) আধুনিক কালের জীবন-বিজ্ঞানের রূপকার হিসাবে গণ্য করা হয়।

ক্যারোলাস লিনিয়াস বা কার্ল লিনি (Carl Linne) সুইডেনের অন্তর্গত রসহল্ট-এ 1707 খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র যাজক। স্বাভাবিকভাবেই পিতা তাঁর পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা বা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ছোট বেলা থেকেই কার্ল লিনির উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। তখনকার দিনের প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী টুরনিফোর্ট-এর (Tournefort) কাছে তিনি

শিক্ষালাভ করেন। পরে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গবেষণা-জীবনের প্রথম দিকে তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পাঠ করে উদ্ভিদের শ্রেণীবদ্ধকরণের দিকে মনোনিবেশ করেন। 1730 খৃষ্টাব্দে মাত্র 23 বছর বয়সে তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় অধ্যাপনা সুরু করেন এবং তাঁকে সেখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে হয়। এই সময় তিনি প্রাণী এবং উদ্ভিদের শ্রেণী-বিন্যাসের প্রধান প্রধান নীতিগুলি উপস্থাপিত করেন এবং দ্বিপদবিশিষ্ট নামমালা প্রবর্তন করেন। দুটি ল্যাটিন শব্দের সাহায্যে এরূপ নামকরণ হয়। যেমন বট গাছের নাম Ficus benghalensis; ডুমুরের নাম Ficus hispida. প্রথম নামটি গণের দ্বিতীয় নামটি প্রজাতির। প্রভাবে কুনো ব্যাঙের নাম Bufo melanosticus এবং বিড়ালের নাম Felis bengalensis. লিনিয়াস্ 4,374 রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ঐ দ্বিনামকরণ প্রণালী অনুসারে নামকরণ করেছিলেন। দ্বিনামকরণ প্রণালী আবিষ্কার-ই তাঁকে জীবন-বিজ্ঞানীদের কাছে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

এই সময় তাঁর 'বিবলীওথিকা বোটানিকা' (Bibliotheca Botanica), 'ক্লাসেস্ প্লানটারাম (Classes Plantarum) এবং জেনারা প্লানটারাম (Genera Plantarum) ইত্যাদি গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়—যার মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী রাজ্যকে নিয়মাবদ্ধ এবং সুসংবদ্ধভাবে পর্যালোচনা করা আছে। তিনি 'সিস্টমা নেচারী' নামে একটি গবেষণামূলক বই রচনা করেন। তার মধ্যে একমাত্র পুংকেশর এবং গর্ভপত্রের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র উদ্ভিদ-জগৎকে 24টি শ্রেণীতে এবং শ্রেণীগুলিকে আবার গর্ভপত্রের সংখ্যা ও প্রকৃতি অনুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গে, বর্গকে কয়েকটি গণে এবং গণকে প্রজাতিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। লিনিয়াস্ প্রাণীরাজ্যকে স্তন্যপায়ী, পক্ষী, উভচর, মৎস্য, পতঙ্গ এবং কম্বোজ—এই ছয়টি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন।

লিনিয়াসের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহে যতটা আগ্রহ ছিল, ঠিক ততটা প্রাণী ও উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্তীয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করার মানসিকতা ছিল না। লিনিয়াসের শ্রেণী-বিভাগ এক বা একাধিক অঙ্গের উপর নির্ভর করে হওয়ায় তা প্রাকৃতিক কিংবা বংশগত সম্পর্ক নির্দেশ করে না; সেই জন্যে লিনিয়াসের শ্রেণী-বিভাগকে কিছুটা কৃত্রিম বলে মনে হয়।

তিনি ষ্টকহলমে কিছুকাল ডাক্তারীও করেন। পরে 1741 খৃষ্টাব্দে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যায় অধ্যাপক পদে যোগ দেন এবং সেখানেই 1778 খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়*

* আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা-700 004

ভেবে কর

1. আদমসুমারির লোক গিয়ে হাজির হয়েছে এক অঙ্ক-পাগলা অধ্যাপকের বাড়ী। বাড়ীতে ক'জন লোক, কতই বা তাদের বয়স সেই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বললেন—"তিনি, তাঁর স্ত্রী আর তিন ছেলে।" ছেলেদের বয়স সম্পর্কে বললেন, "তিন ছেলের বয়সের গুণফল 36". আদমসুমারির লোক উত্তর দিল "ঠিক বুঝতে পারলাম না তো, আর একটু।" তখন ভদ্রলোক একটা বাড়ীর নম্বর দেখিয়ে বললেন, তিন ছেলের বয়সের যোগফল ঐ বাড়ীর নম্বর। আদমসুমারির লোক হিসেব-টিসেব করে আবার জিজ্ঞেস করলেন—"এবারও তো হল না, আর একটু"। তখন ভদ্রলোক জানালেন—"বড় ছেলেটির পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেছে"। আদমসুমারির লোক বলে উঠলেন—"ও আচ্ছা. এইবার ঠিক আছে"। তাহলে, ছেলেদের কার বয়স কত ?

2. রাজা ক্রমবাম সিং দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে এসে পড়লেন অবাক জলপান নদীর ধারে। নদীর ওপারে এক দুর্গ। রাজার আছে কিন্তু সাকুল্যে একটি-ই কামান। সেটি দিয়ে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে—সর্বশক্তি দিয়ে। তা থেকে ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে সেকেণ্ডে মাত্র দশটি করে গোলা ছোঁড়া যায়। কিন্তু দুর্গের দেয়াল বড় শক্ত। অবশেষে রাজা চর মুখে জানতে পারলেন, সেকেণ্ডে কুড়িটি গোলা ঐ দুর্গের দেয়ালে লাগলে তবেই দেয়ালটি ভাঙ্গবে। তবে উপায় কি ?

(সমাধান পৃষ্ঠায় 156 পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)

দেবব্রত সরকার*

---

* পরিষদের হাতে কলমে কেন্দ্র

3. নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি সরল দোলক নেওয়া হল যার দোলন কাল T সে.। চিত্রানুযায়ী দোলকটিকে একটি খাঁজকাটা চাকতির কোন খাঁজের মধ্য দিয়ে দোলাতে
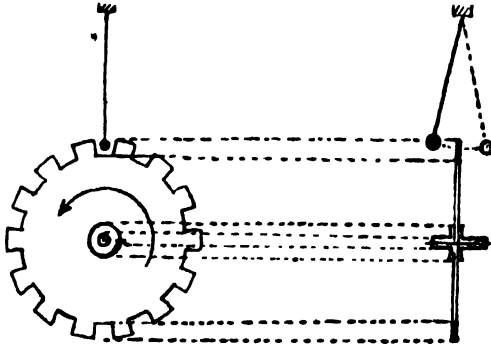
হবে। চাকতিটি স্থির থাকা অবস্থায় দোলকটি সহজেই চাকতির তলের সঙ্গে সমকোণে

আনত তলে দুলতে পারবে। এবার ধরা যাক চাকৃতিটিকে যে কোন নির্দিষ্ট কৌণিক বেগে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। এ অবস্থায় চাকৃতিটির ঘূর্ণনের কম্পাঙ্কের সঙ্গে দোলকটির দোলনকাল T-এর কোন্ সম্পর্ক বজায় থাকলে দোলকটি সহজেই দুলতে পারবে ?

4. প্রমাণ কর, প্রত্যেক আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে একই চাপে এবং তাপমাত্রায় নীচের রাশিটির মান সমান এবং ধ্রুবক—

$$\frac{mV}{M}$$

m, গ্যাসটির আণবিক ওজন ; M, নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের ভর এবং V, ঐ পরিমাণ গ্যাসের আয়তন।

(সমাধান 156, 157 পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)

দুলালকুমার সাহা*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

মডেল তৈরি

(1)

কার্ডিওগ্রাফ ও ব্যাঙের হৃদ্‌স্পন্দনের কয়েকটি পরীক্ষা

গত সংখ্যায় কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্র তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এবার কার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করা হবে। আগেই বলা হয়েছে কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দনকে লেখচিত্রের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়। নানা প্রয়োজনে এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

(i) পরীক্ষাধীন প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দনের প্রকৃতি জানতে ;

(ii) হৃদ্‌স্পন্দনের উপর উষ্ণতা পরিবর্তনের প্রভাব জানতে ;

(iii) হৃদ্‌স্পন্দনের উপর নানা প্রকার ওষুধের প্রতিক্রিয়া জানতে ;

(iv) হৃদ্‌স্পন্দনের উপর স্ট্যানিয়াস লাইগেচার-এর প্রভাব নির্ধারণ করতে।

আরও অন্যান্য প্রয়োজনে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ধরা যাক, পরীক্ষাধীন প্রাণীটি কুনোব্যাঙ (toad)। গত সংখ্যায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ড্রামটির উপর সাদা কাগজ জড়িয়ে সেটিতে তার্পিন তেলের বাতির সাহায্যে ঝুল মাখিয়ে নেওয়া হয়। ব্যাঙটিকে অজ্ঞান করে সূক্ষ্ম কাঁচি ও চিম্‌টার সাহায্যে তার

হৃদ্‌পিণ্ডটি উন্মুক্ত করে লিভারের সঙ্গে যুক্ত বঁড়শিটি খুব সাবধানে নিলয়ের মাংসপেশীর মধ্যে গেঁথে দিলে লিভারটি উপর-নীচে ওঠা-নামা করতে থাকে। লিভারের সঙ্গে যুক্ত লেখনী-সূচটি ড্রামের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে ড্রামটা আস্তে আস্তে বাঁ থেকে ডান দিকে ঘোরালে (ঘোরানোর ব্যবস্থাটি মোটরের সাহায্যে করলেই ভাল হয়) কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝুলমাখানো কাগজের উপর ব্যাঙের হৃদ্‌স্পন্দনের একটি লেখচিত্র অঙ্কিত হয়ে যাবে (চিত্র 1)।
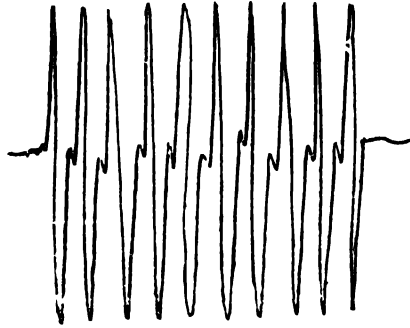
স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন

চিত্র 1

হৃদ্‌স্পন্দনের উপর উষ্ণতার প্রভাব :

একটি বীকারে কিছুটা বরফ-গলা জল এবং অন্য একটি বীকারে কিছুটা উত্তপ্ত 0 65% লবণ জল তৈরি করা হল। দুটি বীকারেই থার্মোমিটার ডুবি য় আছে। ড্রামের উপরে প্রথমে খানিকক্ষণ স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন লিপিবদ্ধ ক
এবার কয়েক ফোঁটা বরফগলা জল হৃৎপিণ্ডের উপর ঢেলে হৃদ্‌স্পন
হল। লেখনী-সূচটি ড্রামের গা থেকে সরিয়ে এনে ড্রামটি থামি কাল T হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গরম লবণ জলের দ্রবণ (লবণজলের তাপমাত্রা যেন 37°C-এর বেশী না হয়) ফোঁটা ফোঁটা করে হৃৎপিণ্ডের উপর ঢেলে আবার আগের মত হৃদ্‌-স্পন্দন লিপিবদ্ধ করা হল। এইভাবে 4°C থেকে 37°C পর্যন্ত বিভিন্ন তাপমাত্রায় হৃদ্‌স্পন্দনের প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় (চিত্র 2)।

হৃদ্‌স্পন্দনের উপর ওষুধের প্রভাব :

হৃদ্‌স্পন্দনের উপর নানা প্রকার ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে প্রতিক্ষেত্রে কয়েক ফোঁটা ওষুধ হৃদপিণ্ডের উপরে ফেলা হয়। প্রাপ্ত লেখচিত্রে হৃদ্‌স্পন্দনের গতি, সঙ্কোচনের তীব্রতা, ওষুধের কর্মকাল ইত্যাদি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। নীচে কয়েকটি প্রচলিত ওষুধের নাম উল্লেখ করা হল :

(i) অ্যাড্রেনালিন ক্লোরাইড, (ii) পাতলা নিকোটিন দ্রবণ, (iii) 5% অ্যাট্রোপিন, (iv) 1% পাতলা ডিজিট্যাল দ্রবণ ইত্যাদি।
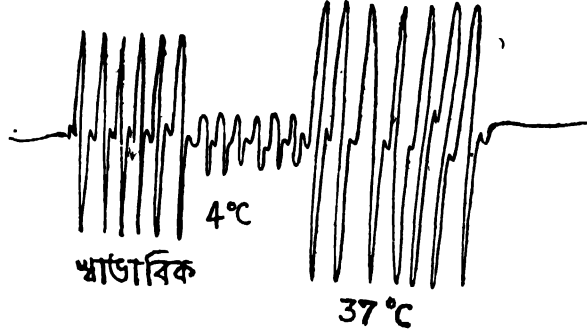
তাপমাত্রার প্রভাব
চিত্র 2

হৃদ্স্পন্দনের উপর স্ট্যানিয়াস লাইগেচারের প্রভাব :

হৃৎপিণ্ডের কয়েকটি বিশেষ অংশকে সরু সুতোর সাহায্যে খুব শক্ত করে বেঁধে দেবার পদ্ধতির নাম স্ট্যানিয়াস লাইগেচার (stannius ligature)। দু'ধরণের লাইগেচারের প্রচলন আছে।

লাইগেচার I : এই পদ্ধতিতে এক টুকরো সুতো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাস এবং অলিন্দের মধ্যে বেঁধে হৃদ্স্পন্দন লিপিবদ্ধ করা হয়।

লাইগেচার II : হৃদ্স্পন্দন লিপিবদ্ধ করার সময় এই পদ্ধতিতে এক টুকরো সুতো হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যকার খাঁজে বেঁধে দেওয়া হয়।
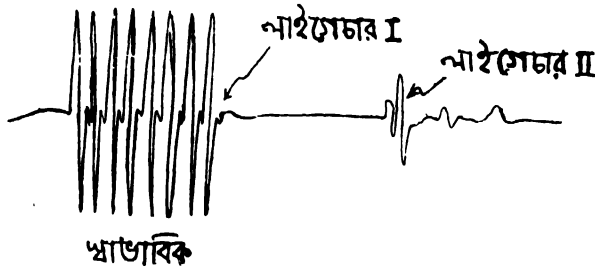
স্ট্যানিয়াস লাইগেচারের প্রভাব
চিত্র 3

প্রথমে স্বাভাবিক হৃদ্স্পন্দন, পরে লাইগেচার I ও সবশেষে লাইগেচার II পদ্ধতির সাহায্যে হৃদ্স্পন্দন লিপিবদ্ধ করে লেখচিত্রের মাধ্যমে (চিত্র 3) হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে বহু তথ্য জানা হয়।

হৃৎপিণ্ডকে অনেকক্ষণ কর্মক্ষম রাখবার জন্যে 0·65% লবণ জলের দ্রবণ কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর হৃৎপিণ্ডের উপর ঢালা হয়। এইভাবে একটি ব্যাঙ নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পরীক্ষা চালানো সম্ভব।

পূর্ণেন্দু সরকার*

---

* যুব বিজ্ঞান সংস্থা, গোবরডাঙ্গা, পোঃ ও গ্রাঃ খাটুরা, 24 পরগণা

(2)

ফেলে-দেওয়া জিনিষের সাহায্যে ব্যাটারী তৈরি

বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার অপরিহার্য, নানা প্রয়োজনে এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় শক্তির বিকল্প উৎসের জন্যে বিজ্ঞানীমহল ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের জগৎ বিশেষভাবে চিন্তিত। সেজন্যে প্রত্যেকেরই উচিত শক্তির বিকল্প উৎস সম্পর্কে কিছু চিন্তা করা এবং শক্তির অপ্রয়োজনীয় ক্ষয় রক্ষা করা। শক্তির উৎস হিসাবে ফেলে-দেওয়া জিনিষ থেকে লেকল্যান্স কোষ তৈরির একটি বিকল্প পদ্ধতির বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে—যা বাড়ীতে তৈরি করা যায়। এর জন্যে প্রয়োজন কতকগুলি 1·5 ভোল্টের পোড়া ব্যাটারী, কয়েকটি চীনামাটির বা কাচের পাত্র ও কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, যার বাজারী নাম নিশাদল। একটি লেকল্যান্স কোষ গঠন করতে যে যে উপাদানের প্রয়োজন, তার অনেক-গুলিই পোড়া ব্যাটারীর মধ্যে পাওয়া যায়; যেমন—ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড সহ (MnO_2) কার্বন দণ্ড, দস্তা ইত্যাদি। প্রথমে একটি পোড়া ব্যাটারীর গা থেকে কাগজের মোড়ক তুলে ব্যাটারীর গায়ের ক্ষয়প্রাপ্ত দস্তাসমেত পেষ্ট সাবধানে পরিষ্কার করে ফেলা হয়; যেন ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডসহ কার্বন দণ্ডটি না ভাঙ্গে। এই অংশের তলার দিকের দস্তা, যা প্রায় অক্ষত অবস্থায় থাকে, তা সংগ্রহ করতে হবে। এবার কার্বন দণ্ডের উপরে অবস্থিত পিতলের টুক্‌রোর গায়ে একটি তামার তারের এক প্রান্ত এবং দস্তার (পরিষ্কৃত) সঙ্গে অন্য একটি তামার তারের এক প্রান্ত সংযুক্ত করতে হবে। জলের মধ্যে নিশাদল দ্রবীভূত করে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে নেওয়া হয়।

ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডসহ কার্বন দণ্ড ও দস্তার টুক্‌রো একটি চীনামাটির পাত্র বা কাচের পাত্রের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধানে রেখে ঐ পাত্রে নিশাদলের সম্পৃক্ত দ্রবণ ঢাললে একটি কোষ তৈরি হয়। এভাবে তৈরী কোষের সাহায্যে একটি 6 ভোল্টের ট্রানজিষ্টর রেডিও চালাবার জন্যে অনুরূপভাবে আরও তিনটি কোষ তৈরি করে ঐ চারটি কোষকে শ্রেণীসমবায়ে যুক্ত করতে হবে। এই কোষের তড়িৎ-বিভব 1·3—1·4 ভোঃ এবং

প্রবাহমাত্রা রেডিও চালাবার পক্ষে যথেষ্ট। এই কোষ দিয়ে ছোট টর্চের বাল্‌ব জ্বালানো যায়। সে ক্ষেত্রে দস্তার পাতের আকার বৃদ্ধি করতে হয়; ফলে প্রবাহমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বাল্‌বকে জ্বালাবে।

এভাবে তৈরী কোষের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী এবং মাঝে মাঝে দস্তা বদলানো ছাড়া অন্য কিছুই করতে হয় না। এখানে দস্তা ফেলে-দেওয়া কোষের তলা থেকে সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভব।

এর অসুবিধা হল একে স্থানান্তরিত করা। নিশাদলের দ্রবণের পরিমাণ যদি বেশী হয়, তা হলে তা দস্তা ও তামার সংযোগস্থলে দ্বিধাতুক কেন্দ্র তৈরি করে দস্তা ও তামার সংযোগস্থলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। খারাপ নিশাদল ব্যবহার করলে দস্তা তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন সংযোগস্থল ঠিকমত চেপে না লাগালে তড়িৎ-বিভব কম হয়।

নিশাদলের দ্রবণ এমন পরিমাণে ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে তা দস্তা ও তামার সংযোগস্থলকে যেন স্পর্শ না করে। নিশাদল উদ্বায়ী বলে এবং কোষের প্রয়োজনে নিশাদল নষ্ট হয় বলে মাঝে মাঝে দ্রবণে কিছু পরিমাণে গুঁড়া নিশাদল দেওয়া প্রয়োজন। সব সময়েই ভাল নিশাদল ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকটি সংযোগস্থল ভাল করে যোগ করতে হবে।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়*

---

* বনগ্রাম, শিমুলতলা

(3)

ছোট ছোট পরীক্ষা দিয়ে বিজ্ঞানের প্রাথমিক নীতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা মডেল তৈরি করে তা প্রমাণ করতে পারে। এরকম একটি মডেল তৈরির কথা এখানে বলা হবে—

বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার

খুব কম ও খুব বেশী উষ্ণতা মাপবার জন্যে পারদ থার্মোমিটার ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন পদ্ধতির কথা জানা আছে। এখানে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে উষ্ণতা মাপবার নীতি ব্যাখ্যা করার মত একটি মডেলের কথা বলা হয়েছে—যা সহজেই তৈরি করা যেতে পারে। কোন পরিবাহী পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধ উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায় আবার ঐ রোধ উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে হ্রাস পায়। উক্ত পরিবাহীর রোধের মান বিভিন্ন স্থির উষ্ণতায় জানা থাকলে—তা দিয়ে কোন অজানা উষ্ণতা নির্ণয়

করা সম্ভব। এটাই হল বৈদ্যুতিক থার্মোমিটারের নীতি। এই রোধ পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়ার জন্যে নীচের পরীক্ষাটির কথা বলা হচ্ছে। এর জন্যে দরকার—

(i) চীনামাটির দণ্ড ;

(ii) বেশ কিছুটা প্লাটিনাম তার ;

(iii) একটি অ্যাম্‌মিটার, A ;

(iv) একটি 9 ভোল্টের তড়িৎ কোষ, B ;

(v) বর্তনী সংযোগকারী তার ও অন্যান্য সামগ্রী
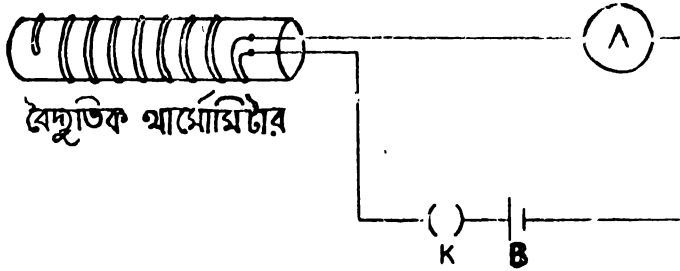
প্লাটিনাম তারটি দু-ভাঁজ করে চীনামাটির দণ্ডের উপর চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে জড়ানো হয় (চিত্র)। প্লাটিনাম তারের একপ্রান্ত অ্যাম্‌মিটার A-এর একটি বন্ধনী স্ক্রুর সঙ্গে যুক্ত করা হল। অন্য বন্ধনী স্ক্রুটি তড়িৎ কোষ B-এর একটি মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হল। প্লাটিনাম তারের অপর প্রান্তটি একটি চাবি K-এর মাধ্যমে তড়িৎ কোষের অন্য মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অ্যাম্‌মিটারটিকে তড়িৎ কোষের সঙ্গে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করতে হবে। চাবি K বন্ধ করলে প্লাটিনাম তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ ঘটবে এবং তার মাত্রা অ্যাম্‌মিটারে নির্দেশিত হবে। যে বস্তু বা পদার্থের উষ্ণতা মাপতে হবে, তার মধ্যে চীনামাটির দণ্ডটি রেখে দেওয়া হয়। উষ্ণতা বেশী হলে প্লাটিনাম তারের রোধ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে অ্যাম্‌মিটারে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা আগের তুলনায় কম হতে দেখা যায়। আবার যে পদার্থের উষ্ণতা মাপা দরকার, তার উষ্ণতা বায়ুর সাধারণ উষ্ণতা অপেক্ষা কম হলে তার মধ্যে প্লাটিনাম সহ চীনামাটির দণ্ডটি রাখলে প্লাটিনামের রোধ সাধারণ উষ্ণতায় বায়ুতে রাখা অবস্থার রোধ অপেক্ষা কমে যাবে; ফলে অ্যাম্‌মিটারের পাঠ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। চীনামাটির দণ্ডটিকে উচ্চ বা নিম্ন উষ্ণতার বস্তু বা পদার্থে অনেকক্ষণ রেখে দিলে অ্যাম্‌মিটারের পাঠ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে স্থির মানে এসে পৌঁছয়। এ অবস্থায় চীনামাটির দণ্ডসমেত প্লাটিনাম তারের উষ্ণতা ঐ পদার্থের উষ্ণতায়

সমান। প্লাটিনামের তার জড়ানো দণ্ডটিই হল বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার। বিভিন্ন জানা স্থির উষ্ণতায় থার্মোমিটারটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের বিভিন্ন মান জানা থাকলে, কোন অজানা উষ্ণতায় ঐ থার্মোমিটারটিকে রেখে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের মান জেনে ঐ অজানা উষ্ণতার মান নির্ণয় করা যায়। তখন অ্যাম্মিটারটি ঐ কাজের জন্যে ক্রমাঙ্কিত (calibrated) বলা হয়।

এভাবে উষ্ণতা নিখুঁতভাবে না মাপা গেলেও বৈদ্যুতিক থার্মোমিটারের নীতি ব্যাখ্যা করার পক্ষে এই পরীক্ষাটি যথেষ্ট ; এই থেকে অন্ততঃ একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

প্লাটিনামের তার খুবই মূল্যবান। প্লাটিনামের বদলে অন্য ধাতুর তৈরি তার ব্যবহার করা যেতে পারে—তবে তা দিয়ে পরীক্ষা করলে শুধুমাত্র উষ্ণতার সঙ্গে রোধ পরিবর্তনের ধারণা পাওয়া যাবে। কেননা ঐ থার্মোমিটারের ক্রমাঙ্কন নিখুঁতভাবে করা সম্ভব নয়। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্লাটিনাম তারের রোধ যেভাবে বৃদ্ধি পায়—উষ্ণতা হ্রাসের বেলাতেও ঠিক একইভাবে ঐ মান হ্রাস পায়। অন্যান্য ধাতুর ক্ষেত্রে ঐ নিয়ম যথাযথভাবে পালিত হয় না—লঙ্ঘিত হয়। যে কারণে অন্যান্য ধাতুর তৈরী তার বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার তৈরিতে প্লাটিনামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় না। প্লাটিনাম থার্মোমিটার দিয়ে উষ্ণতা পরিমাপের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও যথেষ্ট নিম্ন উষ্ণতা থেকে সুরু করে যথেষ্ট উচ্চ উষ্ণতা পর্যন্ত এই থার্মোমিটার দিয়ে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব ; যা অন্যান্য ধাতু দিয়ে তৈরী বৈদ্যুতিক থার্মোমিটারের সাহায্যে সম্ভব নয়।

বৈদ্যুতিক প্রবাহমাত্রা উষ্ণতার সঙ্গে কমবেশী হয়। ফলে কুণ্ডলীর মধ্যে আবেশী ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—যা এই থার্মোমিটারে বাঞ্ছনীয় নয়। তাই প্লাটিনাম তারকে দুভাঁজ করে জড়ানো হয়। এভাবে পাকানো কুণ্ডলীতে উক্ত আবেশী ক্রিয়ার প্রভাব দুটি তারের মধ্যে বিপরীতমুখী হয় ; ফলে পারস্পরিক বিক্রিয়ায় তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

মহুয়া দে*

*ডি. আই. পি. রোড, গভর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেট, ব্লক-R, ফ্লাট-6, কলিকাতা-700 054.

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান

1. শুধু গুণফল বলা হলে সংখ্যা তিনটি বোঝা যায় না; কারণ 36-কে নানারকম ভাবে উৎপাদকে ভাগ করা যায়। যেমন—$1\times3\times12$, $1\times6\times6$,...... ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যাবে $6\times6\times1$ এবং $9\times2\times2$ এই দুটি উৎপাদক ছাড়া বাকী সব ক্ষেত্রেই বয়সের যোগফলগুলি (অর্থাৎ $1+3+12$, $1+4+9$ ইত্যাদি) আলাদা। সুতরাং উৎপাদকগুলির যোগফল তাকে বলে দেওয়া সত্ত্বেও সে বয়স বুঝতে পারছে না; এর একমাত্র কারণ বয়সগুলি 1,6,6 বা 9,2,2 অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বয়সের যোগফল 13. অন্য সংখ্যা হলে যেমন 16, সে নিশ্চয়ই বলত 1, 3, 12 কারণ 36-এর অন্য কোন উৎপাদকের সমষ্টি 16 নয়। এখন কথার প্যাঁচে ভদ্রলোক বললেন যে বড় ছেলে যমজ নয়, অতএব বয়স নিশ্চয়ই 9,2,2.

2. রাজার সেই সবে ধন 'নীলমণি' কামানটিকে যদি একটি গাড়ীর উপর চড়ানো হয় এবং গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গাড়ীটিকে যদি 30 মাইল বেগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এমনভাবে যে, গোলা ছোঁড়বার প্রতি মুহূর্তে গাড়ীটি একদম থেমে গেছে, তবে কি হবে দেখা যাক। ধরা যাক, একটা গোলা ছোঁড়া হয়েছে। পরের গোলাটি ছোঁড়ার মুহূর্তে, প্রথম গোলাটি শূন্যে $\frac{88}{10}=8{\cdot}8$ ফুট দূরে রয়েছে (ঘণ্টায় 60 মাইল = সেকেণ্ডে 88 ফুট এবং পরের গোলাটি $\frac{1}{10}$ সে. পরে ছোঁড়া হচ্ছে)। কিন্তু ইতিমধ্যে গাড়ীটি 4·4 ফুট এগিয়ে গেছে (গাড়ীর গতিবেগ গোলার অর্ধেক)। সুতরাং দ্বিতীয় গোলাটি ছোঁড়বার মুহূর্তে সেটি প্রথমটির থেকে 4·4 ফুট দূরে শূন্যে রয়েছে। এখন যেহেতু দ্বিতীয় গোলাটি ছোঁড়বার সময় গাড়ীটিকে থামিয়ে ছোঁড়া হয়েছে, অতএব এইটিও প্রথমটির সমান অর্থাৎ 60 মাইল বেগে প্রথমটির 4·4 ফুট পিছু পিছু যেতে থাকবে। এইভাবে তার পরেরটি 4·4 ফুট, তার পরেরটি আরও 4·4 ফুট ইত্যাদি দূরত্বে পিছু পিছু যেতে থাকবে। তাই দেয়ালে এসে গোলা পড়বে $\frac{4{\cdot}4}{88}=\frac{1}{20}$ সেকেণ্ড অন্তর। অর্থাৎ এভাবে ব্যবস্থাটি চালু করলে দুর্গের দেয়ালে সেকেণ্ডে কুড়িটি করে গোলা এসে লাগবে এবং দেয়ালটি ভেঙে পড়বে।

3. ধরা যাক, চাক্‌তিটির ঘূর্ণনের কম্পাঙ্ক $= n$

চাক্‌তিটির পরিধির উপর খাঁজ বা দাঁতের সংখ্যা $= m$

অতএব, কোন নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু দিয়ে 1 সেকণ্ডে অতিক্রান্ত দাঁতের সংখ্যা $= m\times n.$

সুতরাং কোন বিন্দুতে $\frac{1}{m \times n}$ সে. পর পর একটা করে দাঁত আসবে।

অনুরূপভাবে ঐ বিন্দুতে $\frac{1}{m \times n}$ সে. পর পর একটি দাঁতবিহীন অঞ্চল আসবে এবং ঐ সময় সহজেই দোলকটির পিণ্ডটি খাঁজের মধ্য দিয়ে অপরদিকে চলে যেতে পারবে। আবার, $\frac{1}{m \times n}$ সেকেণ্ড পরে যদি পিণ্ডটি সেই বিন্দুতে ফিরে আসে, তবে তার দোলন একই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। অতএব, নির্ণেয় সম্পর্ক—

$$\frac{T}{2} = \frac{1}{m \times n}$$

$$\text{বা, } n = \frac{2}{mT}$$

4. একই চাপে ও তাপমাত্রায় বিভিন্ন গ্যাসের ঘনত্ব ($\frac{M}{V}$) নির্ভর করে তাদের আণবিক ওজন (m)-এর উপর। মনে করা যাক, দুটি গ্যাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানা আছে—

প্রথম গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাসের ভর, M_1 ; আয়তন, V_1 এবং আণবিক ওজন, m_1.
দ্বিতীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাসের ভর, M_2 ; আয়তন V_2 এবং আণবিক ওজন m_2

প্রশ্নানুসারে উভয় গ্যাসের তাপমাত্রা ও চাপ এক।

তাহলে—

$$\frac{M_1}{V_1} : \frac{M_2}{V_1} :: m_1 : m_2$$

অন্যভাবে লেখা যেতে পারে—

$$\frac{m_1 V_1}{M_1} = \frac{m_2 V_2}{M_2}$$

$$\therefore \frac{mV}{M} = \text{ধ্রুবক}$$

ফেব্রুয়ারী '77 সংখ্যার "ভেবে কর" প্রশ্নাবলীর 2 ও 3-এর সমাধান

2. স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সাহায্যকারী বিমান পাঠাতে হবে এবং তা এমনভাবে করতে হবে যাতে সাহায্যকারী বিমানটি ফিরে আসতে পারে এবং যতটা তেল ফুরিয়েছে তার বেশী তেলও নেওয়া সম্ভব নয়। এখন দেখা যাক সাহায্যকারী বিমানটি কিভাবে সর্বাধিক সাহায্য করতে পারে। পুরো পথটি হল 360^0. বিমানগুলির পাল্লা 180^0. মূল বিমান এবং সাহায্যকারী বিমানটি যে কোন একদিকে উড়তে থাকল। 60^0 উড়বার পর

সাহায্যকারী বিমানটি 60^0 উড়বার মত তেল মূল বিমানকে দিল এবং নিজে ফিরতে সুরু করল। সে ফিরে আসতে পারবে, কেন না তার পাল্লা হল 180^0. (সে উড়েছে 60^0, দিয়েছে 60^0 উড়বার মত তেল এবং ফিরেছে 60^0 পরিমাণ পথ)। অতএব মূল বিমানটির পাল্লা হয়ে দাঁড়াল $180^0+60^0=240^0$; সুতরাং আরও 120^0 বাকী। এখন এই 'বমানটিকে সাহায্য করতে হবে কৌশল করে, যেহেতু বিমানটি অর্ধেকের বেশী পথ চলে গেছে, সাহায্যকারী বিমান পাঠাতে হবে মূল বিমানটি যে দিক দিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করছে ঠিক তার উল্টো দিক দিয়ে, অর্থাৎ প্রথমটি ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে সেদিকে হলে দ্বিতীয়টি উড়বে তার উল্টো দিকে। যদি সাহায্যকারী বিমানটিকেও আর একটি সাহায্যকারী বিমান দেওয়া হয়, তবে এর পাল্লা হবে 240^0. এখন একটি মূল বিমানকে পৌঁছবার পরও এর কাছে তেল থাকবে 120^0 পথের—যদি প্রথমটি 240^0 ঘোরবার পর দ্বিতীয়টি উল্টো দিক দিয়ে সেটিকে পৌঁছায়। বাকী তেল ভাগাভাগি করে তারা আরও 60^0 পথ এগিয়ে আসবে মূল বিমানটির দিক বরাবর এবং সাহায্যকারী বিমানটি এবার উল্টো দিকে ফিরতে থাকবে। এইভাবে তারা বিমানঘাঁটির 60^0 দূরে এল ; এরপর আরও দুটি সাহায্যকারী বিমান পাঠালে তারা মূল এবং সাহায্যকারী বিমানটিকে ফিরিয়ে আনবে (তারা $60^0+60^0=120^0$ পথের জন্যে তেল নিজেরা যাওয়া আসায় খরচ করবে এবং বাকী 60^0-র পথের তেল দিয়ে প্রত্যেকে একটি করে বিমানকে ফিরিয়ে আনবে) অর্থাৎ মোট সাহায্যকারী বিমান $=5$.

3. লেঞ্জের সূত্র অনুসারে বৈদ্যুতিক আবেশজনিত সৃষ্ট বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক আবেশ সৃষ্টির কারণকে বাধা দেয়—

ক) সুতরাং S-কে P-এর দিকে সরাতে থাকলে S কুণ্ডলীতে আবেশজনিত বিদ্যুতের দিক এমনভাবে নির্ধারিত হয় যে, S-এর সঙ্গে বাঁ-প্রান্তে উৎপন্ন চুম্বক-মেরু ও P-এর ডান প্রান্তের চুম্বক-মেরু একই রকমের হয় এবং তখন সম মেরুর বিকর্ষণের ফলে S-এর সরণ বাধাপ্রাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে চিত্রটি (গত সংখ্যার) ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, আবেশজনিত বিদ্যুৎপ্রবাহ রোধ r-এর ডান দিক থেকে বাঁদিকে যাবে।

খ) ক-এ বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী এক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ প্রবাহ r-এর ডান দিক থেকে বাঁদিকে যাবে।

গ) এক্ষেত্রে বাঁদিক থেকে ডান দিকে যাবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার তেলজাতীয় পদার্থ শরীরের কি প্রয়োজনে লাগে ? এর রাসায়নিক সংকেত কি ?

পূর্বালী রায়, কলিকাতা-700 006

উত্তর : মানুষের দৈনন্দিন আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে তেলজাতীয় পদার্থের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। তৈলজাতীয় পদার্থ অনেকাংশে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। ভারতবর্ষে ভোজ্য তেলের প্রধান উৎস—বাদাম, সরষে, তিল, তিসি ইত্যাদি তৈলবীজ। তবে তিসির তেলকে ভোজ্য তেলের পর্যায়ে ধরা হয় না।

তেল স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে পড়ে। শরীরকে কার্যক্ষম রাখবার জন্যে আরও যে সমস্ত উপাদান দরকার হয় (যেমন—শ্বেতসার, আমিষ), সেগুলির তুলনায় স্নেহজাতীয় পদার্থের শক্তি জোগাবার ক্ষমতা বেশী। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, স্নেহজাতীয় পদার্থ সমপরিমাণ আমিষ বা শ্বেতসারের চেয়ে প্রায় দু-গুণেরও বেশী পরিমাণে শরীরের জন্যে ক্যালরি জোগায়।

স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে কয়েকটি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে—যা শরীরের পুষ্টির জন্যে একান্তই অপরিহার্য। তৈলজাতীয় পদার্থ দেহে আঘাত ও ক্ষত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

দেখা গেছে, দেহে প্রোটিনের ব্যবহারের সঙ্গে খাদ্যের ক্যালরির মানের সম্পর্ক খুবই নিগূঢ়। বেশী প্রোটিন গ্রহণ করলে তার সমস্তটা শরীরে ব্যবহৃত হয় না; অব্যবহৃত অবস্থায় তার কিছু অংশ দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। আগেই বলা হয়েছে যে, স্নেহজাতীয় পদার্থ অন্যান্য খাদ্যবস্তুর তুলনায় শরীরে অনেক বেশী ক্যালরি জোগায়। সুতরাং বেশী পরিমাণ প্রোটিন উপযুক্তভাবে দেহের প্রয়োজনে লাগাতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা আবশ্যক।

তেল, গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত একটি এস্টার-জাতীয় যৌগ। রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করলে পাওয়া যায় :

$$\begin{array}{ccccc} CH_2OH & & R_1COOH & & CH_2OOCR_1 \\ | & & | & & | \\ CHOH & + & R_2COOH & \rightleftharpoons & CHOOR_2 + 3H_2O \\ | & & | & & | \\ CH_2OH & & R_3COOH & & CH_2OOCR_3 \\ \text{গ্লিসারল} & & \text{ফ্যাটি অ্যাসিড} & & \text{গ্লিসারাইড} \end{array}$$
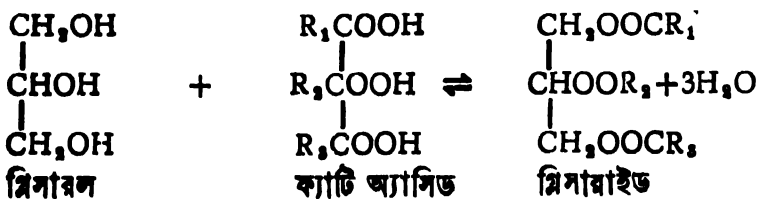
R_1, R_2 এবং R_3 হল আল্‌কিল মূলক—যা এক বা অভেদ হতে পারে

কোন কোন ক্ষেত্রে গ্লিসারলের তিনটি হাইড্রক্সিল মূলকের বদলে দুটি বা একটি মূলকও ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

ভ্রম সংশোধন:—1. ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 55 পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের উদ্ধৃতির আগে দ্বিতীয় পংক্তির শেষে নীচের অংশটুকু সংযোজন করতে হবে:

বিজ্ঞানীর নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে মহামতি আইনষ্টাইনের বিভিন্ন বাণী খুবই সুবিদিত। নীচে তাঁর দুটি উক্তি আলোচ্য প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষণীয়।

2. 102 পৃষ্ঠার 15 পংক্তির সঙ্গে নীচের অংশটুকু সংযোজন করতে হবে:

অনুরূপ বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। ছবি পাঠানোর জন্যে অপর একটি বেতার তরঙ্গকে বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয়—অর্থাৎ শব্দের···

[উক্ত ভুলের জন্যে (কপি ছাড়) দুঃখিত]

পরিষদের খবর

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" প্রকাশনায় সরকারী বাড়তি অনুদান মঞ্জুর

আনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে 1977 সাল থেকে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার প্রকাশনা বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ববর্তী বার্ষিক অনুদান 3,600 টাকার পরিবর্তে তা বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক 7,200 টাকা হয়েছে বলে পরিষদ দপ্তরে সরকারীসূত্রে খবর এসেছে। উল্লেখযোগ্য যে পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের" জন্যেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্বেই বার্ষিক 4,200 টাকা হিসাবে অনুদান মঞ্জুর করেছেন। এজন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

পরিষদ ভবনের ত্রিতল নির্মাণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে পরিষদের ত্রিতল নির্মাণ ও পরিষদ যে জমির উপর অবস্থিত, সেই জমির ঋণ পরিশোধের জন্যে যে আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে, সেজন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাচ্ছে। উক্ত অনুদান থেকে সর্তমত জমির ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।

ত্রিতল নির্মাণের জন্যে শ্রীঅমূল্যধন দেব আশি হাজার টাকার একটি সম্ভাব্য ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করে কার্যকারী সমিতির নির্দেশ নিয়ে ঐ তালিকামত টেণ্ডার আহ্বান করেন। উক্ত ভবনের ত্রিতলে বৈদ্যুতিক লাইন ও সরঞ্জামাদি, জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বাদেই উক্ত তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। যে সমস্ত টেণ্ডার পাওয়া তার মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্যের টেণ্ডারের মান ছিল 72,000 টাকা। দাখিল করেন শ্রীঅজয় ব্যানার্জী—যিনি পরিষদের বিরুদ্ধে অনিলবরণ নাগ প্রমুখ মামলাটির একজন বাদী। নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হবার পর যথানিয়মে গৃহ-নির্মাণ উপসমিতি গঠিত হয়—নবনির্বাচিত সহযোগী কর্মসচিব ডঃ রতন মোহন খাঁ-কে আহ্বায়ক করে। ডঃ খাঁ শ্রী দেবের প্রস্তুত করা তালিকাটি ও টেণ্ডারগুলি সংশ্লে কয়েকজন সি. আই. টি. ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ইঞ্জিনিয়ারদের মতে শ্রীদেব কর্তৃক তৈরী গৃহ-নির্মাণ ব্যয়-তালিকাটিতে সমস্ত ব্যয়ই বাড়িয়ে দেখান হয়েছে। তাঁদের মতে সরকার, সি. আই. টি. পুরসভা প্রভৃতির নিয়ম অনুযায়ী উক্ত ভবনটি আরও অনেক কম ব্যয়ে নির্মাণ করা সম্ভব। সরকার, সি. আই. টি., পুরসভা প্রভৃতির এজাতীয় কাজে প্রতি বর্গফুটে 50/55 টাকা হিসাবে খরচ হয়। অথচ শ্রীদেবের তালিকায় তার জায়গায় প্রতি বর্গফুটে আরও 20/25 টাকা হিসাবে বেশী ধরা আছে। এই সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত টেণ্ডারগুলি বাতিল করে যথাযথভাবে টেণ্ডারের সঙ্গে দেয় টাকার চেক দাখিলকারীদের ফেরৎ দেওয়া হয় এবং স্থির হয় যে একজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে গৃহ-নির্মাণের ব্যয়-তালিকা প্রস্তুত করে ত্রিতল নির্মাণ ব্যবস্থা করা হবে।

মেসার্স জে. সি. চক্রবর্তী এণ্ড সন্স সংস্থার একজন অংশীদার শ্রীরথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে উক্ত ত্রিতল নির্মাণের জন্যে একটি ব্যয়-তালিকা তৈরি করে দেন। এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

যেহেতু আয়ার নতুন টেণ্ডার আহ্বান করে ব্রিভল নির্মাণ শুরু করতে যথেষ্ট সময় লাগবে এবং যেহেতু একবার আহূত টেণ্ডারের সর্বনিম্ন মূল্য (বৈদ্যুতিক লাইন, সরঞ্জাম এবং জল সরবরাহ ও শৌচাগার বাদে) 72000 টাকা—যা উক্ত ব্যয়ের জন্যে পরিষদের তহবিলের সামর্থ অপেক্ষা অনেক বেশী এবং অন্তদিকে সরকারী প্রদত্ত টাকা খরচ করবার ও কলকাতা পুরসভার নিয়মানুসারে উক্ত ব্রিতলের ছাদ ঢালাই করবার সময়সীমা পার হতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকী, তাই কার্যকরী সমিতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেসার্স জে. সি. চক্রবর্তী এণ্ড সন্স সংস্থাকে মি. জে. সি. চক্রবর্তী প্রদত্ত ব্যয়-তালিকা অনুযায়ী ব্রিতল নির্মাণ করে দেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়। অতঃপর উক্ত সংস্থা সহৃদয়তার সঙ্গে কার্যকরী সমিতির ঐ অনুরোধ রক্ষা করেন এবং গত 24শে ফেব্রুয়ারী থেকেই কাজ শুরু করেছেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত ব্রিতল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে বলে ঐ সংস্থার কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

তানকুনি বিজ্ঞান সংস্থা 'বৈশালী'-র পক্ষ থেকে গত 20শে ফেব্রুয়ারী থেকে 27শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গত কয়েক বছর ধরেই বছরে একবার করে তানকুনির ঐ বিজ্ঞান সংস্থার তরুণ কর্মীরা প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। ঐ অঞ্চলে এটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক মডেল দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

(i) গত 20শে ফেব্রুয়ারী পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে' শ্রীশংকর চক্রবর্তী মহাশয় স্লাইড সহযোগে জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—'মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা'। প্রচুর শ্রোতা উপস্থিত থেকে খুবই আগ্রহের সঙ্গে ঐ বক্তৃতা শোনেন এবং এবং অনেকেই শেষে আলোচনায় যোগ দেন।

(ii) ঐ একই দিনে (20শে ফেব্রুয়ারী) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে মানিকতলা গভর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেটের 'প্রবগৃহ'-এ শ্রীশংকর চক্রবর্তী মহাশয় স্লাইডসহযোগে আরেকটি জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয়বস্তু ছিল—'মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'। স্থানীয় আবাসিক ও জনসাধারণের কাছে বক্তৃতাটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বলুন তো—

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা আজকাল এত জনপ্রিয় কেন??

তবে শুনুন এর কারণ—

—ঃ মাত্র পাঁচ দফা ঃ—

প্রথম দফাঃ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন;

দ্বিতীয় দফাঃ নানান ধরণের আকর্ষণীয় ফিচার সংযোজন;

তৃতীয় দফাঃ "বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর"-এ সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান;

চতুর্থ দফাঃ প্রতি মাসে তিনটি করে "মডেল তৈরি"—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসহ প্রকাশ;

পঞ্চম দফাঃ বিষয়বস্তু নির্বাচনে বহুমুখীনতা।

এছাড়া ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা নিশ্চয়ই রাখে না।

বিজ্ঞান-মানসিকতা উন্মেষের জন্যে একমাত্র মাসিক সচিত্র বিজ্ঞান পত্রিকা—"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"—পড়ুন ও পড়ান।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন—

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা এবং প্রকাশন উপসমিতির সভ্যবৃন্দ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন : 55-0660

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে ঐ পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
"সত্যেন্দ্র ভবন"
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্যে পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র'-এর ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সঙ্গে উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করা যাবে। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাবে। তাঁর সঙ্গে পূর্বে যোগাযোগ করে পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্যগণের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

তাং 27.11.76
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুক-পোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করবার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। একারণে দেশের বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ, বিশেষতঃ লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁরা যেন তাঁদের রচিত কিংবা প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন পুস্তকাদি এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-কে দান করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন।

বর্তমান বছর থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করা হয়েছে। এই বিভাগে নবম শ্রেণী থেকে সুরু করে বি. এস. সি. (পাশ অনার্স কোর্স) এম. এস. সি., কারিগরী, মেডিকেল প্রভৃতি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা আছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে নতুন, এমনকি বাড়ীতে অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকাদি দান করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুস্তকাদি প্রেরণ করবার ঠিকানা :
"সত্যেন্দ্র ভবন"
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ | এপ্রিল, 1977 | চতুর্থ সংখ্যা

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা

যতই দিন যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তুও ততই জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে। এখন আর ছোট কোনও পরীক্ষাগারে, অল্প কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে কোনও গবেষণার কাজ করা সম্ভব নয়। আজকালকার বিজ্ঞান গবেষণা প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ভারতবর্ষের মত দেশে এর জন্যে অর্থ সংকুলানের দায়িত্ব সরকারের। বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী বিজ্ঞানীরা ঐ সব বিষয়ে কোন্ কোন্ কাজ করা এদেশের পক্ষে সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়, সেকথা বিবেচনা করে একটি বিশদ প্রস্তাব রচনা করেন। ঐ প্রস্তাবিত কাজগুলিই এদেশের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়। প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই সরকারী অর্থ প্রস্তাবিত কর্মসূচীর জন্যে বণ্টিত হয়। ভারত সরকারের ঐজাতীয় কর্মসূচীর উদাহরণ হিসাবে—কৃষি গবেষণা, মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। জানা আছে—কৃষি গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করবার জন্যে এদেশের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। কৃষি গবেষণার ফলে দেশে কৃষির দ্রুত উন্নতি সম্ভব হবে এবং এখানে ঐ ধরণের কাজ করার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তৈরি করাও কঠিন নয়; সুতরাং একাজ খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু পারমাণবিক শক্তি গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা এত সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই ধরণের কাজ যে এখানেও প্রয়োজন এবং সম্ভব, সেটা প্রমাণ করার জন্যে নানান ধরণের সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। এবিষয়ে উন্নত দেশগুলির পারদর্শী বিজ্ঞানীদের মন্তব্য, মতামত, সব কিছু আলোচনার পরই এটাকে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে ঠিক করা হয়েছিল। শুধু এদেশেই নয়, সর্বত্রই প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত

হয়। কয়েক বছর আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাই এনার্জি পার্টিকল্ ফিজিক্সের গবেষণার ব্যয়-বরাদ্দ অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এই যুক্তিতে যে, ঐ ধরণের কাজ বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। আবার অন্যদিকে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতির কথা ভেবে এবং দ্রুত সাফল্যের বিপুল সম্ভাবনা আছে বলে জীব-বিজ্ঞানে ঐ দেশে বিরাট আকারে গবেষণা সুরু হয়েছে।

যে কোনও দেশে বৈজ্ঞানিক কাজের প্রাসঙ্গিকতা স্বভাবতই সেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেই জন্যেই বিভিন্ন দেশে একই কাজ প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। যেমন ভারতে মহাকাশ গবেষণার মধ্যে মহাকাশ পাড়ি (interplanetary travel) সম্বন্ধে গবেষণা বর্তমানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, যদিও যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়ায় একাজ প্রাসঙ্গিক।

মানুষের অন্যান্য পেশার মত বিজ্ঞানচর্চাও একটি পেশা। ভারতীয় সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থায় বসবাস করছেন এমন ব্যক্তি (অর্থাৎ কোনও ভারতীয়) যদি বিজ্ঞানচর্চা করেন, তবে সেই কাজকেই ভারতীয় বিজ্ঞান-গবেষণা বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিগত জটিলতা এবং ব্যয়বাহুল্যের জন্যে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চাকে অন্য সব সামাজিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সমাজ-সচেতন। বিজ্ঞানীদের সমাজ-সচেতনতা অতীত কাল থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে আধুনিক রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ, এই সমাজ-সচেতনতা বিবর্তনের পদ্ধতিতেই বিকাশ লাভ করছে। সেই জন্যে সবদেশেই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার সামাজিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে ঐ কাজের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করছেন। যেমন, পরিবেশ দূষিতকরণের আশঙ্কায় বিশেষ ধরনের পারমাণবিক গবেষণার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। জীব-বিজ্ঞানের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণাও কয়েক বছরের জন্যে বন্ধ আছে।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সমতা রেখে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমেই যে বিজ্ঞানচর্চা করতে হবে, সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। উন্নত দেশের বিজ্ঞান কর্মকাণ্ডের কোনও একটি অংশ, ঐ সব দেশ থেকে কিনে আনা যন্ত্র দিয়ে, এদেশে সম্পন্ন করলে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হতে পারে না। এর ফলে, ঐ ধরণের কিছু বিজ্ঞানী ঐ সব উন্নত দেশে বিশেষ কাজের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে ক্রমশ ঐ দেশের সমাজভুক্ত হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা প্রাণহীন ও শূন্যগর্ভই থেকে যাবে।

ভারতবর্ষে পরিকল্পিত বিজ্ঞানচর্চা সুরু হলেও সেটি এখনও ত্রুটিমুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেন, এই ধরণের পরিকল্পনা 'অ্যাকাডেমিক ফ্রিডম'-এর পরিপন্থী। এই 'স্বাধীনতা' আসলে কি, তা স্পষ্ট করার জন্যে অতীতের কোন কোন মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়। সমাজ-বিবর্তনের ধারা এবং বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি ও সাফল্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন সামনে রেখে বর্তমান জ্ঞানের আলোকে উক্ত 'স্বাধীনতা'-র বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এখনও কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক সাফল্যে ব্যক্তিগত অবদানের উপরেই জোর দেন। পরিকল্পনার বেড়াজাল উঠিয়ে দিলেই এই ধরণের ব্যক্তিগত অবদান পরিপূর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ পাবে— এই তাঁদের ধারণা। সুতরাং তাঁরা উপদেশ দেন, প্রাসঙ্গিকতার কথা নিয়ে হৈ-চৈ না করে বিজ্ঞানীদের যথাসাধ্য ইচ্ছামত কাজ করে যাওয়াই উচিত। এইভাবে কাজ করলেই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাবে এদেশের বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে,

এ ধরণের চিন্তায় কিছু কিছু ব্যক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। এ ছাড়াও বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পাঠ্যসূচী এখনও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। এসবের ফলেই পরিকল্পিত বিজ্ঞানচর্চা এদেশে পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম যেহেতু মূলত সামাজিক, সেই জন্যে পেশাগত বিজ্ঞানী যাঁরা নন, তাঁদের মধ্যেও বিজ্ঞান-কর্মকাণ্ডের আধুনিক বিবর্তনের ব্যাপারে বলিষ্ঠ জনমত গড়ে ওঠা দরকার। এই পদ্ধতি ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। আশা করা যায়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার মুখপত্র "জ্ঞান ও বিজ্ঞান"-এর মাধ্যমে, এই আন্দোলনে উপযুক্ত ভূমিকা নেবে।

সুনীলকুমার সিংহ*

*সাহা ইনষ্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : সভ্যদের অধিকার ও দায়িত্ব*

শ্রীমহাদেব দত্ত**

ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বাদি প্রচার করে ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটিয়ে জাতীয় উন্নয়নের সাহায্য করবার জন্য আচার্য বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত প্রায় ত্রিশ বছর এই পরিষদ নিজ আদর্শ রূপায়ণে সচেষ্ট। জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন ও উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এর বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পরিষদের আদর্শ রূপায়ণ করে আচার্য বসুর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক সভ্যের সচেতন হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে প্রত্যেক সভ্যেরই নিজ নিজ মত অপর সভ্যদের জানাবার অধিকার আছে এবং বার্ষিক সভায় ও নির্বাচনে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞান পরিষদের মত একটি শিক্ষাগত (academic) প্রতিষ্ঠানের উপযোগী রীতিনীতি বজায় রেখে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করে এবং নির্বাচনে নিজ মতাবলম্বী প্রার্থীদের সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত করবার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু এই সব আলোচনা শিক্ষাগত সংস্থার ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াই কাম্য।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে প্রত্যেক সভ্যের অপর সভ্যদের নিকট প্রচারপত্র বা সংবাদপত্রের মারফৎ মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিষদের সভ্যেরা বিজ্ঞান প্রচারে বিশেষ করে সমাজে বিজ্ঞান-চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রচারে বিশ্বাসী হয়েই এই পরিষদের সভ্য হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মূলত বাস্তব তথ্যভিত্তিক। সুতরাং যাঁরা বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনার পরিবর্তন করে বিজ্ঞান পরিষদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বা

*পরিষদের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিখিত।

**ফলিত গণিত বিভাগ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

নিতে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের প্রচারপত্র তথ্যভিত্তিক হওয়া উচিত। দুই-এক মাস পূর্বে বিজ্ঞান পরিষদের কয়েক জন সভ্যের স্বাক্ষরযুক্ত যে প্রচারপত্র সভ্যদের নিকট পাঠান হয়েছিল—তা যে তথ্যভিত্তিক নয়, নিচের কয়েকটি উদাহরণ থেকে তা সুস্পষ্ট :

(1) উক্ত প্রচারপত্রের কোন এক অংশে বলা হয়েছে, বর্তমান কর্মসচিব বিজ্ঞান পরিষদের নতুন গৃহ নির্মাণের পর আগ্রহ দেখাচ্ছেন, এর আগে পরিষদের সঙ্গে তাঁর কোন সংযোগ ছিল না। বর্তমান কর্মসচিব বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবেই সভ্য হিসাবে পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। 1952 সালের এপ্রিল মাসে পরিষদের সভাপতি আচার্য বসুর প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি পরিষদের সারস্বত সঙ্ঘের সচিব হিসাবে 1962-63 সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন ও ঐ পদাধিকার বলে কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ঐ সময় কার্যোপলক্ষ্যে তাঁকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয় এবং এই জন্যে তিনি পদত্যাগ করেন। এ সমস্ত তথ্য 1952 থেকে 1963 সাল পর্যন্ত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় আগ্রহী সভ্যেরা দেখতে পারেন। এতথ্য উক্ত প্রচারপত্র স্বাক্ষরকারী সভ্যেরা বোধ হয় জানেন না, কারণ সে সময়ে তাঁরা পরিষদের সভ্য ছিলেন না। তাহলে তাঁদের এই প্রচার তথ্যভিত্তিক কি ?

(2) উক্ত প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কর্মসচিব পরিষদকে কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছেন। উক্ত প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কেউ কেউ পরিষদের কার্যকলাপ বন্ধ রাখবার জন্যে আদালতে গিয়ে স্থগিতাদেশের চেষ্টা করেন। ঐ স্বাক্ষরকারীরা বোধ হয় প্রত্যেকেই জানেন যে, পরিষদের নামে তাঁদের কেউ কেউ ও তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা 3টি মামলা দায়ের করেছিলেন। এর ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কোন সাধারণ দায়িত্বশীল সভ্য (যাঁরা মামলাকারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন) কর্মসচিবের দায়িত্ব এই জটিল পরিস্থিতিতে নিতে সম্মত ছিলেন না ও এখনও নন। কাজেই উক্ত স্বাক্ষরকারীদের উপরিউক্ত প্রচেষ্টাজনিত পরিস্থিতির জন্যে কর্মসচিবের দায়িত্ব বর্তমান কর্মসচিবের উপর এসে পড়ে—এতথ্য উক্ত স্বাক্ষরকারীরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারতেন। এটি কি প্রকৃত তথ্যকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার চেষ্টা নয় ?

(3) পরিষদের সহযোগী কর্মসচিব ডঃ শ্যামসুন্দর দে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 1974-75 সালের হাতে-কলমে কেন্দ্রের স্টক রেজিষ্টার তিনি হিসাব পরীক্ষককে দেখতে দেন নি। অথচ সে সময় হাতে-কলমে কেন্দ্রের হিসাব ও স্টক সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পরিষদ কার্যালয়ে তৎকালীন কর্মসচিবের তত্ত্বাবধানেই থাকবার কথা। এটিও উল্লেখযোগ্য যে তখন ঐ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মডেল তৈরি সংক্রান্ত কার্যকরী সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত খরচের খুব কম অংশই ডঃ দে-কে দেওয়া হত। এর ফলে নিয়মিত হাতে-কলমে কেন্দ্র চলার জন্যে মডেল সংক্রান্ত খরচ বাবদ বহু টাকার ক্যাশ মেমো ও বিল পরিষদ কার্যালয়ে জমা ছিল। কিন্তু তার হিসাব হিসাব-পরীক্ষকদের কাছে উপস্থিত করা হয় নি। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির অগ্রিম ও দান নিয়ে ঐ কেন্দ্র চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল। একথাটি পরিষদের গত সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে, সভ্যদের জানার কথা। কাজেই এ প্রচারটি তথ্যবিকৃতির দৃষ্টান্ত নয় কি ?

(4) ডঃ দে সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, তিনি নাকি শিক্ষার্থীদের দেয় ফি ও চাঁদাবাবদ পরিষদের আয়ের সামান্য অংশের হিসাব দেন। কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসচিবের নির্দেশে পরিষদের কর্মচারীর শিক্ষার্থীদের দেয় ফি এবং চাঁদা আদায় করার কথা। ডঃ দে

পরিষদের বেতনভুক কর্মচারী নন। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে ফি ও চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন—তার সমস্ত টাকাই (বিলবই সমেত) পারষদ কার্যালয়ে জমা দেন। এতথ্য কি স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম শ্রীঅমূল্যধন দেব জানেন না ?

(5) ডঃ দে সম্বন্ধে আরও অভিযোগ করা হয়, তিনি 1974 সালের প্রদর্শনীর হিসাব বাবদ 950 টাকার হিসাব দাখিল করেন নি। উক্ত টাকার যাবতীয় হিসাব যে ডঃ দে দাখিল করেছিলেন, পরিষদ কার্যালয়ের কাগজপত্র দেখলেই তা সহজে বোঝা যায়। অথচ ঐ প্রদর্শনী সংক্রান্ত কোন হিসাবই ঐ প্রদর্শনীর মূল আহ্বায়ক প্রদর্শনী-উপসমিতির কোন সভায় বা কার্যকরী সমিতির সভায় অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত করেছেন এরূপ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই! কোন্ সভায় ঐ আয়ব্যয় অনুমোদিত হয়েছিল সে তথ্য সঠিকভাবে প্রচারের স্বাক্ষরকারীদের জানান উচিত নয় কি ? উপরিউক্ত বক্তব্যাদি তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় প্রচারপত্রের স্বাক্ষরকারীদের সমস্ত চেষ্টা পরিষদ বিরোধী কুৎসা রটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

আমাদের প্রায় সব সভ্যই গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। নিয়মতান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাতে দেশের মহামান্য আদালতের শরণাপন্ন হয়ে বিচার প্রার্থনা করবার অধিকার সবার আছে। ন্যায় বিচারের নীতি হিসাবে মহামান্য বিচারকেরাও এক তরফা স্থগিতাদেশও দিয়ে থাকেন। এই ভাবে 10ই মার্চ, 1976, পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন ও নির্বাচনে স্থগিতাদেশ জারী হয়েছিল কেবলমাত্র 3 দিনের জন্যে। তদানীন্তন কর্মসচিব শ্রীদেব (উক্ত প্রচার পত্রের একজন স্বাক্ষরকারী) কার্যকরী সমিতি বা সভাপতির কোন নির্দেশ না নিয়েই বিচারকের কাছে ঐ স্থগিতাদেশের কাল দুই মাস বৃদ্ধির আবেদন করে মঞ্জুর করে নেন। যদিও তাঁর উচিত ছিল স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করে যথা শীঘ্র সম্ভব পরিষদের স্বাভাবিক কাজ চালু রাখা। মহামান্য বিচারপতি যখন উভয় পক্ষের আইনজীবীর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্যাদি জানলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দেন এবং কারও কোনও নিয়মতান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতিজনিত ক্ষোভ থাকলে তা বার্ষিক সভায় সভাপতির নিকট জানাবার নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এর পর স্থগিতাদেশের জন্যে ঐ আদালতে অন্তত আরও 5 বার চেষ্টা করা হয় এবং সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয়। মামলা চলার সময় দেখা যায়, মহামান্য বিচারকেরা মামলা চলাকালীন পরিষদের জাতীয় উন্নয়নের যাবতীয় কর্মাদি স্বাভাবিক রাখতে আগ্রহী হন এবং বিঘ্নকারীদের চেষ্টা বিফল করে ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা করেন।

পরিষদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল সভ্যদের নিকট বর্তমান কার্যকরী সমিতির সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন অধিকার-সচেতনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে পরিষদের আদর্শ রূপায়ণে সহযোগিতা করেন। আচার্য বসুর স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব তাঁরা কি পালন করবেন না ?

ক্রমবাহিক গণনাপ্রক্রিয়ার স্বরূপ

শ্যামল মজুমদার*

সংবাদ সরবরাহ, ব্যাঙ্কিং, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ (traffic-control), আবহাওয়া বিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির কর্মপরিধির ক্ষেত্রে অনেক জটিল সমস্যা দেখা দেয়—যার সমাধান কম্পিউটারের সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। প্রশ্ন হচ্ছে সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্যে যদি একটিই কম্পিউটার থাকে তবে ঐ কম্পিউটারে একই সঙ্গে দুটি বা দুটির বেশী উপরিলিখিত ভিন্নধর্মী গণনাপ্রক্রিয়ার কাজ করিয়ে নেওয়া যায় কিনা? এর উত্তর—একই কম্পিউটারে এক সঙ্গে দুই বা দুই-এর বেশী ভিন্নধর্মী গণনাপ্রক্রিয়ার সংযুক্তিকরণ বা সহযোগিতা (co-operation) সম্ভব। এই উত্তরটি আলোচনা করতে গিয়ে হল্যাণ্ডের খ্যাতনামা কম্পিউটার-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডাইক্‌স্ট্রা (E.W. Dijkstra) সিকোয়েনসিয়েল প্রসেস্ (sequential process) বা ক্রমবাহিক গণনাপ্রক্রিয়া বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে যে সরল ও শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করেছেন তা সাধ্যমত বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে একই কম্পিউটারে দুই বা দুই-এর অধিক গণনাপ্রক্রিয়ার সহযোগিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

অক্রমবাহিক গণনাকারী কম্পিউটারের (non-sequential machine) ও ক্রমবাহিক গণনাকারী কম্পিউটারের কাজের পার্থক্য দেখানো হবে একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে। ধরা যাক চারটি সংখ্যা 7, 12, 2 ও 9 আছে—যাদের যথাক্রমে a(1), a(2), a(3) ও a(4) নাম দেওয়া হল। এদের মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটিকে অর্থাৎ a(2) কে বের করতে হবে কম্পিউটারের সাহায্যে। এই সমস্যার (problem) সমাধানের জন্যে যে কম্পিউটার দরকার তার প্রধান অংশ একটি (বা একাধিক) বিদ্যুৎচালিত সুইচ, যেটি বাঁদিকে অথবা ডানদিকে—এই দুই দিকে সরতে পারে। কোন্ দিকে সুইচটি সরবে তা সুইচের দু-পাশে অবস্থিত দুটি তড়িৎ-চুম্বক কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গের তুলনামূলক মানের উপর নির্ভরশীল। ধরে নেওয়া হল, দুটি কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত তরঙ্গের মানের (এই মান প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মানের আনুপাতিক) মধ্যে এমন তফাৎ রয়েছে, যেটি সুইচটিকে বাঁ দিকে অথবা ডানদিকে—এই দুটি অবস্থার একটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করবে (চিত্র 1)।
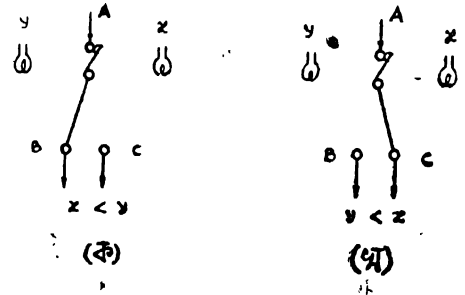
চিত্র 1

এই চিত্রে AB ও AC সুইচটির দুটি অবস্থান নির্দেশ করছে। y এবং x—সুইচের যথাক্রমে বাঁদিকে ও ডানদিকে অবস্থিত দুটি তড়িৎ-চুম্বক কুণ্ডলীর ভিতরে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (যাদের মান প্রদত্ত যে কোন দুটি সংখ্যার মানের

*কম্পিউটার সেন্টার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-700 032

আনুপাতিক)। যখন y-এর মান x-এর চেয়ে বেশি, তখন সুইচের বাঁদিকে অবস্থিত তড়িৎ-চুম্বক কুণ্ডলীর টান বেশি হওয়াতে সুইচটি AB অবস্থানে থাকবে (চিত্র 1 ক)। এর বিপরীত ক্ষেত্রে সুইচটির অবস্থান হবে AC (চিত্র 1 খ)।

এর পরের সব ছবিতে বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রিত সুইচ-এর প্রতীক হিসাবে একটি বাক্সকে বোঝাবে। বাক্সে প্রবেশকারী তড়িতের প্রবেশপথ A বিন্দু ও তার বহির্গমনের সম্ভাব্য দুটি পথ (অর্থাৎ সুইচের দুটি অবস্থান) যথাক্রমে B ও C বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা হবে (চিত্র 2)। তড়িৎ-

চিত্র 2
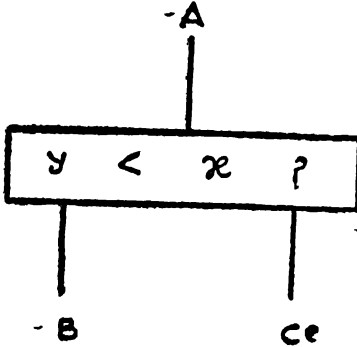
চুম্বকদ্বয়ের মধ্যে প্রবাহকারী x ও y বৈদ্যুতিক তরঙ্গদ্বয়কে বাক্সের মধ্যে লিখিত প্রশ্ন থেকে চেনা যাচ্ছে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সুইচের AC অবস্থান বাক্সে উপস্থাপিত প্রশ্নের 'হ্যাঁ' উত্তর নির্দেশক ও AB অবস্থান 'না' উত্তর নির্দেশক। a(1), a(2), a(3) ও a (4)-এর মধ্যে কোন্‌টি বৃহত্তম (এই সংখ্যাগুলির মানের পার্থক্য এমন যে তুলনা করার পর কোন সুইচ একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নিতে পারবে), তা স্থির করার জন্যে ছটি সুইচ বিশিষ্ট একটি কম্‌পিউটার মেশিনের সম্পূর্ণ কার্যকলাপ চিত্র 3-এ দেখানো হয়েছে। ঐ চিত্রে 1, 2, 3 ও 4 চারটি বাল্‌ব। এদের মধ্যে যে কোন একটি জ্বলে উঠে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দেবে। যদি 2 নম্বর বাল্‌ব জ্বলে, তবে ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে, a(2) হচ্ছে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের
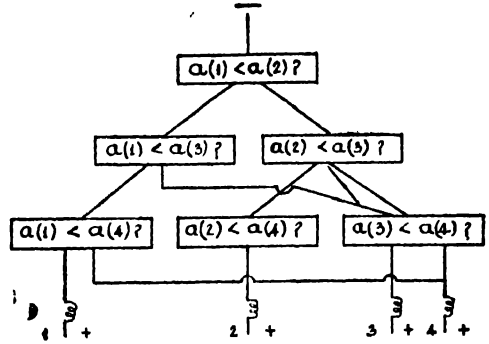
চিত্র 3

উত্তর। বাল্‌বগুলি কম্‌পিউটার যন্ত্রের উত্তর যোগানোর নির্গম ইউনিটের (output unit) অন্তর্ভুক্ত। মেশিনের সমস্যা গ্রহণকারী অন্তর্গমন অংশে (input unit) 7, 12, 2 ও 9—এই সংখ্যাগুলি দেবার পর বাক্সগুলির ভিতর সুইচের অবস্থান পরের চিত্রে দেখানো হয়েছে (চিত্র 4)।
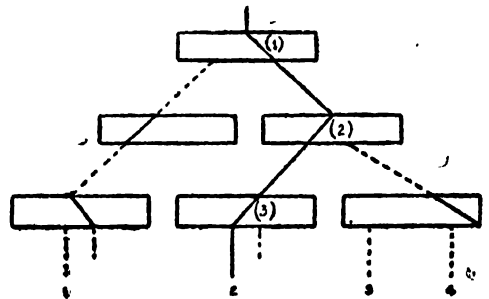
চিত্র 4

যে তারগুলি অন্তর্গমনের (input) সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, সেগুলি ভগ্নরেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এটি পরিষ্কার যে, (চিত্র 4 থেকে) প্রদত্ত সমস্যার সমাধানে মাত্র তিনটি সুইচের (চিত্রে অবিচ্ছিন্ন রেখার দ্বারা চিহ্নিত) ভূমিকা রয়েছে। বলা বাহুল্য এই তিনটি সুইচ 2 নম্বর

বাল্বকে অন্তর্গমনের সঙ্গে যোগ করছে। অন্য তিনটি সুইচের অবস্থান অবান্তর।

কম্পিউটারের কাজের পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করা যাক চিত্র 3-এর সাহায্যে। সমস্যা পাবার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের ছটি সুইচ একই সঙ্গে তুলনা করার কাজ আরম্ভ করল যদিও শেষ পর্যন্ত বিশেষ তিনটি সুইচের অবস্থানই প্রাসঙ্গিক। এই পদ্ধতিতে কোন্ সময়ে কোন্ সুইচ কাজ করছে কিংবা সুইচগুলি একটির পর একটি (ক্রমবাহিকতায়) কাজ করছে কিনা তা বড় কথা নয়। যেন দেখা যাচ্ছে, কম্পিউটারের তুলনা করার সুইচগুলি বিভিন্ন অবস্থানে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করছে। সময় বা ক্রমের (sequence) ধারণা (idea) এখানে নেই। কিন্তু এই চিত্রটি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও দেখা যায়। ভাবা যাক একটি ইলেকট্রন সমস্যা গ্রহণকারী অংশে ঢুকে চিন্তা করছে কোন্ পথে যাবে। তা সে ঠিক করল $a(1) < a(2)$?—এই তুলনার উত্তর দেখে। এই উত্তরের উপর নির্ভর করছে তার গতিপথ বাঁদিকে যাবে, না ডানদিকে যাবে। এর মানে, প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেলে সেটি পরে কি খুঁজবে তা ঠিক করবে। তেমনি দ্বিতীয় সারির বাক্সের প্রশ্নের উত্তর জেনে সেটি তৃতীয় বা শেষ সারির কোন্ বাক্সে যাবে, তা ঠিক করবে। শেষ সারির বাক্সের প্রশ্নের উত্তর থেকে ইলেকট্রনটি জানবে কোন্ বাল্ব জ্বলবে। পুরো সমস্যাটিকে যদি এভাবে দেখা হয়, তবে চিত্র 3-কে খানিকটা জায়গা নিয়ে বসা একটি মেশিনের ছবি হিসাবে না দেখে তাকে একটি ইলেকট্রনের গন্তব্য নির্দেশক কতকগুলি নিয়মের চিত্ররূপ হিসাবে মনে করা যেতে পারে। এই নিয়ম সময়ের হিসাবে একটির পর একটি অনুসরণ করতে হবে। চিত্র3-এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ছুটির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম ব্যাখ্যায় কম্পিউটার যন্ত্রের ছটি সুইচই একসঙ্গে কাজ করছে—যদিও আসলে তিনটি সুইচের ভূমিকাই গণ্য। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় প্রকৃতপক্ষে মাত্র তিনটি প্রশ্নের উত্তরফল যাচাই করা হচ্ছে অর্থাৎ ইলেকট্রন মাত্র তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে; কিন্তু এই সুবিধার মূল্য হিসাবে প্রশ্নগুলি একসঙ্গে করার অধিকার সে হারাচ্ছে। একটি প্রশ্নের উত্তর পাবার পর অন্যটি করতে হচ্ছে। এককথায় প্রশ্নগুলি বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে তুলতে হচ্ছে এবং এই ধারণাটাই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য।

কম্পিউটারের সমস্ত গণনা পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে ঘটে (sequential) বা সেইভাবে জিনিষটাকে দেখা হয়ে থাকে। কোন অ্যালগরিদম্-এর (algorithm) যে প্রবাহ চিত্র (flow chart) দেওয়া হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে যে প্রোগ্রাম (programme) লেখা হয়, গণনা পদ্ধতির ক্রমবাহিকতা তার মূল সুর। প্রবন্ধের সুরুতে একাধিক ভিন্নধর্মী গণনাপ্রক্রিয়ার সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গে প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়বস্তুর যোগসূত্রটি কোথায়? ছুটি ভিন্নধর্মী গণনাপদ্ধতি দূরে থাকুক, কম্পিউটারে একই সমস্যার ছুটি বিভিন্ন গণনা একই সময়ে হয় না। একটি সম্পূর্ণ হলে অন্যটি নেওয়া হয়। ছুটি বিভিন্ন সমস্যার গণনার ক্ষেত্রে এই মন্তব্য স্বভাবতই খাটবে। তবে তাদের সহযোগিতার অর্থ—একটা সমস্যার গণনা খানিকটা এগিয়ে নিয়ে অন্য সমস্যার গণনা খানিকটা করা হয় এবং ক্রমশ আংশিকভাবে করে ছুটি ভিন্নধর্মী গণনা একই সঙ্গে সম্পূর্ণতার দিকে এগোয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, একটি সমস্যার ক্ষেত্রে যা ঘটছে ছুটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে অর্থাৎ গণনার ক্রমবাহিকতা। 'একই সঙ্গে' কথাটির অর্থ একই সময়ে নয়, একটির পর একটি।

সূত্র নির্দেশ

1. ই. ডবলিউ. ডাইকস্ট্রা: কোয়াপারেটিং সিকোয়েন্সিয়াল প্রসেসেস্ (Co-operating Sequential Processes) 1966, গবেষণা পত্রটি 'প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস', সম্পাদক: এফ. গেনিস (Programming Languages Ed. F. Genuys) নামক বইটিতে পাওয়া যাবে। প্রকাশক: অ্যাকাডেমিক প্রেস, 1964, নিউইয়র্ক।

জীবাণু ও আমরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অশোককুমার সরকার*

ছত্রাক ছাড়া ব্যাক্‌টিরিয়া থেকেও অ্যান্টি-বায়োটিক পাওয়া যায়; যেমন—ব্যাসিট্রাসিন। এটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ছোট্ট একটি মেয়ে মার্গারেট ট্রাসির ক্ষত থেকে পাওয়া ব্যাসিলাস লাইকেমিফর্মিস নামক ব্যাক্‌টিরিয়া থেকে। তাই এই নাম।

আবার, পেনিসিলিয়াম গ্রিসিয়ো ফালভাম নামক ছত্রাক থেকে পাওয়া গ্রিসিওফালভিন কাজে লাগে ব্যাক্‌টিরিয়া মারতে নয়, তার বদলে চর্মরোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকদের ধ্বংস করতেই এর ব্যবহার। এই ধরণের পদার্থের নাম অ্যান্টি-ফাঙ্গাল অ্যান্টিবায়োটিক। এর আরেকটি প্রধান উদাহরণ হল স্ট্রেপটোমাইসিস নুরেসি থেকে পাওয়া নিষ্টাটিন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগেই আবিষ্কৃত হয়েছে এরকম দুটি অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্টিবায়োটিক—ব্যাসিলাস সাটিলিস নামক ব্যাক্‌টিরিয়া থেকে পাওয়া মাইক্রোব্যাসিলিন এবং অ্যাস্‌পারগিলাস ভার্সি-কোলোন নামক ছত্রাক থেকে পাওয়া ভার্সি-কোলিন। ছত্রাকঘটিত চর্মরোগের চিকিৎসায় এই সব অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্টিবায়োটিক প্রভূত উপকার করতে পারে।

একই ভাবে অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিবায়োটিকও পাওয়া গেছে। যদিও এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত খুব ভাল ফলদায়ক কোন পদার্থ পাওয়া যায় নি, তবে লক্ষ্ণৌ-এর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আবিষ্কৃত হয়েছে এক জাতের অ্যাস্‌পারগিলাস থেকে পাওয়া 6MFA—নামক একটি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টি-বায়োটিক।

অ্যাস্‌পারগিলাস গ্রুপেরই আর একটি ছত্রাক—এক ধরণের অ্যাসপারগিলাস ফিউমিগে-টাস—থেকে পাওয়া যায় "ফিউমাগিলিন" নামক অ্যান্টিবায়োটিক যা ব্যাক্‌টিরিয়া মারতে অক্ষম, কিন্তু অ্যামিবাজাতীয় প্রোটোজোয়া ধ্বংস করতে পারে। তাই আন্ত্রিক অ্যামিবিয়াসিসে এর ব্যবহার আছে।

এবার, আসা যাক ছত্রাকদের অন্যান্য ব্যবহারে। যেমন, দুটি ভিন্ন ধরণের অ্যাস্‌পার্‌-গিলাস নিগার থেকে পাওয়া যায় সাইট্রিক অ্যাসিড ও গ্লুকোনিক অ্যাসিড। এই সাইট্রিক অ্যাসিডের অর্ধেকেরও বেশী লাগে ওষুধ উৎপাদন শিল্পে; অবশ্য তাছাড়াও লাগে খাদ্যকে সুস্বাদু করতে, কালি তৈরিতে, রঞ্জন শিল্পে ইত্যাদি। গ্লুকোনিক অ্যাসিডেরও প্রধান ব্যবহার ওষুধ শিল্পে। যেখানে প্রধানত: গ্লুকোনিক অ্যাসিড লাগে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট তৈরি করতে, যা শরীরে ক্যালসিয়ামের যোগান দেওয়ার জন্যে খাওয়ান হয়। শিশুদের হাড় সুগঠিত হওয়ার জন্যে প্রয়োজন হয় এই ক্যালসিয়ামের, যা তাকে পেতে হয় মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের রক্ত থেকে ও জন্মের বেশ কিছু কাল পর অবধি মায়ের দুধ থেকে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম ছড়িয়ে আছে বহু খাদ্যে, কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই এমনরূপে থাকে যে, শরীরে শোষিত হয় না, রেচনা পদার্থরূপে বেরিয়ে যায়, তাই মা ও শিশু উভয়েরই জন্যে ক্যাল-সিয়াম গ্লুকোনেট এক অমূল্য সম্পদ আর সেই গ্লুকোনিক অ্যাসিডেরই উৎস হল আমাদের বহু

*12B/1, ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা-700 025

অবহেলিত ছত্রাকেরা। (গ্লুকোনিক অ্যাসিডের আর একটি ব্যবহার হল ফেরাস গ্লুকোনেটরূপে শরীরে লৌহ যোগান দেওয়ার জন্যে)।

বর্তমানকালের আর একটি বিশেষ আবিষ্কার হল এই যে, ছত্রাকেরা ষ্টেরয়েডজাতীয় পদার্থের অণুতেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে নিজেদের কোষনিঃসৃত এনজাইমের দ্বারা। এই ষ্টেরয়েডরা হল এক ধরণের জটিল রাসায়নিক যৌগ যাদের অন্যতম উদাহরণ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত নানা প্রকার ষ্টেরয়েড হর্মোন (যথা কর্টিসোন) এবং যৌন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত টেষ্টোস্টিরোন (পুরুষের দেহে) বা এষ্ট্রোজেন (স্ত্রীলোকের দেহে), যারা শরীরে যৌন গুণাগুণ উৎপাদন করে। কর্টিসোন হর্মোনটি রিউমাটয়েড আর্থাইটিস নামক রোগের চিকিৎসায় বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু প্রাণীদেহের অতিক্ষুদ্র অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে এটি পাওয়া যায় খুবই অল্প পরিমাণে। তাই নিতে হয় ছত্রাকদের সাহায্য। সে ক্ষেত্রে কাঁচামাল হল একটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ ডায়োসজেনিন। আমাদের দেশে এই ডায়োসজেনিনসমৃদ্ধ উদ্ভিদ ডায়োস্কোরিয়া ডেল্টয়ডিয়া পাওয়া যায় কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে এবং ডায়োস্কোরিয়া প্রাজেরি নামে আর একটি উদ্ভিদ পাওয়া যায় দার্জিলিংয়ে। উদ্ভিদদেহ থেকে এই ডায়োসজেনিন বের করে নিয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তাকে পরিণত করা হয় প্রোজেষ্টেরনে। এই প্রোজেষ্টেরন থেকে রাইজোপাস বা অ্যাস্পারগিলাস গণের বেশ কয়েকটি ছত্রাকের দ্বারা ফার্মেন্টেশান ঘটিয়ে পাওয়া যায় কর্টিসোন। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল রাইজোপাস নিগ্রিকান্স, অ্যাস্পারগিলাস নিগার, ও অ্যাস্পারগিলাস ও ক্রাসিয়াস।

ষ্টেরয়েডদের এই রকম পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় এনজাইম যে কেন ছত্রাককোষে আছে, তা এক বিরাট রহস্যের ব্যাপার। প্রকৃতিতে ছত্রাকদের স্বাভাবিক বাসস্থানে মোটেই নেই ষ্টেরয়েডদের এমন ছড়াছড়ি যে, ছত্রাকেরা তা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত বলে মনে করা যাবে। তবু কেন বা কি করে এই অদ্ভুত গুণের তথা এনজাইমের সমাবেশ ঘটল ছত্রাকদেহে? প্রকৃতির অগণিত অনুদ্ঘাটিত রহস্যের মধ্যে এটিও একটি।

আবার, কিছু ছত্রাক নিজেরাই হর্মোন তৈরি করতে পারে; যেমন—উদ্ভিদদেহ আক্রমণকারী ছত্রাক জিব্বারেলা ফুজিকুরোই তৈরি করতে পারে জিব্বারেলিক অ্যাসিড নামে এক উদ্ভিদ-হর্মোন। তাই দেখা গেছে যে, এই ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত ধানগাছ সুস্থ ধানগাছের চেয়ে আরো লম্বা হয়। ভবিষ্যতে উদ্ভিদদেহের দ্রুত ও অধিক বৃদ্ধি ঘটাবার উদ্দেশ্যে ঐ ছত্রাক থেকে হর্মোন উৎপাদন হয়ত হয়ে দাঁড়াবে কৃষিকার্যের এক আশীর্বাদস্বরূপ।

ছত্রাকদের অবদানের কথা কিন্তু এখন শেষ হয় নি। আগেই বলা হয়েছে যে, জীবাণুরা ফার্মেন্টেশান ঘটায় তাদের দেহ থেকে এনজাইম নিঃসরণ করে। সুতরাং আমরা এই সব এনজাইমও জীবাণুদেহ থেকে পেতে পারি ও সেগুলিকে জীবাণুর অনুপস্থিতিতেই বিশেষ বিশেষ কাজে প্রয়োগ করতে পারি; যেমন—গমের ভুষির উপর অ্যাস্পারগিলাস অরিজি নামক ছত্রাক জন্মিয়ে আমরা পেতে পারি টাকা-ডায়াষ্টেজ নামক এনজাইম, যা শ্বেতসারের বিশাল অণুকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে পরিণত করে মলটোজে। আবার ইষ্টের কোষ থেকে পাওয়া যায় ইনভারটেজ নামক এনজাইম যা আখের চিনিকে ইনভারট সুগার অর্থাৎ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের মিশ্রণে পরিণত করে। চকোলেট ক্রিম তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

তারপর ধরা যাক প্রোটিন বিভাজনকারী এনজাইমদের কথা। চর্মশিল্পে চামড়া পরিষ্কার

করার জন্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাকাজে এদের ব্যবহার করা হয়। এর জন্যে প্রয়োজনীয় পেপ্‌সিন ও প্যাংক্রিয়াটিন শূকর বা গরুর দেহ থেকে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কসাইখানা থেকে ঐসব পশুর পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয় নিয়মিত সরবরাহের নিশ্চয়তা না থাকায় ঐসব এনজাইমের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কিন্তু সেগুলি আমরা এদেশেই তৈরি করতে পারি যদি সাহায্য নেই পেনিসিলিয়াম জ্যান্থিনেলাম নামক ছত্রাকের। যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এক্‌স্‌পেরিমেনটাল মেডিসিনেই এই কাজ চলছে।

এ ছাড়াও পেনিসিলিয়াম গণেরই ছত্রাক থেকে পাওয়া যায় পেক্‌টিনেজ যা উদ্ভিদকলার পেক্‌টিন-ঘটিত যৌগের উপর ক্রিয়া করে এবং সেজন্যে ফলের রসের ঘোলাটে ভাব দূর করতে কাজে লাগে।

এগুলি শুধু ছত্রাকদের কথাই বলা হল। কিন্তু ব্যাক্‌টিরিয়ারাও প্রচুর উপকারী ; যেমন—আগেই বলা হয়েছে যে, ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস ল্যাক্‌টিস নামক ব্যাক্‌টিরিয়া দুধকে টকিয়ে দইয়ে পরিণত করে। এই পদ্ধতিতে প্রকৃতপক্ষে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড তৈরি হয়। এই ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড খুবই প্রয়োজনীয় পদার্থ; যেমন—ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের মত ক্যালসিয়াম ল্যাক্‌টেটও একটি অন্যতম ক্যালসিয়াম-ঘটিত পুষ্টিকর খাদ্য। শিল্পক্ষেত্রে এই ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড তৈরি হয় ল্যাক্‌টোব্যাসিলাস ডেলব্রুকির সাহায্যে যখন কাঁচামাল হল চিটে গুড়। আর যদি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হয় ছানার জলে অবস্থিত ল্যাক্‌টোজ নামক শর্করাকে, তাহলে ল্যাক্‌টোব্যাসিলাস ডেলব্রুকির বদলে ব্যবহার করতে হবে ল্যাক্‌টোব্যাসিলাস বুলগারিকাস।

আবার, প্রায় প্রথমেই যে ভিনিগার তৈরির কথা বলেছি তাতে কাজে লাগে অ্যাসিটোব্যাক্টার অ্যাসেটি বা অ্যাসিটোব্যাক্টার সাবক্সিড্যান্‌স।

এই অ্যাসিটোব্যাক্টার সাবক্সিড্যান্‌স্‌ আবার সরবিটল থেকে সরবোজ তৈরিতে লাগে। এই সরবোজ ভিটামিন-সি তৈরিতে লাগে। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে, আবার কিছু ব্যাক্‌টিরিয়া মিথোজীবীরূপে বাস করে। এদের মধ্যে অনেকে নানারকম ভিটামিন সংশ্লেষণ করে খাদ্যের পরিপূরক ভিটামিন সরবরাহ করে, যথা—ভিটামিন-K, ভিটামিন-B_{12}। ছানার জল থেকেই অন্য একটি ব্যাক্‌টিরিয়া ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসেটোবিউটিলিকাম দিয়ে তৈরি হয় রিবোফ্ল্যাভিন বা ভিটামিন-B_2। এই একই ব্যাক্‌টিরিয়া দিয়ে চিটে গুড় থেকে তৈরি করা যায় শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক অ্যাসিটোন ও বিউটানল।

অনেক প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সহজে তৈরিতেও ব্যাক্‌টিরিয়া আমাদের সাহায্য করে। যেমন, গ্লুটামিক অ্যাসিড ও লাইসিন তৈরিতে কাজে লাগে মাইক্রোককাস গ্লুটামিকাস, এশেরিশিয়া কোলাই এবং অ্যারোব্যাক্টার অ্যারোজিনিস। উৎপন্ন পদার্থ লাইসিন একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (শরীরে প্রোটিন তৈরির জন্যে)। কিন্তু চাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি সব প্রধান শস্যেই রয়েছে লাইসিনের অভাব। সেই অভাব পূরণ করতে ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা তৈরী এই লাইসিন একটি অন্যতম খাদ্য-পরিপূরক। গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে পাওয়া মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট খাদ্যকে সুস্বাদু করতে ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু শুধু শিল্পক্ষেত্রেই নয়, তার বাইরে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যেও এরা যুগ যুগ ধরে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। আমরা জানি যে, উদ্ভিদেরা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মাটি থেকে জল—এই দুই সরল অণু নিয়ে আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তৈরি করে কার্বোহাইড্রেট অণু। বিপাকক্রিয়ার ধাপে ধাপে তা হয়ে ওঠে আরো জটিল। মানুষসহ সমস্ত প্রাণী খাদ্যের জন্যে

উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। প্রাণীদেহেও নানা রকম জটিল জৈব যৌগ তৈরি হয়। কিন্তু যে কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে এই প্রাণের ধারা বয়ে আসছে তাতে পরিবেশের সমস্ত সরল পদার্থই এতদিনে জটিল জৈব যৌগে পরিণত হয়ে যাওয়ার কথা; ফলে উদ্ভিদের ঘটত খাদ্যাভাব। সে অভাবের ফল ভোগ করতে হত সমগ্র জীব-জগতকে। কিন্তু এই মহাঅঘটন না ঘটার মূলেও রয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু জগৎ। এরা সমস্ত জটিল যৌগকে ভেঙে আবার সরল অণুতে পরিণত করছে, যাতে তা আবার উদ্ভিদদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে, পুনরায় প্রকৃতির আবর্তনচক্রে আবর্তিত হতে পারে, বারবার ঘুরপাক খেতে পারে জীব ও জড়-জগতের মধ্যে। ব্যাক্টিরিয়াদের এরকমই এক কর্মকাণ্ড দেখতে পাওয়া যায় বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে। সেখানে ডুবে-থাকা পচনশীল মরা গাছপালার মধ্যে যে সেলুলোজ আছে, তার অতিকায় অণুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে ক্লসট্রিডিয়াম ডিজল্ভেনস নামক ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা নিঃসৃত সেলুলোজ বিভাজনকারী এক এনজাইম। ফলে জলের উপর উঠে আসে ঐ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মিথেন গ্যাসের অণু, যা খুবই সাধারণ একটি দৃশ্য। এই উদ্ভূত মিথেন গ্যাস দাহ্য অর্থাৎ জ্বলতে পারে। তাই এই ধরণের ফার্মেন্টেশানকে কাজে লাগিয়ে জ্বালানী গ্যাস তৈরির জন্যে বর্তমানে চেষ্টা চলছে। এই রকমই একটি জ্বালানী গ্যাস হল বর্তমান-কালের গোবর গ্যাস। 1973 সালের শেষের দিক থেকে (পেট্রোলিয়ামের দাম প্রচুর বেড়ে যাওয়ার পর) আমাদের দেশে সহজপ্রাপ্য গোবর থেকে জীবাণুর দ্বারা এই জ্বালানী গ্যাস তথা গোবর গ্যাসে তৈরির চেষ্টা চলছে।

এবার দৃষ্টি দেওয়া যায় কৃষিক্ষেত্রের দিকে। সেখানেও জীবাণুরা কাজ করে চলেছে গোপনে গোপনে—নাইট্রোজেন সরবরাহকারীরূপে। সমগ্র জীবজগতের প্রয়োজন এই নাইট্রোজেন। প্রোটিনের একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান এই নাইট্রোজেন। আর বায়ুমণ্ডলেও এই নাইট্রোজেনের কোন অভাব নেই। বায়ুর 78% এই নাইট্রোজেন। ফলে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর প্রতি একর জমির উপর ভেসে রয়েছে গড়ে প্রায় 30,000 টন নাইট্রোজেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, উদ্ভিদ বা প্রাণী কেউই বাতাসের এই নাইট্রোজেন সরাসরি দেহের মধ্যে নিয়ে পুষ্টি ঘটাতে পারে না। প্রাণীরা একমাত্র উদ্ভিদ থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ গ্রহণ করতে সক্ষম। আর উদ্ভিদেরা মাটিতে যেসব নাইট্রোজেনঘটিত সরল অজৈব লবণ আছে, (যথা, অ্যামোনিয়াম লবণ, বিশেষত নাইট্রেট লবণ) সেগুলিকেই জলে দ্রবীভূত অবস্থায় মূল রোম দিয়ে শোষণ করে দেহগঠনে কাজে লাগাতে পারে। জৈব নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ মাটি থেকে একেবারেই যে নিতে পারে না, তা নয়। তবে প্রায় নগণ্য। কিন্তু মাটিতে এই নাই-ট্রোজেনঘটিত যৌগ আসে কিভাবে? যেমন, বিদ্যুৎপাতের সময় আকাশে নাইট্রোজেন, অক্সি-জেন ও জল বা জলীয় বাষ্প জুড়ে তৈরি হয় নাইট্রিক অ্যাসিড যা বৃষ্টিধারার সঙ্গে মাটিতে পড়ে ও সেখানে নানা পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে। এই রকম ধরণের নানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মাটিতে যুক্ত হয় প্রতি বছর প্রায় 4½ কোটি মেট্রিক টন নাইট্রোজেন। এছাড়া বাতাসের নাইট্রোজেনকে অন্যতম কাঁচামালরূপে ব্যবহার করে নানা রাসায়নিক পদ্ধতিতে কারখানায় তৈরি হয় নানা রকম নাইট্রোজেনঘটিত সার। সেগুলিও প্রতি বছর মাটিতে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন যোগ করে। কিন্তু সর্বোপরি মাটিতে বাস করে কয়েক প্রকার জীবাণু যারা সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে মাটিতে নাই-

ট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়—বছরে খুব কম করে 9 কোটি মেট্রিক টন হারে। এই সব জীবাণু সকলেই প্রোক্যারিয়োটিক কোষযুক্ত—ব্যাক্টিরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবাল। আবার, এদের সকলকেই দু-ভাগে ভাগ করা যায়—স্বাধীনজীবী ও মিথোজীবী।

স্বাধীনজীবীরা অন্য উদ্ভিদের আশ্রয় বা সাহায্য ছাড়াই মাটিতে স্বাধীনভাবে বসবাস ও বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করে যে সব পদার্থ উৎপন্ন করে তা মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ায়; যেমন—ক্লস্ট্রিডিয়াম, সিউডোমোনাস অ্যাজোটোব্যাক্টার, মাইকোব্যাক্টিরিয়াম, ক্লেবসিলা প্রভৃতি গণের অন্তর্গত ব্যাক্টিরিয়া এবং কিছু নীল-সবুজ শৈবাল; যেমন—নষ্টক। অনুমান করা হয় যে, অ্যাজোটোব্যাক্টার প্রতি হেক্টর জমিতে বছরে 10 থেকে 25 কি.গ্রা. নাইট্রোজেন যোগ করে থাকে। এই সব জীবাণু মাটিতে যোগ করে মাটির উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে তোলা যায়।

যেখানেই অ্যাজোটোব্যাক্টার ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই ফসলের উৎপাদন বেশ কিছুটা বেড়েছে। যেমন, গম—15-18%, ভুট্টা—6-18%, আলু—20-22%, টোম্যাটো—28%, পাট—15-22%, ধান—17-29%। এছাড়া এতে জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতাও প্রায় 50% বেড়ে গেছে।

এর পর হল মিথোজীবী নাইট্রোজেন শোষণকারীদের কথা। এদের মধ্যে প্রধান গণ হল রাইজোবিয়াম। এরা উদ্ভিদের মূলরোমকে আক্রমণ করে কর্টেক্স কলার মধ্যে বিস্তারলাভ করে। তারপর কোষের সাইটোপ্লাজমে ঢুকে একটি পাতলা পর্দার দ্বারা আবৃত হয়। তখন এই ব্যাক্টিরিয়াদের বলে ব্যাকটিরিঅয়েড। বাইরে থেকে মনে হয় যেন মূলের গায়ে অজস্র গুটি জন্মেছে। এই সব ব্যাক্টিরিয়ার কোষে নাইট্রোজিনেজ নামক যে এনজাইম থাকে, তা বাতাসের নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ায় পরিণত করে। তার পর নানা এনজাইমের দ্বারা এই NH_3 পরিণত হয় (i) গ্লুটামিক ও অ্যাস্পারটিক অ্যাসিড, অথবা (ii) গ্লুটামিন ও অ্যাস্পারজিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডে, অথবা (i) ও (ii) উভয় ধরণেরই অ্যামিনো অ্যাসিডে। এই সব যৌগরূপেই নাইট্রোজেন সংবাহিত হয় আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহে। এইভাবে আশ্রয়কারী জীবাণুর সাহায্যে উদ্ভিদ পায় নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ আর পরিবর্তে ঐ সব জীবাণু উদ্ভিদদেহ থেকে পায় আশ্রয় ও আলোক সংশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন শর্করাজাতীয় পদার্থ।

কিন্তু এই সব মিথোজীবী জীবাণু একমাত্র শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের (যথা—ডাল, সয়াবীন) সঙ্গেই পরস্পর সহযোগিতায় বাস করতে পারে। অবশ্য বছরখানেক আগে বেশ কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদদেহের বাইরেও রাইজোবিয়াম ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব যদি যোগান দেওয়া যায়, জাইলোজ বা অ্যারাবিনোজের মত কোন পেন্টোজ (পাঁচটি কার্বনযুক্ত) শর্করা ও সাক্সিনিক অ্যাসিডের মত দুটি কার্বক্সিল মূলকযুক্ত কোন অ্যাসিড। তখন আর আশ্রয়দাতা শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের সাহায্য লাগে না। সুতরাং কৃষি গবেষণায় এর পরের ধাপ হবে কি করে অ-শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের সঙ্গে এদের সহযোগিতা গড়ে তোলা যায়। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি প্রধান শস্যজাতীয় উদ্ভিদের সঙ্গে এদের সহযোগিতা গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা হবে কৃষি-বিজ্ঞানের জগতে এক বিপ্লবস্বরূপ।

অবশ্য জেনেটিক ইন্জিনিয়ারিং-ও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। উল্লিখিত পেট্রোলিয়াম হজমকারী গুণের মত এই নাইট্রোজেন শোষণ করার গুণও অবস্থান করে ব্যাক্টিরিয়ার প্লাজমিডে। ঐ প্লাজমিডটিকে আর একটি দ্রুতহারে সংখ্যা বৃদ্ধির গুণসম্পন্ন প্লাজমিডের সঙ্গে যুক্ত করে

তৈরি করা যায় একটি সংকর প্লাজমিড—লিগেজ নামক এনজাইমের সাহায্যে। এই সংকর প্লাজমিডটিতে একদিকে যেমন থাকবে নাইট্রোজেন শোষণ করার গুণ, অন্যদিকে তেমনি থাকবে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির গুণ। এই সংকর প্লাজমিডকে তখন ঢুকিয়ে দেওয়া যায় উদ্ভিদের পরাগকোষে। তার পর তাই থেকে উদ্ভিদ জন্মালে তার কোষে কোষে থেকে যাবে নাইট্রোজেন শোষণকারী ব্যাক্টিরিয়ারই মত বাতাসের নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণের ক্ষমতা।

ব্যাক্টিরিয়ারা কিন্তু অন্য ভাবেও চাষীভাইদের উপকারে লাগতে পারে; যেমন—ব্যাসিলাস পপিলি ও ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েনসিস—এই দুই ব্যাক্টিরিয়াকে কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকরূপে ব্যবহার করা যায়। এরা নিজেদের চারিদিকে স্পোর নামে একটি আবরণ তৈরি করে নিজেদেরকে বিরূপ পরিবেশের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করতে পারে। সেই সঙ্গে এরা একরকম বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে সেই সব কীট-পতঙ্গকে মারে, যারা উদ্ভিদের শত্রু। ঐ বিষাক্ত পদার্থ কিন্তু উদ্ভিদ, জীবজন্তু বা উপকারী কীট-পতঙ্গদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। ফলে D.D.T জাতীয় রাসায়নিক কীটনাশের মত এরা সমগ্র পরিবেশকে দূষিত করে তুলবে না বলেই আশা করা যায়।

আরো যেসব জীবাণু থেকে ভবিষ্যতে আমরা উপকৃত হতে পারি বলে বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি হল থায়োব্যাসিলাস (thiobacillus)। এদের দিয়ে শিল্পসমূহের সালফাইডজাতীয় আবর্জনা থেকে শিল্পজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক দ্রব্য সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যেতে পারে।

বছরখানেক আগে এক জার্মান বিজ্ঞানী ক্লাউস ভাগনার প্রস্তাব করেছেন সামুদ্রিক শৈবালের সাহায্যে সমুদ্রের জল থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করতে। পারমাণবিক চুল্লীতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে লাগে এই ইউরেনিয়াম। প্রতি 1000 টন সমুদ্রজলে ইউরেনিয়াম আছে 3 গ্রাম। রঞ্জন রশ্মি বা এক্স-রে দিয়ে সামুদ্রিক শৈবালদের জিন মিউটেশান* ঘটিয়ে ইউরানাইল অ্যাসিটেটযুক্ত মাধ্যমে বৃদ্ধির জন্যে অভিযোজন ঘটান হয়। ফলে ঐসব শৈবাল সমুদ্রের জল থেকে ইউরেনিয়াম শোষণ করে নিজেদের কোষে তা 10000 থেকে 1 লক্ষগুণ ঘনীভূত করতে পারে। তারপর ঐসব শৈবালদের পৃথক করে নিয়ে তাদের দেহ থেকে ইউরেনিয়াম বের করে নেওয়া যেতে পারে এবং অবশিষ্ট শৈবালদেহ প্রোটিনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এইভাবে সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতুও নিষ্কাশন করা সম্ভব।

বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছে প্রকৃতির আর এক বিরাট রসায়নবিদ-লাইকেনের উপর। এই লাইকেনরা হল পরস্পর মিথো-জীবীত্বের ভিত্তিতে বসবাসকারী ছত্রাক ও শৈবালের সমষ্টি। ক্ষুদ্র শৈবাল বাসা বাঁধে ছত্রাকের বিরাট দলের মধ্যে। ফলে শৈবাল ও ছত্রাকের কাছ থেকে পায় আশ্রয়; আর বিনিময়ে ছত্রাক শৈবালের কাছ থেকে পায় আলোক-সংশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন পদার্থসমূহ। এই লাইকেনদের দ্বারা উৎপাদিত বহুপরিচিত একটি পদার্থ হল লিটমাস নামক রঞ্জক দ্রব্যটি। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ হল যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক ইউসনিক অ্যাসিড নামক অ্যান্টিবায়োটিক। ভবিষ্যতে আরো বহু পদার্থ উৎপাদনে এই লাইকেনরা আমাদের সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

শুধু লাইকেনই নয়, অনাগত দিনগুলিতে নিশ্চয়ই সব রকমের জীবাণুই নব নব রূপে প্রযুক্ত হবে, উদ্ঘাটিত হবে বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নব নব দিগন্ত। এমন কি আজও যারা অবহেলিত, তারাও একদিন আদৃত হবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের দ্বারা।

সামুদ্রিক জৈব যোগ

শ্রীবিশ্বনাথ দাস*

অনন্ত সুনীল জলরাশি নিয়ে সমুদ্র চিরন্তন রহস্যময়। যুগ যুগ ধরে কবিরা তাই সমুদ্রকে নিয়ে কাব্য রচনা করে আসছেন; বিজ্ঞানিগণও সমুদ্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক জীব থেকে বহু প্রকারের জৈব যোগ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি জৈব যোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

1. বেঞ্জিনজাতীয় যোগ (Benzonoid):

1939 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কলিন (Colin) এবং আগের (Augier) সর্বপ্রথম এক প্রকারের লাল শৈবাল (Polysiphonia fastigiata)-এর মধ্যে ফিনলজাতীয় যৌগের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়, ব্রোমোফিনল রোডোমেলেসিয়া (Rhodomelaceae) পরিবারভুক্ত অনেক শৈবালের দেহের একটি সাধারণ উপাদান এবং বিভিন্ন শৈবাল থেকে বিভিন্ন ব্রোমোফিনল নিষ্কাশন করা হয়।

সামুদ্রিক কণ্টকাত্বক (Echinodermata) পর্বের প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন ন্যাপথোকুইনোন (Naphthoquinone) যৌগ লক্ষ্য করা যায়। এই যৌগগুলি বেশ রঙিন। বিজ্ঞানী ম্যাকমান (MacMunn) অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রঞ্জকের তুলনামূলক পরীক্ষা করার সময়ে কণ্টকাত্বক প্রাণীদের দেহের রঞ্জকযৌগের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন এবং তিনি এদের নামকরণ করেন একাইনোক্রোম (Echinochrome)। পূর্বে এই পর্বের প্রাণীদের ডিম, ডিম্বাশয়, দেহমধ্যস্থ তরল পদার্থ প্রভৃতি অংশ থেকে যে সমস্ত ন্যাপথোকুইনোন যৌগ পাওয়া যেত, তাদিগকেই একাইনোক্রোম বলা হত এবং কণ্টক, খোলা প্রভৃতি অংশ থেকে যে সমস্ত এই জাতীয় যৌগ পাওয়া যেত তাদিগকে স্পিনোক্রোম (Spinochrome) বলা হত। এই প্রকারের শ্রেণী-বিভাগ বর্তমানে আর যুক্তিযুক্ত নয়। এখন গঠনের দিক দিয়ে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়।

সামুদ্রিক জৈব উৎস থেকে কতকগুলি অ্যানথ্রাসিন জাতীয় যৌগও পাওয়া গেছে; এদের মধ্যে অধিকাংশই হল 9, 10—অ্যানথ্রাসিন জাতীয়।

2. নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ:

সামুদ্রিক জীবদের দেহে বিভিন্ন ধরণের অ্যামিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড লক্ষ্য করা যায়। নেপচুনিয়া আর্থ্রাইটিকা (Neptunia arthritica) শামুকদের লালাগ্রন্থির প্রধান বিষাক্ত উপাদান হল টেট্রামিথাইল-অ্যামোনিয়াম যৌগ। সমুদ্রের অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে হোমারিন (Homarine) নামক এক প্রকার নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগের প্রাচুর্য দেখা যায়। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির বিশেষ উৎস হল বিভিন্ন স্পঞ্জজাতীয় প্রাণী এবং নানা ধরণের শৈবাল। প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির মধ্যে কতকগুলি বেশ দুষ্প্রাপ্য।

স্পঞ্জদের দেহ থেকে পাওয়া অ্যামাইড এবং নাইট্রাইল জাতীয় যৌগও বিশেষ উল্লেখযোগ্য;

* গ্রাম ও ডাকঘর: নাকড়াকোন্দা, জেলা বীরভূম

সম্ভবত ডাইব্রোমোটিরোসিন (Dybromotyrosin) নামক যৌগ থেকে জৈব প্রক্রিয়ায় এগুলি স্পঞ্জদের দেহে তৈরি হয়।

সামুদ্রিক জৈব উৎস থেকে অনেক নাইট্রোজেন ঘটিত বৃত্তাকার যৌগও (cyclic compound) পাওয়া গেছে; এই যৌগগুলির মধ্যে ইন্ডোল, পাইরোল, পিরিডিন, কুইনোলিন প্রভৃতি নিউক্লিয়াস বর্তমান।

সমুদ্রের কতকগুলি উদ্ভিদের ক্লোরোফিলের মতই একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ দেখা যায়—এগুলিকে ক্লোরোফিল-সি বলা হয়।

3. টারপিনজাতীয় যৌগ (Terpenoid):

সামুদ্রিক জৈব উৎস থেকে যে সমস্ত টারপিন জাতীয় যৌগ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে সেসকুইটারপিনোয়েডের (sesquiterpenoid) [অর্থাৎ যে টারপিন-জাতীয় যৌগের মধ্যে কার্বনের সংখ্যা 15] সংখ্যাই বেশী। বিভিন্ন শৈবাল, একনালী প্রাণী এবং শামুকদের দেহ থেকে এই ধরণের যৌগগুলিকে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে। 1951 সালে ডিক্টিয়োপ্টেরিস ডিভারিকাটা (Dictyopteris divaricate) নামক বাদামী শৈবাল থেকে এই জাতীয় যৌগ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে সামুদ্রিক উৎস থেকে কেডিনল (cadinol), কেলামিন (calamine), বিসাবোলিন (bisabolene) ইত্যাদি প্রায় 50টি সেসকুইটারপিনোয়েড পাওয়া গেছে। এদের কতকগুলির মধ্যে অ্যালকোহল এবং কিটোন; এবং কতকগুলির মধ্যে ব্রোমিন এবং ক্লোরিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও সমুদ্র বিজ্ঞানীরা আরও কতকগুলি অন্য ধরণের টারপিনজাতীয় যৌগের সন্ধান পেয়েছেন। নিম্নে এদের নাম ও উদাহরণ দেওয়া হল:

নাম	উদাহরণ
(i) মনোটারপিনোয়েড (monoterpenoid) [কার্বনের সংখ্যা 10টি]	জেরানিয়ল (geraniol), আলফা-পাইনিন (α-pinene) ইত্যাদি
(ii) ডাইটারপিনোয়েড (diterpenoid) [কার্বনের সংখ্যা 20টি]	অ্যাপলিসিন-20 (aplysin), ক্রেসিন-অ্যাসিটেট (crassin-acetate) ইত্যাদি
(iii) ট্রাইটারপিনোয়েড (triterpenoid) [কার্বনের সংখ্যা 30টি]	ফ্রিডলিন (friedelin) টেরেক্সেরল (taraxeral) ইত্যাদি
(iv) টেট্রাটারপিনোয়েড (tetraterpenoid) [ক্যারোটিনোয়েড (carotenoid)] [কার্বনের সংখ্যা 40টি]	ক্যারোটিন (carotene), একাইনোন ইত্যাদি।

উপরের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে কার্বনের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে দু-একটি কম বা বেশী কার্বন দেখা যায়; যেমন, ডাইটারপিনোয়েড; প্রিস্টেন (pristane-$C_{19}H_{40}$), নিটেনিন (nitenin—$C_{21}H_{24}O_4$), ট্রাইটারপিনোয়েড: কেফালোস্পোরিন P_1 (cephalosporin P_1: $C_{33}H_{59}O_8$); টেট্রাটারপিনোয়েড: পেরিডিনিন (peridinin: $C_{39}H_{50}O_7$) ইত্যাদি।

4. স্টেরল যৌগ (Sterol):

বিজ্ঞানী হেঞ্জ (Henze) সর্বপ্রথম সামুদ্রিক স্পঞ্জ থেকে স্টেরল নিষ্কাশন করেন; তাঁর আবিষ্কৃত এই যৌগ স্পঞ্জোস্টেরল (spongosterol)

নামে পরিচিত। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানী ডোরী (Doree) কতকগুলি প্রাণীপর্বের উল্লেখ করেন—যে সমস্ত পর্বের প্রাণীদের মধ্যে স্টেরলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়; বিজ্ঞানী বার্গম্যানের (Bergmann) নামও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্র থেকে যে স্টেরলগুলি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কার্বনের সংখ্যা 26 থেকে 30; তবে 29 কার্বনযুক্ত স্টেরলের সংখ্যাই বেশি। বহু দিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কোলেস্টেরল (cholesterol) [স্টেরলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য] একটি প্রাণীজ-স্টেরল, কিন্তু বিজ্ঞানী সুডা (Tsuda) একপ্রকার সামুদ্রিক লাল শৈবাল থেকে কোলেস্টেরল আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত করেন। বর্তমানে বিভিন্ন শৈবাল থেকে বিভিন্ন ধরণের স্টেরল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে।

5. নন্-অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড:

সমুদ্রের সবুজ, লাল এবং বাদামী শৈবাল থেকে অনেকগুলি নন্-অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কতকগুলি মুক্ত-শৃঙ্খলযৌগ (open chain-compound) এবং কতকগুলি বৃত্তাকার (cyclic)। ডিক্টিয়োপ্টেরিস্ প্ল্যাজিয়োগ্রামা (Dictyopteris plagiogramma) নামক শৈবাল থেকে উভয় প্রকারের-ই অনেকগুলি হাইড্রোকার্বন পাওয়া গেছে; এই সমস্ত হাইড্রোকার্বনে কার্বনের সংখ্যা এগার।

সমুদ্র থেকে পাওয়া ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে কতকগুলি বেশ জটিল এবং কতকগুলির অণুতে অনেকগুলি দ্বিযোজী কার্বন বর্তমান। এই সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের গঠন নিয়ে আজ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয় নি।

সামুদ্রিক জৈব যৌগ নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশেষ পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে সমুদ্র থেকে অনেক নূতন নূতন জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান

নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন না

যে কোন ধরণের ওষুধ, ভিটামিন ট্যাবলেট অথবা টনিক খাবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অথবা বিজ্ঞাপন দেখে মোহিত হয়ে নিজের সিদ্ধান্তমত ওষুধ খেয়ে অনেক সময় সর্বনাশ ডেকে আনা হয়। সঠিক রোগ নির্ণয় না করে ওষুধ খেলে তার পার্শ্বক্রিয়া (side effect) হবেই—তাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে যায়, এমনকি মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্যের নয়।

যেমন, ব্যথা-বেদনার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অনেকেই খুশিমত বেদনানাশক বড়ি অ্যাস্পিরিনজাতীয় কিছু খেয়ে থাকেন। ফলে ব্যথা হয়ত সেরে যায় কিন্তু অ্যাসিডধর্মী অ্যাস্পিরিন-এর প্রভাবে পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে গ্যাস্ট্রিক আলসারের সূত্রপাত হতে পারে।

আবার রাত জেগে পড়াশুনা করবার জন্যে কেউ কেউ বিশেষ জাতীয় উত্তেজক বড়ি খান। নিয়মিত এই বড়ি গ্রহণ করলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন কোষের কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং নানারকম শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়

ছেলেমেয়েদের সর্দি-কাশি ও জ্বর হলে অনেক পিতামাতাই 'লেবেল আঁটা' কোন কাশি নিরাময় সিরাপ খেতে দেন। কিন্তু এই জ্বর বা সর্দি-কাশি যদি ডিপথেরিয়া বা নিউমোনিয়ার জন্যে হয়ে থাকে, তখন তা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

বেদনানাশক অ্যাস্পিরিন, ভিটামিন বড়ি, স্যাকারিন, গর্ভ-নিরোধক পিল, পেটের অসুখের ক্যাপসুল ইত্যাদি কিছুই নিজের খুশিমত ব্যবহার করা উচিত নয়।

আসলে প্রায় সব ওষুধই শরীরে স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এগুলি যেমন অপকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তেমন উপকারী জীবাণু ও অনেক প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তুকে নষ্ট করে দেয়। তাই পৃথিবীর বহু চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বলছেন, যতদূর সম্ভব ওষুধপত্র এড়িয়ে চলাই ভাল। সাধারণ অসুখ-বিসুখে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির বদলে প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনুসরণ করার জন্যে তাঁরা সুপারিশ করছেন। তাঁদের মতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির পার্শ্বক্রিয়া খুবই কম এবং সাধারণ অসুখ-বিসুখে অনেক সময় এটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি উপযোগী।

অশ্বিনীকুমার*

* মেডিকেল ছাত্রাবাস, 22, গিরিবাবু লেন
কলিকাতা-700 0.2

যোজ্যতা

1 যোজ্যতা

পটাসিয়াম আর এজি (Ag)
হাইড্রোজেন আর এফ্ (F)-কে ডেকে বলল, তোরা 'লেজি'।
ক্লোরিন এবং এন্ এ (Na)
বলল রেগে সিলভারকে, তোদের কেনা চেনে!
ব্রোমিন দিদি বঁটিতে আজ হাত কেটেছে রাতে
ক্লোরিন দাদা আয়োডিন তার লাগিয়ে দিল হাতে;
সবার সাথে ব্রোমিন দিদি করেছে আজ আড়ি
হাতের ব্যথায় একমাস সে থাকবে বাপের বাড়ি।

2 যোজ্যতা

অক্সিজেন আর এফ্-ই (Fe); বলল, খাব কফি
এম্ জি (Mg), জেড্ এন্ (Zn), সি এ (Ca) বলল, ব্যাপার কি এ
সালফার আর লেড; কিনল দুটি ব্লেড
সবাই মিলে দুদিন ধরে কাটছে তারা দাড়ি।

3 যোজ্যতা

আয়রন আর গোল্ড, দুজন ভীষণ বোল্ড।
ক্রোমিয়াম আর এন্ (N)
এ এল্ (Al)-এর ছাতা মাথায় দিয়ে আটকে দিল 'রেন'
ফসফরাস আর বোরন
বলল, আহা মরণ!
পুজোর সময় তিন টাকাতে কিনে দেব শাড়ি।

4 যোজ্যতা

লেড আর টিন
নাচল তা ধিন্ ধিন্।
কার্বন আর সিলিকন্
দাঁত করছে কন্‌কন্
ঠাণ্ডা লেগে চার জনেরই ফুলেছে দাঁতের মাড়ি।

5 যোজ্যতা

আর্সেনিক আর অ্যান্টিমনি
ফস্‌ফরাসের চোখের মণি
পাঁচদিন আজ নাইট্রোজেনের হচ্ছে বেজায় হাঁচি

6 যোজ্যতা

ক্রোমিয়াম আর সালফার
মাথা খারাপ করেছে অন্ততঃ ছ'বার

7 যোজ্যতা

ম্যাংগানীজ তাই, খুঁজতে দাওয়াই
সাতবারের বার নিয়ে চলেছে রাঁচি।

8 যোজ্যতা

আটদিন আজ হচ্ছে ভীষণ ঝড়
ও এস্ (Os) দাদার ঘর করে কড় মড়

0 যোজ্যতা

এইচ্ ই (He), এন্ ই (Ne), এ (A), কারো সঙ্গে মিলব না যে
করি শূন্যে ভর
আমরা তাই দু-হাত তুলে নাচি।

দীপঙ্কর জানা*

* পোঃ মোহেম্মদনগর, হৃতাহাটা, জেলা-মেদিনীপুর

মানব-কল্যাণে উদ্ভিদের দান

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয় জলে। জল-ই জীবন-শক্তির উৎস। যারা প্রথম পৃথিবীতে আলো দেখেছিল, তারা ছিল অতিক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক এককোষী জীব। ক্রমবিবর্তনের ফলে সেই এককোষী জীব কালক্রমে বহুকোষীতে পরিণত হয়েছে। যে জীবন আবির্ভূত হয়েছিল জলে, সে জীবন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে জীবজগতের দুই ধারায় প্রবাহিত হল—একটি উদ্ভিদ-জগৎ ও অন্যটি প্রাণী-জগতে। উদ্ভিদ ও প্রাণী, এই নিয়েই আমাদের পৃথিবীর গতিপ্রকৃতি। সৃষ্টির সুরু থেকেই উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের মধ্যে এক আত্মিক সম্পর্ক বিরাজমান।

প্রকৃতিসৃষ্ট মানুষ পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে উন্নত ধরণের প্রাণী। ক্রম-বিকাশের ফলে সৃষ্টির আদির সেই এককোষী জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীতে। যদিও উদ্ভিদের জন্মের অনেক কাল পরে মানুষের আবির্ভাব, কিন্তু জন্মের সুরু থেকেই সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের নিকট ঋণী। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষের চাই খাদ্য। এই খাদ্য আহরণের জন্যে পৃথিবীতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে—মানুষ যার নাম দিয়েছে 'সবুজ বিপ্লব'। চারদিকে রব উঠেছে—খাদ্য চাই, বাঁচার জন্যে আরও খাদ্য দরকার। সেই খাদ্যের বেশির ভাগই, বিশেষ করে মানুষের প্রধান খাদ্য চাল, গম, বজরা, ভুট্টা প্রভৃতি সংগৃহীত হয় উদ্ভিদ থেকে। মানুষের প্রয়োজনে এই সব খাদ্যের ফলনের বৃদ্ধি আবশ্যক, তাই এই 'সবুজ বিপ্লব' অভিযান।

লজ্জা নিবারণের জন্যে চাই বস্ত্র। বেশির ভাগ বস্ত্র তৈরি হয় উদ্ভিদ-দেহতন্তু থেকে। যেমন তুলাগাছের বীজের বীজত্বকের উপর যে তন্তু পাওয়া যায়, তা দিয়ে তৈরি হয় সুতির কাপড়। এ ছাড়া পাটের বা লিনেনের কাপড়ও তৈরি হয় যথাক্রমে পাট ও তিসি গাছের দেহতন্তু থেকে।

সভ্য মানুষ আজ আর গাছের কোটরে বাস করে না। সে এখন বাস করে তার তৈরি করা মনের মত ঘরে। সেই ঘর তৈরিতেও প্রয়োজন হয় উদ্ভিদকে। কারণ উদ্ভিদ-দেহ থেকে যে কাঠ বা বাঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে সে রচনা করে তার আশ্রয়।

বহু যুগ আগে, ইতিহাসে যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে পরিচিত, সৃষ্টির সেই পুণ্য প্রভাতে মানুষ ছিল অসভ্য, বর্বর ও অসহায়। উদ্ভিদ সমাজ-ই তখন ছিল তার আপনজন। মা যেমন সন্তানকে পালন করে তার বুকের রক্ত দিয়ে, প্রকৃতির, এই শ্যামল অরণ্যানী সেই

সময় তার দেহকে বিলিয়ে দিয়েছে মানব-কল্যাণে। অরণ্য সমাজ তাকে জুগিয়েছে খাদ্য, বাঁচিয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে, দিয়েছে লজ্জা নিবারণের আবরণ। মানুষ পরল গাছের ছাল, ক্ষুধা মেটাল গাছের ফল খেয়ে, গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি করল আশ্রয় —রচিত হল মানব-সমাজ।

মহাকালের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসও এগিয়ে চলল। অরণ্যের সুনিবিড় ছায়ায় একদিন যে মানব-সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল, কালক্রমে তারা শিখল সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাই মানব-সমাজ সৃষ্টিতে উদ্ভিদের দান অনস্বীকার্য। যুগে যুগে পৃথিবীতে এসেছে কত পরিবর্তন। প্রাকৃতিক নিয়মে অরণ্য সমাজের বুকে মাঝে মাঝে নেমে এসেছে বিপর্যয়। তারা অনেকেই রক্ষা পায় নি সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে, সমাধি হয়েছে তাদের মাটির নিচে—স্তরে স্তরে। আজকের সুসভ্য মানুষ সেই স্তরীভূত মৃত উদ্ভিদদেহকে কাজে লাগাচ্ছে তার নিজের প্রয়োজনে। মৃত উদ্ভিদদেহ আজ রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। এই কম্পিউটারের যুগেও দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কাছে কয়লার গুরুত্ব অনেক। কয়লা শিল্পোন্নতির মূল উৎস। বর্তমান পৃথিবীতে এই তৈল সঙ্কটের দিনে কয়লা বিভিন্ন শিল্পের অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। কয়লা থেকে আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী পাওয়া যায়; যেমন—কোল গ্যাস, বিভিন্ন ধরণের রঞ্জক পদার্থ, আলকাত্‌রা, স্যাকারিন প্রভৃতি।

ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিবলে সে উদ্ভিদদেহ থেকে আহরণ করছে তার দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ। উদ্ভিদ-সমাজ না থাকলে পৃথিবীতে মানুষের একাধিপত্য অচল হয়ে যেত।

শ্বাসগ্রহণের জন্যে আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন। অক্সিজেন না পেলে প্রাণী-জগত লোপ পেত, কারণ বেঁচে থাকার জন্যে অক্সিজেন অপরিহার্য। সেই অক্সিজেনও অকৃপণভাবে দান করে চলেছে উদ্ভিদ-জগৎ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যে উদ্ভিদের এ দান অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে প্রাণীকুলও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্যে জোগায় কার্বন ডাই-অক্সাইড। প্রাণী শ্বাসত্যাগের সময় এই কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করে, যা উদ্ভিদের দেহধারণে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার প্রগতিতে উদ্ভিদের অবদান কম নয়। আগেকার দিনে পুঁথিপত্র লেখা হত—তালপাতা, গাছের ছাল বা ভূর্জপত্রের উপর। বর্তমান যুগে যদিও তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তবু আজকের এই শিক্ষার প্রগতি লিপিবদ্ধ হচ্ছে উদ্ভিদদেহে। কাগজ, বর্তমানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যাকে বাদ দিয়ে চলা যায় না, তা তৈরি হয় বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদের দেহ থেকে।

প্রকৃতির সঙ্গে যেমন অহরহ সংগ্রাম করতে হয় মানুষকে তার খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্যে, সেই রকম তাকে আর এক ধরনের সংগ্রাম করতে হয় বিভিন্ন ব্যাধির বিরুদ্ধে।

ব্যাধির হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে মানুষকে সময় সময় উদ্ভিদকুলের উপর শরণাপন্ন হতে হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উদ্ভিদের অবদান কম নয়। বহু প্রাচীন যুগ, সেই চরক ও শুশ্রুতের আমল থেকে ভারতবর্ষে ভেষজ-বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়েছে। এই ক্রমোন্নতির যুগে মানুষ উদ্ভিদদেহ থেকে আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন ধরণের ওষুধপত্র। যার ফলে সে বহু জটিল ব্যাধির প্রকোপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে। কুইনাইন, এমেটিন, এফিড্রিন, রাওলফিন, পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ওষুধের গুণাগুণ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা হয় বিভিন্ন ধরণের দুরারোগ্য ব্যাধিতে। তাই বলতে দ্বিধা নেই, অরণ্য-সমাজ-ই মানুষের প্রকৃত আরোগ্য নিকেতন।

মাটির ক্ষয়রোধেও উদ্ভিদের ভূমিকা যথেষ্ট। উদ্ভিদ তার মূল বিস্তার করে মাটির ক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে। বর্তমানকালে নদী ও সমুদ্রের উপকূলে মাটির ক্ষয়রোধের জন্যে এক ধরণের উদ্ভিদ রোপণ করা হয়, যাদের বলা হয় 'মাটি ক্ষয়রোধকারী উদ্ভিদ' বা 'স্যাণ্ড বাইণ্ডিং প্ল্যাণ্ট'। এই সব উদ্ভিদের মূল জালের আকারে মাটির উপর বিস্তারলাভ করে; যার ফলে মাটির ক্ষয়রোধ সম্ভব হয়। দীঘার সমুদ্র উপকূলে মাটির ক্ষয়রোধের জন্যে এই ধরণের উদ্ভিদ রোপণ করা হয়েছে। মরুভূমিতেও অনেক সময় মরুঝড়ের ফলে মরুভূমির বালি সন্নিকটস্থ লোকালয়কে গ্রাস করে। তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এই সমস্ত উদ্ভিদ রোপণের প্রয়োজন হয় ঐ সব এলাকায়।

দেশকে শস্যশ্যামলা করতে হলে চাই বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি বা মৌসুমী বায়ুকেও আহ্বান জানায় এই শ্যামল অরণ্যানী। তাই মানুষের প্রয়োজনেই অরণ্যকে ধ্বংস করার চেয়ে তাকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রতি বছর বন-মহোৎসবের মাধ্যমে দেশবাসীকে তাই এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

গৃহ ও শহর সজ্জায় উদ্ভিদের স্থান আছে। বহু যুগ ধরে বিভিন্ন ধরণের ফুল উৎসবের প্রধান অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে যখন নানারকম ফুল ফোটে, তখন তা সকলকেই আকৃষ্ট করে।

সব দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, মানব-কল্যাণে উদ্ভিদের দান অপরিশোধ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ-সমাজ মানব-সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-সমাজ উদ্ভিদ-সমাজের উপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। উদ্ভিদ-সমাজ মানব-সভ্যতার অগ্রদূত। তাকে বাদ দিয়ে মানব-সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এক কথায় বলা যায় উদ্ভিদকুল মানব-সমাজের মাতৃস্বরূপা।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

* উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, মেদিনীপুর মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর

বর্ণালী

সাদা আলোককে কাচের প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে পাঠালে ঐ আলোক সাতটি বিভিন্ন রঙ্‌-এ ভাগ হয়ে যায়। এর কারণ হল, কোন আলোক রশ্মি প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে গেলে বেরিয়ে আসার পর তার গতিপথ পাল্‌টে যায়। যে কোণে এই গতিপথের পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে চ্যুতি কোণ (deviation)। বিভিন্ন রঙ-এর আলোকের বেলায় এই চ্যুতির পরিমাণ বিভিন্ন। ফলে বিভিন্ন রঙ-এর কতকগুলি আলোক রশ্মি যদি একসঙ্গে একই পথে একটি প্রিজ্‌মের উপর গিয়ে পড়ে, প্রিজ্‌ম থেকে বেরিয়ে আসার পর রশ্মিগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাবে। এই বেরিয়ে-আসা রশ্মিগুলিকে একটি পর্দায় ফেললে পর্দার আলোকিত জায়গার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রঙ্‌ ধারণ করবে (চিত্র 1)।
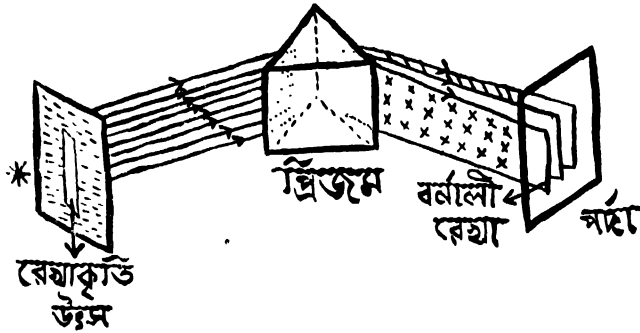
চিত্র 1 বর্ণালী তৈরির ব্যবস্থা (সরলীকৃত)

এখন এই রঙ্‌ কথাটিকে একটু বিশদভাবে বোঝা দরকার। আলোক সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা হল, আলো একধরণের তরঙ্গ। যেমন জলের উপর ঢেউ খেলে, বাতাসের ঘনীভবন এবং তনীভবনের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আলোকও তেমনি তরঙ্গাকারে উৎস থেকে গ্রাহকের দিকে এগিয়ে যায়। কিসের কাঁপুনিতে এই তরঙ্গের সৃষ্টি, এই তরঙ্গ আদৌ জড় মাধ্যম-আশ্রয়ী কি না?—এ সব প্রশ্ন আপাতত মুলতুবী রেখে শুধু এটুকুই বলা যাক—আলোক যখন তরঙ্গ, তখন অন্যান্য তরঙ্গের মত আলোকেরও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave length) আছে। তবে সব আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমান নয়। যেমন নীল আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল্‌দের চেয়ে কম, হল্‌দের আবার লালের চেয়ে কম ইত্যাদি। পরীক্ষাগারে আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপবার উপযোগী পরীক্ষা ব্যবস্থা এখন আরও করা গেছে।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আলোকের রঙ্‌ সম্পর্কে অনুভূতি তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। দুটি আলোকের রঙ্‌ যদি আলাদা হয়

তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়—তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলাদা। তেমনি দুটি আলোকে রঙ্ যদি একেবারে এক হয় তবে বলা উচিত, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক। কিন্তু একটি মুস্কিল আছে। যদিও এ কথা ঠিক যে, মানুষের বর্ণানুভূতি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল, তবু দুটি আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যদি খুব বেশি রকম কাছাকাছি হয়, তারা প্রায় একই ধরণের বর্ণানুভূতি সৃষ্টি করে অর্থাৎ তাদের বর্ণের সামান্য তফাৎ চোখে ধরা পড়ে না। ফলে দুটি আলোকের রঙ্ যদি একই রকম মনে হয়, এটি বলা শক্ত—তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একেবারেই সমান না অসমান; কিন্তু কাছাকাছি দৃশ্য আলোকে অসংখ্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্তমান। তাই বলে সাদা আলোককে বিশ্লেষণ করে অসংখ্য রঙের আলো পাওয়া যায় না। আসলে এই অসংখ্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলিকে সাত ভাগে ভাগ করে দেখা যায়, প্রত্যেক ভাগের আলোক মোটামুটি একটি বিশেষ ধরণের বর্ণানুভূতি সৃষ্টি করে। এক ভাগ লাল অনুভূতির কারণ, এক ভাগ সবুজের ইত্যাদি। সেই জন্যেই সাধারণভাবে বলা হয়, সাদা আলোক সাতটি বিভিন্ন রঙ-এর সংমিশ্রণ। তার মানে এই নয়, এই আলোকে মাত্র সাতটি বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আছে।

গোড়াতে বলা হয়েছে প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে পাঠালে পরে বিভিন্ন রঙ-এর আলোকের বিভিন্ন পরিমাণ চ্যুতি ঘটে। এবারে কথাটিকে আরেকটু নিখুঁতভাবে বলা যায়—বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকের বিভিন্ন পরিমাণ চ্যুতি ঘটে। সাধারণভাবে পরীক্ষায় রেখা আকারের কোন আলোকিত ছিদ্রকে (slit) আলোকের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই আলোকে যদি একাধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থাকে, তাহলে প্রিজ্‌ম প্রত্যেকটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্যে একটি করে রেখাকৃতি প্রতিবিম্ব (image) তৈরি করবে এবং এগুলি পর্দায় একটি আরেকটির গায়ের উপর না পড়ে পাশাপাশি থাকবে; কারণ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক প্রিজ্‌ম থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন গতিপথ অনুসরণ করে প্রতিবিম্ব তৈরি করছে। যেমন কোন আলোকের মধ্যে যদি চারটি বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থাকে তাহলে পর্দায় রেখাকৃতি উৎসের চারটি বিভিন্ন প্রতিবিম্ব তৈরি হবে। এটিও খুব সহজেই ধারণা করা যায়, দুটি আলোক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত আলাদা হবে, তাদের সৃষ্ট প্রতিবিম্বও ততই দূরে দূরে থাকবে এবং ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যদ্বয়ের ব্যবধান যত কম হবে, প্রতিবিম্বদ্বয় ততই কাছাকাছি থাকবে।

এখন সাদা আলোকে যেহেতু অসংখ্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্তমান, স্বভাবতই পর পর দুটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ব্যবধান অতি সামান্য। ফলে সাদা আলোক দিয়ে যদি রেখাকৃতি উৎসকে আলোকিত করা যায়, প্রিজ্‌ম্ তার অসংখ্য প্রতিবিম্ব তৈরি করবে এবং পর পর দুটি প্রতিবিম্বের ব্যবধান প্রায় ধরাই পড়বে না। কাজেই এক্ষেত্রে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রেখাকৃতি প্রতিবিম্বের বদলে একটি নিরবচ্ছিন্ন রেখার সমাহার পাওয়া যাবে—যা দেখতে হবে একটি চওড়া পাড়ের মত। যেহেতু এই পাড়ের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকের সৃষ্টি,

সুতরাং সাদা আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলি যে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের কারণ, তার সবগুলিই এই পাড়ে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় দেখা যাবে।

বলা হয়েছে, বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক প্রিজ্‌মের সাহায্যে বিভিন্ন অবস্থানে প্রতিবিম্ব তৈরি করে। সুতরাং যদি অনেকগুলি জানা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকের সাহায্যে প্রতিবিম্ব তৈরি করে প্রতিবিম্বগুলির অবস্থান লক্ষ্য করা হয়, তা থেকে কোন্ অবস্থান কত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে—তার একটি হিসাব পাওয়া যায়। ঐ ব্যবস্থাটি তখন একটি বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্র হিসাবে কাজ করবে। কোন অজানা আলোকে কি কি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আছে, তা জানতে হলে ঐ আলোককে উৎস হিসাবে ব্যবহার করে প্রিজ্‌মের সাহায্যে প্রতিবিম্ব তৈরি করতে হবে। প্রিজ্‌ম্ যতগুলি প্রতিবিম্ব তৈরি করবে, বুঝতে হবে উৎসের আলোকে ঠিক ততগুলি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আছে। তাছাড়া প্রতিবিম্বগুলির (রেখাগুলির) অবস্থান থেকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলির মানও নির্ণয় করা যাবে।

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল, বর্ণ বিশ্লেষণের পরীক্ষা গোড়ার দিকে শুধু প্রিজ্‌মের সাহায্যে করা হলেও এখন প্রিজ্‌মের চেয়ে শক্তিশালী বর্ণবিশ্লেষকের ব্যবহার জানা আছে। এগুলিকে বলে ব্যবর্তন গ্রেটিং (diffraction grating)।

এই সব যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত অল্প ব্যবধানসম্পন্ন একাধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মিশ্র আলোককে পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। এই অর্থেই এরা প্রিজ্‌মের চেয়ে শক্তিশালী।

এখন প্রশ্ন হল—বর্ণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কি? বর্ণ বিশ্লেষণই কি বিজ্ঞানীর একটি লক্ষ্য, না অন্য কোন বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে ক্রমশ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

কোন পদার্থ যখন কঠিন অবস্থায় থেকে আলোক বিকিরণ করে, তখন সেই আলোককে বর্ণবিশ্লেষকের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করে দেখা যায়, প্রতিবিম্বটি আকারে একটি সাতরঙের চওড়া পাড়ের মত—যার কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে (চিত্র 2ক)। অর্থাৎ এই আলোকে দৃশ্য আলোর সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্তমান। বিকিরণশীল পদার্থটির অন্যান্য ধর্ম যাই হোক না কেন, কঠিন অবস্থায় থাকলে তা সব সময়েই এই অসংখ্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মিশ্র আলোক ছড়িয়ে দেবে। সুতরাং কোন অজানা উৎস থেকে আগত আলোককে বিশ্লেষণ করে যদি উপরিউক্ত ধরণের বর্ণালী পাওয়া যায়, তাতে শুধু এইটুকুই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, বিকিরণশীল পদার্থটি কঠিন অবস্থায় আছে। সেটি কি পদার্থ, কি তার অন্যান্য ধর্ম—এসবের কিছুই বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু কোন পদার্থ যদি গ্যাসীয় অবস্থায় থেকে আলোক বিকিরণ করে, সেই আলোকের বর্ণালী একেবারে অন্য রকমের হয়। বর্তমান আলোচনায় কেবলমাত্র গ্যাসীয় এবং পারমাণবিক (atomic) অবস্থায় আছে (অর্থাৎ পরমাণুগুলি দুই বা ততোধিক

সংখ্যায় জোটবদ্ধ না থেকে মোটামুটি স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে)—এই রকম মৌলিক পদার্থের বর্ণালীর কথা বলা হবে। স্বাভাবিক চাপ এবং তাপমাত্রার মৌলিক গ্যাস
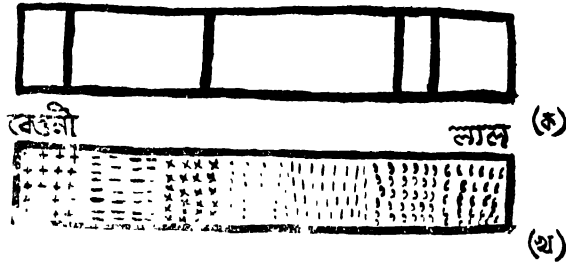
চিত্র 2 (ক) পারমাণবিক বর্ণালী, (খ) সাদা আলোর বর্ণালী। বাঁদিক থেকে ডানদিকে—বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল।

থেকে এই ধরণের বর্ণালী পাওয়ার সহজ উপায়—ঐ গ্যাসকে খুব কম চাপে কোন বদ্ধমুখ কাচ-নলের ভিতর ভরে ঐ নলের দুই প্রান্তে উঁচু মানের তড়িৎ-বিভব প্রয়োগ করা। বিদ্যুৎ ক্ষরণের সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসটি পারমাণবিক বিকিরণ (atomic radiation) ছড়াতে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় তরল এবং কঠিন মৌলের বেলায় ভিন্নতর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। যাই হোক, পারমাণবিক বর্ণালীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ঐ বর্ণালী কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রেখার সমষ্টি (চিত্র 2 খ)। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—একটি কোন গ্যাসীয় মৌলের বর্ণালীতে প্রাপ্ত রেখাগুলির কোনটির অবস্থান অপর কোন মৌলের বর্ণালীস্থিত কোন রেখার সঙ্গে একেবারে মিলে যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট রেখামণ্ডলীসম্বলিত বর্ণালী কেবলমাত্র একটি মৌল থেকেই সৃষ্টি হতে পারে। অন্য যে কোন মৌলের বর্ণালীস্থিত রেখামণ্ডলী এই রেখা-মণ্ডলী থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। প্রত্যেক মৌলের পারমাণবিক বর্ণালী একান্তভাবেই সেই মৌলের নিজস্ব ধর্ম। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই সমস্ত মৌলিক পদার্থকে পারমাণবিক এবং গ্যাসীয় অবস্থায় বিকিরণ করতে বাধ্য করে তাদের পারমাণবিক বর্ণালী দেখে নিয়েছেন এবং প্রত্যেক বর্ণালীস্থিত রেখাগুলির সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য—তাদের অবস্থান থেকে হিসাব করে নিয়েছেন। কাজেই, কোন অজানা পারমাণবিক বর্ণালী সৃষ্টিকারী আলোকের মধ্যে বর্তমান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলি নির্ণয় করে ঐ আলোকের উৎসে অবস্থিত মৌলগুলিকে সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি প্রয়োগ করেই সূর্যে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে তা জানা গেছে। প্রয়োগটি অবশ্য একেবারে সহজপথে হয় নি—হয়েছে একটু ঘুরিয়ে।

1801 খৃস্টাব্দে ফ্রনহফার (Fraunhofer) নামে এক বিজ্ঞানী সূর্যের আলোককে বিশ্লিষ্ট করে লক্ষ্য করেন, বর্ণালীটি একটি সাত রঙের পাড়ের আকারের বটে কিন্তু

সেই উজ্জ্বল পাড়ের গায়ে বহু সংখ্যক কালো রেখা পাশাপাশি সমাবিষ্ট। ফ্রনহফার 500টির মত কালো রেখা দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন ঐ ধরণের রেখার সংখ্যা 20,000-এর মত জানা গেছে। ঐ রেখাগুলির উৎপত্তির কারণ ফ্রনহফার বা তাঁর সমসাময়িক কালে কেউ-ই বুঝতে পারেন নি। তবে ফ্রনহফার এগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ঐ রেখাগুলির অবস্থান লক্ষ্য করে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলি হিসাব করে রেখেছিলেন।

ইতিমধ্যে পরীক্ষাগারে কিছু কিছু মৌলের পারমাণবিক বর্ণালী সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক বর্ণালীস্থিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলি মেপে রাখতে থাকেন। তার পর তাঁরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, বিভিন্ন মৌলের এই বর্ণালীগুলিতে যে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্তমান—তার সবই ফ্রনহফারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন নি—কি এই মিলের কারণ?

অতঃপর কারশফ (Kirchoff) নামে এক বিজ্ঞানী এর এক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিলেন। বিকিরণ সম্পর্কে তিনি আগেই একটি সূত্র প্রস্তাব করেছিলেন—যার বক্তব্য: কোন বস্তু যদি কোন এক ধরণের আলোক বেশি মাত্রায় বিকীর্ণ করতে পারে, তাহলে সেই জাতীয় আলোক তার উপর পড়লে সে তা আনুপাতিকভাবে বেশি মাত্রায় শোষণ করবে। এই সূত্রই ফ্রনহফার রেখা ব্যাখ্যার ভিত্তি। তিনি বললেন, সূর্যের ভিতরের অংশটি (যার নাম আলোকমণ্ডল) খুব উচ্চ তাপমাত্রায় ও উচ্চ চাপে কঠিন অবস্থায় রয়েছে এবং অনবরত অসংখ্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন সাদা আলোক বিকিরণ করছে। এই সাদা আলোক-ই বিশ্লিষ্ট হয়ে সাত রঙের পাড়ের মত বর্ণালী তৈরি করে। সূর্যের বাইরের দিকে কিন্তু সমস্ত পদার্থ গ্যাসীয় ও পারমাণবিক অবস্থায় আছে এবং ঐ অংশের তাপমাত্রা ভিতরের অংশের তুলনায় অনেক কম। এখন ঐ বাইরের অংশে যে সব মৌল পারমাণবিক অবস্থায় আছে, সেগুলি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং কারশফের সূত্র অনুসারে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন আলোক থেকে প্রত্যেক মৌল তার নিজস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকগুলি শোষণ করে নেবে। প্রশ্ন উঠবে, এই মৌলগুলি যেমন আলোক শুষে নিচ্ছে তেমনি আবার ছড়িয়েও ত দিচ্ছে, তাহলে? উত্তর হল—যে কোন পদার্থের বিকীর্ণ আলোকের শক্তি তার তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা যত বেশি হবে, বিকীর্ণ আলোক তত জোরালো হবে। আগেই বলা হয়েছে, সূর্যের ভিতরের অংশের তাপমাত্রা বাইরের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং মৌলগুলি যে আলোক শুষে নিচ্ছে, তার তুলনায় যে আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছে তা অত্যন্ত দুর্বল। কাজেই অশোষিত জোরালো আলোকের তুলনায় এই মৌলগুলির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক এতই ম্লান যে, সংশ্লিষ্ট রেখাগুলি প্রায় অন্ধকার বলেই মনে হয়। আসলে কিন্তু এগুলি কালো নয়।

কারশফের এই ব্যাখ্যা পরীক্ষাসিদ্ধ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কালো রেখাগুলি যে সত্যি সত্যি কালো নয় তা প্রমাণ করতে গেলে উজ্জ্বল পটভূমিটি (background) দূর করতে হবে। অর্থাৎ সূর্যের ভিতরের অংশ থেকে আলোক আসতে দেওয়া চলবে না। পরীক্ষাগারে বসে এটি করা সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় আছে কি? পূর্ণগ্রাস সূর্য-গ্রহণ। চাঁদ তখন সূর্যের ভিতরের অংশকে পুরো ঢেকে দেবে। ভিতর থেকে আর বহু বর্ণ-বিশিষ্ট উজ্জ্বল আলোক পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে না। বাইরের অংশটি কিন্তু পুরোপুরি ঢাকা পড়বে না। ফলে ঐ গ্যাসীয় আবরণ থেকে বিভিন্ন মৌলের বৈশিষ্ট্য বয়ে নিয়ে আলোক ঠিকই এসে পৌঁছবে এবং উজ্জ্বল সাতরঙা পটভূমি অন্তর্হিত হওয়াতে আগেকার ম্লান রেখাগুলিই এবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীরা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে 1872 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ইয়ং এক গ্রহণের সময় ঠিক উপরে বর্ণিত রকমের আকস্মিক পরিবর্তন দেখতে পেলেন। কারশফের সূত্র এবং ফ্রনহফার রেখার ব্যাখ্যার সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল।

সুতরাং বোঝা গেল, ফ্রনহফার রেখাগুলি সূর্যের গ্যাসীয় আবরণে বর্তমান মৌল গুলির পারমাণবিক বর্ণালী। তবে এই বর্ণালী বিকীর্ণ আলোকের সৃষ্টি নয়, শোষিত আলোকের অনুপস্থিতি। এইভাবে উৎপন্ন বর্ণালীকে শোষণ বর্ণালী (absorption spectra) বলা যায়। পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক বর্ণালীর সঙ্গে ফ্রনহফার রেখাগুলি মিলিয়ে দেখা যায়, পৃথিবীতে বর্তমান মৌলগুলির সবগুলিই সূর্যেও বর্তমান। এই প্রসঙ্গে হিলিয়াম আবিষ্কারের কাহিনীটি খুব চিত্তাকর্ষক। ফ্রনহফার রেখাগুলির মধ্যে সোডিয়ামের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রেখার কাছেই অন্য একটি রেখা আছে যা তখনও পর্যন্ত পরীক্ষাগারে কোন মৌল থেকে পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই অনুমান করলেন এই রেখা নতুন কোন মৌল নির্দেশ করছে যা সূর্যে আছে কিন্তু পৃথিবীতে নেই। তাঁরা ঐ মৌলের নাম দিলেন হিলিয়াম। পরে পৃথিবীতেই একটি বিক্রিয়া ক্ষমতাশূন্য গ্যাস পাওয়া গেল, যার পারমাণবিক বর্ণালী নিয়ে দেখা গেল, ঐ বর্ণালীস্থিত রেখার অবস্থান ঠিক উপরিউক্ত অজানা রেখার উপরেই। বোঝা গেল এই সেই হিলিয়াম।

প্রণবরঞ্জন চৌধুরী*

---

* রহড়া রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, 24 পরগণা

মহাকাশ-বিজ্ঞানে পথিকৃৎ চারজন বিজ্ঞানী

> মহাকাশ-বিজ্ঞানের যাঁরা রূপকার এবং ইতিহাসের পাতায় যাঁরা চিরস্মরণীয়.........

বর্তমান যুগ মহাকাশ-বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে মানুষ পা দিয়েছে চাঁদের মাটিতে। দৃষ্টি তার গ্রহ-গ্রহান্তরের দিকে। মহাকাশ বিজয়ের পথে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের অদম্য সাধনা, অনলস অধ্যবসায় এবং অসীম সাহস মানব-প্রগতির ইতিহাসে একটি সুবর্ণ যুগের সুরু করেছে। এই সব বিজ্ঞানীর মধ্যে রাশিয়ার ৎসিয়লকভস্কি (Tsiolkovosky) 1857-1935, আমেরিকার গডার্ড (Goddard) 1882-1945, জার্মানীর ওবের্ত (Oberth) 1894—, এবং জার্মানীর (বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক) ভন্ ব্রাউন (Von Broun) 1912—এনাদের নাম মহাকাশ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ৎসিয়লকভস্কি (Tsiolkovosky)

1857 খৃষ্টাব্দে 15ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার এক গণ্ডগ্রামে ৎসিয়লকভস্কির জন্ম। বাল্যকালে তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি খুব হৈ চৈ পছন্দ করতেন এবং পরিবারে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্কারলেট জ্বরে (scarlet-fever) আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর শ্রুতিশক্তি বিলুপ্ত হয়। এই অসুবিধার জন্যে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতে পারতেন না। ফলে তিনি ঘরকুনো হয়ে পড়েন। তাঁর মা অত্যন্ত যত্ন করে স্কুলের পড়াশুনা তৈরি করে দিতেন। কিন্তু তেরো বছর বয়সে ৎসিয়লকভস্কি তাঁর মাকে হারান এবং একেবারে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়েন এবং স্কুল ছেড়ে দেন। স্কুল ছেড়ে দিলেও বাড়িতে তিনি তাঁর ভাইয়ের বইগুলি নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন

এবং বিভিন্ন লাইব্রেরীতে যাতায়াত সুরু করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিজ্ঞানের দকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সেই বয়সেই এরোস্টাট (aerostat), বেলুন, বাষ্পযান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মনে নতুন নতুন মতবাদ দানা বাঁধতে সুরু করে। ষোল বছর বয়সে স্বাধীনভাবে পড়াশুনা করার জন্যে মস্কোতে যান। একটি ঘটনার উল্লেখ করলে তাঁর অধ্যবসায় সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া সম্ভব। মস্কোতে থাকার সময় তিনি সাধারণ (public) পাঠাগারে পড়াশুনা করতে যেতেন। প্রতিদিন সকালবেলায় পাঠাগারের দরজা খোলার আগে থেকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং রাত্রিবেলায় লাইব্রেরী বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করতেন। সেই সময় তিনি উচ্চগণিত, ক্যালকুলাস, ত্রিকোণোমিতি, প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করেন এবং গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণও সুরু করেন। 1883 সাল থেকে রকেট ও মহাকাশ অভিযানের বিষয়ে তিনি মৌলিক প্রবন্ধ লেখা সুরু করেন। প্রথম প্রবন্ধে তিনি গ্রহান্তরে থাকার উপযুক্ত রকেটচালিত মহাকাশযানের আলোচনা এবং অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ভারশূন্যতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। 1887 সালে 'অন দি মুন' নামে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়। এই বইতে চাঁদের প্রকৃতি, গঠনশৈলী, প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। সাত বছর পরে আর একটি প্রবন্ধে 'অ্যান এরোপ্লেন ফ্লাইং মেশিন'-এ (an aeroplane flying machine) তিনি গ্যাসোলিন ইঞ্জিন পরিচালিত মনোপ্লেনের (monoplane) বিষয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন গতিবেগে বাতাস কি পরিমাণে বাধা দেয় ও ঐ গতিবেগে বাতাসের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি, তা পরীক্ষা করার জন্যে রাশিয়াতে তিনি সর্বপ্রথম কৃত্রিম বায়ু সুড়ঙ্গ (wind tunnel) তৈরি করেন। 1894 সালে প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধে, 'চেঞ্জ ইন আরথ্ রিলেটিভ,' গ্র্যাভিটি তিনি বুধগ্রহের অধিবাসীদের জীবন বর্ণনা করেন। 1895 সালে বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর লেখা আর একটি রম্যরচনা 'ড্রিমস অফ দি আরথ অ্যাণ্ড দি স্কাই' (dreams of the earth and the sky) প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেন। 1903 সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ এক্সপ্লোরিং স্পেস উইথ রিঅ্যাক্টিভ ডিভাইসেস্ (exploring space with reactive devices) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে মহাকাশ অভিযানে নিযুক্ত রকেটের গতিবিষয়ক সূত্রাবলী, নিপুণতা এবং কার্যকারিতা বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। পরিবর্তনশীল ভরবিশিষ্ট বস্তুর গতিবেগের বিষয়েও এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়। তাছাড়া গ্রহান্তরে যাবার উপযুক্ত রকেটের খুঁটিনাটি এবং রকেটের তরল জ্বালানী ব্যবহারের বিশেষ সুবিধার কথাও তিনি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। অন্যান্য বিভিন্ন প্রবন্ধে বহু পর্যায়বিশিষ্ট রকেটের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। রকেট উৎক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উৎক্ষেপণ কোণের, মুক্তি কোণের (escape angle) কথা এবং অন্যান্য গ্রহ থেকে রকেট ছাড়ার কথাও উল্লিখিত আছে।

বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অসাধারণ অবদান দেশে-বিদেশে বিজ্ঞান সমাজে এবং সরকারী মহলেও স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি রাশিয়ায় সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্ অন নেচারেল সায়েন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হন। 1921 সালে রাশিয়া সরকার তাঁর আজীবন ভাতার ব্যবস্থা করেন। 1924 সালে ঝুকভস্কি (Zhukovski) এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমীতে তিনি অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। 1935 সালে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

রবার্ট হাচিং গডার্ড (Robert Hutching Goddard)

আমেরিকার উর্সেস্টার শহরে 1882 সালের 5ই অক্টোবর গডার্ড জন্মগ্রহণ করেন। 1908 সালে উর্সেসটার পলিটেকনিক থেকে তিনি স্নাতক উপাধি পান। 1910 সালে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ. এবং পরের বছর পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি প্রিন্সটেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং 1919 খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় রকেটের তাত্ত্বিক এবং বাস্তব দিক নিয়ে গবেষণা স্থরু করেন। 1920 সালে তাঁর গবেষণাবিষয়ক প্রবন্ধ 'এ মেথড অফ রিঅ্যাচিং এক্সট্রিম অলটিচুডস' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রকেটে ব্যবহারযোগ্য মোটরের কার্যনীতি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে শূন্য স্থানেও রকেট চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তিনিই রকেটে সর্বপ্রথম তরল জ্বালানী ব্যবহার করেন। তিনি বহুপর্যায়বিশিষ্ট রকেট এবং রকেটের জন্যে জ্বালানী পাম্পের উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। রকেটের সমতা বজায় রাখার জন্যে তিনি জাইরোস্কোপ (gyroscope) ব্যবহার করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় 1934-42 সালের মধ্যে জাইরোস্কোপ নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী রকেট তৈরি হয়। তাঁর তৈরি রকেটের গতিবেগ শব্দের গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের দ্বারা পার্ল হারবার আক্রান্ত হবার পর গডার্ড আমেরিকার নৌবিভাগে যোগদান করেন ও যুদ্ধকার্যে রকেট ব্যবহারের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করেন। 1942 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত তিনি নৌবিভাগের ব্যুরো অব্ এরোনটিক্স-এর গবেষণা শাখার

পরিচালক ছিলেন। এই সময়ে কারটিস রাইট কোম্পানিতেও কন্‌সাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার (consulting engineer) হিসাবে কাজ করেন। ভবিষ্যতে যাত্রীবহন এবং মহাকাশ ভ্রমণের ব্যাপারে জেট প্লেন ব্যবহারের উপযোগিতার এবং মহাকাশ ভ্রমণের জন্যে বৈদ্যুতিক এবং পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত রকেট ব্যবহারের সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। 1945 সালের 10ই অগাষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। মহাকাশ অভিযানের ব্যাপারে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির ব্যবহারের সম্ভাবনাকে তিনি বাস্তবে রূপ দেন। জীবদ্দশায় তাঁর গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি না হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনীয়ারগণ তাঁর কাজের গুরুত্ব এবং উপযোগিতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন এবং মার্কিন সরকার ওয়াশিংটন শহরে তাঁর নামে গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার (Goddard space flight centre) নামে বিরাট গবেষণাগার স্থাপন করেন।

হারম্যান্‌ ওবের্ত (Hermann Oberth)

মহাকাশ অভিযান এবং রকেটবিদ্যায় অন্যতম দিকপাল হিসাবে হারম্যান ওবের্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি রুমানিয়ায় 1894 সালের 25শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। মিউনিখ, গোটিংজেন, হাইডেলবার্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ সুরু হবার পর মহাকাশ ভ্রমণের তত্ত্ব নিরূপণের জন্যে তাঁকে সৈন্যবিভাগে পাঠান হয়। 1922 সালে রকেটের জ্বালানীতে কিভাবে অগ্নি-সংযোগ করা উচিত এবং কিভাবে কোন বস্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে সেই বিষয়ে মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত 'বাই রকেট টু ইন্টারপ্লানেটারী স্পেস' বইটির প্রথম অংশে রকেটের গতিবিধির কথা উল্লেখ করেন এবং প্রমাণ করেন যে রকেটের গতিবেগ নিঃশেষিত গ্যাসের গতিবেগ অপেক্ষা বেশি হওয়া সম্ভব। বইটির দ্বিতীয় অংশে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্যে উপযুক্ত ধরণের যন্ত্রবাহী রকেটের কথা বর্ণিত হয়েছে। বইটির শেষ অংশে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি ও সম্ভাবনার কথা উল্লেখিত আছে। মহাকাশে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে এবং ভারশূন্যতার ফলকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে মহাকাশ ষ্টেশন (space station)-এর উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তিনিও রকেটে তরল জ্বালানী ব্যবহার করেন। তাঁর লেখা আর একটি বই 'রোড টু স্পেস ট্রাভেল' 'হির্‌স' (Hirsch) পুরস্কার লাভ

করে। তাঁর তৈরি রকেটের কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি কিছু পরিমাণে সরকারী অর্থানুকূল্য লাভ করেন। 1931 সালে তিনি কয়েকটি রকেটের পরীক্ষাকার্য চালান এবং জ্বালানী হিসাবে মিথেন এবং কোহলের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে তিনি রকেটের উপর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। যুদ্ধের সময় যাতে তিনি অন্য দেশের হয়ে কাজ করতে না পারেন সেই জন্যে জার্মান সরকার অধ্যাপক ওবের্তকে 'ভিয়েনা কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং'-এ রকেট গবেষণা বিষয়ে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁকে কাজ-কর্ম করার ব্যাপারে বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হয় নি। পরে বড় ধরণের জ্বালানী তৈরি করার ব্যাপারে তাঁকে ড্রেসডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়। 1941 সালে তিনি জার্মান নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং যেখানে V-2 রকেট তৈরি করা হয় সেই রকেট ডেভেলাপমেণ্ট সেণ্টার-এ পাঠান হয়। জার্মান নাগরিকত্ব লাভ করা সত্ত্বেও তাঁকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নি বলে খুবই হতাশার মধ্যে তাঁর জীবন কাটতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংরেজরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং নানারকম প্রশ্ন করে। তিনি জার্মান সোসাইটি ফর স্পেস রিসার্চের অবৈতনিক সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন।

ভার্নার ভন্ ব্রাউন (Werner Von Braun)

ভার্নার ভন্ ব্রাউন জার্মানীতে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ৎস্যুরিখ (Zuerich) ইন্‌স্টিটিউট অব্ টেকনোলজি, বার্লিন ইনষ্টিটিউট অব্ টেকনোলজি এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অধ্যাপক ওবের্ত এবং ওয়ালটার ডন্ ব্যাজারের সহযোগী হিসাবে রকেট বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ লাভ করেন। 1930 সালে মাত্র আঠার বছর বয়সেই রকেট ব্যবহারের জন্যে তরল জ্বালানী নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন এবং 1932 সালে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ব্যাপারে জার্মান সৈন্য বিভাগকে সাহায্য করেন। বিভিন্ন ধরণের রকেট ক্ষেপণাস্ত্র যথা A 1, A 2, A 3 এবং A 4 (যা V-2 রকেট নামে পরিচিত) ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে তাঁর অবদান অপরিসীম। রকেট গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে তিনি পিনিমুয়েণ্ডা-কে (Peenemuende) নির্বাচিত করেন। তিনি জার্মান রকেট সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভ্য এবং তাঁর জন্যেই V-2

ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র এবং 'ভাসেনফল' (Wassenfall) নামে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধী স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি মার্কিন আর্মি রকেট প্রোগ্রাম পরিচালক হিসাবে রকেট উন্নয়ন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আলাবামাতে গাইডেড্ মিসাইল ডেভালাপ্‌মেণ্ট ডিভিসনের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। 1956 সালে ডঃ ব্রাউনকে আর্মি বালেস্টিক মিসাইল এজেন্সি (Army Ballistic Missile Agency) উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। 1960 সালে নাসা (NASA) প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁকে মারশাল স্পেস ফ্লাইট সেনটার (Marshal Space Flight Center)-এর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়।

মহাকাশ অভিযান এবং স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ব্যাপারে মৌলিক অবদানের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বহু সম্মান এবং পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন পুরস্কারের মধ্যে মার্কিন ডিস্‌টিংগুইস্‌ট্ সিভিলিয়ান সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, ডাঃ রবার্ট গডার্ড মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড, দি আমেরিকান ইলেকট্রনিক সোসাইটি অ্যাণ্ড আমেরিকান অ্যাসট্রোনমিকাল সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক পুস্তকও রচনা করেন। তিনি এককভাবে অথবা যৌথভাবে যে সমস্ত পুস্তক রচনা করেন সেগুলির মধ্যে 'দি মার্স প্রজেক্ট' 'ফিজিক্স অ্যাণ্ড মেডিসিন অব্ দি আপার অ্যাটমসফিয়ার' 'স্পেস মেডিসিন', 'একরস্ দি স্পেস্ ফ্রনটিয়ার,' 'কনকোয়েস্ট অব্ দি মুন', 'এক্সপ্লোরেসন অব্ মারস', 'প্রজেক্ট স্যাটেলাইট', 'ফার্স্ট মেন অব্ দি মুন', 'এ জার্নি থ্রু স্পেস্' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি আমেরিকার নাগরিক। আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র তথা মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই ডঃ ব্রাউন কোন না কোন ভাবে জড়িত আছেন এবং বর্তমান রকেট ও মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে পুরোধা হিসাবে গণ্য করা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ*

*ফলিত পদার্থ-বিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অনুরোধে উক্ত প্রতিযোগিতার জন্যে মডেল জমা দিবার শেষ তারিখ গত 31শে মার্চ, 1977, তারিখের পরিবর্তে 15ই জুন, 1977, তারিখ ধার্য করা হল, উক্ত তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে মডেল ও আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

কৃষিক্ষেত্রে মিউটেশন প্রজননের দান

প্রাণী বা উদ্ভিদের বংশানুগত গুণের স্থায়ী পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে। এই পরিবর্তনের জন্যে ক্রোমোজোম বা ক্রোমোজমে অবস্থিত জিনগুলি দায়ী। আসলে এই জিনগুলি কোষের মধ্যে থেকে প্রাণী বা উদ্ভিদের বহিস্থ এবং অন্তস্থ গুণগুলিকে পরিচালনা করে। এখন কোন কারণে যদি ঐ জিনগুলির গঠনের পরিবর্তন হয় তাহলে ওদের দ্বারা পরিচালিত গুণগুলিরও পরিবর্তন হবে। ধরা যাক, কোন একটা গাছের সাদা রঙ-এর ফুল একটি 'সাদা' জিন (যার প্রতীক চিহ্ন W) দিয়ে পরিচালিত হয়। এখন যদি ঐ গাছে কয়েকপুরুষ (generation) ধরে লাল ফুল আসতে থাকে, তাহলে ঐ 'সাদা জিনটি' 'লাল জিনে' স্থায়ী হল। এইরূপ পরিবর্তনকে মিউটেশন বা বিশেষভাবে জিন মিউটেশন বলা যায়। অনেক সময় ক্রোমোজমের পরিবর্তনে, যেমন ক্রোমোজোমের অংশ নষ্ট হলে বা যুক্ত হলে কিংবা প্রতিস্থাপিত হলে, মিউটেশন ঘটে। তাছাড়া, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কণাগুলিও উদ্ভিদ বা প্রাণীর গুণাগুণ পরিবর্তনে সাহায্য করে।

এই পরিবর্তন রাসায়নিক বা ভৌত বস্তু দিয়ে আনা যায়। ভৌত বস্তুগুলির মধ্যে এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি এবং রাসায়নিক বস্তুগুলির মধ্যে ইথাইল মিথেন সালফোনেট, নাইট্রাস অ্যাসিড, সালফার মাস্টারড্‌স্‌, নাইট্রোজেন মাস্টারড্‌স্‌ জাতায় বস্তুগুলি প্রধান। এই দুই জাতীয় বস্তুগুলি দিয়ে কৃষি ফসলের বিশেষ রূপান্তর ঘটান হয়েছে। এই মিউটেশন প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ে থাকে, আবার কৃত্রিম উপায়েও করা যায়। তবে প্রাকৃতিক মিউটেশনেরর গতি খুব মন্থর।

1950 সালে ডি. এন.এ. যখন বংশগত গুণের নায়ক হিসাবে প্রমাণিত হল, তখন থেকে কিভাবে এই ডি. এন. এ. অণুর রূপান্তর করা যায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান চলতে থাকে। এই এক একটি ডি. এন. এ. অণু ফসফেট, সুগার ও নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষার দিয়ে গঠিত। একটি ফসফেট, সুগার ও একটি বেস বা ক্ষারের সমন্বয়কে নিউক্লিওটাইড বলে। কতকগুলি নিউক্লিওটাইড মিলে নিউক্লিওটাইড চেন উৎপন্ন করে। এক একটি ডি. এন. এ. অণু দুটি নিউক্লিওটাইড চেন দিয়ে তৈরী, যে দুটি চেন পেঁচান সিঁড়ির মত। এখন যদি স্থায়ীভাবে ঐ চেনের কোন পরিবর্তন হয় তাহলে এরূপ পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে। অনেক পদ্ধতিতে ডি. এন. এ. অণুর পরিবর্তন হয় ; তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল টটোমেরিক শিফট্‌।

উদ্ভিদ প্রজননে এই মিউটেশন ঘটিয়ে কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তবে যত সংখ্যায় বিভিন্ন ধরণের গাছগাছড়া পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে, তার মধ্যে উপকারী গাছগাছড়ার সংখ্যা খুবই কম। প্রতি হাজারে হয়ত একটি ভাল গুণ পাওয়া যায় যেটিকে

আরও প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে ভাল ভ্যারাইটি উৎপন্ন করা যেতে পারে। এত পরিশ্রম হলেও কার্যক্ষেত্রে এর দান কম নয়।

বর্তমানে উদ্ভিদ-প্রজননবিদ্যাতে মিউটেশন প্রজননকে আমূল কাজে লাগান হচ্ছে। যার ব্যবহারে ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তন আনবে। তবে এর কয়েকটি কুফল আছে। অনেক মিউট্যাণ্ট গাছই কৃষি ফসলের ভ্যারাইটির চেয়ে উৎপাদনে নিচু। এখন যদি এরূপ গাছগাছড়ার বীজগুলি ভাল ভ্যারাইটির সঙ্গে মিশে যায় তবে মোট ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবে এবং প্রতি বছর এই মিশ্রিত বীজগুলি ব্যবহার করতে থাকলে উৎপাদন বেশ হ্রাস পেতে থাকবে।

কৃত্রিম মিউটেশন প্রজনন অপেক্ষা প্রাকৃতিক মিউটেশন প্রজননকে কৃষিতে কাজে লাগিয়ে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ধান এবং গম দানাশস্যে এর এক অকল্পনীয় উদাহরণ। গমশস্যে যুগান্তকারী বিপ্লব এসেছে 'নরিন জিন' দিয়ে। এই নরিন জিনকে প্রজননে কাজে লাগিয়ে মেক্সিকান গম এসেছে। এই সকল গম আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে গমের ফলনকে আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। 'নরিন' জাতীয় গমের বৈশিষ্ট্য হল বেঁটে, সহজে পড়ে যায় না এবং অত্যধিক উর্বর মাটিতে জন্মায়। এর ফলে ফসল বেশি পরিমাণ খাদ্য মাটি থেকে গ্রহণ করে; ফলে প্রচুর পরিমাণে দানা উৎপাদিত হয়। লার্মারোজো, 64-A, সোনারা 64, সোনালিকা, জনক, কল্যানসোনা প্রভৃতি উচ্চফলনশীল ভ্যারাইটিগুলির হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ 30-36 কুইণ্টাল। শুধু তাই নয়, এই জাতীয় ভ্যারাইটিগুলিতে প্রোটিনজাতীয় খাদ্যপ্রাণের ভাগও বৃদ্ধি পেয়েছে; যেমন 'সর্বতী সোনারা'-তে শতকরা 16·5 ভাগ প্রোটিন আছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রাকৃতিক প্রজননের সাফল্য সাধিত হয়েছে ধানে। বেঁটে জাতীয় ধানগুলির বৈশিষ্ট্য ঐ গমেরই মত কিন্তু এর একটি প্রধান পার্থক্য হল প্রায় সারা বছরই এগুলি চাষ করা যেতে পারে। প্রথম এই জাতীয় ধানের নামকরণ হয়—ডি-জি-উ-জেন। পরবর্তীকালে ধানের বিভিন্ন গুণকে কাজে লাগিয়ে আজকাল নতুন নতুন উচ্চফলনশীল ধান উৎপন্ন করা হয়েছে, যেমন—পদ্মা, জয়া, পঙ্কজ, পুষা 2-21 ইত্যাদি।

এই হল প্রাকৃতিক মিউটেশনের সুফল। কৃত্রিম মিউটেশন থেকেও প্রজননের আরো অনেক সংবাদ পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। ধানের ক্ষেত্রে জগন্নাথ একটি ভ্যারইটি—যেটি কৃত্রিম প্রজননের দান। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন জাতীয় শস্যে মিউটেশনকে কাজে লাগান হচ্ছে। বার্লিতে 'মল্ট' গুণকে এবং রোগ, কীট-পতঙ্গ নিরোধক, খরা প্রভৃতি গুণকে কাজে লাগান হয়েছে ধান, গম, আলু, সরষেতে। যখন প্রাকৃতিক গাছ প্রভৃতির মধ্যে ঐরূপ রোগ বা কীট-পতঙ্গ, খরা, লবণ নিরোধক জিনের সন্ধান পাওয়া না যায়, তখন ঐ বিশেষ মিউটেশন প্রজননের প্রয়োজন। এর ব্যবহার ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পারে বিভিন্ন অর্নামেন্টাল (ornamental) উদ্ভিদে।

সেখানে বিভিন্ন রঙ-এর পাতা ও ফুলের সমাবেশ উদ্যানকে মনোরম করে তুলতে পারে। ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে যে শতাধিক পাটের মিউট্যাণ্ট ভ্যারাইটি বের হয়েছে সেগুলির উপর পরীক্ষা চলছে এবং তাথেকে নিশ্চয়ই কোন না কোন ভাল জাতের পাট আরো অন্ত ধরণের প্রজনন ঘটিয়ে বের করা যাবে।

অসিত মণ্ডল*

*বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

মডেল তৈরি

(1)

ছোট ছোট পরীক্ষা দিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রাথমিক নীতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা মডেল তৈরি করে তা প্রমাণ করতে পারে। মার্চ, 1977, সংখ্যায় একটি নীতি-বিশ্লেষক মডেল তৈরির বলা হয়েছে। এখানে এরকম আর একটি মডেল তৈরির কথা বলা হবে।

শব্দ-তরঙ্গে শক্তি রয়েছে

সুরসমৃদ্ধ স্বরের (i) তীব্রতা, (ii) তীক্ষ্ণতা এবং (iii) গুণ—এ তিনটি বিশেষত্ব থাকে। শব্দ কতটা জোরে হচ্ছে তা দিয়ে তার তীব্রতা বোঝায়। অর্থাৎ প্রাবল্য দিয়ে শব্দের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় এবং যে মাধ্যম অবলম্বন করে শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় তার নির্দিষ্ট আয়তনে কতটা শক্তি থাকে তা দিয়েই সাধারণত শব্দের তীব্রতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। শব্দ-তরঙ্গ হল কোন মাধ্যমকে অবলম্বন করে শক্তির প্রবাহ। নিচের পরীক্ষাটির মাধ্যমে তা প্রমাণ করা যায়।

এর জন্যে লাগবে, (i) একটি সাধারণ সুর-শলাকা, (ii) একটি অনুনাদক ও (iii) একটি বি'শষ ব্যবস্থায় দুটি দণ্ডের প্রত্যেক প্রান্তে আবদ্ধ চারটি পাত—যা একটি উল্লম্ব অক্ষের চারদিকে অবাধে আবর্তন করতে পারে (চিত্র)।

অনুনাদকটি পাকা লাউ থেকে কিংবা কাঠ বা কোন মাটির বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি থেকে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। চিত্রের মত করে অনুনাদকটি তৈরি করতে হবে। যাঁরা মাটির হাঁড়ি, কলসা তৈরি করেন—তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনমত অনুনাদকটি তৈরি করে নিলেই ভাল হয়। হাঁড়ির আয়তন 4-5 লিটার হলেই চলবে।

অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির বেলায় হাঁড়ির মুখটা পিটিয়ে অনুনাদকের বাঁ-দিকের মত করে নিতে হবে (চিত্র)। হাঁড়ির মুখের ঠিক বিপরীত দিকে 2-3 মি. মি. ব্যাস এবং
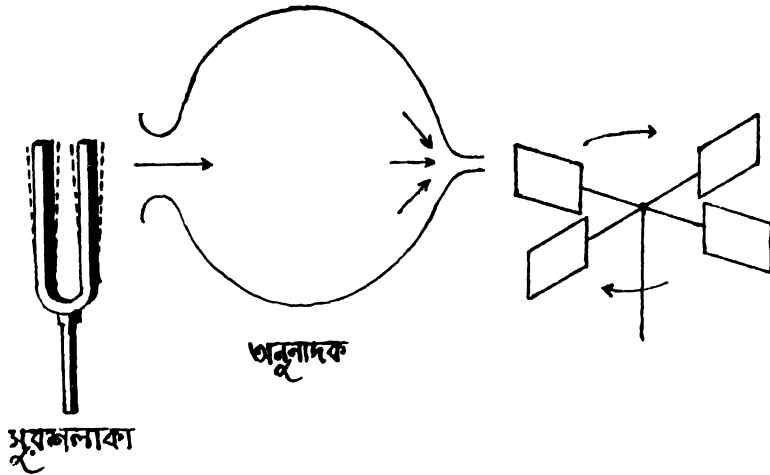
1 সে. মি. দৈর্ঘ্যের একটি সরু নল লাগিয়ে নিতে হবে। এটি এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে ভিতরের বায়ু এই সরু নলের মুখ দিয়ে বের হওয়ার সময় তেমন কিছু বাধা না পায়। পাকা লাউ হলে সেটি রোদে শুকিয়ে নিয়ে (খোসাটাকে শক্ত করার জন্যে) একদিকে সামান্য ফুটো করে ভিতরের অংশ বের করে নিতে হবে। ঐ ফুটোর বিপরীত দিকে আর একটি ছোট ফুটো করে তাতে একটি সরু নল লাগিয়ে নেওয়া হয়।

উল্লম্ব অক্ষের চারদিকে অবাধে আবর্তনশীল ব্যবস্থাটিতে দুটি হাল্কা অ্যালুমিনিয়ামের দণ্ড (4-5 সে. মি. লম্বা) পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে আবদ্ধ থাকে (চিত্র)।

প্রত্যেক দণ্ডের দুই মুক্ত প্রান্তে উল্লম্ব অবস্থায় অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী দুটি পাতলা পাত আটকানো হল। প্রত্যেকটি পাত প্রায় 1 সে. মি. লম্বা ও 1 সে. মি. চওড়া। আবদ্ধ দণ্ড দুটির ভারকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে উল্লম্ব অক্ষটি যাবে—যার চারদিকে সেটি অবাধে ঘুরতে পারে। এই ব্যবস্থাটিকে অনুনাদকের পাশে এমনভাবে বসানো হল যাতে অনুনাদকের সরু নলের মুখ দণ্ডের দু-প্রান্তের পাত একই অনুভূমিক তলে থাকে। এ অবস্থায় সুরশলাকার বাহুকে আঘাত করে তা অনুনাদকের বড় মুখের সামনে ধরলে সুরশলাকার বাহুর সরল সমঞ্জস গতির জন্যে সৃষ্ট নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দ-তরঙ্গ অনুনাদকের বায়ুতে কম্পনের সৃষ্টি করবে। অনুনাদকের ধর্ম অনুযায়ী তা থেকে সরু নলটি দিয়ে অধিক তীব্রতাসম্পন্ন শব্দ বের হবে যা সামনে রাখা পাতলা

পাতযুক্ত আবদ্ধ দণ্ড দুটিকে উল্লম্ব অক্ষের চারদিকে ঘোরাবে। সুরশলাকার বাহুকে একবার আঘাত করে অনুনাদকের সামনে ধরলে এই ঘটনাটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখা যাবে। এমনকি সুরশলাকা সেই সময়ের মধ্যে সরিয়ে নিলেও ব্যবস্থাটি ঘুরতে থাকবে। তা ঘটে অনুনাদকের ধর্মের জন্যে। ঘূর্ণনের বেগ কমে গেলে বা থেমে গেলে সুরশলাকার বাহুতে আঘাত করে অনুনাদকের সামনে আবার ধরলে ব্যবস্থাটি ঘুরতে থাকবে। এভাবে সুরশলাকার সাহায্যে ব্যবস্থাটিকে ঘূর্ণনশীল অবস্থায় রাখা যায়। সুরশলাকার বাহুকে জোরে আঘাত করলে অনুনাদকের মধ্যে বেশী তীব্রতার শব্দ প্রবেশ করে এবং ফলে অনুনাদক থেকেও বেশী তীব্রতার শব্দ বের হয়—সেজন্যে তা আরও জোরে ঘোরে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাটিকে ঘোরাতে হলে শক্তি লাগে। এক্ষেত্রে ঐ শক্তি যে অনুনাদকের সরু নল থেকে নির্গত শব্দ-তরঙ্গ থেকে প্রাপ্ত—তা প্রমাণিত হল।

মহুয়া দে*

*ডি. আই. পি. রোড, গভর্ণমেন্ট হাউসিং এষ্টেট, ব্লক-R, ফ্ল্যাট-6 কলিকাতা-700 054.

(2)

মায়োগ্রাফ

শরীরের প্রতিটি মাংসপেশীতেই এক বা একাধিক স্নায়ু থাকে। এই স্নায়ুতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করলে ঐ মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়। মায়োগ্রাফ (myograph) যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশীর এই সঙ্কোচনকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। মায়োগ্রাফ যন্ত্রের গঠন অনেকটা কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের মতই। এক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি বাড়তি যন্ত্রাংশ লাগবে। তা হল :

1. তড়িৎ-আবেশ কুণ্ডলী—

15 সে. মি. লম্বা ও 6 সে. মি. ব্যাসবিশিষ্ট চোঙের উপর 22 গেজের আবরণযুক্ত তামার তার জড়িয়ে একটি কুণ্ডলী তৈরি করতে হবে। তামার তারের প্রতিটি পাক খুব কাছাকাছি হওয়া প্রয়োজন (চিত্র 1)। অনুরূপভাবে আর একটি কুণ্ডলী তৈরি করতে হবে, যেটি লম্বায় 10 সে. মি. এবং 4 সে. মি. ব্যাসবিশিষ্ট। কুণ্ডলীর তার দুটি পরবর্তী যন্ত্রাংশ—তড়িদ্দ্বারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয়

কুণ্ডলী দুটিকে এমনভাবে রাখা হল যেন প্রয়োজনমত দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির ভিতর ঢোকানো যায় কিংবা প্রথমটি থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়।

চিত্র 1
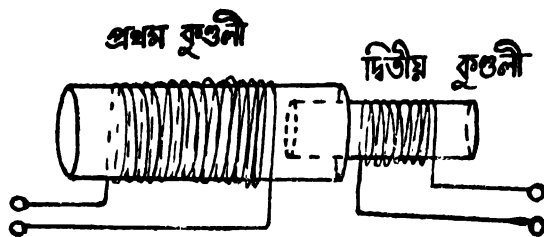
2. ইলেক্‌ট্রোড

এক টুকরো কর্কে ছিদ্র করে তার মধ্যে দুটি আবরণহীন তামার তার ঢুকিয়ে দিতে হবে (চিত্র 2)। লক্ষ্য রাখতে হবে—ক প্রান্তের প্রতিটি তামার তারের দৈর্ঘ্য যেন 3 সে. মি. হয়। খ-প্রান্তের তার দুটির সঙ্গে দ্বিতীয় কুণ্ডলীর তার দুটিকে যুক্ত করা হল।

চিত্র 2

3. চাবি
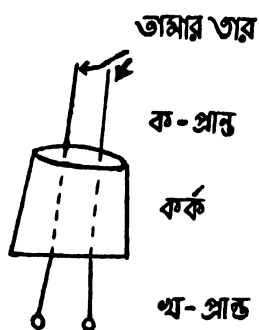
কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের কাঠের ব্লকের কেন্দ্র থেকে (যেখানে 24″ লম্বা অ্যালু-মিনিয়াম দণ্ডটি লম্বভাবে বসানো থাকে ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান', ফেব্রুয়ারী, 1977, সংখ্যা দ্রষ্টব্য) প্রায় 5 সে. মি. দূরে একটি 6 সে. মি. দীর্ঘ শক্ত তামার দণ্ডকে লম্বভাবে বসাতে হবে (চিত্র 3)। প্রথম কুণ্ডলীর যে কোন একটি প্রান্ত এই দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয় (চিত্র 4)।

এবার, 12 সে. মি. দীর্ঘ ও 1 সে. মি. চওড়া একটি তামার পাতকে চিত্র 3-এর মত বাঁকিয়ে লম্বভাবে বসানো অ্যালুমিনিয়াম দণ্ডটির নিচের দিকে আটকাতে

হবে। আরও নিচে আবরণহীন তামার তার দিয়ে একটি ছোট কুণ্ডলী চ তৈরি করে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই তারটি এবং প্রথম কুণ্ডলীর অবশিষ্ট প্রান্তটি একটি 6 ভোল্ট ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।
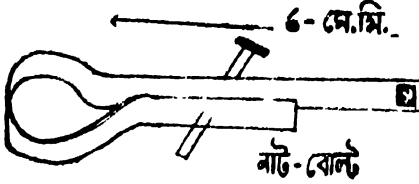
চিত্র 3
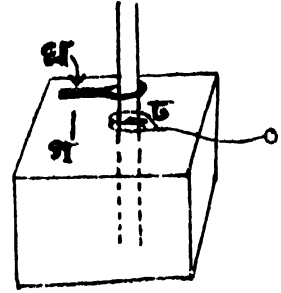
চিত্র 4

মায়োগ্রাফ যন্ত্রে ড্রামটির ঘূর্ণন খুব দ্রুত হওয়া প্রয়োজন (মিনিটে কমপক্ষে 50 বার)। প্রতিটি ঘূর্ণনের সময় ঘ পাতটি গ দণ্ডকে স্বল্প সময়ের জন্যে স্পর্শ করবে—সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘটবে। তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের ফলে দ্বিতীয় কুণ্ডলীতেও তখন একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে। মাংসপেশী সংযুক্ত স্নায়ুর উপর তড়িদ্দ্বার স্থাপন করলে, দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে উৎপন্ন আবেশজনিত স্বল্প সময়কালীন বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্নায়ুকে উত্তেজিত করবে এবং তার ফলে মাংসপেশীতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এ অবস্থায় মাংসপেশী সংযুক্ত তন্তুর সঙ্গে লিভারের বঁড়শিটি যুক্ত করলে এবং লেখনী-সূচটি ড্রামের ঝুল-মাখানো কাগজের উপর স্থাপন করলে মাংসপেশীতে উক্ত প্রতিক্রিয়া বা সঙ্কোচনের একটি লেখচিত্র পাওয়া যাবে। (পরের সংখ্যায় মাংসপেশীর ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি এবং মায়োগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশীর উপর কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে)

পূর্ণেন্দু সরকার*

* পোঃ ও গ্রাঃ খাটুরা, 24 পরগণা

(3)

ইলেকট্রনিক সময়-নির্দেশক

সময়-নির্দেশক যন্ত্র দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোন বৈদ্যুতিক বর্তনীকে চালু কিংবা বন্ধ করা যায়। এখানে একটি ইলেকট্রনিক সময়-নির্দেশক যন্ত্রের বর্ণনা ও কার্যপ্রণালী দেওয়া হবে। অল্প খরচায় এটি তৈরি করা যেতে পারে। এর জন্যে নিচের যন্ত্রাংশগুলি লাগবে :—

(i) AC 128 ট্রানজিস্টর—1টি ;
(ii) S. P. D. T. সুইচ—1টি ;
(iii) কনডেনসার 1000 μF/12V—1টি ;
(iv) পোটেন্‌শিয়োমিটার 2·5KΩ—1টি ;
(v) রোধ 2·2KΩ—1টি ;
(vi) তড়িৎ-চুম্বকীয় সুইচ (রিলে) 9V, 150Ω—1টি ;
(vii) ব্যাটারী 9V—1টি.

চিত্রে এই ব্যবস্থাটির বর্তনী দেখানো হয়েছে। আন্দাজমত সার্সি তৈরি করে নিয়ে বর্তনী অনুযায়ী যন্ত্রাংশগুলি লাগিয়ে নিতে হবে।
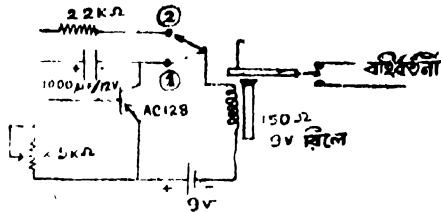
কার্যপ্রণালী :

প্রথমে (1) চিহ্নিত অবস্থানে সুইচটি রাখা হয়। এ অবস্থায় কনডেনসারটি তড়িদাহিত না থাকায় ট্রানজিস্টরটি পরিবাহী পথ দেয়; ফলে কনডেনসারটি দ্রুত তড়িদাহিত হয়ে যায়। তখন রিলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বিদ্যুৎ-চুম্বকের সৃষ্টি করে—যা রিলের উপরে রাখা একটি লোহার পাতকে টেনে নামিয়ে দেয়; ফলে বহির্বর্তনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। এখন সুইচটিকে (2) চিহ্নিত স্থানে ঠেলে দিলে কনডেনসারটি প্রথমে 2·2KΩ রোধের মাধ্যমে মোক্ষিত (discharge) হবে। 2·2KΩ রোধের মাধ্যমে কনডেনসারটি মোক্ষিত হবার সময় ট্রানজিস্টরের বেস-এমিটার (base-emitter) সংযোগস্থলের মধ্যে তড়িৎ-বিভব ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তন ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে পরিবাহী পথ দেবে এবং তখন

কনডেনসারটি ট্রানজিষ্টরের মাধ্যমে দ্রুত মোক্ষিত হয়ে যাবে। কখন ট্রানজিষ্টরটি পরিবাহী পথ দেবে তা পোটেনশিয়োমিটার-এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কন্‌ডেনসারটি তড়িৎবিহীন হয়ে গেলে তড়িৎ-চুম্বকের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় রিলে কাজ না করায় বহির্বর্তনীর সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থায় দুটি সুইচকে কাজে লাগিয়ে কোন বহির্বর্তনীকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে খোলা কিংবা বন্ধ করা যেতে পারে। কনডেনসার ও রোধের মান পরিবর্তন করে সময়ের ব্যবধান কমানো বা বাড়ানো যায়। এ কারণেই মডেলটির উপরিউক্ত নামকরণ করা হয়েছে।

কল্যাণ দাস*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

মার্চ, 1977, সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত 'শব্দকূট'-এর সমাধান

[1] ভি	X	[2] ভা	[3] প্যা	[4] গ্রে	X	[5] স	[6] বো	[7] র
[8] টা	র	বা	ই	ন	X	[9] ডি	রা	ক
[10] মি	লি	X	রি	X	[11] ক্যা	X	ক্স	স
ন	X	[12] ট	ন	সি	ল	X	X	ল্ট
X	[13] প্লাঁ	নি	X	X	[14] সা	হা	নি	X
[15] ভা	জ	ক	X	[16] হা	ই	ড্রা	X	[17] বো
র্নি	ঙ্কা	X	[18] লা	ই	ট	ই	য়া	র
য়া	X	[19] ব্যা	র্ভা	ব্রে	X	[20] বো	স	ন
[21] র	ঙ্খা	স	X	[22] ট	লু	ই	ন	X

ভেবে কর

1. দশটি রূপোর কলসীতে দশটি করে, অর্থাৎ মোট এক-শটি সোনার মোহর আছে। এখন কোন একটি কলসীর প্রত্যেকটি মোহরের ওজন 90 গ্রাম, বাকি কলসী-গুলির সবকয়টি 100 গ্রামের। মাত্র একবার ওজন করে কোন্ কলসীতে কম ওজনের মোহর আছে কি ভাবে বের করা যায়?

2. দুটি 'দুই' দিয়ে বত্রিশ এবং দুটি 'চার' দিয়ে চৌষট্টি কিভাবে লেখা যায়? যে কোন পাটীগাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে।

যেমন $|\underline{2^2} = 24$.

(সমাধান 211 পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।)

দেবব্রত সরকার*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

3. জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার মার্চ সংখ্যার 'ভেবে কর' সমস্যাগুলির একটিতে রাজা ক্রমব্রাম সিং অবাক জলপান নদীর ধারে যে দুর্গের দেয়াল অনেক কষ্ট করে কামান দেগে ভাঙতে পেরেছিলেন, ঐ দুর্গের দেয়াল কত শক্ত ছিল তা নির্ণয় করা রাজার নিজস্ব অঙ্কবিদ্ শ্রীযুত হিসেব সিং মহাশয়ের কাছে কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। দুর্গের দেয়ালের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে কত বল প্রযুক্ত হওয়ায় দেয়াল ভাঙতে আরম্ভ করেছিল তা নিচের তথ্যগুলি পেয়ে তিনি অতি সহজেই হিসেব করে দিয়েছিলেন:

(i) কামানের প্রতিটি গোলার ওজন 5 কি. গ্রা. এবং প্রতি সেকেণ্ডে 20টি গোলা লম্বভাবে দুর্গের দেয়ালে গিয়ে পড়ে;

(ii) প্রতিটি গোলার বেগ সেকেণ্ডে প্রায় 2680 সে. মি. (ঘণ্টায় 60 মাইল);

(iii) দেয়াল ভাঙার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি গোলা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে 320 সে. মি./সে. বেগে ছিটকে ফিরে আসে;

এবং (iv) গোলাগুলি দুর্গের দেয়ালে 1 বর্গমিটার জায়গা জুড়ে গিয়ে পড়ে। তাহলে প্রতি সেকেণ্ডে দুর্গের দেয়ালে প্রযুক্ত বলের পরিমাণ মোট কত ছিল?

4. ভিতর দিকে খাঁজ কাটা একটি বৃত্তাকার রিং কল্পনা করা যাক। এই রিংটি ভূপৃষ্ঠের উপর লম্বভাবে রাখা হল (চিত্র)। এবার একটি ক্ষুদ্র বলকে যদি যথেষ্ট গতি
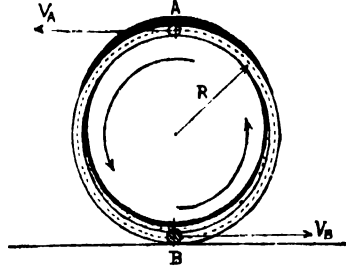
দিয়ে ঐ খাঁজের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে ঐ বলটি ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমকোণে আনত তলে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে (ঘর্ষণ ও অন্যান্য বাধা উপেক্ষা করা হল)। রিংটির ব্যাসার্ধ যদি R হয়, তবে সর্বনিম্ন কত বেগে বলটি খাঁজের মধ্যে B বিন্দুতে ছেড়ে দিলে তা বৃত্তাকার পথে ঘুরবে ?

(সমাধান 211 পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)

দুলালকুমার সাহা*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সামুদ্রিক গবেষণা

সমুদ্র সম্বন্ধে মানুষের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা অনেক দিনের। বৈজ্ঞানিকদের চোখে সমুদ্র একটি বিশাল পরীক্ষাগার। বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রাকৃতিক ঘটনা প্রতি-নিয়ত ঘটে চলেছে এই পরীক্ষাগারে। এগুলির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার দুর্নিবার আকর্ষণ বহু বিজ্ঞানীই অনুভব করেন।

মানুষের জীবনধারণের সমস্যার সঙ্গেও সমুদ্র জড়িত। প্রতি বছর প্রায় 7 কোটি টন পরিমাণ সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য মানুষ ব্যবহার করে। বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারে পৃথিবীপৃষ্ঠের সমস্ত অরণ্য যে ভূমিকা পালন করে, সমুদ্রগুলির ভূমিকাও এই ব্যাপারে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ এবং মূল্যবান গ্যাসের বিপুল ধনভাণ্ডার সমুদ্রতলে সঞ্চিত আছে। স্বভাবতই মানুষ আধুনিক কালে সমুদ্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী।

আধুনিক সামুদ্রিক গবেষণা মোটামুটি তিনটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। এগুলি হল, (i) সমুদ্রের জৈব সম্পদের অনুসন্ধান এবং জৈব সম্পদ উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, (ii) সমুদ্রতলে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও উৎপাদন এবং (iii) সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রাকৃতিক অবস্থা এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে বর্তমানে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে, বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সৌরতাপ বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যাবে, পৃথিবী ক্রমশ শীতল হবে এবং পৃথিবীতে তুষার যুগ নামবে। এর ফলে, সমুদ্রের জলভাণ্ডার কমে গিয়ে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সূর্যতাপে উত্তপ্ত পৃথিবীর তাপ বিকীর্ণ হবে কম। এর ফলে. পৃথিবীপৃষ্ঠে উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং মেরু অঞ্চলের বরফ-গলা জলে সমুদ্রস্ফীতি হয়ে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাবে। বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও বর্তমান মানব-সভ্যতার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে (যেমন; নদীর গতিপথ পরিবর্তন) কখন সমুদ্র; কখন বা বায়ুমণ্ডলের নানা পরিবর্তন সম্ভব। সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সব পরিবর্তন পৃথিবীর সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ বদলে দিতে পারে। তাছাড়া, বিভিন্ন স্থানের জলহাওয়ার পরিবর্তনের মূলে সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেকাংশেই দায়ী।

উপরিউক্ত কারণে, এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করা প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি নির্ভরযোগ্য গাণিতিক মডেল থাকলে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ-লব্ধ ফলাফল ঐ মডেলে ব্যবহার করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাভাষ করা সম্ভব হবে। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী এই গাণিতিক মডেল তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন এবং এতে বেশ কিছুটা সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।

এই কাজের পরিপূরক হিসাবে সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে ভাসমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া, বিশেষ যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত গবেষণা-জাহাজ তৈরি করা হয়েছে এবং এই সব ভাসমান গবেষণাগারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের কাজ সুরু ক'রে দিয়েছেন। এসবের মাধ্যমে নতুন যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উল্লেখ করা যায়: (i) নানা রকম সমুদ্র-প্রবাহের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে; (ii) জানা গেছে, সমুদ্রজল বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এবং এই স্তরগুলির গভীরতা 10 মিটার থেকে সুরু করে আরও কম। দুটি পর পর স্তর তুলনা করলে দেখা যায়, এদের লবণাক্ততা,

তাপমাত্রা এবং এমনকি প্রবাহদিক—স্তর দুটির মধ্যবর্তী সীমাতলে হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়; (iii) বায়ুমণ্ডলের মত সমুদ্রজলে সুসমঞ্জস প্রবাহ ছাড়াও বেশ বড় আকারে বিক্ষুব্ধ (turbulent) প্রবাহ বিদ্যমান। এই বিক্ষুব্ধ প্রবাহ সমুদ্রজলের মোট গতি-শক্তির জন্যে অনেকাংশে দায়ী।

এই সমস্ত নতুন তথ্য উপরিউক্ত গাণিতিক মডেলে প্রাথমিক শর্ত হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এই ধরণের গবেষণায় সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।

আধুনিক হিসাব অনুযায়ী, 2000 খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে প্রায় 600 কোটি। এদের খাদ্যের যোগান দিতে হলে সেই সময়ে সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ হতে হবে প্রায় 13 থেকে 15 কোটি টন। এ পর্যন্ত সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতিকে আদিম যুগের শিকারের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সামুদ্রিক খাদ্যোৎপাদন পদ্ধতিকে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় করতে হলে, সামুদ্রিক জৈব সম্পদের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান এবং এদের নিয়ন্ত্রিত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মৎস্যজাতীয় প্রাণী এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানান ধরণের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সুরু হয়েছে। যেমন দেখা গেছে, সমুদ্রের মৎস্যজাতীয় প্রাণীর বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বসাকুল্যে প্রায় 12 কোটি টন। সুতরাং প্রতি বছর 12 কোটি টনের বেশি মৎস্য শিকার করলে সমুদ্রের জৈব-সম্পদ ক্রমশ কমে যেতে থাকবে। বস্তুত সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চলে মৎস্য শিকারের পরিমাণ সেই অঞ্চলের বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণের চেয়ে যথেষ্ট বেশি। স্বভাবতই এই ধরণের অযৌক্তিক মৎস্যশিকার সংযত করা প্রয়োজন।

সবশেষে, সামুদ্রিক গবেষণায় আরও একটি দিক উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রের সঞ্চিত শক্তির অন্তত কিছু অংশ বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্যে বিভিন্ন দেশে প্রচেষ্টা চলছে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা থেকে শক্তি আহরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা ইতিমধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়ায় চালু হয়েছে।

সুনীল কুমার সিংহ*

* সাহা ইনষ্টিট্যুট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান

1. মনে করা যাক, কলসীগুলিকে 1, 2, 3,……10 দ্বারা চিহ্নিত করা হল। এবার 1নং থেকে 1টি. 2নং থেকে 2টি,………10নং থেকে 10টি করে মোহর নেওয়া হল। অর্থাৎ মোট 55টি মোহর নিয়ে ওজন করা হল। প্রাপ্ত ওজনকে 5500 গ্রাম থেকে বিয়োগ করলে যত হবে তাকে 10 দিয়ে ভাগ করলেই দাগী কলসীর নম্বর পাওয়া যাবে। কারণ যদি 4নং কলসীতে কম ওজনের মোহর থাকে, তবে 4টি কম ওজনের মোহর নেওয়া হয়েছে। এই চারটি মোহরের ওজন $4 \times (100-90=10)$ গ্রাম কম হবে। সুতরাং কতটা ওজন কম হল তাকে 10 দিয়ে ভাগ করলে হাল্কা মোহরের সংখ্যা ও সেই সঙ্গে কলসীর নম্বর জানা যাবে।

2. $\sqrt[\cdot 2]{2} = \sqrt[\frac{1}{5}]{2} = 2^5 = 32 \left[\because \sqrt[n]{2} = 2^{\frac{1}{n}}\right]$

$$\lfloor 4 \quad 24 \quad \sqrt{4^{24}} = 4^{12}$$

এইভাবে

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{4^{\lfloor 4}}}} = 4^{\circ} = 64$$

3. দুর্গের দেয়ালের দিকে গতিশীল প্রতিটি গোলার ভরবেগ $= 5000 \times 2680$. ছিটকে আসা গোলার ভরবেগ $= 5000 \times (-320) = -5000 \times 320$.

গতির অভিমুখ বিপরীত বলে এক্ষেত্রে ভরবেগ ঋণাত্মক। সুতরাং দেয়ালে প্রযুক্ত ভরবেগ

$$= 5000 \times 2680 - (-5000 \times 320)$$
$$= 5000(2680 + 320)$$
$$= 5000 \times 3000$$
$$= 15000000$$

প্রতি সেকেণ্ডে 20টি গোলা দেয়ালে গিয়ে পড়ে। অতএব প্রতি সেকেণ্ডে দেয়ালে প্রযুক্ত মোট ভরবেগ $= 20 \times 15000000$

অতএব দেয়ালের প্রতি বর্গ সে. মি.-তে প্রতি সেকেণ্ডে প্রযুক্ত বলের পরিমাণ

$$= \frac{20 \times 15\,000000}{100 \times 100} \text{ ডাইন}$$

$$= 3 \times 10^4 \text{ ডাইন}$$

4. বলটি যখন A বিন্দুতে তখন বলটির যথেষ্ট গতি না থাকলে প্রযুক্ত কেন্দ্রাভিগ বলের পরিমাণ যথেষ্ট হবে না এবং ফলে তা কেন্দ্রের দিকে কিছুটা নেমে আসবে। অর্থাৎ বলটির গতিপথ ঐ বৃত্তকে পুরোপুরি অনুসরণ করবে না।

ধরা যাক V_A, A বিন্দুতে বলটির বেগ এবং m বলটির ভর

যদি $m \frac{V_A^2}{R} = mg$ হয়, তবেই বলটি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে পারবে।

$$m \frac{V_A^2}{R} = mg \text{ থেকে } V_A = \sqrt{gR}$$

বলটি যখন B বিন্দুতে নেমে আসবে তখন তার বেগ হবে

$$V_B^2 = V_A^2 + 2.g.2R$$
$$= gR + 4gR$$
$$= 5\ gR$$
$$\therefore V_B = \sqrt{5gR}$$

সুতরাং B বিন্দুতে বলটির অন্ততপক্ষে $\sqrt{5gR}$ গতিবেগ থাকলে তবেই বলটি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে পারবে।

জেনে রাখ

গোলাপ ফুল

গোলাপ ফুলের পাপড়ি থেকে আতর তৈরি করা হয়। পরিমাণে খুবই কম পাওয়া যায়। এক ফোঁটা আতর তৈরি করতে প্রায় এক-শটি গোলাপ ফুল লাগে। বিশেষ ব্যবস্থায় এই আতর তৈরি করা হয়। গোলাপের আতর পীতবর্ণের একটি তৈলাক্ত পদার্থ। এর মধ্যে থাকে কয়েকটি এষ্টার, জিরানিয়ল সাইট্রোনেলল, ফিনাইল-ইথাইল অ্যালকোহল ও কিছু মোমজাতীয় পদার্থ। এই সমস্ত রাসায়নিক উপাদান দিয়ে কৃত্রিম উপায়েও আতর তৈরি করা হয়ে থাকে।

রক্ত গোলাপ ফুলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি পাওয়ার জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর পরিমাণে গোলাপ ফুলের চাষ করা হয়েছিল। এছাড়া, গোলাপ জল, গোলাপ তেল, গোলাপ ফুলের রস নানান অসুখ-বিসুখে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গোলাপের পাপড়ি ও চিনির রস দিয়ে তৈরী খাবার—গুলকন্দ-এর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। গোলাপের জ্যামের কথা তো জানাই আছে।

পার্বতী পাল*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : মুক্তি বেগ কি? পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের উপরিভাগে কোন বস্তুর মুক্তি বেগ কত?

শ্যামলী দে, হাওড়া

উত্তর : পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে কোন বস্তুকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রভাবে তা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলকে অতিক্রম করে যাওয়ার মত উপযুক্ত বেগে বস্তুটিকে ছোঁড়া সম্ভব হলে বস্তুটি তখন পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না। সর্বনিম্ন যে বেগে বস্তুকে ছুঁড়লে তা পৃথিবীতে আর ফিরে আসে না, তাকে মুক্তি বেগ বলা হয়।

M, পৃথিবীর ভর; r, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং m, বস্তুর ভর হলে বস্তুর উপর অভিকর্ষজ বলের পরিমাণ হবে $\frac{GMm}{r^2}$

আবার, অভিকর্ষজ ত্বরণ $= \frac{GM}{r^2}$

তাহলে r দূরত্বে বস্তুটির স্থিতিশক্তি $= \frac{GMm}{r}$

বস্তুটিকে পিছটান কাটিয়ে মুক্তি পেতে হলে তাকে সমপরিমাণ গতিশক্তি অর্জন করতে হবে।

অর্থাৎ $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{r}$

বা, $v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$ ... ...(i)

পৃথিবীর ক্ষেত্রে M, 6×10^{27} গ্রাম; r, 6380 কি. মি. এবং $G = 6.66 \times 10^{-8}$ সি. জি. এস. একক। এই সমস্ত মান উপরের সমীকরণ (i)-এ প্রয়োগ করলে পৃথিবীতে বস্তুর মুক্তিবেগ v-এর মান পাওয়া যাবে। তা হল—

$v \equiv 11.2$ কি. মি./সে.

চাঁদের বেলায় M, 7.2×10^{25} গ্রাম এবং r, 1740 কি. মি. (প্রায়)। অতএব চাঁদের উপরিভাগে $v = 2.4$ কি. মি./সে. (প্রায়)।

সমীকরণ (i) প্রয়োগ করে যে কোন গ্রহের উপরিভাগে মুক্তি বেগের মান জানা যায়। মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের উপরিভাগে কোন বস্তুর মুক্তি বেগের মান যথাক্রমে 5 কি. মি. / সে. (প্রায়), 36·8 কি. মি. / সে. (প্রায়), 10·4 কি. মি. / সে. (প্রায়) ও 60·5 কি. মি./সে. (প্রায়)।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পরিষদের খবর

1. জনসাধারণের সুবিধার্থে অতিরিক্ত সময় পরিষদ খোলা রাখার ব্যবস্থা

পরিষদের সভ্য, ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আগামী 15ই এপ্রিল, 1977, থেকে পরিষদের কার্যালয়, গ্রন্থাগার ও 'হাতে-কলমে কেন্দ্র' নিয়মিত সকাল 10টা থেকে রাত 8টা (আটটা) পর্যন্ত খুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে 'হাতে-কলমে কেন্দ্র' পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী খোলা থাকবে; অর্থাৎ প্রতি বুধবার বিকেল 5টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত এবং প্রতি রবিবার বিকেল 4টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

2. বৈজ্ঞানিক আলোচনা-চক্র

অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত বক্তার অনুপস্থিতিতে গত 20শে মার্চ, 1977, তারিখে পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র'-এ সন্ধ্যা 6টায় একটি আলোচনা-চক্র বসে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন:

শ্রীপূর্ণেন্দু সরকার — বিষয়: আলসার
ডঃ রতনমোহন খাঁ — বিষয়: চেরেনকভ বিকিরণ
শ্রীবিজয় বল — বিষয়: বিজ্ঞানে বস্তুবাদ
ডঃ শ্যামসুন্দর দে — বিষয়: কৌশিক ক্রিয়া, শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাব ও তার প্রয়োগ

আলোচনা-চক্রটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল এবং উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিক কালে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় অনেকগুলি ফিচার (মডেল তৈরি, ভেবে কর, জেনে রাখ, ব্যবহারিক জীবনে বা প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, গবেষণা সংবাদ, শব্দকূট ইত্যাদি) নিয়মিতভাবে সংযোজিত হয়েছে। এই সমস্ত বিভিন্ন ফিচার লিখে পত্রিকাটিকে আরও সুসমৃদ্ধ করবার জন্যে পাঠকদিগকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে হাতে বা ডাকযোগে লেখা পাঠাতে হবে। লেখা মনোনীত হলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ সময়মত প্রকাশ করা হবে।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বলুন তো—

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা এখন এত জনপ্রিয় কেন ??

তবে শুনুন এর কারণ—

—ঃ মাত্র পাঁচটি ঃ—

তা হল—

এক ঃ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন ;

দুই ঃ নানান ধরণের আকর্ষণীয় ফিচার সংযোজন ;

তিন ঃ "বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর"-এ সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান ;

চার ঃ প্রতি মাসে তিনটি করে "মডেল তৈরি"—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসহ প্রকাশ ;

পাঁচ ঃ বিষয়বস্তু নির্বাচনে বহুমুখীনতা।

এছাড়া ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা নিশ্চয়ই রাখে না।

বিজ্ঞান-মানসিকতা উন্মেষের জন্যে একমাত্র মাসিক সচিত্র বিজ্ঞান পত্রিকা—"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"—পড়ুন ও পড়ান।

●

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগটি নব-কলেবরে সুসজ্জিত করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে উদ্বোধন করা হয়েছে।

১ ১ ✻

আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা বেলা দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

●

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারপ্রেস, কলিকাতা-700 009

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

মাসিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	পূর্ণপৃষ্ঠা	অর্ধপৃষ্ঠা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
তৃতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
চতুর্থ প্রচ্ছদপট	250·00 টাকা	—
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপটমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
পঠনীয় বিষয়বস্তুমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	125·00 টাকা	65·00 টাকা
সাধারণ সিকিপৃষ্ঠা	40·00 টাকা	

বিজ্ঞাপনের এই হার কেবলমাত্র এক রঙের জন্যে। বার্ষিক এবং ষান্মাসিক চুক্তিবদ্ধ হলে যথাক্রমে 7½% এবং 5% রিবেট দেওয়া হয়।

বি. দ্র. এই হার নূতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চুক্তিবদ্ধ পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হারই বহাল থাকবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন: 55-0660

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে ঐ পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
"সত্যেন্দ্র ভবন"
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্যে পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র'-এর ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সঙ্গে উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করা যাবে। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাবে। তাঁর সঙ্গে পূর্বে যোগাযোগ করে পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্যগণের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

তাং 27.11.76
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করবার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। একারণে দেশের বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ, বিশেষতঃ লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁরা যেন তাঁদের রচিত কিংবা প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন পুস্তকাদি এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-কে দান করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন।

বর্তমান বছর থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করা হয়েছে। এই বিভাগে নবম শ্রেণী থেকে সুরু করে বি. এস. সি. (পাশ ও অনার্স কোর্স) এম. এস. সি., কারিগরী, মেডিকেল প্রভৃতি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা আছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে নতুন, এমনকি বাড়ীতে অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকাদি দান করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুস্তকাদি প্রেরণ করবার ঠিকানা :
"সত্যেন্দ্র ভবন"
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুক-পোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ | জুন, 1977 | ষষ্ঠ সংখ্যা

পরিষদ সভাপতির আবেদন

ভারতের কল্যাণার্থে ও সমাজ সংস্কারের তাগিদে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে 1947 সালে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ 1947 সালের নভেম্বর মাসেই ৺আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের দ্বারা অনুপ্রাণিত বাংলার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণের নিকট বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও চিন্তাধারা প্রচারের জন্যে 1948 সালের জানুয়ারী থেকে নিয়মিত মাতৃভাষায় (বাংলায়) বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" প্রকাশিত হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে 1949 সালের অক্টোবর মাস থেকে বাংলায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশ সুরু হয়েছে এবং অদ্যাবধি বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রচারের দ্বারা যেমন একদিকে আক্ষরিক জনসাধারণের নিকট (এমনকি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ) বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টা চলল অপরদিকে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সৃষ্টি হল।

পঞ্চদশকের মাঝামাঝি বিজ্ঞানানুরাগীদের আগ্রহ মিটাবার জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগার সংগঠিত হয়। পরিষদের নূতন নিজস্ব ভবন হবার পরেই 1970 সালের কাছাকাছি এই গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ বিজ্ঞানানুরাগীদের জন্যে জনপ্রিয় পুস্তক ও পত্রিকা বিভাগ সংগঠনের চেষ্টা করা হয়। আনন্দের বিষয় এ বছর আচার্য বোসের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থাগার পুনঃসংগঠিত করে নবকলেবরে উদ্বোধন করা হয়েছে। পরিষদের নতুন ভবন নির্মাণ শেষ হবার পরেই

আচার্য বোসের চেষ্টায় ও অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে বিজ্ঞানের আকর্ষণীয় মডেল তৈরি করে কর্মোন্মুখী বিজ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে হাতে-কলমে বিভাগ চালু করা সম্ভবপর হয়েছে। এখানে প্রস্তুত মডেল দিয়ে নানা স্থানে জনপ্রিয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা হয়। আচার্য বসুর মৃত্যুর পর এই বিভাগটিকে সম্প্রসারিত ও সুসংগঠিত করে আচার্য বসুর স্মারক হিসাবে "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে বিভাগ" নামকরণ করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে এর আদর্শ রূপায়ণের কাজ চলছে। এখানে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ মডেলের সঙ্গে প্রয়োজনভিত্তিক ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী বিভিন্ন মডেল তৈরির প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। কারিগরী শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিস্তার অবদান বিশেষ প্রয়োজন—বিশেষ করে দেশের উন্নয়নকল্পে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের হাতে-কলমে বিভাগের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে সাধিত হবে। সমাজে বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও চিন্তাধারা প্রসারের জন্যে আমাদের রাজ্যে বিজ্ঞানের সর্বতোমুখী বিভিন্ন প্রকল্প পরিষদ সুরু করেছেন। এগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্যে প্রথমে জেলাভিত্তিক ও পরে মহকুমা ও গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন প্রয়াস করতে হবে। শুধু শহরে শহরে নয়—গ্রামে গ্রামে পরিষদের নানা শাখা স্থাপন, প্রদর্শনী, জনপ্রিয় বক্তৃতা, বিজ্ঞানের নানা তথ্য নিয়ে ও বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব সার্থক করতে চাই সমবেত প্রয়াস (সরকারী, বেসরকারী, সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত)। আনন্দের কথা, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সাহায্য করেছেন। এর জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ। তাঁদের কাছে আবেদন, এসব প্রয়াসকে সার্থক করার জন্যে তাঁরা নিয়মিত সাহায্য করুন আর বিজ্ঞান পরিষদের প্রত্যেক সভ্য ও সাধারণ বিজ্ঞানানুরাগীদের নিকট আবেদন যে, পরিষদকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তারই রূপায়ণে আপনারা সক্রিয় সহযোগিতা করুন। পরিষদের উন্নতিকল্পে আপনাদের প্রস্তাব ও অভিমত সাগ্রহে গৃহীত হবে।

[1977 সালের বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে]

কম্প্যুটর কি পারে না ?

রমণবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

নানাপ্রকার হিসাবের যন্ত্র (computer), অ্যানালগ ও ডিজিটল কম্প্যুটরের পার্থক্য, ডিজিটল কম্প্যুটরের গঠন ও কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কিছু প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' বেরিয়েছে। এ প্রবন্ধে সেই সবের চর্বিত-চর্বণ আমরা করব না। তবে 'কম্প্যুটর কি পারে না ?' এ প্রশ্নের আলোচনা করতে হলে 'কম্প্যুটর কি?' এবং 'কম্প্যুটর কি পারে ?' এর সামান্য মীমাংসা করা অবশ্য প্রয়োজন।

একটি কথা চলিত আছে যে, "যে কোন কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনীয়, কম্প্যটর সেই কাজই করতে পারে।" কথাটি মিথ্যা নয়। কম্প্যুটরের গঠন বা কার্যক্রমের পুরা বর্ণনা ব্যতীতই এ কথাটি

পদ্ধতি (অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে যোগ দিতে আমরা বিদ্যালয়ে শিখি), সে পদ্ধতি বর্ণনীয়। যে কেউ এ বর্ণনা মন দিয়ে শুনলে বুঝবে। যন্ত্র দিয়েও সংখ্যার যোগ সম্ভব। অন্যদিকে রন্ধন-প্রক্রিয়ার বইয়ে যে লেখা থাকে 'পরিমাণ-মত চিনি মেশান' এটি বর্ণনীয় প্রক্রিয়া নয়, কারণ 'পরিমাণ মত' এই কথাটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ নেই।

'বর্ণনীয় প্রক্রিয়া' কথাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি উদাহরণ আমরা দেখলাম। কিন্তু উদাহরণ ও সংজ্ঞা তো এক জিনিস নয়। গণিতশাস্ত্রের কাছে গ্রাহ্য সংজ্ঞা একটি খাড়া করা দরকার। 'বর্ণনীয় প্রক্রিয়া'র সংজ্ঞা একাধিক তর্কশাস্ত্রবিদ্ ও গণিতশাস্ত্রবিদ্ দিয়েছেন। সব সংজ্ঞাগুলিই মূলত এক।

চিত্র 1
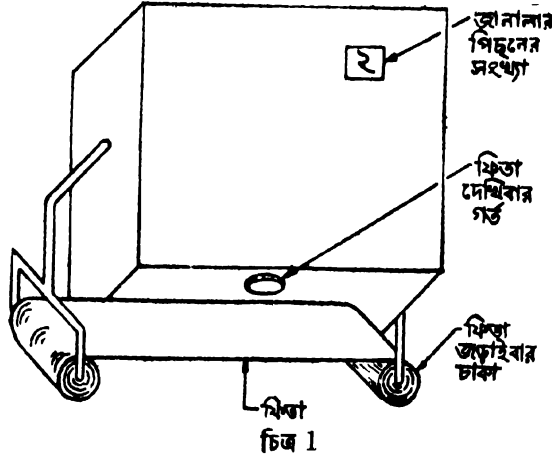
বিশ্বাস করে নিত পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি। তবু একটা খট্‌কা থেকে যায়। 'বর্ণনীয় প্রক্রিয়া' বলতে কি বোঝায় ? উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, দুটি সংখ্যার দশমিক রূপকে যোগ দেবার যে

যে কোন প্রক্রিয়া যদি এক সংজ্ঞা অনুসারে বর্ণনীয় হয়ে তো সেটি অন্যান্য সংজ্ঞা অনুসারেও

---

* টেম্পল্ বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

বর্ণনীয় হয়। কাজেই সব সংজ্ঞার আলোচনা না করে আমরা একটি মাত্র সংজ্ঞার আলোচনা করব। এই সংজ্ঞার জনক ইংরেজ গণিতবিদ্ এ. এম. ট্যুরিং (A. M. Turing)।

মনে করা যাক একটি বাক্স আছে (চিত্র 1)। তার দু পাশে দুটি চাকা। সে দুটির মধ্যে একটি কাগজের ফিতা, তার দু-প্রান্ত ওই চাকায় লাগান।· চাকা ঘুরিয়ে ঐ ফিতা একদিক থেকে আর একদিকে চালাচালি করা যায়। বাক্সের নীচে একটি গর্ত—যার মধ্য দিয়ে ঐ ফিতার একটি ছোট অংশ দেখা যায় এবং সেই গর্তের ভিতর দিয়ে কলম বা রবার কিছু বের করে ওই কাগজে দাগ করা যায় বা মোছা যায়। এ ছাড়া বাক্সের সামনে একটি ছোট জানালার ভিতর দিয়ে একটি সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।

বাক্সটির ভিতর এমন কলকব্জা আছে যার সাহায্যে কলম, রবার ও চাকাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালান যায়। কোন্ ক্রিয়া কখন হবে, তা নির্ভর করে গর্তের তলায় কাগজে কি দেখা যাচ্ছে ও জানালার ভিতর দিয়ে কি সংখ্যা দেখা যাচ্ছে, তার উপর। যন্ত্রের ভিতরের কলকব্জা বদ্‌লে এই নির্ভরতার পরিবর্তন করা যায়।

উদাহরণ হিসাবে মনে করা যাক যে বাক্সটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে জানালায় সংখ্যা থাকবে 1, তখন যদি গর্তের তলায় ফিতায় * দেখা যায় তাহলে সেই * টি অপরিবর্তিত থাকে ও ফিতাটি বাঁ-দিকে এক ঘর সরে যায় অর্থাৎ গর্তটি * বিন্দুটির ডান ধারের কাগজে পড়ে। জানালার সংখ্যাটি 1 থেকে বদ্‌লে 6 হয়। আবার জানালায় 1 থাকলে ও ফিতায় কোন দাগ না থাকলে ('ফাঁক' থাকলে) ফিতাটি বাঁ-দিকে সরে, কিন্তু জানালার সংখ্যাটি 1-এ অপরিবর্তিত থাকে।

উপরের বর্ণনা দুটি ছোট করে এইভাবে লেখা যায়—

1	*	*	ডান	6
1	ফাঁক	ফাঁক	ডান	1

তেমনি আবার ধরা যাক যে, জানালায় যখন 5 সংখ্যাটি থাকবে, তখন যদি গর্তের তলায় ফাঁক থাকে তাহলে সেই ফাঁকের জায়গায় এই ঢ্যারাটি (। চিহ্ন) পড়বে, ফিতা এক ঘর বাঁয়ে সরবে এবং জানালার সংখ্যা বদলে 2 হবে। ছোট করে লিখলে

5	ফাঁক	।	ডান	2

নিচের 1নং তালিকাটি এই ভাবে ভর্তি করা হয়েছে। দেখা যাক যদি বাক্সের কল এই তালিকামত তৈরি হয় তো সে বাক্সে কি প্রক্রিয়া হবে।

মনে করা যাক ফিতার দু-জায়গায় দুটি তারকা চিহ্ন (*) আছে এবং সেই দুটির মধ্যের জায়গায় কয়েকটি ঢ্যারা ও বাকী জায়গা ফাঁক (.)।

এখন বাঁ-দিকের তারকাচিহ্নের বাঁয়ের কোন জায়গা যদি গর্তের নীচে থাকে তো জানালায় 1 থাকে তা হলে কিছুক্ষণ পরে জানালায় থাকবে 0 (ফলে 1নং তালিকা অনুসারে যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবে কারণ জানালায় 0 থাকা অবস্থায় কোন ক্রিয়া বর্ণিত নেই) এবং ফিতাতে দুটি চিহ্নের মধ্যে ঢ্যারাগুলি পাশাপাশি সাজান হয়ে যাবে মাঝে কোন ফাঁক না রেখে। অর্থাৎ প্রথমে যদি ফিতার অবস্থা এই রকম থাকে—

* . . . । . . । . ।। . *

তো যন্ত্র আসার পর হবে এইরকম—

* । । । । । *

1	ফাঁক	ফাঁক	ডান	1
1	*	*	ডান	6
6	।	।	ডান	6
6	.	.	ডান	2
2	.	.	ডান	2
2	।	.	বাঁ	3
3	.	.	বাঁ	3

3	|	|	ডান	5
3	*	*	ডান	5
5	.	|	ডান	2
2	*	.	বাঁ	4
4	*	*	ডান	7
4	.	.	বাঁ	4
4	|	|	ডান	7
7	.	*	ডান	0
7	*	*	ডান	0
6	*	*	ডান	0
7	|	|	ডান	7

1নং তালিকা

ধাপে ধাপে দেখা যাক ব্যাপারটা। মনে করা যাক যে বাঁ-দিকের তারকা চিহ্নের 2 ঘর বাঁয়ে গর্তটি রয়েছে ও জানালায় সংখ্যা আছে 1। অবস্থাটা এই ভাবে দেখান গেল :

1
↓　↓
.　. * . . . | . . | . | | . *

1নং চিত্রের প্রথম ছত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তী অবস্থা হবে

1
↓
. . * . . . | . . | . | | . *

তারপর

1
↓
. * . . . | . . | . | | . *

এবার তালিকার দ্বিতীয় ছত্র অনুসারে

6
↓
* . . . | . . | . | | . *

তারপর চতুর্থ ছত্র অনুসারে

2
↓
. . * . . . | . . | . | | . *

এবং পঞ্চম ছত্র অনুসারে দু'বার

2
↓
. . * . . . | . . | . | | . *

2
↓
. . * . . . | . . | . | | . *

এবার ষষ্ঠ ছত্র অনুসারে

3
↓
. . . * . . . . . . | . | | . *

এবং সপ্তম ছত্র হিসাবে তিনবার

3
↓
. . * . . . . . . | . | | . *

3
↓
. . * . . . . . . | . | | . *

3
↓
. . * . . . . . . | . | | . *

এরপর নবম ছত্র অনুসারে

5
↓
. . * . . . . . . | . | | . *

এবং দশম ছত্র অনুসারে

2
↓
. . * | . . . . . | . | | . *

এইভাবে একটি ঢ্যারা বাঁ দিকের তারকা চিহ্নের পাশে সরে এল। এর পরের অবস্থাগুলি পরপর দেখান গেল চিত্র 2-এ।

চিত্র 2
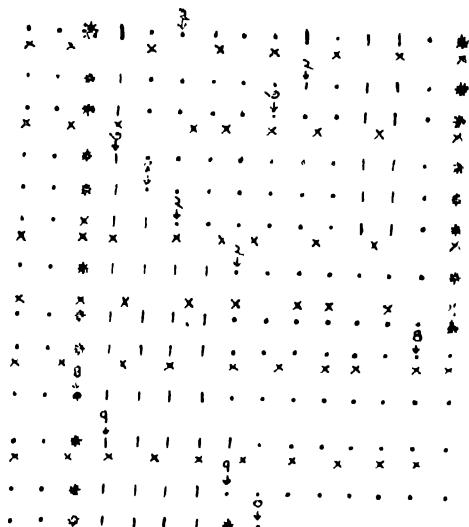
মাঝে মাঝে কিছু ধাপ বাদ দিয়ে দেখান গেল বাকী ধাপগুলি সহজ।

1নং তালিকাটিকে একটি প্রক্রিয়ার বর্ণনা হিসাবে ধরা যেতে পারে। তেমনি যোগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়ার জন্যে বিভিন্ন তালিকা হবে। গাণিতিক প্রক্রিয়ার এই রকম বর্ণনাকে 'ট্যুরিং মেশিন' (Turing machine) বর্ণনা বলে। যে প্রক্রিয়ার ট্যুরিং মেশিন বর্ণনা সম্ভব তাকে 'বর্ণনীয় প্রক্রিয়া' বলে।

যোগ (x+y), গুণ (x.y), এদের পরস্পর যোগে তৈরী সব প্রক্রিয়া (যথা x^5, x^6), তাদের সংবর্তন বা inverse (যথা logarithm, বিয়োগ, ভাগ) প্রভৃতি যত গাণিতিক প্রক্রিয়া ভাবা যেতে পারে, সবই উপরের সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্ণনীয়, এ কথা গণিতবিদ্‌রা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আবার কম্প্যুটর-বিজ্ঞানে যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা দেখেছেন যে বর্ণনীয় সব প্রক্রিয়াই কম্প্যুটরের দ্বারা করা সম্ভব (সময় এবং যথেষ্ট স্মৃতি বা memory থাকলে)। আবার কম্প্যুটর দিয়ে যা করা যায়, তা সব সময়েই বর্ণনীয় কাজেই 'কম্প্যুটর কি পারে না' এর উত্তর পেতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে এমন কোন গাণিতিক প্রক্রিয়া আছে কি না যা উপরের সংজ্ঞা হিসাবে অবর্ণনীয়।

সহজ উদাহরণ কতগুলি মাথায় আসে; যথা "ক্ষীর জাল দেওয়ার সময় যদি পরিমাণ মত চিনি মেশান হয়, তা হলে x সের ক্ষীর করতে কয় সের চিনি লাগে?" এ প্রশ্নের উত্তর মানুষে দিতে পারে না, যন্ত্রে কি দেবে? তার চেয়ে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক, যার একটি গণিতসহ উত্তর আমরা দিতে পারি বা না পারি, উত্তর যে একটি আছে, তা নিঃসন্দেহ।

এ ধরণের বেশ কিছু সংখ্যক প্রশ্ন গণিতবিদ্, তর্কশাস্ত্রবিদ্ ও কম্প্যুটরবিদরা তুলেছেন এবং এখনও তুলছেন। এর মধ্যে থেকে একটি সহজ ও মনোহর প্রশ্নকে আমরা আলোচ্য করব। এই প্রশ্নের প্রথম উত্থাপন করেন হাঙ্গারীর তর্কশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক টি. রাডো (T. Rado)।

মনে করা যাক যে এমন কতগুলি ট্যুরিং মেশিন আছে, যা কাগজে ঢ্যারা কাটতে পারে ও মুছতে পারে শুধু (অর্থাৎ । এবং ফাঁক ছাড়া * ইত্যাদি কোন চিহ্ন যার বর্ণমালায় নেই) আর মনে করা যাক এই জাতের বাক্সগুলির জানালায় 0, 1, 2 এবং তিন, এ ছাড়া কোন সংখ্যা আসে না (এবং আগের মতই, তালিকার কোন ছত্রের প্রথমে 0 থাকে না)। এই রকম বাক্সের জন্যে আমরা 2নং তালিকাটি তৈরি করলাম। এইবার জানালায় 1 এনে একটি সাদা ফিতা (অর্থাৎ যার সব ঘরেই ফাঁক) যন্ত্রে লাগিয়ে দেওয়া গেল। পাঠক যাচাই করে দেখতে পারেন যে কিছুক্ষণ পরে জানালায় 0 এসে থেমে যাবে এবং ফিতায় চারটি ঢ্যারা পড়বে নিম্নলিখিত অবস্থায়

এই তালিকা অনুসারে যন্ত্র চালিয়ে ফাঁকা কাগজে ঢ্যারা পড়ছে চারটি। এর চেয়ে বেশী ঢ্যারা কি এ জাতের যন্ত্রে কাটা যায়, অন্য তালিকার সাহায্যে? পাঠক বলবেন অবশ্যই যায়। আমি যদি তালিকা বানাই

। 1 ফাঁক । ডান 1 ।

তাহলে যন্ত্র অনন্তকাল চলবে ও একাদিক্রমে ঢ্যারা কাটতে থাকবে। এটি এক ধরণের জুয়াচুরী

1	ফাঁক	।	ডান	2
1	।	।	বাঁ	0
2	ফাঁক	।	ডান	3
2	।	।	বাঁ	2
3	ফাঁক	।	বাঁ	2
3	।	।	বাঁ	1

2নং তালিকা

হল। অতএব একটু বদলে প্রশ্ন করা যাক। "যন্ত্রের জানালায় তিনের চেয়ে বড় সংখ্যা না এনে এবং যন্ত্রকে অনন্তকাল চলতে না দিয়ে চারটির চেয়ে বেশী ঢ্যারা কাটা সম্ভব ?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখতে হবে যে জানালায় তিনের বেশী সংখ্যা আসে না এবং ঢ্যারা ও ফাঁক ছাড়া কিছু লেখা যায় না, এমন তালিকা আছে কয়টি।

প্রথম কলমে থাকতে পারে 1, 2 বা 3। তার পরের কলমে ফাঁক বা 1। অতএব কোন তালিকাতেই 6টির বেশী ছত্র থাকতে পারে না। প্রত্যেক সারির তৃতীয় কলমে ফাঁক বা 1, চতুর্থ কলমে বাঁ অথবা ডান, পঞ্চমে 0, 1, 2 বা 3। এই $2\times2\times4=16$ রকম চেহারা প্রতি সারিতে। আবার সব সারি তালিকায় না থাকতে পারে। অর্থাৎ যে কোন সারির চেহারা 17 রকম হতে পারে। তা হলে ছয় সারির বা তার কমের তালিকা হতে পারে 17^6 রকমের।

এই প্রায় সওয়া ছয় কোটি তালিকার মধ্যে কোন কোনটিতে যন্ত্র অনন্তকাল চলবে (উপরের উদাহরণের মত), বাকীগুলি কিছুকালের মধ্যে থামবে। যারা থামবে, তাদের কতগুলি কাগজে কিছু ঢ্যারা কাটবে। কোন্ যন্ত্র কতগুলি ঢ্যারা কাটল দেখে নিলে কয়েকটি যন্ত্র পাওয়া যাবে যারা ফিতায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ঢ্যারা কাটবে।

কাজেই প্রশ্নটি অন্যায় প্রশ্ন নয়। এর উত্তর একটি আছে। এ ক্ষেত্রে গণিতবিদ্‌রা দেখিয়েছেন যে এই সর্বোচ্চ সংখ্যা হল চার। অর্থাৎ 2নং তালিকার চেয়ে ভাল এমন কোন তালিকা নেই যা দিয়ে জানালায় 3-এর চেয়ে বেশী সংখ্যা না এনে চারটির বেশী ঢ্যারা কেটে থামা যায়।

এখন জানালায় যদি 4 পর্যন্ত সংখ্যা আসতে দেওয়া যায় ? পাঠক নিজে চেষ্টা করে দেখতে পারেন—ছয়টির বেশী ঢ্যারা কাটতে পারা যাবে না।

জানালায় 5, 6, 7···ইত্যাদি আনা গেলে সর্বোচ্চ সংখ্যক ঢ্যারা কত হতে পারে, এ প্রশ্ন তা হলে অর্থহীন নয়। মনে করা যাক যে জানালায় x অবধি সংখ্যা আসতে দিলে সর্বোচ্চ সংখ্যক ঢ্যারা কাটা যায় $f(x)$ টি। এখন প্রশ্ন হল, কোন বর্ণনীয় প্রক্রিয়ায় $f(x)$ হিসাব করে বের করা যায় কি না। $f(x)$ বলে একটি সসীম সংখ্যা যে আছে, প্রতি x-এর জন্যে সে তো নিঃসন্দেহ।

মনে করা যাক যে $f(x)$-এর হিসাব বর্ণনীয়। এখন স্মরণ করা যাক যে x^2 ও $x+y$-এর হিসাবও বর্ণনীয়। কাজেই

$$(f(1)+1^2)+(f(2)+2^2)+\cdots\cdots +(f(x)+x^2)$$

এই সংখ্যাটির হিসাবও বর্ণনীয়। এই সংখ্যাটির নাম দেওয়া যাক $F(x)$।

$F(x)$ যখন বর্ণনীয়, তখন এমন একটি ট্যুরিং মেশিন তালিকা তৈরি করা যায় যাতে ফিতায় xটি ঢ্যারা কেটে তার বাঁয়ে গর্ত রেখে জানালায় 1 এনে চালিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পরে যন্ত্র থামবে এবং ফিতায় $F(x)$টি ঢ্যারা পড়বে। অর্থাৎ ফিতায় তিনটি ঢ্যারা প্রথমে থাকলে যন্ত্র থামবে 21টি ঢ্যারা কেটে, প্রথমে চারটি ঢ্যারা থাকলে 43টি ঢ্যারা কেটে, ইত্যাদি।

$F(x)$ এই অপেক্ষক (function) হিসাব করার জন্যে যে তালিকার কথা বলা হল, সে তালিকার বাঁ-দিকের কলমে A-র চেয়ে বড় কোন সংখ্যা নেই। অর্থাৎ যন্ত্র চলার কালে জানালায় সর্বোচ্চ সংখ্যা আসে A। মনে রাখতে হবে যে $F(x)$ সংখ্যাটি সর্বদা $f(x)$ ও x^2 সংখ্যা দুটির চেয়ে বড়। x যদি y-এর চেয়ে বড় হয় তো $F(x)$ সংখ্যাটি $F(y)$-এর চেয়ে বড়।

যন্ত্রে x-এর চেয়ে বেশী সংখ্যা না এনে ফিতায় xটি দ্যারা কাটা যায় নীচের তালিকা অনুসারে।

1 ফাঁক। বাঁ 2

2 ফাঁক। বাঁ 3

× × ×

x ফাঁক। বাঁ 0

এইবার মনে করা যাক যে F(x) হিসাব করার তালিকার প্রথম ও শেষ কলমের প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে x যোগ করা হল (0 তে ছাড়া) ও উপরের তালিকাটি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। তাহলে যে তালিকা তৈরি হল তার অনুযায়ী যন্ত্র চালালে জানালায় কখনও A+x-এর চেয়ে বড় সংখ্যা আসবে না। যন্ত্রটি খালি ফিতায় চালালে যে প্রথম xটি ছত্র অনুসারে xটি দ্যারা কাটবে এবং তার ঘরের ছত্রগুলি অনুসারে F(x)টি দ্যারা কেটে থামবে।

এবার F(x)-এর আরেকটি তালিকা বানিয়ে তার প্রথম ও শেষ কলমের সংখ্যাগুলিতে (0 তে ছাড়া) x+A যোগ করে উপরের তালিকায় জুড়ে দিলে এমন একটি তালিকা পাওয়া যাবে যার অনুযায়ী চালান যন্ত্রে 2A+x-এর চেয়ে বড় কোন সংখ্যা আসে না এবং সেই যন্ত্র খালি ফিতায় F(F(x)) টি দ্যারা কাটতে পারে।

স্মরণ করা যাক যে জানালায় 2A+x-এর বেশী সংখ্যা না এনে কোন যন্ত্র খালি ফিতায় f(2A+x)-এর বেশী দ্যারা কাটা যায় না। উপরের যন্ত্রটি খালি ফিতায় F(F(x)টি দ্যারা কাটতে পারে। অতএব f(2A+x) সংখ্যাটি F(F(x))-এর চেয়ে কম নয় নয় (x যত ছোট বা বড়ই হোক)।

এখন মনে করা যাক x এমন কোন সংখ্যা যাতে x^2, 2A+x-এর চেয়ে বড় হয় (A যত বড়ই হোক, এমন x পাওয়া যাবেই)। সে ক্ষেত্রে F(x) যেহেতু x^2-এর চেয়ে বড়, এবং x^2 যেহেতু 2A+x-এর চেয়ে বড়, সেই জন্যে F(x), 2A+x-এর চেয়ে বড়, সেজন্যে F(x), 2A+x-এর চেয়ে বড়। অতএব F(F(x)), F(2A+x)-এর চেয়ে বড়। কিন্তু F(2A+x) আবার f(2A+x)-এর চেয়ে বড়, অতএব F(F(x) সংখ্যাটি f(2A+x)-এর চেয়ে বড়। কিন্তু আমরা এও জানি যে F(F(x)), f(2A+x)-এর চেয়ে বড় হতে পারে না।

সিদ্ধান্তে আপাতবিরুদ্ধতা দেখা যাচ্ছে। অথচ সিদ্ধান্তটি করার পথে আমরা কিছু পাটিগণিতের নিয়ম ব্যবহার করেছি ও স্বতঃসিদ্ধ ধরেছি যে f(x)-এর হিসাব বর্ণনীয়। অতএব দেখা গেল হয় পাটিগণিতের নিয়ম ভুল, নয়তো f(x)-এর হিসাব বর্ণনীয় নয়। পাটিগণিতের নিয়মের প্রতি যদি পাঠকের কিছুমাত্র আস্থা থাকে তো তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে f(x) হিসাব করার প্রক্রিয়া বর্ণনীয় নয়।

এতে একটি নতুন খট্‌কা উঠছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি যে প্রতি x-এর জন্যে f(x) বলে একটি সংখ্যা থাকতে বাধ্য। এটি প্রমাণ করার জন্যে যে যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটির মূল কথা ছিল, "কোন কোন যন্ত্র ফাঁকা ফিতায় চালালে অনন্তকাল চলবে, আর বাকীগুলি কিছুকালের মধ্যে থামবে।" এখন প্রশ্ন হল, কোন্‌গুলি থামবে তা হিসাব করে বের করা যায় কি করে? সব কটি যন্ত্রকে যদি একসঙ্গে চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুক্ষণ পর পর এক একটি যন্ত্র থামবে এবং সেই যন্ত্রে কাটা দ্যারাগুলি গোনা যাবে। কিন্তু যেগুলি তখনও থামে নি, সেগুলির জন্যে ক্রমাগত অপেক্ষা করে যেতে হবে। কাজেই সর্বোচ্চ সংখ্যক দ্যারা এখনও গোনা হল কিনা যন্ত্র চালিয়ে সেটি বোঝা যাবে না। একমাত্র উপায় হল কোন রকমে তালিকা দেখেই নির্ধারিত করা যে সেটি আদৌ

থামবে কি না। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা নির্ধারণ করা যায়; যেমন—পূর্বোক্ত

1 ফাঁক । ডান 1

তালিকাটিতে। যদি একটি বর্ণনীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে সকল ক্ষেত্রেই এটি নির্ধারণ করা যেত তাহলে উপরের যুক্তি অনুসারে না-থামা যন্ত্র-গুলিকে আগে থেকে বাদ দিয়ে বাকী যন্ত্রগুলির থেকে f(x) হিসাব করা যেত। সেক্ষেত্রে f(x) বের করার প্রক্রিয়াটিও বর্ণনীয় হত। সেক্ষেত্রে এমন একটি সংখ্যা x পাওয়া যেত যে f(2A+x) একাধারে F(F(x)) থেকে বড় অথচ বড় নয়। পাটিগণিতে এমন কোন সংখ্যার দিশা নেই। অতএব স্বীকার করতে হবে যে কোন ট্যুরিং মেসিন থামবে কি থামবে না, তা ঠিক করার কোন সার্বজনীন বর্ণনীয় প্রক্রিয়া নেই।

যাঁরা কম্প্যুটার চালান, তাঁদের কাছে এ কথাটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। কম্প্যুটারকে যখন প্রোগ্রাম করা হয় তখন তার আচরণ হয় ট্যুরিং মেশিনের অনুরূপ—এটি প্রমাণ করে দেখান যায়। এখন এ কথা কম্প্যুটার-পারদর্শীরা জানেন যে প্রোগ্রাম প্রথম চালাবার সময় বহুধা ভুল হয় এবং প্রোগ্রামটিকে বারবার সংশোধন করার দরকার হয়। অনেক সময় ভুলের ফলে কম্প্যুটার একবার চালিয়ে দিলে আর থামতে চায় না। তখন তাকে জোর করে থামিয়ে প্রোগ্রাম সংশোধন করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, এমন কোন উপায় কি আছে—যাতে প্রোগ্রাম যন্ত্রে চড়াবার আগে বোঝা যাবে যে সে প্রোগ্রামে কম্প্যুটার থামবে কি না? সাদা চোখে অনেক ভুল অনেক সময় দেখলেই ধরা পড়ে। কিন্তু সব ভুলই ধরা পড়বে কি? যদি পড়ত এবং ধরবার প্রক্রিয়াটি বর্ণনীয় হত তা হলে এমন যন্ত্র (বা প্রোগ্রাম) বানান যেত যাতে কোন নতুন প্রোগ্রাম কম্প্যুটারে চড়াবার আগে এই যন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখে নেওয়া যেত যে এই প্রোগ্রাম চড়ালে কম্প্যুটার থামবে কি না। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে এরকম বিশ্লেষণ কোন বর্ণনীয় প্রক্রিয়া দিয়ে করা সম্ভব নয়। অতএব প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করার যন্ত্র বা প্রোগ্রাম তৈরি করার চেষ্টা অর্থহীন। এ যন্ত্র অনন্ত-গতি যন্ত্রের (perpetual motion machine) মতই অসম্ভব। অবশ্য তার মানে এই নয় প্রোগ্রাম সংশোধনের কোন কাজই কম্প্যুটারের সাহায্যে হবে না। সাদা চোখে যে সব ভুল ধরা পড়ে (এবং যে সব ভুল বারবার হয়) সেগুলি ধরবার জন্যে প্রোগ্রাম বানান অবশ্যই সম্ভব।

এই বিশ্লেষক যন্ত্রের মতই বহু অসম্ভব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কম্প্যুটার-বিজ্ঞানে বারবার হয়। বারান্তরে স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রাম ও কম্প্যুটারের ভাষা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা আছে তখন এ প্রশ্ন আবার উঠবে।

শ্রীনিবাস রামানুজন

শ্রীমনোরঞ্জন শিকদার*

আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকের দেশ ভারতবর্ষও যে আধুনিক গণিত ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে কিছুমাত্র অবদান রেখে যেতে সক্ষম, তা ছিল পাশ্চাত্যবাসীদের ধারণারও অতীত। এই বদ্ধমূল ধারণার মূলে প্রথম যাঁরা আঘাত হানেন শ্রীনিবাস রামানুজম তাঁদেরই একজন। বস্তুতপক্ষে তাঁর আবির্ভাব অনেকটা উল্কার ন্যায়। উল্কার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির মতই ছিল তাঁর প্রতিভা-দীপ্তি। উল্কার মতই ছিলেন ক্ষণস্থায়ী; উল্কার মতই ঘটে তার আকস্মিক তিরোভাব। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জীবনে নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি যে অপূর্ব মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে যুগপৎ বিদেশীদের চমৎকৃত এবং স্বদেশীয়দের অক্ষমতার কলঙ্ক অপনোদন করেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। তাঁর জীবন-সংগ্রামের কাহিনী ভারতীয় বিজ্ঞান সাধকগণের নিকট চিরকাল আদর্শ ও প্রেরণার উৎসরূপে পরিগণিত হবে।

শ্রীনিবাস রামানুজন মাদ্রাজের (বর্তমান তামিল-নাড়ুর) তাঞ্জোর জেলার এরোদ গ্রামে 1887 সালের 22শে ডিসেম্বর এক ধার্মিক ও ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের কয়েক বছর পরও যখন তাঁদের কোন সন্তানাদি হল না তখন রামানুজনের পিতা-মাতা স্থানীয় দেবতা নামগিরির নিকট কন্যাসন্তানের জন্যে প্রার্থনা করেন। এর পরই তাঁদের প্রথম সন্তান রামানুজনের জন্ম হয়। রামানুজনের পিতা কুম্বকোনামের জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ীর স্বল্প বেতনের কর্মচারী ছিলেন। ফলে আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছিল নিত্য সহচর; কিন্তু পিতা খুবই মিতব্যয়ী থাকায় ঐ অল্প আয়েই কোনক্রমে জীবিকানির্বাহ করতেন।

পাঁচ বছর বয়সে রামানুজনের বিদ্যারম্ভ হয় এবং সাত বছর বয়সে পৈত্রিক কর্মস্থল কুম্বকোনামের উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অতি শৈশব কাল থেকেই তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তির কিছুকাল পর জনৈক সতীর্থ কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত কারের 'Synopsis of the Pure Mathematics' নামক সাধারণ শ্রেণীর একখানা গণিত পুস্তক তাঁর জীবনে নবঅধ্যায়ের সূত্রপাত করে এবং তিনি গণিত-শাস্ত্রকেই প্রধান চর্চার বিষয়রূপে গ্রহণ করেন।

বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন এবং পারতপক্ষে বিশেষ কারোর সঙ্গে মিশতেন না। ফলে বৃত্তিভোগী ছাত্র হয়েও তিনি বিশেষ কারো দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন নি। তিনি নির্জনে বসে নানাবিধ গাণিতিক সমস্যা সমূহের সমাধান ও তদসম্পর্কিত চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। অর্থাভাবে অন্য কোন পুস্তক সংগ্রহে অসমর্থ হয়েও শুধুমাত্র কারের ঐ পুস্তকটি পাঠের জ্ঞানকে অবলম্বন করেই স্বীয় প্রতিভাবলে নানাবিধ গাণিতিক সূত্রাবলী আবিষ্কার করতে থাকেন। পরে দশ বারো বছর বয়সে লোনীর পাঠ্য-পুস্তক "সমগ্র ত্রিকোণমিতি" সম্পূর্ণ অন্যের সাহায্য ব্যতীত আয়ত্ত করেন এবং বিষুব রেখার নির্ভুল দূরত্ব নির্ণয়ে সক্ষম হন। এর অব্যবহিত পরেই অয়লারের বিখ্যাত উপপাদ্যটিও নিজেই প্রমাণ করেন।

বিশ্বের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল

---

* জাখিরপুর, পোঃ দেবীপুর, পঃ দিনাজপুর

সূত্রাদি আবিষ্কার করেছিলেন রামানুজন সে সম্পর্কে কোন কিছুই অবহিত ছিলেন না অথচ তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সেগুলির অনেক কিছুই নূতনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল এমনই রহস্যময় যা যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা এক দুরূহ ব্যাপার। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানির' মতই নানাবিধ গাণিতিক সূত্র তার মাথায় খেলে যেত। যেমন এক ফেরিওয়ালা কতকগুলি বড়ি বিক্রয়কালে বলে যে তার সকল বড়িই এক আনা করে কেবল এই বড়িটির দাম আট আনা। ব্যস তৎক্ষণাৎ তিনি সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীসূত্র মানসচক্ষে দেখতে পেলেন, এমনকি নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরেও বহু অনুরূপ নবাবিষ্কৃত সূত্র লিপিবদ্ধ করতে দেখা গেছে। এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে তিনি বলতেন স্বপ্নে ঈশ্বর তাঁকে নানাবিধ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করান। আর এই সূত্রগুলি তারই ফল। কিন্তু এ উত্তর কখনই যৌক্তিক তথা বিজ্ঞান-সম্মত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মস্তিষ্ক ছিল সতত ক্রিয়াশীল এবং এমনকি নিদ্রামগ্না-বস্থাতেও সমান সক্রিয় থাকত আর তার ফলেই পেতেন নানা সমস্যার সমাধানসূত্র।

রামানুজন 1903 সালে ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গণিত-শাস্ত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে একটি বৃত্তিও লাভ করেন। তারপর মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। তিনি গণিতচর্চায় অধিকতর আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তাঁর অর্থ সঙ্কট তীব্র হতে থাকে শুধুমাত্র গণিতচর্চায় অধিকতর নিমগ্ন থাকায় অপরাপর পাঠ্যবিষয়াবলী বিশেষত ইংরেজী, দর্শন প্রভৃতি বিষয় স্বভাবত অবহেলিত হয়, তদুপরি প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপস্থিতি না থাকায় নিয়মিত পরিক্ষার্থীরূপেও পরীক্ষাদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। 1906 সালে তিনি অনিয়মিত পরীক্ষার্থীরূপে এফ. এ পরীক্ষা দেন। ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন; যদিও শুধুমাত্র গণিতের ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। কারণ গণিতশাস্ত্রে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও ইংরেজী, দর্শন প্রভৃতিতে উত্তীর্ণ হতে বিফল হয়েছেন। তাঁর বৃত্তিও বাতিল হয়ে যায়। এতে তিনি অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এর পর তিনি প্রথমে ভিজাগপট্টম ও পরে মাদ্রাজ যান। মাদ্রাজে 1907 সালে পুনরায় কলাবিষয়ে পরীক্ষা দেন কিন্তু ফলাফল পূর্ববৎ হওয়ায় আর কোন দিন পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করেন নি। এই সময় তাঁর অর্থসঙ্কট চরম পর্যায়ে ওঠে। এই চরম দুর্দিনে এবং প্রবল দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি যখন তাঁর প্রিয় বিষয় গণিতচর্চায় নিমগ্ন হতেন, কেবলমাত্র তখনই যাবতীয় জাগতিক গ্লানি-ক্লেশাদির অনেক উর্ধ্বে এক বিমলানন্দলোকে বিচরণ করতেন।

রামানুজনের শিক্ষাজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় অদক্ষতা তাঁর বিপর্যয়ের প্রধানতম কারণ। তিনি ফরাসী বা জার্মান ভাষাও জানতেন না। অথচ তৎকালে সকল বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদিই ছিল এই সকল ভাষায় রচিত। সেজন্যে রামানুজনের পক্ষে যে কোন প্রামাণ্য পুস্তকাদির সাহায্যগ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। ফলে তাকে গণিতচর্চায় কঠোর পরিশ্রম করতে হত। অথচ রামানুজন যদি এই সকল পুস্তকাদি তাঁর মাতৃভাষা তামিলে পেতেন তবে কখনই তাঁকে জ্ঞান লাভের জন্যে এত শ্রমস্বীকার করতে হত না। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সেই অবাঞ্ছিত ধারা এখনও সমানে চলছে।

1909 সালে রামানুজন জানকীদেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সময় চাকুরীর চেষ্টাও করতে থাকেন। কর্মসংস্থানের জন্যে বহু-স্থান পরিভ্রমণের পর জনৈক বন্ধুর নিকট

মাদ্রাজ পোর্টে একটি ক্ষুদ্র করণিক পদের কথা জানতে পারেন। উক্ত পদের দরখাস্তে একটি সুপারিশ গ্রহণের জন্তে নেলোরের দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্ররাও-এর নিকট গমন করেন। রামচন্দ্ররাও স্বয়ং গণিতজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামানুজনের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর গাণিতিক প্রতিভার কথা উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি সুপারিশ তো করলেনই উপরন্তু বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম করার জন্তে একটি বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন। যাই হোক, ঐ সহৃদয় বন্ধুটির প্রচেষ্টা ও মহানুভব রামচন্দ্ররাও-এর সুপারিশে রামানুজন পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে ঐ পদে বহাল হন। চাকুরির বেতন ও রাও নির্দিষ্ট ভাতায় রামানুজনের অর্থকৃচ্ছ্রতা অনেকটা লাঘব হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে গণিতচর্চায় আত্মনিয়োগে আর কোন বাধা রইল না।

তাঁর জীবনের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল "দি জার্নাল অফ দি ইণ্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে" 1911 সালে প্রকাশিত হয়। এর ফলে অনেকের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বর্তমানের মত এত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। সেহেতু অনেকের অনুরোধে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডির (G. H. Hardy) সঙ্গে যোগাযোগ সংস্থাপন করেন। সে সময়ে অধ্যাপক হার্ডি ছিলেন বিশেষ প্রভাবশালী অধ্যাপক। রামানুজন অধ্যাপক হার্ডিকে একটি চিঠি এবং কিছু গবেষণা-পত্র প্রেরণ করেন। অধ্যাপক হার্ডি ঐ চিঠি ও গবেষণা-পত্র পেয়ে অত্যধিক বিস্মিত হন। পত্রোত্তরে তিনি রামানুজনকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক হার্ডি তৎকালে ভারতে রামানুজনের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চার প্রতিকূল পরিস্থিতির কথাও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি রামানুজনকে ইংল্যাণ্ডে আনবার জন্তে চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। রক্ষণশীল মা সমুদ্রযাত্রা করলে পুত্র জাতিচ্যুত হবে এই ভয়ে বাধা দেন। কিন্তু পরে অবশ্য এই বাধা দূর হয় এক অলৌকিকভাবে। মা স্বপ্নাদেশ পান। আর রামানুজনও মায়ের সম্মুখে কঠোর নিরামিষ ভোজনাদিসহ পারিবারিক সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্য সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করে চলবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।

অবশেষে অধ্যাপক হার্ডি ও তাঁর বন্ধু নেভিলির (Neville) চেষ্টায় রামানুজন ইংল্যাণ্ড গমন করেন। তিনি মাদ্রাজ থেকে 250 পাউণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডে 50 পাউণ্ড বার্ষিক বৃত্তি লাভ করেন।

কেম্ব্রিজে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন যে, এতকাল তিনি যা কিছু আবিষ্কার করেছেন তার কিছু কিছু বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি এই সব আবিষ্কারের কথা জানতেন না। সুতরাং তাঁর আবিষ্কার মৌলিক চিন্তার ক্ষমতার স্বাক্ষর। এছাড়াও অধ্যাপক হার্ডি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, রামানুজনের প্রতিভা যেমন আশ্চর্য তেমনি গণিতশিক্ষা অসম্পূর্ণ, 'ফেমন ফাংশন অফ এ কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল' (function of a complex variable) সম্পর্কে তাঁর পরিচিতি বিশেষ কিছু ছিল না, অপর পক্ষে 'কনটিনিউড ফ্রাকশন' (continued fraction), 'কমপ্লেক্স মালটিপ্লিকেশন' (complex multiplication প্রভৃতি ব্যবহারের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। সে যাই হোক, কেম্ব্রিজের অনুকূল পরিবেশে হার্ডি নেভিলি, লিটলউড প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহৃদয় অধ্যাপকবৃন্দের সহযোগিতায় রামানুজন অতিবিস্ময়কর দ্রুতগতিতে সম্যক জ্ঞান-আহরণ করতে লাগলেন। আর সেই সঙ্গে গবেষণাও চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর প্রতিভা সর্বত্র স্বীকৃত হয়। এরই ফলে 1918 সালে তিনি সুবিখ্যাত রয়াল সোসাইটির

সদস্যপদে বৃত হন। এর পরবর্তী গবেষণাগুলি অধিকতর আধুনিক গাণিতিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালীন রামানুজন স্বপাক ও নিরামিষ ভোজন করতেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। রামানুজন জনৈক বন্ধুগৃহে ভ্রমক্রমে ডিমসহযোগে তৈরী কেক খেয়ে পরে তা জানামাত্র ঐ স্থান ত্যাগ করে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে প্যাডিংটন ষ্টেশনে জার্মান বোমা বর্ষণের কবলে পতিত হন। কিন্তু নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণজনিত পাপ করে তাঁর এত অনুশোচনা হয় যে সে বোমা বর্ষণকে ঈশ্বরনির্দিষ্ট শাস্তিবিধান মনে করে তা বরণ করবার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি সেযাত্রা রক্ষা পান। তাঁর মত গণিতজ্ঞের এ কি অদ্ভুত কুসংস্কার।

রামানুজন অসাধারণ অধ্যবসায়ী ছিলেন। বিলাতে প্রবাসকালে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্র-তীরে ভ্রমণের সময় একদা বন্ধুটি তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। রামানুজন তাঁকে হাতের বহু ঘর্ষণজনিত একটি কর্কশ স্থান দেখিয়ে বলেন যে, আমাকে প্রতিভাশালী করতে এই স্থানের এই অবস্থা। পরে ব্যাখ্যা করে বলেন যে পয়সার অভাবে তিনি কাগজ কিনতে পারতেন না তাই শ্লেট-পেন্সিলে অঙ্ক কষেন আর হাতের ঐ কর্কশ স্থাটি দিয়ে তা মুছতেন। কাগজে লিখলে মাসে চার-পাঁচ রিম কাগজ তাঁর লাগত।

ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সুগভীর অধ্যবসায়ের ফলে যখন তিনি সবেমাত্র অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফলগুলি প্রকাশ সুরু করেছেন ঠিক তখন 1917 সালের প্রথম দিকে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে একটা নার্সিং-হোমে ভর্তি করা হল। চিকিৎসকগণের পরীক্ষায় তাঁর দেহে মারাত্মক যক্ষ্মারোগের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। জীবনের অধিকাংশ সময়েই অত্যধিক অভাব-অনটনহেতু উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হলেন। সেযুগে যক্ষ্মারোগের এত ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। তবুও হার্ডি প্রমুখের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসকগণের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি সুস্থ হতে থাকেন এবং 1919 সালে পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিছুকাল দেশে অবস্থানের পর পুনরায় কেম্ব্রিজ প্রত্যাগমন করেন। তারপর তাঁর অসুস্থতা আবার যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাঁকে পুট্‌নে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি জটিল 'থিটাফাংকশন'-এর উপর নিবন্ধ রচনা করেন। যার উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক ওয়াটশন লণ্ডন গণিত সমিতিতে ভাষণ দান করেন। এই সময় প্রায়শই অধ্যাপক হার্ডি ও রামানুজনের গুণগ্রাহী অধ্যাপকবৃন্দ তাঁকে দেখতে যেতেন। এরূপ একদিন অধ্যাপক হার্ডি ও ডঃ লিটলউড রামানুজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা যে ভাড়াগাড়ীতে এসেছিলেন তার নম্বরটা ছিল 1729। যথারীতি কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক হার্ডি বললেন—দেখ রামানু-জন, এই যে 1729 সংখ্যাটির কোন বিশেষত্ব দেখতে পাচ্ছ কি? আমার মনে হয় এর কোন বিশেষত্বই নেই।

রামানুজন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠলেন—বললেন—না-না। তা কখনই নয়? বরং এই সংখ্যাটিই হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যারাজ্যে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। এটি দুটি সংখ্যার ত্রিঘাতের সমষ্টিরূপে দু-ভাবে প্রকাশিতব্য।

$$1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 7^3$$

উভয়েই একযোগে চমকে উঠলেন। পরে বিস্ময়ের ঘোর কাটলে লিটলউড একটা ছোট সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন 'সকল স্বাভাবিক সংখ্যাই রামানুজনের বন্ধু'।

1920 সালের 26শে এপ্রিল মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ভারতবর্ষের এই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রামানুজনের মৃত্যুতে আহূত শোকসভায় হার্ডি যে উক্তি করেছিলেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক হার্ডি বলেছিলেন যে, রামানুজনকে শেখাতে গিয়ে আমি যত না তাঁকে শিখিয়েছি, আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে শিখেছি ঢের বেশি। অধ্যাপক হার্ডির ন্যায় খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিকের এই উক্তি রামানুজনের প্রতিভা মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীনিবাস রামানুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামে রামানুজন ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত সরকার তাঁর স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও শ্রীনিবাস রামানুজনের নাম তাঁর দেশবাসীর নিকট প্রায় অপরিজ্ঞাত। কারণ এদেশীয় ভাষায় তাঁর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থের একান্তই অভাব। বহুদিন পূর্বে অর্থাৎ রামানুজনের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরই তাঁর জনৈক গুণগ্রাহী বিলাতি অধ্যাপক রামানুজনের একখানা জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তারপর অতি সম্প্রতি জনৈক মাদ্রাজী অধ্যাপক ডঃ এস. আর রঙ্গনাথন আর একখানা জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বলা বাহুল্য এই উভয় পুস্তকই ইংরেজী ভাষায় লেখা। আর এই জন্যে অবস্থার ইতরবিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। এছাড়াও অধ্যাপক হার্ডি তাঁর 'কালেক্টেড পেপার অফ শ্রীনিবাস রামানুজন' সংকলনে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েছেন। আর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ব্যক্তিপরিচিতি বিভাগেও রামানুজনের জীবনী রয়েছে। অথচ আমাদের কোন অভিধানেই এটা পাওয়া যায় না। এমনকি বর্তমান পাঠক্রম অনুযায়ী নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যগণিতের পরিশিষ্টে যে গণিতজ্ঞদের জীবনী দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে রামানুজনের জীবনীর উল্লেখ নেই।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র"-এ একটি জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণকে উক্ত বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বক্তা: অধ্যাপক সন্তোষকুমার ঘোড়ই **বিষয়বস্তু: তরঙ্গ প্রসঙ্গ**

সময়: 19শে জুন রবিবার 1977, বিকাল 5-30টা

সবুজ বিপ্লব ও জীবাণু-সার

সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়*

পৃথিবীতে আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ যে তুলনামূলকভাবে উন্নতির দিকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে তার একমাত্র কারণ হল তাদের খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। খাদ্যের দুশ্চিন্তা নেই বলেই তারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য মানবিক উৎকর্ষের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে পেরেছে ও সফলকাম হয়েছে।

আমাদের দেশে বহু লোক এখনও দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তাদের সকলের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে হলে দেশকে আগে খাদ্যসম্ভারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। আর তার জন্যেই আমাদের দেশে আশু প্রয়োজন এই সবুজ বিপ্লবের। ইতিমধ্যে আমাদের দেশের গবেষকেরা নিজেদের কর্তব্যে সচেতন হয়ে বহু দূর অগ্রসরও হয়েছেন। তার ফলস্বরূপ অনেক সঙ্করজাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। আগে যেখানে বছরে একবার একটি ফসল ফলতো এখন একাধিকবার সেই ফসল ফলছে, ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে করে খাদ্যসমস্যার সমাধান হয়তো আংশিক হয়েছে কিন্তু চাহিদা পূরণ হয় নি।

সবুজ বিপ্লব অর্থাৎ পর্যাপ্ত ফসল ফলাবার সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা—এই প্রচেষ্টায় সর্বভারতীয় কৃষি ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষকেরা একজোট হয়ে কাজে নেমেছেন—তাঁদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অবশ্যই এক ও অভিন্ন কিন্তু পথ বা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন।

কোন কোন গবেষক হয়তো সঙ্করায়ন (breeding) পদ্ধতির দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছেন, কেউ কেউ রোগের হাত থেকে গাছ-পালাকে বাঁচিয়ে রেখে কি করে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারা যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করছেন। আবার কেউবা জীবাণু জগৎকে সার হিসাবে কাজে লাগিয়ে স্বল্প খরচে বেশি উৎপাদনের প্রয়াসে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

এই প্রচেষ্টায় মাটিতে জীবাণু-সারের প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই পদ্ধতি অতীব সরল ও অল্প আয়াসসাধ্য। কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিশ্লেষণ তত সরল নয়। এই নিবন্ধে সংক্ষেপে তার কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

জীবাণু-জগত (microbial world) কথাটির ব্যাপ্তি অনেকটা। নানান ধরনের জীবাণু এদের মধ্যে পড়ে—তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা আমাদের এই সবুজ বিপ্লবকে সফল করার প্রয়াসে কাজে লাগছে। এই জীবাণু জগৎকে যখন কৃষিকার্যে সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে জীবাণু-সার বলা হয়। এদের মধ্যে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী (nitrogen fixer) জীবাণুদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ জীবাণু-সার তৈরির কাজে এরা কাজে লাগে। শৈবাল (algae), ছত্রাক (fungus) এবং ব্যাকটিরিয়া (bacteria) বিভাগের কিছু কিছু সদস্য আছে, যাদের এই নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষমতা আছে।

শৈবালের কথা ধরা যাক। নীলাভ-সবুজ শৈবাল (blue green alga), যাদের বর্ষাকালে রাস্তা-ঘাটে, বাড়ীর আনাচে-কানাচে আমরা প্রায়ই দেখি থক-থকে হয়ে জমে থাকতে। যার উপর পা পড়লে অনেকে পিছলে পড়ি, এদের সংখ্যাও বেশ কিছু, তবুও 'নষ্টক' (Nostock)

* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাপবাগ, বর্ধমান

নামক এই শ্রেণীর শৈবালটির কথা এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষা করে দেখা-গেছে যে, এই নীলাভ-সবুজ শৈবাল থাকলে ফসলের পরিমাণ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পায়! এই নিয়ে বর্তমানে নানান গবেষণা চলছে।

ছত্রাক সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছু কিছু ছত্রাক আছে, যারা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করতে পারে। অ্যাস্পারজিলেসি (Aspergillaceae) শ্রেণীভুক্ত 'ট্রাইকোফাইটন' (Trichophyton)-র নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এর উপরে এখনও বিশেষ কিছু কাজ হচ্ছে না।

এবার আসা যাক ব্যাক্টিরিয়ার কথায়। এদের মধ্যে ছুটি ভাগ আছে। একদল আছে যারা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে, যাদের বলা হয় 'ফ্রি-লিভিং নাইট্রোজেন ফিক্সার' (free living nitrogen fixer) আর একদল আছে যারা অপর উদ্ভিদের সাহায্য ব্যতীত এই কাজ সম্পাদন করতে পারে না। তাদের বলা হয় সিমবায়োটিক (মিথোজীবী) নাইট্রোজেন ফিক্সার (symbiotic nitrogen fixer)। অ্যাজোটোব্যাক্টর, রাইজোবইনকিয়া প্রভৃতি জীবাণুরা প্রথম দলের সদস্য আর রাইজোবিয়াম নামক জীবাণু দ্বিতীয় দলের সদস্য।

কিন্তু এই জীবাণুরা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে কেমন করে কাজে লাগায়, সেটাই হল মূল প্রশ্ন। এই সকল জীবাণুর দেহে নাইট্রোজেনেস (nitrogenase) নামে একপ্রকার এনজাইম (enzyme) আছে, যা নাইট্রোজেন বন্ধনে কাজে লাগে। প্রথমে এরা নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ার (এক ধরণের যৌগ বা নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন এই ছুই মৌলের সংমিশ্রণে তৈরি হয়) আকারে গ্রহণ করে পরে এই অ্যামোনিয়া প্রথমে নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেট যৌগে রূপান্তরিত হয় এবং জীবাণু-কোষগুলি ভেঙে গিয়ে এই নাইট্রেট যৌগ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তখন উদ্ভিদ মূল ও মূলরোমের সাহায্যে সেই যৌগকে নিজের দেহে শোষণ করে নেয়।

প্রথমে যে জীবাণুকে সার হিসাবে ব্যবহার করা হবে সেটিকে কৃত্রিম রাসায়নিক মাধ্যমের (artificial chemical medium) মধ্যে বৃদ্ধি ঘটানো হয়। পরে এই জীবাণুকোষগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ করে আলাদা করে নেওয়া হয় এবং পুনরায় অল্প পরিমাণ মাধ্যম (medium) ঐ জীবাণুকোষ-এর সঙ্গে মিশিয়ে তার জলীয় পদার্থকে —30°C তাপমাত্রায় শুকিয়ে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা লাইয়োফিলাইসেসন (lyophilization)। এর পর পাঁকজাতীয় মাটির সঙ্গে এদের মিশ্রিত করে সেই মাটিকে বাতাসে শুকিয়ে নেওয়া হয়। মাটি ছাড়া কিছু পরিমাণ কয়লার গুঁড়াও মিশ্রিত করা হয়। শুকিয়ে যাবার পর হাতে করে গুঁড়িয়ে প্যাকেটে পুরে ফেলা হয় এবং বাজারে বিক্রি করা হয়।

রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে জীবাণু-সারের প্রয়োগ ভালভাবেই সুরু হয়ে গেছে এবং এনিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, যথা—বসু বিজ্ঞান মন্দির, কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে যে জীবাণু-সার বছরে একর প্রতি 20 থেকে 40 পাউণ্ড নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য এটা অ্যাজোটোব্যাক্টরের ক্ষেত্রে। রাইজোবিয়ামের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ আরও বেশী।

তাই আজ আমাদের দেশের চাষীভাইদের এই জীবাণু-সারের প্রয়োজন এবং প্রয়োগপদ্ধতি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে, কোথায় গেলে এই সার কিনতে পাওয়া যাবে, কিভাবে তাকে কাজে লাগাতে হবে—তাও জানিয়ে দিতে হবে। পরিশেষে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সঠিক ভাবে তা কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা।

পরিবহন সমস্যা

(1)

শ্রীমহাদেব দত্ত

মানব জীবনের মান উন্নয়নে নানাভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়েছে। আবার এই বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে গিয়ে মানব জীবনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে খুব অল্পই শহর আছে যেখানে পরিবহন সমস্যা নেই। বর্তমানে পরিবহনের সুবিধার জন্যে উন্নত দেশে নানা ধরণের মোটর গাড়ী ব্যবহার করা হচ্ছে ও সেখানে নানা ধরণের বড় বড় সড়ক আছে। প্রায় প্রত্যেক ঘনবসতি এলাকায় বিশেষ করে বাণিজ্য এলাকায় গাড়ীর ভিড়ে সব গাড়ী থেমে যেতে বাধ্য হয় অর্থাৎ জ্যাম্ সৃষ্টি হয়। কাজেই এ সমস্যা নিয়ে উন্নত দেশের এমন কি ভারতের মত উন্নতশীল দেশেও নানা চিন্তা করা হয়েছে। দূরগামী গাড়ীগুলিকে শহরের সাধারণ রাস্তায় ব্যবহার করতে না দিয়ে বড় বড় জাতীয় সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পশ্চিম জার্মানীতে এই শতাব্দী গোড়ার দিকে তৈরি হয়েছিল মোটরের রাস্তা (auto-bahm)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে জাতীয় উচ্চ সড়ক (national highways) ও টার্নপিক (turnpike) আছে। এই রাস্তাগুলিকে শহরের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সব গাড়ীর কোন একটি শহরে কোন কাজ নেই সে সব গাড়ী ঐ সব সড়ক দিয়ে সরাসরি চলে যায়। আর যে সব গাড়ী কোন শহরের ভিতরে যেতে চায় সেগুলি ঐ সব সড়কের পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে ঢোকে।

খুব ব্যস্ততার সময় এসব সড়ক দিয়ে গাড়া ঝাঁকে ঝাঁকে চলে। স্বভাবতঃই একই সারি দিয়ে যে সব গাড়ী চলে তাদের গতি মোটামুটি একই রকম থাকে। কিন্তু পাশাপাশি সারির গাড়ীগুলির গতি কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন রকম হলে চলে। আবার যেগুলি কোন শহরে নেমে যাচ্ছে সেগুলি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পাশের সারি দিয়ে সরে যায়। কাজে কাজেই পাশের সারির পিছনের গাড়ীগুলির গতি কিছু কমিয়ে আনতে বাধ্য করে। আবার শহর থেকে কোন নূতন করে গাড়ী সড়কে এলে তাকে পাশের সারিতে ঢুকতে হয়। কিন্তু তাকে তাড়াতাড়ি অনেক দূরের শহরে যেতে গেলে ক্রমশঃ ভিতরের দিকে আসতে হয়। কাজে কাজেই এই অবস্থায় সড়কের পরিবহন সমস্যার সঙ্গে নদীর বা বড় পাইপের মধ্যে তরল পদার্থের প্রবাহের অনেকটা মিল আছে। অবশ্য যদি নদীতে মাঝে মাঝে শাখা-নদী জল নিয়ে এসে পড়ে বা খাল, নদী থেকে জল নিয়ে বেড়িয়ে যায়। এখন যদি সামনে কোন গাড়ী অচল হয়ে যায় বা অন্য কোন রকমে বাধার সৃষ্টি হয় তবে পিছনের গাড়ীগুলির গতিবেগ কমিয়ে থামিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ রাস্তায় জ্যাম্ সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় কোন একটি নিশ্চল কঠিন বস্তুর চারপাশ দিয়ে তরল পদার্থ গেলে বিঘ্ন অংশ (wake) তৈরি হয়—একথা সবাই জানেন। এটাও অনেকটা জ্যামের মত।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে এই রকম পরিবহন সমস্যা তরল পদার্থের বলবিদ্যার (fluid-mechanics) সাহায্যে আলোচনা ও সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। আবার তা হলে গাণিতিক তরল পদার্থ বলবিদ্যার মত করে এই সমস্যায় গাণিতিক সমাধানের চেষ্টা

করা যেতে পারে। এটিকেও একটি গাণিতিক মডেল ধরা যেতে পারে। বর্তমানে গাণিতিক মডেল দিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচলন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু যে সময় সড়কে গাড়ীর ভিড় থাকে না, কেবল কিছু গাড়ী ঐ সকল পথ দিয়ে যায়, তখন গাড়ীর চালকেরা ইচ্ছামত বেগে গাড়ী চালাতে পারে ও সামনে গাড়ী পড়লে পাশ কাটিয়ে একটু অল্প বেগে যেতে পারে। এই সময়ে সড়কের পরিবহন সমস্যার মডেলটি বহু অংশে অনেকটা গ্যাসের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্বের মত (kinetic theory of gases)।

উপরে যে ভাবে পরিবহন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা গেল তা আজকের পরিবহন গতিবিজ্ঞান (traffic dynamics) নামে পরিচিত। এই বিষয়ে উন্নত দেশে আলোচনা ও গবেষণা চলছে ও এভাবে পাওয়া জ্ঞান দিয়ে পরিবহন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে।

এখানে পরিবহন সমস্যার কেবল একটি দিক নিয়ে কিভাবে চেষ্টা চলছে আমরা তা আলোচনা করলাম। পরিবহন সমস্যার অন্য দিক নিয়েও নানা মডেল (ভৌতিক ও গাণিতিক) করা হয়েছে এবং তানিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হচ্ছে। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দিলীপ চক্রবর্তী*

ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার

সূর্য থেকে সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসকে ঘিরে আছে কয়েকটি বলয়—নিউইয়র্কের ইথাকা-র করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী এর আবিষ্কর্তা। এই বিজ্ঞানীদল যখন অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিমানে করে 90 সেন্টিমিটারের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী গ্রহটির ব্যাসের পরিমাপ ও আবহাওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বলয়বেষ্টিত ইউরেনাস

* নেতাজীনগর কলেজ, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা।

করছিলেন তখন ঐ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিতে দেখেন কমপক্ষে পাঁচটি (চিত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে) বলয় ইউরেনাসকে ঘিরে আছে ঠিক সূর্য থেকে ষষ্ঠ গ্রহ শনির বলয়ের মত।

বর্তমান চীনদেশে গণিত-চর্চা কোন্ দিকে

1976 সালে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 9 জন বিজ্ঞানীর এক প্রতিনিধিদল চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়, ইনষ্টিটিউট অব ম্যাথ্যামেটিক্স্, ইনষ্টিটিউট অব মেটিরিওলজি এবং সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং সেখানকার নানা বিষয়ের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা যে শুধু উপরিউক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই গিয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা ডিজেল লোকোমোটিভ ডিপো, প্রিন্টিং মেশিনারী কারখানা এবং কার ইনসুলেসন ডিপোতে গিয়েছিলেন। এই বিজ্ঞানীর দল সেখানে দেখতে পান কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে গণিতের প্রয়োগ করা হচ্ছে। গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত চিহ্নগুলি প্রায় পৃথিবীর সব দেশের ভাষাতে একই রকম। গণিত হল একটি প্রয়োজনভিত্তিক বিষয়। তাই এটি বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। চীনা গণিত-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, বর্তমান চীনের গণিত-চর্চার অবস্থা, বাস্তব সমস্যা সমাধানে গণিতের প্রয়োগ ও গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই ছিল এই মার্কিন বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন গণিত সংস্থা ও কারখানা দেখতে যাওয়া ছাড়াও পিকিং হোটেলে চীনের ইনষ্টিটিউট অব মেকানিক্স্, সিংতাও-এর ইনষ্টিটিউট অব ওসিয়ানোগ্রাফী, ইনষ্টিটিউট অব বায়োফিজিক্স্ এবং ইনষ্টিটিউট অব ম্যাথ্যাম্যাটিক্স্-এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা-চক্রে মার্কিনী বিজ্ঞানীদল মিলিত হয়েছিলেন। চীনা বিজ্ঞানীরা এঁদের কাছে 60টি বক্তৃতা প্রদান করেন। মার্কিন বিজ্ঞানীরাও চীনা বিজ্ঞানীদের কাছে 20টি বক্তৃতা দেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে চীনের গণিতশাস্ত্রের চর্চা ধীরে ধীরে কমে যায়। বিংশ শতাব্দীতে কিছু উন্নতি ঘটে। তারপর 1949 সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হলে এর ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু 1966 সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সুরু হয়, তা শেষ হয় 1970 সালে। এই সময়ে চীনের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। সে সময়ের বিজ্ঞানের গবেষণা ও ট্রেনিং-এর জন্তে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়। এই চিন্তাধারা একটি শ্লোগানে মুখরিত হয় যে 'বিজ্ঞানকে সমাজের কাজে লাগাতে হবে' এবং শিক্ষাব্যবস্থা হবে ব্যবহারিক প্রয়োগের সূত্র। তার ফলে চীনদেশে গবেষণা পরিণত হল বাস্তব সমস্যা সমাধানের হাতিয়ারে আর গবেষণালব্ধ জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ হল শিক্ষাদানের ভিত্তি।

গণিতের ক্ষেত্রে এই নতুন নীতিতে ফলিত গণিতের গবেষণার উপরে জোর দেওয়া হল। ফলে কম্পিউটর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চীনে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে এবং এক্ষেত্রে কিউয়িং থিয়োরীর (queueing theory) মত বিষয়ে চীন এখন দ্রুত বিশ্ববিজ্ঞানের সামনের সারিতে এসে পৌঁচেছে। আবার ফলিত গণিতে সনাতনী (classical) ক্ষেত্রেও 'সসীম গণিতের প্রয়োগ পদ্ধতি' স্বতন্ত্রভাবে চীনা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। তবে, ফলিত গণিতের অধিকাংশ গবেষণাই হয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গণিত ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

তবে এ সত্ত্বেও, বিশুদ্ধ গণিতের চর্চা খানিকটা সীমাবদ্ধভাবে হলেও অব্যাহত রয়েছে। এর অধিকাংশই হল বিশ্বমানদণ্ডের নিরিখে প্রথম শ্রেণীর। এবিষয়ে গোল্ডবাককনজেক্চার, ওয়ারিং প্রবলেম, নেভানলিনাথিয়োরী প্রভৃতি বিষয়ে চীনা বিশুদ্ধ গণিত-বিজ্ঞানীদের কাজ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বীজগণিতীয় টপোলজিতেও তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

প্রতিনিধিদল বলেন যে বিশুদ্ধ গণিতের চেয়ে ফলিত গণিতের প্রসার চীনদেশে অনেক বেশী। তাঁরা ঐ দেশের বহু কলকারখানা ঘুরে দেখেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সে সব কারখানাগুলি স্থানীয় ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত। সেখানে ষ্টাটিষ্টিক্স্ ও অপারেশানস রিসার্চের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, সনাতনী গাণিতিক পদার্থবিদ্যার প্রয়োগও সেখানে হচ্ছে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে চীনদেশে অন্তরকলনীয় জ্যামিতির চর্চা ততটা প্রচলিত নয়। কিন্তু অন্তরকলনীয় জ্যামিতির কয়েকটি সূক্ষ্মশাখায় (manifold theory) কাজ হচ্ছে। চীনদেশের এই দৃষ্টান্ত উন্নতশীল দেশগুলির কাছে লক্ষণীয়।

আমেরিকায় পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গাণিতিক গবেষণা

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে বোর্ড অব ম্যাথ্যাম্যাটিক্যাল সায়েন্সের 29তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গণিতের পরিবেশগত ব্যবহারের তিনটি দিক তুলে ধরা হয়। (1) বিশেষ ঔষধের চিকিৎসা (drug therpy) সম্বন্ধে মডেল। (2) পরিবেশ দূষণ নির্ধারণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি, এবং (3) দেহের উপর পেশাগত আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া। আমেরিকায়ও প্রয়োজনভিত্তিক গণিত-চর্চার উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতীয় গণিতবিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক সংবাদ

বিড়লা মিউজিয়ামে যানবাহন প্রদর্শনী

বিড়লা মিউজিয়ামের উদ্যোগে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধরণের যানবাহনের একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী 2রা মে থেকে 16ই মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে সহযোগিতা করেন সি. এম. ডি. এ., কলিকাতা পুলিশের যান ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (traffic), জাতীয় পরিবহন সংস্থাগুলি ও কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক।

এই প্রদর্শনীটিতে বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে মডেলের সাহায্যে দেখান হয়: i) ধীরে ধীরে যানবাহনে কিভাবে প্রাণীশক্তি থেকে সুরু করে বাষ্পশক্তি, পেট্রোল থেকে প্রাপ্ত শক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হল, ii) কিভাবে যানবাহনগুলির কারিগরী উন্নতিসাধন হল ও কোন কোন যানবাহনগুলিতে বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর (iii) কলিকাতা ও শহরতলীতে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ও কিভাবে কতদূর তা বাস্তবায়িত হয়েছে। (iv) কিভাবে পরিবেশ দূষণ নিবারণ করে যানবাহন তৈরি করতে হবে।

কলিকাতা ও শহরতলীর যানবাহন সমস্যা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস সম্পর্কে আলোচনা-চক্র

4ঠা জুন সকাল সাড়ে দশটায় অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ ভবনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস সম্পর্কে একটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করা হয়।

পুস্তক-পরিচয়

পৃথিবীর গল্পকথা—শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী প্রকাশনী; 15/2এ, কলেজ রো, কলিকাতা-700 009; 108 পৃঃ; দাম—ছ'টাকা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আজকের দিনে আমরা যেভাবে পরিচিত বা সহজেই যেভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারি তা একজন বা দু-জন লোকের দু-একদিন বা দু-এক বছরের চেষ্টায় সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানের এই যে সুগঠিত রূপ, তার পিছনে আছে সুদূর অতীত কাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টা—যার ধারাবাহিক ইতিহাস বিশদভাবে কারও জানা বা মনে রাখা সম্ভব নয়। অনেক সময় একেই আমরা বিজ্ঞানের গল্পকথা বলে মনে করে থাকি। সাধারণ পাঠকদের জন্যে 'পৃথিবীর গল্পকথা'য় বিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিকের কয়েকটি বিষয়কে লেখক সাবলীল ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে জটিলতার মধ্যে না গিয়ে মোট ষোলটি বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সহজ ও সরল ভাষায় পৃথিবী সংক্রান্ত বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপিত করেছেন—সাধারণ পাঠকমাত্রই তা বুঝতে পারবেন। সরল ও বোধগম্য ভাষায় সুন্দরভাবে বর্ণনা, বিষয়বস্তুর জটিলতা হ্রাসে জায়গায় জায়গায় তুলনামূলক আলোচনা ও বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা—এগুলিই হল গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে 'পৃথিবীর বয়েস', 'চলমান মহাদেশ', 'মহাদেশগুলি কি ভাসছে?', 'পাহাড়', 'ভূমিকম্প', 'হিমবাহ', 'প্রবালদ্বীপ' প্রভৃতি বিষয়গুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। তবে কতকগুলি বিষয় কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন (i) 'পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য' শীর্ষক বিষয়বস্তুটি যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তাতে ঐ অংশের নাম 'সৌরজগতের সৃষ্টি রহস্য' হওয়া উচিত। এই অংশে অনেক তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে খুবই স্বল্প অবকাশে; ফলে যাদের উদ্দেশ্যে লেখা—সেই সাধারণ পাঠকেরা গ্রন্থের সুরুতেই আশাহত হবেন। 'পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য' নামকরণের যথার্থতা বজায় রাখতে হলে ঐ পরিপ্রেক্ষিতে আরও আলোচনার প্রয়োজন ছিল। অন্ততঃ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে—তার তাগিদে। (ii) বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বহু জায়গায় ভাল ভাল উপমার আশ্রয় নিয়েছেন; কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতকগুলি উপমা খুবই অপ্রাসঙ্গিক। বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনে তা উপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়; নতুবা বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যহানি হয়। যেমন, 29 পৃষ্ঠায়—"অবশ্য এখনো ভ্রাম্যমান মহাদেশগুলি থেমে নেই, একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ, তবে অতি ধীরে। যেমন করে সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে একটি শিশিরের কণা।" অন্য একজায়গায় ঐ একই পৃষ্ঠায়—'কথায় বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ। তাই মহাদেশের ভাঙন আর চলনের ব্যাপারে মদত জুগিয়েছে পৃথিবীর নিজেরই শক্তি. একথা সহজেই বুঝা যায়। (iii) গ্রন্থের সুরুতে যেসব আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে—সেগুলি বিষয়বস্তুর পাশাপাশি বর্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি আলোকচিত্রের কোন প্রাসঙ্গিক বর্ণনা গ্রন্থে নেই। তাছাড়া গ্রন্থের বহু অংশেই অনেক আকর্ষণীয় আলোকচিত্র বা রেখাচিত্র পরিবেশিত হলে তা গ্রন্থটির কদর বৃদ্ধির সহায়ক হত। (iv) শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জায়গায় জায়গায়

কিছু কিছু অহেতুক পুনরুক্তি করেছেন। (v) গ্রন্থটিতে কিছু কিছু শব্দ ও পরিভাষা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ। (vi) গ্রন্থটির বহু অংশেই অনেক বানান ভুল রয়ে গেছে। আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধন করতে লেখক ও প্রকাশক যত্নবান হবেন।

উপরিউক্ত সামান্য কতকগুলি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে নির্বাচিত বিষয়বস্তুগুলি খুবই জনপ্রিয়। পাঠকমাত্রই এতে আকৃষ্ট হবেন এবং পুস্তকটি পাঠ করে শুধুমাত্র সাধারণ পাঠকই নন, বিশেষজ্ঞরাও লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। আশা করি গ্রন্থটি সমাদৃত হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট খুবই মনোরম।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

পরিষদের খবর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1977 সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

গত 23শে এপ্রিল, 1977 বিকাল তিন ঘটিকায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পরিষদের 1977 সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই বার্ষিক অধিবেশনে যথারীতি 1976 (এপ্রিল '76 থেকে ডিসেম্বর '76) কার্যবিবরণী, আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী এবং 1977 সালের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় (বাজেট) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গত বছরের বিধি-নিয়মাবলীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দুই একটি বিধি-নিয়মের সামান্য সংস্কার করা হয় এবং কার্যকরী সমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত কয়েকটি উপবিধি অনুমোদিত হয়। এইগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

পৃ. 8 12 (খ) নং ধারায় .....'1লা এপ্রিলের স্থলে......'21শে ফেব্রুয়ারী' পড়িতে হইবে।

পৃ. 11 19(ক) নং ধারায় '০ মাসের' স্থলে '3 মাসের' পড়িতে হইবে এবং '30শে সেপ্টেম্বরে'র স্থলে '31শে মার্চ' পড়িতে হইবে।

পৃ. 16 33নং ধারায় দ্বিতীয় পংক্তি......'31শে মার্চের' স্থলে......'20শে ফেব্রুয়ারী' পড়িতে হইবে।

* * *

উপবিধি

বিধি-নিয়মাবলীর 26 নং ধারা দ্রষ্টব্য :—

কর্মসচিব

1. পরিষদের সভ্যগণ পরিষদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ও মৌখিক আলাপাদি পূর্বে যোগাযোগ করিয়া কর্মসচিবের সহিত করিতে পারিবেন, তবে পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধীয়, প্রবন্ধ প্রকাশ, পরিষদের কার্যসূচী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি দপ্তর হইতে দপ্তর পরিচালক অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে যিনি তাঁহার কার্য দেখাশুনা করিতেছেন তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন। কর্মসচিবের পরিষদ বিরোধী অথবা সভ্যদের অধিকার হননের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা সভাপতির নিকট করিতে পারিবেন।

2. বিভিন্ন উপসমিতিতে কর্মসূচী রূপায়ণ সংক্রান্ত পরিষদের কোন সভ্যের কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য সংশ্লিষ্ট উপসমিতির আহ্বায়কের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট উপসমিতি কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পর কার্যকরী সমিতি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনবোধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

3. বিভিন্ন উপসমিতি আহ্বায়কের যথাযথ ব্যয়সংক্রান্ত দাবী অনুযায়ী এবং তাঁহাদের যথারীতি সুপারিশক্রমে (অথবা প্রয়োজনবোধে সভাপতির নির্দেশে) এবং ঐ সংক্রান্ত অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী কর্মসচিব বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় মঞ্জুর করিবেন। অবশ্য একই খাতে এক যোগে ঐ দাবীকৃত ব্যয় 5 হাজার টাকার মধ্যে (5,000·00 টাকা) সীমিত থাকিবে। ব্যয়ের পরিমাণ ইহার অধিক হইলে কর্মসচিব ঐ ব্যয় মঞ্জুর করিবার জন্য কার্যকরী সমিতির অনুমোদন চাহিবেন। একই খাতে পরবর্তী ব্যয়ের জন্য পূর্ববর্তী ব্যয়সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় হিসাবনিকাশ এবং কর্মপূর্তির প্রমাণপত্র সংশ্লিষ্ট আহ্বায়ক কর্মসচিবের নিকট পেশ করিবেন। কর্মসচিব প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট খাতে অনুমোদিত ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা 25 ভাগ পর্যন্ত অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

4. কর্মসচিবের দপ্তরের কর্মচারিবৃন্দ কর্মসচিবের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। অবশ্য প্রয়োজনমত বিভিন্ন সহযোগী কর্মসচিবগণ এবং বিভিন্ন উপসমিতির আহ্বায়কগণ ও উপসমিতির কাজের দপ্তরের যথানির্দিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিদিগকে পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সহযোগী কর্মসচিবের মাধ্যমে যথারীতি নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং ঐ বিষয়ে কর্মসচিবকেও অবহিত করিবেন।

এই অধিবেশনে কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতিতে (1977) নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হন :

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী :

সভাপতি : শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়

সহঃ সভাপতি : শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাহা

কর্মসচিব : শ্রীমহাদেব দত্ত

সহযোগী কর্মসচিব : শ্রীরতনমোহন খাঁ, শ্রীশ্যামসুন্দর দে, শ্রীবিজয়কুমার বল

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীসুনীলকুমার সিংহ

সাধারণ সদস্য : শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামসুন্দর পাল, শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসাধন পাণ্ডে, শ্রীপ্রতুলকুমার দে, শ্রীদেবব্রত সিংহ, শ্রীউষা ঘোষদস্তিদার, শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীঅজিতকুমার মেদ্দা, শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদুলাল সাহা, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীবিশ্বনাথ দাসঘোষ

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা (তৃতীয়)

14ই মে, 77 শনিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "সত্যেন্দ্র ভবনের কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা কক্ষে" শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন "শুল্বসূত্রের জ্যামিতি ও গণিত" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব বক্তাকে পরিচিত করিয়ে দেন। বক্তৃতার শেষে উক্ত তহবিলের দাতা অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ করে বক্তাকে সাধুবাদ জানান। পরিশেষে সহযোগী কর্মসচিব ডঃ শ্যামসুন্দর দে বক্তাকে এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা

গত 8ই মে, 1977 বিকাল 5টায় গোবরডাঙা যুব বিজ্ঞান সংস্থার আমন্ত্রণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর পক্ষ থেকে ডঃ শ্যামসুন্দর দে 'ইলেক্ট্রনিক্স্ ও তার বর্তমান অগ্রগতি' বিষয়ে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত সংস্থা ঐদিন সকালে "গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান প্রচার" বিষয়ে একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন এবং সেখানে বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে-কেন্দ্রের' পক্ষ থেকে ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও শ্রীদুলালকুমার সাহা অংশগ্রহণ করেন।

রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা

28শে মে, '77 শনিবার বৈকাল পাঁচটায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে'র 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' পঞ্চদশ বার্ষিক রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষ। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'কিবেরনেতিকী' (cybernetics)। প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব বক্তাকে পরিচিত করিয়ে দেন। পরিশেষে সহযোগী কর্মসচিব ডঃ শ্যামসুন্দর দে বক্তাকে এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভ্রমসংশোধন :—মে, '77 সংখ্যায় 215 পৃষ্ঠায় "নিউটনের জন্মের পর" এবং 242 পৃষ্ঠায় "নিউটনের 250তম জন্মবার্ষিকী"-র স্থলে যথাক্রমে "নিউটনের মৃত্যুর পর" এবং "নিউটনের 250তম মৃত্যুবার্ষিকী" হবে। 243 পৃষ্ঠায় "জনপ্রিয় বক্তৃতা" শীর্ষক সংবাদের শেষে "ইউ. এস. আই. এস-এর সৌজন্যে"-র স্থলে "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিল্ম ডিভিসন এবং শ্রীগৌতম ঘোষের সৌজন্যে" হবে। এই ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত। কাঃ স

বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিককালে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি বিভাগ (মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান—ব্যবহারিক, খাদ্যোৎপাদন, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সংবাদ—বিশ্ববিজ্ঞান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংবাদ (জাতীয় সংবাদ), পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংবাদ (আঞ্চলিক), গবেষণা-সংবাদ, বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর—মডেল তৈরি, ভেবে কর, প্রশ্ন ও উত্তর, জানবার কথা, শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানানুরাগীদের প্রবন্ধ, বিজ্ঞানীদের জীবনের পাতা থেকে ইত্যাদি) সংযোজিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংস্থাকে এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করা হচ্ছে—তাঁরা যেন এই সব বিষয়ে সংবাদ ও প্রবন্ধাদি—জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। উপযুক্ত বিবেচিত হলে তা যথাসময়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

বিজ্ঞানীদের জীবন-পাতা থেকে

এ কেমন শিক্ষক ?

এন. এন. সেন-এর পাটিগণিত তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার্থীদের একটি অতি পরিচিত নাম। আর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের শিক্ষাবিদ্ এন. এন. এস-এর ক্লাস। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে অবস্থিত শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যাপকরা যাঁরা এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র কৃতজ্ঞ চিত্তে এন. এন. এস-এর শিক্ষা পদ্ধতির কথা স্মরণ করেন। যে কোন বিষয়, যা তিনি পড়াতেন, তাঁর সাবলীল শিক্ষাদান প্রতিটি ছাত্রের কাছে অতুলনীয় মনে হত। তাঁর astronomy পড়ানর ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে (astrology) নৃপেন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ছিল। যখন তাঁর চল্লিশ বছর বয়স। তিনি ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন। শোনা গেল অচিরেই নাকি তাঁর মৃত্যুযোগ। ব্যাপারটা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনের কানে উঠল। তিনি আবার জ্যোতিষশাস্ত্রে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। নৃপেন্দ্রনাথকে astronomy পড়াতে তিনি অনুরোধ করলেন। নৃপেন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ শিক্ষণ-ক্ষমতা দিয়ে astronomy পড়াতে সুরু করলেন। তাঁর ছাত্র ও আজকের প্রবীণ গণিতজ্ঞরা astronomy পঠন পদ্ধতির উল্লেখ করে থাকেন। Astronony পড়ানর ফলে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি মনোভাব কি হয়েছিল বলতে পারি না; কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর এক ছাত্রী শিশুপুত্রটিকে নিয়ে নৃপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি যথারীতি মহাখুশি। কিন্তু ছাত্রীটি যখন শিশু-পুত্রের ঠিকুজী বের করে ভাগ্যফল জানতে চাইলেন নৃপেন্দ্রনাথ হৈ হৈ করে উঠলেন—"না, না, না। ওসবে কিছু হয় না। পুরুষকার দিয়ে ভাগ্যফল পরিবর্তন করা যায়।

আত্মাকে অবসন্ন না করে রাখলে ভাগ্যের ঊর্ধ্বে ওঠা যায়।" সাতাত্তর-আটাত্তর বয়স্ক গণিতজ্ঞ, জীবনের কোন্ অঙ্ক কষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন আজকের কর্মবিমুখ নৈরাশ্য-বিলাসী যুগে জানতে ইচ্ছে করে নাকি? অথচ এই ঘটনার কয়েক বছর আগে একদিন নিজের জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিরুচ্ছ্বাস নিস্পৃহতা দেখে চমকে উঠেছিলাম। তখন তিনি সর্দার শঙ্কর রোডে থাকেন। কর্মজীবন থেকে অনেক দিন অবসর নিলেও শিক্ষাজগতের সঙ্গে বিশেষজ্ঞরূপে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দেখা করতে গিয়েছিলাম। বিদায় দিতে তিনি কথা বলতে বলতে রাস্তার মোড় অবধি এগিয়ে এসেছেন। শরীরটা তখন তাঁর ভাল যাচ্ছিল না। বললাম কোথাও চেঞ্জে ঘুরে আসুন। শরীরটা ভাল হবে। চিরাচরিত খুক্‌খুক্ করে হেসে উঠে বললেন—এ বয়সে কোথায় আবার যাব? একবারই বেরব। টুক করে ঐ পথ ধরে চলে যাব। আঙুল দিয়ে যে রাস্তাটা দেখালেন সেটা চলে গেছে কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে। কিন্তু সত্যিই কি তিনি অমন নিস্পৃহ ছিলেন—ব্যক্তি নৃপেন্দ্রনাথের কথা বলছি না—কিন্তু শিক্ষক নৃপেন্দ্রনাথ? তখন তিনি শেষ আবাস নিউ আলিপুরে উঠে এসেছেন। তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্রী, একটি কলেজের লেক্‌চারার, কয়েকটি দুরূহ অঙ্ক নিয়ে তাঁর কাছে সকাল দশটা থেকে প্রায় বেলা বারটা পর্যন্ত পড়ে এসেছেন। বেলা তিনটের সময় ছাত্রীর বাড়ির কলিংবেল বেজে উঠল। বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন,—একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয়। তোকে সেই যে অঙ্কটা দেখালাম, আর একটা easy process আছে দেখিয়ে দিচ্ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে easy process দেখিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের সনির্বন্ধ অনুরোধ খুক্‌খুক্ হাসির শব্দে ডুবিয়ে দিয়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা পুনরায় হেঁটে বাড়ি ফিরে এলেন পঁচাত্তর বছরের নিস্পৃহ চিরশিক্ষক ডক্টর নৃপেন্দ্রনাথ সেন।

নীতীশ সেন*

---

* ফলিত গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ধারাবাহিকতা ও স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা

স্কুল-কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঘটনাগুলি ধরা দেয় বিচ্ছিন্নভাবে প্রগতির আসল রূপটি প্রায়ই তাদের চোখে পড়ে না। অথচ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাসের দিকে তাকালে একটা জিনিস পরিস্কার বোঝা যায় যে কেবলমাত্র অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ের কাজকর্ম ছাড়া পরবর্তী পর্যায়ের কোন কাজই হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে বা একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয় নি। এটি হয়তো ঠিক যে মূলগত নূতন ধরণের চিন্তা এসেছে কোন এক বিশেষ দিকপাল বিজ্ঞানীর কাছে থেকেই; অবশ্যই তাঁর এই নূতন চিন্তা বিস্তারের পিছনেও পূর্বসূরী বহু জ্ঞাত অজ্ঞাত চিন্তাবিদের অবদান অসামান্য। এমনকি সেই ধারণার পরিপূর্ণ রূপদানের পিছনেও রয়েছে অসংখ্য বিজ্ঞানীর নিভৃত সাধনা। অথচ আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের চোখে দিকপাল বিজ্ঞানীরা নাটকের এক একজন স্বতন্ত্র নায়কের মত। হঠাৎ যেন রঙ্গমঞ্চে তাঁদের আবির্ভাব; অনেকটা এলেন, জয় করলেন মত ব্যাপার। এটি ভাবতে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে বিজ্ঞানের ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে তাঁরা এক একটি 'বিরাট ঘটনা' কিন্তু কোন 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' নন। অনেকটা লম্বা রাস্তার মোড়ের মাথার মত। বিজ্ঞানের যাত্রা বাস্তব ঘটনা প্রবাহের প্রাকৃত কারণের উৎস সন্ধানে। এই সব প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের কাছে এসে সেই প্রচেষ্টা একটা নূতন মোড় নেয়; হয়তো নূতন কোন চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাকে আগের ঘটনাগুলির থেকে পৃথক করে দেখলে দেখার মধ্যে একটি মস্ত বড় ভুল থেকে যায়। কারণ পুরনোর থেকে নূতনের যেটি উদ্ভব, বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত, সন্ধিক্ষণ। পুরনো তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা থেকে বের হয়ে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিজ্ঞান-মানস, আর তখনি হয় নূতনের আবাহন। এ ব্যাপারে পদার্থবিদ্যার একটি ধারাকে অনুসরণ করে দেখা যাক।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, নিউটন মহাকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, সাধারণের চোখে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাঁর এই আবিষ্কারের পিছনে যে কেপ্‌লারের গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রচুর অবদান ছিল এটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য তত্ত্বের সামান্যিকরণ। কেপ্‌লার গ্রহদের গতি-প্রকৃতির সাধারণ সূত্রগুলি বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু এই গতি ও তার প্রকৃতি যে কোন মহাজাগতিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, তার কোন হদিশ তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি। নিউটন

তাঁর গবেষণায় আরো সামান্তিকরণের মাধ্যমে তাঁর বিখ্যাত মহাকর্ষ সূত্রে উপনীত হলেন এবং তাঁর সাধারণ গতিসূত্রের মধ্যে দিয়ে সে সময়ে জানা সমস্ত রকমের গতিশীল বস্তুর নিয়মকানুনকে একীভূত করলেন। কাজেই কেপ্‌লারকে বাদ দিয়ে নিউটনে পৌঁছন সম্ভব নয়। আবার কেপ্‌লারও ঠিক এ ব্যাপারে প্রবর্তক নন। তাঁর উপরে কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিন বিশ্বতত্ত্ব ও তার পর্যবেক্ষণ ফলাফলের প্রভাব ছিল। এ ছাড়াও তিনি কোপারনিকাসের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্য পেয়েছিলেন, যা তাঁর পর্যবেক্ষণকে সফল করেছিল। এ বাবদে বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বা সমসাময়িক কালের অন্যান্য কলাকুশলীদের অবদান অনস্বীকার্য। আবার কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিন বিশ্বরূপের পিছনেও ছিল কোন এক দার্শনিকের প্রভাব। সে সময়ের বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই ভূ-কেন্দ্রিন বিশ্বরূপে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ঐ ধারণা থেকে যেহেতু গ্রহদের চলাফেরা ঠিক মত ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না, তাই প্রয়োজন হয়েছিল নূতন ভাবনার। যাই হোক, এ থেকে এটি পরিষ্কার যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ধারায় একটি পারম্পর্য আছে। এছাড়া কোপারনিকাস-কেপ্‌লার-নিউটনের মধ্যবর্তীকালেও এমন অনেকে এসেছেন যাঁদের খোঁজ আমরা জানি না বা রাখি না। কিন্তু তাঁরাও বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন দীর্ঘ দিন ধরে। আর তারই ফলে পথ প্রস্তুত হয়েছে কেপ্‌লার বা নিউটনের। প্রতিটি অসফল কাজই সফলতার দিকে এক একটি সোপান। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁদের নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত কিন্তু কাজের সঙ্গে নই। যেমন টাইকোব্রাহে বা ব্রুনো। এটি নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে গ্যালিলিওর হাতে টেলিস্কোপ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে অনেক কেপ্‌লারই হারিয়ে যেতেন, আসলে চারদিক থেকে বিভিন্ন জনের কাজ বিজ্ঞানকে যেন একটি সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এর মধ্যে প্রত্যেকের সত্তাই নিজ বিশেষত্বে ভাস্বর কিন্তু কেউই বিচ্ছিন্ন নন। আবার এ জাতীয় কাজকর্মের ব্যাপারে প্রায় সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষে আর্যভটের নাম করা যায়। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীতেই (যে সব জায়গাকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল) প্রায় একই সময়ে বিজ্ঞানের প্রগতি ছিল প্রায় একই রকম। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক অবস্থার চাপে ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞানচর্চার আগ্রহ স্তিমিত হল। এজাতীয় ঘটনা অবশ্য গ্রীস দেশের ইতিহাসেও ঘটেছিল কিন্তু সেখানকার চিন্তাবিদেরা পৃথিবীর অন্য অংশে বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়ায় আশ্রয় পেয়ে তাঁদের জ্ঞানের আলো মোটামুটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে লাভ নেই। আসলে আমার বক্তব্য হল আর্যভট, নিউটন বা কেপ্‌লার কেউই মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

এবারে আমরা নিউটন পরবর্তী যুগের রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে চাই। নিউটন

তাঁর তত্ত্বের সম্পূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ নিজে করে যেতে পারেন নি। তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল লাগরাঞ্জ, অয়লার, ল্যাপলাস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের। এঁরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে নিউটনের তত্ত্বকে অভ্রান্ত ধরেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এসে নিউটনকে মূল বিন্দু ধরে চলমান বিজ্ঞানের এই শান্ত আবহাওয়ায় ঝড় উঠল, কারণ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও যান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, যার সাহায্যে নিউটনের তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ল। তখন থেকেই শুরু হল আর এক যুগসন্ধিক্ষণ। যা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য রূপ নিল আইনষ্টাইনে পৌঁছে। আইনষ্টাইনের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরাই তাঁদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে আইনষ্টাইনের জন্যে পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

নিউটন তাঁর সূত্র ব্যাখ্যার ব্যাপারে ধরে নিয়েছিলেন যে 'সময়' গোটা মহাবিশ্ব জুড়ে একটা ধ্রুব রাশি। অর্থাৎ গোটা মহাবিশ্বেই কোন নির্দিষ্ট সময়ের মান অভিন্ন। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন। কিন্তু তার আগেও চিন্তাবিদ্ মাক্ নিউটনের সময়ের এই ধারণার দারুণ বিরোধিতা করেছিলেন। তাছাড়া নিউটন ভাবতেন যে ইউক্লীডিও জ্যামিতি মেনে চলে এমন এক মহাকাশে তারারা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কিন্তু পরে এ ধারণাও বাতিল হয়ে যায়।

যে দুটি পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ফলে তখনকার প্রচলিত নিউটনীয় মতবাদ দারুন সমস্যার মুখোমুখি হল তার একটি মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষা এবং অন্যটি বুধ গ্রহের অনুসূরের স্থান পরিবর্তনের হার সংক্রান্ত পরীক্ষা। মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষার যে অভাবনীয় ফলাফল পাওয়া গেল তার ব্যাখ্যা দিতে উঠে-পড়ে লাগলেন লরেঞ্জ, ফিটজ্যারল্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা, যা আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করল। একথা নিশ্চয়ই ভুলে গেলে চলবে না যে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা এবং পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা আইনস্টাইনকে বৈপ্লবিক ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে কিছুটা অন্তত সহায়তা করেছিল। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লরেঞ্জের নাম উল্লেখ করতেই হয়।

আইনস্টাইনের আবির্ভাবের ফলে নিউটনের ভরের নিত্যতা প্রভৃতি অন্যান্য ধারণাও বাতিল হয়ে গেল। এর পর আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তাত্ত্বিক রূপ দিলেন এবং বিভিন্ন দেশের শত শত বিজ্ঞানী এর প্রয়োগ ও সমাধানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন। সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব-তত্ত্বের কাঠামোয় একে খাপ খাওয়ানো হল এবং তার ফলে এমন একাধিক মহাজাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব হল যা এতকাল নিউটনীয় ধ্যানধারণা দিয়ে অব্যাখ্যাত ছিল। আবার একটি নতুন ধারায় অনুসন্ধান শুরু হল যার প্রধান ঋত্বিক আইনস্টাইন। কিন্তু

নিউটনকে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই আইস্টাইন নন। আবার আইনস্টাইনও যে খুব সহজে নূতন তত্ত্ব গ্রথিত করেছিলেন—তা নয়, তাঁকেও বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরীক্ষাগারের ছাড়পত্র পাবার জন্যে। তা পাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর এই নতুন ধ্যান-ধারণাকে অনেকেই "ইহুদীর গণিত" বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এটা বললে নিশ্চয়ই খুব একটি বাজে কথা বলা হবে না যে এক-শ' বছর আগে যদি আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আবিষ্কার হত তাহলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা প্রমাণের অভাবেই তা পরিত্যক্ত হত। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞান চারিদিক থেকে একটা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রত্যেকটি যুগেই কিছু না কিছু 'প্রকৃত বিজ্ঞানী" থাকেনই, যেমন নিউটনের সমসাময়িক কালে ছিলেন ইয়ং, হুইগেন্স প্রমুখ; যাঁরা নিউটনের আলোক-কণিকা-বাদের বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য ঠিক সেই সময়েই তাঁরা নিউটনের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারেন নি। যাই হোক, তেমনি আইনস্টাইনের মতামতকে বিরোধিতা করার লোকেরও অভাব হল না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা বাদের মূল দুটি ধারণার একটি—যে কোন তন্ত্রে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সূত্রগুলি দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ হতে হবে। আর অন্যটি—শূন্য মাধ্যমে (?) আলোর গতিবেগের মান একটি ধ্রুব সংখ্যা, এবং তা হল গিয়ে গতি-বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বতম সীমা, যাতে পৌঁছন সাধারণ বস্তুকণার পক্ষে অসম্ভব। জর্জ সুদর্শন দেখিয়েছেন যে, আলোর চেয়ে বেশী জোরে দৌড়তে পারে এমন কণিকাও থাকা সম্ভব, তাদের নামকরণও হয়েছে ট্যাকিয়ন।

মহাকর্ষ ধ্রুবকের মান কমে যাচ্ছে এমন একটি ধারণার সমর্থনে কিছু পরীক্ষা লব্ধ ফলাফল হাজির করেছেন ভ্যান ফ্ল্যান ডেন। আবার ট্যাকিয়নের সন্ধানেও পরীক্ষা চালিয়েছেন কয়েকজন অষ্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী। অবশ্য আজও এসব তত্ত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত নয়। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমরা আবার একটি মোড়ের মাথায় এসে পৌঁচেছি; নিউটনীয় যুগ থেকে আইনস্টাইন হয়ে ধারাবাহিক ভাবে, খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে।

এই রচনার মূল বক্তব্য স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে বিশেষ করে পঠন-পাঠন পদ্ধতির মধ্যে এই ধারাবাহিকতার অনুপস্থিতি এবং তারই ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রগতি সম্বন্ধে এক অবৈজ্ঞানিক ধারণার জন্মলাভ। অবশ্য আমি প্রথম সারির কিছু ছাত্র-ছাত্রীর কথা নিশ্চয়ই আলোচনা করছি না। কিন্তু মধ্যম মেধার ছেলেমেয়েরা, যাদের কথাটাই সবচেয়ে বেশী চিন্তা করা দরকার, তাদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে অজ্ঞ। বিজ্ঞান শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মেধাবী ছাত্রদের ক্ষেত্রে এটি ধরে নেওয়াই যায় যে, মোটামুটি সুস্থ আবহাওয়া পেলেই তারা সেই উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে পারবে। আসলে খুব ভাল ছেলেদের নিয়ে, বাপ-মায়ের যেমন দেশেরও

তেমনি দুশ্চিন্তাটা কিছু কম, কিন্তু যারা মধ্যম মেধার তাদের উপরে কোন কিছু আরোপ করে ভাল ফল পেতে হলে পদ্ধতিটি হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক। আগেই বলেছি বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অবশ্য সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই নয় যে দেশে একেবারে বিজ্ঞানীর বন্যা নামবে। আসলে এমন একটি জেনারেশন তৈরি হবে যাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা হবে বৈজ্ঞানিক। ঠিক সেই অর্থে যে অর্থে আগের লাইনে বৈজ্ঞানিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয়কেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখতে শিখবে। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়টা চলে বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়ে; যে বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনার প্রগতিতে রয়েছে স্বচ্ছন্দ গতি, আর নূতনকে আবাহনের জন্যে সদাপ্রস্তুতি। এর অভাব যে দেখা যায় নি তা নয়, কিন্তু সে ক্ষণিকের; গোটা ব্যাপারটির মধ্যেই চলেছে সত্যের অনুসন্ধান। সেখানে ভুল হয়েছে, ভ্রান্তি এসেছে কিন্তু তা বিজ্ঞানের প্রগতিকে ব্যাহত করে নি, আর সবচেয়ে বড় কথা বিজ্ঞানের প্রগতি দেশ-কালের মধ্যে সীমিত নয়। এই অবস্থায় এটি ভাবার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে যে গোটা শিক্ষণ পদ্ধতিটাই একটি অসুস্থতায় ভুগছে।

আমার মনে হয় ছাত্রদের কথা বাদ দিলে ত্রুটি রয়েছে দুটি পর্যায়ে। প্রথমত সুচিন্তিত সঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রমের অভাব, দ্বিতীয়ত শিক্ষণ পদ্ধতির অনিয়ম। একটি ছোট উদাহরণ নেওয়া যাক—স্কুলের ছেলে নিউটন পড়ছে, তার আগের কিছু নেই, পরেরও কিছু নেই, মাঝ থেকে নিউটন। তারতো মনে হবেই যে মহাশূন্যের মধ্যে নিউটন একটি বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্ক। আগের শিক্ষাবর্ষগুলিতে হয়তো সে কেপলার, কেপারনিকাসের গল্প শুনেছে; শুনেছে কোপারনিকাস আর আর্যভট্ট নাকি সূর্যকে থামিয়ে দিয়ে পৃথিবীটাকে ঘোরাতে লাগলেন; কিন্তু সেতো শুধু গল্প, আর নিউটন তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই বেশ কয়েকটি বড় বড় সূত্র নিয়ে হাজির হলেন। আসলে এদের মধ্যে যে কোন যোগসূত্র আছে সেটাই ছাত্রের কাছে কেউ কোন দিন বলে নি। আমি এ কথা বলছি না যে নবম বা দশম শ্রেণীর ছেলে-মেয়েকে বড় বড় গাণিতিক সমীকরণের সেতুর উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে নিউটন ও কেপ্লারের মধ্যেকার যোগসূত্রটি দেখাতে হবে। কিন্তু কেপ্লারের চিন্তা কিভাবে নিউটনকে প্রভাবিত করেছিল বা কোপারনিকাস-কেপ্লার-নিউটনের মধ্যে কাঁরা কাঁরা এসেছিলেন, কি তাঁদের অবদান, আর্যভট কি ধরণের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এ সব কথা বোঝানোর তো কোন অসুবিধা নেই। আমাদের স্কুল পর্যায়ের কয়টি ছাত্র জানে আলবেরুণির ত্রিকোণমিতি সংক্রান্ত গবেষণার খবর? তারপর নিউটন থেকে কয়েক-শ' বছর ডুবসাঁতার দিয়ে একেবারে আইনষ্টাইন। সাধারণ ছাত্রদের চোখে মাঝখানটা একেবারে ফাঁকা, কাজেই তাদের মনে হয় বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি এক একটি হঠাৎ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। গাণিতিক কাঠামোর মধ্যে না গিয়ে খুব সহজভাবেও তো ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আলোচনা

করা চলে—বিভিন্ন জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিউটনের তত্ত্বের প্রয়োগ, তার অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি। কলেজে যে সব টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনার কথা আলোচনা করা হয় তার মধ্যেও ঠিক যোগসূত্র টেনে যাওয়া হয় না। কাজেই সামানিক শিক্ষাক্রমের বহু ছাত্রের চোখেও অনেক কিছুই সামঞ্জস্যবিহীন থেকে যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞান পড়ানো হবে, কোথাও একেবারে গল্পের ছলে, কোথাও হাল্কাভাবে তত্ত্বগুলিকে ছুঁয়ে যাওয়া আবার কোথাও বা বেশ গভীরে ঢুকে আলোচনা। কিন্তু কোথাওই মূল ধারাবাহিকতার অভাব থাকা চলবে না। তাছাড়াও যতটা সম্ভব আধুনিক ধারণা পর্যন্ত চিন্তাকে পৌঁছে দেওয়া দরকার। তা না হলে কতকগুলি তত্ত্বের বিচ্ছিন্ন সূত্র কেবল পড়া হয়ে থাকবে, মূল বিজ্ঞানকে চেনা হবে না। আর সবচেয়ে আধুনিক আবিষ্কার এমনকি বিতর্কিত মতবাদের খবর দেওয়ার উদ্দেশ্য দুটি। এক—বর্তমান আর ভবিষ্যৎ প্রত্যেকের মধ্যেই অতীতের চেয়ে বেশী সাড়া জাগায়। তাই যে যুগে পাইওনিয়র-10 বৃহস্পতিকে ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে বহু দূরে, চাঁদে জীপ গাড়ি চলেছে, আবিষ্কার হয়েছে নিউট্রন তারা, কৃষ্ণ গহ্বর আরো কত কি ; সেই যুগের ছাত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ানোর নামে শুধু শিরোবিন্দু (zenith) আর 'নাভির' পয়েন্ট চেনালে চলবে কেন। দুটিই পাশাপাশি রাখতে হবে অতীতকে গভীরভাবে, বর্তমানকে সহজ গল্পের মেজাজে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি ছাত্রের মধ্যেই একটি কল্পনাবিলাসী মন লুকিয়ে আছে। তাই শুধু যদি তাকে এক-শ' বছর আগের জিনিসই পড়ান হয়, তবে তার কল্পনাতো সেই এক-শ' বছর আগের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাবে। সেটি নিশ্চই কাম্য নয়। এছাড়াও ধারাবাহিক বিজ্ঞান পাঠের বিভিন্ন মুহূর্তে সে দেখবে দিকপাল বিজ্ঞানীদের সামনে কি জাতীয় সমস্যা এসেছিল যা তৎকালান প্রচলিত ধ্যানধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল না। বিজ্ঞানীরা কিভাবে ঐ সব সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এথেকে তাদের মনে সমস্যাকে পর্যালোচনা করার একটি পদ্ধতি দানা বেঁধে উঠবে। অবশ্য শেষের এই বক্তব্যটুকু পুরোপুরি প্রথম সারির ছাত্রদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মূল সমস্যাটি কি—এটি বোঝা বা বোঝানো একটি বিরাট সমস্যা।

স্কুল-কলেজের পাঠক্রম এমনভাবে তৈরি হওয়া উচিত যাতে বিজ্ঞান পড়তে এসে ছাত্রদের উৎসাহ নষ্ট না হয়ে যায়। প্রায়ই দেখা যায়, ছাত্ররা যে উৎসাহ নিয়ে স্কুল পার হয়ে কলেজে আসে, দু-এক বছর যেতে না যেতেই তাতে ভাটার টান লাগে। দোষটা কি একমাত্র ছাত্রের, না পড়ার বিষয়টিকে যতটা সম্ভব নিরস করে উপস্থিত করার? এটি ভেবে দেখার বোধ হয় সময় এসেছে। নূতন পাঠক্রম যা চালু হল বা হতে চলেছে তাতে এরকম একটি চেষ্টা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আসলে এ বাবদে মূল ভূমিকা শিক্ষকের। বিজ্ঞানকে যেদিন সুসাহিত্যের মত সুখপাঠ্য করা যাবে সেটিও শিক্ষার ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ বলেই চিহ্নিত হবে।

গৌতম বিশ্বাস*

* 69, কে. পি. চট্টরাজ রোড, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

গতি

(1)

চিরকালের তরে
অচল বস্তু অচল রবে,
সচল বস্তু সচল হবে
চলবে সোজা সমবেগে
সরলরেখা ধরে—
(যদি) বাইরে থেকে বল পেয়ে, না
গতীর দশা বদল করে।

(2)

বস্তুর ভরবেগ
যে হারে বদল হয়—
প্রযুক্ত বল তার
সমানুপাতিক রয় ;
প্রযুক্ত বল যেইদিকে ঘটে
ভরবেগ বদলও সেই দিকে বটে।

(3)

সকল ক্রিয়া ঘটে যেমন,
প্রতিক্রিয়ার বহর থাকবে যে তার ?
উল্‌টো সমান তেমন।*

ধনঞ্জয় পাল**

---

* প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সার আইজাক নিউটনের গতিসূত্র অবলম্বনে।

** 9/2সি, রতন বাবু রোড, কলিকাতা-700 002

ভেবে উত্তর দাও

তোমরা সবাই জান সংখ্যা এবং সংখ্যা ব্যবহার করে যা প্রকাশ করা হয়, তা খুব সুনির্দিষ্ট (precise) বলে ধরা হয়। সবাই বলে গণিত বা গাণিতিক বিজ্ঞান খুবই সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান। এখানে আমরা কয়েকটি সংখ্যা এবং সংখ্যা নিয়ে ছোট গল্প বলব ও সহজ আলোচনা করব, যা থেকে বোঝা যাবে যে এই সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে ধারণা কত অস্পষ্ট রয়েছে—একথাটি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

* * *

1. প্রথমে সংখ্যাটি নেওয়া যাক 606×10^{21} ; যারা ভৌতিক বিজ্ঞান কোন সময় না কোন সময় পড়েছে, তারা সংখ্যাটি নিশ্চয়ই জান, সংখ্যাটি কোন সূত্রে পেয়েছ বল ? কি তোমার মত ? যদি বড় হয় তাহলে কত বড় ? পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত বলতো ? আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে (Universe) কতগুলি তারা আছে ? হিসাবের সুবিধার জন্যে ধরা যাক 1 লক্ষ তারা ; আরও সুবিধার জন্যে ধরা যাক যে প্রত্যেক তারাটি এক একটি সূর্য ও তার পাশে গড়ে 10টি গ্রহ আছে। এখন হিসাবের সুবিধার জন্যে আরও ধরলাম প্রত্যেক গ্রহতে আমাদের মতই লোক আছে ও গড়ে লোকসংখ্যা 300 কোটি।

এবার বলতো 606×10^{21} লোকদের বসতি করবার জন্যে কতগুলি ব্রহ্মাণ্ড দরকার হবে ?

এর উত্তরটা যদি বলতে পার তাহলে বুঝবে এই সংখ্যাটি কত বড়।

* * * *

2. এক সময় বারাণসীতে এক রাজা ছিলেন তিনি দাবা খেলতেন ও খেলা দেখতে খুব ভালবাসতেন। একবার তিনি খবর পেলেন যে একজন বড় খেলোয়াড় শহর দর্শন করতে এসেছেন। রাজা তাঁকে রাজসভায় ডেকে আনলেন ও উপহার দিয়ে খেলাতে রাজি করলেন। খেলোয়াড় যে উপহার চাইল রাজা তা শুনে খুব হাসলেন, খেলোয়াড় বললেন যে আমার দাবার ছকটি গমের দানা দিয়ে পূর্ণ করে দিলেই হবে। কিন্তু দানাগুলি এমনভাবে দেবেন, প্রথম ঘরের জন্যে 1টি, দ্বিতীয় ঘরের জন্যে 2টি, পরেরটির জন্যে 4টি, এইভাবে প্রত্যেক ঘরের জন্যে তার আগেরটির দ্বিগুণ করে দিতে-হবে। এই সামান্য উপহার চাওয়ায় রাজা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। খেলোয়াড় খেলায় মন দিয়ে বসলেন ও রাজাকে এক কথায় অতি সহজেই হারালেন ও গম চেয়ে বসলেন। রাজা খাদ্যভাণ্ডারের মহামাত্যকে গম দিতে বললেন। গম দিতে গিয়ে দেখা গেল শস্যভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল কিন্তু উপহারের দাবী মিটলো না। কেন এমন হল ভেবে বলতো ?

এখন এটাকেই আধুনিক সমাজের উপযোগী করে বলা যাক।

ধরা যাক, প্রত্যেক গমের পরিবর্তে একটা করে পয়সা খেলোয়াড়কে দেওয়া হল। বলতো কত টাকা লাগবে? ঐ টাকা ভারতের বাজেটের কতগুণ? আমেরিকান বাজেট কত জান? এই উপহারের টাকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনি রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের কত গুণ বলতো? পৃথিবীর সব রাষ্ট্র মিলে দিতে পারবে তো?

*　　　　*　　　　*

3. কতকগুলি স্বাভাবিক সংখ্যা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নানাভাবে নিয়ে তোমরা বিভিন্ন সেট্ (set) তৈরি কর, যেমন ধর {1}, {1, 2}, {1, 2, 3},……, {2, 4, 5}……, {3, 4, 7, 9}……, {1, 2, 3……}, {2, 4, 6……}, {1, 2, 4, 8, 16……}। এখন উপরে যে সব সেট্ লেখা হয়েছে, তা থেকে কিছু কিছু সংখ্যা বাদ দিলে যে সেট্ পাওয়া যাবে তা নিশ্চয়ই যে সেট্ থেকে ঐ সব সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়েছে তার থেকে ছোট। যেমন ধর {1, 2, 3}, 3 সংখ্যাটিকে বাদ দিলে পাওয়া যাবে {1, 2}। অবশ্যই শেষেরটি আগের চেয়ে ছোট। কেন বলতো? এখন আমরা {1, 2, 3, 4, 5, 6 7…}, সেট্টি নিই এবং এই সেট থেকে 1, 3, 5, 7, প্রভৃতি সংখ্যাগুলি বাদ দিলে যে সেট্টি পাব সেটি {2, 4, 6……}

এখন {1, 2, 3,… …} একটি শেষ সংখ্যা থাকে (যত বড়ই হোক না কেন—কোটি বা কোটি কোটি) তাহলেও আমাদের আগের ধারণামত বাদ দেবার পর যে অংশ পাব, তা বাদ দেবার আগেকার সেটের সমান হবে না, ঠিক তো?

কিন্তু {1, 2, 3……} এই সেটে যদি আমরা সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা নেই অর্থাৎ সেট্টিতে কোন শেষ সংখ্যা না থাকে, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে? যদি আমরা এই সেট্ থেকে 1, 3 প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যা বাদ দিয়ে দিই {2, 4, 6……} সেটটি নেই ও তার কোন শেষ সংখ্যা না থাকে, একটু ভাবলেই দেখতে পাবে {1, 2, 3……} (শেষ সংখ্যা নাই) এই সেটের প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে জুড়ি পাওয়া যাবে দ্বিতীয় সেট্ {2, 4, 6……} (শেষ সংখ্যাটি নাই) থেকে। অর্থাৎ এদিক থেকে এই দুটি সেট সমপর্যায় অর্থাৎ সমান। অংশটা পুরো সমান হয়ে গেল, তাজ্জব নয় কি?

{1, 2, 3……} (শেষ সংখ্যা নাই)। {2, 4, 6……} (শেষ সংখ্যা নাই) {1, 2, 4, 8, 16……} (শেষ সংখ্যা নাই)। এই রকম সব সেট নিয়ে আরও একটু ভেবে দেখ দেখি ব্যাপারটি কি দাঁড়াচ্ছে?

সংখ্যা ও সংখ্যা দিয়ে যেসব লেখা বা আলোচনা করা যায়, তোমাদের সেসব সম্বন্ধে ধারণ সুনির্দিষ্ট তো? একটু ভেবে বল।

উত্তর তোমাদের কাছ থেকে পাব বলে আশা করা যাচ্ছে।

কা. দ.

মডেল তৈরি

(1)

বর্ণ উৎপাদক যন্ত্র

লাল, নীল, সবুজ এই তিনটি বর্ণকে প্রাথমিক বর্ণ বলা হয়; কারণ এই তিনটি বর্ণকে যে কোন অনুপাতে মিশ্রিত করে অন্যান্য বর্ণের সৃষ্টি করা যেতে পারে। এখানে একটি যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হবে। যার সাহায্যে এই তিনটি প্রাথমিক বর্ণের আলোর উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি করে যে কোন বর্ণের আলোক রশ্মি তৈরি করা যাবে। এই যন্ত্রটি সহজে এবং কম খরচে তৈরি করা যেতে পারে। এর জন্যে নিচের জিনিসগুলির প্রয়োজন :

i) পাতলা কাঠ বা মেসোনাইড বোর্ড (প্রায় 10 বর্গফুট) ;
ii) তিনটি 220 ভো: 25 ওয়াট সাদা কাঁচের বাল্ব ;
iii) তিনটি বাল্ব হোল্ডার ;
iv) 20K Ω 30 ওয়াট মানের তিনটি পোটেনশিয়োমিটার (নব সমেত),
v) কিছুটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত (প্রায় $1\frac{1}{2}$ বর্গফুট) ;
vi) একটি কবজা (1″ প্রায়)
vii) লাল, নীল, সবুজ রঙের পাতলা সেলোফেন কাগজ ;
viii) একটি 8″×6″ মাপের ঘষা কাঁচ
ix) কাজের জন্যে 2/3 মিটার তার, প্রয়োজনমত মেশিন স্ক্রু ও পেরেক।
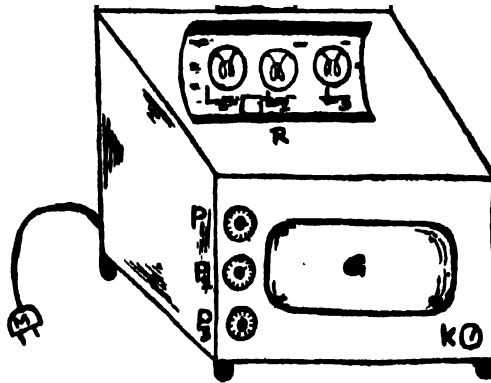
চিত্র 1

প্রথমে কাঠ দিয়ে $1\frac{1}{2}$ ফুট লম্বা, 1 ফুট চওড়া ও 1 ফুট উচ্চতার একটি বাক্স তৈরি করে নিতে হবে। বাক্সের উপরের দিকের কাঠটি কবজা দিয়ে আটকে খোলা-বন্ধের ব্যবস্থা

করতে হবে। বাক্সের সামনের দিকটি মাপমত কেটে ঘষা কাঁচটিকে (G) চারটি অ্যালুমিনিয়ামের টুক্‌রো দিয়ে স্ক্রু সাহায্যে আট্‌কাতে হবে। এখন ঐ তিনটি বাল্‌বকে (L_1, L_2, L_3) সাহায্যে বাক্সের ভিতরের পিছনের দিকে লাগাতে হবে। অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে একটি প্রতিফলক (R) (চিত্র 1-এর মত) তৈরি করে, বাল্‌ব তিনটির ঠিক পিছনে লাগাতে হবে। এই প্রতিফলকের কাজ হল বাল্‌বের আলো-কে প্রতিফলিত করে ঘষা কাঁচের উপরে ফেলা। এখন ঐ বাল্‌ব তিনটিকে যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ বর্ণের সেলোফেন কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় বাল্‌ব জ্বললে ঐ বাল্‌বগুলি থেকে সাদা আলোর পরিবর্তে ঐ তিন বর্ণের আলোক পাওয়া যায়। পোটেনশিয়োমিটার তিনটি (P_1, P_2, P_3) ও সুইচ K-কে বাক্সের সামনের দিকে পছন্দমত জায়গায় আটকে

চিত্র 2
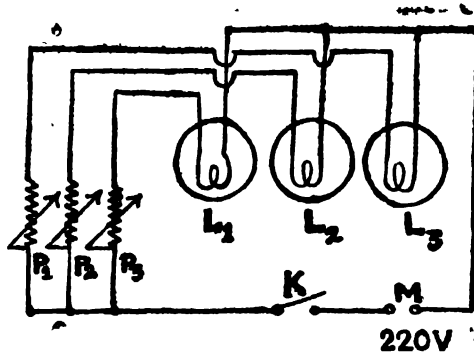
দিতে হবে এবং চিত্র 2-এর মত তার দিয়ে বর্তনীতে সংযোগ করতে হবে। বাক্সের পিছন দিক থেকে মেন লাইনের তার বের করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি পোটেনশিয়োমিটারের নবের সঙ্গে 3 সে. মি, ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তাকার কাগজ আটকে যতগুলি সম্ভব সমান ভাগ করে দিতে হবে এবং প্রতিটি নবে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি তীর চিহ্নের মত একটি সূচক আটকানো হয়। এখন পোটেনশিয়োমিটারটি ঘোরালে কতটা ঘুরলো তা ঐ কাগজের স্কেল থেকে জানা যাবে।

যন্ত্রটি চালু করার জন্যে প্রথমে M তারটি বৈদ্যুতিক মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তারপর K সুইচ চালু করতে হবে। তখন ঐ পোটেনশিয়োমিটারগুলি তিনটি বাল্‌বের সঙ্গে শ্রেণী সমবায় যুক্ত থাকায় পোটেনশিয়োমিটারের রোধ বাড়ালে বাল্‌বের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ কমে যাবে। তখন বাল্‌বের উজ্জ্বলতা হ্রাস পাবে। পোটেনশিয়োমিটারের রোধ হ্রাস করলে আবার আলোর উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি ঘটে। এইভাবে পোটেনশিয়োমিটারগুলি ঘুরিয়ে যে কোন বাল্‌বকে যে কোন উজ্জ্বলতায় রাখা সম্ভব। বাল্‌বগুলির পিছনে প্রতিফলক থাকায় প্রত্যেক বাল্‌ব থেকে নির্গত বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মি ঘষা কাঁচের উপরে পড়ে এবং এক নূতন বর্ণের সৃষ্টি করে।

ঠিকমত পোটেনশিয়োমিটার তিনটি ঘুরিয়ে আলোকের এই তিনটি বর্ণকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করে নানান বর্ণ পাওয়া যায় এবং বিশেষ বিশেষ বর্ণের জন্যে নবের সঙ্গে সংযুক্ত বৃত্তাকার স্কেলের পাঠকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব। এভাবে সাদা আলোও পাওয়া যেতে পারে।

কল্যাণ দাস*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

(2)

ওভারহেড প্রজেক্টর

বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষাদানের জন্যে ব্লাকবোর্ডের বদলে ওভারহেড প্রজেক্টরের প্রচলন হচ্ছে। ওভারহেড প্রজেক্টর একটি উন্নত শিক্ষণসহায়ক সামগ্রী, এ কথা ঠিকই। কিন্তু বাজারে যে সমস্ত ওভারহেড প্রজেক্টর পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির দাম এত বেশি যে, সাধারণ শিক্ষালয় এবং বিজ্ঞান ক্লাবের তা কেনা সাধ্যাতীত। এ প্রবন্ধে স্বল্প ব্যয়ে মোটামুটি কাজ চালানোর মত ওভারহেড প্রজেক্টর কি করে তৈরি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছি।

এটি তৈরি করতে যে যে জিনিস লাগবে তা হল:

1) $\frac{1}{4}''$ মোটা প্লাইউড : $2' \times 3'$

2) $2'' \times 1'' \times 2''$ কাঠের দণ্ড

3) 20 কিম্বা 22 গেজের টিনের (G. I.) পাত : $1' \times 1'$

4) $4'' \times 4''$ কাচের পাত—1টি

5) 10 কিম্বা 15 সেন্টিমিটার ফোকাল লেন্থের এবং প্রায় 3″ ব্যাসের উত্তোত্তল লেন্স—1টি

6) 100 ওয়াট আরজেন্টা বাল্ব—1টি

7) বাল্ব হোল্ডার (ব্যটন টাইপ হলে ভাল হয়)—1টি

8) একমুখী পিয়ানো সুইচ—1টি

9) $3'' \times 6''$ মাপের পাতলা কাচের আয়নার টুক্রো

10) এক্রিলিক সীট অথবা সেলোফেনের চাদর—$3''$ চওড়া এবং 2 ফুটের বেশি লম্বা

11) গ্রাজড্ পেন্সিল অথবা গ্লাস মার্কিং পেন্সিল

12) $\frac{3}{16}''$ রুফ বোল্ট এবং ওয়াসারসমেত ফ্লাই নাট

প্লাইউড খণ্ড থেকে $1' \times 1'$ মাপের ছ'টি টুক্রো কেটে নিয়ে একটা বাক্স তৈরি কর। বাক্স তৈরির আগে ঐ বাক্সের ভিতর বায়ু সঞ্চালনের জন্যে চারিপাশের প্লাই-এর

টুক্‌রোগুলির গায়ে (চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে) কতকগুলি ছিদ্র করতে হবে এবং উপরের প্লাইউডের মধ্যস্থলে 3″×3″ অংশ কেটে বাদ দিয়ে সেখানে 4″×4″ কাঁচের
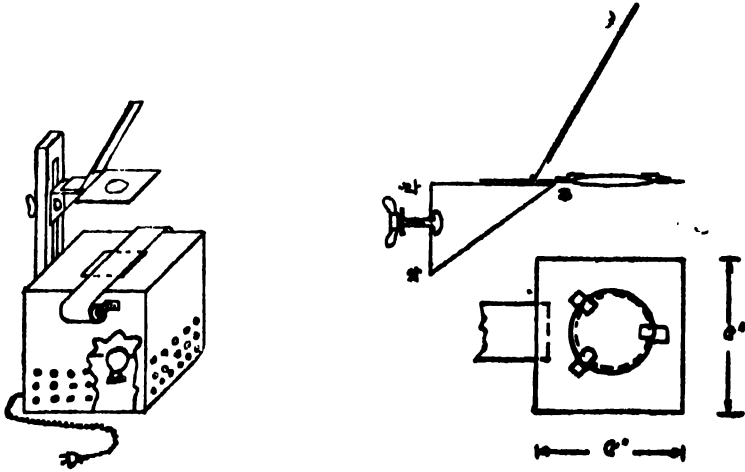
টুকরো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কাঁচের টুক্‌রোটি টিনের Z ক্লিপ দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে প্লাইউডের গায়ে লাগানো যেতে পারে।

বাক্সটির ভিতরে নিচের প্লাইউডের কেন্দ্রস্থলে সংযোগকারী তার রেখে বাল্‌ব্‌ হোলডারটি বসাও। পরে ঐ হোলডারে একটি 100 ওয়াটের বাল্‌ব্‌ লাগাতে হবে। এবার বাক্সের গায়ে একটি পিয়ানো সুইচ বসিয়ে তার একপ্রান্তে হোলডারের একটি তার লাগাও। পিয়ানো সুইচের অপর প্রান্ত থেকে একটি তার এবং হোল্‌ডারের অপর তারটি ছিদ্রপথে বাইরে এনে একটি দু-পিনওলা প্লাগে লাগাও। বাক্সটির ভিতরের দিকে সাদা রং করে নিলে ভাল হয়।

এখন 2″×1″×2′ কাঠের খণ্ডটির নিচের দিকে এক ফুট ছেড়ে এর মাঝ বরাবর ¼″ চওড়া ও 8″ লম্বা স্লট (slot) কাট। ড্রিল দিয়ে পর পর ফুটো করে এবং ফাইল দিয়ে ঘষে ঐ স্লট কাটা যেতে পারে। এবার স্লটকাটা দণ্ডটি একদিকের প্লাইউডের মাঝখানে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। ঐ প্লাইউডের বিপরীত দিকেরটি ছাড়া অন্য দু-পাশের প্লাইউড দুটির গায়ে L আকৃতির পাতের সাহায্যে এক থেকে দেড় ইঞ্চি ব্যাসের ও তিন ইঞ্চির বেশি দীর্ঘ দুটি রোলার এমনভাবে লাগাতে হবে (চিত্র দ্রষ্টব্য) যাতে করে সহজে ঐ রোলারদ্বয়ের একটি ঘুরিয়ে সেলোফেনের চাদর একদিকে জড়িয়ে রাখা যায়। খালি টিনের গুঁড়ো মাজনের কৌটো রোলাররূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এবার টিনের পাত থেকে যথাক্রমে 5″×5″, 2′×1′ এবং 3½″×9′ মাপের তিনটি টুক্‌রো কেটে নাও। 5″×5″ টিনের মাঝখান থেকে উভোত্তল লেন্সের ব্যাসের

চেয়ে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি কম ব্যাসের বৃত্তাকার অংশ কেটে বাদ দাও। বৃত্তাকারে ড্রিল দিয়ে ফুটো করে এবং ফাইল দিয়ে ঘষে তা করা যেতে পারে। এবার ঐ কাটা অংশের উপর উভোত্তল লেন্স বসিয়ে টিনের Z ক্লিপ দিয়ে (চিত্রে দ্রষ্টব্য) বা অন্য উপায়ে স্থায়ীভাবে লাগিয়ে দাও। Z ক্লিপ $5'' \times 5''$ পাতের উপর ঝালাই করে কিম্বা স্ক্রু ও নাট দিয়ে লাগানো যেতে পারে। দ্বিতীয় টিনের টুকরোটি অর্থাৎ $2''$ চওড়া ও 1 ফুট লম্বা পাতটি চিত্রানুযায়ী ত্রিভুজাকারে বাঁকাও। এটি হল লেন্স ও প্রতিফলক আয়নার ধারক। ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য হবে যথাক্রমে কখ $=4''$, খগ $=3''$ ও গক $=5''$। দু-প্রান্তের মিলনস্থলে ঝালাই করে জুড়ে দাও। খগ বাহুর মধ্যস্থলে একটি $\frac{1}{4}''$ ফুটো কর। এই ফুটোর ভিতর দিয়ে রুফ্ বোল্ট গলিয়ে প্রজেক্টর বাক্সটির দণ্ডের গায়ে ধারকটিকে ফ্লাইনাটের সাহায্যে ইচ্ছামত উচ্চতায় আটকে রাখা যাবে। কখ পাতের উপর আধ ইঞ্চি অংশ চাপা রেখে লেন্স লাগানো টিনের পাতটি অর্থাৎ $5'' \times 5''$ পাতটি ঝালাই করে (ছবিতে যেমনভাবে দেখানো হয়েছে) জুড়ে দাও। তৃতীয় টিনের পাতটির উপর আয়নার টুকরো বসিয়ে ঐ পাতের দু'ধার থেকে সমানভাবে মুড়ে দিতে হবে যাতে আয়নার টুকরো টিনের পাতের গায়ে আটকে থাকে। প্রতিফলক আয়নাসমেত পাতের অবশিষ্ট অংশ চিত্রানুযায়ী বেঁকিয়ে লেন্স ও প্রতিফলক ধারক ত্রিভুজের কখ বাহুর উপর ঝালাই করে কিম্বা স্ক্রু ও নাট দিয়ে লাগাও। প্রতিফলক আয়না লাগানো পাতটি খক বাহুর উপর $45^\circ - 60^\circ$ কোণে রাখতে হবে। প্রতিফলক আয়না যেন লেন্সের উপরই থাকে।

প্রজেক্টর বাক্সটির বাক্সটির দু-পাশের রোলারে জুড়ে সেলোফেনের চাদর পরিয়ে দাও, যেন তা উপরিভাগের $3'' \times 3''$ কাটা অংশের ঢাকা কাঁচের উপর দিয়ে যায় (চিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রজেক্টরের আলো জ্বালিয়ে স্লটকাটা দণ্ডের গায়ে ফ্লাই নাট আলগা করে ত্রিভুজাকার লেন্স ও প্রতিফলক ধারকটি ওঠানামা করিয়ে ফোকাস ঠিক কর। এবার $4'' \times 4''$ কাঁচের প্লেটের উপরস্থ সেলোফেনের চাদরে যা কিছু লেখা যাক, তা বহুগুণ বর্ধিত হয়ে লেখকের পিছনে পর্দায় বা দেয়ালে ফুটে উঠবে। গ্রীজড্ পেন্সিল অথবা গ্লাস মার্কিং পেন্সিল লেখার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

এই ওভারহেড প্রজেক্টরের বাক্সের চারিপাশের প্লাইউডের ছিদ্রাবলী 100 ওয়াট বাল্বের উত্তাপ বিকিরণের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই একটানা অনেকক্ষণ ব্যবহার করা যাবে না। এজন্যে একপাশে ছোট গরম বায়ু নিষ্কাশক ফ্যান লাগালে ভাল হয়। একটি মিনমোটরের সঙ্গে তিন বা চার ইঞ্চি ব্যাসের টিনের চাকতি কেটে পাখা বানিয়ে তা জুড়ে দিলে বায়ু নিষ্কাশক ফ্যান তৈরি হবে।

শ্রীনিখিলেশ মিত্র*

* বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম, 19এ, গুরুসদয় রোড, কলিকাতা-700 019

কীট-পতঙ্গের সন্তান-বাৎসল্য

কীট-পতঙ্গেরা তাদের সন্তানের জন্যে সতর্ক থাকে। প্রায় প্রতিটি কীট-পতঙ্গই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে এবং তার সুখ-সুবিধার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে। ডিম-অবস্থা থেকে সুরু করে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা পর্যন্ত প্রয়োজন হয় পিতামাতার যত্ন ও সতর্কতা। ডিম-অবস্থায় প্রয়োজন উপযুক্ত আস্তানা ও পরবর্তী জীবনদশায় পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে ডিম পাড়ার পরেই মায়ের মৃত্যু ঘটে। এই সময় যাতে ডিমগুলি নষ্ট না হয়, তার জন্যে মায়েরা ডিম-পাড়ার আগেই উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করে ও সেখানে ডিম পাড়ে। কিন্তু প্রজাপতি গোষ্ঠিভুক্ত কিছু পোকা বসন্তকালে গাছের পাতার উপরই ডিম পাড়ে ও এক রকম আঠার সাহায্যে ডিমগুলিকে পাতার সঙ্গে আটকে রাখে। শুধু পাতার সঙ্গে আটকে রাখলেই কীট-পতঙ্গের দায়িত্ব শেষ হয় না। শরৎকালে গাছের পাতা ঝরে যাবার ঠিক আগে কীট-পতঙ্গ আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা তখন ডিমযুক্ত পাতাগুলিকে গাছের ডালের সঙ্গে আটকাবার ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হয়।

কীট-পতঙ্গেরও আবার শত্রু আছে। কিছু শত্রুর কাজ চুরি করে ডিম খাওয়া। তাই এই সমস্ত ডিম-খেকো শত্রুর হাত থেকে ডিম রক্ষা করার জন্যে কীট-পতঙ্গ এমন জায়গায় ডিম পাড়ে, যাতে শত্রুর নজরে সহজে না পড়ে। এই কারণে অধিকাংশ কীট-পতঙ্গই গাছের গুঁড়ি, পাথর বা অন্য কোন বস্তুর নীচে এবং গাছের ডাল, পাতা, ফল বা পাথরের গায়ে কোন গর্ত বা ফাটলের মধ্যে ডিম পাড়ে। অনেক সময় মাটির নীচে গর্ত করে সেখানেও ডিম পাড়তে দেখা যায়। অনেক কীট-পতঙ্গ ডিমের চারধারে একটা রক্ষাকারী আবরণ তৈরি করে। আরশোলার ক্ষেত্রে এই রকম আবরণ দেখা যায়। জলজ পোকারাও তাদের ডিম রক্ষার জন্যে সদাব্যস্ত। আর এই কারণে তাদের ডিমগুলি জলে ভেসে বেড়ানো পাতার নীচে সিল্কের সুতোর মত এক ধরণের সুতো দিয়ে তৈরী আবরণে ঢাকা থাকে।

শুধু ডিম রক্ষা করলেই তো চলবে না। পরবর্তী জীবনদশার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও করতে হবে মা-বাবাকে। ডিম ফুটে যে অপরিণত লার্ভা বেরোবে তার জন্যে চাই উপযুক্ত বাসস্থান আর পরিমিত খাবার। বালি, পাথর, গোবর, মোম, পাতা বা কাগজের টুকরো ইত্যাদির সাহায্যে তৈরি হয় লার্ভার ঘর। এক ধরনের উইভিল (Weevil, ছুঁচলো মাথাওয়ালা গুবরেপোকা) গাছের পাতা পাকিয়ে চুরুটের আকারে পরিণত করে তার মধ্যে লার্ভার থাকার ব্যবস্থা করে। কিছু

মাকড়সা দেহনিঃসৃত সিল্কের সুতোর সাহায্যে গাছের পাতাকে লম্বানলের আকারে পরিণত করে ও এই নলের ভিতর ডিম পাড়ে এবং এখানেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। পাতার এই ঘরের এক ধারে বাইরে বেরোবার পথ. ও অপর ধারে ভিতরে ঢোকার পথ থাকে।

ডিমের মত লার্ভাকেও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে এদের মধ্যে ভীষণ তৎপরতা দেখা যায়। প্রায় সব লার্ভার আস্তানার পথ বন্ধ করার ও শত্রুর চোখকে ঠকানোর উপযুক্ত করে তৈরি করা হয় এবং বাসাকে ঘিরে কতকগুলি নকলপথ তৈরি করে রাখা হয়।

শত্রুমুক্ত উপযুক্ত বাসস্থান তৈরির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। তাইতো অনেক পোকা এমন জায়গায় ডিম পাড়ে, যার ধারেকাছে থাকে লার্ভার উপযুক্ত খাবার। যেখানে আগে থেকে খাবারের ব্যবস্থা থাকে না সেখানে মায়েদের দায়িত্ব লার্ভার খাবার তৈরি করা। কিছু কাঠখেকো পোকা [আইপিডি (Ipidae) গোত্রভুক্ত] লার্ভার জন্যে কাঠের কোন সুড়ঙ্গের ভিতর ছত্রাক চাষ করে। দক্ষিণ আমেরিকার ইয়ুকা (Yucca) মথের লার্ভা পছন্দ করে ইয়ুকা গাছের বীজ। সেজন্যে এই মথ নিজের সন্তানের স্বার্থে ইয়ুকাফুলের পরাগসংযোগে সাহায্য করে। লার্ভার খাদ্যের তালিকা দেখলে দেখা যায়, এরা অনেক রকম খাবার খায়। যেমন, তাজা বা পচা সব্‌জি, গরু বা ঘোড়ার মল, ফুলের রেণু, কোন পোকার বা অন্য কিছুর মাংস। গুব্‌রে পোকারা তৈরি করে গোবরের ছোট ছোট বল আর এই বলগুলিকে তারা বয়ে নিয়ে যায় তাদের লার্ভার বাসায়। কিছু সামাজিক বোলতা তাদের হুল ও বিষের সাহায্যে মাকড়সা, উইচিংড়ে ও শুঁয়াপোকাকে আধমরা করে বাসায় নিয়ে আসে লার্ভাকে খাওয়াবার জন্যে।

সব সময় শত্রুমুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করেই মা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তাই তারা ডিম বা লার্ভার বাসার কাছে কড়া পাহারায় থাকে বা পিঠে করে বয়ে বেড়ায় এই ডিম বা লার্ভাকে। অধিকাংশ ছারপোকা শ্রেণীর পোকা, মেম্ব্রাসিড, থ্রিপস ও ক্রাইসোমেলিড তাদের দেহ দিয়ে ডিম ঢেকে রাখে ও কোন শত্রু এলে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেও ছাড়ে না। এক ধরণের জলজ গুব্‌রে পোকা (হাইড্রোফাইলিড) সিল্কের আবরণে ডিমগুলি আবৃত করে দেহের নীচের দিকে রেখে দেয় এবং যতক্ষণ না ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে ততক্ষণ বয়ে বেড়াবে। কিছু আরশোলা তাদের অপরিণত বাচ্চাকে দেহের শক্ত আবরণের নীচে রেখে দেয়। এছাড়া যেখানে মাটির নীচে ডিম বা লার্ভার থাকবার ব্যবস্থা হয়, সেখানে মায়েরা সর্বদা সতর্ক পাহারায় ব্যস্ত থাকে। মাকড়সার ক্ষেত্রেও ডিম পিঠে করে বয়ে বেড়াতে দেখা যায় এক বিশেষ ধরণের মাকড়সা ডিমগুলিকে একটা সিল্কের আবরণে আবৃত করে বুকের নীচে আটুকে রাখে।

বেশীর ভাগ কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে শুধু স্ত্রীদেরই দায়িত্ব সন্তানের সুবিধার দিকে নজর রাখা। অধিকাংশ পুরুষ কীট-পতঙ্গ সন্তানের কথা একটুও ভাবে না। কিন্তু অনেক পুরুষ কীট-পতঙ্গকে আবার মায়েরা জোর করে ভাবতে বাধ্য করে। যেমন অনেক জলজ ছারপোকার মায়েরা জোর করে পুরুষ ছারপোকার ঘাড়ে চেপে বসে এবং পিঠের উপর ডিম পেড়ে আঠা দিয়ে আটকে দেয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোচ্ছে ততক্ষণ ডিমের বোঝা পিঠের উপর থাকে। এছাড়া অনেক সময় পুরুষ কীট-পতঙ্গ স্ত্রী কীট-পতঙ্গের কাজেও সাহায্য করে।

অনেক কীট-পতঙ্গ আছে, যারা অন্য কীট-পতঙ্গের বাসায় ডিম পাড়ে বা তাদের বাচ্চাদের জন্যে মজুত খাবারে ভাগ বসায়। বেমবেক্স (Bembex) গোষ্ঠীভুক্ত বোল্‌তা যখন তার ভাবী সন্তানদের জন্যে পিঠে করে আধমরা মাছি বাসায় বয়ে নিয়ে যায়, তখন মিল্টোগ্রাম্মা (Miltogramma) নামে এক মাছি ঐ আধমরা মাছির পিঠে ডিম পেড়ে দেয়। ফলে মিল্টোগ্রাম্মার ডিম বোল্‌তার বাসায় পৌঁছয় ও লার্ভা অবস্থায় বোল্‌তার লার্ভার খাবারে ভাগ বসায়। সিটারিস (Sitaris) নামে দক্ষিণ ইউরোপের এক ধরণের গুব্‌রে পোকা মৌমাছির বাসার মুখে ডিম পেড়ে রাখে। তারপর ডিম ফুটে যে লার্ভা বেরোয়, সেগুলি মৌমাছির দেহের রোমের সঙ্গে আট্‌কে গিয়ে মৌমাছির বাসায় ঢোকে তার তারপরেই সুরু হয় বাসার মালিকের বাচ্চাদের জন্যে মজুত খাবারে ভাগ বসানো।

শ্রীঅশোককান্তি সান্যাল*

* ভারতের প্রাণিতাত্ত্বিক সমীক্ষা, কলিকাতা-12

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 : নিউটনের গতির তিনটি সূত্রের কি কোন প্রমাণ আছে? যদি থাকে, তবে তা কি?

রমা পাল, মেদিনীপুর

প্রশ্ন 2 : কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীর চোখ অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে। এর পিছনে কি কোন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া যুক্ত?

দুলালকুমার জানা, মেদিনীপুর

উত্তর 1 : নিউটনের গতির সূত্রগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম (law of nature)। প্রাকৃতিক নিয়মকে বিজ্ঞানে প্রমাণ করার চেষ্টা ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়। কিছু পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির স্বপক্ষে আপাতযুক্তি (plausible reason) তুলে ধরা হয় যাতে মনে হয় এটি যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে মেনে নেওয়া যায়, অনেকটা গণিতের স্বতঃসিদ্ধের মত। প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নেবার পর তাথেকে গণিত বা অনুরূপ যুক্তিসম্মত উপায়ে নানা ফলাফল বের করা হয় আর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লব্ধ ফলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয় ও যদি মেলে তবে ধরা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হল। যদি কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দ্বারা ফল না মেলে তবে আরও সাধারণভাবে ঐ সব প্রাকৃতিক নিয়মকে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। এসব কথাই নিউটনের গতিনিয়ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

উমা বসু*

* ফলিত গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা 700 009

উত্তর 2: কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীদের চোখ অন্ধকারে যে জ্বল জ্বল করে তার সঙ্গে জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। এ সমস্ত প্রাণীর চোখের গঠন এমনই যে আপতিত স্বল্প এবং ক্ষীণ আলোকও তাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। এর ফলেই তাদের চোখ জ্বল জ্বল করে। তবে, এরকম ঘটনার সময় বোঝা যায় যে, কোথাও নিশ্চয়ই আলো আছে। আবদ্ধ ঘরে সম্পূর্ণ অন্ধকার করে ঐ সমস্ত জন্তুদের নিয়ে পরীক্ষা করে তাদের চোখের কোন দীপ্তি পাওয়া যায় নি।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

শোক-সংবাদ

জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 29শে মে, '77 শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

অধ্যাপক সুনীতিকুমারের মৃত্যুতে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হল।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বলুন তো—

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা এখন এত জনপ্রিয় কেন??

তবে শুনুন এর কারণ—

—ঃ মাত্র পাঁচটি ঃ—

তা হল—

এক ঃ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন;

দুই ঃ নানান ধরণের আকর্ষণীয় ফিচার সংযোজন;

তিন ঃ "বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর"-এ সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান;

চার ঃ প্রতি মাসে "মডেল তৈরি"—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসহ প্রকাশ;

পাঁচ ঃ বিষয়বস্তু নির্বাচনে বহুমুখীনতা।

এছাড়া ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা নিশ্চয়ই রাখে না।

বিজ্ঞান-মানসিকতা উন্মেষের জন্যে একমাত্র মাসিক সচিত্র বিজ্ঞান পত্রিকা—"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"—পড়ুন ও পড়ান।

JNAN-O-BIJNAN
Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta.)
June, 1977

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগটি নব-কলেবরে সুসজ্জিত করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে উদ্বোধন করা হয়েছে।

* ১ ১ *

আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—[illegible], কলিকাতা-700 009
মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

মাসিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	পূর্ণপৃষ্ঠা	অর্ধপৃষ্ঠা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
তৃতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
চতুর্থ প্রচ্ছদপট	250·00 টাকা	—
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপটমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
পঠনীয় বিষয়বস্তুমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	125·00 টাকা	65·00 টাকা
সাধারণ সিকিপৃষ্ঠা	40·00 টাকা	

বিজ্ঞাপনের এই হার কেবলমাত্র এক রঙের জন্যে। বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চুক্তিবদ্ধ হলে যথাক্রমে 7½% এবং 5% রিবেট দেওয়া হয়।

বি. দ্র. এই হার নূতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চুক্তিবদ্ধ পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হারই বহাল থাকবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন: 55-0660

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে ঐ পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
"সত্যেন্দ্র ভবন"
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্যে পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র'-এর ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সঙ্গে উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করা যাবে। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাবে। তাঁর সঙ্গে পূর্বে যোগাযোগ করে পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্যগণের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

তাং 27.11.77
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন: 55-0660

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুক-পোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ | জুলাই, 1977 | সপ্তম সংখ্যা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র নুতন ভাবনা

জনসাধারণের নিকট বিজ্ঞান প্রচার করবার উদ্দেশ্যে 1947 সালে সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস। আচার্য বোসের নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় 1948 সালের জানুয়ারীতে পরিষদের ।নিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বের এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মাতৃভাষায় প্রচারের জন্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশন সুরু হয় ঐ জানুয়ারী মাসেই। 1948 সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র-ছাত্রী এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্যে এই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর মধ্যেই 'ছোটদের পাতা' নামক একটি বিভাগ খোলা হয়। 1950 সালে এই ছোটদের পাতাটির নামকরণ হয় 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর'। 1977-এর জানুয়ারীতে এই বিভাগটির নামকরণ করা হয়েছে 'বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর'।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয় পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসে এত সুদীর্ঘকাল 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ একটি বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

গত মার্চ '77 মাসে সম্পাদকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হয়েছে ও সম্পাদকমণ্ডলীর 5ই এপ্রিল '77-এর প্রথম অধিবেশনে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার উদ্দেশ্য ও সাধনা আরও সুষ্ঠুভাবে করবার জন্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ অতিরিক্ত আরও দুটি বিশেষ বিভাগ প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দুটি বিভাগ 'মানব কল্যাণে বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান সংবাদ'। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ সুদীর্ঘকাল 'সঞ্চয়ন', 'বিজ্ঞান সংবাদ' ও পত্রিকার শেষে 'বিবিধ' এই তিনটি বিভাগ ছিল।

ঐ কালে 'মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের' বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নানা কারণে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর কয়েকটি সংখ্যায় বিজ্ঞান সংবাদ পরিবেশন করা হয় নাই। বর্তমানে ঐ সব প্রবন্ধকে দুটি বিভাগ করে সুসংগঠিত করবার চেষ্টা হচ্ছে।

1971 সালে পরিষদের কার্যকরী সমিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিজ্ঞানের গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ও দেশ বিদেশে এই সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি, বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার নিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে। যদিও এই সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। তবু দেখা যায় বহু সংখ্যায় এইরূপ সিদ্ধান্তমত প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। নবগঠিত সম্পাদকমণ্ডলীর অধিবেশনেও এইরূপ প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিষদের সভাপতির প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি সংখ্যায় দেশ-বিদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জীবনীর পাতা থেকে যে সব ঘটনা, যা বিজ্ঞান সাধনার কোন না কোন দিককে ফুটিয়ে তোলে, সে সব ঘটনা আকর্ষণীয়ভাবে 'বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরে' প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা দেবার জন্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্পাদকমণ্ডলীর এই অধিবেশনের সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পরে কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই সব প্রস্তাব সমর্থিত হয়।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নূতন ভাবনা অনুযায়ী চারটি বিভাগ থাকবে। 'বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরে' থাকবে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের জীবনীর পাতা থেকে নেওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিজ্ঞানের নানা শাখা, বিজ্ঞানীদের জীবনী, হাতেনাতে করে দেখার জন্যে মডেল তৈরি, ভেবে কর, ভেবে উত্তর দাও এবং প্রশ্ন ও উত্তর প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী নানা প্রবন্ধ একটি সংখ্যায় অংশ হিসাবে দেওয়া সম্ভব হবে। বিজ্ঞান সংবাদ বিভাগে থাকবে বিশ্ব সংবাদ, ভারতীয় সংবাদ, আঞ্চলিক সংবাদ, পরিষদের সংবাদ ও গ্রন্থ সংবাদ। বিশ্ব সংবাদ উপবিভাগে থাকবে—বিজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, নানা ঘটনার প্রকল্প প্রভৃতির বিবরণ। অনুরূপভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ ও আঞ্চলিক সংবাদ, ভারতীয় বা আঞ্চলিক বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীদের বা বিজ্ঞান সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাদি ও বিজ্ঞান প্রকল্প জানানো হবে।

পরিষদ সংবাদে পরিষদ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাদি, সভ্য, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের জন্য পরিষদের আকর্ষণীয় কার্যসূচী ঘোষণা ও বিবরণ দেওয়া হবে।

গ্রন্থ সংবাদে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক পরিষদ দপ্তরে সমালোচনার জন্যে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুস্তকের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশক ও দাম পত্রিকায় ঘোষণা করা হবে। পরে যথা সময়ে সম্ভবপর স্থলে ঐ পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করা হবে।

মানব কল্যাণ বিভাগে থাকবে খাদ্যোৎপাদন বা সমাজ উন্নয়নে বিজ্ঞান, মানব শরীর ও বিজ্ঞান, মানব মন ও বিজ্ঞান, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান। এই সব উপবিভাগে বিজ্ঞানের নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

জনসাধারণের নিকট সার্থকভাবে বিজ্ঞান প্রচারে এই সব বিজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা সন্দেহাতীত।

সাধারণ বিভাগে প্রকাশিত হবে সম্পাদকীয় (এ বিষয়ে উপরেই বলা হয়েছে)। বিজ্ঞানের নানা শাখার ও বিজ্ঞানীর জীবনী ও বিজ্ঞান সংস্থা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধের জনপ্রিয়তা, তথ্যের নির্ভুলতা ও জনজীবনের

উপযোগিতা হিসাবে বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র এই নবরূপায়ণের জন্যে চাই প্রত্যেক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের (যাঁরা মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাংলায় লেখায় অভ্যস্ত) সমবেত প্রয়াস। এ জন্যে প্রত্যেক সভ্যকে, গ্রাহককে, অনুগ্রাহককে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন উপরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনপ্রিয় তথ্যনির্ভুল প্রবন্ধাদি পাঠান। বিচারকের নিকট পরিষদ থেকে প্রেরিত প্রবন্ধাদি যথা শীঘ্র সম্ভব বিচার করে তা পত্রিকাতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ এবং পত্রিকাকে আরও জনপ্রিয় করবার মতামত সম্পাদক মণ্ডলী বিবেচনা করবেন। এছাড়া পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং সভ্য-সভ্যাদের পত্রিকা সম্বন্ধে মতামত জানবার জন্যে ষান্মাসিক কিংবা বার্ষিক পাঠক সম্মেলনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে কয়েক বছর আগে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পৃষ্ঠাসংখ্যা কমাতে হয়েছে। এ পর্যন্ত তা বাড়ানো সম্ভব হয় নাই পত্রিকার আদর্শ সার্থক রূপায়ণে এই পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক, কিন্তু এর জন্যে মূল্য-বৃদ্ধি হলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র উদ্দেশ্য সাধন ব্যাহত হবে। এজন্যে চাই সরকারের, নানা বেসরকারী বিজ্ঞানানুরাগী প্রতিষ্ঠানের ও সঙ্গতিসম্পন্ন বিজ্ঞানানুরাগীর অর্থানুকূল্য। আশা করা যায়, অর্থাভাবে এই মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

শুল্বসূত্রের জ্যামিতি ও গণিত*

(1)

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন**

[আমাকে 'শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা' দেবার আমন্ত্রণের জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বর্গীয় শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন। তাঁর জন্ম 1878 সালের 8ই অক্টোবর, শিক্ষা 24 পরগণার বরিষা হাইস্কুলে ও প্রেসিডেন্সী কলেজ। তাঁর কর্মজীবন অতি-বাহিত হয়েছিল বিবিধ সরকারী কাজে এবং পাটনার জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন 1934 সালে। শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় দানশীল বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। সরশুনার দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র, যাদবপুরের কিরণশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল, বেহালার বিদ্যালয় ইত্যাদি তাঁর দানশীলতার সাক্ষ্য বহন করছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য। এবিষয়ে তিনি যেসব প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে-ছিলেন সেগুলি এখন গবেষণার বিষয়। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর এই গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করেই আমি আমার বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন করেছি শুল্বসূত্রের জ্যামিতি]

প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উৎস তাঁদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। ঋক্, সাম, যজুস, অথর্ব এই চার সংহিতা, তাদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ নিয়ে বৈদিক সাহিত্যের বিপুল কলেবর।

* 14ই মে '77 প্রদত্ত 'শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা' (তৃতীয়)

** ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টি-ভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুর, কলিকাতা-700 032

যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিশ্বকল্পনার মধ্য দিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করা বৈদিক ঋষিদের প্রধান লক্ষ্য হলেও এর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান। বেদ ক্রমশঃ পুরনো হয়ে এলে, বৈদিক সভ্যতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে বেদের মর্মোদ্ধারকল্পে প্রয়োজন হল বেদের এই সব অন্তর্নিহিত জ্ঞান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করবার। সূত্রযুগে আনুমানিক ছ-শ' থেকে দু-শ' খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আমরা এ ধরনের গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি। বেদ জ্ঞান লাভের অপরিহার্য অঙ্গ বলে এদের পরিচয় 'বেদাঙ্গ' হিসাবে। বেদাঙ্গের বিষয় ছটি: শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। সহজে মনে রাখবার প্রয়োজনে যতদূর সম্ভব অল্প কথায় সূত্রের আকারে গ্রন্থগুলি লেখা। সমাসবদ্ধ শব্দকে মুক্তোর মত পর পর গেঁথে দুরূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতীয়রা এই যে এক অভিনব সূত্র-সাহিত্যের অবতারণা করেছিলেন সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা নেই।

শুল্বসূত্রের ইতিহাস

আমরা বলেছি বেদাঙ্গের এক শাখা কল্প। কল্প মানে অনুষ্ঠান। বিবিধ অনুষ্ঠানের রীতি, নীতি, পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনার জন্য যেসব সূত্রগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল সামগ্রিকভাবে তাদের নাম কল্পসূত্র। কল্পসূত্র চারভাগে বিভক্ত—শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ব। যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দেওয়া শ্রৌতসূত্রের মূল উদ্দেশ্য। একাজে প্রয়োজন হয় নানা ধরণের যজ্ঞবেদি ও অগ্নিবেদি তৈরি করবার। এই বেদি স্থাপনের ক্রিয়াকৌশল লিপিবদ্ধ শুল্বসূত্রে। বলা বাহুল্য, এক ধরণের জ্যামিতি ও গণিতের অবলম্বন ছাড়া বেদি নির্মাণ সম্ভবপর নয়। তাই অনিবার্য কারণেই শুল্বসূত্রের মধ্যে বৈদিক হিন্দুদের প্রাথমিক জ্যামিতিক ও গাণিতিক জ্ঞান প্রচ্ছন্ন। প্রাচীন ভারতে কিভাবে জ্যামিতি ও গণিতের বিকাশ হল সেটা বুঝতে হলে এই শুল্বসূত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে উপায় নেই।

'শুল্ব' শব্দটির অর্থ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শুল্ব মানে রজ্জু বা দড়ি। এই শব্দের মূল 'শুল্ব' মানে 'মাপা' বা 'মাপ গ্রহণের ক্রিয়া'। অর্থাৎ দড়ির সাহায্যে মাপ গ্রহণ করবার পদ্ধতি সূত্রাকারে যেসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তাদেরই বলা হয় শুল্বসূত্র। স্বভাবতঃই আমাদের মনে হবে মিশরীয় রজ্জু সম্প্রসারক বা 'হার্পেনদোনাপ্তি'দের কথা। দড়ি নিয়ে জমি মাপজোখের ব্যাপারে হার্পেন-দোনাপ্তিরা বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং তাদের পদ্ধতি অবলম্বন থেকেই পরে পরিমিতি ও জ্যামিতির উদ্ভব হয়। দেখা যাচ্ছে বৈদিক ভারতবর্ষেও অনুরূপ পদ্ধতিতে মাপজোখের কাজ চালু হয়েছিল এবং একাজে পটু শুল্ববিদদের তৎপরতায় ভারতীয় জ্যামিতির বনিয়াদ স্থাপিত হয়। মানব-শুল্বসূত্রে শুল্ব বিজ্ঞান বলতে ব্রাহ্মণদের জ্যামিতিকেই বোঝানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, কুশলী জ্যামিতিবিশারদ হিসাবে শুল্ববিদরা যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন তারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

শুল্বসূত্র যখন শ্রৌতসূত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তখন প্রত্যেক শ্রৌতসূত্রেরই একটি করে শুল্বসূত্র থাকা উচিত। চতুর্বেদের প্রত্যেকটির একটি করে শ্রৌতসূত্র আছে; সুতরাং প্রত্যেক বেদের শুল্বসূত্র থাকবে এটি আশা করাই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে যজুর্বেদের বিভিন্ন শাখার মাত্র কয়েকখানি শুল্বসূত্র। যজুর্বেদের বহু শাখা, যেমন কাঠক বা চরয়নীয়-কঠ। কপিষ্ঠল (কঠ), মৈত্রায়নী, তত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী। সূত্র রচনার দিক থেকে তত্তিরীয় শাখার যজুর্বেদীরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও তৎপর। এই শাখার অন্তর্ভুক্ত বৌধায়ন

আপস্তম্ব, বাধুল ও হিরণ্যকেশী প্রত্যেকেই শুল্বসূত্র রচনা করেছেন যদিও আমরা হাতে পেয়েছি কেবল বৌধায়ন ও আপস্তম্বের শুল্ব। মৈত্রায়নী শাখায় মানব শুল্বসূত্র পাওয়া গেছে, বারাহ-শুল্ব সূত্র নিখোঁজ। কাঠক-কপিষ্ঠল শাখায় লৌগাক্ষী-কৃত এক শুল্বসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাজসনেয়ী বা শুক্লযজুর্বেদী সূত্রকার কাত্যায়নের খ্যাতি বহু বিস্তৃত; তাঁর কাতীয় শুল্বসূত্র কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। অতএব বহু শুল্বসূত্র রচিত হলেও আমরা অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছি বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন ও মানবের শুল্বসূত্র। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশি।

শুল্বসূত্রগুলি কবেকার রচনা? সূত্রকারদের সময় ঠিকভাবে নির্ণয় করবার ব্যাপারে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা থাকলেও এঁদের প্রাচীনত্বের একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভবপর। গেঅর্গ বুয়েহ্‌লার বৌধায়ন ও আপস্তম্বকে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র-দেশের অধিবাসী বলে সাব্যস্ত করেছেন। রামগোপালের মতে, এঁরা সম্ভবতঃ আর্যাবর্তের গঙ্গা-যমুনার দোআবের লোক। কাত্যায়ন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা সম্ভবপর হয় নি। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির সময়ের বিচারে শুল্বকারদের সময়ের একটা হিসাব পাওয়া যেতে পারে। অধিকাংশ পণ্ডিতদের অভিমত পাণিনির সময় 350 খৃষ্টপূর্বাব্দ। তার মানে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি তৎপর ছিলেন। সূত্র রচনার অন্তর্নিহিত বিচার থেকে বৌধায়ন ও আপস্তম্ব নিঃসন্দেহে পাণিনির পূর্ববর্তী। একই কারণে কাত্যায়ন পাণিনির পরবর্তী। বুয়েহ্‌লার আপস্তম্বকে স্থাপন করেছেন পাণিনির 150 থেকে 200 বছর আগে। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের বিশিষ্ট সম্পাদক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত রিচার্ড গার্বের মতে আপস্তম্বের কাল কোনক্রমেই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পরে হতে পারে না। সুতরাং বৌধায়ন ও আপস্তম্ব যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর কোন এক সময় জীবিত ছিলেন এরকম মনে করা অযৌক্তিক হবে না। মানবের সময় সম্ভবতঃ বৌধায়ন ও আপস্তম্বের মাঝামাঝি। পাণিনি পরবর্তী কাত্যায়নের সময় বেরিডেল কীথ মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব 250; ম্যাকডোনেল ও এগেলিং-এর মতে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বৌধায়ন মানব, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন যে সময়েই জীবিত থাকুন ও তাঁদের সূত্রগ্রন্থ রচনা করুন না কেন, যেসব বেদি ও অগ্নি স্থাপনের নিয়ম তাঁরা আলোচনা করেছেন সে সব বেদি ও অগ্নি যে আরো সুপ্রাচীন এবং তাদের উল্লেখ যে সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে সুস্পষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। যজ্ঞের হোতা অধ্বর্যু ও অন্যান্য পুরোহিতের উপবেশনের ও যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত উচ্চস্থানের নাম বেদি, যেমন, মহাবেদি, দর্শ-পূর্ণমাস বেদি, সৌত্রামণি বেদি, পৈত্রিকী বেদি, উত্তর বেদি ইত্যাদি। যজ্ঞের অগ্নিস্থাপনের জন্য যেসব বেদি তৈরি হত তাদের নাম অগ্নিবেদি। কতকগুলি তৈরি হত বরাবরের জন্য—আহবনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি হল এ জাতীয় নিত্য অগ্নি। আর বিশেষ বিশেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য যেসব অগ্নির নির্দেশ ছিল সেই কাম্য অগ্নির দৃষ্টান্ত হল শ্যেনচিৎ, কঙ্কচিৎ, প্রৌগচিৎ, দ্রোণচিৎ, রথচক্র-চিৎ ইত্যাদি। ঋগ্বেদের বহু জায়গায় গার্হপত্য অগ্নির উল্লেখ আছে,—'গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা' (1/15/12)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, একুশটি ইট দিয়ে গার্হপত্য ভিত্তি তৈরি করতে হবে—'প্রতিষ্ঠা বা একবিংশাঃ প্রতিষ্ঠা গার্হপত্যা' ইত্যাদি (5/2/3/5)। শ্যেনপাখির আকৃতি অনু-করণ করে যে অগ্নিবেদির স্থাপনা তার নাম শ্যেনচিৎ; স্বর্গলাভ যাদের কামনা তারা এ ধরনের বেদিতে যজ্ঞ সম্পাদন করবেন। এ বিষয়ে

তৈত্তিরীয় সংহিতা বলছে—'শ্যেনচিতং চিন্বিত সুবর্গকামঃ শ্যেন বৈ বয়সাং প্রতিষ্ঠা শ্যেন এব ভূত্বা সুবর্গংপতিত' (5/4/11/1-31)। এরকম ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সূত্রযুগের প্রারম্ভে শুল্বসূত্র রচিত হলেও তাদের অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক ও গাণিতিক জ্ঞান অনেক আগে সংহিতা-ব্রাহ্মণের কালেই উদ্ভূত হয়েছিল।

এ সব বেদির কারো আকার সমচতুর্ভুজ, কারো আয়ত, কারো ত্রিভুজ, কারো গোল, কারো বা আবার বক্রপক্ষ ব্যস্ত পুচ্ছ শ্যেনপাখির মত। নির্দিষ্ট সংখ্যক ইট দিয়ে নির্দিষ্ট আয়ত ক্ষেত্রের এসব বেদি তৈরি করতে হলে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির সঙ্গে যেমন পরিচয় থাকা দরকার তেমনি দরকার এক আকৃতিকে অন্য আকৃতিতে রূপান্তরিত করবার জ্ঞান। শুল্ব-কাররা তাই প্রথমেই আলোচনা করেছেন বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মাপবার বিবিধ মাপ। তারপর চতুর্ভুজ ত্রিভুজ, গোল ইত্যাদি ক্ষেত্র-রচনার এবং এক ধরনের ক্ষেত্রকে অন্য ধরনের ক্ষেত্রে পর্যবসিত করবার কৌশল। এই কৌশলের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁরা তথাকথিত পিথাগোরাসের সূত্র আবিষ্কার করেছেন, আবিষ্কার করেছেন অমূলদ সংখ্যা ও নির্দেশ দিয়েছেন π-এর স্থূল মানের। এমন কি পরোক্ষভাবে অনির্দেশ্য সমীকরণের সমাধানেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় শুল্বকারদের এই আলোচনার মধ্যে।

এককের মাপ

বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ শুল্বকাররা দৈর্ঘ্যের এককের যে সব মাপ দিয়েছেন তা এই রকম :

1 অঙ্গুল = 14 অণু = 34 তিল
1 ক্ষুদ্রপদ = 10 অঙ্গুল
1 প্রাদেশ = 12 „
1 পদ = 15 অঙ্গুল
1 ঈষা = 188 „
1 অক্ষ = 104 „
1 যুগ = 86 „
1 জানু = 32 „
1 শম্যা = 36 „
1 বাহু = 36 „
1 প্রক্রম = 2 পদ
1 অরত্নী = 2 প্রাদেশ = 24 আঙ্গুল
1 পুরুষ = 5 অরত্নী = 120 „
1 ব্যাম = 5 অরত্নী
1 ব্যায়াম = 4 অরত্নী

এক অঙ্গুল হল 3/4 ইঞ্চির কাছাকাছি।

বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্র

বর্গক্ষেত্র (সমকোণী সমচতুর্ভুজ) ও আয়তক্ষেত্র আঁকবার একাধিক পদ্ধতি বিভিন্ন শুল্বসূত্রে দেওয়া হয়েছে। সবগুলিই সমকোণ রচনা করবার নিয়ম এবং তা থেকেই বেরিয়ে এসেছে পিথাগোরাসের উপপাদ্য। কয়েকটি নিয়ম এখানে বলছি।

প্রথম নিয়ম : বৌধায়নের এক সূত্র অনুযায়ী বর্গক্ষেত্রের বাহুর মাপের একটি দড়ি দিয়ে তার দু-প্রান্তে দুটি গিঁঠ ও ঠিক মাঝখানে একটি চিহ্ন দিয়ে দড়িটিকে মাটিতে প্রাচী অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম বরাবর রেখে তার সমান দাগ কাটতে হবে। EW এই দাগ (চিত্র 1)। E ও W-তে একটি করে শঙ্কু বসানো হোক। দড়ির এক প্রান্তের গিঁঠ E শঙ্কুতে গলিয়ে দিয়ে আর এক প্রান্ত টেনে একটা একটা বৃত্ত আঁকতে হবে ; তারপর W শঙ্কুকে কেন্দ্র করে অনুরূপ আর একটি বৃত্ত। বৃত্তদ্বয়ের ছেদ বিন্দু N′, S′ বরাবর রেখা হবে উত্তর-দক্ষিণ রেখা। দড়ির মাঝখানের চিহ্ন EW-র মধ্যে বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়ে N′S′-এর অভিমুখে দড়ির দৈর্ঘ্যের মাপে NS টানা হোক। এবার E, W, N ও S-এ শঙ্কু স্থাপন করে দড়ির দু-প্রান্তের

গিঁঠ এক সঙ্গে শঙ্কুর মধ্যে গলিয়ে দিয়ে মাঝখানের চিহ্ন টেনে পর পর চারটি বৃত্ত আঁকা

চিত্র 1　　চিত্র 2
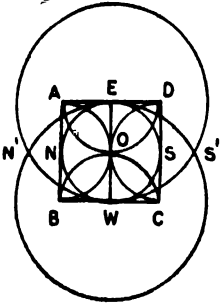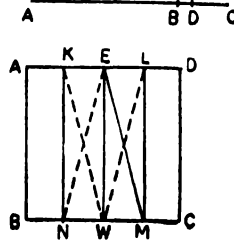
যাক। বৃত্তগুলি ছেদ করবে A, B, C ও D বিন্দুতে। রেখা টেনে বিন্দুগুলি যোগ করে দিলে আমরা বর্গক্ষেত্র পেয়ে যাব। এই অঙ্কন-পদ্ধতির মধ্যে একটি সরল রেখাকে দ্বিখণ্ডিত করবার ও তার মাঝের বিন্দুতে লম্ব টানবার পদ্ধতি সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় নিয়ম: আয়তক্ষেত্র রচনা করবার একটি উপায় নির্দেশ করেছেন আপস্তম্ব এইভাবে। পূর্ব-পশ্চিম রেখা বা পৃষ্ঠা বরাবর প্রমাণ দৈর্ঘ্যের ব্যবধানে E ও W বিন্দুতে দুটি শঙ্কু স্থাপন করা হোক (চিত্র-2)। প্রমাণ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আরো অর্ধেক যোগ করে যা দাঁড়ায় ততটা লম্বা একটা দড়ি নিতে হবে। এই দড়ি হল ABC, যাতে $BC = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} EW$। দড়ির বাড়তি অংশ BC-তে এমনভাবে একটা চিহ্ন দেওয়া হোক যাতে সেই চিহ্নিত বিন্দু D-র দূরত্ব C প্রান্ত থেকে BC-র এক ষষ্ঠাংশ কম হয়। অর্থাৎ $BD = \frac{1}{6}$ BC। এবার দড়ির দু-প্রান্তে গিঁঠ বেঁধে সেই গিঁঠ E ও W শঙ্কুতে গলিয়ে দিয়ে চিহ্নিত D-বিন্দু ধরে একবার দক্ষিণে একবার উত্তরে টেনে M ও N বিন্দুতে দাগ দিতে হবে। এবার শঙ্কু দুটিতে দড়ির গিঁঠ বদলে একইভাবে D-চিহ্ন উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে K ও L বিন্দু পেতে হবে। তারপর KL MN যোগ করলে অভীপ্সিত আয়তক্ষেত্র পাওয়া যাবে। বর্গক্ষেত্র পেতে হলে দড়ির দুটি গিঁঠ একই সঙ্গে একবার E শঙ্কুতে আর একবার W শঙ্কুতে বসিয়ে D চিহ্ন ধরে KL ও MN রেখা বরাবর উত্তর-দক্ষিণে টেনে A, B, C, D বিন্দু পেতে হবে; তারপর এদের যোগ করে দিলেই চলবে।

অঙ্কনটি যে একটি সমকোণী আয়তক্ষেত্র তা দড়ির মাপ ও চিহ্ন দেবার নির্দেশ থেকেই প্রমাণ করা যায়। ধরা যাক

$AB = 2a$; $BC = a$; $BD = \frac{1}{6}a$; $DC = \frac{5}{6}a$

EMW ত্রিভুজের বাহু তিনটির মাপ যথাক্রমে এই রকম:

$EW = 2a$; $WM = \frac{5}{6}a$; $EM = 2a + \frac{1}{6}a$

$EW^2 + WM^2 = 4a^2 + \frac{25}{36}a^2 = \frac{169}{36}a^2$

$EM^2 = \left(2a + \frac{a}{6}\right)^2 = \frac{169}{36}a^2$

সুতরাং $EW^2 + WM^2 = EM^2$

পিথাগোরীয় নিয়ম অনুযায়ী $\angle EWM$ একটি সমকোণ এবং KLMN একটি সমকোণী আয়তক্ষেত্র।

একটি নির্দিষ্ট মাপের দড়িকে প্রয়োজনমত বাড়িয়ে বাড়ানো অংশের বিশেষ এক জায়গায় চিহ্ন দিয়ে উপরিউক্ত উপায়ে সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করবার অনেকগুলি পদ্ধতি শুল্বকারেরা দিয়েছেন। প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথকভাবে দুটি সংখ্যার বর্গের যোগফল তৃতীয় একটি সংখ্যার বর্গের সমান। উপরের দৃষ্টান্তে,

$$12^2 + 5^2 = 13^2$$

অন্যান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল:

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$
$$15^2 + 8^2 = 17^2$$
$$7^2 + 24^2 = 25^2$$
$$12^2 + 35^2 = 37^2$$
$$15^2 + 36^2 = 39^2$$

পিথাগোরীয় উপপাদ্য

বৈদিক শুল্বকারেরা যে আয়তক্ষেত্রের বা সমকোণীয় ত্রিভুজের কর্ণ ও বাহুদ্বয়ের সম্পর্কের ব্যাপার আবিষ্কার করেছিলেন, আয়তক্ষেত্রের উপরিউক্ত অঙ্কনের মধ্যেই তা সুপরিস্ফুট। তথাপি এখানেই তাঁরা থামেন নি। এই সম্পর্কের কথা তাঁরা সংজ্ঞার আকারে অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। সংজ্ঞাটি হল :

দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্যঙমানী চ যৎ পৃথগ্ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।

(বৌধায়ন)।

"আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর উদ্ভূত বর্গক্ষেত্রের মাপ দুই বাহুর উপর পৃথক পৃথকভাবে উদ্ভূত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের একত্রিত মাপের সমান।"

এখানে অক্ষয়ারজ্জুর মানে কর্ণ। পার্শ্বমানী ও তির্যঙমানী হল পূব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে ন্যস্ত দুই বাহু। আপস্তম্ব, কাত্যায়ন ও অন্যান্য শুল্বকারেরা প্রায় একই ধরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

উপপাদ্যটি পিথাগোরাসের নামে চলে এলেও বাস্তবিকই তিনি এর আবিষ্কর্তা ছিলেন কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। সমকোণী বা মূলদ (rational) ত্রিভুজের নিয়মের কথা যে পিথাগোরাস প্রথম বলেন সে কথা আমরা প্রথম জানতে পারি সিসেরোর লেখা থেকে আনুমানিক 50 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ পিথাগোরাসের প্রায় 500 বছর পরে। খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে ডিয়োজেনিস লেটির্যাস, তৃতীয় শতকে হেরন ও পঞ্চম শতকে প্রোক্লাস এই আবিষ্কারের উল্লেখ করেন। এর জ্যামিতিক প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ইউক্লিডের 'Elements' নামক জ্যামিতি গ্রন্থে (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী)। এ বিষয়ে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতিদের অবদানও স্মরণযোগ্য। প্রাচীন মিশরীয় কাহুন প্যাপিরাসে (খ্রীঃ পূঃ 2000) $4^2+3^2=5^2$ সম্পর্কের উল্লেখ আছে যা থেকে মূলদ ত্রিভুজের ব্যাপার টানা যায়। ব্যাবিলনীয় কিউনিফর্ম লিপিতেও এজাতীয় বর্গসংখ্যার সম্পর্ক পাওয়া গেছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীর চৈনিক পাটীগণিত 'চৌ পেই সুয়ান চিং'-এও এ জিনিস আছে। সুতরাং এটি একটি অতি প্রাচীন আবিষ্কার। যেখানেই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে, পরিমিতি ও এক ধরণের জ্যামিতি আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানেই এজাতীয় অমূলদ ত্রিভুজ সম্পর্কিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ আমরা পাই। ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেও সেই একই ধরণের জ্ঞানের পরিচয় পরিষ্কারভাবে পাওয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মুলারের স্বপ্ন

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

প্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতিতে অধ্যাপক হারমন জোসেফ মুলারের অবদান অবিস্মরণীয়। রঞ্জেন রশ্মির প্রয়োগে ড্রসোফিলা মাছির চোখের রঙ, গায়ের লোম, পাখনার আকৃতি প্রভৃতি বংশগত বৈশিষ্ট্যকে যে পাকাপাকিভাবে পাল্টিয়ে দেওয়া যায়, তা অধ্যাপক মুলার প্রথম দেখিয়েছিলেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্মে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁকে ভূষিত করা হয়।

ছোটবেলা থেকে মুলার মানব জাতিকে কি ভাবে উন্নত করা যায়, তার স্বপ্ন দেখতেন। আট বছর বয়েসে তিনি একবার বাবার সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়েছিলেন। সেখানে ঘোড়ার পায়ের ক্রমবিবর্তন দেখে তাঁর মনে হল জীবের যদি এ ধরণের রূপান্তর ঘটে, তাহলে বিবর্তন প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করে মানুষ তার উন্নতির কাজে লাগাতে পারে। ছোট বয়েসে এই ধরণের চিন্তাধারা তার মাথায় আসতো, কিন্তু প্রজনন-বিজ্ঞানের জ্ঞান গভীর না থাকায়, তিনি তা প্রকাশ করতে সাহস করতেন না।

পরবর্তীকালে মুলার ছোটবেলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কৃত্রিম শুক্র-সঞ্চালনের (artificial insemination) সাহায্যে তিনি উন্নত মানব জাতি গঠন করার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর মুলার শুক্র ব্যাঙ্ক (sperm bank) প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচার করে গেছেন। 'প্রতিভাবান' ব্যক্তিদের শুক্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করাই হবে এই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য।

যে কোন ব্যক্তির শুক্র গ্লিসেরল সহযোগে তরল নাইট্রোজেনে অনেক বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভব। হিমায়িত (frozen) শুক্র তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে তেমন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, যতটা হয় সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায়। মুলার বলতেন, যারা তেজস্ক্রিয় রশ্মির সংস্পর্শে আসেন, তাদের নিজের ও পত্নীর স্বার্থে শুক্র সংরক্ষণ করা কর্তব্য। যেসব পুরুষ স্বেচ্ছায় নির্বীজকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন, তারা যদি তাদের শুক্র সংরক্ষণ করেন, তাহলে তাদের অপত্য লাভের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হবে না। তাদের সংরক্ষিত শুক্র প্রয়োজনবোধে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া যেসব ব্যক্তি সন্তানোৎপাদনে অক্ষম অথবা বংশ-রোগগ্রস্ত তাদের স্ত্রীরা শুক্র ব্যাঙ্কের সাহায্যে সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। মুলার বিশ্বাস করতেন যে এই ধরনের ব্যাঙ্ক স্থাপিত হলে, অনেক বিবাহিত দম্পতি তাদের অন্তত একটি সন্তান প্রতিভাবান' ব্যক্তির শুক্র দ্বারা সৃষ্টি করতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। তিনি এই সব দম্পতির পছন্দমত ব্যক্তির শুক্র নির্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন; তাহলে বাঞ্ছিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য তাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

মানব জাতির উন্নতিতে অধ্যাপক মুলার যে দুটি গুণকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তা হচ্ছে সহযোগিতার মনোভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি। সহ-

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-700 009

যোগিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলতেন যে বৃহত্তর সমাজে নিত্য নতুন অবস্থায় মানুষকে মানিয়ে চলতে গেলে পারস্পরিক সাহচর্য একান্ত অনিবার্য। আর বুদ্ধিবৃত্তির সমর্থনে তিনি বলতেন যে আজকাল সামাজিক ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে এত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে যে তা হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা উন্নত সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা প্রয়োগ করে দেশকে উন্নত করতে পারেন। সহযোগিতার মনোভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া মানুষের ধৈর্য, মনের সাবলীলতা, অনুসন্ধিৎসা, সঙ্গীত-কলায় আগ্রহ, স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সাহস, উদ্যম ও সচেতনতা প্রভৃতি গুণকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে দেশের জনসংখ্যা সাধারণতঃ হ্রাস করা হয়ে থাকে, কিন্তু এর সঙ্গে সুষ্ঠু প্রজনন-নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হলে উন্নত মানব জাতি গঠন করা সম্ভব। যেসব দম্পতি প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী, তাদের বেশী সংখ্যক এবং যারা কোন গুণের অধিকারী নন, তাদের কম সংখ্যক সন্তানোৎপাদনে উৎসাহিত করাই হবে প্রজনন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য।

মানব জাতির উন্নতির জন্যে অনেকে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগকে পছন্দ করেন না। 1961 সালের সেপ্টেম্বর মাসে Science পত্রিকায় মূলারের প্রবন্ধ 'Human Evolution by Voluntary Choice of Germ Plasm' প্রকাশিত হওয়ার পর, অনেকেই তাঁর প্রজনন-পরিকল্পনাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন করতে পারেন নি। কেউ কেউ তাঁর পরিকল্পনাকে অপরিপক্ক বলে মনে করতেন। 'প্রতিভাবান' ব্যক্তির যেসব বৈশিষ্ট্য অধ্যাপক মূলার উল্লেখ করেছেন, সেগুলি পুরোপুরি বংশগত কি না, সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া কৃত্রিম শুক্র-সঞ্চালনের অপব্যবহার এবং দাতা-গ্রহীতার নির্বাচন প্রভৃতিতে পক্ষপাতিত্বের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিব গড়তে যে বানর হবে না তার কি গ্যারেণ্টি আছে? ইসিডোরা ডানকানের প্রতি জর্জ বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তিটির কথা অনেকের মনে পড়বে। অধ্যাপক মূলার এই সব সমালোচনার যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। মৃত্যুর এক বছর আগে আমেরিকার শিকাগো শহরে মানব প্রজনন-বিজ্ঞানের তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনে তিনি আবেগময় ভাষায় বলেছিলেন,

"We should not let ourselves be discouraged by the temporary difficulties. We should not only bear in mind the urgent need for success, we should also recall that, after all, man has gone from height to height, and that he is now in a position, if only he will, to transcend himself intentionally and thereby proceed to elevations yet unimagined."

সৃষ্টির অন্বেষণে

(1)

দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার*

অজানাকে জানবার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন অভ্যাস। অসীমকে চিনবার প্রচেষ্টাই ধাপে ধাপে নিয়ে চলেছে তাকে উন্নতির পথে। সে আজ অনন্ত মহাকাশের দিকে পা বাড়িয়েছে সীমিত প্রচেষ্টা নিয়ে তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে। সুদূর নীহারিকাকে জানা হয়তো কোন দিনই শেষ হবে না তার—তাই বলে সেও থেমে থাকবে না নিশ্চেষ্ট হয়ে—ক্ষণিকের জন্যেও।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

পুরাকালে মানুষ সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহরাজিকে দেবতা মনে করে পূজা করতো। তাদের ধারণা ছিল এদের ইচ্ছাতেই সব কিছু পরিচালিত হয় এবং মানুষের ভাগ্যও এরাই নিয়ন্ত্রণ করে এরপর এগুলির নিয়মিত চলাফেরা লক্ষ্য করে—তারা সময় ও দিন-পঞ্জী তৈরি করে তাকে কাজে লাগাতে শিখলো।

রাত্রিকালে পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকারাজি দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আকার কিন্তু অত্যন্ত বড় এবং প্রচুর পরিমাণে তাপ ও আলো দেয়। এদের এত ক্ষুদ্র মনে হয় কারণ এগুলি বহু দূরে অবস্থিত। এই দূরত্ব মাইল বা কিলোমিটার এককে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এদের দূরত্ব মাপা হয় 'আলোক বর্ষ' এককে (আলোকের গতিবেগ সেকেণ্ডে 186,000 মাইল। এইরূপে আলোক 1 বছরে যতদূর যেতে পারে সেটাই 1 আলোক বর্ষ)।

সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম নক্ষত্র Alpha Centauri' চার আলোক বর্ষের চেয়েও দূরে অবস্থিত। 'Denab' নক্ষত্রটির অবস্থান 650 আলোক বর্ষ দূরে। একটার তুলনায় আর একটা নক্ষত্র আকারে অনেক বড়। বিভিন্ন নক্ষত্র বিভিন্ন রং-এর আলো দেয়। কতকগুলি নক্ষত্রের আলো আবার উজ্জ্বল। 'ধূসর-সাদার' চেয়ে 'লাল' আলো বিকিরণকারী নক্ষত্র অনেক বেশী শীতল। সূর্য হলুদ রং-এর আলো দেয়। অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য একটি ক্ষুদ্র এবং শীতল নক্ষত্র। যদিও একটি নক্ষত্রের অবস্থান অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় অনেক দূরে—তথাপিও এদেরকে এক একটি গ্রুপে ফেলতে পারি। এই এক একটি গ্রুপকে বলা হয়—এক একটি ছায়াপথ (galaxy)।

আমাদের ছায়াপথ 'মিল্কিওয়ে'। তীরচিহ্নিত স্থানে রয়েছে সূর্যের অবস্থান। বামদিকের ছবিটি সামনে থেকে দেখলে এবং ডান দিকের ছবিটি পাশ থেকে দেখলে যেমন দেখায়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে (universe) 10,000 কোটি ছায়াপথ আছে। প্রত্যেকটি ছায়াপথে রয়েছে

* ক্যালিবন ইনষ্টিটিউশন, 20এ-বি, সাদার্ন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-700 0.6

10,000 কোটি নক্ষত্র এবং তার সৌরমণ্ডল। ঘনসন্নিবিষ্ট বলে মনে হলেও ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি পরস্পর থেকে কোটি কোটি মাইল তফাতে রয়েছে। আমাদের ছায়াপথের নাম—'milky way'। এর ব্যাস 100,0 0 আলোকবর্ষ। এর আকার ঘড়ির স্প্রিং-এর পাকের মত পেঁচানো (spiral)। পাশ থেকে দেখতে অনেকটা অমসৃণ ডিম্বাকারের মত মনে হয়।

এর সবচেয়ে নিকটতম ছায়াপথ (milky way) হল অ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda)। এটি উত্তর আকাশে অবস্থিত। এর আকার আমাদের ছায়াপথের প্রায় দ্বিগুণ এবং পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 20 লক্ষ আলোকবর্ষ।

মিল্কি ওয়ের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছায়াপথ অ্যাণ্ড্রোমিডা।

মহাকাশে এখানে ওখানে পাতলা সাদা মেঘের মত ঘূর্ণায়মান ও জলন্ত গ্যাসীয় পদার্থ দেখা যায়। তাদের এক একটিকে বলে নীহারিকা (nebula)। এরা মহাকাশে কোটি মাইল জুড়ে রয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে নীহারিকা থেকে নক্ষত্রের সৃষ্টি। ছায়াপথ, নীহারিকা, এবং এদের মধ্যে যে অনন্ত শূন্য স্থান (empty space) আছে তাকেই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (universe) বলি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম আজ থেকে 1300-2000 কোটি বছর পূর্বে। ঘন ও তপ্ত তরল পদার্থ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ছায়াপথ, নীহারিকা ও গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষ কোথায় তা আমরা জানি না। ছায়াপথগুলি সৃষ্টির পর থেকেই প্রবল বেগে একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (কোন কোনটি প্রায় আলোর গতিবেগে)। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ফুলানো বেলুনের মত বেড়েই চলেছে।

নক্ষত্রগুলি লক্ষ্য লক্ষ্য বছর আলোক রশ্মি বিকিরণ করে একদিন হয়তো নিভে যাবে—আবার কোন নূতন নক্ষত্রের সৃষ্টি হবে হয়তো কোথাও। এইভাবে চলতে থাকবে ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা—অনন্তকাল ধরে।

সৌরজগৎ

আমাদের এই সৌরজগতের (Solar system) সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অনেক পরে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় 460 কোটি বছর পূর্বে কোন কারণে আমাদের ছায়াপথের (milky way) অংশ থেকে বিচ্যুত ঘূর্ণনরত গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয়ে সূর্য এবং তার 9টি গ্রহ এবং 33টি উপগ্রহের সৃষ্টি। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে 13 লক্ষ গুণ বড় এবং তা পৃথিবী থেকে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্যের দেহ বিরাট অগ্নিময় গ্যাসপিণ্ড। এর চারধারে উজ্জ্বল ও প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত গ্যাসরাশি—জ্বলন্ত অবস্থায় বহু সহস্র মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় 6000°C এবং কেন্দ্রে তার তাপমাত্রা 14,000,000°C। এই তাপমাত্রা পৃথিবীর যে কোন বস্তুকে তৎক্ষণাৎ গলিয়ে ফেলতে পারে।

সূর্য তার নিজ অক্ষের উপর 25 দিনে একবার ঘুরে আসে। সূর্যপৃষ্ঠে বিশালাকৃতির কালো

কালো দাগ দেখা যায়। এদেরকে বলা হয় সৌরকলঙ্ক (sun spot)। বিজ্ঞানীরা সৌরকলঙ্কের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করে সূর্যের গতিবেগ নির্ণয় করেন। সূর্যপৃষ্ঠের পারিপার্শ্বিকতার তুলনায় সৌরকলঙ্কের তাপমাত্রা 2000°C কম। ফলে সূর্যের যে তাপ অপচয় হয় 'ফিউশন' বিক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন তাপ সেটাকে পূরণ করে। এজন্য সূর্যের তাপের কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। কথায় আছে—'বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়'। তাই সূর্যের ভিতরের
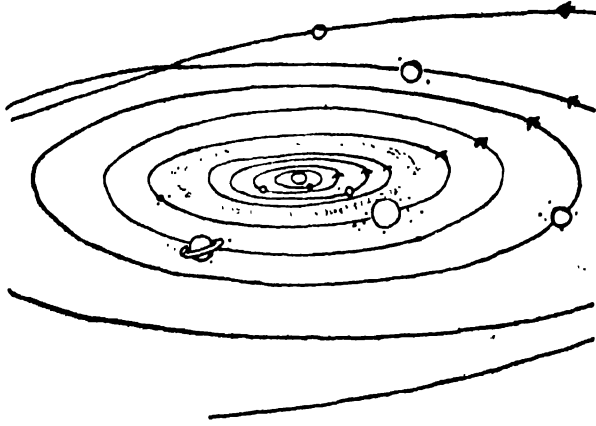
সৌরজগৎ—সূর্যকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো ঘুরছে। প্লুটোর কক্ষপথের কিছু অংশ নেপচুনের কক্ষপথের ভিতর দিয়ে গেছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে রয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroide)।

এজন্য তা কৃষ্ণবর্ণ। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা 11 বছর ধরে বাড়তে থাকে—তারপর আবার কমতে থাকে। একে বলে সৌর-কলঙ্ক চক্র (sun spot cycle)। সৌরকলঙ্কগুলি বিভিন্ন আকৃতির হয়। কোন কোনটি আমাদের পৃথিবীর চেয়েও বড়।

সূর্যের মহাকর্ষ বল পৃথিবীর চেয়ে 28 গুণ বেশী। এই প্রবল আকর্ষণ প্রধানত হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে সূর্যের কেন্দ্রে ঘন সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। উচ্চতাপে ও চাপে হাইড্রোজেন পরমাণু প্রথমে ডয়টেরিয়াম এবং পরে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এটি একটি জটিল নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া (fusion reaction)। এতে প্রচণ্ড তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। বিকিরণের হাইড্রোজেনও একদিন শেষ হয়ে যাবে—এর প্রচণ্ড বিক্রমও তাই একদিন হবে অবলুপ্ত—আর তখনই হবে তার মৃত্যু। তবে আমাদের আতঙ্কিত হবার কিছু নেই—কারণ সে সময় আসতে এখনও কয়েক শ' কোটি বছর দেরী।

অন্যান্য নক্ষত্রেও এরূপ ফিউশন বিক্রিয়া ঘটে। ফলে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এবং হিলিয়াম থেকে কার্বন পরমাণু তৈরি হয়। বড় বড় নক্ষত্রে মৌল তৈরির পরবর্তী ধাপ হচ্ছে—হিলিয়াম ও কার্বন গলিয়ে অক্সিজেন এবং কার্বন পরমাণু গলিয়ে ম্যাগনেশিয়াম অণু তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে পর্যায় সারণীর প্রাকৃতিক মৌল 'লৌহ' অবধি সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাচক্রে কোন সময়ে কতকগুলি নক্ষত্রের মধ্যে বিস্ফোরণের

ফলে লোহার চেয়ে ভারী মৌল সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সৌরজগৎও এইভাবে সৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের অংশবিশেষ। এ পর্যন্ত প্রকৃতিতে 92টি মৌল পাওয়া গেছে (সম্প্রতি তিনটি ভারী প্রাকৃতিক মৌলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের এখনও নামকরণ করা হয় নি)। এরা দীর্ঘস্থায়ী (life span 1000 million years)। এদের সৃষ্টিও উপরিউক্ত পদ্ধতিতেই হয়েছে। এছাড়া আরও 13টি মৌল কৃত্রিমভাবে বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সৃষ্টির সময় সূর্য এবং তার গ্রহ-উপগ্রহগুলি অনন্ত অগ্নিপিণ্ড ছিল। তাপ বিকিরণের ফলে গ্রহগুলি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং ঘন ভারী পদার্থগুলি কেন্দ্রের দিকে এবং হালকা পদার্থগুলি উপরিপৃষ্ঠের দিকে জমা হতে থাকে। সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলিকে—নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) rocky inner planets :
বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এবং চন্দ্র

(খ) fluid outer planets :
বৃহস্পতি ও শনি।

(গ) ice giants :
ইউরেনাস ও নেপচুন।

(ঘ) প্লুটো

বুধ (Mercury)

বুধ সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট (পৃথিবী=1, বুধ—0·06) এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ (5 কোটি 79 লক্ষ কি. মি.) এটি 'rocky inner planets' গ্রুপের সর্বপ্রথম গ্রহ। এর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী (47·9 কি. মি./সে.)। সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে 88 দিন সময় লাগে। কিন্তু নিজের অক্ষের উপর অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে (আহ্নিক গতি 59 দিনে)। বুধপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিনে 350°C রাত্রে −170°C। গ্রহগুলির মধ্যে বুধের মহাকর্ষ বল সবচেয়ে কম (পৃথিবী=1, বুধ—0·37)। তাপের এত তারতম্য এবং মহাকর্ষ বল কম হওয়ার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বায়ুমণ্ডল গড়ে উঠা সম্ভব হয় নি সেখানে। বুধের উপরিভাগ অনেকটা চন্দ্রের মত কিন্তু 'কোর' (core) পৃথিবীর মত। এর 'কোর' প্রধানত লোহার যৌগ এবং উপরিপৃষ্ঠ সিলিকেটের যৌগে তৈরী। বুধের ঘনত্ব পৃথিবীর প্রায় সমান এবং তার 'কোর' সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের 'কোরে'র আয়তনের তুলনায় সর্ববৃহৎ (বুধের 60% আয়তনই কোর, পৃথিবীর আয়তনের 31% কোর)।

ঊর্ধ্বাকাশে পৃথিবীকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে চুম্বকের আস্তরণ। একেই বলে—'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট'। এই 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট' প্রাণঘাতী বিকিরণ ও মহাজাগতিক কণার হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে। বুধেরও চুম্বকের আস্তরণ রয়েছে তবে তা পৃথিবীর $\frac{1}{10}$ অংশ।

শুক্র (Venus)

বুধের পরে আসে শুক্রগ্রহ। শুক্রকে বলা হয় পৃথিবীর sister planet। কারণ শুক্র হচ্ছে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ এবং এর আকার (পৃথিবী—1, শুক্র—0·88) ও ঘনত্ব (পৃথিবী 5·5, শুক্র—5·2, জল—1 ধরলে) উভয়ই প্রায় সমান।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (95%)। অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোক্লোরিক (HCl), হাইড্রো-ফ্লোরিক (HF), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর প্রায় 100 গুণ বেশী। শুক্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা 482°C (এই তাপমাত্রা সীসাকে গলাতে পারে)। কক্ষপথে শুক্রের গতিবেগ সেকেণ্ডে 35 কি. মি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে শুক্রের 1 দিন (আহ্নিক গতি −243 দিন, পশ্চাদ্‌গামী) 1 বছর (বার্ষিক

গতি 224·7 দিনে) অপেক্ষা বড়। এর মহাকর্ষ পৃথিবীর প্রায় সমান (পৃথিবী – 1, শুক্র – 0·88)।

অবস্থান, আকার, ঘনত্ব, মহাকর্ষ বল ইত্যাদি দিক দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এর প্রকাশ হল কেন ?

শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গলের আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থার কথা জানতে গেলে আমাদের —460 কোটি বছর ধরে এদের ভিতরে ও বাইরে যে পরিবর্তন হয়েছে—সেদিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। এই পরিবর্তন প্রধানত আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গিরণের ফলেই হয়েছে। লাভার সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্যাস বের হয়েছে ভূ-অভ্যন্তর থেকে।

পৃথিবীর বর্তমান আবহাওয়ার পরিবেশ সুরু হয় যখন আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সমুদ্র-নদীতে বিশাল জলরাশি সৃষ্টি করলো। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড জলের খনিজ পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে শিলা, চুনাপাথরের পাহাড় (crustal rocks) সৃষ্টি করলো। এর ফলে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রায় নিঃশেষিত হল। জীবনের হল সূত্রপাত এবং সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন করলো বায়ুমণ্ডলকে সমৃদ্ধ।

অপরপক্ষে শুক্র (পৃথিবীর চেয়ে) অনেকটা সূর্যের কাছে এবং এখানকার বিবর্তন সুরু হয় পৃথিবীর চেয়ে 5 থেকে 10°C বেশী উত্তপ্ত অবস্থা থেকে। এই 10°C বেশী তাপমাত্রাতেই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলে পরিণত হতে পারলো না। ফলে জলের অভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমাট বেঁধে কঠিন শিলা বা পাহাড় সৃষ্টি না করে বায়ুমণ্ডলে জমা হল। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন—শুক্রের বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রয়েছে তা সমগ্র পৃথিবীতে চুনাপাথরের পাহাড়রূপে আবদ্ধ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সমান।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে যে জলীয় বাষ্প ছিল তা অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet ray) দ্বারা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। মহাকর্ষ বল কম হওয়ার জন্যে হাইড্রোজেন। মহাকাশে চলে যায় এবং অক্সিজেন শুক্রপৃষ্ঠের অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে যৌগ গঠন করে।

অপরপক্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে মুক্ত অক্সিজেন রয়েছে তা ওজোনের (O_3) একটি স্তর সৃষ্টি করেছে। এই ওজোনের স্তর ভেদ করে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে আসতে পারে না। ফলে প্রাণিকুল এবং সমুদ্রের জল ঐ ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা পেয়েছে। পৃথিবীর অবস্থান যদি এমন জায়গায় হত যে এর তাপমাত্রা 5 থেকে 10°C বেশী—তা হলে জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হবার সুযোগ পেত না। ফলে আজকের এই পৃথিবীর অবস্থা হত অন্যরূপ।

পৃথিবীতে এখন তুষার যুগ (ice age) চলছে। তা সুরু হয়েছে প্রায় 10 লক্ষ বছর পূর্বে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পৃথিবীতে পতিত সূর্যালোকের 35% প্রতিফলিত এবং 65% পৃথিবী কর্তৃক শোষিত হয়। উক্ত তাপে পৃথিবীর তাপমাত্রা—18°C হওয়া উচিত ছিল এবং তাতে সমুদ্রের জল জমে বরফে পরিণত হত। কিন্তু আমরা দেখেছি পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে 22°C কিন্তু কেন ?

শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সূর্যালোক বায়ুমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করে কিন্তু অবলোহিত রশ্মিকে (infra-red ray) বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (0·03%) ও জলীয় বাষ্প (1·40%) বাধা দেয়। একে 'green house effect বলে (গ্রীন হাউস পদ্ধতিতে তাপ কোন তাপ-স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর প্রবেশ করতে পারে এবং কোন পদার্থে শোষিত হয়ে তাপ যখন পুনরায় বিকিরিত হয় তখন ঐ তাপের তরঙ্গ-

দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হওয়ার ফলে পূর্বোক্ত তাপ-স্বচ্ছ পদার্থটি তাপ-রোধী হয়ে পড়ায় ঐ পদার্থের মধ্যে দিয়ে উক্ত তাপ আর বের হতে পারে না)। এর ফলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা যা হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে বেশী হয়। অপরপক্ষে শুক্রগ্রহের 95% কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তাপমাত্রাকে কি ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে পারে সহজেই অনুমেয়। (ক্রমশঃ)

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা

অসিতবরণ কুণ্ডু*

আজকাল উদ্ভিদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে জানার জন্যে গবেষণার প্রচেষ্টা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেখা গেছে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ন্যায় বিভিন্ন রোগের ও পোকামাকড়ের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সকল রোগ বা পোকামাকড় অথবা ভাইরাসজনিত দুই-ই হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরণের কীট-পতঙ্গ গাছের জীবনের বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়। কীট-পতঙ্গের আক্রমণের প্রাদুর্ভাব আজকাল বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। কৃষিকার্যে সবুজ বিপ্লবের পর আজকাল চাষআবাদের ক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের চাষ বেড়ে গেছে। এদের পাতায় অধিক পরিমাণে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার ফলে পাতায় শর্করাজাতীয় খাবারের পরিমাণও বেশী থাকে। ফলতঃ এই ধরণের গাছগুলিতে পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং এদের বৃদ্ধিও দ্রুততর হয়। যদিও কীট-নাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায় তবুও অধিক পরিমাণে এই বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহারের ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্যাগুলি প্রাণীদের ক্ষেত্রে chemotherapy উদ্ভাবিত হওয়ার পরও সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমতঃ এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহারে আগের মত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না এবং অদূর ভবিষ্যতে সুফল আরও কমে যাবে। তার কারণ হল পোকামাকড়-গুলি ক্রমাগত এই দ্রব্যাদির সংস্পর্শে থাকার ফলে নিজেদের বাঁচার চেষ্টাই সফল হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে পরিব্যক্তি (mutation) ঘটে থাকে। যেহেতু কীট-পতঙ্গের প্রজনন ক্ষমতা খুবই বেশী, এই পরিবর্তিত পতঙ্গদের সংখ্যা সহজেই বৃদ্ধি পাবে এবং তখন এই রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে কোনও ফল হবে না, সেক্ষেত্রে অন্য ধরনের দ্রব্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তার উপর রাসায়নিক দ্রব্যগুলি প্রাণীদের পক্ষেও বিষাক্ত এবং প্রাণীকোষে নানা ধরণের প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শস্যদানার মধ্যে অল্প পরিমাণে সঞ্চিত এই সমস্ত পদার্থ শেষ পর্যন্ত মানুষের কোষে এসে হাজির হয়। ক্রমাগত এইভাবে সঞ্চয়ের ফলে মানুষের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া বিশেষতঃ ক্যান্সার রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। তাছাড়া ভারতের গ্রামদেশের কৃষকেরাও এই সমস্ত দ্রব্যাদির প্রয়োগও যথোচিত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে করে উঠতে পারে না, ফলে আরও নানা সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, এদের একটি নিজস্ব রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে যাকে

* ই. জি. রা (I. J. I. R. A.) 17, তারাতলা রোড, কলকাতা-700 053

বলা হয় অনাক্রম্যতা (immunity)। এই ক্ষমতার ফলেই আমরা শহর কলকাতার বিষাক্ত, জীবাণু-পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করেও প্রতিনিয়ত রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ি না। বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা টীকা নিয়ে এই প্রতিরোধক ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—প্রাণীদের ন্যায় গাছেরও এই রকম রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে কিনা, এবং তা থাকলে কিভাবে কাজ করে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে কি আমরা কাজে লাগিয়ে গাছের পরমায়ু এবং ফসল দেবার ক্ষমতা বাড়াতে পারি? গবেষণার ফলে দেখা গেছে উদ্ভিদেরও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বর্তমান এবং তা বিভিন্ন ধরণের পোকামাকড় এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে সক্রিয়। এখন আলোচনা করা যাক গাছের রোগ প্রতিরোধক শক্তি এবং তার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে।

আমরা জানি কীট-পতঙ্গের বৃদ্ধি নির্ভর করে যথাসময়ে যথোচিত হরমোন ক্ষরণের উপর। পতঙ্গের জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের হরমোন কাজ করে এবং এদের অভাবে পতঙ্গের বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্ষমতা দুই-ই হ্রাস প্রাপ্ত অথবা নষ্ট হয়ে যায়। পতঙ্গের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা শূককীট থেকে যখন এরা পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে আসে তখন তাদের corpora allota নামক গ্রন্থি থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয় তা পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই হরমোনকে তাই বলা যেতে পারে কিশোরকালীন হরমোন (jnvenile hormone)। corpora allota গ্রন্থিটি যদি বাদ দেওয়া যায় তবে ঐ হরমোনের অভাবে পতঙ্গের বৃদ্ধি এবং পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। স্ত্রীজাতীয় পতঙ্গদের বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং পুরুষেরা পূর্ণ যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন হয় না। বংশবৃদ্ধির উপর হরমোনের প্রভাব যদিও পরোক্ষ তবুও একান্ত প্রয়োজনীয় এই হরমোনকে যদি কোনও ক্রমে বাদ দেওয়া যেতে পারে তবে বংশবৃদ্ধির অভাবে এই অপরিণত পতঙ্গরা সহজেই লোপ পায়। অনেক উদ্ভিদ দেখা গেছে বিভিন্ন ধরণের পতঙ্গের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পতঙ্গের প্রভাবে উদ্ভিদ এই কিশোরকালীন হরমোন সৃষ্টি করে পতঙ্গকে যোগান দেয় এবং অতি সহজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে। উদ্ভিদ যেমন পতঙ্গের কিশোরকালীন হরমোন সৃষ্টি করতে সক্ষম আবার এই হরমোনের প্রভাব নষ্ট করতে পারে এমন দ্রব্যাদিও তৈরি করতে পারে। সম্প্রতি Ageratum houstoniatum নামে অপেক্ষাকৃত কীট-পতঙ্গমুক্ত উদ্ভিদ থেকে দুটি দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা এই হরমোনের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে পারে। দ্রব্য দুটিকে ঐ উদ্ভিদের রস থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা গেছে এবং রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষিতও হয়েছে। একটি হল 7-methoxy—2,2-dimethyl chromene (—অথবা সংক্ষেপে precocene I) এবং অন্যটি 6, 7-dimethoxy—2,2-dimethyl chromene (সংক্ষেপে precoceneII)। রাসায়নিক গঠন-সংকেত চিত্র 1-এর মত।

precoceneগুলিকে antijuvenile hormone বলা যেতে পারে। এর প্রভাবে কীট-পতঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পায়। শূককীট থেকে পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তনের কালে এই antijuvenile hormone-এর প্রভাবে পতঙ্গের পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্তি ঘটে না এবং পতঙ্গের আকার খুবই ছোট হয়। প্রজনন ক্ষমতা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যে পতঙ্গের বংশবৃদ্ধিতে বাধা পড়ে। এই ভাবে উদ্ভিদ দুটি আত্মরক্ষা করে। উদ্ভিদের নিদানশাস্ত্রে এই যৌগ দুটির আবিষ্কার এক নতুন দিকের প্রতি আলোকপাত করল। যদিও এই ধরণের precocene জাতীয় যৌগ

সমস্ত ধরণের পতঙ্গ বা তদ্‌জনিত রোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে না তবুও এই ধরণের যৌগ অথবা অধিকতর তীব্র যৌগের রাখেন phyto-alexins—phyton মানে উদ্ভিদ এবং alexin মানে মুক্ত রাখা। বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন ধরণের phyto-alexin তৈরি হয়

MeO
recocene-I

MeO
MeO
Precocene-II
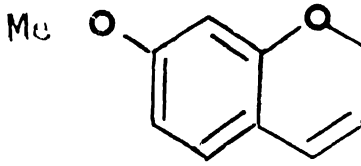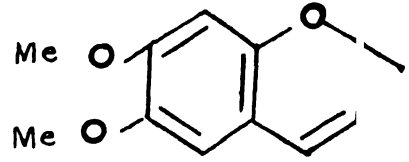
চিত্র 1

সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে জোরদার করা উচিত। কীটতত্ত্ববিদরা মূলতঃ কীট-পতঙ্গের ঐ কিশোরকালীন হরমোনের সংশ্লেষণে বাধা সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থের সন্ধানে তৎপর হয়েছেন। এই গবেষণা যদি ফলপ্রসূ হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে খুব সহজে পতঙ্গের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই ধরণের যৌগ কীটঘ্নের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহার করা যাবে এবং তার ফলে পরিবেশ দূষিতকরণের সমস্যাকে এড়ানো যাবে।

এতক্ষণ কীট-পতঙ্গ থেকে উদ্ভিদের আত্মরক্ষার কথাই আলোচিত হল। অতঃপর উদ্ভিদের ভাইরাস, ছত্রাক ও তদ্‌জনিত নানা রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচার নিজস্ব কোনও উপায় আছে কিনা তা আলোচিত হবে। মানবদেহে যেমন বিভিন্ন রোগবীজাণুর উপস্থিতিতে অ্যান্টিবডি এবং ভাইরাসের উপস্থিতিতে interferon নামক এক ধরণের পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং এগুলিই মানবদেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত করে রাখে, উদ্ভিদও ভাইরাস ও ছত্রাকের উপস্থিতিতে অনুরূপ যৌগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। 1940 সালে মুলার এবং বর্জার নামক দুই কৃষিবিদ্‌ দেখেন যে ভাইরাসের আক্রমণে গাছের মধ্যে এক ধরণের স্নেহজাতীয় যৌগের সৃষ্টি হয় এবং এই যৌগগুলি মাত্র রোগমুক্ত উদ্ভিদেই সাধারণতঃ দেখা যায়। বিজ্ঞানীদ্বয় স্নেহজাতীয় এই পদার্থগুলির নাম

এবং এটি তখনই তৈরি হয় যখন উদ্ভিদ ভাইরাস এবং ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। আলু থেকে রিসিটিন, মুগকলাই থেকে ফেজিওলিন, মরষে থেকে পিসাটিন নামক বিভিন্ন ধরণের phytoalexin পাওয়া গেছে। ধানগাছ Helminthosporium oryzea নামক ছত্রাকের আক্রমণে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে গাছগুলিকে (অন্ততঃ দুটি ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে) যদি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী Helminthosporium-এ রাখা হয় তবে ঐ গাছগুলি পরে ঐ রোগের আক্রমণে মোটেই কাবু হয়ে পড়ে না। সবচেয়ে আশার কথা এই যে বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যেমন mono-iodoacetic acid, 2, 4 dimitrophenol-এর উপস্থিতিতে phytoalexins তৈরি করে বিভিন্ন ছত্রাক নিবারক দ্রব্যও অনেক সময় phytoalexins-এর সৃষ্টি করে। গবেষণা যদি ফলপ্রসূ হয় তবে আমরা আশা করতে পারি যে এই ধরণের যৌগগুলিকে উদ্ভিদের টীকা হিসাবে ব্যবহার করতে পারা যাবে এই আবিষ্কার যদিও প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে, তবুও 'জীববিদ্যার সাহায্যে উদ্ভিদের কীট-পতঙ্গ এবং বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে'র এক প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে একে তাবা যেতে পারে।

মানব কল্যাণে বিজ্ঞান

কৃষিতে

চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

বিজয় বল* ও পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়*

বিজ্ঞানের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে আজ আমরা সকলেই জানি যে বৈজ্ঞানিক পথ অনুসরণ করলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যার সঠিক ও সরল সমাধান খুঁজে পেতে পারি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার-নিরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার জটিলতাগুলিকে এমনভাবে রূপান্তরিত এবং সমাধান করা সম্ভব যা আমাদের চিন্তাধারাকে সৃষ্টিকর্মের পথে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সমস্যা এবং সমস্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রায় সবসময়ই তার সহযাত্রী। এসব সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সমাধান একমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ দ্বারাই করা সম্ভব। জীবনের যে কোন কাজের মাঝে কেমন করে দ্বন্দ্ব আসতে পারে আর তার সমাধানই বা কেমন করে করা যায়, চাষীর জীবনের কিছুটা অংশ দিয়ে তা বোঝবার চেষ্টা করবো।

ধরা যাক, আমাদের দেশের চাষাবাদের কথা। বহু দিন ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশের চাষীরাও চাষ করতো লাঙল দিয়ে, সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রে লাঙল আর বলদ নিয়ে মাটি চাষ করতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও তাদের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার উপায় ছিল না। দিনের পর দিন মাথায় হাত দিয়ে তাদের বসে থাকতে হত আকাশে কালো মেঘের অপেক্ষায়। তারপর অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টিতো আছেই। আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে অনিশ্চয়তা—সে হাড়ভাঙা খাটুনি অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। মাঠে ট্রাক্টর নেমেছে, মাঠের পাশে জলের কল বসেছে, ভাল ফসলের জন্যে রাসায়নিক সার তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও কিছু বেড়েছে, কিন্তু তা চাষাবাদের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও নতুন নতুন সারের যোগানের তুলনায় কতটুকু। সবকিছুর যোগান থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। চাষী এই যন্ত্রপাতি ও সারের ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। এই উৎপাদনের উন্নতি—যন্ত্রপাতি ও সারের উন্নতির তাল রেখে চাষীর চিন্তাধারার উন্নতির সঙ্গেই সম্ভব। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চাষীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে উৎপাদন ও বৃদ্ধি হচ্ছে তা একটি চাষীর জীবনীর মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা করবো।

চীনের বড় একটি গ্রাম। ঐ গ্রামের মোট জমির প্রায় এক তৃতীয়াংশতে হত বাদামের চাষ। এই সম্পূর্ণ চাষের দেখাশুনা করতেন একজন মধ্যবয়স্ক চাষী। একবার তিনি ঠিক করলেন তিনি নিজেই তার অন্যান্য চাষীভাইদের নিয়ে একটা পাহাড়ীয়া জমিতে চাষ করবেন। পাহাড়ীয়া জমি কিছুটা অনুর্বর বলে এর আগে ওখানে চাষাবাদ খুব বেশী হত না। গাঁয়ের যেখানে বাদামের চাষ হত—সেখান থেকে এ চাষের পদ্ধতি মোটামুটি তিনি বুঝে এলেন। চাষীভাইদের নিয়ে বেশ কিছু দিন খাটাখাটুনী করে চাষাবাদও করলেন, পাহাড়ীয়া মাটি গভীর করে লাঙল দিয়ে খুঁড়ে তাতে বীজ পুঁতলেন, কিছু দিন কেটে গেল. তারপর যখন ফসল কাটার দিন এল—

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
কলিকাতা-700 009

ফসল ফললো খুব সামান্যই। কিন্তু কেন এমন ঘটলো?—যে নিয়ম তিনি শুনে এসেছিলেন বাদাম চাষীদের কাছ থেকে—সেই নিয়মেই তিনি চাষ করেছেন—চাষীর কাছে এসে দাঁড়াল বিরাট দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সমাধানের পথ তিনি খুঁজতে লাগলেন materialistic condition বা চাষের বস্তুগত অবস্থার দিকে তাকিয়ে। তাঁর মনে হল materialist dialetics-এর কয়েকটি লাইন 'only those who are subjective, one sided and superficial in their approach to problem will smugly issue orders or directives the moment they arrive on the scene, without considering the circumstances, without viewing things in their totality (their history and their present state as a whole) and without getting to the essence of the things (their nature and internal relations between one thing and another) such people are bound to trip and fall.'

অর্থাৎ পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমস্যা, বিভিন্ন সমস্যাগুলির কারণ ও তাদের সম্পর্ক এবং সর্বোপরি পূর্ব অভিজ্ঞতা তলিয়ে বিচার না করে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা কখনই ফলপ্রসূ হয় না। সত্যিইতো তাই। চাষী পাশের গাঁ থেকে বাদাম চাষের নিয়ম জেনে এসেছিলেন সত্যি, কিন্তু সেটা সমতল ও উর্বর মাটির জন্যে। সে নিয়ম পাহাড়ী-অনুর্বর মাটিতে খাটে কি না, তা যথাযথ বিচার না করেই চাষ সুরু করেন এবং তার শ্রম একপ্রকার পণ্ডশ্রমেই পরিণত হয়।

এবার সুরু হল পরীক্ষা। এই দ্বন্দ্বের সমাধান একমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। অবশেষে জানা গেল জমি অসমতল হওয়ায় এক্ষেত্রে গভীর খনন চলে না, আর বীজ এখানে খুব কাছাকাছি রোপণ করতে হয়, কেননা মাটি ধ্বসে পড়ে বীজ যখন-তখন চাপা পড়তে পারে। চাষীভাই আবার চাষ সুরু করলেন ঐ জমিতে—এবার ফসল ফললো প্রচুর।

এই সাফল্যের পর তিনি সুরু করলেন নতুন করে চিন্তা—কেমন করে উৎপাদন এই অঞ্চলে আরও বাড়ানো যায়। বাদাম গাছের কাণ্ড, ফল, ফুল ও অন্যান্য অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক কি, তাদের কাউকে কোন বিশেষ অবস্থায় রেখে এর উৎপাদন বাড়ানো যায় কিনা?—এই নিয়ে সুরু হল নতুন পরীক্ষা।

দুই গুচ্ছ চারা নিয়ে পর্যবেক্ষণ আরম্ভ হল। পরপর তিন রাত্রি জমিতে উপস্থিত থেকে ফুলের পরিস্ফুটন ভাল করে লক্ষ্য করলেন। তাঁর মনে হল এই ফুল ফোটা এবং তা থেকে ফল হওয়াটা এক্ষেত্রে অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তারপর সুরু হল দীর্ঘ পরীক্ষা ষাট-রাত এবং ষাটদিন ধরে মোট 170টি চারাকে নিয়ে। আর তাদের গায়ে লেবেল লাগিয়ে দিলেন, যে লেবেলের গায়ে লেখা আছে ফুল ফোটার দিন। গভীর রাত্রে—ঝড়, জল, বৃষ্টির মধ্যে পরীক্ষা করে চললেন কোন্ পরিবর্তন কেমন ভাবে হয়।

একটি ফুল ফোটা আর ফল পাকবার মধ্যে সময় লাগছে ষাট দিন এবং গাছের প্রথম ডাল-গুচ্ছেই সবচেয়ে বেশি ফল হচ্ছে। সুতরাং প্রথম ডাল-গুচ্ছটি থেকে বেশি ফলন পেতে হলে বীজ খুব অল্প গভীরে পুঁততে হবে। কেননা প্রথম গুচ্ছটি চারায় একেবারে নীচের দিকে থাকে, কিন্তু যেহেতু জমি শুষ্ক, বীজ গভীরে না পুঁতলে শুকিয়ে যাবার ভয় থাকে। এক্ষেত্রে অধিক ফলনের জন্যে কোন্ পথকে সে বেছে নেবে?

এ দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্যে চাষীভাই স্মরণ করলেন বস্তুবাদের আরেকটি কথা। 'It [materialist dialectics] holds that external causes are the condition of

change and internal causes are the basis of change, and external causes become operative through internal causes অর্থাৎ, যে কোন পরিবর্তনের মূল হল তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেই পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। প্রথম ডালশুচ্ছে যে প্রচুর ফলন হয়, তা ঐ গাছের আভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব চরিত্র, পারিপার্শ্বিক মাটি, জল, সূর্যের আলো এই ফলনকে নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। বীজ যদি খুব গভীরে পোঁতা হয়—তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রথম গুচ্ছের ফলনে বাধা সৃষ্টি করবেই।

এই সমস্যা নিয়ে যখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছেন, হঠাৎ একদিন অন্য এক গ্রামে গমজাতীয় ফসলের চাষ দেখতে গিয়ে তাঁর চোখে পড়লো ঐ গমজাতীয় গাছের গোড়ার মাটি হাল্কা করে দেওয়া আছে—গোড়া থেকে মাটি সরিয়ে না নিলে তাতে রৌদ্র লাগবে না—ফলনও ভাল হবে না। তিনি ভাবলেন এ কারণ তাঁর বেলাতেও ঘটতে পারে। সেজন্যে তিনি নিজের বাদামের চারাগুলিকে অমনিভাবে লাগালেন। কালক্রমে ঐ জমির ফসল আরও অনেক বৃদ্ধি পেল।

ব্যবহারিক জীবনে

পরিবহন সমস্যা

(2)

শ্রীমহাদেব দত্ত

জুন সংখ্যা (1977) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' দেশের মধ্যে বিভিন্ন শহরে যোগাযোগকারী পরিবহন সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে—কিভাবে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হয় ও সমস্যার পথ বের করতে হয়।

এবারে শহরের ভিতরের পরিবহন সমস্যার কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোচনার করা যাচ্ছে শহরের মধ্যে পরিবহন সমস্যার মোটামুটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—যথা:

প্রথম পরিবহনের দ্রুততা, দ্বিতীয় পরিবহনে অত্যধিক ভিড় বা জ্যাম, তৃতীয় পরিবহনজনিত পরিবেশ দূষণ নিবারণ।

পরিবহনের দ্রুততার জন্যে শহরের মধ্যে যথাসম্ভব দ্রুতগতির যানবাহনের সংখ্যা বাড়াতে হবে ও ধীরে ধীরে মন্থরগতির যানবাহনগুলি অপসারণ করতে হবে। শহরের সড়কে যথাসম্ভব ভিড় বা জ্যাম হতে দেওয়া যাবে না, তবে মনে রাখতে হবে শহরের মধ্যে যানবাহনের গতির একটা সীমা রাখতে হবে না হলে পথে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাবে। কাজেই দ্রুতগতির যানবাহন শহরের পথে চালু করা সম্ভব নয়, বরং সমস্যাটি সমাধানের সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা কি—তা বের করবার সমস্যা—যাকে বলা হয় (optimum problem)। অবশ্যই পথে যানবাহনাদি ও পথচারীদের সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিভাবে এই নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা পরিবহন সমস্যার আর এক দিক। পরে কোন প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সড়কের যানবাহনের অত্যধিক ভিড় বা জ্যাম্ এড়াতে গেলে সর্বাপেক্ষা বেশী যানবাহন কি রূপ গতিতে চালানো যায় তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এর জন্যে নির্ভরযোগ্য statistics-এর নিরীক্ষা চালাতে হবে অর্থাৎ নমুনা জরীপ (sample survey)।

এই সব নিরীক্ষা বিশ্লেষণ করে সড়কের পরিবহন ক্ষমতার যে সব সীমা পাওয়া যাবে, তার অতিরিক্ত যানবাহন অন্য সড়ক দিয়ে বা ভূগর্ভের ভিতরের পথ দিয়ে বা উপরের ঝুলন্ত পথ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে এখানে বলা যেতে পারে ভূগর্ভপথ বা ঝুলন্তপথ দিয়ে যানবাহন ঘোরাতে গেলে তাতে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়, সে সব জটিল সমস্যা কি রূপ এবং সমাধানই বা কিভাবে করা যায়, অন্য প্রবন্ধে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

যানবাহনের জন্যে পরিবহন দূষণ নানাভাবে হয়। প্রত্যেক শহরেই আগের দিনে প্রাণীচালিত যানবাহন ব্যবহৃত হত। এসব যানবাহন বর্তমানে ব্যবহৃত মোটরগাড়ী প্রভৃতি দ্রুতগতির যানের তুলনায় মন্থর গতি হত, উপরন্তু এই সব প্রাণীর বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি শহরের সড়কের সৌন্দর্য ও পরিবেশ দূষিত করত। উপরন্তু সড়কে আবর্জনাদি জমে। সেজন্যে শহরের এই সব যানবাহনের পরিবর্তে বাষ্পচালিত, পেট্রোলচালিত ও তড়িৎচালিত যানের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাষ্পচালিত যানবাহনের বাষ্প উৎপাদনের জন্যে কয়লা ব্যবহার করতে হয় এবং তার জন্যে যে ধোঁয়া হয় তা শহরের পরিবেশ দূষণ ঘটায়। আবার বাষ্পচালিত যানবাহনের গতিবেগ শহরের এলাকায় পুরো ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এসব কারণে প্রায় সব শহর থেকে বাষ্পচালিত যানবাহন অপসারিত হয়েছে। এ সব দিক থেকে পেট্রোল বা ডিজেলচালিত মোটরগাড়ীগুলি অনেক সুবিধাজনক। সড়ক বা সড়কের পাশে বাড়ীগুলির সৌন্দর্যহানি ঘটায় না ও সড়কের উপর দিয়ে প্রয়োজনমত দ্রুতগতিতে চলাচল করতে পারে, কিন্তু পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এর থেকে যে গ্যাস বাইরে ছাড়া হয় তা শহরের নিকটের বায়ুমণ্ডল দূষিত করে ও শহরের স্বাস্থ্যহানি হয়। এর জন্যে ভাবা হচ্ছে যদি অন্যভাবে মোটরগাড়ী চালানো যেত তাহলে পরিবেশ দূষণও নিবারিত হত। এ বিষয় এখনো নানা চেষ্টা চলছে কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি রেখে সার্থক হওয়া সম্ভব হয় নি।

পরিবেশ দূষণ নিবারণ করতে গেলে তড়িৎ চালিত যানবাহন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। এইরূপ সবচেয়ে পরিচিত যান ট্রামগাড়ী। তবে ট্রামগাড়ীর নীচের চাকা নির্দিষ্ট লাইনে চলার জন্যে ও উপরের শিখাটি (trolley) সবসময় বৈদ্যুতিক তারের উপর রাখার জন্যে ট্রামগাড়ী সামনের কোন পথচারী যানকে পাশে রেখে যেতে পারে না। এজন্যে শহরে সড়কের ভিড় যেখানে আছে সেখানে ট্রাম দ্রুতগতি যান হিসাবে চলতে পারে না।

এই অসুবিধা কিছুটা দূর করা হয় ট্রলিবাস দিয়ে অর্থাৎ বাস চালানো হয় তড়িৎশক্তি দিয়ে—তড়িৎ প্রবাহ উপরের তার থেকে নিয়ে। এ বাসগুলি সামনে বাধা এলেও সামান্য পাশ কাটিয়ে যাতায়াত করতে পারে তবে বেশী পারে না। তবে যান হিসাবে এগুলি ট্রামের তুলনায় সামান্য সুবিধাজনক মাত্র। উপরন্তু ট্রলিবাস চালু রাখতে গেলে যথাসম্ভব রাস্তার একটা বিশেষ অংশ ট্রলিবাসের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।

এসব কারণে বিদ্যুৎচালিত যানবাহন শহরের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে গেলে ভূগর্ভের মধ্য দিয়ে পাতাল রেল হিসাবে চালানো বা উপরে ঝুলন্ত রাস্তার উপর দিয়ে মনোরেল হিসাবে চালাতে হয়, তবে পাতাল রেল চালু রাখেত গেলে কত জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়, তা পরের প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

খাওয়ার পরেই জল খাবেন না

অশ্বিনী কুমার*

দুপুরে বা রাত্রে খাওয়ার পরই ঢক্ ঢক্ করে কয়েক গ্লাস জল খেয়ে নেবার অভ্যাস আছে কি? যদি থাকে তাহলে অভ্যাসটি বদল করতে চেষ্টা করুন। কারণ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যনালীর নানা অংশে পাচক রস নিঃসৃত হতে থাকে। তখন খাদ্য ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে গিয়ে হজম হয়। সে সময় বেশী জল খেলে পাচক রস পাতলা হয়ে যায় এবং তার ফলে খাদ্যবস্তু হজম হতে দেরী হয়। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে জল খেলে হজম হয়ে-যাওয়া খাদ্য জলের সঙ্গে মিশে অন্ত্রে ভালভাবে শোষিত হতে পারে। অর্থাৎ খাওয়ার এক বা দেড় ঘণ্টা পরে বেশী করে জল খান।

আমাদের খাদ্যের মূল উপাদান প্রোটিন, শর্করা ও চর্বি। এছাড়া থাকে কয়েকটি খনিজ পদার্থ ও নানা ধরণের ভিটামিন। খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে যাবার সময় খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি পর্যায়ক্রমে হজম হতে থাকে। খাদ্য হজমের জটিল কাজকর্মগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্যে অনেকগুলি উৎসেচক ও কয়েকটি হর্মোনের প্রয়োজন হয়—যেগুলি খাদ্যনালীর বিশেষ অংশ থেকে নিঃসৃত হয়। নীচে কয়েকটি উৎসেচকের নাম, কাজ ও প্রাপ্তিস্থান তালিকার আকারে দেওয়া হল।

কাজ	উৎসেচকের নাম	প্রাপ্তিস্থান
প্রোটিন হজম	(1) পেপসিন, রেনিন	পাকস্থলী
	(2) ট্রিপসিন, কিমোট্রিপসিন ইলাসটেজ, নিউক্লিওটাইডেজ	অগ্ন্যাশয়
	(3) ইরাপসিন, আর্জিনেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র
শর্করা হজম	(1) টায়ালিন	লালা
	(2) প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ মলটেজ	অগ্ন্যাশয়
	(3) অ্যামাইলেজ, সুক্রেজ, মলটেজ ল্যাকটেজ…ইত্যাদি	ক্ষুদ্রান্ত্র
চর্বি হজম	(1) গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ	পাকস্থলী
	(2) প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ	অগ্ন্যাশয়

উপরিউক্ত তালিকাটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রোটিন মুখ্যত পাকস্থলীতে এবং অংশত ক্ষুদ্রান্ত্রে হজম হয়। শর্করা হজম হয় মূলত মুখে (লালা) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে; পাকস্থলী

* মেডিকেল ছাত্রাবাস; 22 গিরিবাবু লেন; কলিকাতা 700 012

শর্করা হজমে প্রায় কোন সাহায্যই করে না। চর্বি হজম হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে; চর্বি হজমের জন্যে পিত্তরসের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অর্থাৎ কোন খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যনালীর নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন উৎসেচকের নিঃসরণ আরম্ভ হয় এবং তাদের পর্যায়ক্রমিক কাজের ফলেই খাদ্য হজমের কাজটা সুসম্পূর্ণ হয়। হজমীকৃত খাদ্যের সরল এবং তরল দ্রবণটি ক্ষুদ্রান্ত্রের রক্তনালীকার দ্বারা শোষিত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় অংশটি মলের আকারে জমা হয়।

অতএব খাবার পর সেগুলি ঠিকমত হজম হওয়ার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে জল খাওয়া উচিত নয়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দিলীপ চক্রবর্তী*

বিশ্ব সংবাদ

সৌরশক্তিচালিত টেলিফোন

বিজ্ঞানীরা সৌরশক্তি মানব কল্যাণে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করছেন। সম্প্রতি বৃটেনে সৌরশক্তিচালিত টেলিফোন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলে নরফোকের কাছে একটি পক্ষী সংরক্ষণ কেন্দ্রে সৌরটেলিফোন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তা চমৎকার ফললাভ করেছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে গ্রামে গ্রামে অতি সহজেই যোগাযোগ ব্যবস্থা টেলিফোনের মাধ্যমে প্রবর্তন করা যাবে—যদি এই ব্যবস্থা পরীক্ষার পর সফল হয়। সবই নির্ভর করবে কতটা ব্যয়সাপেক্ষ—তার উপর। পরিমিত ব্যয়ে করা সম্ভব হলেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

পিগিব্যাক

গত 18ই জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফলভাবে পৃথিবী থেকে মহাকাশ ষ্টেশনে যাত্রার যাত্রীবাহী
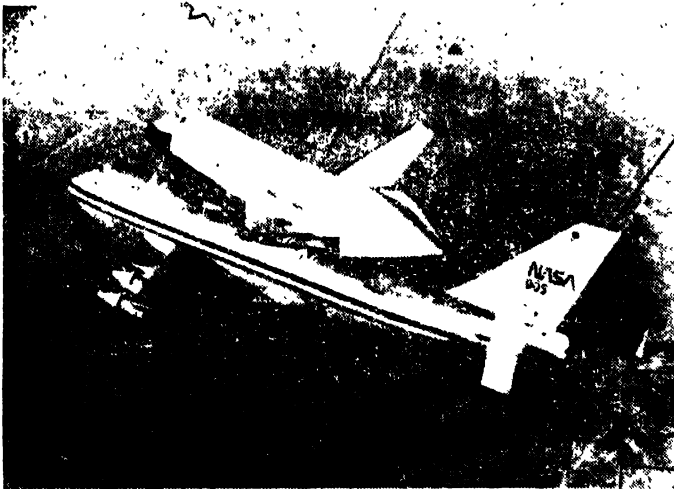
উড়ন্ত অবস্থায় পিগিব্যাক (Piggyback)

* নেতাজী নগর কলেজ, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা

যানের পরীক্ষামূলক অভিযান চালানো হয়েছে। যাত্রীবাহী যান "এণ্টারপ্রাইজ" দু-জন মহাকাশচারী ফ্রেড হেইস ও গর্ডন ফুলারটনকে নিয়ে 747 জাম্বো জেট-এর পিঠে চড়ে ('পিগি-ব্যাক') পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে যাত্রার পরীক্ষা চালায় এবং 42 মিনিটকাল এই পরীক্ষা চলে। উপরের ছবিটিতে যাত্রী ছাড়া মহাকাশ যান 'এণ্টারপ্রাইজ'কে পরীক্ষামূলকভাবে 747-জাম্বো জেটের পিঠে চড়ে আকাশ ভ্রমণের পরীক্ষা চালাতে দেখা যাচ্ছে। এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল গত বছরের গ্রীষ্মকালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মোঝাবো মরুভূমি অঞ্চলে। উড়ন্ত অবস্থায় জাম্বো জেট বিমানটি ঘণ্টায় 700 কিলোমিটার গতিবেগসম্পন্ন হলে তার পিঠ থেকে মহাকাশ যাত্রীবাহী যান 'এণ্টারপ্রাইজ' জেট বিমানটি ছেড়ে আকাশে ওঠে এবং পরে আবার উড়ন্ত জাম্বো জেট বিমানটির পিঠে এসে বসে। নির্বিঘ্নে এই পরীক্ষা পর পর পাঁচবার চালানো হয়।

ভারতীয় সংবাদ ট্রানজিষ্টর

ট্রানজিষ্টর টেলিভিসান

ট্রানজিষ্টর রেডিও এখন ভারতের ঘরে ঘরে। তাই এখন ট্রানজিষ্টর রেডিওর মত ট্রানজিষ্টর টেলিভিশান তৈরি করার চেষ্টা চলছে। এই টেলিভিসান যন্ত্রটি ব্যাটারীর দ্বারা পরিচালিত। ট্রানজিষ্টর টি. ভি সঙ্গে নিয়ে খুশীমত চলাফেরা করা যাবে। সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নামক একটি ভারতীয় গবেষণা সংস্থা এই ট্রানজিষ্টর টি. ভি. তৈরি করেছে। ইতিমধ্যেই পিলানী ইঞ্জিনীয়ারিং ইনষ্টিটিউট একটি ভাল্‌ব্‌ সেট বা পাওয়ার সেট তৈরি করেছে। শোনা যাচ্ছে এই টি. ভি সেটগুলিতে multichannel ব্যবস্থাও রয়েছে। এই সংস্থা জানায় যে একটি সেটের উৎপাদন খরচ মাত্র 1100 টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আমেরিকার পেনসেলভেনিয়ার একটি গবেষণাগারে ট্রানজিষ্টর টি. ভি সেট তৈরি করা এবং তা রঙীন টি. ভি সেটে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ

কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষৎ (বিজ্ঞান)

বর্তমানে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যই বিজ্ঞান প্রসারের জন্য সুসংগঠিত হয়েছে ও এই সব পরিষৎ কর্তৃক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এদের মধ্যে কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষৎ (বিজ্ঞান) অন্যতম।

1957 সালে এই পরিষৎ গঠনের চেষ্টা হয় এবং আধুনিক শাস্ত্র নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। কিন্তু এটি বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

1962 সালের পর পুনরায় উদ্‌যোগ নেওয়া হয় ও এবারে এই উদ্‌যোগ বিরাট সফলতা অর্জন করে। পারষদের উদ্যোক্তরা দাবী করেছেন—বর্তমানে এই পরিষৎ-এর সভ্য সংখ্যা 4000 জন। এ ছাড়া প্রায় 1500 বিজ্ঞান সংস্থা এই সংস্থার অনুমোদিত। এই সংস্থা থেকে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে; এইগুলি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের পত্রিকা। এগুলির নাম—শাস্ত্রগথী (কলেজ ছাত্রদের জন্যে), শাস্ত্রকেরলম্ (উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে), ইউরেকা (উচ্চ প্রাথমিক ছাত্রদের জন্যে)। প্রচার সংখ্যা শাস্ত্রগথী-5000, শাস্ত্রকেরলম-15,000, ইউরেকা 7000।

সমস্ত প্রদেশে এদের শাখা স্থাপিত হয়েছে। মূল কেন্দ্র দুটি—একটি কালিকটে আর একটি ত্রিবেন্দ্রামে। এই পরিষদের উদযোগ বহু কারুশালা স্থাপিত হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন

শহরে ও গ্রামে গ্রামে নিয়মিত জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিষৎ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চারটি অ্যাকাডেমি সুসংগঠিত করেছে। এগুলি হল কেরল জীব-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি, কেরল পদার্থবিদ্যা অ্যাকাডেমি, কেরল রসায়ন-বিদ্যা অ্যাকাডেমি এবং কেরল কারিগরীবিদ্যা অ্যাকাডেমি।

এই পরিষদের তথ্যাদি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রসারের জন্যে নিশ্চয় প্রেরণা যোগাবে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় এ রাজ্যেও অনুরূপ বিজ্ঞান প্রসারের ব্যবস্থা হবে আশা করা যায়।

বায়ুমণ্ডল ও বিদ্যুৎ-মেঘ থেকে তড়িৎ-ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা

গণেশ বিশ্বাস*

"এ মেনং সুজতা সুতে মন্দি মিত্রায় মন্দিনে চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে॥"—মন্ত্র: ; 2, সুক্তম (ঋগ্বেদ-সংহিতা)

হে বিদ্বান পুরুষ! এই অগ্নিতত্ত্ব ও জল-তত্ত্বকে নানাভাবে প্রকাশিত কর। ইহা প্রকাশিত হলে এই হর্ষদায়ক কলাকৌশলের সহায়ক অগ্নি* বা বিদ্যুৎকে পুরুষার্থী ও কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিদের সুখের জন্যে তার সদ্ব্যবহার কর।

কলকাতার মত বড় শহরে যে কোন সময়ে খুট্ করে সুইচ টিপলেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে ওঠে, পাখা ঘুরতে থাকে। যে সব জায়গা থেকে এই তড়িৎপ্রবাহ আসছে, সেখানকার দানবাকারের তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রগুলি চব্বিশ ঘন্টাই না জানি কত ব্যস্ত! কিন্তু পৃথিবীর জন্ম থেকে বায়ুমণ্ডল দিবারাত্র যে ধরণের তড়িৎ ক্রিয়ায় ব্যস্ত রয়েছে, তার তুলনায় তারাপুরা কিংবা দামোদরের বৈদ্যুতিক যন্ত্র দানবগুলিকে বলা যায় নিতান্তই কুঁড়ের বাদশা! প্রকৃতপক্ষে বায়ুমণ্ডলকে বলা যায় একটি মহাদানবীয় তড়িৎ-উৎপাদক কারখানা। তার আকার যেমনই অদ্ভুত, তার কাজও তেমনি বিস্ময়কর! বায়ুমণ্ডলে সর্বক্ষণ যে সব তড়িৎক্রিয়া চলছে, তার সামান্যই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কেবল আকাশে বিদ্যুৎ-মেঘ সঞ্চারিত হলে, সময় সময় বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ-চমকের ঘটনা থেকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে চোখ বা পরোক্ষভাবে কানের সাহায্যে মেঘের বিদ্যুতের অস্তিত্ব অনুভব করতে সমর্থ হই।

বায়ুমণ্ডল ও মেঘে যে ধরণের তড়িৎক্রিয়া চলতে দেখা যায়, তা থেকে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে, এই সব তড়িৎ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে, তা হয়তো মানুষের বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন মেটাতে অনেকখানি সাহায্য করবে।

এখানে পৃথিবীর তড়িৎ-ক্ষেত্র ও বিদ্যুৎ-মেঘের সামান্য পরিচয় দিয়ে নিলে আলোচনাটি একটু প্রাঞ্জল হতে পারে।

* ন্যায় শাস্ত্র অনুযায়ী অগ্নি (তেজ) চার প্রকার—'ভৌম' (ভূপৃষ্ঠস্থ বহ্নি), 'দিব্য' (জল যার ইন্ধন ও আকাশে অবস্থানকারী বিদ্যুৎ), 'ঔদর্য' (ভুক্ত দ্রব্যের পরিণামহেতু তেজ), 'আকরজ' (খনি থেকে উৎপন্ন সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থ)।

"ভৌম দিব্যোদর্যাকরজ ভেদাৎ।"
তর্ক সংগ্রহ (অন্নং ভট্ট)

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি, মেদিনীপুর।

পৃথিবীর তড়িৎ-ক্ষেত্র

1752 খৃঃঅব্দে লেমোনিয়ে (Lemonnier, L. G.) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, উত্তম বা পরিষ্কার আবহাওয়ার কালে বায়ুমণ্ডলে একটি অবিচল তড়িৎ-ক্ষেত্র থাকে। এই তড়িৎ-ক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে পৃথিবীর বাইরের দিকে প্রায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত। এই তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রাবল্যের অভিমুখ নির্দিষ্ট থাকে বায়ু উচ্চস্তর

চিত্র 1—উত্তম আবহাওয়ায় পৃথিবীর তড়িৎ ক্ষেত্র

থেকে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে। এই ঘটনা থেকে জানা যায়, পৃথিবী ধারণ করছে ঋণতড়িৎ, যার মোট পরিমাণ 500000 কুলম্ব, আর বায়ুর উচ্চস্তরে রয়েছে ধনতড়িৎ। 50 কি. মি. উচ্চতার বায়ু-স্তরের পরিবাহিতা অত্যন্ত বেশী এবং এই স্তরের সর্বত্র তড়িৎ-বিভব সমান। এই স্তরের আধুনিক নাম 'ইলেকট্রোস্ফিয়ার' (electrosphere)। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা যায়, পরিষ্কার আবহাওয়াকালীন বায়ুমণ্ডলীয় তড়িৎ-ক্ষেত্রের বিভব নতি (potential gradient)-এর মান, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সুরু করে, প্রতি মিটারে প্রায় 120 ভোল্ট (চিত্র 1)। ইলেকট্রোস্ফিয়ার ও ভূতলের মধ্যে বিভব-বৈষম্য দাঁড়ায় প্রায় 400000 ভোল্ট। এই বিপুল বিভব বৈষম্যের প্রভাবে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে ভূতলে সর্বদাই তড়িৎ প্রবাহিত হয়, যদিও এর পরিমাণ খুবই কম। এই প্রবাহের নাম 'পরিবহন-প্রবাহ'[1] (conduction current)। উত্তম আবহাওয়ায় এই প্রবাহের গড় মান প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে 2.73 মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার বলা যায়। বৃটিশ বিজ্ঞানী ওয়ারমেল (Wormel, T. W.) বাদলা আবহাওয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় তড়িৎপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডমিশ্রিত জল থেকে তড়িদ্‌বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তিন বছর ব্যাপী অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন প্রস্তুত করেছিলেন।

---

1. পরিবহন-প্রবাহ—ভূগর্ভস্থ তেজস্ক্রিয় পদার্থ, বায়ুমণ্ডলের তেজস্ক্রিয় গ্যাস, মহাজাগতিক রশ্মি, সূর্যের অতিবেগনী রশ্মি প্রভৃতির ক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত আয়ন-জোড় (ধনায়ন ও ঋণায়নের জোড়া) তৈরি হয়; ফলে বায়ুর পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী ও ইলেকট্রোস্ফিয়ারের মধ্যে বিদ্যমান বিভব-বৈষম্যের জন্যে আয়নসমূহ চলতে সুরু করে—ধনায়ন চলতে থাকে নিম্ন বিভবের দিকে (ভূতল অভিমুখে), আর ঋণায়ন চলতে থাকে উচ্চ বিভবের দিকে (ইলেকট্রোস্ফিয়ারের দিকে)। এই উভয় প্রকার আয়ন-স্রোতের সামগ্রিক ফল হল ইলেকট্রোস্ফিয়ার থেকে ভূতলের দিকে একটি অবিরাম তড়িৎ প্রবাহ—পরিবহন প্রবাহ। এই প্রবাহ ভল্টামিটারে কোন লবণের জলীয় দ্রবণে একটি পরিমিত বিভব-বৈষম্য প্রয়োগে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহের অনুরূপ।

বলা প্রয়োজন, বিভব-নতি বায়ুমণ্ডলের নীচের দিকেই বেশী; ফলে মোট 400000 ভোল্ট বিভব-বৈষম্যের অধিকাংশই নীচের দিক থেকে উৎপন্ন।

বিদ্যুৎ-মেঘ

একটি পরিণত বিদ্যুৎ-মেঘের ভূমির উচ্চতা থাকে এক কিলোমিটার থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে; শীর্ষদেশ থাকে দশ থেকে পনর কিলোমিটারের মধ্যে; ভূমির দৈর্ঘ্য ষোল কিমি.-এর মত এবং গভীরতা আট থেকে ষোল কিমি.।

বিদ্যুৎ-মেঘের ভূমি অঞ্চলের উষ্ণতা থাকে 0° সেগ্রে.-এর কিছু বেশী, আর শীর্ষদেশের উচ্চতা (−40°) সেগ্রে. বা আরো কম। মেঘের নিম্নাঞ্চলে থাকে শিলাগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর মিলিত বড় জলের ফোঁটা এবং কিছু শিলা। 0° সেগ্রে. উষ্ণতার স্তর থেকে (−40°) সেগ্রে. উষ্ণতা পর্যন্ত থাকে অতিশীতল জলের ক্ষুদ্র ফোঁটা এবং প্রচুর শিলা বা বরফ-কেলাস; (−40) সেগ্রে অপেক্ষা ভিন্ন উষ্ণতায় বিরাজ করে শুধু বরফ-কণা—অতিশীতল জল (−41°) সেগ্রে.-এর নীচে আর তরল অবস্থায় থাকতে পারে না।

মেঘের শীর্ষদেশে অবস্থান করে ধনাত্মক তড়িৎ এবং নিম্নাঞ্চলে ঋণতড়িৎ। ধনাত্মক তড়িৎ আধানের কেন্দ্র অবস্থিত থাকে (−20°) সেগ্রে. উষ্ণতায় এবং প্রায় 7 কিমি. কি তারও অধিক উচ্চতায়; ঋণাত্মক তড়িৎ-আধানের কেন্দ্র অবস্থান করে (−30°) সেগ্রে. উষ্ণতায় এবং 2 থেকে 7 কিমি. উচ্চতার মধ্যে। দুই প্রধান তড়িতের প্রত্যেকটির পরিমাণ 1000 কুলম্ব; এছাড়া অধিকাংশ বিদ্যুৎ-মেঘে হিমাঙ্কের কিছু বেশী উষ্ণতায় (+2° সেগ্রে.), প্রধান ঋণতড়িতের নীচের দিকে জলের ফোঁটার মধ্যে যে অতিরিক্ত ধনাত্মক তড়িৎ অবস্থান করে, তার পরিমাণ 10 কুলম্ব। মেঘের প্রধান তড়িৎদ্বয় উৎপন্ন হয় 50 ঘন কিমি. অঞ্চল জুড়ে; ঋণতড়িৎ আশ্রিত থাকে মেঘের অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুগুলিতে, যেমন শিলা এবং নীচের দিকের জলের ফোঁটায়, আর ধনাত্মক তড়িৎ থাকে লঘুতর বরফকুঁচি ও অতিশীতল জলবিন্দুতে। মেঘের মধ্যে তড়িৎ-আধান উৎপন্ন হবার প্রথমের দিকে উভয় প্রকার তড়িৎ কম-বেশী মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোতের মধ্য দিয়েই পড়তে থাকে নীচের দিকে এবং বিভিন্ন প্রান্তবেগ (terminal velocity)-এর জন্যে পৃথক হতে থাকে। এইভাবে তড়িৎ-আধান পৃথক হতে থাকলে, প্রক্রিয়ার সুরু থেকে গড়ে 20 মিনিট সময়ে মেঘের মধ্যে 3 কিমি. ব্যবধানে 20 থেকে 30 কুলম্ব তড়িৎ-আধান পৃথক হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মেঘের কেন্দ্রাঞ্চলের বিভব নতি দাঁড়ায় প্রতি সেন্টিমিটারে 1000 ভোল্টের মত। এই সময় মেঘের উভয় মেরুর মধ্যে অথবা মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে মোট বিভব-বৈষম্য দাঁড়ায় 10 কোটি থেকে 100 কোটি ভোল্ট আর ঠিক তখনই দেখা দেয় মেঘের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ চমক বা ভূপৃষ্ঠগামী বজ্রশিখা। একবার বিদ্যুৎ-মোক্ষণের 20-30 সেকেণ্ডের মধ্যেই মেঘ আবার তার বিদ্যুৎক্ষরণের সামর্থ্য ফিরে পায়, অর্থাৎ মেঘের মধ্যে আবার 20-30 কুলম্ব তড়িৎ আধান পৃথক হয়ে পড়ে।

বায়ুমণ্ডলীয় তড়িৎ থেকে ক্ষমতা লাভ

পরিবহন প্রবাহ থেকে ক্ষমতা লাভঃ এখন দেখা যাক বায়ুমণ্ডলীয় তড়িৎপ্রবাহ থেকে প্রতি মুহূর্তে কতটা ক্ষমতা (power) লাভ করা সম্ভব। পরিষ্কার আবহাওয়ায় ইলেকট্রোস্ফিয়ার ও ভূতলের মধ্যে বিদ্যমান 400000 ভোল্ট বিভব বৈষম্যে, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রবহমান 2·73 মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার পরিমাণের পরিবহন-প্রবাহ থেকে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ক্ষমতা পাওয়া যাবে,

$$(400000 \text{ ভোল্ট}) \times (2{\cdot}73 \times 10^{-6} \text{ অ্যাম্পিয়ার}) = 1{\cdot}092 \text{ ওয়াট}$$

এই পরিমাণ তাড়িৎ ক্ষমতায় এক বর্গ—কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত কোন বাড়ীর কোন প্রয়োজনই মেটে না।

বায়ুমণ্ডলে স্থায়ী বিভব-বৈষম্য থেকে ক্ষমতা লাভঃ এবার দেখা যাক ইলেকট্রোস্ফিয়ার ভূতলের মধ্যে উত্তম আবহাওয়ায় বিদ্যমান 400000 ভোল্ট বিভব-বৈষম্যের জন্য ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ুতে প্রতি মিটার উচ্চতায় 120 ভোল্টের মত যে বিভব-নতি দাঁড়ায়, তাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব কি না। এই বিভব-নতির জন্যে ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে দু-মিটার ব্যবধানে বিভব-

চিত্র 2
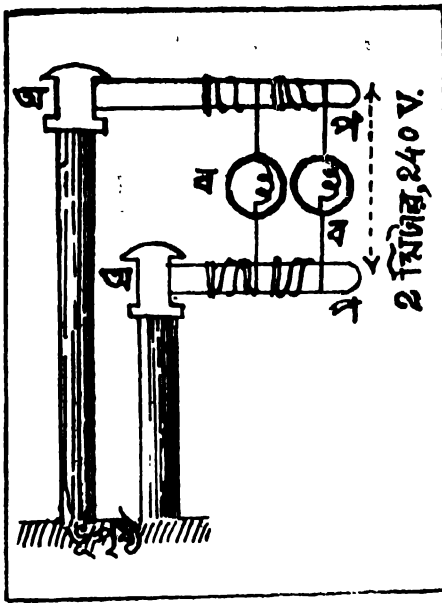
এবার আমরা আশা করতে পারি এই পরিবাহীদ্বয়ের (প. প.) সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যাবে। অ-অন্তরক, ব-বাল্‌ব্‌।

বৈষম্য দাঁড়ায় 240 ভোল্টের মত। কাজেই ভূ-পৃষ্ঠের উর্ধ্বে দু-মিটার ব্যবধানে পৃথিবীর সঙ্গে অন্তরিত দুটি পরিবাহী সুবিধাজনকভাবে স্থাপন করলে, এই পরিবাহী দুটির মধ্যেও বিভব-বৈষম্য দাঁড়াবে 240 ভোল্ট। তাই এবার আমরা আশা করতে পারি এই পরিবাহীদ্বয়ের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যাবে (চিত্র 2)।

কিন্তু সমস্যা রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে কোন অন্তরিত পরিবাহী স্থাপন করলে, প্রথমের দিকে তার তড়িৎ-বিভব আশপাশের বায়ু থেকে ভিন্ন হয়। এই সময় আশপাশের বায়ু এবং পরিবাহীর মধ্যে একটি স্বল্প মাত্রার তড়িৎ প্রবাহ (পরিবহন প্রবাহ প্রভৃতি) চলতে থাকে, যতক্ষণ না পরিবাহীর বিভব সংলগ্ন বায়ুর সমান হয়। কিন্তু বায়ু অত্যন্ত কুপরিবাহী (3 কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে, 1 মিটার দীর্ঘ এবং 1 বর্গ-মিটার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি বায়ুস্তম্ভের রোধের গড় মান $= 1.33 \times 10^{13}$ ওহম্ অর্থাৎ তের লক্ষ ত্রিশ হাজার কোটি ওহ্‌ম্—কি অচিন্তনীয় বিপুল রোধ! একটি এক শত ওয়াট বৈদ্যুতিক বাতির রোধ মাত্র 500 ওহমের মত) বলে পরিবাহী ও আশপাশের বিভব সমান হতে সময় লাগে অনেক। এখন যে মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলে স্থাপিত অন্তরিত পরিবাহীদ্বয়ের সঙ্গে কোন বাল্‌ব্ বা হিটার যোগ করা যায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই পরিবাহীদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান বিভব-বৈষম্য অন্তর্হিত হয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যে হারে পরিবাহীদ্বয়ের মধ্যে বিভব-বৈষম দূর হয়, সেই হারে উভয়ের মধ্যে বিভব-বৈষম্যের ঘাটতি পূরণ হয় না—ঘাটতি পূরণের পদ্ধতি অত্যন্ত ধীর। যে স্বল্পক্ষণের জন্যে বাল্‌বের তারের কুণ্ডলীতে 240 ভোল্ট বিভব-বৈষম্য ক্রিয়া করে, সেই সময়ের মধ্যে কুণ্ডলী উত্তপ্ত হয় না, ফলে আলোও জ্বলে না। আলো জ্বলার মূল শর্ত হল, প্রযুক্ত বিভব-বৈষম্য যেন পরিমিত মানের হয় এবং তা যেন সর্বক্ষণ অপরিবর্তিত থাকে।

বিদ্যুৎ-মেঘ থেকে ক্ষমতা লাভঃ এখন দেখা যাক বজ্রপাতকালে যে তড়িৎ-শক্তি মুক্ত হয়, তাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব কি না। মেঘের মধ্যে কিংবা মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যুৎ চমককালে 10 কোটি থেকে

10) কোটি ভোল্ট পরিমাণের যে বিভব-বৈষম্য সৃষ্টি হয়, তার ফলে প্রতিটি বিদ্যুৎ-শিখার প্রধান ঘা-এর[2] তড়িৎপ্রবাহের মান দাঁড়ায় 20,000 অ্যাম্পিয়ার থেকে 20,0000 অ্যাম্পিয়ার। যদি বিভব-বৈষম্য এবং প্রবাহের সর্বোচ্চ মানও ধরা যায়, তবে পৃথিবীস্পর্শী একটি বিদ্যুৎ-শিখার 'প্রধান-ঘা'-এর সঙ্গে যে তড়িৎশক্তি মুক্ত হয়, তার পরিমাণ (প্রধান-ঘা-এর স্থায়িত্বকাল 100 মাইক্রো-সেকেণ্ড বা 100×10^{-6} সেকেণ্ড ধরে) দাঁড়ায়,

(10^{9} ভোল্ট) $\times$ (2×10^{5} অ্যাম্পিয়ার) $\times$ (100×10^{-6} সেকেণ্ড) জুল $=$ (10^{9} ভোল্ট) $\times$ (20 কুলম্ব) জুল $=2\times10^{10}$ জুল, অর্থাৎ, দু-হাজার কোটি জুল।

ইংল্যাণ্ডের একটি হিসাব থেকে জানা যায়, সেখানে বছরে প্রতি বর্গ-কিলোমিটার ভূমিতে গড়ে মাত্র দুটি বজ্রপাত ঘটে। কাজেই সেখানে যদি প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ-শিখার শক্তিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়, তবে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে বছরে প্রতি বর্গ-কিলোমিটার এলাকার জন্যে প্রায় 4000 কোটি জুল, অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে প্রায় 1200 ওয়াট ক্ষমতা লাভ করা যেতে পারে। এর বেশীর ভাগ অংশ বিদ্যুৎ-শিখার পথের তাপ বৃদ্ধির কাজে ব্যয়িত হয়। কাজেই অবশিষ্ট বিদ্যুৎ-শক্তি মাত্র একটি গৃহস্থের আলো, হিটার, রেডিও, ফ্রিজ প্রভৃতি চালানোর কাজের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। এখন, লণ্ডন বা কলকাতার মত মহানগরীতে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে কয়েক হাজার ফ্ল্যাট-বাড়ী থাকা অসম্ভব নয়। কাজেই মনে হয় মেঘ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের সম্ভাবনা নিতান্তই অলীক।

---

2 প্রধান-ঘা—বজ্রপাত ঘটার পূর্বে প্রথমে মেঘের নিম্নদেশ থেকে একটি ধাপযুক্ত স্বল্পোজ্জ্বল তড়িৎ স্রোত (leader stroke বা stepped leader) পৃথিবী স্পর্শ করে, ফলে তার গতিপথের পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়; সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবাহী-পথের মাধ্যমে মেঘ-ভূমি থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে চোখ-ধাঁধানো আলোক-শিখাসহ তীব্র ইলেকট্রন-প্রবাহ। শেষের এই প্রবাহকে বলা যায় 'প্রধান-ঘা' বা 'প্রত্যাবৃত্ত-ঘা' (main stroke বা return stroke)

পরিষদের খবর

বিভিন্ন উপসমিতি (1977)

1. গৃহনির্মাণ তদারক উপসমিতিঃ কর্মসচিব (আহ্বায়ক), কোষাধ্যক্ষ, শ্রীরতনমোহন খাঁ, শ্রী ধীরাজ বসু, শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, শ্রীশ্যামসুন্দর দে, শ্রীশংকর দত্ত, শ্রীগোপাল মুখার্জী, শ্রীপ্রদীপ ঘোষ।

2. গৃহনির্মাণ উপসমিতি: শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমহাদেব দত্ত, শ্রীসুনীলকুমার সিংহ, শ্রীরতনমোহন খাঁ (আহ্বায়ক), শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, শ্রীধীরাজ বসু, শ্রীশ্যামসুন্দর দে, শ্রীসুনীলকুমার দে, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

3. প্রকাশন উপসমিতিঃ শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শ্রীশংকর চক্রবর্তী, শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্যগণ—শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী,

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, শ্রীমহাদেব দত্ত, শ্রীশ্যামসুন্দর দে, শ্রীবিজয়কুমার বল, শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী, শ্রীসুব্রত পাল, শ্রীনীতীশ সেন, শ্রীনিখিলেশ মিত্র।

4. অর্থ উপসমিতি ঃ সভাপতি, কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ (আহ্বায়ক), সহযোগী কর্মসচিবগণ, শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীধীরাজ বসু।

5. গ্রন্থাগার উপসমিতি ঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি), শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীবিজয় কুমার বল (আহ্বায়ক), শ্রীশান্তি বোস, শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত সিংহ, শ্রীশ্যামসুন্দর দে, শ্রীউষা ঘোষ দস্তিদার, শ্রীরতনমোহন খাঁ শ্রীশ্যামসুন্দর পাল, শ্রীযুগলকান্তি রায়, শ্রীবিপ্লব দাশ, শ্রীঅজিত কুমার সাহা, শ্রীদুলাল সাহা, শ্রীপার্বতী পাল, শ্রীঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবেশ রায়, শ্রীবিশ্বনাথ রায়।

6. সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র উপসমিতি ঃ শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু (সভাপতি), শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশ্যামসুন্দর দে, শ্রীনিখিলেশ মিত্র, শ্রীদীপক পাঠক, শ্রীবিজয়-কুমার বল, শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শ্রীবিশ্বনাথ দাসঘোষ, শ্রীদুলাল সাহা, শ্রীশংকর চক্রবর্তী, শ্রীপার্বতী পাল, শ্রীঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীঅসীম দত্ত, শ্রীসুব্রত ঘোষ, শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, শ্রীশ্যামসুন্দর পাল, শ্রীরতনমোহন খাঁ, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।

7. জনসংযোগ উপসমিতি ঃ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীধীরাজ বসু, শ্রীরতনমোহন খাঁ, শ্রীসাধন পাণ্ডে, শ্রীদেবব্রত সিংহ (আহ্বায়ক)।

8. যোজনা ও পরিকল্পনা উপসমিতি : শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীমণীন্দ্র-মোহন চক্রবর্তী (আহ্বায়ক), শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীসাধন পাণ্ডে, শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজিতকুমার মেদ্দা, শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, দে

রাজ্য মন্ত্রীসভায় পরিষদের সভ্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য ডক্টর অশোক মিত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রীসভায় অর্থ ও যোজনা দপ্তরের মন্ত্রীরূপে যোগদান করেছেন। এজন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে তাঁর সহযোগিতায় বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ রূপায়ণের প্রয়াস সার্থক হবে।

গ্রন্থ-সংবাদ

নিম্নোক্ত গ্রন্থটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় সমালোচনার জন্যে পাওয়া গেছে। যথাসময়ে এর সমালোচনা প্রকাশিত হবে।

আলো আরও আলো—সাধন দাশগুপ্ত, প্রত্যয় প্রকাশ : 17/2, জয়দেব কুণ্ডু লেন, হাওড়া। মূল্য : বারো টাকা।

বিজ্ঞানীদের জীবনপাতা থেকে

অবহেলা! এ কি অবহেলা?

বিজ্ঞান নিয়ে তোমরা কত গল্পই না শুনে থাক। কত বড় বড় আবিষ্কার নাকি হয়েছে আকস্মিক ঘটনার ফলে। পেনিসিলিন আবিষ্কারকে স্বয়ং ফ্লেমিং বিনয়বশতঃ বলেছেন অঘটনের জয়যাত্রা (triumph of accident)। কিন্তু সত্যিই কি তাই! ফ্লেমিং হয়তো পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্যই গবেষণা করছিলেন না কিন্তু মারাত্মক সংক্রামক জীবাণুনাশের জন্য তিনি গবেষণা শুরু করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকেই। যুদ্ধের সময় রয়েল মেডিকেল আর্মি কোরে কাজ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও সংক্রামক ব্যাধিতে অনাবশ্যক অসংখ্য মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন। অতি সামান্য আঘাতে মৃত্যু, অতি সাধারণ জীবাণুর বিরুদ্ধে অতি শক্তিশালী জীবাণুনাশক ওষুধের (antiseptics) ব্যর্থতা তাঁকে বিমূঢ় করে তোলে। তিনি অনুভব করলেন যুদ্ধের পূর্বে তাঁর সাফল্যমণ্ডিত জীবাণুবিষয়ক গবেষণা সবই অকিঞ্চিতকর ও উদ্দেশ্যহীন ছিল।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবার তিনি গবেষণা শুরু করলেন এমন একটা প্রতিষেধক আবিষ্কারের আশায় যা শরীরের কোন তন্তুর ক্ষতি না করে শক্তিশালী জীবাণুনাশক হবে। দশ বছর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা চালিয়ে বিভিন্ন যৌগিক উপাদান নিয়ে যখন তিনি খুবই বিব্রত, এমন সময় 1928 সালে এক গ্রীষ্মের দিনে গবেষণাগারে তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। একটি চেটাল ছোট গবেষণাপাত্রে তিনি কিছু ষ্টেফিলকোকাস জীবাণু কাল্‌চার করছিলেন। অবহেলাবশতঃ সেই পাত্রটির একাংশে কিছু ছাতা (mould) পড়েছে। এই রকম ছাতা প্রায় দেখা যায়। কিছুই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অনেক কারণেই ছাতা পড়তে পারে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে যুগসৃষ্টিকারী ধূলিকণা থেকে ছাতা পড়েছিল। শোনা যায়, নিকটবর্তী এক মদের দোকানের বিয়ারের পিঁপে থেকে

এই ধূলিকণা উড়ে এসেছিল। ফ্লেমিং পরীক্ষা করে দেখলেন পাত্রের 'ছাতা-পড়া' অংশটুকু জীবাণুমুক্ত এবং আরও ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন আশেপাশের জীবাণু কুঁকড়ে যাচ্ছে। তাহলে কি ঐ ছাতা-পড়া অংশ থেকে এমন একটা কিছু বেরচ্ছে যা জীবাণুনাশক? এর পর অবশ্য বহু জটিল গবেষণা, বহু ধরণের পরীক্ষা ও আরও বহু গবেষকের প্রচেষ্টায় পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়।

পেনিসিলিনের উপাদান ঐ বিশেষ 'ছাতা' আবিষ্কারকে "অঘটনের জয়যাত্রা" বলা ঠিক হবে না কিন্তু। আসলে এই সব আকস্মিক আবিষ্কারের কারণ নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা, ক্লান্তিহীন পর্যবেক্ষণ এবং কিছু কিছু শুভ যোগাযোগ। এক কথায় কোন কিছু অবহেলা না করাই সাধনার অঙ্গ। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ কালে ফ্লেমিং নিজেই বলেছিলেন—আমি যদি প্রথমে বলতাম অসংখ্য গবেষণা, প্রচুর পড়াশুনা ও গভীর চিন্তার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে এক বিশেষ ধরণের 'ছাতা' থেকে মূল্যবান জীবাণুনাশক আহরণ করা সম্ভব এবং আমি তারই গবেষণা করেছি তাহলে সেটা অসত্য ভাষণ হত। তাই আমি সত্যি কথা বলাই শ্রেয় মনে করি। একটা আকস্মিক পর্যবেক্ষণ থেকে পেনিসিলিনের উৎপত্তি। আমার কৃতিত্ব এইটুকুই যে আমি এই পর্যবেক্ষণ অবহেলা করিনি এবং এক জীবাণু গবেষকের ন্যায় এই বিষয়ে কাজ করে গেছি।

গবেষকের সাধনা তো তাই—কোন কিছু অবহেলা না করার অসাধারণ পরিশ্রম।

নীতীশ সেন*

* ফলিত গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

জীবমণ্ডল

জীবজগৎ এবং এই পৃথিবীর অশ্মমণ্ডল (lithosphere), বারিমণ্ডল (hydrosphere) এবং বায়ুমণ্ডল (atmosphere) এই সব মিলিয়ে হল জীবমণ্ডল (biosphere)। অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল বলতে বোঝায় এই পৃথিবীর কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় আবরণ। আর জীবমণ্ডল বলতে বোঝায় পৃথিবীর এমন একটি পাতলা আবরণ, যেখানে নানাপ্রকার জীবের অবস্থান।

ভূপৃষ্ঠে আছে প্রধান দুটি মণ্ডল—অশ্মমণ্ডল ও বারিমণ্ডল। আর পৃথিবীর চারদিকে বায়ুর যে আবরণ আছে, তার নাম বায়ুমণ্ডল। অশ্মমণ্ডলে সাধারণভাবে আগ্নেয়শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়, সেই সঙ্গে কিছুটা পাললিক শিলাও থাকে। ভূপৃষ্ঠে অবশ্য স্থল অপেক্ষা জলই বেশী (ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিন ভাগই জল)।

বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, মৌল বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় এক-শ', আর এদের প্রায় সবগুলিকেই পৃথিবীতে পাওয়া যায়। ভূত্বকে সোনা, রূপা, তামা প্লাটিনাম প্রভৃতি কয়েকটি মৌল মুক্ত অবস্থায় পাওয় যায়। তবে অধিকাংশ মৌলই পাওয়া যায় অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ যৌগ বা যৌগিক পদার্থরূপে। বিজ্ঞানী ক্লার্ক ভূপৃষ্ঠে (24 মাইল গভীরতা পর্যন্ত অশ্মমণ্ডল এবং বারিমণ্ডল) এবং বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ সম্পর্কে একটা হিসেব করেছেন। তাঁর হিসেব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আছে অক্সিজেন (49·85 শতাংশ) ; তারপর আছে সিলিকন (26·03 শ.), অ্যালুমিনিয়াম (7·28 শ.) এবং আয়রন বা লোহা (4·12 শ.)। তার চেয়েও কম আছে ক্যালসিয়াম (3·18) (2·33 শ.), সোডিয়াম (2·33 শ.), পটাসিয়াম (2·33 শ.) ও ম্যাগনেসিয়াম (2·11 শ.)। আর খুব কম পরিমাণে আছে হাইড্রোজেন (0·97 শ.), টাইটেনিয়াম (0·41 শ.), ক্লোরিন (0·20 শ.), কার্বন (0·19 শ.) প্রভৃতি মৌল।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে অন্ততঃ 250 মাইল (400 কি. মি.) পর্যন্ত বায়ু বিদ্যমান। তবে এই বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নি। অনেকের অনুমান, এর বিস্তার উপর দিকে প্রায় হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত।

বায়ুর ওজন আছে। তাই উপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের উপর চাপ দেয়। এজন্য ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে ওঠা যায়, বায়ুস্তর তত পাতলা হয়ে গেছে। সেখানকার বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে প্রয়োজনীয় বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, এজন্য শ্বাসকষ্ট হয়।

বায়ু একটি মিশ্র। আয়তন হিসেবে বায়ুর প্রায় একভাগ অক্সিজেন ও চার ভাগ নাইট্রোজেন—এ দুটি হল বায়ুর প্রধান উপাদান। এছাড়া বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং কতকগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে, তবে তাদের পরিমাণ খুব কম।

জীব তার গঠনগত উপাদানের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করে পৃথিবীর উপর, তার শক্তির জন্য নির্ভর করে সূর্যের উপর। একটি জীবদেহে উৎপন্ন শক্তি অন্য জীবের কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং, শক্তির জন্য জীবজগতে অবিরাম সৌর শক্তির প্রবাহ প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সবুজ উদ্ভিদই সৌর শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এজন্য অন্য সকল জীবকেই শক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে সূর্য থেকে যে, পরিমাণ তেজ-রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তার 0·1 শতাংশ মাত্র সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগাতে

পারে। এই শক্তি নানারূপ খাদ্যদ্রব্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন জীব সেই সব খাদ্য থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, এই সব সবুজ উদ্ভিদ জীবমণ্ডলের সেই সব অঞ্চলেই শুধু সীমাবদ্ধ, যেখানে দিনের বেলায় সূর্যের আলো পৌঁছায়। এগুলি হল বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ, কয়েক মিলিমিটার গভীরতা পর্যন্ত মৃত্তিকান্তর, সমুদ্রের উপরিভাগ, হ্রদ এবং নদ-নদী।

উন্মুক্ত সাগরের উদ্ভিদ জীবন বলতে প্রধানতঃ প্ল্যাঙ্কটন বোঝায়। এরা সাধারণতঃ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়। এরা সমুদ্রের লবণাক্ত জলের তুলনায় সামান্য ভারি। কাজেই সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত থাকলে, এরা ধীরে ধীরে তলিয়ে যেত এবং শেষে একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে থিতিয়ে পড়তো। সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে এই সব উদ্ভিদ যে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় না, তার কারণ, সমুদ্র সব সময়ই অশান্ত থাকে। এই রকম কিছু উদ্ভিদ হয়তো ধীরে ধীরে ডুবে যায়, ডুবে যেতে যেতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারপর জলের তাড়নায় আবার উপরদিকে ভেসে ওঠে। এই সব উদ্ভিদকোষ সব সময় একটি অঞ্চলে আবদ্ধ থাকলে সেখানকার পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হয়ে যেত। কিন্তু জলের তাড়নায় এরা এক জায়গা থেকে এমন আর এক জায়গায় সরে যেতে পারে, যেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

আমাদের মত যে-সব প্রাণী ডাঙ্গার উপরে কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থের সংযোগ-স্থলে বাস করে, তারা অবশ্য চলে-ফিরে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। জলচর প্রাণীরাও জলের মধ্যে বিচরণ করে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

স্বাভাবিক কারণেই নীচের দিকে জীবমণ্ডলের বিস্তার খুবই সীমাবদ্ধ কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশী সীমাবদ্ধ উপরদিকে। সুউচ্চ পর্বতে (যেমন—হিমালয়ে) প্রায় ছ-হাজার মিটার সীমারেখার উপরে সবুজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ, তরল জলের একান্ত অভাব। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিম্নচাপ (অর্ধেকেরও কম) সম্ভবতঃ আর একটি কারণ। আরও অধিক উচ্চতায় কয়েক প্রকার নিম্নশ্রেণীর প্রাণী (যেমন—মাকড়সা) হয়তো দেখা যায়। এরা হয়তো এমন সব ছোটখাট কীট-পতঙ্গ ধরে খায়, যারা হাওয়ায় ভেসে আসা ফুলের পরাগ (বা, রেণু) কিংবা অন্যান্য জৈব পদার্থ আহার করে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবের পক্ষে কঠিন মৃত্তিকা ও বায়ুর সংযোগস্থলে জীবন-ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, সেখানেই তার আহার্য পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। অবশ্য পুকুর বা জলা-জায়গার স্থির জল এবং বায়ুর সংযোগস্থলেও নানাপ্রকার

কীটাণু বা জীবাণু বেঁচে থাকতে এবং বংশবিস্তার করতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানী বারনেল অনেকদিন আগেই বলেছেন যে, সুদূর অতীতে জলের সংস্পর্শযুক্ত মৃত্তিকাস্তরই সম্ভবতঃ জীবের জন্ম ও বিকাশের দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সবুজ উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয়—(1) জল, যা উদ্ভিদ সহজেই শিকড়ের সাহায্যে শোষণ করে নিতে পারবে এবং সেজন্য তা মৃত্তিকা-কণাগুলির মাঝে সব সময় উপযুক্ত চাপে সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন, (2) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, যা উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে সহজেই গ্রহণ করতে পারবে এবং (3) অক্সিজেন (বিশেষতঃ রাত্রিবেলা) যা জলের চেয়ে বায়ু থেকেই অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব। এছাড়া প্রয়োজন হয় নানাপ্রকার খনিজ লবণ, যেগুলি মৃত্তিকা-কণাগুলির মধ্যে অবস্থিত জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে।

অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে জীবের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং তাদের জীবন প্রধানতঃ ঐ সবের উপরেই নির্ভরশীল। পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলি পর্যায়ক্রমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং জলের বিবর্তনচক্রগুলি পর্যালোচনা করলে, এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে।

জীবজগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকেরই খাদ্যের প্রয়োজন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রকম জীবের মধ্যেও একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, একের বেঁচে থাকার জন্য, খাদ্য হিসেবে, অন্যের প্রয়োজন। যেমন, সবুজ উদ্ভিদ অজৈব উপাদান দিয়ে খাদ্য সংশ্লেষিত করে। আর হরিণ, গরু, মোষ, শূয়োর প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীরা ঐ সব উদ্ভিদ বা ঘাস-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার বাঘ, সিংহ, শিয়াল প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা তাদের খাদ্যের জন্যে একান্তভাবে নির্ভর করে ঐ সব তৃণভোজী প্রাণীদের উপরে। এই খাদ্য-শৃঙ্খল নিম্নরূপ :—

সবুজ উদ্ভিদ ——→	তৃণভোজী প্রাণী ——→	মাংসাশী প্রাণী
ঘাস, পাতা	হরিণ, গরু,	বাঘ, সিংহ
ইত্যাদি	মোষ ইত্যাদি	শিয়াল ইত্যাদি।

এই রকম আর একটি খাদ্য-শৃঙ্খল হল :—

ঘাস——→কীট-পতঙ্গ——→ব্যাঙ——→সাপ——→ময়ূর

আবার এইরকম অপর একটি খাদ্য-শৃঙ্খল হল :—

অ্যালগি (বা, সবুজ শেওলা)——→অ্যামিবা——→জলজ কীট-পতঙ্গ ——→ছোট মাছ——→বড় মাছ

এইভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এই পৃথিবীতে এইরকম খাদ্য-শৃঙ্খল আরও

অনেক আছে। আর তা থেকেই বোঝা যাবে যে, খাদ্যের ব্যাপারে একে অন্যের উপরে কতটা নির্ভরশীল।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, যে-কোন রকম খাদ্যের অভাব ঘটলে, তার উপর নির্ভরশীল প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। মরুভূমিতে জলাভাব, তাই সেখানে গাছপালা বিশেষ জন্মাতে পারে না। আর গাছপালা না থাকায় সেখানে তৃণভোজী প্রাণীরা থাকতে পারে না। আবার তৃণভোজী প্রাণীরা থাকে না বলে সেখানে মাংসাশী প্রাণীরাও থাকতে পারে না। তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চলের অবস্থাও অনেকটা এই রকম। অপর দিকে গভীর অরণ্যে, যেখানে নানাপ্রকার সবুজ উদ্ভিদের সমারোহ, ফুল-ফলের প্রাচুর্য, সেখানেই সাধারণতঃ হরেক রকম প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

* আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা-700 004

সার্থক হয়েছে আজ স্বপ্ন জেনারের

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ মরেছে বসন্ত রোগে। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে লাখে লাখে। খৃষ্ট জন্মের প্রায় বারো-শ' বছর আগে মৃত মিশরের ফ্যারাও পঞ্চম রামেশিসের মমি পরীক্ষা করে জানা গেছে, তিনি মারাত্মক ধরণের বসন্ত রোগের আক্রমণেই গত হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে লেখা সংস্কৃত ও চীনা গ্রন্থাদিতে বসন্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও বাইবেলে বা গ্রীক রোমক পুরাণে বসন্ত রোগের কোন উল্লেখ নেই।

বর্তমানে বসন্তের মারাত্মক প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কিন্তু পনেরো-কুড়ি বছর আগেও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক মড়কের সৃষ্টি করতো ভাইরাসঘটিত এই রোগ। আর দেশান্তরে? শুধুমাত্র একটি বছরে 1757 খৃষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের 57000 অধিবাসীদের মধ্যে 18000 জন মারা যায় বসন্ত রোগে। এর সঙ্গে অন্ধ হয়ে যায় যে কত জন তার ইয়ত্তা নেই।

এখন বসন্তে আর কেউ মারা যাবে না। বসন্ত পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়েছে—এ দাবী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বসন্ত দূরীকরণ কার্যক্রমের প্রধান ডাঃ জেনাল্ড হেণ্ডারসেনের।

বসন্ত জীবনে একবারই আসে। এই রোগ দ্বিতীয়বার কোন মানুষের দেহ আক্রমণ করে না। অষ্টদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মনুষ এই ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটুকু

জেনেছিল। তাই তারা বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে গুটি তুলে নিয়ে তা দিয়ে কোন নীরোগ লোকের দেহ ছড়ে দিত। ফলে নীরোগ লোকটি মৃদু ধরণের বসন্তে আক্রান্ত হত এবং তা থেকে সহজেই মুক্তি পেত। কিন্তু এর ফলে ভবিষ্যতে সে আর কোন দিন বসন্তে আক্রান্ত হত না। এই ধরণের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বলা হত 'ভেরিওলেশন'। কারণ বসন্তের ভাইরাসের নাম 'ভেরিওয়ালা।' অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে ভেরিওলেশন খুব জনপ্রিয় ছিল। এই ভেরিওলেশন করতে গিয়ে জানা গেল একটি তথ্য: গো-বসন্তে পূর্বাক্রান্ত গোয়ালিনীদের ভেরিওলেশনে করে মৃদু বসন্ত রোগাক্রান্ত করা যায় না। তথ্যটিকে কাজে লাগালেন ইংরেজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার। 1796 খৃষ্টাব্দে তিনি গো-বসন্তে আক্রান্ত এক গোয়ালিনীর দেহ থেকে শুক্‌নো গুটি নিয়ে তা দিয়ে ছড়ে দিলেন আটবছর বয়সী একটি ছেলের বাহু। এর ফলে ছেলেটি ভেরিওলেশনের ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে গেল। জেনার এই পদ্ধতির নাম দিলেন 'টিকা দেওয়া' এবং ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলেই পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নেবে মারাত্মক বসন্ত রোগ।

কিন্তু জেনারের কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। বসন্তে প্রতি বছরে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে। সঙ্গে সঙ্গে দোহাই দিয়েছে ভগবানের। বসন্ত ঈশ্বর প্রেরিত এবং অবশ্যম্ভাবী রোগব্যাধি। ফলে টিকা দিতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবীরা প্রহৃত হয়েছে দেশে দেশে।

এর কারণ একটাই। অতীতে কোন রাষ্ট্রই জনচিকিৎসাকে বর্তমানের মত গুরুত্ব দিত না। আজ বসন্ত দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত বিরাট সংস্থার দশ বছর মেয়াদী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে—যে পরিকল্পনাকে সর্বাত্মক সাহায্য দিয়েছে জাতিসংস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র।

বসন্ত রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আমাদের সবারই আছে। বসন্ত হল আঞ্চলিক মারী (endemic)। এর ভাইরাস বায়ুতাড়িত হয়ে এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশলাভ করে। সংক্রমণের প্রথমে ভাইরাস রোগীর ফুস্‌ফুসের মধ্যে বাসা বাঁধে, সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দিন দশ বারো পরে প্রবল গা ব্যথার সঙ্গে জ্বর আসে রোগীর। আরও দু-তিন দিন বাদে হাতে ও কপালে বসন্তের গুটি দেখা দেয়। পরে সারা শরীরে গুটি দেখা দেয়, চোখের মণিও বাদ পড়ে না। প্রথমে গুটিগুলি রসভর্তি থাকে। দিন পাঁচেক বাদে রস পরিণত হয় পুঁজে। আরও দিন পাঁচেক বাদে, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি রোগী না মারা পড়ে, গুটিগুলি শুকাতে আরম্ভ করে। শেষে খুলে পড়ে যায়। রেখে যায় বিবর্ণ দাগ, যেগুলি ক্রমশঃ পরিণত হয় ছোট ছোট কালো গর্তে। 'ভেরিওলা মেজর' ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা 20-40 জনই মারা যায়। বেঁচে গেলেও অনেকে হয়ে যায় চিরদিনের মত অন্ধ।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও বসন্ত রোগ দূরীভূত হয়েছে পৃথিবী থেকে। আরও দু-বছর বাদে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সরকারীভাবে ঘোষণা করবেন রোগ নিঃশেষের কথা। পৃথিবীর শেষ বসন্ত রোগীটি রোগাক্রান্ত হয়েছিল ইথিওপিয়ার এক অজ গ্রামে, গত বছরের নয়ই অগাষ্টে। ভারতের শেষ বসন্ত রোগীটি আক্রান্ত হয়েছিল 1975 সালের চব্বিশে মে। তারও আগে 1972 সালে আফগানিস্থান থেকে ও 1974 সালে পাকিস্থান থেকে বসন্ত বিদায় নিয়েছে। বাংলা দেশের শেষ বসন্ত রোগীটি হল তিন বছরের রহিমা বানু। সে 1975 সালের ষোলই অক্টোবর মারাত্মক ধরণের 'ভেরিওলা মেজর' ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সে শুধু বাংলা দেশেরই নয়, 'ভেরিওলা মেজরের'ও শেষ রোগী। ইথিওপিয়ায় সক্রিয় ভাইরাসের নাম ছিল 'ভেরিওলা মাইনর।'

এ সম্ভব হয়েছে শুধু জেনারের টিকা দানের কল্যাণেই নয়; বসন্ত তার নিজের ভাইরাসের মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিয়ে বেড়াচ্ছিল। 'ভেরিওলা মেজর' ও 'ভেরিওলা মাইনরে'র এক বিশেষ ধর্ম হল, মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব তাদের পোষকের কাজ করতে পারে না। মানুষের ফুস্‌ফুসই তাদের একমাত্র বাসস্থান এবং তারা কোন মানুষের দেহেই চার সপ্তাহের বেশী থাকতে পারে না।

বিগত 1967 সালের প্রারম্ভে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন বসন্ত দূরীকরণের কার্যক্রমটি হাতে নেয় তখন নিরক্ষীয় অঞ্চলের তিরিশটি ঘন বসতিপূর্ণ রাষ্ট্রে বসন্ত সারা বছরের রোগ ছিল। রোগ দূরীকরণের জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহামারী বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের সাহায্যে দুটি কাজ করতে লাগলেন—রোগাক্রান্তদের পৃথকীকরণ ও ব্যাপক টিকা দান। কোথাও রোগীর সন্ধান পেলেই তাঁরা রোগীকে ঘরবন্দী করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেন আশেপাশের সমস্ত টিকা না-দেওয়া লোককে। টিকা না-দেওয়া কাউকেই রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিতেন না। এর ফলে রোগের প্রসার বন্ধ হতে লাগল। মাস দুয়েকের মধ্যে ঐ অঞ্চলে দ্বিতীয় কেউ বসন্ত রোগাক্রান্ত না হলে ঐ অঞ্চল রোগমুক্ত বলে ধরে নেওয়া হতে লাগল। ভবিষ্যতে যদি না কেউ ফুস্‌ফুস ভরে অন্য অঞ্চল থেকে রোগের ভাইরাস নিয়ে আসে তবে ওই অঞ্চলে কারুর রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

পদ্ধতিটি আপাতদৃষ্টিতে সোজা মনে হলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীদের কাছে। অনুন্নত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশগুলির নিরক্ষর নাগরিকেরা রোগের কথা স্বাস্থ্যকর্মীকে জানাবার চেয়ে রোগ গোপন করাই শ্রেয় মনে করে। এছাড়া আছে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী। 1973 সালে উত্তর প্রদেশে সপ্তাহে 100 থেকে 300 বসন্ত রোগীর সংবাদ সরকারের কাছে পৌঁছত। অক্টোবর মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুসন্ধান করে দেখলেন সংখ্যাটা সাত হাজারেরও বেশী। আসলে স্বাস্থ্য কর্মীরা অধিকাংশ গ্রামে অনুসন্ধানই চালাতো না। সুতরাং রোগীর সঠিক সন্ধান পাওয়াই ছিল বিশ্ব

স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে প্রধান সমস্যা। সুখের বিষয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ঐকান্তিকতায় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হল। অনুসন্ধানে পদ্ধতির উন্নতি হল। রোগীর সন্ধান দেবার জন্যে পুরস্কার দেওয়া হতে লাগল। ফলে 1974 সালের জুলাই মাসে যে ভারতের সাত হাজার গ্রামে বসন্ত রাজত্ব করছিল, পরবর্তী মে মাসে সে ভারত থেকেই বসন্ত বিদায় নিল চিরদিনের মত। বসন্তের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল ইথিওপিয়ায়। সেখানে মরু ও পাহাড় ঘেরা দুটি অগম্য অঞ্চলের পাঁচটি গ্রামে গত বছরের জুন-জুলাই মাসে বসন্তের অস্তিত্ব ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দশজন মহামারী বিশেষজ্ঞ ও দশ হাজার ইথিওপিয় স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরলস প্রয়াসে অগাষ্ট মাসে বসন্ত চিরবিদায় নিল ইথিওপিয়া থেকে।

বসন্ত রোগ আর কি কোনদিন ফিরে আসবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ হেণ্ডারসন জানিয়েছেন, না, আসবে না—যদি না কোন মনুষ্যেতর জীবের অস্তিত্ব থেকে থাকে—যারা এই মুহূর্তে 'ভেরিওলা' ভাইরাস পোষণ করে চলেছে।

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়*

* রসায়ন বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া-3

বিজ্ঞান কি?

বর্তমানে মানব প্রগতিতে বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্ব। আজ সক্রিয় বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক, বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগীরা সমাজের এক বিরাট অংশ। বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্যে দেশে নানা সংস্থা গড়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্রমশঃই গুরুত্ব পাচ্ছে।

বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ক্রমশঃ বৃহত্তর স্থান অধিকার করছে। বিজ্ঞানে গবেষণা ও উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্যে বিদেশের অনেক বিজ্ঞান সংস্থা গড়ে উঠেছে, আবার অনেকে বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার করছে।

বর্তমান কালে পৃথিবীতে হাজার হাজার বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। এখন যদি একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলা যায় যে বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়, তবে মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতো দূরের কথা, খুব অল্প বিজ্ঞানী এই কথাটি ভেবে দেখেছেন। এই কথাটির উত্তর পাওয়া যাবে এমন পুস্তকের সংখ্যা খুবই অল্প; আবার এই সব পুস্তকের মধ্যে বেশীর ভাগ পুস্তকই ঠিক বিজ্ঞান নয়, মূলতঃ দর্শন সংক্রান্ত। অবশ্য এ বিষয়ে সঠিক ও সুস্পষ্ট উত্তর বিজ্ঞানের মধ্যে থেকে দেওয়াও কঠিন।

অবশ্য এর জন্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিজ্ঞান কি—এটা বিজ্ঞানের একটা

সবচেয়ে মূলগত প্রশ্ন। যে কোন বিষয় এই রকম মূলগত প্রশ্ন একই রকম কঠিন। যেমন দর্শন কি, সাহিত্য কি—এসব প্রশ্নের অল্প কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। আবার আমি কে, এই ছোট প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে দর্শনে, বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের বিরাট অংশ নিয়ে। তবে বিজ্ঞানী হয়ে বিজ্ঞান কি—এর প্রকৃত উত্তর দিতে না পারলেও বিজ্ঞান বলতে সাধারণ ভাবে কি বোঝা যায় সেটা দিকপাল বিজ্ঞানীদের লেখায় আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তার কিছু আলোচনা করার চেষ্টা হচ্ছে।

বিজ্ঞান কথাটির প্রচলন অতি প্রাচীন। এমন কি গীতার সপ্তম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ। তবে বিজ্ঞান বলতে বর্তমানে যা বোঝায়, ঐসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতীয় দর্শনাদিতে পরমাত্মা, ঈশ্বর বা আত্মার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে বিজ্ঞান বলতে বাস্তব বিজ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যুক্তিশাস্ত্রে বলা হয় কোন কিছুই সম্পূর্ণ গোড়া থেকে সুরু করা যায় না (nothing can begin from the beginning)। গোড়ায় ধারণার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না তবে এই সব ধারণা বলতে কি বোঝায় তার কিছুটা ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমানে সেটাই আলোচনা করা হবে।

মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বাইরের অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করে। অবশ্য বর্তমানকালে এই সব ইন্দ্রিয়ের সহায়ক নানা রকমের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একজন মানুষের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান নির্ভর করে একদিকে যেমন তাঁর বাইরের দৃষ্ট বস্তুর উপর, অপরদিকে তাঁর মানসিক ও ইন্দ্রিয়ের গঠনের উপর। সাধারণভাবে বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান মিলিয়ে যথাসম্ভব ব্যক্তি বিশেষের মানসিক বা ইন্দ্রিয়াদি-নিরপেক্ষ একটি বস্তুজগতের ধারণা করা হয়। এ বিষয়ে বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ প্রধানতঃ দর্শনের বিষয়বস্তু। বাস্তব বিজ্ঞানে এইরূপ একটি বস্তু জগতের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয় এবং চেষ্টা করা হয় এই বস্তুজগতের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা,ও জ্ঞান অর্জনের। বর্তমান আলোচনায় কি ভাবে এটা করা হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হবে।

বেকন প্রমুখ দার্শনিকেরা বাস্তব বিজ্ঞানে কি ভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞানী নিউটনও তাঁর "প্রিন্সিপিয়া" নামক প্রামাণ্য পুস্তকে আলোচনা করেছেন। এখানে নিউটনকে অনুসরণ করেই কি এ বিষয়ে উত্তর দিবার চেষ্টা করা হবে।

নিউটন বিজ্ঞানে তত্ত্ব সম্বন্ধে উপরের পুস্তকে চারটি সূত্র গ্রথিত করেছেন।

প্রথম সূত্র : যদি সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থা একই রূপ হয় তবে একইভাবে ঘটনা ঘটবে।

উপরিউক্ত সূত্রটি অধিরোহণ তর্কশাস্ত্রে বা জ্ঞান শাস্ত্রে (epistemology) একটি সাধারণ সূত্র, এর নাম "প্রাকৃতিক একরূপতা" (Uniformity of Nature)।

একটু ভাবলেই দেখা যাবে এটি সাধারণ মানুষেরও বিশ্বাস।

দ্বিতীয় সূত্র : প্রত্যেক নির্দিষ্ট কারণে সুনির্দিষ্টরূপে কার্য বা ঘটনা ঘটবে। এটি সাধারণভাবে কার্যকারণ সূত্র নামে পরিচিত। প্রথম সূত্রটির মত এটিও যে কোন যুক্তি-সম্মত বিদ্যার সাধারণ সূত্র, একারণে এটির বিশেষ আলোচনা-নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় সূত্র : বস্তুর যেসব ধর্ম পরিবেশের নানারূপ পরিবর্তনে নিত্য (অপরিবর্তনীয়) তা বস্তুর নিজস্ব ধর্ম বলে গৃহীত হয়।

অধিরোহণ তর্কশাস্ত্রে এই সূত্রটি সবিস্তারে আলোচিত। এই সূত্রের সাহায্যে বস্তুর নিজস্ব ধর্মের বর্ণনা করে সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়। এই সূত্রের মূল ধারণাটিরও যে কোন যুক্তিসম্মত সাধারণ বিদ্যায় একটি মূল ধারণা হিসাবে গৃহীত হয়।

তবে এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত যে বর্তমানে যে কোন যুক্তিসম্মত বিদ্যায় কয়েকটি সর্বাপেক্ষা মূলগত বস্তু বা বিষয়ের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয় না। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে যুক্তিসম্মত কোন বিদ্যা একেবারে গোড়া থেকে গ্রথিত করা সম্ভব নয়। কয়েকটি সর্বাপেক্ষা মূলগত বস্তু বা বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে ঐ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেবার চেষ্টা করা হয়। এই বিষয় বা বস্তুগুলির কতকগুলি মূল ধর্ম, কল্পনা বা স্বতঃসিদ্ধরূপে বিবৃত করা হয়। পরে সব সংজ্ঞা বা আলোচনা এইগুলির উপর চলে।

চতুর্থ সূত্র : বাস্তব বিজ্ঞানে যে কোন তথ্যের প্রারম্ভিক কল্পনা বাস্তব জগতের বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমর্থিত বা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর যুক্তিসম্মতভাবে ভিত্তি করে গ্রথিত হবে। বাস্তব বিজ্ঞানের যে কোন শখায় উপরিউক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমর্থিত কল্পনার (hypothesis, প্রাকৃতিক নিয়ম) উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত যুক্তিসম্মত উপায়ে যে সমস্ত তত্ত্ব গড়ে ওঠে ও সেভাবে পাওয়া ফলাফলের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গতি দেখাতে পারলে তবে তা বাস্তব বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই সূত্রটি বাস্তব বিজ্ঞানকে অপরাপর যুক্তিসম্মত বিদ্যা থেকে বিশিষ্ট করে।

পরবর্তীকালে এই সূত্রটি নানাভাবে টীকা দিয়ে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গেছে, এইভাবে পাওয়া গেছে আপেক্ষিত তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পরের প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

শেষোক্ত সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে বাস্তব বিজ্ঞানের যে কোন শাখার একদিকে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অপর দিকে থাকে তত্ত্ব। ম্যাক্স বর্ন তাঁর "The Theory and the Expriment" পুস্তকে বলেছেন যে বিজ্ঞানের প্রগতি হয় দুটি ডানার উপর ভর দিয়ে, একটি ডানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অপরটি তত্ত্ব। এ বিষয়েও পরবর্তী প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।*

শ্রীমহাদেব দত্ত

*[17ই এপ্রিল '77 পরিষদের 'হাতে-কলমে কেন্দ্রে' প্রদত্ত বক্তৃতাংশ অবলম্বনে রচিত]

মডেল তৈরি

(1)

বৈদ্যুতিক রেগুলেটর

রেগুলেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ইচ্ছামত কমিয়ে বা বাড়িয়ে বৈদ্যুতিক পাখাকে আস্তে কিংবা জোরে চালানো যায়। অনেক সময় আবার আলোকের তীব্রতাকে ইচ্ছামত বদ্‌লানোর দরকার হয়ে থাকে। এখানে একটি সহজ পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক রেগুলেটর তৈরির কথা বলা হবে। যে কেউ এটি বাড়িতে বসে বিনা খরচে তৈরি করতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন :

i) একটি সুপরিবাহী ধাতুর তৈরী বাটি (হরলিক্‌স্‌ বা ঔষধের শিশির উপর যে ঢাক্‌না থাকে সেটি হলেও চলবে) ;

ii) একটি গোল করে কাটা পিচবোর্ড যা ঐ বাটি বা ঢাক্‌নার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে।

iii) কিছু পরিমাণ কার্বন গুঁড়ো (পুরনো ব্যাটারীর মাধ্যে যে কার্বন দণ্ড থাকে সেটি গুঁড়িয়ে নিলেই চলবে) ;

iv) একটি নাট এবং একটি বড় স্ক্রু ;

v) উল্লিখিত পিচবোর্ডের চেয়ে ছোট মাপের একটি গোল অ্যালুমিনিয়ামের পাত ও কিছুটা তার।

বাটি বা ঢাক্‌নাটিকে একটি কাঠের উপর আটকানো হল (চিত্র)। ঢাক্‌নাটির
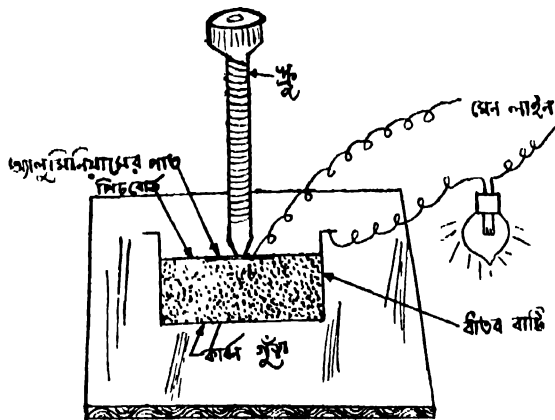
মধ্যে কার্বনের গুঁড়ো নেওয়া হল। এবার, পিচবোর্ডের মাঝখানে পাতলা ধাতুর পাতটি আটকে দিতে হবে। পিচবোর্ডে গর্ত করে একটি তারকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তা পাতের

সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তার পর এই পাতসহ পিচবোর্ডটিকে বাটির কার্বনের উপর রাখা হয়। একটি স্ক্রু কাঠের ফ্রেমের উপর রেখে ঐ কার্বনের উপর চাপ দিতে হবে। আর একটি তার ঐ বাটি এবং একটি বাল্‌ব-এর সঙ্গে শ্রেণী সমবায়ে মেইন লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এখন, মেইন লাইন চালু থাকলে আস্তে আস্তে বাল্‌ব্‌টি জ্বলবে।

পিচবোর্ডের উপর চাপ দিলে দেখা যাবে যে, বাতির উজ্জ্বলতা ক্রমশ বাড়ছে। বাতির বদলে পাখা লাগিয়েও তার গতি কমানো বা বাড়ানো যায়। এই ভাবে ইচ্ছামত বাতিকে বা পাখাকে জোরে জ্বালানো বা ঘোরানো সম্ভব। তাই এটিকে রেগুলেটর বলা হয়। কার্বনের উপর যত চাপ বাড়ানো এবং কমানো যায়, রোধও তত কমে কিংবা বাড়ে। এটাই হল এর মূল নীতি।

দুর্গাপ্রসাদ দাস*

---

* গ্রাম—খামারবাড়, পোঃ ওন্দা, জিলা—বাঁকুড়া।

(2)

সমীর সুড়ঙ্গ (Wind Tunnel)

বিমানের অন্যতম প্রধান অংশ হল এর plane বা ডানা। নামে 'প্লেন' হলেও ডানা মোটেই সমতলীয় নয়, এক বিশেষ ধরণের বক্রতল বিশিষ্ট, যার নাম এরোফয়েল (aerofoil)। বিমানের ডানার এই এরোফয়েল আকৃতি বায়ুস্রোতে বিমানকে উড্ডয়ন শক্তি (Lift) অর্জনে সাহায্য করে। এরোফয়েল অনেক রকমের হয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে প্রায়ই সব রকম এরোফয়েলের উপরিতলে কুঁজ (camber) থাকে। কিন্তু নীচের তল প্রকার ভেদে সমতল, কুঁজবিশিষ্ট কিংবা অবতল হতে পারে। কোন্‌ জাতীয় এরোফয়েল বিভিন্ন গতিতে কতটা উড্ডয়ন শক্তি অর্জন করতে পারবে তা নির্ণয় করা হয় wind tunnel বা কৃত্রিম সমীর সুড়ঙ্গে পরীক্ষা করে। সমীর সুড়ঙ্গ নির্মাণ ও চালু রাখা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। মোটামুটি পর্যবেক্ষণের জন্যে স্বল্প ব্যয়ে কি করে মিনি সমীর সুড়ঙ্গ বানানো যায়, সে আলোচনায় আসছি।

1. প্লাইউড 1/4″ মোটা
2. ঐ 1/8″ মোটা
3. সাইকেলের স্পোক বা ঐ জাতীয় মোটা তার —1টি
4. 1″×1″ কাঠের দণ্ড
5. টেবিল ফ্যান—1টি (রেগুলেটরসহ)

6, থার্মোকল $1'' \times 6'' \times 2'$

1/4" মোটা প্লাইউডের $9'' \times 20''$ চার টুকরো জুড়ে আয়তাকার বাক্স তৈরি কর। এই বাক্সের যে কোন একদিকের প্লাইউডের মাঝামাঝি জায়গায় 7" × 14" অংশ কেটে বাদ দিয়ে কাটা জায়গায় 4 মিলিমিটার পুরু কাচ লাগাও। এবার 'ক' চিত্রে প্রদত্ত মাপ অনুযায়ী আটখানা $\frac{1}{4}''$ পুরু প্লাইউডের টুক্‌রো কেটে নিয়ে দুটি বর্গাকার চোঙ তৈরি কর। এই বর্গাকার চোঙ দুটি মূল আয়তাকার বাক্সের খোলা

(ক)
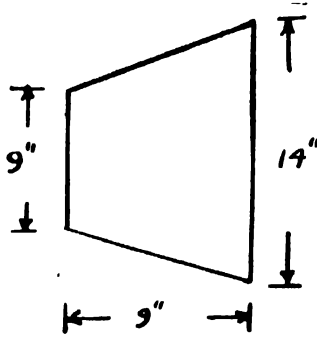
চিত্র ক

দু'প্রান্তে চিত্রানুযায়ী জুড়ে দাও। একটি বর্গাকার চোঙের ভিতর কয়েকটি $\frac{1}{4}''$ মোটা প্লাইউডের 4"–5" চওড়া লম্বা লম্বা টুক্‌রো পরস্পরের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রেখে সমান্তরাল দাড় করিয়ে ফেভিকল দিয়ে আটকে দাও। এগুলিকে static vane বলে। প্রতি দুটি উল্লম্ব static vane-এর মাঝে কয়েকটি আনুভূমিকে ভেন লাগাও। সমীর সুড়ঙ্গ তৈরি শেষ। সমীর সুড়ঙ্গের ভেনঅলা প্রান্তে একটি টেবিল ফ্যান বসিয়ে সমীর সুড়ঙ্গটিতে চারটি পায়া লাগিয়ে ফ্যানের পাখার সমান উঁচু কর (চিত্র খ)। সমীর সুড়ঙ্গের উপরিতলে মাঝামাঝি জায়গায় এক ধারের দিকে একটা তিন-চার ইঞ্চি উচু কাঠের টুক্‌রো বসাও। এখন সাইকেলের স্পোকটি ঐ কাঠের দণ্ডের উপরে দাঁড়িপাল্লার মত সহজভাবে লাগাও যেন আলম্বের দু-ধারের বাহুদ্বয়ে অনুপাত হয় 5:1। বড় বাহুটি pointer বা নির্দেশক কাঁটার কাজ করবে। তাই এর প্রান্তের কাছে অর্ধবৃত্তাকার স্কেল দাঁড় করাও। আর ছোট বাহুটির প্রান্ত থেকে একটা সরু ও পাত্‌লা টিনের পাত উপরিতলস্থ গর্ত দিয়ে সমীর সুড়ঙ্গের ভিতর পর্যন্ত চলে যাবে, যার সাহায্যে পরীক্ষণীয় এরোফয়েল অংশ বিভিন্ন কোণে ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

থার্মোকল টুক্রো থেকে দুই বা ততোধিক ভিন্ন আকৃতির এরোফয়েল কেটে নিয়ে এদের একটিকে উপরিউক্ত উপায়ে সমীর সুড়ঙ্গের ভিতর ঝুলিয়ে দাও।
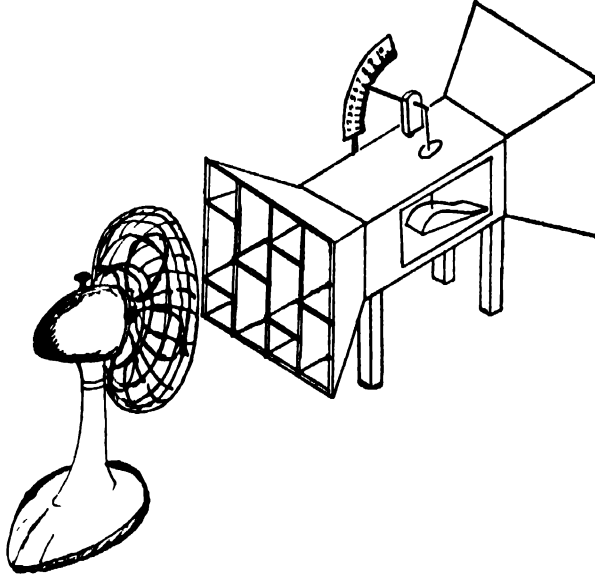
চিত্র খ

টেবিল ফ্যান থেকে উৎসারিত ঘূর্ণায়মান বায়ুপ্রবাহ স্টাটিক ভেনের জালিপথে সমান্তরাল হয়ে যখন সুড়ঙ্গের ভিতর বয়ে যাবে, তখন উপর-নীচে চাপের তারতম্য সৃষ্টিহেতু এরোফয়েলটি ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকবে। ফলে, আলম্বের অপর প্রান্তের নির্দেশক কাঁটা অর্ধ বৃত্তাকার স্কেল বরাবর নীচের দিকে নামতে থাকবে। রেগুলেটরের সাহায্যে বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং একই এয়ারোফয়েলকে ভিন্ন ভিন্ন কোণে ঝুলিয়ে রেখে, বিভিন্ন গতিতে এবং বিভিন্ন কোণে এরোফয়েলের উড্ডয়ন ক্ষমতা পরীক্ষা করা যাবে।

সম্প্রতি লোকান্তরিত আমার ছাত্র বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুলের একাদশ শ্রেণীর মেঘনাদ দত্তকে দিয়ে এ ধরণের একটা সফল সমীর সুড়ঙ্গ তৈরি করিয়েছিলাম। মেঘনাদ দত্ত গত ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত জেলা বিজ্ঞান মেলায় ঐ মডেলের জন্যে পুরস্কৃত হয়।

শ্রীনিখিলেশ মিত্র*

*বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা-700 019

ভেবে উত্তর দাও

1. গণিতের শিক্ষক হারাণবাবু ক্লাসে এসে সমাধান করতে দিলেন সমীকরণটিকে

$$x^4 = x$$

সঙ্গে সঙ্গে রাম উত্তর দিল

$x=1$, কিন্তু শ্যামের উত্তর $x=0$

কোন্ উত্তরটি ঠিক ও কেন ? আর কোন উত্তর আছে কিনা ?

2. যদু ক্লাসে শিখল

যদি $(x-a)^2 = b^2$ হয়

$x = a+b,\ a-b$

যদু $x=5$; $a=3,\ b=2$ নিয়ে দেখল

$$5 = 5,\ 1$$

5 আর 1 সমান হল কি করে ? এটা আবার কি ? কোথায় গোলমাল ?

3. ক্লাসে রাম প্রশ্ন করল

যখন $p^x = p^y$ তখন $x = y$

যেহেতু $5^0 = 5 = 5^1$, তবে

$0=1$ হবে না কেন ? শ্যাম শীঘ্র উত্তর দিল $p^x = p^y$ হলে $x=y$ হবে সব সময়, কেবল 0 বা 1 না হলে ; কাজেই রাম যা বলেছে তা ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে সেজন্য $0=1$ ঠিক নয়। শিক্ষক মহাশয় রাম ও শ্যাম দু'জনকেই ভুল করার জন্যে শাস্তি দিলেন। কেন বলতো ? ওরা দু'জনেই কি কি ভুল করল ?

4. মাধব গণিতের অসীম ধারণা যে সসীম, তা প্রমাণ করার জন্য যুক্তি দেখালো যে সবাই জানেন :—

$$\log x \geqslant \log y \text{ যখন } x \geqslant y$$

$$\therefore \log(0) > \log(-1)$$

এখন $\log x < 0$ যখন $x < 1$ আবার x কমলে $\log x$ কমে। সুতরাং $\log x \to -\infty$ যখন $x \to 0$

আবার $e^{\pi i} = \cos\pi + i\sin\pi = -1$

$$\therefore \log(-1) = \pi i$$

কাজেই $-\infty$ আপাতদৃষ্টিতে অসীম হলেও সীমাহীন নয়। সিদ্ধান্ত অদ্ভুত নয় কি ? তাহলে যুক্তির ভুল কোথায় ?

[তোমাদের কাছ থেকে উত্তর পাব বলে আশা করা যাচ্ছে]

আলপনা মুখোপাধ্যায়

* ফলিত গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 : আধুনিক পদার্থবিদ্যায় vacuum সম্বন্ধে ধারণা কি? আমরা কি সত্যিই ইথারকে বাদ দিতে পারি?

গৌতম বিশ্বাস, বহরমপুর।

উত্তর 1 : গ্যালিলিও এবং নিউটনের গতিবিদ্যায় সাফল্যের পর বিজ্ঞানের সবকিছুই বলবিদ্যার মডেল (mechanical model) দিয়ে ভাববার চেষ্টা হত। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তথ্যে মূলগত সমীকরণগুলিকে ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝবার জন্যে ইথারের কল্পনা করা হয়েছিল ও ইথারে কিছু কিছু বলবিদ্যার চিন্তাভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূলগত গুণ আরোপ করা হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রগতির পর বিশেষ করে 1928 সালে অধ্যাপক ডিরাক প্রমুখের গবেষণা-পত্র প্রকাশের পর বিজ্ঞানে বলবিদ্যার মডেল নিষ্প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হয়েছে। এখন গাণিতিক মডেলই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়। এদিক থেকে ইথারের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। তাকেই বর্তমানে vacuum বলা হবে যেখানে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি (কোনরূপ পরিবর্তন না করেই) বা সোয়েডিঙ্গার প্রভৃতির সমীকরণ সত্য।

রেণুকা দত্ত*

* ফলিত গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা 700 009

বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিককালে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি ফিচার (মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান—ব্যবহারিক, খাদ্যোৎপাদন, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সংবাদ—বিশ্ববিজ্ঞান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংবাদ (জাতীয় সংবাদ), পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংবাদ (আঞ্চলিক), গবেষণা-সংবাদ, বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর—মডেল তৈরি, ভেবে কর, প্রশ্ন ও উত্তর, জানবার কথা, শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানানুরাগীদের প্রবন্ধ বিজ্ঞানীদের জীবনের পাতা থেকে ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংস্থাকে এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করা হচ্ছে—তাঁরা যেন এই সব বিষয়ে সংবাদ ও প্রবন্ধাদি—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। উপযুক্ত বিবেচিত হলে তা যথাসময়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta.)

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগটি নব-কলেবরে সুসজ্জিত করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে উদ্বোধন করা হয়েছে।

১১

আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—গুপ্তপ্রেশ, কলিকাতা-700 009
মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

মাসিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	পূর্ণপৃষ্ঠা	অর্ধপৃষ্ঠা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
তৃতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
চতুর্থ প্রচ্ছদপট	250·00 টাকা	—
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপটমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
পঠনীয় বিষয়বস্তুমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	125·00 টাকা	65·00 টাকা
সাধারণ সিকিপৃষ্ঠা	40·00 টাকা	

বিজ্ঞাপনের এই হার কেবলমাত্র এক রঙের জন্যে। বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চুক্তিবদ্ধ হলে যথাক্রমে $7\frac{1}{2}\%$ এবং 5% রিবেট দেওয়া হয়।

বি. দ্র. এই হার নূতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চুক্তিবদ্ধ পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হারই বহাল থাকবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন: 55-0660.

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্যে পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র'-এর ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সঙ্গে উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করা যাবে। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাবে। তাঁর সঙ্গে পূর্বে যোগাযোগ করে পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্যগণের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

তাং 27.11.76
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55 0660

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুক-পোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ | অগাষ্ট, 1977 | অষ্টম সংখ্যা

রাজ্য পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

সম্প্রতি বিপুল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত রাজ্যে নূতন সরকার শাসনভার হাতে লইয়াছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করিব যে সমস্যাবহুল পশ্চিমবঙ্গে বহুজনের সমর্থনে সমাসীন সরকার বিভিন্ন বিষয়ে এমন নীতি নির্ধারণ ও তাহার রূপায়ণে সচেষ্ট হইবেন যাহাতে অনতিবিলম্বে আমাদের সমস্যাগুলি সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব না হইলেও কিছুটা সমাধান সম্ভব হয়। আমাদের দেশে যে ধরণের উন্নয়ন প্রয়োজন, তাহা কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বাস্তবানুগ প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব। সেই কথা বিগত কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য কেন্দ্রীয় যোজনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ 20 কোটি টাকা হইতে পঞ্চম পরিকল্পনায় 1568 কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য 150 কোটি টাকা ভাগে জুটিয়াছিল। রাজ্য যোজনা পর্ষদের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি গঠিত হইয়াছিল যাহাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা হইয়াছিল। 1971 সালের 4ঠা জুন তারিখে এক সভায় এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি গঠিত হয় এবং নিম্নলিখিত 10টি সাবকমিটি গঠিত হয়, যথা:—

(1) কৃষিবিদ্যা এবং তৎসম্পর্কিত বিজ্ঞান

(2) চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ফলিত পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

(3. উন্নয়নে সাহায্যকারী সমাজ-বিজ্ঞান

(4) প্রাণ-বিজ্ঞান

(5) পরিবেশ ও মৃৎ-বিজ্ঞান

(6) ভৌতিক বিজ্ঞান

(7) খনিজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

(8) ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যা

(9) ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত অন্যবিধ প্রযুক্তি

(10) বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ও জনসাধারণের নিকট বিজ্ঞান পৌঁছান ইত্যাদি

ইহার সব সাবকমিটিগুলিকে নিম্নলিখিত নির্দেশের মধ্যে কাজ করিতে বলা হইয়াছিল, যেমন :—

(1) বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থবহ যোগসূত্র গড়িয়া তোলা।

(2) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদিত প্রকল্প কমিটির পরিধির মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প যাচাই করিয়া উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সেইগুলির রূপায়ণের ব্যবস্থা করা।

(3) পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটিকে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রাখিতে সাহায্য করা এবং গবেষণা, অনুসন্ধান এবং প্রকল্প রূপায়ণ প্রভৃতি হইতে নবলব্ধ জ্ঞান উপরিউক্ত কমিটির গোচর করা।

(4) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে রূপায়ণের অগ্রাধিকার স্থির করা।

(5) মূল কমিটি হইতে প্রাপ্ত অন্য বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করা মূল কমিটির কার্যকলাপ রাজ্য উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ও উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হইবে তাহা আগেই রাজ্যপালের একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কতকগুলি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অনুমোদিত হয় এবং আর্থিক অনুদান ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য রাখিয়া কতকগুলি ছোট প্রকল্পই এই প্রাথমিক অনুমোদনে স্থান পাইয়াছিল। 1976 সালের মার্চ মাস হইতে এই সকল প্রকল্পের কাজ সুরু হয়। আরও অনেক প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটির নিকট আর্থিক সাহায্য অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, (1) পশ্চিমবঙ্গের প্রেরিত প্রকল্পগুলি এক বৎসরেরও অধিককাল বিবেচিত হয় নাই, (2) ছোট ছোট যে প্রকল্পগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চালু হইয়াছে তাহার নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য ঠিক সময়ে পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই জন্য এই সকল প্রকল্পে নিযুক্ত গবেষকদের মনে হতাশা ও অনিশ্চয়তার সঞ্চার হইয়াছে এবং স্বভাবতঃই এই অবস্থা কাজের পক্ষে সহায়ক নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল প্রকল্প চালু আছে তাহার কর্মিগণ গত তিন মাস বেতন পান নাই। আবার অনুদান ষান্মাসিক ও বাৎসরিক হিসাবে অগ্রিম না মিলিয়া প্রতি মাসে দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে কিন্তু তাহারও কোন স্থিরতা নাই। ফলে প্রকল্প রূপায়ণ ও তাহার কর্মীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর বর্তমান সরকার এখন পর্যন্ত এই সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতি ঘোষণা না করায় এই বিষয়ে অনিশ্চয়তা দূরীভূত হইতেছে না।

এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনে হয় সর্বাগ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি নির্ধারণ ও ঘোষণা আশু প্রয়োজন। যদি এই বিষয়ে পূর্বনির্ধারিত নীতিগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তাহাও অবিলম্বে করা আবশ্যক। আরও প্রয়োজন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি ও অন্য কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থাগুলির নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয় প্রাপ্য অর্থ ও অন্য সাহায্য আদায় করা। আমরা আশা করি পশ্চিমবঙ্গের নূতন সরকার পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রীক প্রয়োজনের দিক হইতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থাকে উপযুক্ত অগ্রাধিকার দিবেন। আগের মত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বর্তমানেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবে এই কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

শুল্বসূত্রের জ্যামিতি ও গণিত*

(2)

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন**

আয়ত ক্ষেত্রের বিবিধ রূপান্তর

নির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে, ত্রিভুজে কিংবা বৃত্তে রূপান্তরিত করবার অনেকগুলি নিয়ম শুল্বসূত্রে আছে।

(1) দু'টি বর্গক্ষেত্রের যোগফল কিংবা বিয়োগফলের সমান বর্গক্ষেত্র ঃ

বর্গক্ষেত্রের যোগফলের বেলায় বৌধায়নের সমাধান হল :

কনীয়সঃ করণ্যা বর্ষীয়সো বৃধ্রমুল্লিখেৎ।

বৃধ্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুঃ সমস্তয়োঃ পার্শ্বমানী ভবতি।

'বৃহত্তর বর্গক্ষেত্রের একাংশ ছোট বর্গক্ষেত্রের বাহু দিয়ে প্রথমে কেটে ফেলতে হবে। এই কাটা অংশের কর্ণের (অক্ষ্ণয়ারজ্জু) উপর রচিত বর্গক্ষেত্র প্রদত্ত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের যোগফলের সমান হবে।'

বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের বিয়োগফলের বেলায় বৌধায়ন বললেন :

যাবন্নির্জিহীর্ষেৎ তস্য করণ্যা বর্ষীয়সো বৃধ্রমুল্লিখেৎ।

বৃধ্রস্য পার্শ্বমানীমক্ষ্ণয়েতরৎ পার্শ্বমুপসংহরেৎ।

সা যত্র নিপতেৎ তদপচ্ছিন্দ্যাৎ।

ছিন্নয়া নিরস্তম্।

এর মানে বড় বর্গক্ষেত্রের একাংশ ছোট বর্গক্ষেত্রের বাহু দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। তারপর কাটা অংশের বড় বাহুটিকে বিপরীত বাহুর উপর নুইয়ে দিয়ে সেই বিপরীত বাহুর অংশ কেটে নিতে হবে। এই কাটা অংশের উপর তৈরি বর্গক্ষেত্র বিয়োগফলের সমান।

সূত্র—দু-টির মধ্য দিয়ে যে দু-টি পদ্ধতির কথা বলা হল আঁকলে তা এরকম দেখাবে। চিত্র-3-এ
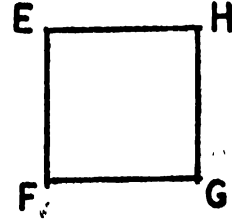
চিত্র 3 ক
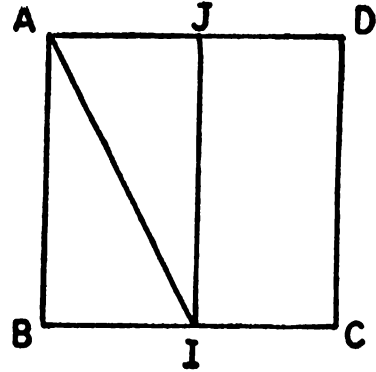
চিত্র 3 খ

A B C D বড় ক্ষেত্র থেকে ছোট ক্ষেত্র F G-র সমান করে A B I J আয়তক্ষেত্র কেটে নেওয়া হল। এই আয়তক্ষেত্রের কর্ণ A I হবে ঈপ্সিত বর্গক্ষেত্রের বাহু, কারণ

$AI^2 = AB^2 + BI^2$ = বড় বর্গক্ষেত্র + ছোট

* 14ই মে, '77 প্রদত্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা' (তৃতীয়)

** ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুর, কলিকাতা-700 032

বর্গক্ষেত্র চিত্র-4-এ ঐ একই অঙ্কন ব্যবস্থা। এখানে I J বাহুকে নুইয়ে দেওয়া হয়েছে A B বাহুর

চিত্র 4 ক

চিত্র 4 খ

উপর। এই নোয়ানো বাহু L K বড় বাহুর যে কাটা অংশ B K-র সৃষ্টি করেছে সেইটেই হবে ঈপ্সিত বর্গক্ষেত্রের বাহু। কারণ,

$BK^2 = KL^2 - BL^2 = AB^2 - BI^2 =$ বড় বর্গক্ষেত্র—ছোট বর্গক্ষেত্র

(2) **বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে কিংবা আয়তক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করবার উপায়ঃ**

মনে করা যাক যে বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে হবে সেই অভীষ্ট আয়তক্ষেত্রের একটি বাহুর মাপ দেওয়া আছে। ABCD প্রদত্ত বর্গক্ষেত্র, MN ঈপ্সিত আয়তক্ষেত্রের নির্দিষ্ট বাহু (চিত্র-5)। MN-এর সমান করে BA ও CD-কে বাড়িয়ে BCEF আয়তক্ষেত্র টানা হল। এর কর্ণ FC AD-কে ছেদ করেছে O বিন্দুতে। O-র ভিতর দিয়ে AB-র সমান্তরাল
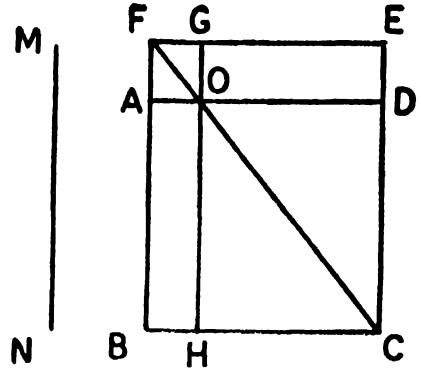
চিত্র 5

GH টানা হলে GHCE আয়তক্ষেত্র উৎপন্ন হল। এই আয়তক্ষেত্র যে ABCD বর্গক্ষেত্রের সমান তা সহজেই প্রমাণ করা যায়, কারণ অঙ্কন থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ABHO, GODE আয়তক্ষেত্র সমান। বৌধায়ন ও আপস্তম্বের টীকাকারদের ব্যাখ্যা অবলম্বনে এই অঙ্কন দেওয়া হল।

আয়তক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করবার বিষয়টি অপেক্ষাকৃত জটিল। ABCD আয়তক্ষেত্র থেকে BCEF বর্গক্ষেত্র কেটে নেবার পরে যে অংশ পড়ে রইল তাকে HG রেখা টেনে সমান দুটি আয়তক্ষেত্রে ভাগ করা হক (চিত্র-6)।
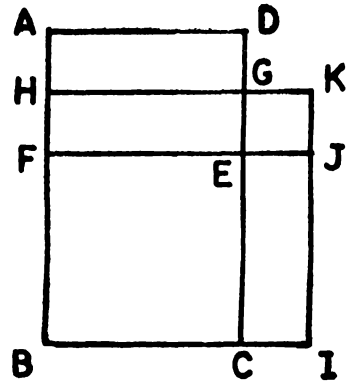
চিত্র 6

বাইরের ভাগ ADGH-কে সরিয়ে এনে ECJI-র

জায়গায় বসান হক। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, BIJEGHB ক্ষেত্রটি ABCD আয়তক্ষেত্রের সমান। শুধু তাই নয়, এটি BIKH ও EJKG বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের বিয়োগফল। সুতরাং চিত্র-4-এ যে পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তদনুযায়ী এই বিয়োগফলের সমান একটি বর্গক্ষেত্র আমরা এখন এঁকে নিতে পারি।

(3) বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রকে ত্রিভুজে রূপান্তরিত করবার উপায় :

একটি নির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রকে সমক্ষেত্রের ত্রিভুজে রূপান্তরিত করতে হলে প্রথমে দ্বিগুণ ক্ষেত্রের একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হবে। ABCD এরকম দ্বিগুণিত বর্গক্ষেত্র। এখন পূব দিকের বাহু AD-র মধ্যকেন্দ্র E বিপরীত বাহু BC-র B ও C-র সঙ্গে যোগ করে দিলে আমরা অভীষ্ট ত্রিভুজ পেয়ে যাব।

চতুরশ্রং প্রৌগং চিকীর্ষন যাবচ্চিকীর্ষেৎ দ্বিস্তাবতীং ভূমিং সমচতুরশ্রং কৃত্বা পূর্বস্যাঃ করণ্যা মধ্যে শঙ্কুং নিহন্যাৎ।

তস্মিন্ পাশৌ প্রতিমুচ্য দক্ষিণোত্তরয়োঃ শ্রোণ্যোর্নিপাতয়েৎ। বহিস্পন্দ্যমপচ্ছিন্দ্যাৎ।

চিত্র 7
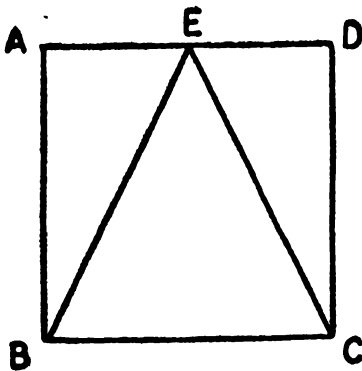
"বর্গক্ষেত্রকে প্রৌগে (সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ) পরিণত করতে হলে মাটিতে দ্বিগুণ বর্গক্ষেত্র এঁকে তার পূব দিকের বাহুর মধ্য বিন্দুতে একটি শঙ্কু বসাতে হবে। শঙ্কু থেকে সুতো টেনে শ্রোণীর (পশ্চিম দিকের বাহু BC) উত্তর দক্ষিণ কোণ (B, C) যুক্ত করতে হবে। (সুতোর) বাইরের অংশ (ABE, ECD) কেটে বাদ দিতে হবে।"

চিত্র 8
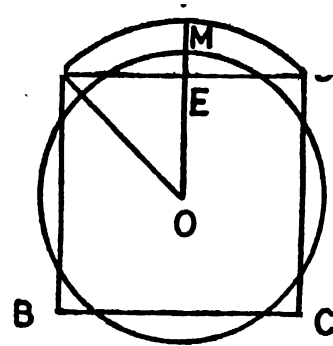
(4) বর্গক্ষেত্রকে বৃত্তে এবং বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করবার উপায় :

এবার দেখা যাক, একটি নির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্রকে কিভাবে বৃত্তে, পক্ষান্তরে একটি বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা যায়। প্রথম পদ্ধতি সম্বন্ধে শুল্বসূত্রের নির্দেশ হল :

চতুরশ্রং মণ্ডলং চিকীর্ষন্নক্ষয়ার্ধং মধ্যাৎ প্রাচীমভ্যাপাতয়েৎ।

যদতিশিষ্যতে তস্য সহ তৃতীয়েন মণ্ডলং পরিলিখেৎ। (বৌধায়ন।)

"বর্গক্ষেত্রকে বৃত্তে পরিণত করতে ইচ্ছা করলে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের অর্ধেক কেন্দ্র থেকে প্রাচী রেখা বরাবর স্থাপন করতে হবে। কর্ণার্ধের যেটুকু (বর্গক্ষেত্রের) ভিতরে রইল তার সঙ্গে বাইরের অংশের এক তৃতীয়াংশ যোগ করে (এবং তাকে ব্যাসার্ধ ধরে) একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। (সেইটিই অভীষ্ট বৃত্ত)।

বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করবার নিয়ম হল :
মণ্ডলং চতুরশ্রং চিকীর্ষন বিষ্কম্ভং
পঞ্চদশভাগান্ কৃত্বা
দ্বাবুদ্ধরেৎ। ত্রয়োদশাবশিষ্যন্তে।
সানিত্যা চতুরশ্রম্। (আপস্তম্ব)

"বৃত্তের বদলে বর্গক্ষেত্র ইচ্ছা করলে ব্যাসকে পনের ভাগে ভাগ করে তা থেকে দু'ভাগ বাদ দিতে হবে। পড়ে থাকবে তের ভাগ। এইটেই হবে আসন্ন বর্গক্ষেত্রের বাহু।"

প্রথমটির অঙ্কন পদ্ধতি চিত্র-8এ দেখানো হল। ABCD প্রদত্ত বর্গক্ষেত্র। এর কর্ণের অর্ধেক OA-কে পূব দিকে বসিয়ে OP রেখা পাওয়া গেল। এর OE অংশ বর্গক্ষেত্রের ভিতরে, EP অংশ বাইরে। EP-র এক তৃতীয়াংশ EM। সুতরাং OE+EM বা OM-কে ব্যাসার্ধ ধরে বৃত্ত টানলে সেই বৃত্তের ক্ষেত্র হবে বর্গক্ষেত্রের সমান। এই পদ্ধতিতে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হবে $3 \cdot 88772a^2$। বোধায়ন π-এর মান 3 দিয়েছেন; সেইটে ধরে এই হিসাব। বলা বাহুল্য, বর্গক্ষেত্রের মাপের অবিকল সমান করে বৃত্ত আঁকা সম্ভবপর নয়। টীকাকাররা অবিকল মাপ বলে 'সা নিত্যা' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। এদুটিকে জুড়ে যদি 'সানিত্যা' অর্থাৎ 'সা অনিত্যা' করা যায় তবে বোঝাবে এটি একটি আসন্ন মান। এর ইঙ্গিত আপস্তম্বের পরবর্তী সূত্রে রয়েছে।

বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে পরিবর্তন করবার নিয়মটি সুস্পষ্ট। মনে করা যাক বৃত্তের ব্যাস d। তাহলে অভীষ্ট আসন্ন বর্গক্ষেত্রের বাহু 2a হবে—

$$2a = d - \frac{2d}{15} = \frac{13d}{15}$$

অমূলদ রাশি

বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, তাদের কর্ণ ও বাহুর সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে শুল্বকাররা অনিবার্য কারণেই $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি অমূলদ রাশি আবিষ্কার করেন। একটি চতুরশ্র অর্থাৎ সমকোণী সমচতুর্ভুজের কর্ণ দ্বিগুণ চতুরশ্র তৈরি করে থাকে এটা তাঁরা দেখেছিলেন। একটা সূত্রে বৌধায়ন তা স্পষ্ট করেই বলেছেন :

সমচতুরশ্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুঃ দ্বিস্তাবতীং ভূমিং
করোতি।

সুতরাং সমচতুরশ্রের বাহু 1 হলে কর্ণ হবে $\sqrt{2}$, অবশ্য বর্গমূলের আধুনিক প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করে। শুল্বকাররা $\sqrt{2}$-এর নাম দেন 'দ্বিকরণী', অর্থাৎ যা দ্বিগুণ চতুরশ্র উৎপন্ন করে। তেমনি একটি সমকোণী ত্রিভুজের পূব-পশ্চিমের বাহু প্রমাণ বা এক এবং তির্যক বাহুটি দ্বিকরণী ($\sqrt{2}$) হলে কর্ণের মান হবে 'ত্রিকরণী' বা $\sqrt{3}$। তার মানে সেটি উৎপন্ন করবে প্রমাণ চতুরশ্রের তিন গুণ ক্ষেত্রের একটি চতুরশ্র।

প্রমাণং তির্যগ্ দ্বিকরণ্যায়ামঃ তস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুঃ
ত্রিকরণী।

দ্বিকরণী, ত্রিকরণী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে শুল্বকাররা যেমন $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি বুঝিয়েছেন তেমনি $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ইত্যাদি বোঝাতে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন 'দ্বিতীয় করণী', 'তৃতীয় করণী', 'পঞ্চম করণী' ইত্যাদি। গাণিতিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ধরণের নামকরণের মধ্যে বৈদিক হিন্দুদের যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় আমরা পাই।

শুল্বকাররা অমূলদ রাশির সংজ্ঞা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা $\sqrt{2}$-এর মানও খুব নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। এই মান তাঁরা প্রকাশ করেছেন এইভাবে :

প্রমাণং তৃতীয়েন বর্ধয়েৎ তচ্চ চতুর্থেনাত্ম-চতুস্ত্রিংশোনেন। সবিশেষঃ (বৌধায়ন)।

'প্রমাণ-সংখ্যাকে তার এক তৃতীয়াংশ ও সেই এক-তৃতীয়াংশের এক চতুর্থাংশ বাড়িয়ে তা থেকে শেষোক্তের এক চৌত্রিশতম অংশ বাদ দিতে হবে। এটি আসন্ন মান।'

অঙ্কে সাজিয়ে লিখলে,

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3\cdot4}-\frac{1}{3\cdot4\cdot34}=1\cdot4142156$$

আসন্ন ঠিক কিভাবে দ্বিকরণীর এতটা নিভুর্ল মান নির্ধারণ করা সম্ভবপর হল শুল্বসূত্রে তা স্পষ্ট করে দেখানো নেই বটে, তবে শুল্বসূত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করে এটা বার করা যায়। (একটি পদ্ধতি A Concise History of Science, পৃঃ 154-155 দ্রষ্টব্য।) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয় কিউনিফর্ম লিপিতে $\sqrt{2}$-এর মান পাওয়া গেছে। তাদের অঙ্কপাতন পদ্ধতি ছিল ষষ্টিক। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাবিলনীয় ও বৈদিক শুল্বকারদের মান প্রকাশ করলে দাঁড়াবে এ রকম :

$\sqrt{2}=1;24, 51, 10$ (ব্যাবিলনীয়)

$\sqrt{2}=1;24, 51, 10, 37$ (শুল্বসূত্র)

বলা বাহুল্য, এই দুই মানের মিল অত্যন্ত কাছাকাছি। এধরণের মিল দেখে প্রাচীনকালের এই দুই সভ্যতার মধ্যে যে ভাবের আদান-প্রদান ছিল এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল, এরকম কথা অনেকে বলে থাকেন।

শ্যেনচিৎ অগ্নিবেদি রচনা

আমরা বলেছি, নিভুর্লভাবে বেদি সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে শুল্বকাররা জ্যামিতির চর্চা ও উন্নতিবিধান করেছিলেন। এও বলেছি, বিশেষ বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য শ্যেনচিৎ, দ্রোণচিৎ, রথচক্রচিৎ ইত্যাদি কাম্য অগ্নিবেদি তাঁরা রচনা করেছেন। প্রথমবার রচনা করতে হলে এধরণের অগ্নির ক্ষেত্রমাপ অবিকল $7\frac{1}{2}$ বর্গপুরুষ হওয়া চাই। তারপর এক এক বর্গপুরুষ যোগ করে অগ্নিক্ষেত্রকে $101\frac{1}{2}$ বর্গপুরুষ পর্যন্ত বাড়ান যায়। পাঁচটি স্তরে অগ্নিবেদি তৈরি করবার রীতি এবং প্রত্যেক স্তরে থাকবে 200 ইট। এই ইটের ক্ষেত্র ও বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে পর পর দুটি স্তরে ইটের ধার (বাইরের ধার ছাড়া) মিলে না যায়। উদ্দেশ্য বেদিকে দৃঢ়বদ্ধ করা।

বিভিন্ন শুল্বসূত্রে নানা ধরণের শ্যেনচিৎ অগ্নিবেদি স্থাপনের নিয়ম দেওয়া আছে। বৌধায়নে দেওয়া এক বক্রপক্ষ ব্যস্তপুচ্ছ শ্যেনচিৎ বেদির কথা এখানে আলোচনা করব। এই বেদির ক্ষেত্রের মাপ $7\frac{1}{2}$ বর্গ পুরুষ বা $\frac{15}{2}\times120\times120$ বর্গ অঙ্গুল। বেদি মাপবার জন্য শুল্বকার এক্ষেত্রে 'পঞ্চমী' নামে একটি এককের উল্লেখ করেছেন। এক পুরুষের পঞ্চম ভাগ বাহু দিয়ে যে বর্গক্ষেত্র তার নাম 'পঞ্চমী'; অর্থাৎ এর ক্ষেত্রমাপ 24×24 বর্গঅঙ্গুল। এর আর এক নাম বর্গ অরত্নী, কারণ অরত্নীর মাপ 24 অঙ্গুল। তাহলে $7\frac{1}{2}$ বর্গপুরুষ হবে $\frac{15\times120\times120}{2\times24\times24}$ বা $187\frac{1}{2}$ পঞ্চমী বা বর্গ অরত্নী। এই পঞ্চমী এককের কতটা শ্যেনচিতির মস্তকে, দেহে, দুই পক্ষে ও পুচ্ছে থাকবে সে বিষয়ে সূত্রের নির্দেশ হল :

তাসাং পঞ্চাশদ্বে চাত্মনি। অর্ধচতুর্থ্যঃ শিরসি। পঞ্চদশ পুচ্ছে। অষ্টপঞ্চাশৎসার্ধা দক্ষিণে পক্ষ উপদধ্যাৎ। তথোত্তরে। অর্থাৎ ক্ষেত্রের বন্টন ব্যবস্থা হবে :

মস্তকে	—	$3\frac{1}{2}$ পঞ্চমী বা বর্গ অরত্নী
দেহে	—	52　,,　,,
দুই পক্ষে	—	117　,,　,,
পুচ্ছে	—	15　,,　,,
		$187\frac{1}{2}$　,,　,,

এবার বিভিন্ন মাপের আয়তক্ষেত্র অবলম্বনে কিভাবে উপরিউক্ত মাপের মস্তক, দেহ, ইত্যাদি তৈরি করা যায় সেটা দেখা যাক। 48×54 বর্গ অঙ্গুল বা $4\frac{1}{2}$ পঞ্চমী আয়তক্ষেত্রের মাথায় দু'পাশ থেকে অর্ধেক পঞ্চমী পরিমাপের দুটি ত্রিভুজ কেটে বাদ দিলে $3\frac{1}{2}$ পঞ্চমী মাপের বেদির মস্তক EGBCF পাওয়া যাবে (চিত্র-9(ঞ))।

দেহের জন্য নিতে হবে 10×6 বর্গ অরত্নী মাপের আয়তক্ষেত্র ABCD, যাতে AB=10 অরত্নী বা 240 অঙ্গুল, AD=6 অরত্নী বা 144

অঙ্গুল। তারপর 2 অরত্নী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ প্রত্যেক কোণা থেকে কেটে বাদ দিলে ELKJ LHGE ক্ষেত্রটি পড়ে থাকবে। এর মাপ 52 পঞ্চমী এবং এটিই হবে দেহ।

প্রত্যেকটিতে DK_1, L_1K_2 ইত্যাদি কর্ণ এঁকে বাইরের ত্রিভুজ DGK_1 $L_1K_1K_2$ ইত্যাদি বাদ দিলে পক্ষের ছ'টি পত্র পাওয়া যাবে। এই পত্র-সমষ্টির মাপ $4\frac{1}{2}$ পঞ্চমী। সুতরাং পত্রসমেত
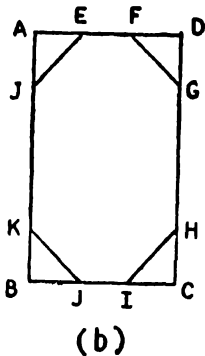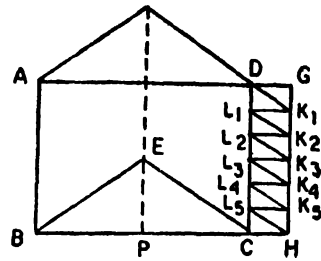
চিত্র 9—শ্যেনচিৎ অগ্নিবেদির বিভিন্ন অংশ। (a) মস্তক ; (b) দেহ ; (c) পুচ্ছ ; (d) পক্ষ।

পুচ্ছের জন্য ABCD আয়তক্ষেত্রের মাপ 8×3 বর্গ অরত্নী। তা থেকে ABE, CDF সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ দুটি (উভয়ের ক্ষেত্রফল 9 বর্গ অরত্নী) বাদ দিলে ব্যস্ত পুচ্ছ EBCF-এর মাপ দাঁড়াবে 15 পঞ্চমী [চিত্র-9(c)]।

এক একটি পক্ষের জন্য যে ABCD আয়তক্ষেত্রটি নিতে হবে তাতে AD-র মাপ 9 অরত্নী বা 216 অঙ্গুল, AB-র 6 অরত্নী বা 144 অঙ্গুল। পক্ষটিকে বাঁকাবার উদ্দেশ্যে আয়তক্ষেত্রের মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে একটি রেখা টেনে BC ও AD-র পূব দিকে 3 অরত্নী দূরত্বে E ও F চিহ্ন বসিয়ে EB, EC, FA, FD যোগ করে দিলে যে ABECDF ক্ষেত্র পাওয়া যাবে সেইটেই বক্রপক্ষ। এর ক্ষেত্রমাপ অবিকল 54 বর্গঅরত্নী। এবার পক্ষের পালক বা পত্র তৈরি করতে হবে। DC বাহুর পাশে DC HG আয়তক্ষেত্র আঁকতে হবে যাতে DG-র মাপ হয় 36 অঙ্গুল বা $1\frac{1}{2}$ অরত্নী। তারপর L_1K_1, L_2K_2 ইত্যাদি রেখা টেনে এই আয়তক্ষেত্রকে সমান দু-ভাগে ভাগ করা হক।

পক্ষের মাপ $58\frac{1}{2}$ পঞ্চমী এবং দু-পক্ষ মিলিয়ে 117 পঞ্চমী।

এই অগ্নিবেদিতে দশ রকম ইট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ;

B_1—পঞ্চমী, বর্গইট, ··· 24×24 বর্গ অঙ্গুল

B_2—অধ্যর্ধা পঞ্চমী, পঞ্চমীর দেড়গুণ 24×36 „

B_3—পঞ্চমী সপাদা, পঞ্চমীর এক চতুর্থ ভাগ বেশি 24×30 „

B_4—পঞ্চমী অর্ধা, পঞ্চমীর অর্ধেক ত্রিভুজ ইট 24 24,24 $\sqrt{2}$ „

B_5—পঞ্চমী পাদ্যা, পঞ্চমীর এক চতুর্থাংশ ত্রিভুজ, 24,12 $\sqrt{2}$,12 $\sqrt{2}$ „

B_6—অধ্যর্ধার্ধা, অধ্যর্ধা পঞ্চমীর অর্ধেক ত্রিভুজ 36,24,12 $\sqrt{13}$ „

B_7—দীর্ঘ পাত্থা, অধ্যর্ধার
এক চতুর্থাংশ, ভূমি
দীর্ঘতর, 36,6 $\sqrt{13}$,6 $\sqrt{13}$,,

B_{10}—পঞ্চমীর এক অষ্টমাংশ
ত্রিভুজ ইট 12,12,12 $\sqrt{2}$,,
সূত্রের বিধান ও টীকাকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী
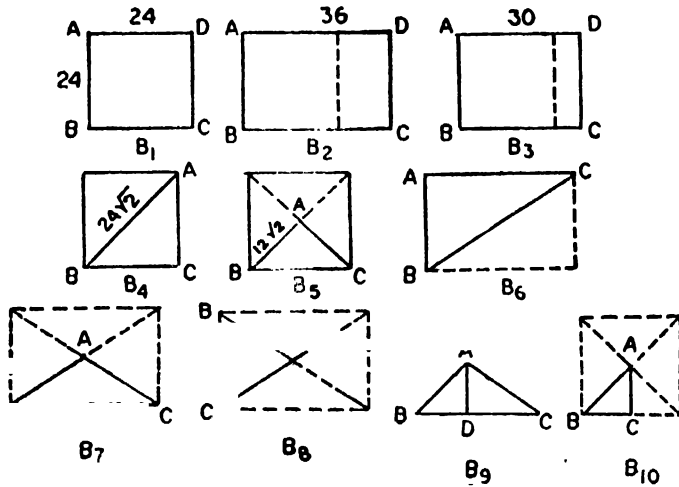
চিত্র 10—বিভিন্ন আকৃতির ইট।

B_8—শূল পাত্থা, অধ্যর্ধার
এক চতুর্থাংশ, ভূমি
ক্ষুদ্রতর, 24,6 $\sqrt{13}$,6 $\sqrt{13}$,,
B_9—উভয়ী, পঞ্চমী ও অধ্যর্ধার

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে কিভাবে ইট সাজাতে হবে তা চিত্র-11 ও চিত্র-12 তে দেখানো হলো। বেদির বিভিন্ন অংশে ইটের সংখ্যা সারণী—1 ও সারণী—2-এ দ্রষ্টব্য। বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে, প্রত্যেক
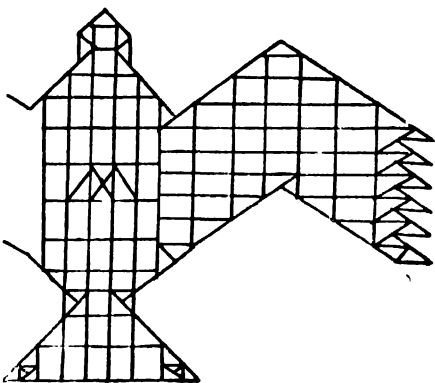
চিত্র 11—প্রথম স্তরে ইটের সজ্জা।
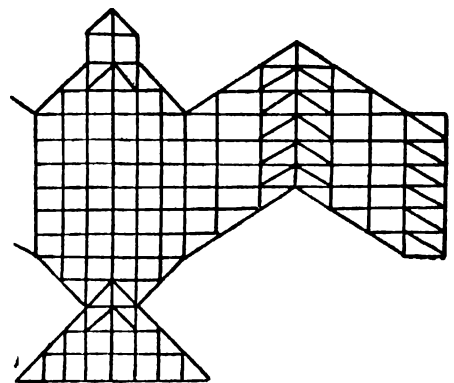
চিত্র 12—দ্বিতীয় স্তরে ইটের সজ্জা।

এক অষ্টমাংশ জুড়ে
ত্রিভুজ ইট, 30,12 $\sqrt{2}$,6 $\sqrt{13}$

স্তরে 200 ইট সাজানো হয়েছে এবং দুই স্তরের ইটের ধার বেদির অভ্যন্তরে কোথাও মেলে নি।

সারণী—1 : প্রথম স্তরে বিভিন্ন প্রকার ইটের সংখ্যা

বেদির অংশ	বিভিন্ন প্রকার ইট					মোট
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_6	
মস্তক			2	2		4
দেহ	44			16		60
দুই পক্ষ		40			76	116
পুচ্ছ	10			10		20
মোট	54	40	2	28	76	200

সারণী—2 : দ্বিতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার ইটের সংখ্যা

বেদির অংশ	বিভিন্ন প্রকার ইট										মোট
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	B_9	B_{10}	
মস্তক (দেহের কিছুটা অংশ নিয়ে)	1		1	2	1				4		9
দেহ (মস্তক, পক্ষ, পুচ্ছের সংযোগ-স্থলের কিছু অংশ বাদে)	6	12	10	4		4	2	2			40
পক্ষ (দেহের কিছু অংশ নিয়ে)		50	10		4	30	26	4	4		128
পুচ্ছ (দেহের কিছু অংশ নিয়ে)	4	5		6	6					2	23
মোট	11	67	21	12	11	34	28	6	8	2	200

প্রত্যেকটি যজ্ঞবেদির ব্যাপারে এরকম নিখুঁত জ্যামিতিক বিন্যাস ও চুলচেরা গাণিতিক হিসাবের প্রয়াস বৈদিক হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। এই প্রয়াস থেকেই তাঁরা ক্ষেত্রজ্ঞানের অধিকারী হন, শুল্বজ্যামিতি উদ্ভাবন করেন এবং তার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে অমূলদ রাশি, বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত, মূলদ ত্রিভুজের গুণাগুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা সম্পাদন করেন।

স্মৃষ্টির অন্বেষণে

(2)

দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার*

পৃথিবী

প্রথমের দিকে পৃথিবী ছিল চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত একটি অখণ্ড বস্তুপিণ্ড। একে বলা হত প্যানজিয়া (Pangaea)। প্রায় 20 কোটি বছর পূর্বে এই অখণ্ড ভূমিতে ভাঙন সুরু হল—এবং আস্তে আস্তে তা দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তর অংশ লিউরেশিয়া (Laurasia) এবং দক্ষিণ অংশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwana-land) নামে পরিচিত হল। আমাদের দেশ—ভারতবর্ষের অবস্থিতি ছিল এই গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডেই। ক্রমে আরও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভেঙে পৃথিবী আজকার এই 7টি মহাদেশের রূপ লাভ করেছে।
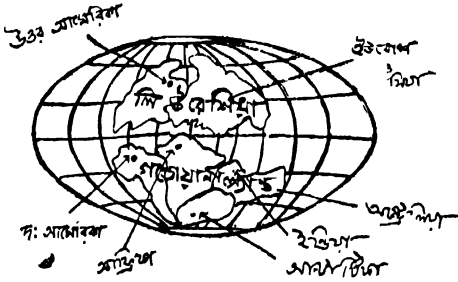
প্রায় 20 কোটি বছর পূর্বের পৃথিবীর সম্ভাব্য মানচিত্র। উত্তর অংশ লিউরেশিয়া এবং দক্ষিণ অংশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড—এই দুটি ভাগে পৃথিবী বিভক্ত হয়ে যায়—'টেথিস' (Tethys) সমুদ্র দ্বারা।

শুক্রের পরেই আসছে পৃথিবী। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে যে একে সৌরজগতের (তথা মহাবিশ্বের!) শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যেতে পারে। . খানে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে—গড়ে উঠেছে সভ্যতা—ছুটে চলেছে মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সভ্যতার খোঁজ নিতে।

কিন্তু প্রাণের অস্তিত্ব কিভাবে সুরু হয়েছিল—এই পৃথিবীতে—তারও উত্তর পাওয়া গিয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। তাঁরা বলেন—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যেই প্রাণের উদ্ভব হয়। মৌল থেকে সরল যৌগে—সরল থেকে জটিল যৌগে—তারপর কোষ (cell) এবং শেষে সৃষ্টি হয় প্রাণের (life)।

কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন—অন্ততঃ এই কটি মৌল—প্রাণসৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু ঐ মৌলগুলিকে একসঙ্গে রেখে দিলেই—প্রাণ আপনা আপনি সৃষ্টি হবে না। এর জন্য চাই উপযুক্ত মাধ্যম ও পরিবেশ। প্রাণ সৃষ্টির জন্য জলই সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। জলের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং প্রাণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলি এলোপাথারী এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকবে ও বারবার ধাক্কা খাবে। অসংখ্যবার ধাক্কা খেতে খেতে এমন এক সময় আসবে যখন এক অণু আর একটা অণুর সঙ্গে মিলে বৃহত্তর অণু তৈরি করবে। এইভাবে অণুগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে বিরাট শৃঙ্খলযুক্ত প্রাণসৃষ্টিকারী DNA, RNA এবং প্রোটিন অণু তৈরি হবে।

এটাই হল প্রাণ সৃষ্টির মূল কথা এবং এইভাবেই প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল—এই পৃথিবীতে। তারপর নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ

---

* কালিধন ইনস্টিটিউশন, 20এ-বি, সার্দার্ন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-700 026

জীব মানুষের আবির্ভাব হল ধরাপৃষ্ঠে এবং অবশেষে এসে পৌঁছেছে সভ্যতার বর্তমান অবস্থায়।

কিন্তু প্রশ্ন জেগেছে এই সভ্যতার আয়ু আর কতদিন? মানুষের সভ্যতা—শিল্প—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রাণঘাতী বিপদ এসে জুটেছে মানুষের ভাগ্যে, তাহল pollution—গত 100 বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল 20% দুষিত হয়েছে। অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এই দুষিতকরণকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ক্লোরিন, Aerosols (particles from pollution) কণা ইত্যাদি দূষিত পদার্থ বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্লোরিন এবং নাইট্রোজেন-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে নষ্ট করে—ফলে প্রাণঘাতী অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করে তুলবে। দ্বিতীয়তঃ বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড (অধিকাংশ সমুদ্র কর্তৃক শোষিত হয়) বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে—মেরুপ্রদেশের বরফ গলিয়ে পৃথিবীকে প্লাবিত করতে পারে। তৃতীয়তঃ সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে পৌঁছতে 'aerosols' কণা বাধা দেয়। ফলে হয়তো এমন একদিন আসতে পারে যখন যথেষ্ট উত্তাপের অভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠ হবে বরফে আচ্ছাদিত।

মঙ্গল

পৃথিবীর পরে আসে মঙ্গলগ্রহ (Mars)। এটা 'rocky inner planet' গ্রুপের শেষ গ্রহ। মঙ্গল সূর্য থেকে 22 কোটি 79 লক্ষ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক (6,787 কি. মি)। কিন্তু মঙ্গলের 1 বছর হয় পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ সময়ে (687 দিনে)। এর দিন প্রায় পৃথিবীর দিনের সমান (24 ঘণ্টা 37 মিঃ 23 সেঃ)। মঙ্গলের গতিবেগ সেকেণ্ডে 24·1 কি. মি. (পৃথিবীর 29·1 কি. মি./সে.) এবং মহাকর্ষ বল পৃথিবীর $\frac{3}{8}$ অংশ। মঙ্গলের উপরিপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা—23°C এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ অত্যন্ত কম (পৃথিবীর প্রায় দু-শ' ভাগের এক ভাগ)।

বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান—কার্বন ডাই-অক্সাইড, আরগন (30%), এছাড়া নাইট্রোজেন (3%), জলীয় বাষ্প (0·01), অক্সিজেন, কার্বন-মনোক্সাইড (0·1%), ওজোন (O_3) এবং হাইড্রোজেন গ্যাস আছে যৎকিঞ্চিত পরিমাণ। মঙ্গলগ্রহের ঘনত্ব পৃথিবীর 70%। এর ভূস্তরে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, লোহা, লোহার অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম। মঙ্গলগ্রহের অতিকায় আগ্নেয়গিরি 'অলিম্পাস-মোনস্' পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি 'Mouna Loa'-র (হাওয়াই দ্বীপে) চেয়ে তিনগুণ বড়। মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ রয়েছে—'ফোবস্' (27·2 কি. মি. দীর্ঘ এবং 19·4 কি. মি প্রস্থ) এবং 'ডাইমস্' (16 কিঃ মিঃ দীর্ঘ এবং 11 কিঃ মিঃ প্রস্থ)।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা মনে করতেন মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের আবহাওয়া প্রাণ সঞ্চারের বিশেষ উপযোগী এবং সেখানে উন্নততর প্রাণী বসবাস করে। শুক্রগ্রহের আবহাওয়া মণ্ডলী বিশ্লেষণ করলে—কোন প্রাণীর অস্তিত্ব আমরা সেই পরিবেশে আশা করতে পারি না। কিন্তু মঙ্গলের আবহাওয়া পরিমণ্ডল অনেকটা পৃথিবীর মতই। তা চন্দ্রের চেয়ে কিছুটা সিক্ত কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে কিছুটা শুষ্ক। এখানে প্রচণ্ড শীতে পড়ে বটে তবে প্রাণধারণের একেবারে অনুপযোগী নয়। গ্রীষ্মকালে বিষুবরেখা অঞ্চলে (equator) 70°F পর্যন্ত তাপ ওঠে। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে যৎকিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্প আছে। (তা সমগ্র মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের মাত্র এক ইঞ্চির $\frac{1}{1000}$ অংশ গভীর জলস্তর গঠন করতে পারে)। যদিও প্রাণ সৃষ্টির জন্য এত অল্প জল

মোটেই যথেষ্ট নয়—তবে অতীতে কোন অনুকূল পরিবেশে প্রাণ সৃষ্টি হলে আস্তে আস্তে শুষ্ক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব নয়।

মেরিনার-9 যে ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে—তা দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মঙ্গলের পৃষ্ঠে একদিন সমুদ্র ও নদীতে জলের প্রবাহ ছিল। পৃথিবীর মত মঙ্গলের বুকেও হয়তো বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদের সমাবেশ ছিল। মহাকর্ষ বল অত্যন্ত কম হওয়ায় হাল্কা মৌল এবং জল মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে ও কিছু জল মেরু অঞ্চলে বরফের আকারে জমা হয়ে আছে। (মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের বরফের আকারে যে জল আছে তা সমগ্র মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে ছড়িয়ে দিলে 10 মিটার গভীর জলে তাকে প্লাবিত করতে পারে)। এইভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গল উন্নত ধরণের প্রাণী বসবাসের উপযোগী পরিবেশটি হারিয়েছে। তবে এমন হতে পারে যে 'milder season'এ হয়তো কোন প্রাণীর উদ্ভব হল—শীতকালে স্পোর (spores) আকারে থাকলো—তারপর উপযুক্ত পরিবেশে আবার তার প্রকাশ হল। এমনও মনে হতে পারে যে মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেন অত্যন্ত কম—সেটা প্রাণের পক্ষে কোন অন্তরায় কিনা? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে পৃথিবীতে যখন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল—বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন মোটেই ছিল না—অধিকাংশই ছিল—কার্বন ডাই-অক্সাইড।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাইকিং-2-কে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলে বরফের মধ্যে নামিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাঁদের ধারণা হয়তো সেখানে কোন প্রাণের সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বৃহস্পতি

fluid outer planet গ্রুপের প্রথম গ্রহ হল বৃহস্পতি (Jupiter)। মঙ্গলের পরেই এর স্থান। সূর্য থেকে এর দূরত্ব 77 কোটি 83 লক্ষ কিঃ মিঃ। বৃহস্পতির 1 বছর হয় পৃথিবীর 11·86 বছরে এবং 1 দিন হয় পৃথিবীর 9 ঘণ্টা 50 মিঃ 30 সেকেণ্ডে।

সৌরজগতের সর্বপ্রবৃহৎ গ্রহ এবং ভর পৃথিবীর 318 গুণ এবং এর আকৃতি পৃথিবীর 1317 গুণ। বৃহস্পতির মহাকর্ষ বল পৃথিবীর আড়াই গুণের চেয়েও বেশী (2·64 গুণ)। এই জন্য সম্ভবতঃ সৃষ্টির পরে কোন মৌল বা পদার্থ মহাকাশে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায় নি এর পৃষ্ঠ থেকে। বৃহস্পতির চুম্বক আস্তরণ পৃথিবীর 10 গুণ।

বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান—হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। তাছাড়া অল্প পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং জলও রয়েছে। বায়ুমণ্ডল উপরে 1000 কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা—150°C (clouds)। বৃহস্পতির মেরু অঞ্চল এবং বিষুবরেখা অঞ্চলের মধ্যে তাপমাত্রার খুব বেশী পার্থক্য নেই। বৃহস্পতি গ্রহে একবার ঝড় সুরু হলে—তা বছরের পর বছর চলতে থাকে। এর কেন্দ্রের তাপমাত্রা 30,000°C এবং সেখানে চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের 3 থেকে 5 কোটি গুণ বেশী।

বৃহস্পতির 13টি উপগ্রহ রয়েছে। এদের মধ্যে Io. Europa, Ganymeda, Callisto বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য যে 'Io'-ই সৌর জগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বস্তু যার বায়ুমণ্ডল রয়েছে।

বৃহস্পতিকে গ্রহ না বলে নক্ষত্র বলাই শ্রেয়। প্রথমতঃ এর গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডল 1000 কিঃ মিঃ বিস্তৃত এবং এর অতিতপ্ত অভ্যন্তর অনেকটা নক্ষত্রেরই মত। বৃহস্পতি সূর্য থেকে যে তাপ পায় তার দ্বিগুণ তাপ বিকিরণ করে।

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানীরা অতি শক্তিশালী কতকগুলি 'কণা' বৃহস্পতি থেকে যে বের হচ্ছে তা নির্ণয় করেছেন। একমাত্র সূর্য ছাড়া ঐ ধরণের

কোন কণা সৌর-জগতের কোন গ্রহ থেকে নির্গত হয় না।

তৃতীয়তঃ বৃহস্পতি সূর্যের মত শক্তিশালী বেতার সংকেত (radio signal) পাঠায়।

চতুর্থতঃ সৌর জগতের গ্রহগুলির অবস্থান যতদূরে তাদের ঘনত্বও কমে এসেছে ক্রমান্বয়ে—সেই অনুপাতে। বৃহস্পতি 13টি উপগ্রহ নিয়ে একটি 'ছোট সৌরজগৎ' সৃষ্টি করেছে এবং এর উপগ্রহগুলির ঘনত্বও দূরত্বের সঙ্গে কমে গিয়েছে। পরিশেষে পদার্থবিদ্ Simpson-এর কথা দিয়েই ছেদ্ টানছি—'Jupiter is a poorman's star'?

শনি

'fluid outer planets' গ্রুপের দ্বিতীয় এবং শেষ গ্রহ হচ্ছে শনি (Saturn)। বৃহস্পতির পরে শনির অবস্থান। সূর্য থেকে শনির গড় দূরত্ব 142 কোটি 70 লক্ষ কিঃ মিঃ। এটা 29·49 বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু নিজ অক্ষের উপর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘোরে। এর 1 দিন হয় পৃথিবীর 10 ঘণ্টা 14 মিনিটে। শনির ব্যাস পৃথিবীর প্রায় 10 গুণ (শনি = 120,000 কিঃ মিঃ, পৃথিবী = 12,756 কিঃ মিঃ)। এর ভর পৃথিবীর
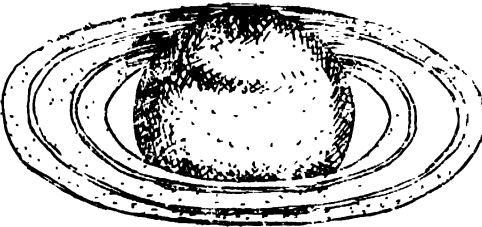
শনি গ্রহ এবং তিনটি চক্রাকার বেষ্টনী। বাইরের বেষ্টনী দুটির মধ্যে দূরত্ব 2700 কিলোমিটারেরও বেশী।

95 গুণেরও বেশী (পৃথিবী = 1, শনি = 95·2) এবং এর আয়তন পৃথিবীর আয়তনের 755 গুণ। মহাকর্ষ বল পৃথিবীর চেয়ে শনির কিছু বেশী-পৃথিবী = 1, শনি = 1·15)।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান—হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। এর তাপমাত্রা—180°C (clouds)।

শনি গ্রহের তিনটি চাকার মত বলয় (চক্রাকা বেষ্টনী) পর পর রয়েছে। বেষ্টনী ও গ্রহের মধ্যে বেশ একটু ফাঁক রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা শনির কোন উপগ্রহ ভেঙ্গে অগণিত ছোট বা খণ্ডের সৃষ্টি হয়ে সেগুলি শনির চারিদিকে ঘুরছে ঐগুলি সম্ভবতঃ বরফের খণ্ড। শনির দশটি উপগ্রহ রয়েছে।

ইউরেনাস

'Ice giants' গ্রুপের প্রথম গ্রহ হল—ইউরেনাস (Uranus)। শনির পরে ইউরেনাসের স্থান। এর সূর্য থেকে গড় দূরত্ব 286 কোটি 96 লক্ষ কিঃ মিঃ। এটা 84·01 বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে (গতিবেগ 6·8 কিঃ মিঃ/সেঃ) কিন্তু শুক্রের মত শনিও নিজ অক্ষের উপর অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে (—11 ঘণ্টা পশ্চাদ্‌গামী)। এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় 4 গুণ। ইউরেনাসের ভর পৃথিবীর 14·6 গুণ এবং আয়তন 67 গুণ। এর মহাকর্ষবল পৃথিবীর চেয়ে অল্প বেশী (পৃথিবী = 1, ইউরেনাস = 1·17)

ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান—হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং এবং মিথেন। এর তাপমাত্রা—210°C (clouds) ইউরেনাসের 5টি উপগ্রহ রয়েছে।

নেপচুন

'Ice giants' গ্রুপের দ্বিতীয় ও শেষ গ্রহ হল নেপচুন (Neptune)। এটা সূর্য থেকে 499 কোটি 66 কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

নেপচুন 164·8 বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে (গতিবেগ 5·4 কিঃ মি/সেকেণ্ডে)

নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরতে 16 ঘন্টা সময় লাগে। নেপচুনের ব্যাস—পৃথিবীর প্রায় 4গুণ (নেপচুন=49500 কিঃ মিঃ) এবং এর ভর পৃথিবীর 17·2 গুণ এবং আবার পৃথিবীর 57 গুণ। নেপচুনের মহাকর্ষ বল পৃথিবীর চেয়ে একটু বেশী (পৃথিবী=1, নেপচুন=1·18)।

বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান—হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং মিথেন। এর তাপমাত্রা—220°C (clouds)। এর দুটি উপগ্রহ রয়েছে।

প্লুটো

সৌর জগতের নবম গ্রহ হল প্লুটো (Pluto)। এটি সূর্য থেকে 590 কোটি কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। প্লুটো 24৲7 বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে (গতিবেগ 4·7 কিঃ মিঃ/সেকেণ্ডে)। নিজ অক্ষের উপরে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে 6 দিন 9 ঘন্টা। এর ব্যাস পৃথিবীর অর্ধেকেরও কম [প্লুটো=6000 কিঃ মিঃ (?)]। ভর ও আয়তন উভয়ই পৃথিবীর $\frac{1}{10}$ অংশ। তাপমাত্রা—230°C (?)। প্লুটোর কোন উপগ্রহ নেই।

প্লুটো হল—ধূমকেতুর উৎস। অনেক সময় প্লুটো নেপচুনের উপগ্রহ বলেও পরিগণিত হয়।

আরও একটি গ্রহ সৌরজগতে আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই দশম গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে 'ভলকান'। এটা শনিগ্রহ থেকে 3 গুণ বড় এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে 464 বছর সময় লাগে।

এছাড়াও মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে পৃথিবীর চেয়ে 90 গুণ বড় একটি গ্রহ আনুমানিক 60 লক্ষ বছর পূর্বে কোন অজ্ঞাত কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানে এখনও অনেক গ্রহকণিকা (asteroid) রয়েছে।

মহাকাশ অভিযান সুরু হয়েছে সবে। একেবারে শৈশব অবস্থা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে তার কাছে। অভিযানে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মানুষ নিবৃত্ত করবে তার অতল জ্ঞানপিপাসাকে।

[এ বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে কারো আগ্রহ থাকলে লেখক বা পরিষদ দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন]

সোলানাম খাসিয়ানাম—একটি মূল্যবান ভেষজ সম্পদ

এণাক্ষী রায়চৌধুরী* ও রথীনকুমার চক্রবর্তী*

বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশের প্রধান সমস্যা বিপুলভাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধি। সহসা এইভাবে জন সংখ্যা স্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং কর্টিকোষ্টিরয়েড ওষুধের ভূমিকা খুব দ্রুতগতিতে প্রসারলাভ করে চলেছে। কর্টিকোষ্টিরয়েডের মূল উপাদান থেকে প্রস্তুত হচ্ছে গর্ভনিরোধ খাবার বড়ি বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ ও নানারকম দৈহিক অস্বাভাবিকতা নিয়ন্ত্রণে এর ব্যবহার আশ্চর্য ফলপ্রদ।

কর্টিকোষ্টিরয়েড একপ্রকার হরমোন বা জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা জীবদেহের বৃক্ক বা কিডনীর উপরিস্থিত সুপ্র্যারেন্যাল বা অ্যাড্রিন্যাল নামক গ্রন্থির বর্হিভাগীয় অংশ থেকে নিঃসৃত হয়। বর্তমানে এই জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। গবাদি পশুর দেহ থেকে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি অপসারিত করে তা থেকে কর্টিসোন (cortison) বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হত। তার পরিমাণ ছিল খুবই কম; যেমন—450,000 গ্রাম অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে মাত্র 0·5 গ্রাম কর্টিসোন পাওয়া যায়।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর ষ্টিরয়েড-উপক্ষারের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ডায়োস্কোরিয়া (Dioscorea) নামক উদ্ভিদের কন্দের মধ্যে অন্তর্লীন অবস্থায় এর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই কন্দসকল মাটির এত গভীরে অবস্থান করে যে, তা সংগ্রহ করা প্রচুর সময়সাপেক্ষ এবং ভারতবর্ষে যে দুটি ডায়োস্কোরিয়ার প্রজাতি থেকে এই উপক্ষার পাওয়া যায় তারা সাধারণতঃ তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়া বৃদ্ধিলাভ করে না। তাছাড়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এদের এমনভাবে উৎপাদিত করা হয়েছে যে এই দুটি প্রজাতি এখন প্রায় লোপ পাওয়ার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সোলানাম খাসিয়ানাম (Solanum khasianum) নামক উদ্ভিদের ফলের মধ্যে ষ্টিরয়েড পুঞ্জের সংহতি সাধক 'সোলাডাইন' (solasodine) অন্তর্লীন অবস্থায় সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে এই ষ্টিরয়েড-উপক্ষার (steroidal alkaloid) পাওয়ার জন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন পরীক্ষা করে চলেছেন।

আসামের খাসিয়া পর্বতে প্রায় এক মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট শাখাপ্রশাখাযুক্ত রোমশ, কন্টকাবৃত এই গুল্মপ্রকৃতির উদ্ভিদটি বেগুন জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত। কাণ্ডের গায়ে দু-রকমের কাঁটা দেখা যায়। একটি সোজা এবং অন্যটি অনেকটা হুকের মত। দ্বিশীর্ষক শাখাবিন্যাস অর্থাৎ প্রধান কাণ্ডের অগ্রভাগ দুই বা ততোধিক শাখায় বিভক্ত হয়। কাণ্ডের পর্ব থেকে অভিমুখ বিন্যাসে পক্ষবৎ খণ্ডিত পাতাগুলি সাজানো থাকে। পাতার শিরার উপর কাঁটা এবং পাতার গায়ে ছোট ছোট রোমগ্রন্থি ছড়ানো থাকে। ফুলগুলি সাদা বা ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের হয়। ফুলগুলির মঞ্জরীদণ্ডের অগ্রভাগে প্রথম ফুল ফোটে এবং ফুলগুলি নিম্নমুখীভাগে ফোটে। ফলগুলি প্রায় দুই থেকে তিন সেণ্টি-মিটার ব্যাসযুক্ত, ফ্যাকাশে হলুদের উপর সবুজ দাগ থাকে। আকৃতিতে প্রায় গোলাকার এবং 0·2 থেকে 0·3 সে. মি. ব্যাসযুক্ত হয়।

* কেন্দ্রীয় উদ্ভিদ গবেষণাগার, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

সি. বি. ক্লার্ক এই উদ্ভিদটিকে প্রথম বর্ণনা করেন এবং বৈজ্ঞানিক দ্বিনামকরণ হয়—সোলানাম খাসিয়ানাম ক্লার্ক। এটি খাসিয়া পর্বত ছাড়াও আসামের জয়ন্তিয়া পর্বত, নেফা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, দেরাদুন, উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের গাড়োয়াল পাহাড়, নীলগিরি, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জন্মায়।

বিভিন্ন জায়গায় সোলানাম খাসিয়ানাম ফলে ষ্টিরয়েড-উপক্ষার সোলাসোডাইনের (solasodine) অনুপাত বিভিন্ন। নীলগিরি অঞ্চলের সংগৃহীত সোলানাম খাসিয়ানাম ফলে সোলাসোডাইনের শতকরা 5·4%, আসামের চেরাপুঞ্জি, নেফা, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের এবং বোম্বাই-য়ের সংগৃহীত ফলে সোলাসোডাইনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা 3·2%, 2·1% 2·02%, 2·6%।

ফল ও পুষ্পসহ সোলানাম খাসিয়ানাম গাছ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন সোলাসোডাইন নামক উপক্ষারটি ফল থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ফলের পূর্ণতাপ্রাপ্তির বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই উপক্ষারের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ভর করে ফলের এক বিশেষ অবস্থার উপর। যেমন দেখা গেছে কাঁচা বা অত্যধিক পাকা অবস্থায় এর পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু ফলগুলি সবুজ থেকে হলুদ রঙ হতে আরম্ভ করেছে সেই অবস্থায় সংগ্রহ করে

নির্যাস বের করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ পরিমাণ উপকার পাওয়া যায়। আবার যদি ফলগুলি ছাড়িয়ে বীজগুলি বের করে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে কখনই খুব শুষ্ক বা জলা জায়গাতে ভালভাবে বাড়তে পারে না। যদিও বীজ থেকে সাধারণতঃ গাছ হয় কিন্তু দেখা গেছে কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা
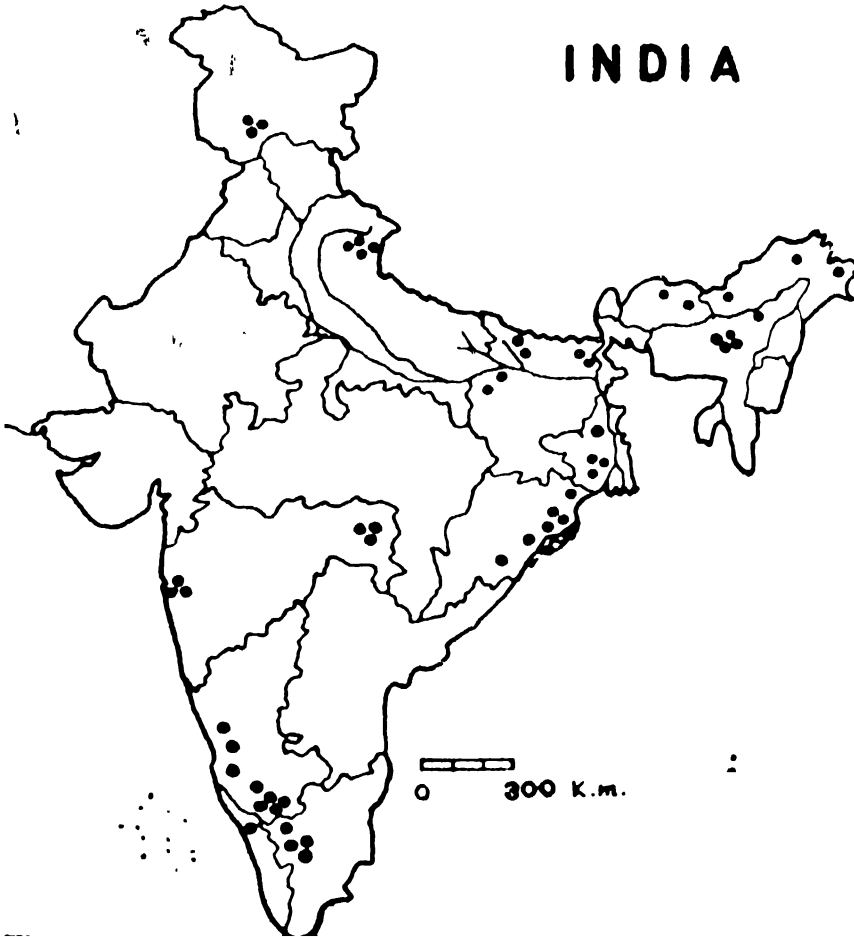
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সোনাপাথ খাসিয়ানামের প্রাপ্তিস্থান

নির্যাস বের করা হলে দেখা যাবে কোন উপকার নেই। অর্থাৎ এই থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বীজের চারিদিকে যে আঠাল চট্‌চটে পদার্থ থাকে তার মধ্যেই অন্তর্লীন অবস্থায় এই ষ্টিরয়েড-উপকারটি নিহিত থাকে।

চাষবাস প্রসঙ্গে বলা যায়—এই উদ্ভিদটি বিভিন্ন ধরণের মাটি ও আবহাওয়াতে জন্মাতে পারে কিন্তু কেটে মাটিতে বসালেও গাছ হতে পারে। প্রথমে মাটি তৈরি করে বীজ বপন করা হয় এবং ছোট ছোট চারা হয়। সেই চারাগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়। দেখা গেছে অক্টোবর মাসে সরাসরি বপন-করা গাছে প্রচুর ফল হয়। সরাসরি বপন-করা গাছ পনের বা কুড়ি দিন পর সঠিক দূরত্ব রেখে 45 দিনের মধ্যে

অবশিষ্ট চারাগুলি তুলে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু নির্গন করার পর পুনরায় রোপণ করার সময় মনে রাখা প্রয়োজন যেন সাধারণতঃ এক সারিতে রোপণ করা হয় এবং দুটি গাছের দূরত্ব 90 সে. মি. ও দুটি সারির মধ্যে দূরত্ব এক মিটার থাকে।

মাটির কথায় বলা যায়, এটি যে কোন প্রকার মাটিতে চাষ করা যেতে পারে কিন্তু মাটি যেন খুব এঁটেল না হয় বা দীর্ঘদিন যেন জল জমে থাকতে না পারে, এই গাছের চাষ সমতলভূমিতে করে দেখা গেছে প্রতি হেক্টরে প্রায় চার মেট্রিক টন ফল পাওয়া যায়।

সার ব্যবহার না করে যেমন প্রচুর ফল পাওয়া যায় আবার দেখা গেছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম প্রয়োগ করে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে এবং অধিক ফল পাওয়া যায়। অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে ফলন কমে যায় এবং গাছ ধীরে ধীরে মরে যেতে পারে। P_{40} K_{80} ও N_{40} এবং N_{80} কে. জি. সার প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করলে সবচেয়ে অধিক ফল পাওয়া যায়।

বীজ সাধারণতঃ মার্চ, জুন ও অক্টোবর মাসে বপন করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়, সর্বাধিক ফল পাওয়া যায় এবং ফলগুলি আকারে বড় হয়। মার্চ মাসে বপন করলে গাছের বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। প্রচুর ফুল হয় কিন্তু ফল কম হয়। সম্ভবতঃ শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য ভাল ফলন পাওয়া যায় না।

বপন করার পর 65 থেকে 80 দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে খুব শুষ্ক আবহাওয়া না থাকলে প্রত্যেকটি ফুলে ফল আসে এবং 80-90 দিনের মধ্যে ফলের সবুজ রঙ হলুদ রঙে পরিবর্তিত হয়। আর এই অবস্থাতেই ফল সংগ্রহ করা হয় কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে ফলের পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপর উপক্ষারের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ভর করে।

এই গাছটি সাধারণতঃ একবর্ষজীবী। বপনের পর পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ফলন হয় এবং তারপর ফলন ক্রমশঃ হ্রাস পায়। কিন্তু উপযুক্ত জলবায়ুতে দেখা গেছে এই উদ্ভিদগুলি বহু বর্ষজীবী হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে অবিরতভাবে ফল জোগানের জন্য একই ভূমিতে বছরে দু-বার এই উদ্ভিদটি চাষ করা যেতে পারে।

গাছের রোগ সম্বন্ধে বলা যায়—কিছু কিছু ছত্রাক ফিউসেরিয়াম অক্সিপোরাম (Fusarium oxysporum) বিশেষ ধরণের টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এই গাছকে আক্রমণ করে। এর ফলে গাছ ধীরে ধীরে শুকাতে থাকে এবং গাছে প্রচুর পরিমাণে ফুল বা ফল হয় না এবং সোলাসোডাইন-এর পরিমাণও কমে যায়।

এই রোগ কি করে প্রতিরোধ করা যায় সেজন্য নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। যদিও গবেষণাগারে মাটিকে জীবাণুমুক্ত করে ভাল ফল পাওয়া গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নি, যার ফলে আমরা তা অল্প ব্যয়ে ব্যাপকভাবে মাঠে প্রয়োগ করতে পারি।

এই গাছটির সাইটোলজি সম্বন্ধে বলার পূর্বে প্রসঙ্গতঃ কিছু বলা প্রয়োজন—সাধারণতঃ উদ্ভিদের দেহে কোষ দুই প্রকারের। প্রথম প্রকার

কোষকে দেহকোষ (somatic cell) বলে। এই কোষের নিউক্লীয়াসে '2n' সংখ্যাযুক্ত ক্রোমোজোম (chromosome) বা ডিপ্লয়েড (diploid) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। দ্বিতীয় প্রকার কোষকে যৌনকোষ বা germ cell বলা হয় এবং এই কোষের নিউক্লীয়াসে 'n' সংখ্যাযুক্ত ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি উদ্ভিদের এই ক্রোমোজোমের সংখ্যাও নির্দিষ্ট থাকে এবং এটি উদ্ভিদের বংশগত ধর্ম বহন করে। সোলানাম খাসিয়ানাম (ক্লার্ক) ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n=24 এবং n=12। কেউ কেউ দেখেছেন কখনও কখনও একটি বা দুটি বিশেষ ক্রোমোজোমের (β-ক্রোমোজোম) উপস্থিতিতে এর সংখ্যা বেড়ে 2n=25 বা 26 হয়। আবার পরাগরেণুর মাতৃকোষে কখনও কখনও একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম (accessory chromosome) দেখা যায়। ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে 2n=25 হয়। এই ক্রোমোজোম কোষ বিভাগের দ্বারা পরাগরেণু তৈরি হওয়ার সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোষের সাইটোপ্লাজমে দ্রবীভূত হয়ে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান থাকার সম্ভাবনা থাকে।

বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকে চেষ্টা করে আসছিলেন কৃত্রিম উপায়ে ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে ভাল জাতের ফল বা বেশী ফল পাওয়া যায় কিনা। গবেষণার ফলে দেখা গেছে অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজ থেকে যখন ভ্রূণমুকুলের জন্মলাভ হয় নি এই অবস্থায় দশমিক এক বা দু-ভাগ কলচিসিনের (colchicine) জলীয় দ্রবণ দিনে দু-বার করে দু-দিন প্রয়োগ করলে শতকরা যথাক্রমে 5·7 ভাগ গাছ টেট্রাপ্লয়েড (2n=48) ও 3·5 ভাগ মিক্সাপ্লয়েড (mixaploid) এবং 7·1 ভাগ গাছ টেট্রাপ্লয়েড ও 25 ভাগ গাছ মিক্সাপ্লয়েড রূপান্তরিত হয়। এই টেট্রাপ্লয়েড গাছগুলির পাতা গাঢ় সবুজ ও মোটা হয় এবং পাতাগুলিতে কম সংখ্যক খাঁজ থাকে বলে সাধারণ গাছ থেকে অতি সহজে চেনা যায় বা পৃথক করা যায়। এই গাছে ফুল ও ফল হতে দেরী হয়। ফলগুলি সাধারণতঃ ওজনে কম ও ছোট হলেও বীজগুলি বড়ই হয়। আরও দেখা গেছে সাধারণ গাছের অনেক পর্বে 3টি থেকে 5টি পর্যন্ত ফল হয়। এর ফলে টেট্রাপ্লয়েড গাছের ব্যাপক আকারে ব্যবসাভিত্তিক চাষবাসে সাফল্য আশা করা যায়।

এর পরাগবিদ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিণত পরাগরেণু বিষুব অঞ্চল বরাবর যদি দেখা যায় তাহলে সাধরণতঃ গোলাকার দেখায়। কিন্তু মেরু বরাবর কিছুটা ত্রিকোণাকার দেখায়। পরাগরেণুর বাইরের আবরণটি জালকাকার এবং এই আবরণীতে এক মেরু অঞ্চল থেকে অপর মেরু অঞ্চল পর্যন্ত তিনটি লম্বা (21·2 থেকে 25·0×2·5 থেকে 3·7μ) ছিদ্র থাকে। এর ঠিক পরের স্তরে উপরিউক্ত ছিদ্রের প্রায় মধ্যস্থল বরাবর একটি করে মোট তিনটি ছিদ্র (4· থেকে 5·0×15·0 থেকে 16·2μ) থাকে। এই তিনটি ছিদ্রের মধ্যে দুটি ছিদ্র কখনও কখনও একত্রে যুক্ত হয়।

যেহেতু এই গাছের ফল আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনে লাগে অতএব এই ফলের আকার, গঠন প্রভৃতি বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার।

যদিও পূর্বেই বলা হয়েছে ফল প্রায় গোলাকার এবং ব্যাস 2 থেকে 3 সে. মি. হয়। কিন্তু বিষুব অঞ্চলের ব্যাস কিছুটা বড়। ছোট অবস্থায় ফলগুলিতে সবুজ ও মধ্যে মধ্যে লম্বালম্বিভাবে সাদা ডোরা দাগ থাকে। পরে যত বড় হতে থাকে ফলের রং পরিবর্তিত হয়ে হাল্কা ক্রীম রং হয় এবং দাগগুলি সবুজ রঙে রূপান্তরিত হয়। ফলটি পরিপক্ক হলে পুরোপুরি হলুদ রঙের হয়। ফলের উপরিত্বক খুব মসৃণ ও চকচকে হয়। ফলটিকে লম্বালম্বি কাটলে দেখা যাবে কেন্দ্রস্থ স্ফীত ভ্রূণ কোষগুলি থেকে প্রচুর সংখ্যক অপরিণত বীজ বা ডিম্ব পেরিকার্পের (pericarp) মধ্যে ছড়ানো থাকে। বীজগুলি

সোলাসোডাইন নিষ্কাশন ও স্বতন্ত্রীকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণ (extraction and isolation of the solasodine)-এর কথায় বলা যায়—আমরা জানি সোলানাম খাসিয়ানাম গাছের ফল থেকে সাধারণতঃ সোলাসোডাইন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এই সোলাসোডাইন থেকে কর্টিকোষ্টিরয়েড ও যৌন হরমোনগুলি তৈরি করা হয় বা করা যেতে পারে। সোলাসোডাইন বেঞ্জিন, ক্লোরোফর্ম এবং পিরিডিনে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। অ্যাসিটোন, অ্যালকোহল ও মিথানলে মোটামুটিভাবে দ্রবীভূত হয় এবং জলে স্বল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু ইথারে প্রায় অদ্রবণীয়।

SOLASODINE
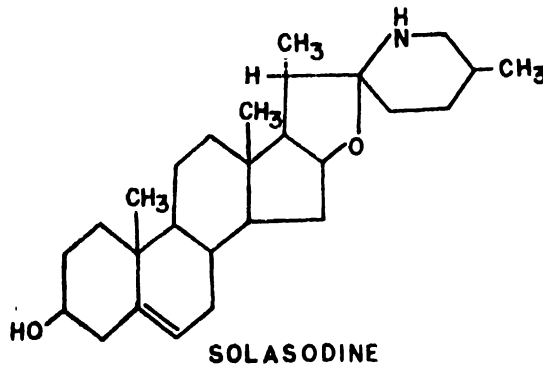
সোলাসোডাইনের রাসায়নিক গঠন

খুবই চ্যাপটা এবং পুরোপুরি গোলাকার না হলেও প্রায় গোলাকার বলা যেতে পারে।

গাছগুলি কণ্টকাকীর্ণ হওয়ায় ফল সংগ্রহ করা কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে জিবারেলিক অ্যাসিড (gibberellic acic) গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে কাঁটাগুলির সংখ্যা বহুলাংশে কমে যায় বা ছোট হয়ে যায়।

সোলাসোডাইন সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী ওডো (Oddo) 1929 সালে সোলানাম সোডোমিয়াম (Solanum sodomeum Linn.) গাছ থেকে স্বতন্ত্রীকরণ ও সনাক্তকরণ করেন।

সাধারণতঃ ফলগুলি শুকাবার পর নিষ্কাশন করা হয় এবং পরে soxhlet-এ পেট্রোলিয়াম ইথার বা অ্যালকোহল প্রভৃতিতে 40 থেকে 60

ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (40°—60°C) প্রাথমিকভাবে নিষ্কাশন করা হয়। পরে পর্যায়ক্রমে বিশুদ্ধ সোলা-সোডাইন প্রস্তুত করা হয়। সোলানামের ফল থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সোলাসোডাইন নিষ্কাশিত করা যেতে পারে। একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতি নিয়ে দেওয়া হল।
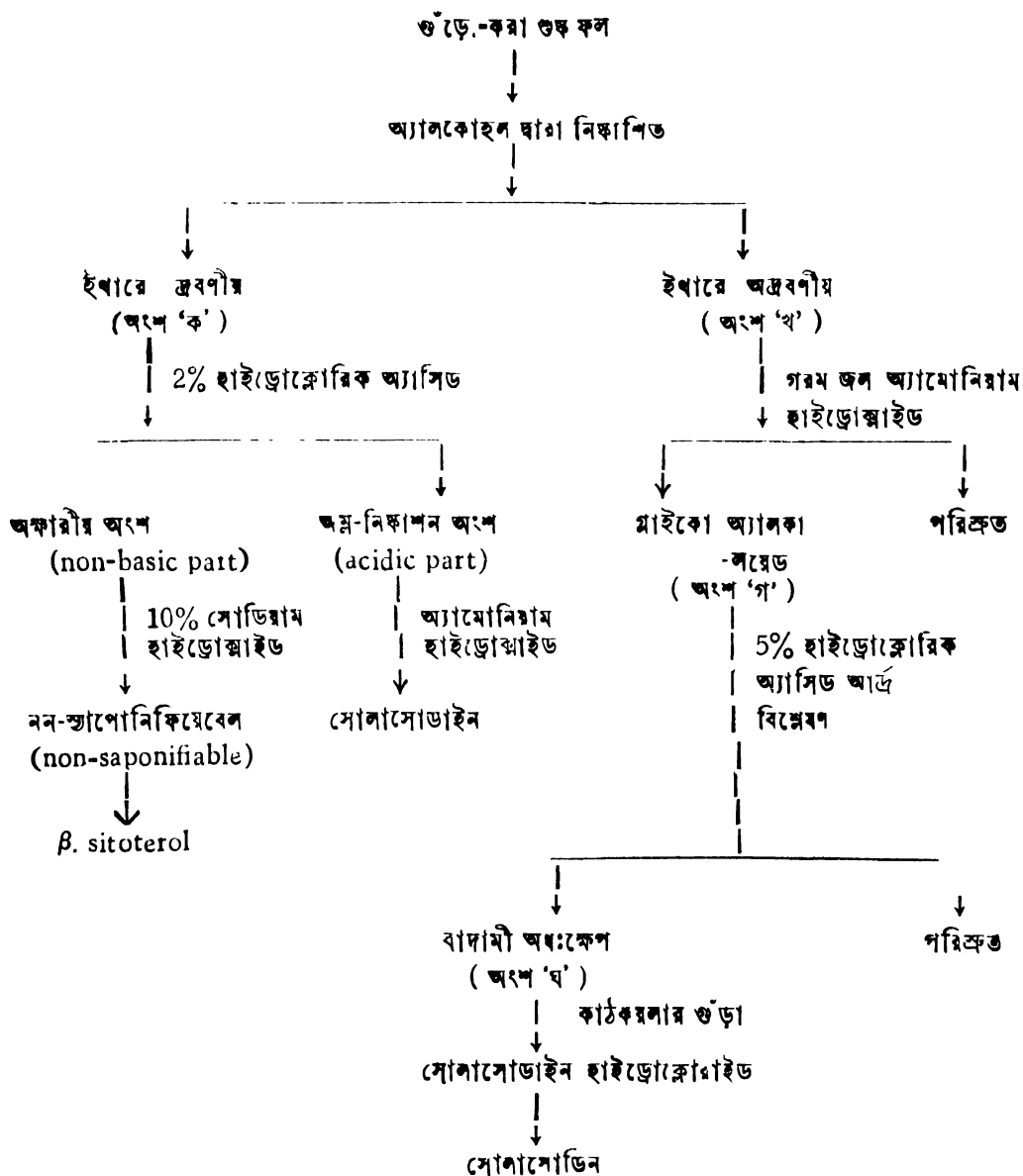
সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে দেশের কর্টিকো-ষ্টিরয়েড জাতীয় ওষুধ প্রস্তুতের জন্য সোলানাম খাসিয়ানাম-এর ফল কাঁচা মাল (raw material) হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। এই গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ডায়োস্কোরিয়া জাতীয় উদ্ভিদের থেকে অনেক বেশী। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সোলানাম খাসিয়ানাম গাছ শুধু দেশের চাহিদা মেটাতেই সক্ষম হবে না, উপরন্তু এটি বহুলাংশে বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করাও সম্ভব হবে।

ব্যবহারিক জীবনে

পরিবহণ সমস্যা (3)

শ্রীমহাদেব দত্ত

পরিবহণ সমস্যা সম্বন্ধে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র আগের দুটি (জুন ও জুলাই, 1977) সংখ্যায় দেখানো হয়েছে যে পরিবেশ দূষণ নিবারণ করে শহরের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অংশে যোগাযোগকারী যানবাহনের মধ্যে তড়িৎ-চালিত যানবাহন সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, কিন্তু শহরের সড়কের উপর তড়িৎ-চালিত ট্রাম, এমনকি ট্রলিবাসকেও দ্রুত-গতিতে চালানো সম্ভব নয়। এজন্য পাতাল রেল বা পাতাল পথের প্রকল্প নেওয়া হয়। এভাবে সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় ও তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে সমাধান করতে হয়। এখানে সে বিষয়ে সম্ভবমত আলোচনা করা হবে। লোড শেডিং-এর জন্য ট্রাম বা ট্রলি-বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়, যাত্রীদের অসুবিধা হয় কিন্তু প্রাণ বিপন্ন হয় না। কিন্তু পাতাল রেল বা পথে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হলে রেল বা ট্রলিবাসের যাত্রীদের অবস্থা কিরূপ হয়, তা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে; বিশেষ করে যদি ঐ সময় ঐ রেল বা ঐ গাড়ী ষ্টেশনের উপর না থেকে দুটি ষ্টেশনের সংযোগকারী নলের (tube) মধ্যে থাকে। কাজে কাজেই পাতাল রেল চালু করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে হবে যাতে লোডশেডিং না হয়।

পাতাল রেল বা পাতাল পথের আর একটি বড় সমস্যা ভূগর্ভস্থ সমগ্র রেলপথ বা পথের মধ্যে বায়ু-প্রবাহ সঞ্চালিত রাখা। এ ব্যবস্থা না করতে পারলে যাত্রীদের ও যানবাহন-কর্মীদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ভিতরের বায়ু দূষিত হয় ও জীবনহানির কারণ ঘটায়।

এই বায়ু প্রবাহ সঞ্চালন করা হয় তড়িৎ-চালিত বায়ুক্ষেপক পাম্প ও বায়ু নিষ্কাশক পাখা প্রভৃতি যন্ত্রাদি দিয়ে। এজন্য পাতাল রেল বা তড়িৎ প্রবাহের স্থায়িত্ব একান্ত আবশ্যক। তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হলে বা লোডশেডিং হলে যেমন যানবাহন থেমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে বায়ুও দূষিত হতে আরম্ভ করবে এবং কিছুক্ষণ ধরে এরকম চললে ভূগর্ভের বায়ু যাত্রী বা কর্মীদের প্রাণহানি ঘটাবে। বর্তমানে যে হারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং চলছে, তা চিরতরে দূর করতে না পারলে পাতাল রেল প্রকল্পের সার্থকতা আকাশকুসুমে পরিণত হবে। অন্ততঃপক্ষে বিশেষ তড়িৎ উৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারা ভূগর্ভস্থ রেলপথ বা পথের তড়িৎ-প্রবাহ স্থায়ীভাবে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। পাতাল রেল বা পথের জন্য ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ নির্মাণ প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চাঙ্গ কুশলতার দরকার। প্রথমে দরকার যেখান দিয়ে রেলপথ তৈরি হবে সেখানকার ভূমি প্রভৃতির বিশেষভাবে বিশ্লেষণ (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের দিক থেকে) করতে হবে। সংলগ্ন জমির চাপ সইবার ক্ষমতাদি বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ঠিক করতে হবে। যে অঞ্চল দিয়ে পাতাল রেল প্রস্তুত হবে তার সংলগ্ন বাড়ীঘর, সড়কের উপর যানবাহনের প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ধারণ করে এসব প্রকল্প কাজে লাগাতে হবে। এভাবে জরীপাদির কাজ সম্পূর্ণ শেষ হলে তখনি সঠিক পরিকল্পনা করে কাজে নামা হয়। ভূগর্ভস্থ রেলপথ ষ্টেশনাদি তৈরি করবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, এবিষয়ে কোন্ পদ্ধতি কার্যকরী হবে তাও নির্ণয় করতে হবে। কাজে কাজেই পাতাল রেল বা পথ ঠিকমত নির্মাণ

করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন একথা সহজেই অনুমেয়। কলকাতায় পাতাল রেল নির্মাণের জন্যে এদেশীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে রুশ বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। আরও শোনা যায় এ বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি নির্ণয়ে আরও অন্য দেশেরও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে সংবাদ নানা পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে ও সম্ভবমত বিস্তারিত আলোচনা নানা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা না করে কয়েকটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করা গেল।

পাতাল রেলের এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাওয়ার (crossing), [বিশেষ করে দুটি ষ্টেশনের সংযোগকারী নলের (tube) মধ্যে] ব্যবস্থা করা বিশেষ জটিল ও বিপদসঙ্কুল। এজন্য গাড়ীগুলি সাধারণভাবে চক্রাকার বা গলার মালার মত লাইনে চালানো হয়।

বিভিন্ন রুটের গাড়ীগুলি সাধারণত ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তর দিয়ে এক পাশ থেকে অন্য পাশে যায় (cross)। এজন্য এই সব crossing-এ বিভিন্ন স্তর দিয়ে লাইন পাততে হয় ও ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরের ষ্টেশন করতে হয়। কাজেই এই সব crossing-এর সমস্যাগুলি অধিকতর জটিল।

ভূমির তল থেকে বিভিন্ন স্তরের ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনগুলিতে লিফ্‌ট বা চলন্ত সিঁড়ি ব্যবস্থা করতে হয়, তা না হলে যাত্রীদের ট্রেনে পৌঁছানো বা ট্রেন থেকে আসতে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় হয়। আবার এক ষ্টেশন থেকে অন্য এক ষ্টেশনে যেতে গেলে কোন কোন রুট দিয়ে যেতে হবে তার নিদর্শনজ্ঞাপক চিত্রাদি রাখতে হয় এবং কোন কোন দেশে এটি ঐ চিত্রের উপর আলোর সাহায্যেও দেখানো হয়। যে ষ্টেশন থেকে যাত্রা করে গন্তব্যস্থলের ষ্টেশনে যেতে হবে সেই দুটি বোতাম টিপে দিলে রেলপথের চিত্রের (map) আলোরেখা জ্বলে ওঠে। আবার বিভিন্ন রুটের বিভিন্ন রঙের আলো জ্বলে যাতে বোঝা যায় কোথায় কোথায় গাড়ী বদ্‌লাতে হবে যাতে যাত্রীদের লাইন দিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য বেশী সময় নষ্ট করতে না হয়, এজন্য রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রবেশ পথে বড় বড় বিভিন্ন সারির (barrier) মুখে এমন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে তাতে টিকিট মূল্য না ফেললে মাঝখানে লোহার দ্বারা প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়। আবার যাত্রীরা দিনের কাজের শেষে ফেরবার পথে ক্লান্তিতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় বা নিজেদের গল্পগুজবের মধ্যে অন্যমনস্ক হলে গাড়ী থামবার পর নিজেদের নামবার ষ্টেশন ভুল না করে, এজন্য প্রত্যেক ষ্টেশনে থাম, আলোর ঢাকনার আবরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে করা হয় যাতে ষ্টেশনের নাম না পড়লেও যাত্রীরা তাদের ষ্টেশন চিনে নিতে পারে।

পরিবহণ সমস্যার সমাধান পাতাল রেল বা পথের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করা হয়, তবে এই পাতাল বা পথের নানা জটিল সমস্যা আছে যা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা সমাধান করা হয়। এখানে এসব বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

কলিকাতায় পাতাল রেল

চিত্র 1—ডায়াফ্রাম ওয়াল [মাটির নীচে পাতাল রেল চলার জন্য কংক্রীটের বাক্স করে যে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হচ্ছে, সেই পথের (বাক্সের) দু-পাশের মাটি যাতে ধসে না পড়ে সেই জন্য কংক্রিটের বাক্স তৈরির আগে দু-পাশে দু-ফুট (66 সি. এম.) চওড়া এবং 14 মিটার গভীর কংক্রিটের দেয়াল তৈরি করা হয়। এই দেয়ালকে বলা হয় ডায়াফ্রাম ওয়াল। এর দ্বারা ধস্ প্রতিরোধ করা হয়।] তৈরির জন্য ক্যালিগ্রাব যন্ত্র দিয়ে মাটি খোঁড়া হচ্ছে।
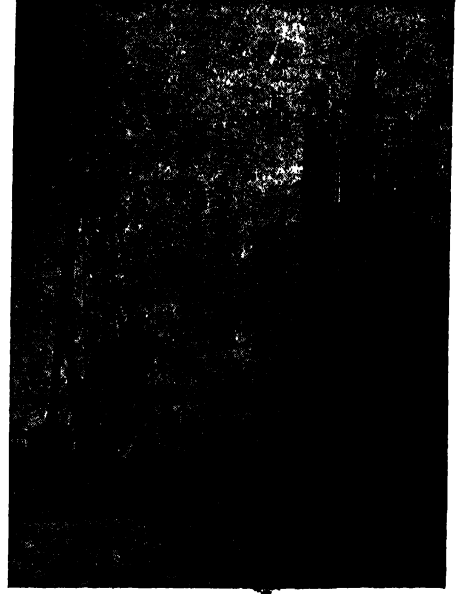
চিত্র 2—মাটি খোঁড়ার পর লোহার খাঁচা গর্তে বসানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাশে মাটি খোঁড়ার যন্ত্র দেখা যাচ্ছে।
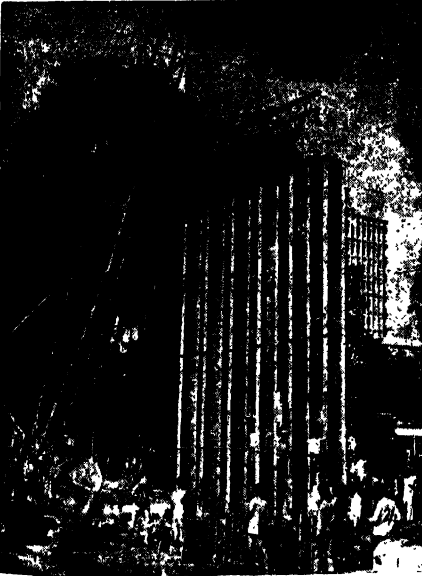
চিত্র 3—ডায়াফ্রাম ওয়াল তৈরির জন্য বীমের ফ্রেম গর্তে লোহার খাঁচার মধ্যে বসানো হচ্ছে। পরে সার্ভিস গেট হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
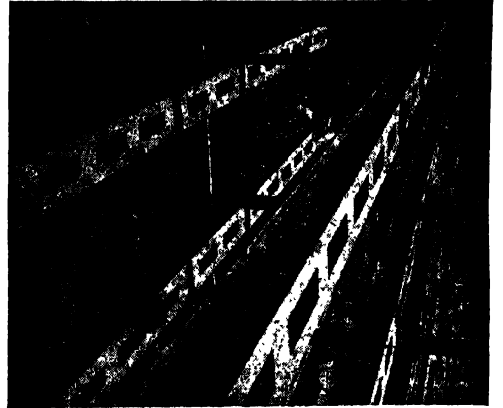
চিত্র 4—ডায়াফ্রাম ওয়াল তৈরি হবার পর দু পাশে লোহার বীম দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার পাতাল রেলের কাজে মাটির ঢেলার (বেনটোনাইট) অবদান এতই বেশী?

চির দত্ত*

বিড়লা তারামণ্ডল থেকে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার চলতে গিয়ে পথচারী বা মোটর-যান আরোহী বিস্মিত দৃষ্টিতে পাশে তাকিয়ে দেখেন, বড় বড় ক্রেন আর মস্ত উঁচু কংক্রীট মেশানো যন্ত্র রাত-দিন কাজ করে যাচ্ছে কলকাতার বুকে পাতাল রেলের আগমনকে ত্বরান্বিত করার জন্ত। সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময় জাগলেও তারা বোধ হয় প্রায় সাড়ে দশ মিটার মাটির নীচে রেলপথকে বসাবার জন্ত কি ধরণের নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পারেন না। কিন্তু তারা যদি একটু উৎসাহিত হন, জানতে পারবেন এই সাড়ে দশ মিটার নীচু মাটিকে ঠেকিয়ে রেখে তলার কাজ করা কি দুরূহ ব্যাপার বিশেষতঃ বর্ষার দিনে। কিন্তু নির্মাণ-শিল্পে এক অভিনব জিনিসের আবিষ্কারের ফলে মাটির এক দিক ফাঁকা করে দিলেও অপর দিকের মাটিকে আটকে রাখার পদ্ধতি অনেক সহজতর হয়ে গেছে। সে বস্তুটি হচ্ছে কিছু মাটির ঢেলা—বৈজ্ঞানিক নাম 'বেনটোনাইট'। গুজরাট রাজ্যের ভবনগরে এবং উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে বিশেষ ধরণের এই মাটি পাওয়া যায়। এই মাটির মূল বৈশিষ্ট্য হল একে জলে মিশিয়ে ঘোলা হিসাবে ব্যবহার করলে, সেই ঘোলা মাটির দেয়ালের স্বাভাবিক পতনকে রুখতে পারে। অর্থাৎ কোন জমিতে যদি গভীরভাবে গর্ত খুঁড়ে কিছু পরিমাণ বেনটোনাইট ঘোলা ভর্তি করে দেওয়া যায় দেখা যাবে মাটির প্রাচীর অনেক নীচু পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও ধসে পড়ছে না। কারণ এই ঘোলার ঘনত্ব জলের চেয়ে অনেক বেশী। তাই, বেনটোনাইট মাটি মেশানো ঘোলা যখন সন্ত তৈরি কোন মাটির গর্তে ভরে দেওয়া হয়, তখন এর গভীর ঘনত্ব মাটির তলা থেকে উৎপন্ন জলের চাপের থেকে বেশী থাকে এবং এর সঙ্গে এই ঘন ঘোলা পাশের মাটির দেয়ালের ভিতর যে সব জল বহনকারী ছিদ্র থাকে তাকেও বন্ধ করে দেয়। ফলে একদিকে যেমন মাটির দেয়াল এই গভীর চাপের কাছে মাথা নত করে ধসে পড়তে পারে না, অপর দিকে ভূগর্ভের জল ও চাপের ফলে বেরিয়ে আসতে পারে না।

কলকাতায় পাতাল রেল তৈরি করতে গিয়ে ময়দানে বাধাহীন ফাঁকা জমিতে উপরিউক্ত সমস্যাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ সাড়ে দশ মিটার মাটির নীচে রেলপথকে বসাতে গিয়ে 14 মিটার নীচু পর্যন্ত মাটি কেটে সে মাটিকে দাঁড় করিয়ে রাখাটাই এক বিরাট ঝামেলার ব্যাপার হয়েছিল। কারণ স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তিন চার মিটারের উপর মাটি কাটলেই পাড় ধসে পড়ার সম্ভাবনা—বর্ষার দিনে তো কথাই নেই। কিন্তু সে জটিল সমস্যাকে মেটাতে গিয়ে পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ বেনটোনাইট ঘোলা'র ব্যবহারকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। তারা পরিকল্পিত রেলপথের দু-পাশে সমান্তরাল-

---

* পূর্ত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভাবে 0·60 মিটার বিস্তৃত দু-প্রস্থ মাটির লাইন কেটে চলেছেন, যার গভীরতা 14 মিটার পর্যন্ত নেমে গেছে। এই ঘোলা সেই মাটির গর্তে ব্যবহার করার ফলে এত নীচু পর্যন্ত মাটি কাটলেও পাড় ধসে পড়ছে না এবং সেই সুযোগে দু-সারি মাটির গর্তে আগে থেকে তৈরি করা লোহার খাঁচা বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরে সে খাঁচার মধ্যে কংক্রীট ঢেলে পাকা-পোক্ত কংক্রীটের দেয়াল তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

দশ মিটার দূরে এই দু-সারি দেয়াল তৈরি হওয়ার জন্য এর মাঝে মাটি কেটে ভবিষ্যতের রেলপথ এবং ষ্টেশন তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে ইঞ্জিনীয়ারদের কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। এর ফলে ময়দানে বিস্তৃত এই রেল পথের কাজ অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অবশ্য এই ধরণের কাজের সুযোগ শহরের সব জায়গায় নেওয়া যাবে না। কিছু জটিল অঞ্চলে উপরের যানবাহন চলাচলকে অক্ষুন্ন রাখতে এক দীর্ঘ দূরত্ব ধরে মাটির তলায় লোহার পাতের পথরেখা ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। সে প্রচেষ্টা আরো কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য।

কিন্তু বর্তমানে ময়দান অঞ্চলের কাজের জন্য এই ঘোলা ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ অনেক সহজতর পথে সমস্ত কাজের পারচালনা করছেন—এতে একদিকে যেমন পরিকল্পনায় ব্যয় অনেকটা কম হচ্ছে অন্যদিকে এক বিস্তৃত পথের কাজ অতি দ্রুত সমাপ্ত হচ্ছে। এ কাজের জন্য যে ঠিকেদারদের উপর কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে, তারা শুধু পাতাল রেলের কাজের জন্যই নয়, বিরাট বাঁধ তৈরির কাজে এবং বড় বড় পুল তৈরির কাজেও এই ঘোলার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন। তারা মাটির নীচে বহুদূর পর্যন্ত মাটি কেটে ঘোলার মাধ্যমে সে দেয়ালকে ধসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে পুলের জন্য বড় বড় কূয়ো তৈরি করেছেন বা বাঁধের বিস্তৃত দেয়াল মাটির বহু নীচ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছেন।

মাটির ঢেলার এই বিস্ময়কর ব্যবহার প্রযুক্তি বিজ্ঞানে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এবং প্রযুক্তিবিদ মাত্রই উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির অকৃপণ সহযোগিতা নির্মাণ শিল্পকেও কতখানি সমৃদ্ধতর করতে পারে।

মানব শরীরের আজব পাম্প

নীলাঞ্জন বসু

মনে করুন এমন একটি পাম্পের কথা যেটি চব্বিশ ঘন্টায় একলক্ষ বার পাম্প করতে পারবে, যদিও প্রয়োজন বোধে তার ক্ষমতা দ্বিগুণ করা যাবে। পাম্পটি দিবারাত্র সমানে চলবে এবং একবারও না থেমে 70/80 এমনকি এক শ বছরও চলতে পারবে। পাম্পটি 18 হাজার লিটার তরল পদার্থকে চব্বিশ ঘন্টায় পাম্প করবে এবং যে নলগুলির মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ যাবে তা সম্পূর্ণ সোজা করলে লম্বায় হবে প্রায় 96000 হাজার কি. মি.। বোধ হয় আপনি বলবেন এমন পাম্প হয় না। কেন, আপনারই তো আছে একটি। হ্যাঁ, আমি হৃৎপিণ্ড বা হার্টের কথাই বলছি।

হৃৎপিণ্ড দুই ফুসফুসের মাঝখানে, কিছুটা বাঁ-দিক ঘেষে অবস্থিত। আকারে অনেকটা হাতের মুঠোর মত। হৃৎপিণ্ডের ভিতরটি ফাঁপা এবং চার কক্ষ (chambers) বিশিষ্ট। এই কক্ষ চারটিকে অলিন্দ (auricle) ও নিলয় (venricle) বলা হয়। অলিন্দ দুটি—ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দ। নিলয়ও দুটি—ডান ও বাম নিলয়। হৃদ্‌পিণ্ডের গাত্রটি পুরু পেশী দ্বারা গঠিত। চারটি কপাটিকা বা ভাল্‌ব (valve) স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলে ও বন্ধ হয়। এদের সম্মিলিত কার্যকরণ হৃৎপিণ্ডটিকে একটি ছন্দময়গতি প্রদান করে। যেহেতু হৃৎপিণ্ডের পেশীকে সমস্ত জীবন ধরে একটানা কাজ করে যেতে হয়, সেহেতু এগুলি বিশেষ কলা, (specialized tissue) দ্বারা গঠিত যা হাত, পা ইত্যাদি সাধারণ পেশী সমূহের থেকে আকারে-প্রকারে ভিন্ন।

এহেন যন্ত্র যা আমাদের সমগ্র জীবন-যাত্রার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত তাকে সুস্থ রাখা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সাধারণতঃ উত্তেজনায়, আনন্দে, ভয়ে, পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি হয় সাময়িকভাবে। এখন দেখা যাক মোটামুটি কি কি ভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের উপর আঘাত আসতে পারে।

অতিরিক্ত ধূমপান হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। একটি সাধারণ সিগারেটে প্রায় এক গ্রাম তামাক থাকে যার 20 ভাগ নিকোটিন (nicotine)। যাকে আমরা ফিলটার বলি, তা কিন্তু সমস্ত নিকোটিন আটকাতে পারে না। বরং বেশীর ভাগই ছেড়ে দেয়। নিকোটিন রক্তে প্রবেশ করে অন্যান্য ক্ষতির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দেয় আর মানুষকে বার বার গভীর নিঃশ্বাস নেওয়ায় প্রবৃত্ত করায়। অতিরিক্ত ধূমপান রক্ত জমাট বাধায় সহায়তা করে, ফলে দেখা যায় হৃদযন্ত্রের অসুখ ধূমপায়ীদের মধ্যে বেশী।

হৃদযন্ত্রের রক্ত সরবরাহকারী ধমনীতে (coronary artery) রক্ত জমে যাওয়াকে বলা হয় করোনারী থ্রম্বসিস (coronary thrombosis)। হৃদ্‌যন্ত্রের এই রোগে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। শুধুমাত্র আমেরিকায় বছরে 1,50,000। দীর্ঘ মানসিক দুশ্চিন্তা, প্রবল উত্তেজনা আকস্মিক গুরুতর শোক করোনারী থ্রম্বসিসের অন্যতম কারণ।

নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগের ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বা ভ্যালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একে বলা হয় রিউম্যাটিক হার্টের অসুখ (rheumatic heart disease)।

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনসন (hypertension) হৃদ্‌পিণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর। চোখ মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ধমনী উচ্চ রক্ত চাপে কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আবার কিডনীর ধমনীরও ক্রমাগত উচ্চ রক্তচাপে ক্ষতি হতে পারে এবং ক্রণিক নেফ্রাইটিস্ (chronic-nephritis) হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে যখন আমাদের ভয়, আনন্দ, রাগ, উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তা হয় তখন ধমনীর আবরণ (walls of the artery) সঙ্কুচিত হয় ও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এই সাময়িক রক্তচাপ বৃদ্ধিতে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হয় না, কারণ কিছুক্ষণ পরে রক্তচাপ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশের চিত্র।

হৃৎপিণ্ডের অংকদেশের চিত্র।

অত্যধিক মিষ্টি খাওয়াও শরীরের তথা হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা যে কার্বোহাইড্রেট খাই তা শরীরের অভ্যন্তরে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে গ্লাইকোজেন হিসাবে লিভার বা যকৃতে জমা থাকে। তবে যকৃতের গ্লাইকোজেন ধরে রাখার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অতিরিক্ত গ্লুকোজ চর্বি হিসাবে চামড়ার নীচে জমা হয়। অত্যধিক চর্বি আমাদের শরীরের একটি অনাবশ্যক বোঝা। শুধু তাই নয় প্রতি কিলোগ্রাম বাড়তি ওজনের জন্য হৃদ্‌যন্ত্রকে দেড় কিলোমিটার অতিরিক্ত শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করতে হয়। ফলে হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। রক্তে কোলেস্টেরল (cholesterol) বলে চর্বিজাতীয় এক পদার্থ থাকে। অত্যধিক ডিম, মাংস ঘি, মাখন চীজ ইত্যাদি খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ফলে ধমনী ও শিরার গায়ে কোলেস্টেরল জমে তাদের সরু করে দেয় এবং রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়, ধমনী তাদের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) হারায়। এর থেকে হয় হৃদ্‌রোগ যার নাম অ্যাথেরোস্কেলেরসিস্ (atherosclerosis)।

আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয় বৈদ্যুতিক সংকেতের (electrical impulse) সাহায্যে, যা সাইনো-আর্ট্রিয়াল (sino-artrial-node) নোড থেকে স্পন্দিত হয়। যদি কোন কারণে এই সংকেতের গোলোযোগ ঘটে তবে হৃৎপিণ্ডের চারটি কক্ষের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকবে না ফলে যে যার ইচ্ছামত স্পন্দিত হবে। এই অবস্থাকে বলা হয় হার্ট ব্লক (heart block)। বর্তমানে পেসমেকার (pace maker) নামক যন্ত্রের সাহায্যে হৃদ্‌স্পন্দন আবার স্বাভাবিক করা যায়।

সাধারণভাবে মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ, সাঁতার কাটা, পরিমিত পরিমাণে ব্যায়াম ও পরিমিত আহার হৃদ্‌যন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দিলীপ চক্রবর্তী

বিশ্ব সংবাদ

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিডরিক গাউস-এর দ্বিশত জন্ম-জয়ন্তী

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর দ্বিশততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জার্মানীর বিভিন্ন শহরে তাঁর আবিষ্কারের তথ্য সম্বলিত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল এই বছরের প্রথম দিকে।

জার্মানীর ব্রুন্‌সভিকে 1777 খৃষ্টাব্দে 30শে এপ্রিল বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ফ্রিডরিক গাউস 200 বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল থেকেই গণিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। স্কুলে পড়ার সময় 1 থেকে 60 পর্যন্ত সংখ্যার যোগ তিনি খুব কম সময়ের মধ্যে করে ফেলার এক কৌশল উদ্ভাবন করেন। শৈশবে তিনি ব্রুন্‌স্‌ভিকে গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করেন। 1792 থেকে 1795 পর্যন্ত তিনি কলেজে পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায়, 1796 সালে "17টি কোণবিশিষ্ট একটি জ্যামিতিক গঠন কৌশলের" আবিষ্কার করেন। এর পর তিনি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন এবং বীজগণিতের একটি তথাকথিত মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার জন্য তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও হেল্মষ্টেড্‌ট বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে।

তিনি জ্যোতির্বিদ্যার উপর গবেষণা করেছিলেন। ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়াজ্জি 1800 সালে 'সিরেস' নামক যে গ্রহটি মধ্যবর্তী রাত্রে আবিষ্কার করেছিলেন, তার পরিক্রমণ পথের হিসাব কষে তিনি বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন এবং তাঁর আবিষ্কারের কয়েক দিন পরেই এই গ্রহটি দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। এই গ্রহের পরিক্রমণের হিসাব যদি তিনি না করতেন তা হলে হয়ত আর কোন দিন গ্রহটিকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

এর অল্পদিন পর তিনি গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গবেষণার সাক্ষ্য রেখে গেছেন, তিনি যে শুধু গণিতজ্ঞ ছিলেন তা নয়, মহাশূন্যের গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমণ পথ নির্ধারণ ছাড়াও, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন পরিমাপের মূল্যায়ন এবং পদার্থবিদ্যাগত পর্যবেক্ষণের বিষয়েও নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার এবং জমি জরীপের ক্ষেত্রে তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পদার্থবিদ্ ভেবার-এর সঙ্গে বিজ্ঞানী গাউস বিদ্যুৎ-চৌম্বক টেলিগ্রাফ বিশ্বে প্রথম আবিষ্কার করেন।

ভারতীয় সংবাদ

শিক্ষা বাজেট

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র লোকসভায় শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দেন। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের সাক্ষরতা ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিগত ত্রিশ বছরে হয় নাই।

এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যহীন সাক্ষরতা নিরর্থক এবং দীর্ঘফলপ্রসূ নয়। স্বাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে ন্যূনতম আবশ্যিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা অর্থাৎ জনশিক্ষার প্রসার এই অভিযানকে সার্থক ও সফল করবে। এ বিষয়ে সরকারের অবহিত হওয়া উচিত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মন্ত্রক

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মন্ত্রক বর্তমানে প্রধান মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আছে। জাতীয় উন্নয়নে এ মন্ত্রকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অসাধারণ। প্রধান মন্ত্রীর উপর জাতীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় এই মন্ত্রকের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যথা শীঘ্র সম্ভব একজন যোগ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হবার কথা শোনা যাচ্ছে। মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই এই মন্ত্রী নিযুক্ত হবার কথা।

আঞ্চলিক সংবাদ

রাজ্যের দু-জন শিক্ষামন্ত্রী

গত 23শে জুন রাজ্যের মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেন। শিক্ষামন্ত্রককে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে, অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবং অধ্যাপক পার্থ দে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন।

শিক্ষা দপ্তরকে দুই ভাবে বিভক্ত করা ও দু-জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ করা ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে এই প্রথম। অবশ্য এতে শিক্ষা মন্ত্রকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সন্দেহ নাই। তবে শিক্ষা মন্ত্রককে এই দ্বিধাকরণ শুধু জনসাধারণের নিকটে নয়, অনেক উচ্চশিক্ষিতেরও বিস্ময় উদ্রেক করেছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই এই ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ততা স্পষ্ট হবে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি হল 5 থেকে 14 বছর পর্যন্ত শিক্ষাকে আবশ্যিক ও সার্বজনীন করা ও সমস্ত ভারতবাসীকে সাক্ষর করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিগত তিরিশ বছর এই আদর্শ রূপায়ণের প্রয়াস নৈরাশ্যজনক। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও সার্বজনীন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে। এই শিক্ষা আদর্শ ও উদ্দেশ্যর সার্বজনীনতা ও নাগরিকদের প্রয়োজনীয়তার উপর নবগঠিত রাজ্য সরকার সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। অপরপক্ষে উচ্চশিক্ষা ও কারীগরী শিক্ষার প্রকল্প-গুলি জাতীয় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে জড়িত করতে হবে। কাজেই এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী দু-জন মন্ত্রীর দপ্তর পরস্পর সংযোগ রক্ষা করে অগ্রসর হলে জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে রাজ্যের নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র, উচ্চশিক্ষার মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থদে-কে সম্বর্ধিত করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উপরিউক্ত তিনজন অধ্যাপক রাজ্যের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সভায় বিভিন্ন বক্তা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং রাজ্যের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনজন মন্ত্রী এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশেষ করে রাজ্যের শিক্ষার অনগ্রসরতা নিয়ে আলোচনা করেন। ডঃ অশোক মিত্র বলেন দেশের বর্তমান কাঠামোর মধ্য দিয়ে দেশের দুর্বিসহ দারিদ্র্য

দৃঢ়ীকরণের জন্য প্রধান প্রয়োজন, দেশের জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করা; আর এজন্য চাই ন্যূনতম আবশ্যিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার। এজন্য ডঃ মিত্র সভায় জানান যে দূর দূর গ্রামে শিক্ষা প্রসারের জন্য পাঠশালা চালু করবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি অন্য খাত হতে টাকা নিয়ে এই খাতে দিতে দ্বিধা করবেন না। অধ্যাপক পার্থ দে জানান দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ন্যূনতম আবশ্যিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে ও এজন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা করবে। এই আবশ্যিক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান প্রসার অপরিহার্য।

এই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু আক্ষরিক জ্ঞান দেওয়া তা নয়, তার সঙ্গে যদি সামাজিক সচেতনতা এবং প্রকৃত মানুষ হিসাবে বাঁচার জন্য জ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তবেই সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী জনমানস প্রস্তুত হবে বলে আশা করা যায়।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

কিশোর কল্যাণ পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গত 15-17 মে মেদিনীপুর জেলার নাইকুড়ি গ্রামে ঠাকুরদাস ইনষ্টিটিউশনে তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার গবেষণাকেন্দ্র, বিড়লা মিউজিয়ম, ব্রিটিশ কাউন্সিল, মার্কিন তথ্য সংস্থা, গোবরডাঙ্গা রেনেশাঁস ইনষ্টিট্যুইট, বিদ্যাসাগর সংস্কৃতি পরিষদ স্থানীয় ব্লক অফিস, সি. এ. ডি. পি. এবং স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে।

এই উপলক্ষে স্কুল ও কলেজ স্তরে দুটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল স্তরে বিষয়বস্তু ছিল 'উদ্ভিদজগৎ ও মানবকল্যাণ' এবং কলেজ স্তরে ছিল 'মহাকাশ গবেষণা ও তার উপযোগিতা'। এছাড়া দুটি বিশেষ আলোচনার আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞানের আলোচনা-চক্র (1)

গত 28শে জুলাই '77 বিকাল 4টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে "বিজ্ঞান, মানুষ ও সমাজ" সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন পরিষদের সহ-সভাপতি ও উপাচার্য ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। আলোচনা-চক্রে সমাজ উন্নয়নে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ বিষয়ে আলোচিত হয়। প্রত্যেক বক্তাই সমাজে বিজ্ঞান প্রসারে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব অধ্যাপক মহাদেব দত্ত বলেন সভ্যতার ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়—দায়ী যাঁরা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করতে বিজ্ঞানীদের বাধ্য করেন।

(2)

হিষ্ট্রি অব সায়েন্স স্টাডি সারকেল (বিজ্ঞান কলেজ) (History of Science Study Cirele Science Callege). কর্তৃক নিউটনের 250তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ব্যাপি এক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নিউটন এবং তার বিভিন্ন আবিষ্কারের ইতিহাস ও সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেন, যথাক্রমে অধ্যাপক মহাদেব দত্ত, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত পাল, ডঃ সমরেন্দ্রনাথ সেন এবং অধ্যাপক চঞ্চলকুমার মজুমদার।

কলিকাতা গণিত সমিতির প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী :

আগামী 6ই সেপ্টেম্বর 1977 কলিকাতা গণিত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস। এই উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী সভা, সভ্যদের সাধারণ সভা, কার্যকরী সমিতির সভা এবং জনহিত প্রকল্পে গণিতের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা-চক্র এবং গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা সভা এবং কয়েকটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হচ্ছে।

পরিষদ সংবাদ

সম্বর্ধনার প্রচেষ্টা

পরিষদের সভ্যদের অন্যতম ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, ডঃ অশোক মিত্র রাজ্যের অর্থ ও যোজনা মন্ত্রী এবং ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সম্বর্ধনা সভা প্রস্তাব করে তাঁদের নিকট সুবিধামত তারিখ ও সময় জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। তাঁদের উত্তর পেলে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে।

ভ্রম সংশোধন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র জুলাই সংখ্যায় '77 প্রশ্ন ও উত্তর শিরোনামায় (554 পৃঃ) যেখানে 'ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি' লেখা আছে সেখানে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলির পরে '(যাহাতে $\epsilon=1$ ও $\mu=1$)' পড়তে হবে।

গ্রন্থ-সংবাদ

নিম্নোক্ত গ্রন্থটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় সমালোচনার জন্যে পাওয়া গেছে। যথাসময়ে এর সমালোচনা প্রকাশিত হবে।

তড়িৎবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ—ডঃ কাশীনাথ দত্ত, প্রকাশক : ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি, 1, বিধান শিশু সরণী, কলিকাতা-54 দাম : পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে একটি জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিষয় : শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য প্রকল্প

বক্তা : ডক্টর গৌরী দত্ত

স্থান : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 'সত্যেন্দ্র ভবন' (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6)

তারিখ ও সময় : 19শে অগাষ্ট '77, বিকাল 5-30 মিঃ

গ্রন্থ-পরিচয়

আলো আরও আলো—শ্রীসাধন দাশগুপ্ত, প্রত্যয় প্রকাশ; 17/2, জয়দেব কুণ্ডু লেন, হাওড়া—1; 150 পৃষ্ঠা; মূল্য বারো টাকা।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার আলো সাধারণ পাঠক-পাঠিকার নিকট পৌঁছে দেবার জন্যে লেখক সার্থকভাবে চেষ্টা করেছেন তাঁর "আলো আরও আলো" গ্রন্থে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক জটিল তত্ত্ব সহজবোধ্য ভাষায় ও সরস উপমায় সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে উপমাগুলির ব্যবহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সার্থক হয়েছে। মাঝে মাঝে ছড়ার টুকরোর পরিবেশনা রচনাটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করেছে। বিশেষভাবে কয়েকটি ছড়া বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাকে সুন্দরভাবে

তুলে ধরেছে, অথচ বৈজ্ঞানিক সত্যও উপেক্ষিত হয় নি।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীদাশগুপ্ত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় বস্তুগুলিকে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে সরল ও বোধগম্য ভাষায় সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যার মোট আটটি বিষয়বস্তু—এক্স-রে, তেজস্ক্রিয়তা, কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ, সাধারণ আপেক্ষিকতা-বাদ, পরমাণু উপকরণ ও কণা-তরঙ্গ তত্ত্ব, পারমাণবিক শক্তি (ফিউসন-ফিসন) ও একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব—এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বোঝাবার জন্যে তুলনামূলক আলোচনা করে লেখক আধুনিক বিজ্ঞান-মনীষীদের বিচিত্র চিন্তাধারাকে সাধারণ ভাবে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে কিছুটা সফলও হয়েছেন। সাধারণ শিক্ষিতসমাজ আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং পারমাণবিক শক্তির বিরাট রূপ ও তার প্রকাশ জানতে খুবই আগ্রহী। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটি শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট খুবই আকর্ষণীয় হবে। স্বল্প পরিসরে সহজ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আপেক্ষি-কতাবাদ ও পারমাণবিক শক্তির উপর আলোচনা খুব হৃদয়গ্রাহী ও বোধগম্য হয়েছে।

সূক্ষ্মতার বিচারে গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ সংশয় সৃষ্টি করেছে। যেমন, 19 পৃষ্ঠায়—"তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের সঠিক ধারণা দিলেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell)।" আমরা জানি মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর বল-রেখা ধারণার (idea of lines of force) সাহায্যে তড়িৎ-চুম্বকের তাত্ত্বিক দিকটা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ফ্যারাডের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেই ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের সুঠাম গাণিতিক রূপদান করেন। কয়েক স্থলে প্রকাশভঙ্গীর জন্য বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা সঠিকভাবে রক্ষিত হয় নি। যেমন 76 পৃষ্ঠায়—"আমরা জানি মোটা লোক ছুটলে রোগা হবে। অথচ এই তত্ত্বে আমরা দেখছি যে ছুটলে তার ওজন বাড়বে। যত জোরে ছুটবে তত ওজন বাড়বে এবং প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দৈর্ঘ্যও কমবে। সুতরাং আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে কিছু না করে বসে থাকলে ওজনও বাড়ে না, দৈর্ঘ্যও কমে না।" আবার 88 পৃষ্ঠায়—"যখন বস্তুর গতির সাপেক্ষে অনেক ধীর তখনই আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রের আসন্ন ফল হিসাবে পাই সনাতন গতি-বিজ্ঞানের সূত্র।" এরকম আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থটির বহু অংশেই অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেছে। অবশ্য কিছু কিছু ভুল সংযোজিত সংশোধন-পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত সামান্য কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বিজ্ঞান-সাহিত্যকে লোকায়ত্ত করার উদ্যম হিসাবে লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয়। আশা করি গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদপট গ্রন্থটির নামের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ এবং বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

বিদ্যুৎ দত্ত*

---

* সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল সায়েন্সেস্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞানীদের জীবনপাতা থেকে

প্রয়াস, না স্বভাব ?

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে অনেক গল্পই হয়তো তোমরা শুনে থাক। গবেষণায় তাঁর আত্মমগ্নতা এখনতো প্রায় কিংবদন্তী। এমনো শোনা যেত দিনের পর দিন তিনি ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে গবেষণায় রত থাকতেন। বাক্যালাপতো দূরের কথা, কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎও করতেন না। স্ত্রীর সঙ্গেও না। জানলার কাছে খাবার রাখা থাকত। ইচ্ছে হলে খেতেন, ভুলে গেলে খেতেন না। এমন গভীর গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবার মূলে থাকে একটা প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা এবং কঠোর পরিশ্রম—দৈহিকতো নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক বেশী মানসিক ও চিন্তার। কাজের সময়ের এতটুকু অপব্যবহার নয়—সে যত তুচ্ছই হক না কেন। একটা ছোট্ট ঘটনা এই সূত্রে উল্লেখ করছি।

তবে প্রথমেই বলে রাখি, এই গল্পটি আমি এত বছর আগে শুনেছিলাম যাঁর কাছ থেকে, এটি তাঁর জীবনেই ঘটেছিল কিনা, না উনিও অন্য কারোর কাছে শুনেছিলেন, আজ এত বছর পর স্মরণ করতে পারছি না। তবে এটা ঘটেছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের একটা ল্যাবরেটারীতে। আর তিনি যদি এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে থাকেন তাহলে সেই ল্যাবরেটারীতে হয়তো উপস্থিত ছিলেন ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—সেই বিখ্যাত সহপাঠীবৃন্দ। একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখান হচ্ছিল। একটা অস্বচ্ছ রিটর্টে তরল পদার্থ ফুটিয়ে কোন একটা ক্যাটালেটিক এজেন্টের মধ্যে দিয়ে কোন প্রক্রিয়া দেখাবার এক্সপেরিমেন্ট। ডেমনস্ট্রেটার

ছিলেন একজন য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান কিম্বা গোয়ানিস ক্রিশ্চান। এমন কি খাস ইংরেজও হতে পারে। এক কথায় যার মাতৃভাষা ছিল ইংরাজী। আপাততঃ তিনি ভীষণ উৎকণ্ঠিত। এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে না। বার বার পরীক্ষা করছেন, এটা নাড়ছেন, ওটা পাল্টাচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে মাতৃভাষা যাদের ইংরাজী তাদের ভয়ানক দাপট ছিল। নেটিভ ছেলেদের সামনে এমন হেনেস্থা। মহাবিব্রত ইংরাজীভাষী ডেমনষ্ট্রেটার এমন সময় দেখতে পেলেন বারাণ্ডায় পায়চারীরত জগদীশচন্দ্রকে।

আচার্যের সেই আত্মমগ্ন পদচারণ একটা অতুলনীয় দৃশ্য ছিল। নিজের ঘর বা ল্যাবরেটারী থেকে বেরিয়ে আসতেন, হাতে একটা পেন্সিল, ধীরে ধীরে লম্বা বারাণ্ডায় পায়চারী করতেন এ মাথা থেকে ওমাথা। গভীর চিন্তায় মগ্ন, কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। সবাই নিঃশব্দে তাঁর পাশ দিয়ে যাতায়াত করত। উনিও কারা যাচ্ছে আসছে কিছু মাত্র খেয়াল করতেন না।

এহেন অবস্থায় জগদীশচন্দ্রকে ল্যাবরেটারীর দরজার সামনে দেখে মরিয়া ডেমনষ্ট্রেটার 'স্যার স্যার' করে ছুটে গেলেন। "হচ্ছে না, সব ঠিক আছে তবুও এক্স-পেরিমেণ্ট হচ্ছে না।" জগদীশচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ওর মুখের দিকে তাকালেন, নীরবে ল্যাবরেটারীতে ঢুকলেন। অন্যমনস্কভাবেই বললেন—Is there anything in it? পেন্সিল দিয়ে রিটর্টে মৃদু টোকা দিলেন। ঠক করে শূন্য রিটর্টটা জ্বলন্ত বার্নারের উপর থেকে পড়ে গেল। গভীর চিন্তামগ্ন জগদীশচন্দ্র পুনরায় বারাণ্ডায় চলে গেলেন।

বিজ্ঞানের অভ্রান্ততায় গভীর বিশ্বাসী ছিলেন বলেই জগদীশচন্দ্র জানতেন 'সব ঠিক থাকলে' ফলও ঠিক থাকবে। কোন ত্রুটি সংশোধন করতে গেলে গোড়ার থেকেই খুঁজতে হয় এবং একটা ছোট্ট টোকাতেই বোঝা যায় রিটর্ট শূন্য কি পূর্ণ? এই অনুসন্ধানের দীর্ঘ অভ্যাস তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। গভীর অন্যমনস্কতাতেও যথাযথ অনুসন্ধানে অসুবিধা হত না এবং অতিসামান্য ব্যাপারেও নিয়মানুসারে চলতেন বলেই কত গভীর কাজ করার সময় পেয়েছিলেন।

নীতীশ সেন*

* ফলিত গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

সবুজ উদ্ভিদ আমাদের পরম সুহৃদ্

বর্তমানে মানুষই হল এই পৃথিবীর অধিপতি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। মোট সংখ্যা এবং ওজন সবদিক দিয়েই একমাত্র মাছ ছাড়া, আর সকল জীবকেই সে এখন ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সে নগণ্য শেওলার চেয়েও অধম। কারণ, ক্ষুদ্রতম সবুজ শেওলাটিও নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে নিতে পারে, কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে মানুষ একান্ত-ভাবে পরনির্ভরশীল। তার প্রয়োজনীয় সব রকম খাদ্যই তাকে সংগ্রহ করে নিতে হয় অপর কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর কাছ থেকে।

এই পৃথিবীতে, কিংবা অপর কোন গ্রহে, সবুজ উদ্ভিদকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলেন যে, একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের পক্ষেই অজৈব উপাদান থেকে জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক কার্বো-হাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা, প্রোটিন (Protenis) এবং স্নেহ (Fats)—জাতীয় জৈব যৌগগুলি প্রস্তুত করা সম্ভব। আর এ কাজের প্রধান সহায়ক হল সৌর শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিজ্ঞানীরা শত চেষ্টা করেও আজ অবধি ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে এই বিক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম হন নি। অথচ কি আশ্চর্য, সুবিশাল মহীরুহ থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম শেওলা পর্যন্ত প্রতিটি সবুজ উদ্ভিদ প্রতিদিন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এই বিক্রিয়া সাধন করে চলেছে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদের সহায়তায় প্রতি বছর প্রায় 150 মহাপদ্ম* টন কার্বন 25 মহাপদ্ম টন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তার ফলে 400 মহাপদ্ম টন অক্সিজেন মুক্ত হয়। অনেকেই হয় তো জানেন না যে, এর প্রায় 90 শতাংশ বিক্রিয়াই সম্পাদিত হয় সমুদ্রে জলের তলায়, নানা প্রকার সবুজ শেওলার সহায়তায়। আর বাকি 10 শতাংশ মাত্র সম্পাদিত হয় ডাঙ্গায়, সবুজ গাছপালার সহায়তায়।

এইভাবে সংশ্লেষিত জৈব পদার্থসমূহের অতি সামান্য অংশ পরে ব্যবহৃত হয় নানারকম প্রাণীর খাদ্য হিসাবে। সে তুলনায় অনেক বেশী অংশ ব্যয়িত হয় ঐ সব উদ্ভিদেরই শ্বাসক্রিয়া এবং অন্যান্য জৈবনিক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য। তবে মৃত উদ্ভিদ এবং পাতার পচনকালে বেশীর ভাগই বিয়োজিত হয়ে পুনরায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), জল (H_2O) এবং বিবিধ লবণে পরিণত হয়ে যায়।

---

* এক মহাপদ্ম = 1 billion = 10^{12}

গাছের শাখা-প্রশাখায় অবস্থিত চেপ্টা সবুজ রঙের অঙ্গকে বলা হয় পাতা। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, গাছের পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কোষ দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন কোষে প্রচুর সবুজকণা বা ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে বলে পাতা সবুজ দেখায়। এর প্রধান উপাদান ক্লোরোফিল। আর এ থেকেই উদ্ভিদ জগতে যত প্রকার বৈচিত্র্যের উদ্ভাবনা হয়েছে। এমনিতে ক্লোরোফিল নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যে শক্তি নিষ্ক্রিয় ক্লোরোফিলকে সক্রিয় করে তুলতে পারে, তা কেবলমাত্র সূর্যরশ্মি থেকেই পাওয়া সম্ভব। সূর্যের সেই শক্তি গ্রহণ করেই ক্লোরোফিল উদ্ভিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। প্রাণিদেহে সবুজকণা বা ক্লোরোফিল থাকে না, এজন্য প্রাণীরা সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি সবুজপাতায় পড়ে 80 শতাংশ অবশোষিত হয়, 15 শতাংশ প্রতিফলিত হয়, আর প্রায় 5 শতাংশ বায়ুমণ্ডলে বিনষ্ট হয়। আবার, অবশোষিত রশ্মির মাত্র 20 শতাংশ কাজে লাগিয়ে সবুজ পাতা সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া (Photosynthesis) সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

সূর্যরশ্মি থেকে প্রাপ্ত শক্তির সহায়তায়, সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল বায়ু মণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং মাটি থেকে প্রাপ্ত জলের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে, আর সেই সঙ্গে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। এজন্য প্রতিটি গাছের পাতাই চায় বেশী করে আলোক-রশ্মি পেতে। তাই তো দেখা যায়, সকল পত্রপল্লব এক জায়গায় স্তূপীকৃত অবস্থায় না থেকে, ডাল-পালার উপরে নানা ভঙ্গিমায় অবস্থান করে, যাতে প্রত্যেকের পক্ষেই যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ আলো পাওয়া সম্ভব হয়। যে লতাটি দুর্বল, সেও অন্ধকারে পড়ে থাকে না, অন্য কোন সরল বৃক্ষকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আলোর সন্ধানে।

গাছের পাতায় অনেক রন্ধ্র বা ছিদ্র আছে। পাতার ওপর সূর্যকিরণ পড়লে, এ-সব ছিদ্রের মুখ খুলে যায় এবং বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। এই গ্যাস মাটি থেকে সংগৃহীত রসের সঙ্গে মিশে যায়। সূর্য-কিরণ এবং সবুজ কণার সাহায্যে তা থেকে কার্বনঘটিত খাদ্য তৈরি হয়, আর অক্সিজেন গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। এভাবে প্রথমে শর্করা (যেমন, গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা) এবং পরে স্টার্চ সেলুলোজ প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয়। একেই বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ (Photosynthesis) বা অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া (Carbon-assimilation)। পাতা যেন উদ্ভিদের রান্নাঘর। এখানে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ তাই খেয়ে জীবনধারণ করে। তবে এখানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার সবটা তখনই খরচ হয় না। উদ্‌বৃত্ত অংশ উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন স্থানে

অবস্থিত ভাঁড়ার-ঘরে সঞ্চিত থাকে, ভবিষ্যতের জন্য। এই সব সঞ্চিত খাদ্যই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী তাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার ক'রে থাকে।

[উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি এইভাবে প্রকাশ করা যায়:—

$$n\,CO_2 + n\,H_2O \longrightarrow (CH_2O)_n + n\,O_2$$
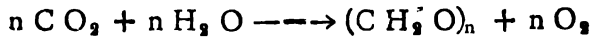
প্রকৃতপক্ষে বিক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, এবং অনেকগুলি ছোটখাট বিক্রিয়ার ফলে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়।]

খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও আরও নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি। তুলো, কাগজ প্রভৃতি সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ। এগুলি সালোক সংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন প্রাথমিক পদার্থেরই পরিবর্তিত রূপ। এছাড়া চা, কফি, কোকো, নানা-প্রকার ভেষজ ওষুধ, তেল, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি কত জিনিস আমরা ব্যবহার করি। সালোক-সংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদদেহে যে সব কাঁচামাল (raw materials) উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ তার নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে সেই সব কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করেই যেন ঐ সব জিনিস আমাদের জন্য তৈরি করে রাখে।

সূর্য থেকে যে সব শক্তি নিয়ত বিকীর্ণ হয়, তার মধ্যে শুধু আলোক-শক্তিকেই সবুজ পাতা গ্রহণ করে এবং নিজদেহে নানাভাবে সঞ্চয় করে রাখে। পরে তা থেকেই পাওয়া যায় রাসায়নিক শক্তি—তাপ-শক্তি। সভ্য মানুষ অগ্নি-উৎপাদনের জন্য যে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করে, তা গাছেরই সঞ্চিত পদার্থ। অনেকেই হয়তো বলবেন যে, বর্তমান সভ্য-জগৎ কাঠের চেয়ে কয়লা ও খনিজ তেলের উপরে অনেক বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এগুলিও আদিযুগের উদ্ভিদ এবং সমুদ্রের তলায় অবস্থিত নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্রাণীই শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে। এসময় বায়ুর অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং তারই সাহায্যে কোষে কোষে মৃদু-দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এর ফলে প্রাণীদেহে শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তির সাহায্যেই প্রাণীরা অঙ্গ-সঞ্চালন করে জীবনীশক্তির পরিচয় দেয়। শ্বাসকার্যের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। প্রাণীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এগুলি বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়।

উদ্ভিদও পাতার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। উদ্ভিদ প্রধানতঃ পাতার ছিদ্রপথে বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই অক্সিজেনের সাহায্যে কোষে কোষে মৃদু-দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর তার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, জলীয় বাষ্প এবং তাপ-শক্তি উৎপন্ন হয়। এই সব গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়।

উদ্ভিদের শ্বাসকার্য দিনরাত সমানভাবে চলে। এজন্য সবুজ কণা বা সূর্যকিরণের কোন প্রয়োজন হয় না। দিনের বেলা পাতার মধ্যে অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলতে থাকে বলে শ্বাসক্রিয়া যেন ঢাকা পড়ে যায়। রাতের বেলা আলোর

অভাবে অঙ্গার-আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাই তখন শুধু শ্বাসক্রিয়া বোঝা যায়। এ সময় কেবল অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প পরিত্যক্ত হয়।

শ্বাসকার্যের ফলে উদ্ভিদ যে শক্তি অর্জন করে, তার সাহায্যেই সে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এই খাদ্যই পরে, শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে ইন্ধনের মত কাজ করে। উদ্ভিদ প্রাণীদের মত অঙ্গ-সঞ্চালন করতে পারে না, তাই তার নিজের জন্য বেশী শক্তির প্রয়োজনও হয় না। মানুষ এবং তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদ দেহের এই সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় করে মহানন্দে চলে বেড়ায়। একদিকে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শক্তি সঞ্চয় করে অন্যদিকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা তারই ধ্বংসসাধন করে। একের ক্ষতি, তাই অপরের সমৃদ্ধি। উদ্ভিদ অচল, কিন্তু তারই বিনিময়ে আমরা সচল।

আর একটি কথা। যে কোন জীবের শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত হচ্ছে। কিন্তু সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে দূষিত বাতাস পুনরায় শোধিত হয়।

সবুজ উদ্ভিদই প্রধানতঃ প্রাণী-জগৎকে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে। শুধু তাই নয়, জীবজগতের প্রতিটি জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে বাতাস অবিরত কলুষিত হয়, আর সবুজ উদ্ভিদ সেই দূষিত বাতাসকে অবিরত কলুষমুক্ত করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সবুজ উদ্ভিদ আমাদের পরম সুহৃদ্। কিন্তু তবুও অকৃতজ্ঞ মানুষ প্রতিনিয়ত গাছপালা ধ্বংস করে চলেছে। বলা যায় না, উদ্ভিদ হয়তো একদিন এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরে গিয়ে এর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সেদিন মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে, উদ্ভিদ তার কত বড় সুহৃদ্ ছিল।

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর সহাবস্থান প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা বলেন, দেশের বনভূমির আয়তন দেশের সমগ্র ভূ-ভাগের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ হওয়া দরকার। বনের আয়তন এই হিসেবের চেয়ে কম হলে, তা একটি কঠোর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, তাহলে সেখানকার বাতাস আরও বেশী করে কলুষিত হবে, আর সেখানে বৃষ্টি কম হবে এবং ভূমিক্ষয় বেশী করে হবে বলে মরুভূমির প্রসার আরও বাড়বে। আর মরুভূমির প্রসার যত বাড়বে, প্রাণীর সংখ্যাও তত কমবে। হিসেবে করে দেখা গেছে যে, বর্তমানে ভারতের বনভূমির আয়তন তেরো শতাংশ মাত্র। সুতরাং, একথা অনুমান করার পক্ষে যুক্তি আছে যে, ভারতের বনভূমির আয়তন যথাসত্বর যথোচিত প্রসারিত না হলে, জাতির বৈষয়িক উন্নতির যাবতীয় প্রয়াসের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত সভ্য শহরবাসীরা অপরাহ্নে যে শ্বাসকষ্ট অনুভব করে, তার প্রধান কারণ, শহরে গাছপালার একান্ত অভাব। শহরে যদি আরও গাছপালা থাকতো, তাহলে শহরের বাতাস আরও সহজে কলুষমুক্ত হতে পারতো। আর আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধতার বাতাস গ্রহণ করে আরও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারতাম।

ভরসার কথা এই যে, মানুষ এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, উদ্ভিদ ছাড়া কোন প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই সে আজ বৃক্ষ-রোপণে এবং বন-সৃজনে আগের চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগী হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মানুষের হঠকারিতার ফলে, অরণ্যবহুল একটি দেশে অরণ্যের ক্ষয় এত দ্রুত এবং বৃহৎ আকারে হতে পারে যে, দেশটি দু-তিন শতাব্দীর মধ্যেই মরুদেশে পরিণত হতে পারে। তাঁদের মতে, অবাধ বনক্ষয় ও তজ্জনিত ভূমিক্ষয়ের কারণে ভারতের বহু শস্য-শ্যামল এবং দ্রুমদলশোভিত অঞ্চল মাত্র এক-শ' বছরের মধ্যেই অর্ধ-মরুদশা প্রাপ্ত হয়েছে। একটি বাস্তব সত্য এই যে, দেশের কোন অঞ্চল একবার মরুদশায় অভিভূত হলে, সেখানে নতুন অরণ্য-সৃজন এক দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং প্রতি বছরই বনভূমির আয়তন প্রশস্ত করবার একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা উচিত। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সকলের সমবেতভাবে সচেষ্ট হওয়া দরকার। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

* রসায়ন বিভাগ, আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-700 004

রেডিও-ভাল্‌বের কথা

কিসের থেকে যে কি হয়ে যায়! এক আবিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ ঘটে যায় আর এক নূতন আবিষ্কার, যার কথা আগে কল্পনাই করা হয় নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমনই আকস্মিক আবিষ্কারের ঘটনা বা দুর্ঘটনা অনেক আছে। রেডিও-ভাল্‌বের আবিষ্কার তেমনই এক হঠাৎ-ঘটা চমকদার ঘটনা।

1883 খ্রীষ্টাব্দ। বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতির জীবনকাল বাড়াবার জন্য গবেষণা করছিলেন। বৈদ্যুতিক বাতিতে তিনি ব্যবহার করতেন কার্বন ফিলামেণ্ট। তখনকার ব্যবস্থামত একটা যথাসম্ভব বায়ুশূন্য কাচের গোলকের মধ্যে ফিলামেণ্টটি ঢুকিয়ে দিয়ে তার দুটি প্রান্ত বের করে রাখা হত। প্রান্ত দুটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত করলে ফিলামেণ্টটা ভাস্বর হয়ে আলো বিকিরণ করতো। এডিসনের হঠাৎ কি খেয়াল হল, তিনি এরূপ একটা বায়ুশূন্য কাঁচের গোলকের মধ্যে বাড়তি একটা ধাতব পাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পাত থেকে একটা ধাতব তার বাইরে নিয়ে এলেন। নীচের ছবিতে ব্যবস্থাটা দেখানো হল (চিত্র 1)।
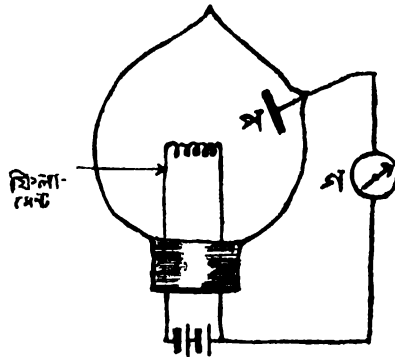
চিত্র 1—এডিসনের পরীক্ষা

ফিলামেণ্টটি ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত করে ধাতব পাত প-কে গ্যালভ্যানোমিটার গ-এর মধ্য দিয়ে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করলে দেখা গেল গ্যালভ্যানোমিটারের ভিতর দিয়ে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ হচ্ছে, কিন্তু ঋণাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করলে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল ফিলামেণ্ট ও ধাতব পাতের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানের ভিতর দিয়ে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ ঘটেছে। এডিসন বুঝতে পারলেন তিনি একটা নূতন আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু ঠিক যে কি ঘটেছে এবং কিভাবে ঘটেছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি, কারণ সে কালের বৈজ্ঞানিক

ধারণায় এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এডিসন এ বিষয়ে আর বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি।

দীর্ঘকাল পরে 1899 খ্রীষ্টাব্দে টমসনের ইলেকট্রন মতবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হল। ব্যাখ্যাটি এইরূপ—বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কার্বন ফিলামেণ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং তার থেকে নির্গত হয় অসংখ্য ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রন'। ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে ধাতব পাতটি যুক্ত করলে, ফিলামেণ্টের তুলনায় এর বিভব ধনাত্মক হয়ে যায়, ফলে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে পাতের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং গ্যালভ্যানোমিটারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাতটির বিভব ফিলামেণ্টের তুলনায় ঋণাত্মক হলে ইলেকট্রনগুলি বিকর্ষণ অনুভব করে, তাই গ্যালভ্যানোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ধরা পড়ে না। তবে একটা কথা এই যে, এডিসন যে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করতেন তা আধুনিক মান অনুযায়ী যথেষ্ট বায়ুশূন্য হত না। সুতরাং বাতির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বায়ুর আয়নিত পরমাণু বিদ্যমান থাকত। এজন্য যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হত তা প্রধানত ইলেকট্রন কণার প্রবাহের ফলে সৃষ্ট হলেও অংশত বায়ুর আয়নিত কণার দ্বারাও সৃষ্ট হত।

এডিসন বুঝতেই পারেন নি যে তিনি তাপজনিত ইলেকট্রন নির্গমনের ঘটনার সর্বপ্রথম সাক্ষী। টমসনের ইলেকট্রন মতবাদের প্রতিষ্ঠার পরে এই ঘটনার নাম দেওয়া হল 'থার্মো-আয়নিক এমিসন', এবং যে বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে এই এমিসন সৃষ্টি হয় তার নাম দেওয়া হল 'থার্মো-আয়নিক ভাল্‌ব' অথবা 'ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব', সহজ ভাষায় যাকে বলা হয় 'রেডিও-ভাল্‌ব'। 1901 খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ডসন থার্মো-আয়নিক এমিসনের একটি গাণিতিক সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 1923 খ্রীষ্টাব্দে ডাসম্যান (Dusman) আরও নির্ভুল একটি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও চলছে।

থার্মো-আয়নিক এমিসনকে তরলের বাষ্পীভবনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাপ প্রয়োগের ফলে তরল পদার্থ থেকে যেমন বাষ্পাভবন হয়, তেমনই কতকগুলি ধাতব পদার্থ থেকে উচ্চ তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের 'বাষ্প' নির্গত হয়। তবে তরলের বাষ্পের সঙ্গে এই ইলেকট্রন 'বাষ্পের' কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে। তরলের বাষ্পীভবন সাধারণ তাপমাত্রায়ও সংঘটিত হয়, কিন্তু ইলেকট্রন এমিসনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া তরলের বাষ্প হল তরলের অণু বা পরমাণু, কিন্তু ইলেকট্রন এমিসন পদার্থের অণু বা পরমাণু নয়, এরা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি। ধাতুকে প্রচণ্ড তাপে তরলিত করে তার থেকে ধাতব পরমাণুর বাষ্প সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারটি ইলেকট্রন এমিসন নয়। তাছাড়া ইলেকট্রন এমিসন অনেক কম মাত্রায় ঘটে।

থার্মো-আয়নিক ভাল্‌বের ব্যবহার

(1) ডায়োডঃ পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহের সমপ্রবাহে রূপান্তরিতিকরণ বা রেক্‌টি-ফিকেশন—1904 খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের একটি কার্যকর রূপ প্রদান করেন। কার্বনের ফিলামেণ্টটিকে ঘিরে একটি চোঙাকৃতি ধাতব পাত স্থাপন করা হয় এবং সমগ্রটিকে একটি বায়ুশূন্য কাচের গোলকের মধ্যে বসান হয়। ফিলামেণ্টটির নাম হল 'ক্যাথোড' অর্থাৎ ঋণাত্মক পাত, এবং চোঙাকৃতি ধাতব পাতটির নাম হল 'প্লেট' বা 'অ্যানোড' অর্থাৎ ধনাত্মক পাত। এরূপ ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের নাম হল 'ডায়োড', কারণ এতে আছে দু-ধরণের 'ইলেকট্রোড' বা পাত। নীচে ডায়োডের চিত্র দেওয়া হল (চিত্র 2)।
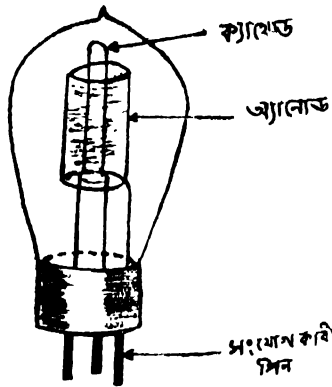
চিত্র 2—ডায়োড

ডায়োডের কার্যপদ্ধতির মূল কথাটি হল যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'রেকটিফিকেশন' বা পরিশোধন। এর মধ্যেই নিহিত আছে 'ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব' নামেরও সার্থকতা। 'ভাল্‌ব' বলতে আমরা বুঝি এমন এক ব্যবস্থা যা কোন প্রবাহকে একমুখী করে, অর্থাৎ প্রবাহটি কেবল একটি নির্দিষ্ট অভিমুখেই যেতে পারে, বিপরীত দিকে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব ইলেকট্রনের প্রবাহকে একমুখী করে—ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে. বিপরীত দিকে এই প্রবাহ বাধা পায়।

অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে একটি পরিবর্তী বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে একটি পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রবাহের দুটি পৃথক 'অর্ধচক্র' থাকে। প্রথম অর্ধচক্রে অ্যানোড ক্যাথোডের তুলনায় ধনাত্মক বিভবে থাকে, তখন ধনাত্মক অ্যানোড উত্তপ্ত ক্যাথোডে উত্তপ্ত ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণাকে আকর্ষণ করে, ফলে ভাল্‌বের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় অর্ধচক্রে অ্যানোড ক্যাথোডের তুলনায় ঋণাত্মক হয়ে পড়ে, তখন ঋণাত্মক অ্যানোড ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণাকে

বিকর্ষণ করে। ফলে ভাল্‌বের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে অ্যানোড-ক্যাথোড পথের মধ্যে একটি পর্যায়ক্রমিক একমুখী প্রবাহের মধ্যে একটা পর্যায়ক্রমিক উত্থান-পতন থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় এই উত্থান-পতন কমিয়ে এনে প্রবাহের মধ্যে সমতা আনলে পরিবর্তী প্রবাহ একমুখী সমপ্রবাহে পরিণত হয়। ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'রেকটিফিকেশন'।

(2) ট্রায়োড: পরিবর্তী বিভবের পরিবর্ধন—1906 খ্রীষ্টাব্দে ড' ফরেষ্ট (De Forest) ডায়োডের কিছু পরিবর্তন সাধন করলেন। তিনি অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে একটি তৃতীয় ইলেকট্রোড স্থাপন করলেন এবং এর নাম দিলেন 'কণ্ট্রোল গ্রিড'। একে শুধু 'গ্রিড'ও বলা হয়। এইভাবে তৈরি হল 'ট্রায়োড', অর্থাৎ তিন ইলেকট্রোডযুক্ত ভাল্‌ব। নীচে ট্রায়োডের আদিরূপের চিত্র দেওয়া হল (চিত্র 3।

চিত্র 3—ট্রায়োড
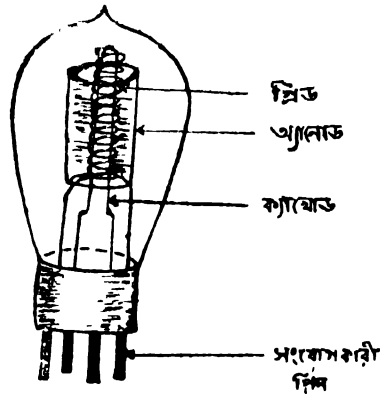
ট্রায়োডের ফিলামেণ্ট বা ক্যাথোডটি ভাল্‌বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাকে বেষ্টন করে একটি প্যাঁচানো তার, এর নামই 'গ্রিড'। আবার ফিলামেণ্ট ও গ্রিডকে বেষ্টন করে আছে অ্যানাডের চোঙাকৃতি ধাতব পাত।

গ্রিডের ব্যবহারের ফলে ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের একটি নূতন ব্যবহারের উদ্ভব হল যার নাম দেওয়া হয়েছে "পরিবর্তী বিভবের পরিবর্ধন"। ট্রায়াডের এই কার্যপদ্ধতির ব্যাখ্যা বেশ জটিল। তবে এ সম্বন্ধে মোটামুটি কথাটি হল—অ্যানোডকে ক্যাথোডের তুলনায় ধনাত্মক বিভবে রাখলে অ্যানোডের মধ্য দিয়ে একটি সমপ্রবাহী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হয় 'অ্যানোড কারেণ্ট'। গ্রিড ব্যবহার করে গ্রিড ও ক্যাথোডের মধ্যে একটি বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি করলে, গ্রিড ও ক্যাথোডের মধ্যেও একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তার নাম 'গ্রিড কারেণ্ট'। দেখা যায় যে, গ্রিড বিভব বা কারেণ্টের সামান্য

পরিবর্তন, অ্যানোড বিভব বা কারেন্টের বিরাট পরিবর্তনের কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রিড বিভবের কথা। ভোল্ট মাত্র পরিবর্তনে অ্যানোড কারেন্টের যে পরিমান পরিবর্তন হয়, অ্যানোড বিভবের 50 বা অধিক ভোল্ট পরিবর্তনে তা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং গ্রিড ও ক্যাথোডের মধ্যে অল্প পরিমাণ পরিবর্তী বিভব প্রয়োগ করলে, অ্যানোডে বহুগুণ পরিবর্ধিত পরিবর্তী প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের "পরিবর্তী বিভবের পরিবর্ধন"। কেবল পরিবর্তী বিভবের পরিবর্ধন নয়, বিশেষ ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তি পরিবর্ধনও করা যায়।

বহু ইলেকট্রোডযুক্ত ভাল্‌ব—পরবর্তীকালে ট্রায়োড অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী ভাল্‌বের উদ্ভব হয়েছে। 1916 খ্রীষ্টাব্দে হাল (Hull) কন্ট্রোল গ্রিড ও অ্যানোডের মধ্যে আরও একটি ইলেকট্রোড ব্যবহার করেন, এর নাম দেওয়া হয় 'স্ক্রিনগ্রিড', এবং ভাল্‌বটির নাম হয় টেট্রোড' অর্থাৎ চার ইলেকট্রোডযুক্ত ভাল্‌ব। টেট্রোডের পরিবর্ধন ক্ষমতা ট্রায়োড অপেক্ষা অনেক বেশী। আরও পরবর্তী কালে 'সাপ্রেসর গ্রিড' নামে পঞ্চম একটি ইলেকট্রোড ব্যবহার করে 'পেন্টোড' ভাল্‌বের উদ্ভব হয়েছে, যার পরিবর্ধন ক্ষমতা আরও অনেক বেশী। এইভাবে ক্রমশ ভাল্‌বের মধ্যে ইলেকট্রোডের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে, এবং তাদের বিচিত্র সমাবেশের ফলে একটিমাত্র ভাল্‌বকে দিয়ে দুই' তিন বা ততোধিক ভাল্‌বের কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

রেডিও-তরঙ্গ সার্থকভাবে প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব হয়েছে যে কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে; তার মধ্যে ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব বা রেডিও ভাল্‌বের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকই যন্ত্র-বিজ্ঞানের জগতে একটিমাত্র আবিষ্কার যে কত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা আধুনিক রেডিও ভাল্‌বের বিচিত্র ব্যবহার না জানলে বোঝা সম্ভব নয়। কেবল বেতার ব্রডকাষ্ট নয়, দীর্ঘ দূরত্বের বেতার টেলিফোন, সিনেমা, টেলিভিসন, রেডার প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার অবদানগুলির সঙ্গে রেডিও-ভাল্‌বের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বেতার গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আবশ্যিক। আধুনিক সভ্যতার যুগান্তকারী সংযোজন ইলেকট্রনিক গণকযন্ত্র বা 'কম্পিউটার' যা মানব-মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম কর্মক্ষমতাকেও করায়ত্ত করেছে, যাকে ব্যঙ্গ করে নাম দেওয়া হয়েছে 'যন্ত্রমানব' অথবা 'যন্ত্রদানব', তা এই ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের জটিল সমাবেশের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ*

* বালিচক বি. এইচ ইনষ্টিটিউশান, পোঃ বালিচক, মেদিনীপুর

ভেবে উত্তর দাও

1. যদুবাবু ও রামবাবুর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তাঁরা ঠিক করলেন তাঁদের সন্তানের প্রতি বৎসর জন্মবার্ষিকী পালন করবেন ও যে বৎসরে জন্মতারিখ ও বার একই সময়ে পড়বে সে বৎসরে অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে পালন করবেন। যদুবাবুর সন্তানের জন্মতারিখ 1976-য়ে 20শে জানুয়ারী এবং রামবাবুর সন্তানের জন্মতারিখ ঐ সালেরই 25শে এপ্রিল। কোন্ কোন্ সালে তাঁরা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠান পালন করবেন? তাঁদের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান পালনের কোন সাল কি একই হবে?

2. শোনা যায় সভ্যতায় অনগ্রসর কোন কোন জাতির লোকেরা সংখ্যা পর পর গুনে যেতে পারেন না, বড়জোর কেউ কেউ পাঁচ পর্যন্ত গুনতে পারেন, কেউ কেউ ছয় পর্যন্ত গুনতে পারেন। স্বভাবতই তাঁরা সর্বোচ্চ যে সংখ্যা গুনতে পারেন, তার চেয়ে বেশী সংখ্যা হলে আবার গোড়ার থেকে গোনেন, যেমন যাঁরা পাঁচ পর্যন্ত গুনতে পারেন তাঁরা সাত সংখ্যা গুনতে গেলে ছয়কে এক, সাতকে দুই বলে গোনে। এদের যোগ ও গুণের নামতা কি রকম হবে লেখতো? যারা পাঁচ পর্যন্ত গুনতে পারে আর যারা ছয় পর্যন্ত গুনতে পারে, এদের যোগ ও গুণের নামতাগুলির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে কি?

3. নিশ্চিন্তপুরের সমাজপতিরা গ্রামের সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে চলার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষকে সুন্দর রাখবার জন্য নিয়ম করলেন যে গ্রামের যারা নিজে হাতে দাড়ি কামাবেন না, গ্রামের একমাত্র নাপিত মেধো কেবল তাদেরই দাড়ি কামিয়ে দেবে। এখন ভেবে উত্তর দাওতো মেধোর দাড়ি কামানো হতো কিনা?

4. একটি চাকা মাটিতে গড়িয়ে দেওয়া হল। চাকাটির দুটি সীমা বৃত্তাকার এবং বহির্বৃত্ত ও অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1 ও r_2। অতএব, স্পষ্টতঃই r_2-র চেয়ে r_1 বড়, কেননা দুটি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু একই। বৃত্ত দুটির মধ্যের অংশটি সমতলীয় পাত। চাকাটি যখন দাঁড় করিয়ে ছাড়া হয়েছিল, তখন বৃত্ত দুটির সর্বোচ্চ বিন্দু দুটি (মাটি থেকে) রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল। চাকাটি গড়াবার পর এমন অবস্থায় ধরে থামানো হল, যখন ঐ বিন্দু দুটি আবার উপরের বিন্দু হিসেবে দেখা গেল। যদি ইতিমধ্যে চাকাটি n বার ঘুরে থাকে তবে বিন্দু দুটি যথাক্রমে $2n\pi r_1$ ও $2n\pi r_2$ দূরত্ব গেছে। এখন যেহেতু উপরিউক্ত দুটি বিন্দুই চাকার সাপেক্ষে স্থির, অতএব চাকাটির অনুভূমিক সরণ যতটা হবে, ঐ বিন্দু দুটিও পৃথকভাবে ততটা দূরত্বই অগ্রসর হবে। তাহলে তো $2n\pi r_1 = 2n\pi r_2$ অর্থাৎ কিনা $r_1 = r_2$। কিন্তু আমরা তো জানি r_1, r_2-এর চেয়ে বড়। উত্তর দাওতো কি করে এমন হল।

শ্রীঅমল দাশ*

* স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা-700 006

মডেল তৈরি

বাতাসের বেগ মাপা যন্ত্র

কোনও কোনও দিন ঝড় হবার পর আমরা সংবাদপত্রে বাতাসের গতিবেগের খবর দেখি। যে যন্ত্র দিয়ে এই গতিবেগ মাপা হয় তার নাম এ্যানিমোমিটার (aenemo-meter)। এ যন্ত্রটি বেশ সহজেই করে ফেলা যায়। যে জিনিষগুলি লাগবে তার তালিকা হচ্ছে এই :—
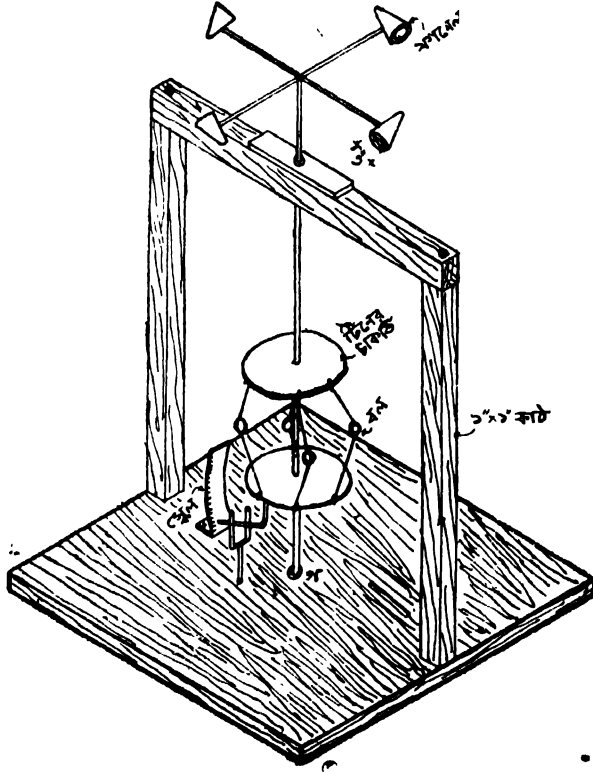
1. 1″×1″ কাঠের টুকরো 1 ফুট লম্বা — 3টি
2. 1″×1″ কাঠ 1″ মোটা— — 1 টুকরো
3. জি. আই. পাত 20 গেজ—2″×1″ — 2 ”
4. লোহার রড 1 ফুট
5. $\frac{1}{4}$′ ব্যাস লোহার গুলি (বলবেয়ারিং-এর গুলি)- 5টি
6. টিনের ফানেল (সরু মুখটি বন্ধ করা) — 4টি
7. $\frac{1}{8}$″ লোহার রড বা তার — 2 ফুট
8. 3″ ব্যাসবিশিষ্ট টিনের চাকতি — 2টি

20 গেজ জি আই পাত

প্রথমে মোটা কাঠটির ওপর পেরেক বা স্ক্রুর সাহায্যে 1″×1″ কাঠগুলিকে লাগাতে হবে। ছবিতে যেমন আছে ঠিক তেমনিভাবে লাগালে অনেকটা ফাঁসীকাঠের মত দেখতে হবে। মাঝখানের কাঠটিতে ঠিক মাঝ বরাবর খাড়াভাবে একটি ছিদ্র করতে হবে যার ভেতর দিয়ে $\frac{1}{4}$″ লোহার দণ্ডটি সোজা নেমে যেতে পারে। এই দণ্ডটি 'গ' বিন্দুতে ঠিক খাড়াভাবে থাকবে। 'খ' স্থানটির দু-দিকে অর্থাৎ কাঠটির ওপরে আর নীচে দুটি টিনের পাতকে (2″×1″) ছিদ্র করে এমনভাবে লাগাতে হবে যে, ঐ পাত দুটির ছিদ্র দিয়ে লোহার রডটি যেন নেমে যেতে পারে। 'গ' বিন্দুতে একটি অল্প গভীরতাবিশিষ্ট ছিদ্র করতে হবে যার ভেতরে $\frac{1}{4}$″ বল-বেয়ারিং-এর গুলিটি ঢুকে থাকবে। মোট কথা এই রডটি যেন স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে। এবার দণ্ডটিকে ঠিকমত বসাবার আগে দুটি টিনের চাকতিতে ছেঁদা করে (চিত্রে যে রকম আছে) একটিকে ওপরে ও অপরটিকে নীচে লাগাতে হবে। ওপরের চাক্তিটিকে রডের সঙ্গে ঝালাই করে দিতে হবে যাতে রডটি ঘুরলে চাক্তিটিও ঘুরবে। নীচের চাক্তিটি ঝালাই করতে হবে না—এটি রডের গায়ে ওঠানামা করবে। চাকতি দুটি লাগাবার আগে তাদের গায়, ধারের দিকে সমান দূরত্বে চারটি করে ছোট ছোট ছিদ্র করতে হবে। চারটি লোহার গুলির সঙ্গে ছোট ছোট তারের আংটা করে সুতো বেঁধে (চিত্রে যেমন আছে) চাক্তির ছিদ্রগুলির সাথে আটকে দিতে হবে একটি লোহার তারকে 90° কোণ করে বেঁকিয়ে নীচের চাক্তির তলায় ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তারটিকে আনুভূমিক অবস্থায় রাখার জন্য একটি টিনের টুক্রো নীচের কাঠের সঙ্গে আটকে খাড়াভাবে রেখে তার ওপর দিয়ে লোহার তারটিকে বসিয়ে দিতে হবে। যে বিন্দুতে তারটি বসবে সেই বিন্দুটিকে pivot বলা হয়। pivot থেকে লোহার তারটির বেশী অংশ চাক্তি থেকে দূরে ঝুলে থাকবে। একটি কার্ডবোর্ড কেটে স্কেল তৈরি করে লম্বভাবে কাঁটাটির সামনে রাখলে কাঁটাটির ওঠানামা কতটুকু হচ্ছে তা বোঝা যাবে।

এবার $\frac{1}{8}$″ লোহার রড 1 ফুট করে কেটে দুটিকে সমকোণে রেখে (অর্থাৎ একটি ক্রসের মত করে) $\frac{1}{4}$″ লোহার খাড়া রডটির ওপরে রেখে ঝালাই করে দিতে হবে। এই সরু রডগুলির চারটি মাথায় টিনের ফানেলগুলি ঝেলে দিতে হবে। এমনভাবে এই ফানেলগুলি লাগাতে হবে যে ওদের খোলা বড মুখ যেন একই দিকে থাকে।

বাতাস বইলে টিনের ফানেলগুলির গায় ধাক্কা দিয়ে খাড়া দণ্ডটিকে ঘুরিয়ে দেবে। সুতোয় আটকানো লোহার বলগুলিও ঝালাই করা টিনের চাক্তির টানে ঘুরতে থাকবে এবং কেন্দ্রাতিগ বলের জন্য ছড়িয়ে পড়তে চাইবে। নীচের চাক্তিটি দণ্ডের সঙ্গে লাগানো না থাকায় ওপরে উঠে আসবে। এর ফলে নীচের চাক্তির তলায় ঠেকে-থাকা কাঁটার প্রান্তটি ওপরে উঠে আসবে ও অন্য প্রান্ত স্কেলের গায় নেমে যাবে। বাতাসের বেগ যত বাড়বে তত জোরে চাক্তি ঘুরবে ও বলগুলির

টানে নীচের চাকৃতি তত বেশী ওপরে উঠবে এবং কাঁটাটি ক্রমশঃ নীচে নামবে। এ থেকে বাতাসের গতিবেগের একটা আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। অবশ্য এই যন্ত্রটিকে মানমন্দিরে রাখা একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে মোটামুটি বাতাসের গতিবেগ জানা যেতে পারে।

দিলীপকুমার পাঠক*

* বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, 19A গুরুসদয় রোড, কলিকাতা 700019

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : সহজে দেখা যায় একটি 40 কিলো ওজনের কোন বস্তুকে 1 কিলো, 3 কিলো, 9 কিলো এবং 27 কিলো খণ্ডে ভাঙ্গতে পারলে 1 থেকে 40 কিলো ওজনের সমস্ত বস্তুই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যাবে। এইরূপ আর কোন ওজনের বস্তুকে অনুরূপ ভাবে খণ্ডে ভেঙ্গে ঐ 1 কিলো থেকে ঐ বস্তুর ওজন যতটা ততটা ওজন করা যেতে পারে কি ? এ বিষয়ে কোন নিয়ম আছে কি ?

দুলালচন্দ্র পাত্র, কলিকাতা-700 006

উত্তর : হ্যাঁ হয়। যেমন 3 কিলো ওজনকে 2 কিলো ও 1 কিলোতে ভাঙ্গলে 4 কিলোকে 3, 1 কিলো খণ্ডে ভাঙ্গলে ; 7 কিলোকে 4, 2, 1 কিলোতে ভাঙ্গলে ; 13 কিলোকে 1, 3, 9 কিলোয় ভাঙ্গলে ; 15 কিলোকে 8, 4, 2, 1 কিলোতে ভাঙ্গলে ; 31 কিলোকে 1, 2, 4, 8, 16 কিলোতে ভাঙ্গলে ; 63 কিলোকে 1, 2, 4 8, 16, 32 কিলোতে ভাঙ্গলে ; 121 কিলোকে 1, 3, 9, 27, 81 কিলোতে ভাঙ্গলে ; 127 কিলোকে 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 কিলোতে ভাঙ্গলে অনুরূপভাবে ওজন করা যাবে।

1 কিলো থেকে উপরিউক্ত যে বস্তুকে ভাঙ্গা হল তার ওজন যত কিলো সেই পর্যন্ত সব ওজনকে (কিলোতে) দাঁড়িপাল্লায় মাপা যাবে। এভাবে আরও বহু উদাহরণ তৈরি করা যায়।

1 থেকে সুরু করে 2 বা 3 অনুপাত নিয়ে যে কোন সসীম গুণোত্তর শ্রেণী লিখলে যে যোগফল পাওয়া যাবে সেই ওজনের বস্তুকেই গুণোত্তর শ্রেণীপাদের (trm) সমান ওজনের খণ্ডে ভাঙ্গলে 1 কিলো থেকে ঐ যোগফল পর্যন্ত যত তত ওজনের সবকিছুই ওজন করা যাবে। এই বিষয়টি গণিতে সংখ্যা লিখবার জন্য যেসব বিভিন্ন মাপ (scale of notation) সম্বন্ধে আলোচনা আছে তা থেকে অতি সহজেই ধরা যায়।

পার্বতী পাল*

* সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনষ্টিটিউট ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

JNAN-O-BIJNAN

Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta.)

August, 1977

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগটি নব-কলেবরে সুসজ্জিত করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে উদ্বোধন করা হয়েছে।

* ১ ১ *

আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—গুপ্তপ্রেশ, কলিকাতা-700 009

মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

শারদীয় সংখ্যা

সহায়তায়ঃ পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি

প্রধান সম্পাদকঃ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

30তম বর্ষ, 10ম-11শ সংখ্যা অক্টোবর-নভেম্বর, 1977

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-700 006

ফোনঃ 55-0660

মূল্যঃ তিন টাকা

(সডাক তিন টাকা পঁচিশ পয়সা)

বিষয়-সূচী

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

প্রচ্ছদপট—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

PRECIVAC
Rotary High
Vacuum Pump
For Industry, Research
Educational Institutes
& Govt. Contractors
PRECIVAC ENGINEERING COMPANY

কেশুত্তে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল
নির্য্যাস পারফিউম
প্রোডাক্টস প্রাঃ লিমিটেড

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানতে হলে পরিষদ চলাকালীন পরিষদের অফিস-তত্ত্বাবধায়ক শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু জানতে হলে উক্ত কেন্দ্রের আহ্বায়ক শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডঃ শ্যামসুন্দর দে কিংবা শ্রীদুলালকুমার সাহার সঙ্গে ঐ কেন্দ্র চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, চিঠিপত্র কর্মসচিব বা বিভাগীয় আহ্বায়কদের নামে যথাবিধি পাঠানো যাবে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে কর্মসচিব বা বিভিন্ন আহ্বায়কদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্য/সভ্যাদের সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

1লা, অক্টোবর, 1977
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55 0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

মাসিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	পূর্ণপৃষ্ঠা	অর্ধ পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপট	175 00 টাকা	100 00 টাকা
তৃতীয় প্রচ্ছদপট	175 00 টাকা	100·00 টাকা
চতুর্থ প্রচ্ছদপট	250 00 টাকা	—
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপটমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
পঠনীয় বিষয়বস্তুমুখী পৃষ্ঠা	140 00 টাকা	75·00 টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	125·00 টাকা	65·00 টাকা
সাধারণ সিকিপৃষ্ঠা	40·00 টাকা	

বিজ্ঞাপনের এই হার কেবলমাত্র এক রঙের জন্যে। বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চুক্তিবদ্ধ হলে যথাক্রমে $7\frac{1}{2}\%$ এবং 5% রিবেট দেওয়া হয়।

বি. দ্র. এই হার নূতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চুক্তিবদ্ধ পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হারই বহাল থাকবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18.00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9.00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19.00 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুক-পোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন: 55-0660.

2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

			মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা
1.	উদ্ভিদ-জীবন—গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার		মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা— 72
2.	জড় ও শক্তি—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ		,, 116
3.	সুবাস ও সুরভি—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		,, 88
4.	আচার্য প্রমথনাথ বসু—মনোরঞ্জন গুপ্ত		,, 80
5.	কয়লা—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য		,, 104
6.	খাদ্য ও পুষ্টি—শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল		,, 95
7.	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস		,, 120
8	খাদ্য থেকে যে শক্তি পাই—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়		,, 173
9.	রোগ ও তাহার প্রতিকার—শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার		,, 110
	উপরের প্রতিটি পুস্তকের মূল্য মাত্র এক টাকা।		
10.	ধরিত্রী—শ্রীসুকুমার বসু	মূল্য : মাত্র 50 পয়সা	,, 76
11.	পদার্থ বিদ্যা, 1ম খণ্ড—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	মূল্য : এক টাকা	,, 80
12.	পদার্থ বিদ্যা, 2য় খণ্ড—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	মূল্য : এক টাকা	,, 82
13.	সৌর পদার্থ বিদ্যা—শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	মূল্য : 1·50 টাকা	,, 205
14.	ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়—ননীমাধব চৌধুরী	মূল্য : 3·50 টাকা	,, 341
15.	মহাকাশ পরিচয় (2য় সংস্করণ) শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ	মূল্য : 8·00 টাকা	,, 224
16.	বিদ্যুৎপাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা—সতীশরঞ্জন খাস্তগীর	মূল্য : 3·00 টাকা	,, 61
17.	অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায়	মূল্য : 6·00 টাকা	,, 364
18.	বোস সংখ্যায়ন—শ্রীমহাদেব দত্ত	মূল্য : 2·00 টাকা	,, 74

প্রকাশক—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন : 55-0660

একমাত্র পরিবেশক : ওরিয়েণ্ট লঙ্‌ম্যান অ্যাণ্ড কোং লিঃ

17, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-700 072

ফোন : 23-1601

মডেল প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়বস্তুর উপর একটিমাত্র পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করে অংশগ্রহণ করতে পারে। পরিষদ থেকে মডেল পরিচালনার জন্যে প্রতিযোগী প্রয়োজনমত 220 ভোল্ট পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। অন্য কিছু প্রয়োজন হলে প্রতিযোগীকেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। বিচারকদের নিকটে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তাদের মডেল সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে। মডেলের মৌলিকত্ব, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক (প্রয়োজনভিত্তিক) উৎকর্ষ, সংগঠন ইত্যাদির উপর প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ভর করবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত আবেদনপত্র সংগ্রহ করবার শেষ তারিখ 31শে জানুয়ারী, 1978 এবং মডেলসহ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 15ই মার্চ, 1978. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে আবেদনপত্র পরিষদের কার্যালয়ে বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত পাওয়া যাবে। মডেলও এই ঠিকানায় ঐ সময়ের মধ্যে জমা নেওয়া হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 009

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিঃ দ্রঃ (i) পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত মডেল বিবেচিত হবে না;

(ii) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র"-এর কোন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ অক্টোবর-নভেম্বর, 1977 দশম-একাদশ সংখ্যা

প্রতিবেদন

দেশের উন্নতি, সমাজের পুনর্গঠন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নতি প্রভৃতি নির্ভর করে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার উপর এবং তার সার্থক রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজন জনজীবনে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ও তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার উন্মেষ। এই উপলব্ধি থেকেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য বসু ছিলেন বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখার প্রথম সারির বিজ্ঞানী। গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাবতেন, জীবনকে সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এবং দেশের দৈন্য ও দারিদ্র্য দূর করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা দরকার, তার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদের। তিনি দেখলেন—ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তাই যাতে দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিতভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞানসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ জানা যায়, সে জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি আরও দেখলেন, আমাদের দেশের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা চালিত হয় বিদেশী ভাষায়, যা জনজীবনে বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তোলবার পটভূমিকায় প্রধান অন্তরায়। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণে ব্রতী হন এবং দেশের বিভিন্ন অংশে বিজ্ঞান প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় সভায় যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের সার্থকতা সম্বন্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এবিষয়ে অনুপ্রেরণা দান করেছেন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রণয়ন; হাতে-কলমে কেন্দ্র, গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থাপন; বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন, স্মৃতি-বক্তৃতা ও আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচী নির্ধারিত

হয়েছে। গত ত্রিশ বছর ধরে পরিষদ এই সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে চলেছে। শুধু শহরেই নয়, গ্রামে গ্রামেও এই কর্মসূচীগুলিকে রূপায়িত করার চেষ্টা চলছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরে নানা ধরণের আকর্ষণীয় ফিচার—মডেল তৈরি, ভেবে কর, জেনে রাখ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও সহায়ক হয়েছে। এর ফলে পত্রিকাটির চাহিদা শতকরা প্রায় 20 ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিভিন্ন স্কুল-বোর্ড পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা লক্ষ্য করে এটি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে বিতরণ করে আসছেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক এ পর্যন্ত প্রায় 32টি পুস্তক প্রকাশ করে পরিষদ বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে স্বল্প মূল্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছে। নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরিষদ কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেছে। এগুলি ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রাদি পাঠে জনসাধারণকে সুযোগ দেওয়ার জন্যে বহুদিন থেকেই একটি গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। 1969 সালে সরকারী ও বেসরকারী দানে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। এই সময়েই আচার্য বসুর অনুপ্রেরণায় নতুন ভবনে হাতে-কলমে কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়। যে সম্বন্ধে আজকের দিনে নতুন করে কিছুই বলার অপেক্ষা রাখে না। আক্ষরিক ও নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার অন্যতম পন্থার কথা ভেবেই তিনি পুস্তক, পত্রিকা প্রকাশ, জনপ্রিয় বক্তৃতা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি কর্মসূচীর সঙ্গে এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শিক্ষাভিত্তিক মডেলের সঙ্গে জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেও মডেলের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। হাতে-কলমে কেন্দ্রের মহৎ উদ্দেশ্য, বাস্তব উপযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অদম্য অনুপ্রেরণা একে একটি সুগঠিত রূপ দিয়েছে। স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য সরকার 1976 সাল থেকে মাসিক 350 টাকা হিসাবে অনুদান মঞ্জুর করেছেন। প্রায় দেড়শোর বেশি আকর্ষণীয় বিজ্ঞানের মডেল ও বহু চার্ট এখানে তৈরি হয়েছে। আচার্য বসুর তিরোধানের পর এর নামকরণ হয়েছে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র'। পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থানুকূল্য পাওয়া গেলে দেশের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে প্রদর্শনীর আয়োজন করে জনজীবনে বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে কেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ ও জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (NCERT) প্রভৃতি সংস্থার নানা কর্মধারাকেও এই কেন্দ্রটি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারবে।

দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এবছরের জানুয়ারী মাস থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে নবকলেবরে সুসজ্জিত করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। এই বিভাগে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে বি এস্ সি, (পাশ ও অনার্স কোর্স), এম. এস. সি., কারিগরী প্রভৃতি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা আছে। বেলা এগারোটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত এমন কি রবিবারেও ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন অধ্যাপক, গবেষক, শিক্ষক ও বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তকাদি এই পাঠাগারে দান করেছেন। স্থানীয় অঞ্চলে এই পাঠাগারটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পরিষদ আশা রাখে, ভবিষ্যতে অনুরূপভাবে স্বেচ্ছাকৃত এবং সরকারী ও বেসরকারী দানে পাঠাগারটি

আরও সমৃদ্ধ হবে এবং পাঠক-পাঠিকারা যাতে তাঁদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাও করা যাবে।

পরিষদের বহুমুখী আদর্শ ও উদ্দেশ্য রূপায়ণের কাজে অর্থাভাব আমরা স্বতঃই অনুভব করি। খুবই সীমিত পরিমাণ সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক অনুদানের সাহায্যেই পরিষদের পরিচালনা ও নানা কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ চালাতে হয়। পরিষদের বহুমুখী কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে তা খুবই নগণ্য।

সমাজ সচেতনতার বিজ্ঞানভিত্তিক উন্মেষের কাজে পরিষদকে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ-ভাবে সমাজে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে আমরা আমাদের বর্তমান কর্মসূচীকে আরও বিস্তৃত করতে চাই। এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে, তা হল :

(ক) গ্রামীন উন্নয়নে বিশেষ করে কৃষি, কুটীরশিল্প ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মেষের জন্য বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে (জেলা-মহকুমা-থানা-ভিত্তিক) পরিষদের শাখা স্থাপন করা। এই সব শাখা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন এবং স্লাইড ও ফিল্ম-সহযোগে প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা ;

(খ) "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকাকে জনসাধারণ ও ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আবও বেশি নিয়োজিত করা এবং সরকাবী ও বেসরকারী উদ্যোগে পত্রিকাটির প্রচার বৃদ্ধি করা ,

(গ) গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা এবং পাঠকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বাংলা ভাষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং বাংলা ভাষার প্রামাণ্য বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা ;

(ঘ) "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা"-কে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করা এবং হাতে-কলমে কেন্দ্রের কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা।

উপরিউক্ত কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে সরকারী বেসরকারী অর্থানুকুল্য এবং ব্যক্তি বিশেষের দানের জন্যে আবেদন করছি। প্রসঙ্গক্রমে পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই, "সত্যেন্দ্রভবন" সংলগ্ন জমিখণ্ডকে সবকারের মাধ্যমে স্থায়ী সংগ্রহশালার জন্যে অধিগ্রহণ করা হোক এবং সেখানে স্থায়ী সংগ্রহ-শালা স্থাপন করা হোক।

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন, পরিষদের পূর্বোক্ত কর্মসূচী সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকারী উদ্যোগের কিছু কিছু অংশ রূপায়ণে পরিষদকে সহজেই নিয়োজিত করা যায়। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পাওয়া গেলে আমরা আনন্দের সঙ্গে তা পালন করব।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের সহযোগিতায় এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির আনুকূল্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ একদিন একটি বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হবে এবং জাতীয় উন্নয়নে ও ভারতের কল্যাণ সাধনে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ*

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে যখন পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তখন আমি প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্য লাভ করি। তিনি আমাদের 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' পরীক্ষার অন্যতম বহিরাগত পরীক্ষক ছিলেন। সেদিনের পরীক্ষার্থী আমরা

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সকলেই শুনেছিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ বসু নামে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ঢাকা থেকে আমাদের পরীক্ষা নিতে আসছেন। অতবড় এক-জন বিজ্ঞানীর মুখোমুখি হতে হবে ভেবে বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। চারদিকে নানা গুজবও রটেছিল। শুনলাম তিনি নাকি মৌখিক পরীক্ষায় এমন এমন প্রশ্ন করেন যার উত্তর দিতে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীরাও হিমশিম খেয়ে যায়। আরো শুনলাম প্রশ্নগুলি হবে জটিল আর দুরূহ। সে সব নানারকমের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতেও সময় লাগে যথেষ্ট। ফলে পরীক্ষার্থীদের পক্ষে 'এক্‌স্‌পেরিমেন্ট' শেষ করা কোনমতেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

কিন্তু সত্যিই যখন মৌখিক পরীক্ষা সুরু হল, তখন আমাদের ভুল একেবারে ভেঙে গেল। ধীর পায়ে তিনি পরীক্ষা-হলে ঢুকলেন। আমার কাঁধের উপরে হাত রেখে তিনি এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন যেন মনে হল আমার কোন বন্ধুই বুঝি আমাকে 'এক্‌স্‌পেরিমেন্টে' সাহায্য করতে এসেছেন। বিষয়বস্তুর মূলের উপর তিনি একের পর এক অনেক প্রশ্ন করছিলেন ঠিকই কিন্তু প্রশ্নগুলির মধ্যে এমন একটা অনুক্রম ছিল যাতে বিষয়টি সম্পর্কে আমার ধারণা আরো স্বচ্ছ হয়। আমার পরীক্ষার বিষয় ছিল কুণ্ডলীর স্বয়ংক্রিয় তড়িদাবেশ অনুসন্ধান। যতদূর মনে পড়ে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—স্বয়ংক্রিয় তড়িদাবেশ বলতে কি বোঝায় এবং তা কুণ্ডলীর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে কি না? সমপ্রবাহে এবং পরিবর্তী প্রবাহে তার প্রতিক্রিয়া কি এক রকম? তড়িদাবিষ্ট দণ্ডের অক্ষে তড়িদাবেশের মান ও প্রকৃতি কত এবং কি রকম? এমনি সব প্রশ্ন!

এইভাবে তড়িদাবেশের প্রসঙ্গ থেকে তড়িদা-বস্থায় ত্বকের উপর তার প্রভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিনি অবলীলায় চলে গেলেন। আধঘণ্টা ধরে

* ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

কথোপকথন চলল। আমি অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারি নি। তিনি বিশদভাবে সেগুলি আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আমার কাছে এটা শুধু পরীক্ষণ নয়, শিক্ষণও বটে। পরীক্ষা দিতে গিয়ে অনেক কিছুই শিখলাম। আমাদের কাছে এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, একজন পরীক্ষক পরীক্ষার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে প্রকারান্তরে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করছেন। আমাদের তরুণ প্রাণে তিনি যে অগ্নিশিখাটি জ্বালিয়ে দিলেন তাই-ই ক্রমশ দেদীপ্যমান হয়ে উঠতে লাগল। আমাদের কাছে তাঁরই মধুর কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হত।

আচার্য বসুর মহাপ্রয়াণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যে আকাশবাণী থেকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা বছর তিনেক আগের ঘটনা হলেও আমার বেশ মনে আছে। কথাগুলি বড় মর্মস্পর্শী। সেদিন উপাচার্য বলেছিলেন, 'হতে পারে—ভবিষ্যতে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চেয়ে বিজ্ঞানের জগতে আরো শক্তিমান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটবে; কিন্তু বিজ্ঞান হৃদয়ের সঙ্গে উদার হৃদয়ের সহাবস্থান দুর্লভ। আনন্দোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটি ছাত্র-শিক্ষক—উভয়ের প্রতি যেমন, তেমনি সাধারণ মানুষের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর সহমর্মিতা। এমন গুণের মানুষ, এমন মনের মানুষ আর আমাদের মধ্যে আসবেন—এমন আশা কম'। গান্ধীজী সম্পর্কে আইনষ্টাইন বলেছিলেন, 'কয়েক শতাব্দী পরে লোকে অবাক বিস্ময়ে ভাববে এমন মানুষও এই পৃথিবীতে এসেছিলেন'। তা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

ছোটবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষ হয়। কলিকাতা হিন্দু কলেজে পড়বার সময় তাঁর শিক্ষক শ্রীবক্‌সি তাকে এক-শ'র মধ্যে এক-শ দশ নম্বর দিয়েছিলেন। প্রশ্নপত্রের এগারটি অঙ্কের দশটির উত্তর চাওয়া হয়েছিল। তিনি সবকয়টি অঙ্কই কষেছিলেন, নির্ভুল হয়েছিল। এমন কি তিনি কোন কোন অঙ্ক একাধিক পদ্ধতিতে করে দেখিয়েছিলেন। এজন্যে পরীক্ষক তাকে পূর্ণমানের চেয়ে দশনম্বর বেশি দিয়ে তাঁর স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভাকে সম্মানিত করেছিলেন।

অনেক মহাপুরুষের মত আচার্য বসু আত্মভোলা স্বভাবের মানুষ ছিলেন। যদি কেউ তাঁর অভ্যর্থনা কক্ষে যেতেন অবশ্যই দেখতে পেতেন, কত রকমের লোকই না তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সমাজসেবকরা দুর্ভিক্ষ বা বন্যাপীড়িত এলাকায় কি ভাবে সাহায্য করা যায় তার জন্যে পরামর্শ চাইতে আসতেন। খ্যাতনামা চলচ্চিত্র শিল্পী বা অভিনেতা তাঁর কাছে হামেশাই আসতেন। রাজনীতিবিদরা এসে তার সঙ্গে দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। এ ছাড়া বড় বড় শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষণারত ছাত্ররা তো তাকে সদাসর্বদা ঘিরে থাকতেন। নিজের রচনা প্রকাশে তার খানিকটা অনীহা ছিল। দুরূহ তত্ত্ব প্রতিপাদনে ছিল তাঁর অফুরন্ত আগ্রহ। প্রতিপাদিত বিষয়টি লিখে ভারি তৃপ্তি পেতেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তা ছাপাবার কথা মনেই থাকত না। কেউ যদি তার রচনাটি সংগ্রহ করে বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকার জন্যে পাঠিয়ে দিতেন তা স্বতন্ত্র কথা—তা না হলে রচনা অপ্রকাশিত থেকে যেত।

বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সঙ্গীতেও ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি বহু ভাষাও জানতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। একবার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক জুলিয়ট কুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রটি (অধুনা সাহা ইন্‌স্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) পরিদর্শন করতে আসেন। অধ্যাপক কুরী স্বনামধন্যা মাদাম কুরীর জামাতা এবং ইরিয়েন কুরীর স্বামী। সেদিন অধ্যাপক কুরীকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজিও

হন। ফরাসী ভাষায় তাঁর বক্তৃতা যাতে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে প্রচার হতে পারে তার জন্যে একজন দোভাষীর প্রয়োজন ছিল। ভাষ্যকারের সুবিধার জন্যে অধ্যাপক কুরী থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলতে রাজি ছিলেন। উপস্থিত সেখানে অনেকেরই ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু কেউই অনুবাদে সাহসী হলেন না। এমন বক্তৃতার রসগ্রহণ করতে পারবেন না ভেবে অনেকেই ভারী নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ ধীর পায়ে বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। অধ্যাপক কুরীর বক্তৃতার ইংরেজী ভাষ্য করতে তিনি রাজি হলেন। বক্তৃতা চলল। দেখা গেল অধ্যাপক কুরীর এক একটি বাক্য শেষ হতে না হতেই আচার্য বসু তার ইংরেজী ভাষ্য করে চলেছেন। এইভাবে সমস্ত ভাষণটাই মুখে মুখে অনূদিত হল। সে হৃদয়গ্রাহী ভাষ্য শুনে সকলেই খুশী হয়েছিলেন।

বাস্তবিক-ই তাঁর বক্তৃতা শুনলে মন আনন্দে ভরে উঠত। তাঁর ছাত্র হওয়া ভাগ্যের কথা। আরো সৌভাগ্যের কথা এই সহৃদয় মানুষটিকে জানা, তাঁর অনুগ্রহ ও স্নেহ লাভ করা।

হরমোন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

মানবদেহের বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থি, যাদের ইংরেজিতে endocrine gland আখ্যা দেওয়া হয়, তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকালেও জীব-বিজ্ঞানীদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে এই বিশেষ গ্রন্থি-গুলির পার্থক্য এই যে, এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রস (hormone) নালিকা-বাহিত না হয়ে গ্রন্থির অভ্যন্তরে রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। সমগ্র শরীরে এই গ্রন্থিরস বা হরমোন-এর অবাধ গতি এবং এরই শাসনে ও তত্ত্বাবধানে দেহের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের প্রায় সবই অনুষ্ঠিত হয়। পিতা-মাতার বংশগত বৈশিষ্ট্য যেমন 'জিন' (gene) মারফৎ সন্তানে বর্তায়, জিনের একান্ত বশবর্তী এই বিশেষ গ্রন্থিগুলিও তেমনই দেহমনে নানা পরি-বর্তন সংগঠিত করে। এই গ্রন্থিরস বা হরমোন-এর আধিক্য বা স্বল্পতা মানবদেহে বহু বিচিত্র রোগ বা অস্বাভাবিকতার জন্যে দায়ী।

1902 খ্রীষ্টাব্দে দু'জন ইংরেজ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট স্টারলিং (Ernest Starling) এবং উইলিয়াম বাইলিস (William Byliss) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার সূত্রপাত করেন। কুকুরের অগ্ন্যাশয় (pancreas) নিয়ে গবেষণার ফলে 1904 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরাই সর্বপ্রথম একটি হরমোন সিক্রিটিন (secre-tin) আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

এরই পরবর্তীকালে নানাদেশের নানা বিজ্ঞানীর একক অথবা যৌথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, সাধারণত প্রণালীহীন গ্রন্থি (duct-less gland), পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, বিশিষ্ট নার্ভ (বা, স্নায়ু)-কোষ ও নার্ভ (বা, স্নায়ু)-তন্তুপ্রান্তে উৎপন্ন হরমোন উৎপত্তিস্থান থেকে রক্ত-স্রোতে বাহিত হয়ে, কোনও সন্নিহিত বা দূরবর্তী স্থানে গিয়ে, বিভিন্ন কোষ ও কলার ক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি-সংক্রান্ত বিদ্যা বিজ্ঞান-জগতে 'এণ্ডোক্রিনোলজি' (endocrinology) নামে পরি-চিত (গ্রীক, *endon* = within, *krinein* = to sift, *logos* = science)। একটি অন্তঃস্রাবী

* রসায়ন বিভাগ, আর জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-4

গ্রন্থি একই সঙ্গে তার নিজস্ব হরমোনের কারখানা এবং সঞ্চয়কক্ষ (বা, ভাঁড়ার-ঘর) হিসেবে কাজ করে, কারণ ওই হরমোন অল্প সময়ের জন্যেও দেহের অন্যত্র সঞ্চিত থাকতে পারে না।*

এ যাবৎ যেসব ভিন্ন ভিন্ন হরমোন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের ক্রিয়া সম্পর্কেও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ মানুষের নানা প্রকার আধিব্যাধি সম্পর্কেও আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রণালীহীন গ্রন্থিগুলিতে, যেমন—মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাসে (hypothalamas) এবং মস্তিষ্কের ভূমিসংলগ্ন পিটুইটারিতে (pituitary), গলদেশের থাইরয়েডে (thyroid), উদরাভ্যন্তরে বৃক্ক-সংলগ্ন অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থিতে এবং অ্যাড্রিন্যাল-ত্বকে (adrenal cortex), স্ত্রীদেহের ডিম্বাশয়ে (ovary), এবং প্রণালীযুক্ত অগ্ন্যাশয়ে (pancreas) ও পুং-দেহের শুক্রাশয়ে (testis), এক বা একাধিক হরমোন প্রস্তুত হয়। এদের কতকগুলি বৃদ্ধি, বিকাশ ও বংশবিস্তারে এবং অন্যগুলি বিপাকে, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

হরমোন প্রধানত দু'রকম। কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হল কলা, কোষ বা প্রান্তিক অঙ্গ। আবার কতকগুলির লক্ষ্যস্থল হল অপর কোন গ্রন্থি, যেখানে প্রথমটির ক্রিয়ায় অপর কোন হরমোন উৎপন্ন হয়।

*এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্টারলিং সবপ্রথম হরমোন (গ্রীক, *hormaein* = to excite) কথাটি ব্যবহার করেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

Hormones have to be carried from the organ where they are produced to the organ which they affect, by means of the blood stream, and the continually recurring physiological needs of the organism must determine their repeated production and circulation through the body.

এইভাবে দেহের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন বিবিধ হরমোন দ্বারা দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বিপাক সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং, এরূপ যে-কোন একটি গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এইসব ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটে।
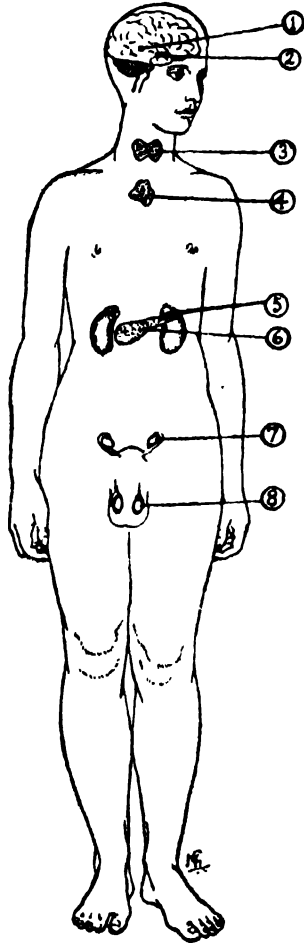
মানবদেহের কয়েকটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির (endocrine glands) অবস্থান—

1 হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus)
2 পিটুইটারী (pituitary)
3. থাইরয়েড (thyroid), [এর নিচের অংশ প্যারাথাইরয়েড (parathyroid)]
4. থাইমাস (thymus)
5. অ্যাড্রিন্যাল (adrenal)
6. অগ্ন্যাশয় (pancreas)
7. ডিম্বাশয় (ovary)
8. শুক্রাশয় (testis)

প্রকৃতপক্ষে প্রথম হরমোন আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বিজ্ঞানী আবেল (Abel), 1897 খ্রীষ্টাব্দে। এর নাম অ্যাড্রিন্যালিন (adrenalin) বা এপিনেফ্রিন (epinephrin ; গ্রীক *epi* = upon, *nephros* = kidney)। আর এটাই প্রথম হরমোন যা ল্যাবরেটরীতে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। এই কৃতিত্ব অর্জন করেন স্বাধীনভাবে দু'জন বিজ্ঞানী—

স্টল্জ (Stolz, 1904) এবং ডাকিন (Dakin, 1905)। বৃক্ক-সংলগ্ন অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থি থেকে এটি নিঃসৃত হয়। এর ক্রিয়ায় রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃদ্‌স্পন্দনের বেগ বেড়ে যায়। হাঁপানির আক্রমণকালে এদ্বারা কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। করোটির মধ্যে মস্তিষ্কের ঠিক নিচেই আছে পিটুইটারি-গ্রন্থি। এটি দেখতে ছোট্ট একটি মটরদানার মত। এর দুটি অংশ—সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ। পিটুইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন (Somato-Tropic-Hormon, বা STH) দ্বারা সাধারণভাবে দেহের বৃদ্ধি হয়। দেহের বিকাশ, বিশেষত স্ত্রী ও পুরুষের যৌবন-লক্ষণসমূহের (যেমন, স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতিগত পার্থক্য), প্রধানত যৌনগ্রন্থিতে (gonads) উৎপন্ন হরমোনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মস্তিষ্কের হাইপো-থ্যালামাস অংশের ক্ষরণক্ষম কোষ থেকে উৎপন্ন উত্তেজক উপাদান রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে যখন পিটুইটারির সম্মুখভাগে পৌছয়, তখন সেখানে দু'রকম হরমোন (FSH এবং LH) সঞ্জাত হয়ে যৌন-গ্রন্থিকে সক্রিয় করে তোলে এবং তাদের নিজ নিজ হরমোন-ক্ষরণে উদ্বোধিত করে। প্রথমটির প্রভাবে স্ত্রীদেহে ডিম্বকোষের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে ও ঈস্ট্রোজেনজাতীয় বিশিষ্ট হরমোনের (যেমন, ঈস্ট্রোন এবং ঈস্ট্রাডাইয়ল) ক্ষরণ হয়, আর পুংদেহে শুক্রকীটের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। আবার দ্বিতীয়টির প্রভাবে স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষের নিষ্ক্রমণ ও প্রজেস্টেরোন নামক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরপক্ষে পুংদেহে টেস্টোস্টেরোনের ক্ষরণ হয়।

ঈস্ট্রোন (estrone) সর্বপ্রথম নিষ্কাশিত হয় 1929 খ্রীষ্টাব্দে (Butenandt ; Doisy)। এটি স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মূত্রে পাওয়া যায়। আর ঈস্ট্রাডাইয়ল (estradiol) পাওয়া যায় ডিম্বাশয়ের কলায় এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মূত্রে। পুরুষের যৌন হরমোন দুটি—এদের মধ্যে অ্যান্ড্রোস্টেরোন (androsterone) সর্বপ্রথম পুরুষের মূত্র থেকে নিষ্কাশিত হয় 1931 খ্রীষ্টাব্দে (Butenandt), আর টেস্টোস্টেরোন (testosterone) সর্বপ্রথম নিষ্কাশিত হয় শুক্রাশয়ের কলা থেকে, 1935 খ্রীষ্টাব্দে (Laqueur)। যৌন হরমোন সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে জার্মান বিজ্ঞানী বুটেনান্ট (Butenandt)-কে 1939 খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রের নোবেল-পুরস্কার দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আমাদের গলার সামনের দিকে আছে থাইরয়েড (thyroid)। কোন কিছু গেলার সময় কণ্ঠমণি (adam's apple) যে ওঠা-নামা করে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার নিচেই থাইরয়েড-গ্রন্থির অবস্থান। এই গ্রন্থি অনেকটা মোটরগাড়ির অ্যাক্সিলেটরের মত কাজ করে। কারণ, এথেকে উৎপন্ন আইওডিন-ঘটিত যৌগ থাইরক্সিন (thyroxine) ও ট্রাই--আইওডো-থাইরোনিন (triiodothyronine) আমাদের দেহের সাধারণ বিপাক (metabolism) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। থাইরয়েড থেকে এই হরমোন অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকলে, দেহরূপ এঞ্জিনটি যেন ছুটে চলে। তখন দেহমধ্যে ইন্ধনের দহন-ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততালে সম্পাদিত হতে থাকে। এতে আমাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, একথা সত্যি ; কিন্তু এর ফলে দেহের ক্ষয় হয় অত্যন্ত দ্রুত। আবার এই হরমোন স্বল্প পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকলে, দেহরূপ এঞ্জিনটি অত্যন্ত মৃদুতালে বা মন্থর গতিতে চলতে থাকে। তখন দেহমধ্যে ইন্ধনের দহন-ক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পাদিত হতে থাকে। এর ফলে আমরা ক্রমশ নিস্তেজ এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, একটি শিশুর থাইরয়েড-গ্রন্থি থেকে এই হরমোন নির্দিষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত না হলে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, এবং তার বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য সমবয়স্ক অন্যান্যে শিশুরা

যতটা লেখাপড়া শিখতে পারে, সে তা পারে না।

উল্লেখ্য যে, হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন হরমোন (Thyrotropin Releasing Factor, সংক্ষেপে TRF) সোজাসুজি পিটুইটারির সম্মুখভাগে যায়। তখন তা থেকে থাইরোট্রোপিন (Thyrotropin), বা TSH (Thyroid-Stimulating Hormone), নিঃসৃত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। এই হরমোনের ক্রিয়ায় থাইরয়েড-গ্রন্থিতে থাইরক্সিন ও ট্রাই-আইওডো-থাইরোনিন সংশ্লেষিত হয় এবং সেগুলি রক্তস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয়। আবার, এখান থেকে যে পরিমাণ থাইরয়েড-হরমোন রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে হাইপোথ্যালামাসে পৌঁছয়, তা থেকেই যথাক্রমে TRF এর এবং TSH-এর নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এভাবে এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রত্যেকটি গ্রন্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

কিন্তু আইওডিনের অভাব ঘটলে, থাইরয়েডে যথেষ্ট হরমোন উৎপন্ন হয় না। এজন্যে থাইরয়েড হরমোন স্বল্প পরিমাণে হাইপোথ্যালামাসে যায়। এর ফলে সমগ্র চক্রটি ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রথমে TRF, এবং পরে TSH, অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়। আর অত্যধিক TSH-এর প্রভাবে আইওডিনের অভাবগ্রস্ত থাইরয়েড-গ্রন্থি আকারে বড় হয়ে যায়। এইভাবে গলগণ্ড (goiter) রোগ দেখা দেয়।

বিজ্ঞানী কেন্ড্যাল (Kendall) 1914 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গরুর থাইরয়েড থেকে এই হরমোন (থাইরক্সিন) নিষ্কাশিত করেন। তারপর 1926 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হ্যারিংটন (Harington) এটি সংশ্লেষিত করেন। মানবদেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এই হরমোন এখন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অগ্ন্যাশয় (pancreas) মূলত নানা উৎসেচক (enzyme)-এর কারখানা। এই উৎসেচকগুলি নালিকা-বাহিত হয়ে অন্ত্রমধ্যে নিঃসৃত হয় এবং খাদ্যের পাচন-ক্রিয়ায় সহায়তা করে। কিন্তু এই অগ্ন্যাশয়ের মধ্যেই ছড়ানো রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বৈপ অংশ (Islets of Langerhans). এই দ্বৈপ অংশে উৎপন্ন হয় ইনসুলিন (insulin) এই হরমোন আমাদের দেহে কার্বোহাইড্রেটের সদ্ব্যবহার এবং পেশীমধ্যে, অথবা যকৃতে (liver), উদ্বৃত্ত কার্বোহাইড্রেটের সঞ্চয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে বহুমূত্র বা মধুমেহ (*diabetes mellitus*) রোগ দেখা দেয়। তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রকোপ বেশি হলে (অর্থাৎ, গ্লুকোজের মাত্রা, 100 মিলিলিটার রক্তে 160 মিলি গ্রামের চেয়ে বেশি হলে) মূত্রের সঙ্গে শর্করা, অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটোন নির্গত হয়। এই অবস্থায় বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে।

কানাডার দুই বিজ্ঞানী ম্যাক্লিয়ড (Macleod) এবং ব্যান্টিং (Banting) 1921 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অগ্ন্যাশয়ের নির্যাস বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করে সুফল পান। তাঁরাই এই সক্রিয় পদার্থটির নাম দেন ইনসুলিন। এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্যে 1923 খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

পিটুইটারির পশ্চাদ্ভাগ থেকে এমন কতকগুলি বিভিন্ন গুণান্বিত হরমোন উৎপন্ন হয়, যেগুলি মাতৃ-গর্ভ থেকে শিশুর জন্মকালে জরায়ুর সঙ্কোচন উদ্বোধিত করে, প্রসবের পর মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করে, এবং বৃক্ক থেকে মূত্র-রেচন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

প্যারাথাইরয়েড এবং অ্যাড্রিন্যাল-ত্বক (adrenal cortex) থেকে উৎপন্ন হরমোনসমূহ সাধারণভাবে অজৈব উপাদানগুলির বিপাক, তথা গ্রহণ ও বর্জন-ক্রিয়া, নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখ্য যে, পিটুইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন হরমোন (Adreno-Cortico-Tropic Hormone, সংক্ষেপে ACTH) অ্যাড্রিন্যাল-ত্বককে উদ্বোধিত করে অ্যাড্রিন্যাল-ত্বক থেকে নিঃসৃত হয় করটিন (cortin)।

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে, এটি একটি জটিল মিশ্র। এ থেকে প্রায় চল্লিশটি ষ্টিরয়েড-জাতীয় যৌগ (steroid compounds) পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল করটিসোন (cortisone)। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের বিপাকে এর ক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বাত-ব্যাধিতেও এ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে গবাদি পশুর অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থি থেকে এটি সুলভে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এ জাতীয় বিভিন্ন যৌগের আণবিক গঠন এবং সেই সঙ্গে জীববিন্যাসংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী কেনড্যাল (Kandall) এবং হেন্‌চ (Hench)-কে, এবং সেই সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী রাইখস্টাইন (Reichstei.)-কে, 1950 খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যে, এবং সেই সঙ্গে বংশ-বিস্তার সুনিশ্চিত হওয়ার জন্যে, হরমোনগুলির স্বাভাবিক ক্ষরণ অত্যাবশ্যক। অত্যধিক অথবা অত্যল্প ক্ষরণ, কোনটাই কাম্য নয়। কারণ, তাহলে বৈকল্য অবশ্যম্ভাবী। যেমন, পিটুইটারির সম্মুখভাগের অক্ষমতায় ঘটে বামনত্ব, অকালবার্ধক্য এবং অতিকৃশতা। বিপরীতভাবে, পিটুইটারির অতি-সক্রিয়তার ফলে দেখা দেয় অতিকায়ত্ব (বা, দৈত্যাকৃতি)। তেমনি থাইরয়েডের ক্রিয়া-স্বল্পতায় ঘটে মেদ-বাহুল্য। আবার, এর ক্রিয়াবৃদ্ধিহেতু দেখা দেয় কৃশকায়ত্ব, সদা-বিস্ফারিত-নেত্র (exophthalmos প্রভৃতি রোগ। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, হরমোন-সংক্রান্ত এই সব গবেষণার ফলে আমাদের জ্ঞান যেমন বেড়েছে, তেমনি হরমোন নিঃসরণের ত্রুটি-জনিত নানা প্রকার রোগ নিরাময় করার সম্ভাবনাও এখন অনেক বেড়েছে।

আর একটি কথা। প্রথম দিকে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, কেবলমাত্র উচ্চতর প্রাণীদের বেলায়ই এরূপ হরমোন নিঃসৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহেও হরমোনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

—শুধু প্রাণী-জগতে নয়, বিজ্ঞানীদের মতে—উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, পাতা-ঝরা প্রভৃতিও নানা প্রকার উদ্ভিদ-হরমোন (plant hormones) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

1964 সাল। মার্চ মাস নাগাদ ভারত সরকারের তদানীন্তন রাসায়নিক এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক হলদিয়ায় একটি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট যাতে হয় তার সুপারিশ প্রথম করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটা না একটা অজুহাতে হলদিয়ার পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানা আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এই কারখানা স্থাপন নিয়ে যত সব অসুবিধার কথা আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে এই কারখানার জন্যে যে উপাদানটি দরকার হবে তার যোগান সম্পর্কে বহু সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এই উপাদানটি হচ্ছে ন্যাপ্‌থা (naphtha)। এটি পেট্রোলিয়ামের গেসোলিন আর কেরোসিনের মধ্যবর্তী অংশ। এটিকে ভেঙেই সার, রাবার, প্লাস্টিক, গুঁড়োসাবান, কীটনাশক পদার্থ, বিভিন্ন ওষুধ আর রেজিনের জন্যে উপাদানস্বরূপ অলিফিন, অ্যারোমেটিক্‌স্ আর সিন্‌থেসিস গ্যাস যা দরকার তার সবই মিলছে। কিন্তু এর অভাবে পূর্বাঞ্চলের রাবার বা প্লাস্টিক শিল্পগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা এ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই বিষয়টি শুধুই আলোচনা পর্যায়ে; খুব বেশি এগোয় নি।

প্রয়োজনীয়তা—পূর্বে গতানুগতিক পদ্ধতিতে যেমন অ্যালকোহলকে জলমুক্ত করে ইথিলিন তৈরি করা হত, এখন আর সেভাবে ইথিলিন তৈরি করা হয় না। এই সব প্রণালীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইথিলিন তৈরি করা সম্ভব নয়। পলিথিন (polythene), নাইলন (nylon), টেরিলিন (terylene) ইত্যাদির চাহিদা বাড়ছে—কিন্তু এই রকম ইথিলিনের সূত্র থেকে এদের যোগান চাহিদা অনুপাতে সম্ভব নয়। এই সব বিবেচনা করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এদের জন্যে যে সব উপাদান দরকার তার যোগান পেট্রোলিয়াম কেমিক্যাল থেকে চলে আসছে। উন্নতিশীল দেশগুলিও ক্রমশই পেট্রোলিয়াম কেমি-ক্যালসকেই (Chemistry and Industry, 1977, পৃ. 13) অলিফিন (olefins), অ্যারোমেটিক্‌স্ (aromatics) আর সিন্‌থেসিস গ্যাস (synthesis gas) তৈরির জন্যে ব্যবহার করে চলেছে। আগে অ্যাসিটেলিন তৈরি হত কার্বাইড থেকে অথবা ভেজিটেবল প্রডাক্ট, যেমন মোলাসেস (molasses) থেকে। রাবারের জন্যে যে বিউটাডাইন (buta-diene) দরকার তাও আগে রিপ (Reppe) প্রণালীতে অ্যাসিটাইলিন আর ফরমালডিহাইড থেকেই হত। বর্তমান চাহিদা অনুসারে এই পদ্ধতিগুলি যথেষ্ট নয়। এটিই একটি প্রধান কারণ যার জন্যে বহু দেশ পেট্রোলিয়াম কেমিক্যালসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে আর পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট যাতে থাকে তার জন্যে এত আগ্রহী। ভারত কোনভাবেই পিছিয়ে থাকতে পারে না। পশ্চিমাঞ্চলে এই রকম কারখানা বর্তমান থাকলেও পূর্বাঞ্চলে একটিও নেই। হলদিয়া কলকাতার নিকটবর্তী বলে বাণিজ্যিক দিক দিয়েও এখানে এরকম একটি কারখানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গবাসীর একটি দাবি রয়েছে। আরও সুবিধা হল এই যে, এই কারখানা থেকে বিউটাডাইন (butadiene) আর ষ্টাইরিন (styrene) যা হবে, তাতেই সিনথেটিক রাবার (synthetic rubber) হতে পারছে। পলিথিনের জন্যে যতটা ইথিলিন দরকার তাও মিলবে। আর সাইক্লোহেক্সেন (cyclo-hexane) যা মিলবে তার থেকেই নাইলনের জন্যে অ্যাডিপিক অ্যাসিড (adipic acid) আর

* বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700 006

হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন (hexamethylene diamine) জুটছে। কম খরচায় এদের প্রচুর উৎপাদন সম্ভব বলেই কোন দেশ আর এখন এই সব উপাদানের জন্যে গতানুগতিক প্রণালীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে পেট্রোকেমিক্যাল্সের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে।

1947 সালের আগে পর্যন্ত ইউরোপ এবং তথাকথিত উন্নতশীল দেশগুলিতেও অন্য শিল্প কারখানার উপজাত (by-product) পদার্থগুলিকেও পলিমার শিল্পের (polymer industries) উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হত। এটা মিতব্যয়ীও ছিল না আর সামাজিক প্রয়োজনের পক্ষেও সহায়ক নয়। এছাড়া আরও বিশেষ কারণ হচ্ছে—ক্রমেই বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি (petroleum refinery) কারখানা গজিয়ে উঠছে। কাজেই এর থেকে যে ন্যাপ্থা মিলছে তা খরচার দিক দিয়ে বিকল্প সূত্র কোল (coal), কোক (coke) আর মোলাসেস (molasses) থেকে সস্তা হচ্ছে। কোন কারখানা খুলবার আগে কারখানার আয়তন কি হবে, উপাদানের পরিমাণ কি হবে, গুণগত দিক দিয়ে প্রডাক্টগুলি (product) কি রকম হবে এবং তাদের চাহিদা কেমন তা যেমন বিবেচনা করা দরকার, তেমনি তা সময়োচিত কিনা তাও দেখা দরকার। এখন পলিথিন পাইপ ব্যবহার হচ্ছে খুব বেশি, পলিএষ্টার (polyester fibre) ফাইবারও। এক্ষুণি এরকম পরিবর্তন না করে বিলম্ব করলে দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতি হবে। তাই ইথিলিনের অভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিল্প কারখানাগুলির ক্ষতি হয় তা আদৌ সমীচীন হবে না।

প্রাপ্যতা—হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা তৈরি করতে হলে অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে ন্যাপ্থাকে ভেঙ্গে ইথিলিন তৈরি করতে গেলে যে ন্যাপ্থা দরকার তার যোগান কোথা থেকে হবে সে বিষয়টিই এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ভারতের বহু অঞ্চলেই পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি রয়েছে। যেমন ভারত রিফাইনারি, বোম্বে; হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম, বোম্বে; কয়ালি রিফাইনারি, গুজরাট; মাদ্রাজ-রিফাইনারি, মাদ্রাজ; বারুনি রিফাইনারি, বারুনি; গৌহাটি রিফাইনারি, গৌহাটি; হলদিয়া রিফাইনারি, হলদিয়া। বিশেষত্ব হল যে—ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে এই সব রিফাইনারির ন্যাপ্থা হলদিয়ায় দিতে পারছে না। তাদের উদ্বৃত্ত কিছুই থাকছে না; আঞ্চলিক চাহিদা মেটাতেই সব নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং হলদিয়া রিফাইনারি থেকে যতটা ন্যাপ্থা মিলছে তাতে কতটা যোগান সম্ভব হবে তার উপরই বিবেচনা করতে হবে।

ইথিলিন ন্যাচারেল গ্যাস (natural gas) থেকেও মিলে; বরং সেটাই ভাল। কিন্তু এখানে ন্যাচারেল গ্যাস নেই; এর উপর প্ল্যান্ট দাঁড় করাতে হলে সবটাই বাইরের থেকে আমদানি করে নিতে হবে। এই সব বিবেচনার পর হলদিয়ায় ন্যাপ্থা ক্র্যাকারের (cracker) প্ল্যান্টই উত্তম বলে স্থির হয়েছে।

ইথিলিনের জন্যে অন্য সূত্র হিসাবে স্পাইক্ড ক্রুডের কথাও (spiked crude) ভাবা যেতে পারে। এটি ক্রুড অয়েল অফ ন্যাপ্থার মিশ্রণ। মিডিল ইষ্ট কানট্রিতে (Middle East Countries) মাঝারি দামে এগুলি পাওয়া যায়। একে পাতিত করে ন্যাপ্থার পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়া পেট্রোলিয়ামের ভারি অংশ যেমন গ্যাস অয়েল (gas-oil), ওয়াক্সি ডিষ্টিলেট (waxy distillate) এবং ক্রুড অয়েল (crude oil) থেকেও অলিফিন পাওয়া যায়।

মন্তব্য—হলদিয়া রিফাইনারি থেকে যে ন্যাপ্থা পাওয়া যাবে তার কিছুটা দুর্গাপুর ফার্টিলাইজার প্রজেক্টের জন্যে লেগে যাচ্ছে। তারপর বাকি যা পড়ে থাকবে, তা দিয়ে একটা প্ল্যান্ট হবে কিনা তা নিয়েই সংশয়। কেউ কেউ বলেন এই পরিমাণ ন্যাপ্থা মোটেই যথেষ্ট নয়। আমদানি

অত্যাবশ্যক। আবার কেউ কেউ মনে করেন হলদিয়া রিফাইনারি পুরোপুরি কার্যকরী হলে এর থেকে যে ন্যাপ্‌থা হবে তা দিয়ে অন্তত 60 কোটি টাকার প্রকল্প মত পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যাণ্ট হতে পারবে, তবে ঐ পরিমাণ ন্যাপ্‌থা পেট্রো-কেমিক্যাল চেয়ারম্যান ডঃ এস বরদারঞ্জন যে 600 কোটি টাকা প্রকল্পের কথা জানিয়েছিলেন, তার কাছে খুবই নগণ্য হবে। অন্তত অবস্থা যা তাতে তিন লক্ষ টন ন্যাপ্‌থা ক্র্যাকারের একটা প্ল্যাণ্ট হতে অন্তরায় খুব একটা কিছু থাকতে পারে না। তাছাড়া ন্যাপ্‌থা যদি কিছু আমদানি করতেও হয় তবুও ক্ষতির ভয় কম। এতে যে সব পদার্থ উৎপন্ন হবে তাদের রপ্তানি থেকে যে আয় হবে, তা দিয়ে ন্যাপ্‌থা আমদানি করলে যে খরচ হবে তার চেয়ে বেশি হওয়ার কথা। সব দিক বিবেচনা করলে হলদিয়ায় একটা ন্যাপ্‌থা ক্র্যাকার প্ল্যান্টের প্রয়োজন আছে।

এদেশে অবহেলিত গণিত শিক্ষা।

শ্রীরতনমোহন খাঁ*

এক সময় বলা হত "গণিত হল সভ্যতার দর্পণ"। সেযুগে গণিতের ছিল যথেষ্ট কদর, ছাত্র-ছাত্রীদের ছিল গণিতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ এবং সমাজে ছিল গণিতজ্ঞের বিশেষ মর্যাদা। ফলে বহু মনীষীর সাধনায় গণিত সমৃদ্ধ হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে গণিতের সুষ্ঠু প্রয়োগে বিজ্ঞানের বহু শাখার অগ্রগতি হয়েছিল। কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয়ে মহাবিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে এসে গণিতে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা সবচেয়ে গৌরবের বলে মনে করত। আজ সেই পটভূমি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করা যায় "তুমি কি নিয়ে পড়াশুনা করতে চাও?" উত্তর হবে—পদার্থবিদ্যা, না হয় রসায়নবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্র, নয়তো কারিগরীবিদ্যা বা বাণিজ্য—এইরূপ কোন একটি। কোন ছাত্রছাত্রী বলবে না যে সে গণিতজ্ঞ হতে চায়। তাই, অন্য কোন বিষয়ে পড়াশুনা করার ছাড়পত্র না পাওয়ার ফলে অনিচ্ছা সহকারে কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী এখনও গণিত নিয়ে পড়াশুনা করে। কোন অভিভাবকও আজ আর তাঁর ছেলে-মেয়েদের গণিত নিয়ে পড়াশুনা করা পছন্দ করেন না। এমনকি গণিতের যাঁরা শিক্ষক তাঁরাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের গণিত নিয়ে পড়াশুনা করার জন্যে উৎসাহ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। গণিতের প্রতি এই উন্নাসিকতাই হল আজকের দিনে গণিত শিক্ষার প্রধান সঙ্কট। এই সঙ্কটের কারণ কি? উত্তর পেতে হলে তিনটি মূল কারণের দিকে লক্ষ্য করতে হবে—

(i) গণিতে উচ্চ শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের স্বল্পতা;

(ii) গণিতের পাঠ্যসূচীর অসম্পূর্ণতা;

(iii) গণিতশাস্ত্রে গবেষণালব্ধ মৌল কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা মর্যাদার অভাব।

সঙ্কটের গভীরতা উপলব্ধি করতে হলে উপরিউক্ত কারণগুলিকে একটু অনুধাবন করে দেখা যাক।

(i) একথা অনস্বীকার্য যে অন্যান্য শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষিতদের তুলনায় গণিতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে আজকের এই অর্থভিত্তিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের পরিধিও খুব সীমিত। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবেদনে প্রকাশ—গণিতজ্ঞদের কর্মসংস্থানের একমাত্র পথ শিক্ষকতা। আজ সমাজে যেখানে অর্থেরই একমাত্র কৌলিন্য, সেখানে এমন ক'জন আদর্শবান অভি-ভাবক পাওয়া যাবে যাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের

* গণিত বিভাগ, সিটি কলেজ, রামমোহন সরণি, কলিকাতা-700 009

গণিত নিয়ে পড়াতে চাইবেন আর ক'জন মেধাবী ছাত্রছাত্রী থাকবে যাঁরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে গণিত নিয়ে পড়াশুনা করে আত্মঘাতী হতে চাইবে? অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম হয়তো মেলে; কিন্তু তা খুবই যৎসামান্য।

(ii) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত গণিতের ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজনভিত্তিক বা কর্মভিত্তিক কোন জ্ঞানই প্রায় থাকে না। অন্যদিকে একজন ইঞ্জিনীয়ারের থাকে প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান। বাণিজ্য বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর থাকে কারবার ও হিসাব সংক্রান্ত জ্ঞান। আজকের দিনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সব বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন। ফলে গণিতবিদ্যায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি সমাজে আজ প্রায় কোন কাজেই লাগে না। একথা বলছি না যে, প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞান থাকলেই বেকারত্ব থাকবে না। তবে একথা তো মানতেই হবে যে প্রয়োজনভিত্তিক জ্ঞানে শিক্ষিত না হলে কর্মক্ষেত্রে সে জ্ঞানের তেমন কোন মূল্য নাই। এদিক থেকে উচ্চ শিক্ষায় গণিতের পাঠ্যসূচী অসম্পূর্ণ!

(iii) পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা,...... প্রভৃতির গবেষণালব্ধ ফলের বহুক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক মূল্য থাকে। গণিতের গবেষণায় সোজাসুজি এরূপ কোন মূল্যায়ন হয় না। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গণিতের গবেষণার উপর খুব একটা আগ্রহ নেই। বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের মৌল গবেষণার জন্যে আছে নোবেল পুরস্কারের মত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। গণিতের গবেষণাক্ষেত্রে এরূপ বা সমতুল্য তেমন কোন স্বীকৃতি না থাকায় ভাল ছাত্রছাত্রীরা গণিতের উপর গবেষণায় বিশেষ আকৃষ্ট হয় না। তাহলে এই সঙ্কট নিরসনের পথ কি? এর জন্যে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে গণিতের প্রতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উন্নাসিকতা দূর হয় এবং সাধারণ মানুষের কাছে গণিত তার স্বত মর্যাদা ফিরে পায়। এর জন্যে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর পর্যন্ত গণিতের পাঠক্রমকে নতুন করে বিন্যাস করতে হবে। পাঠ্যসূচীকে করতে হবে যুগোপযোগী; প্রয়োজনভিত্তিক বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে করতে হবে বর্জন। পাঠ্যসূচীর এক অংশ হওয়া উচিত তত্ত্বগত আর বাকি অংশ হবে প্রয়োজনভিত্তিক। বিশেষ করে স্নাতক পর্যায়ের অনার্স পাঠক্রম এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রম বহুমুখী ও কর্মমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ হিসাবে স্নাতক পর্যায়ের অনার্স পাঠক্রমের সূচীর কথা ধরা যেতে পারে। এই উপাধি লাভের জন্যে আটটি পত্রের পরীক্ষা দিতে হয়। এই আটটি পত্রের মধ্যে চারটি পত্রকে বিশুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় গাণিতিক তত্ত্বে সীমাবদ্ধ রেখে বাকি চারটি পত্রের মধ্যে প্রয়োজন-ভিত্তিক ও প্রয়োগমূলক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই চারটি পত্রে পদার্থ ও রসায়ন-বিদ্যার গাণিতিক বিশ্লেষণ, রাশিবিজ্ঞান, হিসাব শাস্ত্র, পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশ, কম্-পিউটার, ব্যাঙ্ক ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত গণিত, ইকোলজি, বায়োনিক্স প্রভৃতি বিষয়বস্তু উপযুক্তভাবে পরিবেশিত হতে পারে। এইভাবে বা আরো ভালভাবে পাঠ্যসূচী প্রণীত হলে গণিতের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মক্ষেত্রে অবজ্ঞেয় হবে না এবং অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়াও গণিতে গবেষণার জন্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সরকারের অনুদান নীতিকেও উদারচেতা হতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে, গণিতের গবেষণায় তাৎক্ষণিক মূল্য কম হলেও পরোক্ষ মূল্য অকল্পনীয়।

পরিশেষে একথাই বলব যে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি হোক এবং পাঠ্যসূচী এমনভাবে তৈরি হোক যাতে ছাত্রছাত্রীরা গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কর্মক্ষেত্রে গণিতজ্ঞরা অবহেলিত না হয় এবং সে সঙ্গে গণিতের চর্চা ও গবেষণা জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজের সহায়ক হয়।

কালাজ্বর আসছে

সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়*

সংবাদে প্রকাশ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে আবার কালাজ্বর আসছে। পশ্চিমবঙ্গে যদিও এখন পর্যন্ত কালাজ্বর ভীষণভাবে দেখা দেয় নি কিন্তু বিহারে প্রায় দু'হাজারের বেশি লোক প্রাণ দিয়েছেন। এবং উত্তর বিহারের বৈশালী, সীতামারি এবং সমস্তিপুর জেলার দু'লক্ষেরও বেশি অধিবাসী এই রোগের কবলে পড়েছেন। আমাদের দেশের ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদীর উভয় তীর বরাবর আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জেলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ এবং অধুনা বাংলাদেশ কালাজ্বরের স্বাভাবিক বাসস্থান হিসাবে পরিগণিত হত। বিগত কয়েক দশক পূর্বে কালাজ্বরের বিভিন্ন ফলপ্রদ ওষুধ ও হরেক রকমের কীট-পতঙ্গনাশক আবিষ্কার এবং প্রয়োগের ফলে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়ার মত কালাজ্বরও লোপ পেয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে এবং নিয়মিতভাবে কীট-পতঙ্গ নাশক ওষুধ ব্যবহার না করার জন্যে, মশা, মাছি প্রভৃতি পতঙ্গগুলির অতিবৃদ্ধির ফলেই বোধ হয় আবার কালাজ্বরের করাল ছায়া আমাদের দেশের উপর পড়েছে।

কালাজ্বর একটি ভয়ঙ্কর দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক রোগ। সাধারণভাবে সংক্রমণের এক থেকে তিন মাসের মধ্যে রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রচুর ঘামসহ অবিরাম বা সবিরাম জ্বর রোগের প্রথম লক্ষণ। এই অবস্থায় রোগী সমস্ত কাজকর্ম করতে পারে এবং খাওয়ার প্রতি তার তীব্র আসক্তি দেখা যায়। ক্রমে প্লীহা (spleen) এবং যকৃত (liver) বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্লীহা যকৃতের তুলনায় অনেক গুণ বড় হয়। যদি উপযুক্তভাবে চিকিৎসিত না হয়, তবে অপুষ্টির জন্যে দেহের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় এবং ভীষণভাবে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। দুর্বল রোগীর হাত, পা সরু প্যাকাটির মত দেখায়। মাথার চুল নীরস ও ভঙ্গুর হয়। প্লীহার অতিবৃদ্ধির ফলে পেট ঢাকের মত বড় হয়। গায়ের চামড়া শুষ্ক, খসখসে, কর্কশ হয়ে যায় এবং হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে (চিত্র 1)।

রোগীর হাতের, পেটের এবং পায়ের চামড়া অস্বাভাবিক কালো হয়ে জ্বর হওয়ার জন্যে একে সাধারণত কালাজ্বর বলা হয়। এভাবে রোগী ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয় এবং অবশেষে সে তার সমস্ত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এজন্যে প্রথম সংক্রমণের দু'বছরের মধ্যেই কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীর শতকরা 95 ভাগ নিউমুনিয়া, যক্ষা, আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক রোগ সময়মত ধরা পড়লে এবং উপযুক্তভাবে চিকিৎসিত হলে, রোগী সহজেই রোগমুক্ত হতে পারে।

কালাজ্বরের আক্রান্ত রোগীর প্লীহার কোমল অংশ (pulp) পরীক্ষা করে 1903 খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে লিশম্যান (Leishman) এবং মাদ্রাজে ডনোভ্যান (Donovan) প্রায় একই সময়ে মানুষের কালাজ্বর উৎপাদনকারী এককোষী পরজীবী প্রাণী আবিষ্কার করেন। পরে আবিষ্কারকের নামে এই পরজীবীর নামকরণ হয় লিশ্‌ম্যানিয়া ডনোভ্যানি (Leishmania donovani) এটি প্রটোজোয়া পর্বের ম্যাষ্টিগোফোরা (mastigophora) শ্রেণীর প্রাণী। লিশ্‌ম্যানিয়ার জীবনচক্রে দুটি পোষকের (host) প্রয়োজন। একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী মানুষ এবং অপরটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী বেলেমাছি

* আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা-700 004

(sandfly)। দুটি পোষক ছাড়া লিশ্‌ম্যানিয়ার **(Leishmania)** জীবনচক্র সম্পূর্ণ হতে পারে না। লিশ্‌ম্যানিয়া অ্যামিস্টোগোট (amistogote) দশায়

চিত্র 1
কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগী

মানুষের রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়েল **(reticulo-endothelial)** কোষের সাইটোপ্লাজমের **(cyto-plasm)** মধ্যে এবং প্রোম্যাষ্টিগোট **(promasti-gote)** দশায় বেলমাছির পাকস্থলীতে দেখা যায়।

নাম ভিসারেল লিশ্‌ম্যানিএসিস **(visceral leish-manasis)**। এ ছাড়া মানুষের প্রান্তীয় রক্ত প্রবাহের মধ্যে এবং কখন কখনও শ্বেত কণিকায় অ্যামিস্টোগোট দশায় লিশ্‌ম্যানিয়া দেখা যায় (চিত্র 2)।

লিশ্‌মানিয়া অ্যামিস্টোগোট দশায় ফ্লাজীলাহীন (flagella), উপবৃত্তকার বা গোলাকৃতি হয়। আয়তনে লোহিত-কণিকার প্রায় অর্ধেক। পরজীবী কোষের সাইটোপ্লাজম পাতলা ঝিল্লী **(membrane)** দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। দুটি নিউক্লিয় বস্তুর (nuclear substance) অপেক্ষাকৃত বড়টি গোলাকৃতি এবং একে কোষের ঝিল্লীর দিকে দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়স বস্তুটি দণ্ডাকৃতি, এর নাম কাইনেটোপ্লাস্ট (kinetoplast)। কাইনেটোপ্লাস্ট থেকে পরজীবী কোষের ধার পর্যন্ত একটি খুব সরু সুতোর মত বস্তুকে অ্যাক্সোনোম **(axonome)** বলে। অ্যাক্সোনোমের কাছে একটি কোষগহ্বর দেখা যায়।

অ্যামিস্টোগোট দশায় লিশ্‌ম্যানিয়া যুগ্ম বিভাজন পদ্ধতিতে ক্রমাগত বংশবিস্তার করে। ফলে একটি পোষক কোষ (host-cell) এর মধ্যে 50 থেকে 200 বা তার বেশি পরজীবী দেখা যায়। এর ফলে পোষক কোষের আয়তন খুব বেড়ে যায়। অবশেষে কোষ-আবরণী (cell-membrane) ফেটে অ্যামিস্টোগোট, পোষক-কোষ থেকে বেরিয়ে এসে রক্তস্রোতের সঙ্গে

চিত্র 2
লিসমানিয়া ডোনোভানির অ্যামাষ্টিগোট রূপের রেখাচিত্র

লিশ্‌ম্যানিয়া অ্যামিস্টোগোট দশায় মানুষের প্লীহা, যকৃত, বৃক্ক **(kidney)** অস্থি-মজ্জার **(bone-marrow)** রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়েল কোষের **(r. e. cell)** সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বাস করে অঙ্গগুলির বিকৃতি ঘটায়। এ জন্যে কালাজ্বরের বৈজ্ঞানিক

প্রবাহিত হওয়ার সময় নতুন নতুন পোষক-কোষে অনুপ্রবেশ করে সমগ্র রেটিকুলার এণ্ডোথিলিয়েল তন্ত্রকে সংক্রামিত করে।

কালাজ্বরে আক্রান্ত একজন মানুষ থেকে আর একজন সুস্থ মানুষের মধ্যে লিশ্‌ম্যানিয়া কি ভাবে

সংক্রামিত হয়, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত থাকলেও এটা মোটামুটি সবাই মনে করেন যে, ভারতবর্ষে লিশ্‌ম্যানিয়ার সংক্রমণের বাহন বেলেমাছি; যার বৈজ্ঞানিক নাম Phlebotomus argentipes.
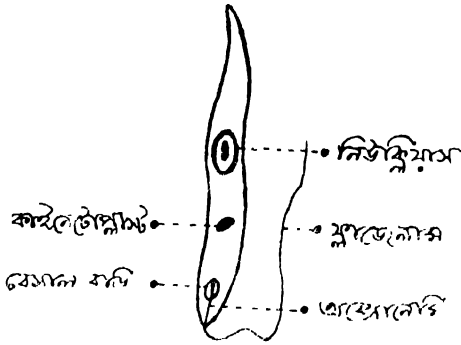
চিত্র 3
লিশম্যানিয়া ডোনোভানির প্রোম্যাষ্টিগোট রূপের রেখাচিত্র

খাদ্য হিসাবে বেলেমাছি যখন কালাজ্বরে আক্রান্ত কোন মানুষের রক্ত শোষণ করে, সেই সময় প্রান্তীয় রক্তস্রোতে প্রবাহিত অ্যামিস্টোগোট পর্যায়ের লিশ্‌ম্যানিয়া রক্তের সঙ্গে বেলেমাছির পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পাকস্থলীতে লিশ্‌ম্যানিয়া অ্যামিস্টো-গোট দশা থেকে প্রোম্যাস্টিগোট (promastigote) দশায় পরিবর্তিত হয় (চিত্র 3)। এই দশায় পরজীবী দৈর্ঘ্যে 5 থেকে 10 μ এবং প্রস্থে 2 থেকে 3 μ এবং দেখতে অনেকটা মাকুর (spindle) মত হয়। প্রোম্যাস্টিগোট কোষের মাঝখানে নিউক্লিয়াস এবং সামনের দিকে প্রস্থভাবে কাইনেটোপ্লাস্ট থাকে। পরজীবীর দৈর্ঘ্যের সমান বা বড় একটি সরু ফ্ল্যাজিলাম (flagellum) সামনের দিকে দেখা যায়।

লিশ্‌ম্যানিয়া বেলেমাছির পাকস্থলীতে, প্রোম্যাষ্টি-গোট দশায় যুগ্মবিভাজন পদ্ধতির দ্বারা একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি পরজীবীর সৃষ্টি হয়। এভাবে প্রোম্যাষ্টিগোট ক্রমাগত বংশ বিস্তারের ফলে, সংক্রমণের 6 থেকে 9 দিনের মধ্যে বেলেমাছির পাকস্থলীতে অসংখ্য প্রোম্যাষ্টি-গোট উৎপন্ন হয়। তখন ফ্ল্যাজিলাম (flagellum) যুক্ত পরজীবীগুলি খাদ্যনালীর সামনের দিকে অর্থাৎ গলবিল ও মুখবিবরের দিকে, ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে। এ অবস্থায় বেলেমাছি সুস্থ মানুষকে কামড়ালে রক্ত খাওয়ার সময় কিছু পরিমাণে প্রোম্যাষ্টিগোট ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। তারপর রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়েল কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। প্রোম্যাষ্টি-গোট রেটিকিউলো-এণ্ডোথিলিয়েল কোষের সাইটো-প্লাজমের মধ্যে ধীরে ধীরে অ্যামিস্টোগোট দশায় পরিণত হয়। এইভাবে লিশ্‌ম্যানিয়া দুটি পোষকের মাধ্যমে দুই আকৃতিতে বা দশায় জীবন-চক্র সম্পূর্ণ করে।

লিশ্‌ম্যানিয়ার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করে দেখা যায়, দুটি পোষকের মধ্যে সংক্রমণের ভাঁড়ার হচ্ছে সংক্রামিত মানুষ এবং সংক্রমণের বাহক বেলেমাছি। তাই সংক্রমণের প্রতিরোধের জন্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে বেলেমাছিকে আক্রান্ত রোগী এবং সুস্থ মানুষ থেকে এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে যাতে বেলেমাছি, সুস্থ এবং আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে আসতে না পারে। রোগ থেকে সুস্থ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্যে রোগীকে, আত্মীয়পরিজন এবং প্রতিবেশী থেকে যথাসম্ভব পৃথক করে রাখতে হবে। রোগীকে এমন একটা ঘরে রাখতে হবে যেখানে প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো এবং বাতাস ঢুকতে পারে। বেলে-মাছি আকারে মশার থেকেও ছোট, তাই এমন মশারি ব্যবহার করতে হবে যাতে মশারীর ভেতর কোন রকমেই বেলেমাছি ঢুকতে না পারে। আক্রান্ত রোগীকে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসক দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সহজেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক লক্ষণ প্রায় টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়া

জ্বরেরই মত। তাই উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা রোগীকে যথাবিধি পরীক্ষার পরেই চিকিৎসা করা উচিৎ। এছাড়া পূর্বে যে সমস্ত কালাজ্বরের ফলপ্রদ ওষুধ বাজারে বিক্রয় হত, সেই সব ওষুধ যাতে সহজলভ্য হয় তার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেলেমাছি, অন্ধকারে, ভিজে সেঁতসেঁতে জায়গায়, ঘরের দেয়াল ও মেঝের ফাঁক-ফোঁকরে, নোংরা আবর্জনাপূর্ণ ঝোপ-ঝাড়ে থাকতে ভালবাসে এবং সেইখানেই ডিম পাড়ে। তাই বেলেমাছিকে সমূলে নির্মূল করার জন্যে ঘরের মেঝের, দেয়ালের ফাঁক-ফোকর এবং নোংরা যাতে না থাকে সেই দিকে নজর দিতে হবে। বাড়ির আশেপাশের সমস্ত আগাছা, জঙ্গল পরিষ্কার করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে বাড়ি ও বাড়ির আশে-পাশে প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো এবং বাতাস ঢুকতে পারে। এছাড়া কীট-পতঙ্গনাশক ওষুধ ডি. ডি টি প্রচুর পরিমাণে ছড়াতে হবে বাড়ি ও বাড়ির আশে-পাশে যাতে করে বেলেমাছি ডিমসহ সমূলে ধ্বংস হয়।

যদি রোগের বাহক বেলেমাছিকে সমূলে ধ্বংস করে, সুস্থ মানুষকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হওয়া যায় এবং সুচিকিৎসার মাধ্যমে আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করে সংক্রমণের ভাঁড়ারকে শূন্য করতে পারা যায়, তবে সেটাই হবে আগামী দিনের মহামারী কালাজ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবার নিশ্চয়তা !

মগজের অন্তঃপুরে

শঙ্কর চক্রবর্তী*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটি ঘটনা। আমেরিকার হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের ডাঃ পল ইয়াকভলেভ বোস্টনের কাছে একটি মানসিক রোগের হাসপাতালে এক বিকেলবেলা রাউণ্ড দিচ্ছিলেন। হঠাৎ দুটি মহিলা রোগীর দিকে তাঁর নজর পড়ল। নজরে পড়ার মত হয়ত বিশেষ কিছুই ছিল না। একটি রোগী শুয়ে রয়েছে, অন্যজন শান্তভাবে তার বিছানার পাশে বসে চামচ দিয়ে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে।

এগিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন ডাঃ ইয়াকভলেভ। যে রোগিণী খাইয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ তার কেসটির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। মহিলাটির বয়স সাঁইত্রিশ এবং এমন এক স্নায়বিক রোগে সে ভুগছিল যে চলে ফিরে বেড়ানোও তার পক্ষে ছিল খুবই কষ্টদায়ক। পরিষ্কারভাবে কথাও সে বলতে পারত না। ডাঃ ইয়াকভলেভের আরো মনে পড়ল সেদিনই সকালবেলা তিনি ঐ মহিলাটিকে খাবারের ঘরে দেখেছেন, একজন নার্স তাকে খাইয়ে দিচ্ছিল। এই রোগীটির নিজের হাতে খাওয়ার কোন ক্ষমতাই ছিল না। যতবারই সে খেতে চেষ্টা করত, তার হাত এমনভাবে কাঁপত খাদ্যবস্তু নিজের মুখের কাছে তুলে ধরতেও পারত না। অথচ এই মুহূর্তে সেই রোগীটিই কি পরিপাটিভাবে আর একটি রোগীকে নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাটি দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হতে পারে। জানা গেছে, এই রহস্যের আস্তানা মানুষের স্নায়ুকেন্দ্র বা মগজের অন্তঃপুরে।

* 289, 'সি' ব্লক, বাপুজীনগর, কলিকাতা-700032

আমাদের ঐ মানসিক রোগীটির ব্যাধি তার মগজের একটি অংশকে নিয়ে, যার নাম 'বেসাল গ্যাংলিয়া'—এ একটি ধূসরবর্ণের স্নায়ুকোষের সমষ্টি। যেসব কাজ আমরা প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে করি, যেমন হাঁটা, বসা, খাওয়া ইত্যাদি, তাদের সুনির্দিষ্ট করার কাজ যেমন 'বেসাল গ্যাংলিয়া'র, তেমনি মানুষ ও তার মনের অন্তঃপুরের মধ্যে যোগাযোগ সাধন এবং ব্যক্তিগত অন্তর্জীবনের তত্ত্বাবধান করাও হল এর কাজ। নিজেকে চেনার কাজে এই অংশটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অহংবোধের মূলেও এই স্নায়ুর প্রভাব। মগজের এই অংশটি অসুস্থ হওয়ার ফলেই ডাঃ ইয়াকভলেভের রোগিণী নিজের হাতে খেতে পারছিল না, তার অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজগুলিও সঠিকভাবে করতে পারছিল না। কিন্তু তার মগজের সবচেয়ে উন্নত অংশ যে কর্টেক্স, যার অন্যতম কাজ ব্যক্তিমানুষ ও তার বাইরের জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে—তা ছিল অক্ষুণ্ণ; তাই আর একজন রোগীকে খাইয়ে দিতে তার কোন বেগ পেতে হয় নি। যুদ্ধের সময় নার্সদের সংখ্যা ছিল কম, তাই একই ধরণের মানসিক রোগে ভোগার জন্যে যে সব রোগী নিজের হাতে খেতে পারছিল না, তাদের একে অপরকে খাইয়ে দিতে উৎসাহিত করা হল।

মানুষের আরো অনেক অদ্ভুত আচরণের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মূলে রয়েছে মগজের কোন না কোন অংশের অসুস্থতা। বিলেতের কোন হাসপাতালে একটি মেয়ে এসে একদিন জানাল, তার গোটা বাঁ হাতটাই নাকি তার নিজের নয়। সে নাকি তার ঐ হাতটিকে কুড়িয়ে পেয়েছে তার ঘরে এবং পরে সেলাই করে নিয়েছে তার দেহের সঙ্গে। তার আসল বাঁ হাতটা কোথায় গেল, এই প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি বলল, ছোটবেলায় সেটি সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। সাধারণ বিচারে মেয়েটিকে বিকৃতমস্তিষ্ক মনে হলেও এই অস্বাভাবিক আচরণের সূত্রকে খুঁজতে হবে মগজের 'কর্টেক্স' অংশে।

স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া—পরিচিত মানুষ। পথে দেখা হল, কথাবার্তাও হল অথচ কিছুতেই নামটা মনে করা গেল না। এরকম সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ আমাদের অনেকেরই হয়। কিন্তু মগজের মধ্যে স্মৃতির কোন একটি বিশেষ এলাকা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ার ঘটনাও বিরল নয়। এধরণের একটি রোগীর চোখের সামনে একটি চাবির গোছা ধরা হল, কিন্তু কিছুতেই সে বলতে পারছে না, জিনিষটা কি। অর্থাৎ চোখে দেখে কোন একটি বস্তুকে চেনার ক্ষমতা সে হারিয়ে বসে আছে। কিন্তু যেই চাবির তোড়াটা বাজানো হল, সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, "ওহো, ওটা তো চাবি!" কানে শুনে চেনার ক্ষমতা সে কিন্তু হারায়নি।

এরকম আর একটি রোগীর কাছে বর্ণমালার 'অ' অক্ষরটি বড় করে কাগজে লিখে তার চোখের সামনে ধরা হল। কাগজটা নাড়াচাড়া করে এদিক ওদিক তাকিয়ে লোকটি মাথা নেড়ে বলল, অক্ষরটি সে পড়তে পারছে না। এবার রোগীর আঙুলটি ধরে অক্ষরটি বোলাতেই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এবার চিনতে পেরেছি—অক্ষরটি 'অ'। এমনিভাবে আরো কয়েকটি অক্ষর লিখে রোগীটির সামনে ধরা হল। দেখা গেল, চোখে দেখে নয়, যদি তাকে অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল বোলাবার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে সে খুব ছোট ছোট অক্ষরও চিনতে পারছে এবং সম্পূর্ণ এক একটি বাক্য পড়তেও তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। একটি কমলালেবুর দিকে তাকিয়ে সে কিছুতেই চিনতে পারছে না জিনিষটা কি, কিন্তু হাতে নিয়ে যেই ফলটির গন্ধ তাকে শুঁকতে দেয়া হল, অমনি সে বলে উঠল, " আরে এতো কমলা!"

চোখে দেখে, কানে শুনে, বই পড়ে, প্রশ্নের

মাধ্যমে, বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করে—নানাভাবে সারাজীবন ধরে আমরা কত অভিজ্ঞতাই অর্জন করে চলি। এই সমগ্র অভিজ্ঞতার স্মৃতি মগজের বিভিন্ন এলাকায় কিভাবে সঞ্চিত হয়ে থাকে, তা স্নায়ুবিজ্ঞানীদের কাছে আজও এক পরম বিস্ময়। তার মধ্যে কোন এলাকায় বিপর্যয় দেখা দিলেই ঘটে জীবনযাত্রার ছন্দপতন। মগজের সবচেয়ে উন্নত ও চিন্তাশীল অংশ কর্টেক্সের যেমন স্মৃতি এলাকা রয়েছে, তেমনি তার 'মোটর' বা চালক অংশের মধ্যেও রয়েছে স্মৃতির এলাকা। এই চালক অংশের কোন এলাকা আহত বা রোগগ্রস্ত হলে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে অঙ্গসঞ্চালনে মানুষ অপারগ হয়ে ওঠে। হয়ত জুতোর ফিতে বাঁধার মত একটি সহজ কাজ সে কিছুতেই করে উঠতে পারছে না, হয়তো ছুঁচের মধ্যে সুতো ভরতেও পারছে না, কলম দিয়ে লেখার কাজেও অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে।

উচ্চ মননশীল স্নায়বিক ক্রিয়ার ছন্দপতনের একটি লক্ষণ হল কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এ ধরণের অক্ষমতার মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এরকম একটি রোগী 'পাঁচ' ও 'সাত' এই সংখ্যা দুটি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারলেও 'সাতান্ন' সংখ্যাটি আর কিছুতেই উচ্চারণ করে উঠতে পারছিল না। একজন রোগী একই কথা বারে বারে বলে চলেছে, যদিও সে কথাটি সে আদৌ বলতে চায় না; অথচ যে কথা সে বলতে চাইছে, সেগুলোকে আর কিছুতেই সাজিয়ে উঠতে পারছে না। একজন লোক অনেক কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। সেক্সপীয়রের রচনা থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে তার স্মৃতিশক্তি কখনো দুর্বল হতে দেখা যায় নি। একটি পদও ভুল না করে সে অনেক গানও গাইতে পারত। কিন্তু ঐ একই শব্দ বা কথাগুলোকে সে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার মধ্যে কিছুতেই ব্যবহার করতে পারত না।

আশ্চর্য জটিল এক যন্ত্র—বিচিত্র এই মানুষের মগজ। এক জটিল আবর্তের মত এ আমাদের সমগ্র জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চিন্তা, স্মৃতি ও মননের কেন্দ্র। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ—দেখা, শোনা, চলাফেরা, শ্বাসক্রিয়া, রক্তসংবহন, খাদ্যবস্তুর পাচন, শরীরে দূষিত পদার্থের নিষ্ক্রমণ, প্রতিটি ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হল ঐ মস্তিষ্ক। আমাদের চেতন মনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই আমাদের মগজ দেহযন্ত্রের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপকে অতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, মিটিয়ে চলেছে তাদের যত কিছু প্রয়োজনকে।

প্রায় দু'হাজার কোটি স্নায়ুকোষের সমবায়ে তৈরি মানুষের মগজের ওজন তিন পাউণ্ডের মতো এবং মাথার খুলির মধ্যে এর আয়তন হল পনেরশ থেকে ষোলশ ঘন সেন্টিমিটারের মতো। স্নায়ুকোষের মধ্যে সবচেয়ে বড় যারা, তাদের ব্যাস হল প্রায় এক সেন্টিমিটারের পাঁচ হাজার ভাগের একভাগ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে একটি স্নায়ুকোষের চেহারা দেখাবে ঝাঁকড়া মাথা-ওয়ালা একটি গাছের মতো। আগে ধারণা ছিল স্নায়ুরা মোটামুটি অনড়, অচল, অবস্থাতেই থাকে; কিন্তু বর্তমানে ধারণাটা পালটেছে। কোন বিষয় লেখা বা পড়ার সময় লেখক ও পাঠক উভয়েরই মগজের স্নায়ুগুচ্ছেরা বাত্যাবিক্ষুব্ধ বৃক্ষশাখার মতো আন্দোলিত হতে থাকবে।

আশ্চর্য ব্যাপারটা হল এই, বিপুলসংখ্যক স্নায়ুকোষেরা যদিও স্বল্প একটি জায়গার মধ্যে জড়ো হয়ে রয়েছে, এদের পরস্পরের মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই—এক অতি সূক্ষ্ম মাপের ব্যবধান বিরাজ করছে, যাকে বলা হয় সাই-ন্যাপ্‌স্। এ যেন এক বাধার প্রাচীরের মতো, স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবাহ যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বাধাকে অতিক্রম করার মতো জোরালো মাপের

হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ মগজের অন্তঃপুরে প্রবেশের ছাড়পত্র তার মিলবে না।

মগজের বাসস্থান একটি অস্থি নমনীয় দণ্ডের ওপরে, যাকে আমরা বলি মেরুদণ্ড—ছ'ফুট লম্বা লোকের ক্ষেত্রে যার দৈর্ঘ্য হল এক গজের মতো। মেরুদণ্ডকে বলা হয় নিম্নমস্তিষ্ক। মেরু-দণ্ডের ওপরের তিন ইঞ্চি পরিমাণ অংশকে বলে ব্রেনষ্টেম; এর ওপর মধ্যমস্তিষ্ক। মধ্য-মস্তিষ্কের নিচে দু'পাশে হল সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক—আমাদের চলা, বসা, ভারসাম্য বজায় রাখা, সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হল যার কাজ। তার ওপরে সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক। এই গুরুমস্তিষ্কের ওপরের অংশ সেরিব্রাল কর্টেক্সরূপেও মস্তিষ্কের চরম উৎকর্ষ পর্যায়ে পরিণতি লাভ করেছে।

প্রতি মুহূর্তেই আমাদের শরীরের কিছু অংশের ক্ষয় ঘটছে, আবার কিছু অংশ নতুন করে জন্মাচ্ছে। দেখা গেছে প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ লক্ষ রক্তের লোহিত কণিকার মৃত্যু ঘটছে, আবার সমপরিমাণ লোহিত কণিকা তৈরি হচ্ছে। এই মৃত্যু ও নবজন্মের পালা চলেছে শরীরের সর্বত্র, এমনকি অস্থিমজ্জার মধ্যেও। প্রমাণিত হয়েছে, প্রতি সাত বছরে আমাদের শরীরের সমগ্র বস্তুর পুনর্জন্ম ঘটে। অর্থাৎ কিনা, সাত বছর পূর্বের একটি জীবকোষকেও এই নতুন শরীরে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জীবকোষ বা রক্তের লোহিত কণিকাদের মতো স্নায়ুকোষদের কিন্তু পুনর্জন্ম ঘটে না। তাদের ক্ষেত্রে শুধু ক্ষয়ের পালা। জন্মাবার পর থেকেই খুব ধীর গতিতে মগজের কিছু কিছু অংশের মৃত্যু শুরু হয়ে যায়। যে সব স্নায়ুকোষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাদের মৃত্যু শুরু হয় সকলের আগে। স্বাদগ্রহণের স্নায়ু-কোষদের পালা শুরু হবে এর পরে। এই অবক্ষয়ের গতি এত মন্থর যে, কয়েক দশক আগে ছাড়া এর কোন লক্ষণই প্রকাশ পাবে না।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবক্ষয়ের মাত্রা বেড়ে যায়। সত্তর বছর বয়সে একটি মানুষের মগজের ওজন সাত আউন্সের মতো কমে যেতে পারে মগজের মধ্যে বহুলক্ষ স্নায়ু-কোষের মৃত্যু যার দ্বারা সূচীত হচ্ছে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মগজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কমে আসে। আইনষ্টাইন তাঁর মূল গবেষণার মূলসূত্রগুলো উদ্ভাবন করেন পঁচিশ বছর বয়সে কিন্তু তার পরিণতি ও বিকাশ তাঁর পরবর্তীকালের বহু দশকব্যাপী চিন্তা ও সাধনার ফল।

কর্টেক্স—গুরুমস্তিষ্কের দুই অংশের ওপর একটি আস্তরণের মতো ছড়ানো রয়েছে কর্টেক্সের ধূসরবর্ণের স্নায়ুকোষ, মস্তিষ্কের সবচেয়ে উন্নত কেন্দ্র হল যেটি। বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে প্রায় আধুনিক কালেই যে অংশটি গড়ে উঠেছে বলা যায়। এর বয়েস হল দশ কোটি বছরের মতো। জটিলতার বিচারে কর্টেক্সের সঙ্গে পৃথিবীতে আর কোন যন্ত্রেরই তুলনা চলে না। স্বল্প পরিসরের মধ্যে জায়গা করে নেবার জন্যে একটির পর একটি ভাঁজের আকারে একে গড়ে উঠতে হয়েছে। এর বহু এলাকাই এখনো অনাবিষ্কৃত ও দুরধিগম্য।

আমাদের দেখা, শোনা, স্পর্শানুভূতি প্রভৃতি প্রতিটি কাজের জন্যে কর্টেক্সে এক একটি এলাকা নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। কোন প্রত্যঙ্গ থেকে স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবাহ স্নায়ুর মাধ্যমে কর্টেক্সে নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছতে গিয়ে কখনো ভুল জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। মনে করা যাক, কোন গান শুনছি, উত্তেজনা প্রবাহ কর্টেক্সের শ্রবণ কেন্দ্রে না পৌঁছে দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছে

গেল। এ যেন অনেকটা টেলিফোনের ক্রস-কানেকসনের মতো—একটি লাইনের বিদ্যুৎস্রোত আর একটি লাইনে পৌঁছে বসে আছে। সঙ্গীতের মূর্ছনাকে কানে না শুনে, তখন আমরা চোখে দেখব আলোর ঝলকানির উত্তাল তরঙ্গের মতো। টেলিফোনের লাইন মেরামত করার মতো মগজেরও তখন কিছুটা মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়বে আর কি।

প্রতিবর্তন চক্র (রিফ্লেক্স আর্ক)—মনে করা যাক, হাতের ওপর একটি মশা এসে বসেছে। হাত থেকে জ্ঞানদা (সেন্সরি) স্নায়ুতন্ত্রী মাধ্যমে উত্তেজনাপ্রবাহ মেরুদণ্ডে পৌঁছল, সেখান থেকে নির্দেশ নিয়ে উত্তেজনা প্রবাহ মোটর বা চালক স্নায়ুতন্ত্রীকে সচল করে তুলল—আমরা হাত দিয়ে মশাটা মারলাম। এ হল একটি সাধারণ প্রতিবর্তন-চক্র। এই কাজটুকুর জন্যে কর্টেক্সের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। আমরা হয়ত একটি বই পড়তে পড়তেও কাজটা করতে পারতাম।

কোন আলো যদি ধীরে ধীরে আমাদের চোখের কাছে নিয়ে আসা হয়, তাহলে চোখের তারাকে আমরা ছোট করতে বাধ্য হই। এখানে প্রতিবর্তন-চক্রটা সম্পূর্ণ করার জন্যে মগজের আর একটু উচ্চতর পর্যায় মধ্যমস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়েছে। একটি নতুন বিষয়কে অধিগত করা বা কোন জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রতিবর্তন-চক্রকে সম্পূর্ণ হতে হবে মগজের সবচেয়ে উন্নত পর্যায় কর্টেক্সের মধ্য দিয়ে। সোজা কথায়, সমস্যার জটিলতা যত বাড়বে, ততই মগজের উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের কাছে হাত পাততে হবে।

যে সব প্রতিবর্তন প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়, তাদের আমরা বলি আনকণ্ডিশনড রিফ্লেক্স। এদের বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে বাঁচাই সম্ভব নয়। তেমনি বেশ কিছু প্রতিবর্তকে মানুষ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে, যাকে আমরা বলি কণ্ডিসন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স, যে বিষয়ে পাভলভের যুগান্তরকারী গবেষণায় মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে।

আবেগ বা উত্তেজনার উৎস : হাইপোথ্যালেমাস—ব্রেনষ্টেম, যা মেরুদণ্ডের সঙ্গে মগজের উচ্চতর পর্যায়ের যোগাযোগ সাধন করছে—তাই হল আমাদের কতকগুলো প্রধান উত্তেজনা বা আবেগের উৎস। ব্রেনষ্টেমের মাথায় হল হাইপোথ্যালেমাস, যার আয়তন গোটা মগজের প্রায় 1/300 ভাগ মাত্র। কিন্তু ওই ছোট জায়গাটুকুর কাণ্ডকারখানাই আমাদের আবেগ সৃষ্টির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, নিদ্রা এবং জাগরণের চক্র—এদের মাত্রা এবং পারস্পরিক সমন্বয়সাধন হল এর কাজ। শরীরের জীবকোষেরা যে তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে, এ তার জোয়ার-ভাটার বেগ নির্ণয় করে থাকে, যার ফলে যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, আমাদের দৈনন্দিন ক্ষয়কে তা পূরণ করতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা এবং শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রাও এ নিয়ন্ত্রণ করে; শরীরের রাসায়নিক পদার্থগুলো ভেঙ্গে ফেলা বা সংশ্লেষের কাজ তদারকির দায়িত্বও হল এর। এর কাজ হল অনেকটা প্লেনের পাইলটের মতো, প্যানেলে বসানো যন্ত্রপাতিগুলোর কলকাঠি নড়াচড়ার ওপর যাকে সবসময়ে নজর রাখতে হচ্ছে। একটি কাজ করার জন্যে যে বাড়তি শক্তি, তাও এ যুগিয়ে থাকে। আমাদের রাগ, হর্ষ, বিষাদ সবকিছুর মূলেও এর ভূমিকা।

হাইপোথ্যালেমাস অঞ্চল রুগ্ন হলে তার পরিণতি কি বিচিত্র হয়, লণ্ডনের ন্যাশনাল হাসপাতালের ডাঃ জে. মার্টিন একবার একটি

রোগীর ঘটনায় তা প্রত্যক্ষ করেন। নিজের মায়ের মৃতদেহ যখন কবরস্থ করা হচ্ছে, তখন সে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়তে থাকে। নিতান্ত বিব্রতচিত্তে সে তাড়াতাড়ি সমাধিক্ষেত্র থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়, কিন্তু তখনো তার হাসির বেগ ক্ষান্ত হয়নি। কিছুদিন বাদে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে তার মৃত্যু ঘটে।

আমাদের আবেগ অনুভূতির বহুধাবিচিত্র যে প্রকাশ, তার সবটাই হাইপোথ্যালেমাসের এক্তিয়ারভুক্ত, এটা ঠিক নয়। এখানকার সংকেতগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্টেক্সে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ তা পুরোপুরি অর্থবহ হয়ে ওঠে না। সব ঘটনা-স্রোত কর্টেক্সেই অনুভূতির অতিসূক্ষ্ম আলো-ছায়ার খেলায় মায়াময় হয়ে ওঠে।

উত্তেজনা এবং আবেগের কারবার হল কর্টেক্সের সবচেয়ে পুরনো অংশগুলোকে নিয়ে, যারা বহুকাল পূর্বে বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে সব প্রাণীর মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। এই অংশগুলোকে নিয়ে হল প্রত্ন মস্তিষ্ক যার আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অনেক সময়েই অতি স্থূলভাবে। এর কাজের ওপর খবরদারী করার জন্যে গড়ে উঠেছে কর্টেক্সের নব্য বা সবচেয়ে আধুনিক অংশ। খুব বন্য এবং উগ্র প্রকৃতির বানরকে অপারেশন করে তার মগজের দু'পাশের কর্টেক্সকে সরিয়ে ফেলার পর দেখা গেছে, প্রাণীগুলো শান্ত হয়ে ওঠে বটে কিন্তু ওদের যৌন আবেগ বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে। মৃগী-রোগের চিকিৎসায় মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরণের অপারেশন করে রোগীর যৌন আবেগ প্রচণ্ডমাত্রায় বেড়ে উঠতে দেখা গেছে। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের যে কোন আবেগের বহিঃপ্রকাশের ওপর কর্টেক্সের খবরদারীর প্রয়োজন কতটা বেশি।

মগজের প্রতিরক্ষা—দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে যে বিপুল পরিমাণ উত্তেজনা প্রবাহ প্রতি মুহূর্তে স্নায়ুপথে মগজে পৌঁছোবার চেষ্টা করছে, তার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যদি এক সেকেণ্ডের সহস্রভাগের একভাগ সময়ের জন্যেও, কর্টেক্সে পৌঁছতে পারতো, আমরা সবাই পাগল হয়ে যেতাম। ব্রেনস্টেম-ই দুর্ঘটনার হাত থেকে মগজকে রক্ষা করছে। এ যেন দ্বাররক্ষকের মতো প্রয়োজনের তাগিদ অনুযায়ী শত সহস্র উত্তেজনা প্রবাহের মধ্যে কোন একটিকেই ওপর মহলে পৌঁছোবার ছাড়পত্র দিচ্ছে।

বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে আনুমানিক প্রায় দশ কোটি উত্তেজনা প্রবাহ প্রতিদিন প্রতি সেকেণ্ডে স্নায়ুকেন্দ্রের দরজায় হানা দিচ্ছে। মেরুদণ্ডই বেশিরভাগ সংকেতের সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যারা ওপরের এলাকায় পাড়ি জমায়, তাদের মধ্যে মাত্র একশটি সংকেত, অর্থাৎ দশ লক্ষের মধ্যে মাত্র একটিই কর্টেক্সের সর্বোচ্চ অংশে গিয়ে পৌঁছয়। তার মধ্যে মাত্র আবার অল্প কয়েকটি সংকেত নিয়েই আমরা শেষ পর্যন্ত মাথা ঘামাব।

স্মৃতি—বই পড়ে, কাজের মধ্য দিয়ে এবং আরো নানাভাবে আমরা জীবনে যা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তার কিছুই হারিয়ে যায় না—স্মৃতির কোঠায় জমা পড়ে। তা না হলে আমাদের রোজ নতুন করে সবকিছু শিখতে হত। বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, জুতোর ফিতে বাধা, একটি ডিমকে হাত দিয়ে তোলার সময় তার ওপর কতটুকু চাপ প্রয়োগ করতে হবে—সে বিষয়ে খেয়াল রাখা, একটি অধীত বইয়ের কোন বিশেষ অংশ, সবই স্মৃতির আকারে মগজে জমা থাকে।

এই স্মৃতি অনেক সময়ে এক বিচিত্র খেলায় মেতে ওঠে। কোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আট ঘণ্টা ধরে কোম্পানীর বোর্ডের

সভা পরিচালনা করে ঘরে ফিরে এসে মাত্র আধ ঘণ্টা বাদে তাঁর সেক্রেটারীকে বলছেন, "মনে হচ্ছে, আমার ডিরেক্টর বোর্ডের একটি সভায় যাবার কথা ছিল"। স্বল্পকাল আগে যে ঘটনাটিতে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তার কথাই তিনি বেমালুম ভুলে বসে আছেন। এই যে স্বল্পকালীন স্মৃতি, মগজের মধ্যে তা যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের ছোট একটি চক্রের মত কাজ করে—এ যেন নাগরদোলার মতো ছোট একটি জায়গার মধ্যেই ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলার মত ব্যাপার। নাগরদোলার আবর্তন যেই বন্ধ হল, অমনি মগজ অন্য একটি বিষয়ের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করবে, স্বল্পকালীন পূর্বের স্মৃতিটার যেন আর অবশেষ মাত্র নেই।

দীর্ঘকালীন স্মৃতি হঠাৎ একটি ঘটনাসংঘাতে কিভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে, বেশ কয়েক বছর আগে, তার একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। জন ব্যারিমোর তখন আমেরিকায় বালটিমোরে হ্যামলেটের অভিনয় করছিলেন। একদিন অভিনয়ের পর নাইট ক্লাবে এসে নাচ শুরু করেছেন, হঠাৎ একটি স্পট্ লাইট নাচের ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে ধীরগতিতে ঘুরতে ঘুরতে তার ওপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিমোর নাচ থামিয়ে অভিনয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর হ্যামলেটের 'টু-বি-অর-নট-টু-বি" ভাষণটির এক অনবদ্য রূপায়ণে সবাই মুগ্ধ হয়ে উঠল।

সম্মোহন ও স্মৃতি—চোখের মাধ্যমে বাইরের জগতের শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগ উত্তেজনা প্রবাহ আমাদের মগজে পৌঁছয়। মগজে প্রতিটি বস্তুর প্রতিবিম্ব যেভাবে জমা পড়ে, সাধারণ ছবির সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না—অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের ফর্ম ও টেকনিকের সঙ্গেই তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে বেশি।

তথ্যকে স্মৃতির আকারে ধারণের ক্ষমতা মগজের কি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিজ্ঞানীর একটি আশ্চর্য পরীক্ষায় সেটি ধরা পড়ে। একটি রাজমিস্ত্রীকে সম্মোহিত করে তিনি পরীক্ষাটা শুরু করেছিলেন। সম্মোহিত অবস্থায় মানুষের অবচেতন মনের বহু পুরনো দিনের স্মৃতিকে যে নিখুঁতভাবে উদ্ধার করা যায়, যেটা অস্বাভাবিক অবস্থায় কোনমতেই সম্ভব হয় না—এই পরিচিত তথ্যটিকেই তিনি বিচার করে দেখতে চাইছিলেন।

রাজমিস্ত্রীটি দশ বছর আগে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গথিক প্যাটার্নের বিশাল বাড়ীটির দেয়াল তৈরির কাজ করেছিল। একটি দেয়ালে একটি বিশেষ জায়গার একটি বিশেষ ইঁটের বিবরণ তার কাছ থেকে চাওয়া হল। কয়েক মুহূর্ত বাদে সে উত্তর দিল—ইঁটটা ভাটিখানায় একটু বেশি পুড়েছিল এবং ওটার রং ছিল কালো। ইঁটটির বাঁদিকের কোণে একটি ধূসরবর্ণের নুড়ি ছিল বসানো এবং ওপরের ডানদিকের কোণ বরাবর ইঁটটা ছিল একটু ফাঁপা। এমনি আরো বহু বর্ণনায় প্রত্যেকটি ছিল নিখুঁত ও অভ্রান্ত। দশ বছর আগে শ্রমিকটি যেদিন ইঁটটি বসিয়েছিল, সেই একই দিনে সে হয়তো আরো দু'হাজার ইঁট বসায়, কিন্তু তার স্মৃতি থেকে কোন একটি ইঁটের এতটুকু বৈশিষ্ট্যও হারিয়ে যায় নি। সম্মোহিত অবস্থায় যে কোন ব্যক্তিই পুরনো স্মৃতির রোমন্থনের ব্যাপারে ঐ শ্রমিকটির মতই অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিতে সমর্থ হবেন।

স্মৃতির কারখানা—সারা জীবনে যে বিপুল পরিমাণ ঘটনাস্রোতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, আমরা তার শতকরা নব্বই ভাগ খুঁটিনাটি ভুলে যাই। তার

মধ্যে হয়তো খুব প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যও থাকতে পারে। কিন্তু বা আমাদের স্মৃতিকোঠায় জমা পড়ে তার পরিমাণই বিরাট বিপুল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেনিন লাইব্রেরীতে রয়েছে চার কোটির মতো বই। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই সমগ্র গ্রন্থে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য রয়েছে, একটি মানুষ সারা জীবনে তার চেয়েও দশগুণ বেশি তথ্য তার স্মৃতিতে ধারণ করতে পারে।

অসংখ্য স্নায়ুকোষ একসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠলে মগজ থেকে তরঙ্গের বিকিরণ ঘটবে—ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রে যাকে লিপিবদ্ধ করা যায়। মগজে টিউমার বা অন্য কোন অসুস্থতা এই তরঙ্গ বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। আমাদের মধ্যে যারা একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ, তাদের মগজ থেকে 'এস' জাতীয় তরঙ্গের বিকিরণ ঘটে। আর, যারা একটু বেশি বস্তুতান্ত্রিক, তারা 'পি' জাতীয় তরঙ্গের অধিকারী। এই দুজাতীয় তরঙ্গের অধিকারী দুটি মানুষ পরস্পরের সান্নিধ্যে এলে ঠোকাঠুকি বাধবেই—কখন কখন বিপর্যয় পর্যন্ত ঘটে বসে। পৃথিবীর শতকরা তিরিশ ভাগ মানুষই এই দু'জাতীয় তরঙ্গের অধিকারী ; বাদবাকিরা অন্য-জাতের।

চিন্তা সঞ্চালন ?—মানুষের মগজের গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অতি অদ্ভুত ঘটনা বিজ্ঞানীদের বেশ কিছুকাল ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ব্যাপারটা হল, একটি মানুষের মগজের চিন্তার সঙ্গে দূরবর্তী আর একটি মানুষের মগজের চিন্তার যোগাযোগ সাধন। অনেকে বলবেন, ব্যাপারটা তো বিজ্ঞানের নয়, প্যারাসাইকোলজি বা অতি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার ? তাহলেও কিছু কিছু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

খোদ সোভিয়েট ইউনিয়নেই এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। এই ক্ষেত্রে গবেষণারত প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন আকাদেমি সদস্য ভি., বখতেরেফ. এ. নিয়ন্তোভিচ, অধ্যাপক এল. ভাসিলিয়েফ এবং আরো অনেকে। অধ্যাপক এল. ভাসিলিয়েফ এবং তাঁর একদল সহকর্মী বেশ কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে একটি পরীক্ষা করেন। এক ব্যক্তিকে সেবাস্তোপোলের একটি বীথিকায় একটি বেঞ্চের ওপর বসানো হয়েছিল। আর একটি ব্যক্তি ছিল লেনিনগ্রাদে। সেবাস্তোপোলের ব্যক্তি কামনা করলেন, লেনিনগ্রাদের ব্যক্তি যেন নিদ্রা যান। তার ইচ্ছা আরোপের এই প্রথায় উক্ত ব্যক্তিকে ঘুম পাড়াতে মাত্র ছমিনিট সময় লেগেছিল। ঠিক একই পদ্ধতিতে লেনিনগ্রাদের উক্ত ব্যক্তিকে প্রায় এগারশ মাইল দূর থেকে ইচ্ছা আরোপ দ্বারা জাগানো হয়েছিল।

মস্তিষ্কবিজ্ঞানীরা বলেছেন, আমাদের মগজের সম্মুখভাগে একটি এলাকা রয়েছে (যা ফ্রন্টাল ও টেম্পোরাল নামে মগজের দুটি বিশেষ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত), যাকে বলা যেতে পারে একটি নিস্তব্ধ এলাকা, বাইরে থেকে কোন উত্তেজনা আরোপ করলেও যেখান থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় কোন ব্যক্তির এই এলাকার বিভিন্ন জায়গা স্পর্শ করে তার অতি শৈশবকালের বহুস্মৃতিকে জাগ্রত করা সম্ভব হয়েছে। মগজের এই নিস্তব্ধ বা 'সাইলেন্ট' এরিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। মগজের এই অঞ্চলটির সুবিস্তৃত গবেষণার মধ্য দিয়েই হয়তো একদিন পৃথিবীর সবচেয়ে জটিলতম যন্ত্রটির বহু অনাবিষ্কৃত রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

চা-এর ইতিকথা

বলাইচাঁদ কুণ্ডু*

বর্তমান কালে ভারতের সর্বত্র, এমনকি, অতি দূর গ্রামাঞ্চলেও চা পানের প্রসার যেভাবে বেড়েছে, তার ফলে চা-এর সঙ্গে সকলের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু 60-70 বৎসর আগে ভারতে চা-এর প্রসার এরূপ হয় নি। তখন অনেক গ্রামের লোক 'চা'-এর নামও শোনেনি। তবে কলকাতা এবং অন্যান্য শহরের লোকের মধ্যে চা পানের প্রচলন ছিল।

ভারতে 'চা পানের' বিপুল প্রসারের জন্যে বিদেশী চা ব্যবসায়ী লিপটন কোম্পানীর বিশেষ চেষ্টার কথা উল্লেখ করতে হয়। ঠিক 60 বছর আগে, "বয়স আমার ··তখন হবে বারো", তখন আমি ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলাম পূজার ছুটির সময়। সেই সময় ডায়মণ্ডহারবারের বিশাল বিস্তৃত নদীর ধারে একা একা ঘুরে বেড়াতাম। একদিন কাছারীর কাছে একজন সাহেবকে ঘিরে কিছু উৎসুক জনতার ভীড় দেখে ভাবলাম, বোধ হয় কোন মিশনারী সাহেব খৃষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করছেন। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম তা নয়! বড় বড় হরফে LIPTON লেখা একটা ভ্যান গাড়ী ও তার সামনে একজন খাঁটি ইংরেজ সাহেব ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায়—চা-এর গুণগান করছেন। 'চা শীতের উষ্ণ পানীয় আর গরমের শীতল পানীয়' এবং আরো অনেক উপকারের কথা, যেমন—'চা পান করলে ম্যালেরিয়া দমন হয়, শরীর সুস্থ থাকে, ইত্যাদি'। কিছুক্ষণ পরে বক্তৃতা শেষ করে সাহেব গাড়ী থেকে ছোট ছোট চায়ের প্যাকেটে ভরা একটা বাক্স বার করলেন ও উপস্থিত সকলকে এক একটা করে প্যাকেট ও বাংলাতে লেখা—চা তৈরি করবার পদ্ধতি—ছাপা হ্যাণ্ডবিল দিলেন। চা তৈরি করবার প্রণালী আবার ভাল করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। আমার বেশ মনে আছে, একজন লোক জিজ্ঞাসা করলেন—আজ ত বিনি পয়সায় চা-এর প্যাকেট পাওয়া গেল, তা এই রকম বরাবর বিনি পয়সাতে চা-এর প্যাকেট দিয়ে যাবেন ত? সাহেব উৎসাহ সহকারে বললেন—'হ্যাঁ হাঁ, আমি আগামী সপ্তাহে এই দিনেই আবার আসব ও আপনাদের চা দিয়ে যাব; আপনারা প্রত্যহ সকালে চা পান করতে আরম্ভ করে দিন।

এইভাবে লিপটন কোম্পানী ভারতের শহরে গ্রামে সর্বত্র চা-এর বিপুল প্রচার করেছিল। কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের সকল প্রকার লোকের মধ্যে বিশেষত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে চা পানের অসম্ভব প্রসার হয়েছিল।

আমাদের পরিবারে অবশ্য চা পান অনেক দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। আমার পিতৃদেব সকাল বিকাল চা পান করতেন। লিপটনের নীল রং-এর গোল গোল চা-এর টিন আমাদের বাড়ীতে কলকাতা থেকে আনানো হত। ছোটদের চা খাওয়া একেবারে নিষেধ সত্ত্বেও আমরা লুকিয়ে চা পান অভ্যাস করেছিলাম।

1921 সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে আমি কলকাতাতে আসি। কলকাতাতে কলেজে পড়বার সময় তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সঙ্গে দেখা করবার ও তাঁদের বক্তৃতা শোনবার প্রবল আকাঙ্খা আমার ছিল। ভবানীপুর

* 332, লেকটাউন, কলিকাতা-700 055

ব্রাহ্মসমাজে একদিন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। আচার্যদেব চা পানের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে নানাযুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বললেন যে, চা পান শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—চা পান না বিষপান। আচার্যদেবের অপূর্ব বক্তৃতা শুনে আমি চা খাওয়া বর্জন করেছিলাম। পাঁচ বছর পরে আচার্যদেবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল ও মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছেও যেতাম। তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে কখনও আর এই বিষ পান করব না। হায়রে মানুষ! আজ আচার্যদেব নেই, আজ আর কলকাতাতে কেউ তাঁর কথা শুনছে না। এখন স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারী, হাটে-বাজারে সব সময় চা পানের ধুম—এখন সকলের মুখে এক কথা - any time is tea time. আর আমরা সবাই সেই স্রোতে ভেসে গিয়েছি।

স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী শিক্ষালয়ে "সুসীম চা চক্র" প্রবর্তন করেছিলেন 1331 সালে। সেই চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষে (শ্রাবণ 1331) রচিত তাঁর অপূর্ব কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

হায় হায় হায়,
দিন চলি যায়!
চা-স্পৃহ চঞ্চল।
চাতক দলবল
চল চল হে
টগবগ উচ্ছল
কাতলি তল জল
কল কল হে।
এল চীন গগন হতে
পূর্বপবন স্রোতে
শ্যামল রসধর পুঞ্জ
শ্রাবণ বাসরে
রস ঝর ঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে। —ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের চা-এর প্রতি কিছু দুর্বলতা ছিল। তিনি শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে চা-চক্রে আহুত অতিথিগণের প্রতি উদ্দেশ্য করে 'চাতক' নামে আর একটি অনবদ্য কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার শেষের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারলাম না :

চা-রসঘন শ্রাবণ ধারা প্লাবন লোভাতুর
কলাসদনে চাতক ছিল এরা
সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে কী সুর
চকোর বেশে বিধুরে কেন ঘেরা।

চা-এর কথার ভূমিকা এইভাবে নিবেদন করে এবার কোথা থেকে চা এল এবং কি ভাবে সারা পৃথিবীতে চা পান ছড়িয়ে পড়ল, সেই কথাই বলব।

গুরুদেব লিখেছিলেন—"এল চীন-গগন হতে"। এটা খুবই সত্য কথা। চা-এর ব্যবহার চীন দেশে কয়েক হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। বিভিন্ন চীনা উপাখ্যানে আছে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব 2700 সালে চীন সম্রাট শেন নুং (Shen Nung) আবিষ্কার করেন যে, চায়ের পাতা থেকে নিষ্কাশিত কাথ-এ জীবনীশক্তির পরিবর্ধক ও উদ্দীপক গুণ আছে। চীন দেশের ঐতিহাসিকগণও বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব 1200 বছর আগে চৌ রাজ বংশের সময়ে চীনে পানীয় হিসাবে চা-এর প্রচলন ছিল। ক্রমে ক্রমে এর ব্যবহার বিশাল চীন সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং 700 খৃষ্টাব্দে চা চীনের জাতীয় পানীয় রূপে স্বীকৃতি পায়।

অষ্টম খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ চীন থেকে জাপানে চা নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেখানেও চা সকলের বিশেষ প্রিয় পানীয় হয় ও জাপানীদের সাংস্কৃতিক জীবনে ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারেও চা উৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হতে সুরু হয়।

তৎকালে তুরস্কদেশীয় ব্যবসায়ীগণ চীন,

ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করতেন। তাঁরাই চীনদেশ থেকে পশ্চিম দেশ সমূহে চা নিয়ে যান ও সেই সব দেশে চা পান করার প্রথা প্রবর্তন করেন। 1700 খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রুশ দেশেও চা পান প্রচলিত হয় ও ক্রমে ক্রমে সেখানে চা জাতীয় পানীয়ের মর্যাদা পেয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপে চা পানের প্রবর্তন হয়—প্রথমে ওষুধ হিসাবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সারা পশ্চিম ইউরোপে বিশেষত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে চা পানের প্রসার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এখন প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র চা-এর ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। দেখা গেছে যেখানে ইংরেজ জাতি গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সেখানেই চা পানের প্রচলন সুরু হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে বেড়ে গিয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে কিন্তু চা-এর প্রচলন তেমন হয় নি। অবশ্য উত্তর আমেরিকাতে যখন ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তারা সেখানে চা পান প্রবর্তন করেছিল। তখন ইংরেজ বণিকেরা চীন থেকে চা আমদানি করে পরে ইংল্যাণ্ড থেকে সেই চা অন্যান্য দেশে রপ্তানি করত। ঐ চায়ের উপর সাংঘাতিক রকম বেশি রপ্তানি শুল্ক ছিল। একারণে চা-এর দাম আমেরিকাতে অত্যন্ত বেশি পড়ত। কিন্তু আমেরিকানরা ঐ কর দিতে অস্বীকার করে এবং হল্যাণ্ড থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে চা আমদানি করবার ব্যবস্থা করে। তখন ইংরেজরা চা-এর উপর শুল্ক কমিয়ে দিলেও আমেরিকানরা তা দিতে অস্বীকার করে। 1773 সালে ইংরেজরা চা-এর উপর আমদানি কর আরো কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে; কিন্তু আমেরিকানরা ইংল্যাণ্ড থেকে আনীত চা কিনতে অস্বীকার করে। একবার তারা ইংল্যাণ্ড থেকে বোষ্টন বন্দরে প্রেরিত তিন জাহাজ চা ইংল্যাণ্ড ফেরত দেবার জন্যে ইংরাজ বণিকদের বলেছিল। কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল। এতে আমেরিকানদের মধ্যে একটা বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং তারা ইংল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত সমস্ত চা নষ্ট করবার জন্যে শলা পরামর্শ করে। তারপর 16ই ডিসেম্বর, 1773 তারিখে সুযোগমত 40-50 জন আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশ ধরে বোষ্টন বন্দরে যে তিনটি জাহাজে চা ছিল, সেই তিনটি জাহাজে উঠে শত শত চা-এর বাক্স ভেঙে সমস্ত চা সমুদ্রে ফেলে দেয়। তারপর দারুণ হৈ চৈ, গোলমাল সুরু হয়ে যায়। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় 'বোষ্টন টি পারটি'। এর কথা অনেকেই নিশ্চয় জানেন। এই ঘটনাকে সূত্র করে আমেরিকাতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লব সুরু হয়েছিল। বোধ হয় এই কারণেই আমেরিকাতে চা জনপ্রিয় হতে পারে নি।

প্রবন্ধের আরম্ভেই বলেছি যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকেরা বিশেষ চেষ্টা করে চা পানের প্রচলন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীনের অনেক বাগানে চা উৎপন্ন হত। সেই সময় জাভাতেও কিছু চা উৎপন্ন হত; কিন্তু সে চা হল্যাণ্ড দেশে প্রেরিত হত। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চা উৎপাদনকারী চীনদেশের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক কিছু ক্ষুন্ন হয়। একজন্যে তারা ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে চা চাষের জন্যে চেষ্টা করে। 1788 খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের পক্ষ থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বিহারের কোন কোন স্থানে ও অধুনা বাংলাদেশের রংপুর এবং কুচবিহারে চা চাষ করবার জন্যে সুপারিশ করা হয়। ইতিমধ্যে 1821 থেকে 1826 সালের মধ্যে কোন সময়ে মেজর ব্রুস্ নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আসামের জঙ্গলে এবং স্কট নামক আর একজন ইংরাজ মনিপুরে চা গাছ

খুঁজে বের করেন। এই দেশী চা গাছ সম্বন্ধে ইংরাজ শাসন কর্তারা বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। তাঁরা ও তাঁদের উপদেষ্টাগণ চীন থেকে চা বীজ আনবার ব্যবস্থা করেন।

1837 সালের প্রথমে কলিকাতাতে কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজ বণিক মিলিত হয়ে ভারতে চা উৎপাদন করবার উদ্দেশ্যে 'কমিটি অব টি কালচার' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ঐ কমিটির সদস্যগণ তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-কে ভারতে চা উৎপাদন করবার জন্যে সুপারিশ করেন। ঐ সুপারিশের ফলে 1834 সালের 24 জানুয়ারী তারিখেই বেন্টিঙ্ক ভারতে চা উৎপাদন করবার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ওয়ালিচ্‌ Wallich-কে ভারতে চা উৎপাদন করবার সমস্ত ব্যবস্থা করতে বলেন। সেজন্যে ম্যাকিনতোষ এণ্ড কোং নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গর্ডন নামে একজন কর্মচারীকে চীনদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। মিঃ গর্ডন-কে তিনটি কাজের ভার দেওয়া হয়, যথা—(i) চীন থেকে প্রচুর পরিমাণে চা-এর বীজ সংগ্রহ করা, (ii) চা গাছ উৎপন্ন করবার ও তা থেকে চা করবার সম্যক জ্ঞান লাভ করা এবং (iii) চীনদেশ থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ চাষী আনবার ব্যবস্থা করা। গর্ডন চীনদেশে যাবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে চীনদেশের উপকণ্ঠে আসামের সদিয়া অঞ্চলের বনের মধ্যে জেন্‌কিন্‌স্‌ ও চার্লটন নামে দু'জন ইংরাজ বণিক অনেক বন্য চা গাছ আবিষ্কার করেন। মেজর ব্রুস্‌-এর পরে দ্বিতীয়বার এই আবিষ্কারের ফলে ইংরাজ বণিকগণের মধ্যে একটা হৈ চৈ সুরু হয় এবং গর্ডন সাহেবকে চীনদেশ থেকে ফিরে আসতে বলা হয়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ ওয়ালিচ কিন্তু জেনকিন্‌স্‌ ও চার্লটন-এর আবিষ্কৃত চা গাছকে আসল চা বলে বিশ্বাস করতে স্বীকার করলেন না। তারপর সেই বন্য চা গাছ থেকে প্রস্তুত চা তাঁকে পাঠানো হল। কিন্তু তথাপি ডঃ ওয়ালিচ আসামের বন্য চা গাছ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

এই সময় ভারত গভর্নমেন্ট ভারতীয় চা, বিশেষত আসাম থেকে প্রাপ্ত চা সম্বন্ধে সঠিক অনুসন্ধান করবার জন্যে ও ভারতের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে চা উৎপাদন করবার জন্যে একটি কমিশন গঠন করেন। তিনজন বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ ওয়ালিচ, ডঃ গ্রিফিথ ও ডঃ ম্যাক্লেল্যাণ্ড এর সদস্য নির্বাচিত হন। সদস্যগণ আসামে আবিষ্কৃত চা গাছ সম্বন্ধে কোন সঠিক মতামত প্রকাশ করেন নি, তবে তাঁরা চীনদেশ থেকে আনীত চা বীজ থেকে চা চাষ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। স্থান নির্বাচন ব্যাপারে প্রথমে হিমালয় পর্বতের নিকটবর্তী স্থানসমূহে ও পরে আসামের উপযুক্ত স্থানে এবং সর্বশেষে দক্ষিণ-ভারতে নীলগিরি অঞ্চলে চা চাষ করবার সুপারিশ করেন। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সদস্যগণের মধ্যে নানাবিধ মতবিরোধ হয়। চা উৎপাদনের জন্যে স্থান নির্বাচন বিষয়েও সদস্যগণ একমত হতে পারেন নি। ডঃ ওয়ালিচ মনে করে-ছিলেন, হিমালয়ের নিকটবর্তী স্থানসমূহ চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত স্থান। যেহেতু আসামের বনে বন্য চা গাছ পাওয়া গেছে, সেজন্যে গ্রিফিথ ও ম্যাক্লেল্যাণ্ড ঠিক করে-ছিলেন যে আসামই চা উৎপাদন করবার উপযুক্ত স্থান।

কমিশনের সদস্যগণের মতবিরোধের ফলে গর্ডন সাহেবকে আবার চীনদেশে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরে গর্ডন চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যান। এর ফলে ভারতে চা চাষ সুরু হবার কিছু বিঘ্ন হয়।

এর কিছু পরে ইংলণ্ডের রয়াল হরটিকালচারাল সোসাইটি-র চেষ্টায় ফরচুন নামক একজন

ইংরেজের নেতৃত্বে আর একটি দলকে চীনে পাঠানো হয়। তিনি প্রায় তিন বছর চীনে ছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চা বীজ, চা-এর চাষ ও চা উৎপাদন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার শিক্ষা নিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট উক্ত সোসাইটি ভারতবর্ষে প্রেরণ করেছিলেন এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারত সরকার প্রথমে আসামে, পরে দার্জিলিং ও নিকটবর্তী ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং পরে দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে চা চাষের প্রবর্তন করেন।

ভারতবর্ষে চা বাগানগুলি প্রথমে গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হত। নানাবিধ কারণে গভর্ণমেন্টের পক্ষে চা বাগান পরিচালনা করা অসুবিধাজনক মনে হল। বিশেষত ক্রমাগত লোকসান হতে থাকায় গভর্ণমেন্ট সমস্ত বাগান ইংরেজ বণিকগণকে বেশ সস্তা দামে বিক্রি করে দেন। বণিকগণের কর্তৃত্বাধীনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ফলে চা বাগানগুলি অত্যন্ত লাভজনক হয় এবং আরো অনেক চা বাগান বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়।

ভারতবর্ষের ইংরাজ বণিকগণ পরিচালিত চাবাগানগুলির অসামান্য সাফল্যের ফলে, ঐ বণিকেরা শ্রীলঙ্কাতে (সিংহলে) উপযুক্ত অঞ্চলে চা চাষের প্রবর্তন করেন এবং সেখান থেকে পরে এই আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে চা চাষ ও চা উৎপাদন সুরু করে দেন। চা চাষ ও চা উৎপাদন খুব লাভজনক হওয়ায় পৃথিবীর আরো অনেক দেশে এখন চা-এর উৎপাদন হচ্ছে।

চা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস (Camellia sinensis) এই গাছের আদি নিবাস যে কোথায় তা আজও সঠিক জানা যায় নি। একথা ঠিক যে, চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে চীন দেশে চা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে ও সেখানে বিস্তৃতভাবে চা-এর চাষ হচ্ছে, কিন্তু চীনদেশের কোথাও বন্য

চা গাছের পাতা ও ফুলসহ ডাল

চাগাছ কেউ দেখে নি। আসামের বনে যে চা গাছ পাওয়া গেছে তা ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস্ কিনা সেবিষয়ে মতানৈক্য আছে। বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ ওয়ালিচ এবিষয়ে সঠিক মত দিতে পারেন নি। চা গাছের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। বিখ্যাত ইংরেজ পর্যটনকারী ও বিজ্ঞানী কিংডন ওয়ার্ড মনে করেন, দক্ষিণ পূর্ব চীনের উত্তরে কোন স্থানে চা—ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস্ প্রজাতির উৎপত্তি স্থান।

ভারতবর্ষ ব্যতীত চা ভালভাবে যে সব দেশে জন্মায় তা কিছু উল্লেখ করেছি। এই সব প্রধান উৎপাদনকারী দেশ ব্যতীত মালয়দেশ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, মরিসাস, কঙ্গো, রোডেশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, ক্যামেরুনস,

ব্রেজিল, পেরু, আরজেনটাইন, প্যারাগুয়ে, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, মেক্সিকো, ইরান, অষ্ট্রেলিয়া,

সব দেশের অক্ষাংশ 40°N থেকে 35°S—সেই সব দেশেই চা উৎপন্ন হতে পারে।

দার্জিলিং অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে চা-এর চাষ

ডুয়ার্স অঞ্চলের পাহাড়ী ভূমিতে চা-এর চাষ [চিত্র দুটিতে চা-এর ঝোপকে অল্প ছায়া দেবার জন্যে যে বিভিন্ন গাছ লাগান হয় তা দেখান হয়েছে।]

তুরস্কদেশ প্রভৃতি দেশেও অল্পবিস্তর চা-এর চাষ হয়। চা উৎপাদনকারী দেশসমূহ পৃথিবীর মানচিত্রে দেখান হল। দেখা যাচ্ছে, যে

ব্রেজিল, পেরু ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভাল জাতের কফি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তাসত্ত্বেও, চা-এর উৎপাদন খুবই লাভ-

অনক। এজন্যে এই সব দেশে চা চাষের জন্যে ও সালে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ
চা চাষ বৃদ্ধির জন্যে প্রচুর চেষ্টা চলছে। 1966 সালে সেই সব দেশে বিশেষত ব্রেজিল ও
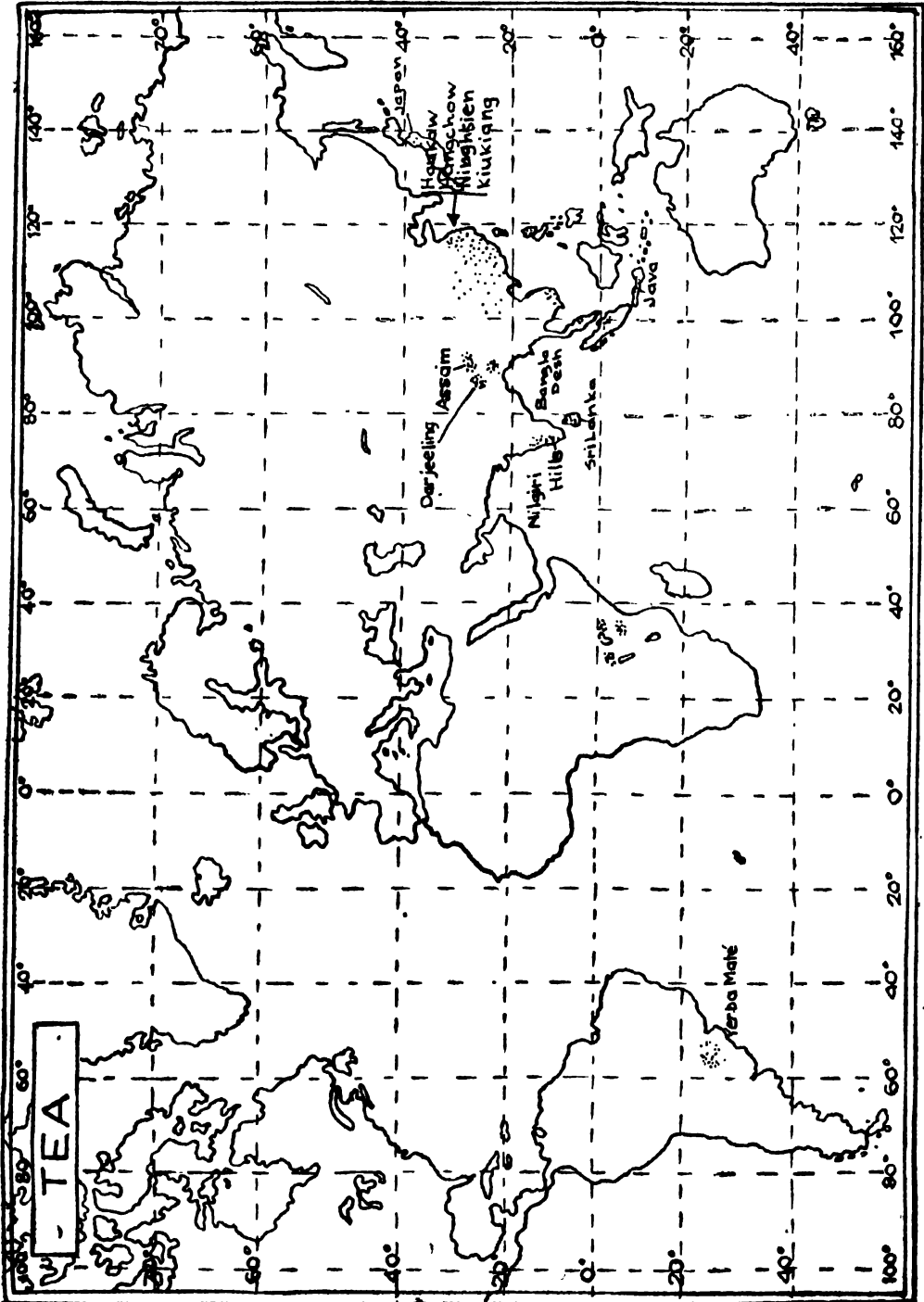
পৃথিবীর মানচিত্রে চা উৎপাদনকারী দেশসমূহ দেখানো হয়েছে

পেরুতে উন্নত পদ্ধতিতে চা চাষের প্রবর্তন ও চা চাষ বৃদ্ধির বিশেষ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা আমি নিজে দেখে এসেছি।

আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশেই চা উৎপন্ন হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চা চাষের জমির পরিমাণ ও উৎপন্ন চা-এর হিসাব দেখান হল। দেখা যাচ্ছে ভারতেই সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয়। ভারতে দার্জিলিং অঞ্চলে উৎপন্ন চায়ে এক অপূর্ব সুগন্ধ থাকে। এজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই এই চা-এর বিশেষ কদর। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে যে চা উৎপন্ন হয়, তার একটা আলাদা হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই চা এর স্বাদ কিন্তু অন্যরকম। কোন কোন দেশে এই চা বিশেষভাবে আদৃত।

অত্যন্ত ছোট দেশ হলেও—শ্রীলঙ্কার স্থান চা উৎপাদনকারী দেশ সমূহের মধ্যে দ্বিতীয়। শ্রীলঙ্কাতে দেখেছি, সেখানে প্রায় সর্বত্র জমি ও আবহাওয়া চা চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সিংহলের চা-এর একটা বিশেষ স্বাদ আছে। অনেকটা ভারতের নীল-গিরিতে উৎপন্ন চা এর মত। বিদেশের কোন কোন স্থানে এই চা-এর বিশেষ কদর আছে।

অনেক চেষ্টা করেও চীনদেশের চা উৎপাদনকারী জমি ও উৎপন্ন চা সম্বন্ধে কোন তথ্য পাইনি। সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে চীনদেশে যেখানে যেখানে চা উৎপন্ন হয়, তা দেখান হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চা-এর জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

	জমির পরিমাণ (হাজার একরে)	উৎপাদন (মিলিয়ন পাউণ্ড)		জমির পরিমাণ (হাজার একরে)	উৎপাদন (মিলিয়ন পাউণ্ড)
উত্তর ভারত	641	579	উগাণ্ডা	21	14
দক্ষিণ ভারত	184	185	টাঙ্গানাইকা	20	10
বাংলাদেশ	80	51	মালাই	31	29
শ্রীলংকা	591	467	রোডেশিয়া	5·6	2·8
ইন্দোনেশিয়া	193	94	মোজাম্বিক	83	21
ভিয়েতনাম	23	10	মরিসাস	4·5	2·8
মালয়েশিয়া	8·6	6·2	তুরস্ক	38	18
ফরমোসা	93	40	সোভিয়েত রাশিয়া	163	91
জাপান	122	171	আর্জেন্টিনা	62	22
কেনিয়া	49	36	*		

* চীন দেশ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন প্রতি বৎসরে চা খরচের তালিকা

	পাউণ্ড		পাউণ্ড
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	9·6	নেদারল্যাণ্ড	1·6
ইয়ের	9 4	চিলি	1·5
অষ্ট্রেলিয়া	5·9	মালয়	0·5
নিউজিল্যাণ্ড	7·2	সুদান	1·4
ইরাক	7·5	টিউনিস	2·3
শ্রীলঙ্কা	4·1	ইরান	1·9
কানাডা	2·5	জাপান	1·8
ইজিপ্ট	2·3	আলজেরিয়া	0·8
মরক্কো	2·6	আমেরিকা	0·7
দক্ষিণ আফ্রিকা	2·1	ভারতবর্ষ	0·7

সোভিয়েত রাশিয় ও চীনদেশের কোন তথ্য পাওয়া যায় নি

সবচেয়ে বেশী চা-এর দরকার হয় যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে জনপ্রতি প্রায় 10 পাউণ্ড চা দরকার হয়। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চা উৎপাদনকারী দেশ হলেও এখানে বছরে জনপ্রতি চা-এর ব্যবহার অত্যন্ত কম, প্রায় 1 পাউণ্ডের মত। উপরে 1962 সালের হিসাব দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে গত 15 বছরে অবশ্য চা পানের ব্যবহার অচিন্ত্যনীয় ভাবে বেড়ে গেছে কিন্তু তাতেও মনে হয় জনপ্রতি 2 পাউণ্ডের বেশি হবে না।

চা সম্বন্ধে আরো বিবরণ, বিশেষত চা গাছের প্রকৃতি, চা-এর পাতা, চা চাষ, চা উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখা হয় নি। ভবিষ্যতে অন্য প্রবন্ধে এই সব বিষয়ে আলোচনা করব।

নিরক্ষরতা বনাম গণশিক্ষা

শ্রীমহাদেব দত্ত*

ভারতের সংবিধানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। কে জানে কবে সে প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হবে। কাজেই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিরক্ষরতা দূরী-করণে নতুন করে শপথ নেবেন এতো স্বাভাবিক। রাজ্যেও পট-পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী (যিনি একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক) নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ঘোষণা করেছেন। তবে এবিষয়ে এঁদের আলোচনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে আর একটি বিষয় ভেসে উঠেছে (যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠে)। এ কথাটি হচ্ছে যে, দেশের জনসাধারণকে তাদের নাগরিক অধিকার বোঝাবার জন্যে মানুষের মতন জীবনধারণ করবার ন্যূনতম শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। এ কথাটাই গণশিক্ষা বা জনশিক্ষা বলে বোঝানো যেতে পারে। দেশ উন্নয়নের জন্যে, জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্যে চাই অত্যাবশ্যক গণশিক্ষা। কেবলমাত্র নিরক্ষরতা দূরী-করণ গণশিক্ষার কোন মতেই বিকল্প নয়।

অবশ্য সংবিধান রচনার পর থেকেই যাঁরা সরকার গঠন করেছেন, তাঁরাই নিরক্ষরতা দূরী-করণের কথা বলেছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমি-তির নামে বিভিন্ন সংস্থা গঠিত হয়েছে এবং বহু সমাজসেবী এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করেছেন। এরূপ একজন প্রখ্যাত সমাজসেবীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললেন, কোন গ্রামে কয়েক সপ্তাহের জন্যে শিবির স্থাপন করে কিছু নিরক্ষরকে সাক্ষর করা গেল কিন্তু পরের বছর আবার শিবির স্থাপন করে দেখা গেল, পূর্বের শিবিরের সাক্ষররা আবার নিরক্ষর হয়ে গেছে।

কাজেই এভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা দুরাশা। তিনি আরও জানালেন, প্রক্রিয়ামূলক ভাবে দু-একটি শিবিরে নিরক্ষরদের সাক্ষর করবার পর আকর্ষণীয় সচিত্র সিনেমা পত্রিকার সঙ্গে ঐ সাক্ষরদের পরিচয় করিয়ে কিছু ঐরকম বই রেখে আসা হল; পরের বছর শিবির স্থাপন করে দেখা গেল, পূর্বে শিবিরের শিক্ষাপ্রাপ্ত সাক্ষরেরা নিরক্ষর হয়ে যান নি এবং তাঁদের সচিত্র সিনেমা পত্রিকার জন্যে আগ্রহ বেড়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠে—এভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করা কি সার্থক? সরকারী অর্থসাহায্য ও বেসরকারী সমাজ কর্মীদের পরিশ্রম সিনেমা জগতের প্রচার সাহিত্যের জন্যে ব্যয় করা কি উচিত? আর সরকারী অর্থব্যয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে যে বহু বই প্রকাশ করা হচ্ছে, তা কি উক্ত সাক্ষরদের কোন ব্যবহারে আসছে? নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটি নেতিবাচক প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা জাতীয় উন্নয়নে বা জীবনধারণের মান উন্নয়নের কোন উদ্দেশ্য সফল করবে না। এজন্যে উচিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে, জনশিক্ষা প্রচারের সম্মুখ প্রয়াস। সরকার ও সমাজকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে, প্রত্যেক মানুষকে যেন মানুষের মত জীবনধারণ এবং মানব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবার জন্যে ন্যূনতম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষায় নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থার সঙ্গে চাই পৌরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কৃষি বা বাগিচা রচনার

* এস. এন. বোস ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল সায়েন্সেস, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, সামান্য ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা। এর জন্যে চাই সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে, বিশেষ করে, শিক্ষিত তরুণদের স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে নিয়োগ ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে যেমন গণশিক্ষার বিস্তার হবে দ্রুততর, তেমনি শিক্ষা বিস্তারের অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ, হবে সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ। এই গণশিক্ষা প্রচারে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মত প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে গণশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা হবে সহজতর ও অল্প ব্যয়সাধ্য।

পারমাণবিক সংযোজন ও বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন

সুনীলকুমার সিংহ*

বর্তমানে পারমাণবিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কলা-কৌশল ব্যবসায়িক শিল্পোদ্যোগের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে এসম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে, এবং সেগুলি তথাকথিত "অপারমাণবিক" দেশে বিক্রি করা হচ্ছে। এই শিল্পোদ্যোগ বর্তমানে এতটা উন্নত যে, যন্ত্র উৎপাদনকারী দেশগুলি ব্যবসায়িক সমবায়ে একত্র হয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে দর কষাকষি ও ও আলাপ-আলোচনা করে তাদের পণ্য বিক্রি করছে।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈরির কলা-কৌশলের খুঁটিনাটি অবারিতভাবে সব দেশে ছড়িয়ে পড়া উচিত হবে কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই শক্তিকেন্দ্রে জ্বালানীর দহনের শেষে অবশিষ্ট অংশ হিসাবে বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ পড়ে থাকে, যা মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। পৃথিবীর সর্বত্র অবারিতভাবে এই শক্তিকেন্দ্রগুলি স্থাপিত হলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সমস্যার অনেক সুরাহা হয়—একথা ঠিকই; কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ পড়ে-থাকা মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থগুলির প্রাচুর্য এত বেড়ে যাবে যা শেষ পর্যন্ত প্রাণী-জগতের পক্ষে আত্মঘাতী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এই দহন-অবশেষের পদার্থকে কিভাবে নষ্ট করা যায় বা নিরাপদে কোন স্থানে জমিয়ে রাখা যায়, তা নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলছে। কিন্তু আজও এই বিপদ সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণের কোনও কার্যকরী উপায় পাওয়া যায় নি। ঠিক এই কারণেই পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বিষয়টির গুরুত্ব অনেক পরিমাণ বেড়ে গেছে।

পারমাণবিক সংযোজনভিত্তিক শক্তিকেন্দ্রের কতকগুলি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে। প্রথমত, এই শক্তিকেন্দ্রের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানীর পরিমাণ প্রায় অফুরন্ত। দ্বিতীয়ত, এই কেন্দ্রের দহন-অবশেষের পদার্থ তেজস্ক্রিয় নয়; সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিষক্রিয়ার জন্যে উদ্বেগের অবসান হবে। অবশ্য পারমাণবিক সংযোজনভিত্তিক শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলতে যে সব বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং সমস্যার মোকাবিলা করা প্রয়োজন তাদের জটিলতা অনেক বেশি। এই প্রবন্ধে এই ধরণের শক্তিকেন্দ্র সম্পর্কে মূল ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হবে।

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা-700 009

পারমাণবিক সংযোজনভিত্তিক শক্তিকেন্দ্রে ডয়টেরিয়ামকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডয়টেরিয়াম হল হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রের একটি আইসোটোপ। ডয়টেরিয়াম জ্বালানীর শক্তিকেন্দ্রের মূলে যে কটি পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়ার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, সেগুলি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হল :

(ক) ডয়টেরিয়াম + ডয়টেরিয়াম = ট্রাইটিয়াম + প্রোটন। এই সংযোজন বিক্রিয়ার উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ 4 এম. ই. ভি. (মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট)

(খ) ডয়টেরিয়াম + ডয়টেরিয়াম = হিলিয়াম-3 + নিউট্রন। এই বিক্রিয়ার উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ 3·25 এম. ই. ভি.।

(গ) ডয়টেরিয়াম + ট্রাইটিয়াম = হিলিয়াম-4 + নিউট্রন ; শক্তির পরিমাণ 17·6 এম. ই. ভি.।

(ঘ) ডয়টেরিয়াম + হিলিয়াম-3 = হিলিয়াম-4 + প্রোটন ; শক্তির পরিমাণ 18·3 এম. ই. ভি।

ডয়টেরিয়ামের মত ট্রাইটিয়ামও হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রের আর একটি ভারি আইসোটোপ। উপরিউক্ত বিক্রিয়াগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডয়টেরিয়াম কেন্দ্রীনের সংযোজন বিক্রিয়ার জন্যে উদ্ভূত ট্রাইটিয়াম এবং হিলিয়াম-3 কেন্দ্রীনগুলি যখন পুরোপুরি হিলিয়াম-4 এবং নিউট্রন ও প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন যে শক্তি উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ প্রতিটি ডয়টেরিয়াম কেন্দ্রীনের জন্যে—7 এম. ই. ভি.। এর অর্থ, এক পাউণ্ড ডয়টেরিয়াম জ্বালানী থেকে 43 মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যাবে। এর তুলনায়, রাসায়নিক জ্বালানী গ্যাসোলিনের এক পাউণ্ড থেকে মাত্র 6 কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যায়।

সাধারণ জলে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনগুলির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই ডয়টেরিয়াম। তবুও এক গ্যালন সাধারণ জল থেকে লভ্য শক্তির পরিমাণ প্রায় 350 গ্যালন গ্যাসোলিন থেকে রাসায়নিক দহনজাত শক্তির পরিমাণের সমান। পৃথিবীর সব সমুদ্রগুলির কথা ভাবলে দেখা যাবে, এখন যে হারে মানুষের শক্তির চাহিদা তা যদি হাজার গুণও বেড়ে যায়, তাহলেও সমস্ত সমুদ্রের জলের মধ্যে যে ডয়টেরিয়াম আছে তা দিয়ে পৃথিবীর শক্তির যোগান কয়েক হাজার কোটি বছরের জন্যে অব্যাহত রাখা যাবে। সাধারণ জল থেকে ডয়টেরিয়াম পৃথক করা খুব ব্যয়সাধ্য নয়। খনিগর্ভ থেকে কয়লা নিষ্কাশনের খরচের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, জ্বালানী হিসাবে ডয়টেরিয়ামের মূল্য কয়লার মূল্যের মাত্র এক শতাংশ এবং সবশেষে উল্লেখযোগ্য, ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়ামের পারমাণবিক দহনের ফলে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় গ্যাসই তৈরি হয়; সুতরাং দহন-অবশেষের বস্তু নিয়ে কোনও সমস্যার প্রশ্ন নেই।

ডয়টেরিয়ামের পারমাণবিক দহনের সমস্যাটি কিন্তু বেশ জটিল। ডয়টেরিয়াম, ট্রাইটিয়াম এবং হিলিয়াম-3 কেন্দ্রীনের মধ্যে উপরিউক্ত পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া ঘটাতে হলে, কেন্দ্রীনগুলিকে পরস্পরের খুব কাছে নিয়ে আসা প্রয়োজন—যাতে ওদের মধ্যে পারমাণবিক বল ক্রিয়াশীল হয়। পারমাণবিক বলের প্রভাব কেন্দ্রীনের বাইরে খুবই অল্প দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রীন কিন্তু ধনাত্মক তড়িৎ-আধানযুক্ত; সুতরাং তাদের মধ্যে বিকর্ষণী বৈদ্যুতিক বল ক্রিয়াশীল। কেন্দ্রীনগুলি যখন একে অপরের খুব কাছে আসে, বিকর্ষণী বলের পরিমাণ তখন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। সুতরাং পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া ঘটানোর জন্যে কেন্দ্রীনগুলিকে এই প্রচণ্ড বিকর্ষণী বলের বাধা অতিক্রম করে একটিকে অপরটির কাছে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এর থেকে বোঝা যায়, কেন্দ্রীনগুলিকে প্রচণ্ড গতিবেগে পরস্পরের দিকে নিক্ষেপ করা দরকার। এই প্রচণ্ড গতিবেগের

ফলে পরমাণু গঠনের জন্যে কেন্দ্রীনের সঙ্গে যে সমস্ত ইলেকট্রন আবদ্ধ থাকে, তা কেন্দ্রীনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে পরমাণু কেন্দ্রীন ও পারমাণবিক ইলেকট্রন যখন পারমাণবিক বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ প্রকার বস্তুকে 'প্লাজ্‌মা' বলা হয়। অর্থাৎ পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটানোর অনেক আগেই ডয়টেরিয়াম গ্যাস ডয়টেরিয়াম প্লাজ্‌মাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ডয়টেরিয়াম প্লাজমার মধ্যে যে ডয়টেরিয়াম কেন্দ্রীন থাকবে, তাদের গতি অনেকগুণ বৃদ্ধি হলে তবেই পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া সম্ভব হতে পারে। অবশ্য, এই ডয়টেরিয়াম প্লাজ্‌মাকে একটি ধারক পাত্রে রাখা প্রয়োজন। কারণ তখনই কেন্দ্রীনগুলি ধারক পাত্রের দেয়ালে বহুবার প্রতিহত হয়ে প্লাজ্‌মার মধ্যে বারবার ফিরে আসবে, এবং এতে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে ও পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ধারকপাত্রের মধ্যে এই প্রকার প্রচণ্ড গতিশীল প্লাজ্‌মা কণিকার বর্ণনা দেওয়া হয় তার তাপমাত্রা ও চাপের উল্লেখ করে। যদি কোন ধারকপাত্রে সাধারণ তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ডয়টেরিয়াম গ্যাস নিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো হয়, তবে যে তাপমাত্রা এবং চাপে উপযুক্ত সংখ্যক পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে, তার পরিমাণ যথাক্রমে 350 মিলিয়ন ডিগ্রী এবং 2 মিলিয়ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ।

চাপের পরিমাণ গ্যাসের কণিকা সংখ্যার উপর নির্ভর করে। সুতরাং খুব অল্প ঘনত্বের ডয়টেরিয়াম গ্যাস নিয়ে শুরু করলে (ধরা যাক, যার চাপের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ) 350 মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রায় ঐ প্লাজ্‌মায় যে চাপ উৎপন্ন হবে, তার পরিমাণ খুব একটা প্রচণ্ড ধরণের হবে না। অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ এই ধরণের চাপ নিয়ে পরীক্ষার কাজ অনেক সহজ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও ডয়টেরিয়াম কণিকার সংখ্যা যথেষ্ট কম হলেও পারমাণবিক সংযোজনজাত মোট শক্তির পরিমাণ হবে অনেক বেশি।

ডয়টেরিয়াম প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা বাড়িয়ে পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া শুরু করলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তি উৎপাদন করবে না। তাপমাত্রা বাড়ানোর সরঞ্জাম সরিয়ে নিলেই সংযোজনজাত শক্তির পরিমাণ ক্রমেই কমতে শুরু করবে; কারণ এই শক্তির বেশ কিছু অংশ ডয়টেরিয়াম কেন্দ্রীনের সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘর্ষজাত এক্স্‌-রশ্মি (X-ray) রূপে খরচ হয়ে যাবে; এবং প্লাজ্‌মার প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। প্লাজ্‌মার বিশুদ্ধতাও খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ ডয়টেরিয়াম ছাড়া অন্য কেন্দ্রীন খুব অল্প পরিমাণেও প্লাজ্‌মায় থাকলে এক্স্‌-রে বিকিরণের মাত্রা খুবই বেড়ে যায়। অন্যদিকে, প্লাজ্‌মা কণিকাগুলি ধারকপাত্রের দেয়ালে প্রতিহত হওয়ার সময় তাদের ভরবেগের কিছু অংশ দেয়ালে চলে গেলে প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা কয়েক মুহূর্তেই এত কমে যাবে যে পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে প্লাজ্‌মা কণিকারা বাস্তব ধারকপাত্রের দেয়াল স্পর্শ করতে না পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া চালিয়ে যেতে হলে আমাদের প্রয়োজন উচ্চ তাপমাত্রা এবং উপযুক্ত চাপের বিশুদ্ধ প্লাজ্‌মা; এছাড়া প্লাজ্‌মার ধারক পাত্রটি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে প্লাজ্‌মা কণিকারা পাত্রের দেয়াল স্পর্শ করতে না পারে।

প্লাজ্‌মা কণিকাগুলি তড়িতাধানযুক্ত। সুতরাং বাইরে থেকে এদের উপর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ

করলে এদের গতিপথ বেঁকে যাবে। অবশ্য এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যাতে প্লাজ্মা কণিকার গতির জন্যে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র প্লাজ্মার মধ্যে সব বিন্দুতে বাইরে থেকে আরোপ করা চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান ও বিপরীতমুখী হয়। সেক্ষেত্রে প্লাজ্মার মধ্যে কণিকাদের গতিপথ হবে সরলরেখা। শুধুমাত্র উপরিতলের কণিকাগুলি বাইরের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রতিহত হয়ে প্লাজ্মার মধ্যেই ফিরে আসবে। এই ধরণের চুম্বক ধারক পাত্রের ব্যবহারের ফলে প্লাজ্মা কণিকাগুলি ওদের বাস্তব ধারক পাত্রের দেয়াল স্পর্শ করতে পারবে না, এবং তজ্জ'নত প্লাজ্মার তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সমস্যা দূর হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রায় 100 বায়ুমণ্ডলীর চাপের প্লাজ্মাকে চুম্বক ধারক পাত্রে ধরে রাখতে হলে 50 হাজার গাউস পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রকার চুম্বক ধারক পাত্রকে সম্পূর্ণ ছিদ্রহীন করা যায় না। তবে এই ছিদ্রের পরিমাণ কমিয়ে এনে স্বয়ংক্রিয় সংযোজন বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব।

তথাকথিত পিন্চ্ (Pinch) প্রক্রিয়ার ব্যবহার করে চুম্বক ধারক পাত্র তৈরি করার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্লাজ্মার মধ্য দিয়ে উচ্চমানের একটি তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত করানো হয়। এর ফলে উদ্ভূত চৌম্বক ক্ষেত্র প্লাজ্মাকে সংকুচিত করে তড়িৎস্রোতের প্রবাহ দিকে একটি প্লাজ্মা স্তম্ভের সৃষ্টি করে। এই প্লাজ্মা স্তম্ভকেও পিন্চ্ বলা হয়। পিন্চ্টি তার দৈর্ঘ্য বরাবর চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা দিয়ে সীমিত থাকে এবং এইভাবে একটি চোঙাকৃতির চুম্বক ধারকপাত্র তৈরি হয়। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পিন্চ্ একটি খুবই সংবেদনশীল বস্তু। পিন্চের মধ্যে কোথাও একটু দুমড়ে বা মুচড়ে গেলে তা মুহূর্তের মধ্যেই বিরাট আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পিন্চ্টি নষ্ট হয়ে যায়। আবার দেখা যায়, পিন্চের মধ্যে কোন কোন স্থানে ব্যাসের পরিমাণ কমে গিয়ে হঠাৎ পিন্চ্টি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। কখন বা পিন্চ্টিতে অনুদৈর্ঘ্য বক্রতার সৃষ্টি হয় এবং এটি অল্প সময়ের মধ্যেই এত বেড়ে যায় যে, প্লাজ্মা কণিকারা তাদের বাস্তব ধারক পাত্রের দেয়াল স্পর্শ করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে পিন্চ্টির তাপমাত্রা প্রচণ্ডভাবে কমে যায়। এই ধরণের স্তম্ভাকৃতি পিন্চের দুই প্রান্তের কণিকাগুলি সাধারণত তাদের বাস্তব ধারক পাত্রের দেয়াল স্পর্শ করে পিন্চের তাপমাত্রা কমানোতে সহায়তা করে। পিন্চকে কিভাবে এই সব আত্মঘাতী পরিস্থিতি থেকে বাঁচানো যায় এবং স্থায়িত্ব বাড়ানো যায়—তা নিয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে অনেক পরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ডো-নাটের আকৃতি বিশিষ্ট পিন্চ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায়, এই ধরণের ডো-নাট পিন্চ্ মোটামুটি স্থায়ীভাবে স্বয়ংক্রিয় পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া চালাতে পারবে। অবশ্য পিন্চ্ প্রক্রিয়া ছাড়াও অন্য উপায়ে চুম্বক ধারক পাত্র তৈরি করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়ার সাহায্যে উৎপন্ন শক্তিকে আলানী প্লাজ্মা থেকে কিভাবে বাইরে এনে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা হবে সে সম্পর্কেও মোটামুটি দুটি পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে। যদি ডয়টেরিয়াম সংযোজন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে শক্তি কেন্দ্র তৈরি হয়, তাহলে পারমাণবিক সংযোজনজাত শক্তির বেশির ভাগই হিলিয়াম-3 এবং প্রোটনের গতিশক্তিরূপে প্রকাশ পাবে। এই দুটি কেন্দ্রীন স্বভাবতঃই তড়িতাধান যুক্ত। বাইরে থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে এদের প্লাজ্মার মধ্যেই ধরে রাখা যাবে। সুতরাং পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া চলার

সঙ্গে সঙ্গে হিলিয়াম-3 এবং প্রোটনের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে যাবে এবং প্লাজ্‌মার আয়তন বৃদ্ধি পাবে। প্লাজ্‌মা তখন তার চুম্বক ধারক পাত্রের বলরেখাগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে কাজ করে যাবে। চৌম্বক বলরেখার বিরুদ্ধে এই কাজকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি মূলত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় পদ্ধতি এবং সাধারণত তাপ-বৈদ্যুতিক পদ্ধতির তুলনায় এটির অনেক সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা।

অন্যদিকে, ডয়টেরিয়াম-ট্রাইটিয়াম সংযোজনকে ভিত্তি করে শক্তিকেন্দ্র তৈরি হলে সংযোজন বিক্রিয়াজাত শক্তির বেশির ভাগই নিউট্রন কণিকার গতিশক্তিরূপে প্রকাশ পাবে। সেক্ষেত্রে নিউট্রনগুলিকে কোন বস্তুতে শোষণ করলে বস্তুটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এই তাপশক্তিকে উপযুক্ত বস্তুমাধ্যমের দ্বারা স্থানান্তরিত করে এবং তা দিয়ে কোন গ্যাস টারবাইন চালিয়ে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যাবে। এটি হবে মূলত তাপ-বৈদ্যুতিক পদ্ধতি।

অবশ্য একথা ঠিক, পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়াকে ব্যবহার করে কার্যকরী কোন বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা আজও সম্ভব হয় নি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া প্রমুখ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এ বিষয়ে কাজ এগিয়ে চলেছে। অনেক কাজই করা হচ্ছে গোপনে। আশার কথা, এই সব কাজের মধ্যে এমন অনেক নতুন ধরণের এবং শক্তিশালী কলা-কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে যা প্রকৃতির রহস্য-ভেদে মানুষের প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী এবং অর্থবহ করে তুলছে।

জীবদেহ গঠনে আঙ্কিক নিয়ম

যুগলকান্তি রায়

অদূর ভবিষ্যতে 'স্বর্ণ-সংখ্যা' প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন বৈষম্য এবং তাদের নিজেদের গঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোকপাত করবে।

ইটালির গণিতজ্ঞ লিওনার্দো পিসা একটি সংখ্যা শ্রেণী আবিষ্কার করেছিলেন যেটি গণিতশাস্ত্রে ফিবোনাশি শ্রেণী (Fibonacci series) নামে পরিচিত। ঐ শ্রেণীটি হল—

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,⋯। এইশ্রেণীর কোন পদের সংখ্যা তার পূর্ববর্তী দুটি পদের সংখ্যার সমষ্টির সমান। যেমন, তৃতীয় পদের সংখ্যা $=0+1=1$, চতুর্থ পদের সংখ্যা $=1+1=2$, সপ্তম পদের সংখ্যা = ষষ্ঠ পদের সংখ্যা + পঞ্চম পদের সংখ্যা $=5+3=8$ ইত্যাদি। এই শ্রেণীর দুটি বৈশিষ্ট্য আছে—

(1) x, y, z ঐ শ্রেণীর পর পর তিনটি সংখ্যা হলে—দেখা যাবে $xz \sim y^2=1$. যেমন—

$5\times13\sim8^2=1$, $3\cdot8\sim5^2=1$ ইত্যাদি

(2) ঐ শ্রেণীর কোন পদ এবং তার পূর্ববর্তী পদের সংখ্যার অনুপাত হিসেব করলে দেখা যাবে,

নবম পদের পর থেকে অনুপাতগুলি মোটামুটিভাবে 1·618-এর সমান

যেমন, (i) 55/34 = 1·617647
(ii) 89/55 = 1·618182
(iii) 144/89 = 1·617978
(iv) 233/144 = 1·618056
(v) 377/233 = 1·618026
(vi) 610/377 = 1·618037

এই অনুপাতটিকেই 'স্বর্ণ অনুপাত' (golden ratio) ϕ বলা হয়। একদিক দিয়ে বিচার করলে এই 'স্বর্ণ-অনুপাত', ϕ (1·618) একটি অনন্য সংখ্যা। এই সংখ্যাটিকেই 'স্বর্ণ-সংখ্যা' বলা হয়। কেননা, এটিই একমাত্র ধনাত্মক সংখ্যা—যার থেকে 1 বাদ দিলে বিয়োগফল অনোন্যক (reciprocal) সংখ্যার সমান হয়। যেমন,

$$\frac{1}{1.618} = 0·618; \text{ অর্থাৎ } \frac{1}{\phi} = \phi - 1$$

$$\text{বা, } \frac{1}{1·618} = (1·618 - 1) = 0·618$$

0·618-কে 'স্বর্গীয়-সংখ্যা' (Divine Number) বলা হয়।

ফিবোনাশি শ্রেণী এবং স্বর্ণ-সংখ্যার প্রতি প্রকৃতির একটি বিশেষ সম্পর্ক বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন। গাছের পাতায়, ফুলের পাপড়ির বিন্যাসে, প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যের মধ্যে তাঁরা ফিবোনাসি শ্রেণী এবং স্বর্ণ-সংখ্যার উপস্থিতি খুঁজে পাচ্ছেন। গাছের ডালের একটি পাতাকে ধরে উপরে ঠিক সেই অবস্থানে যে পাতাটি থাকবে সেই পর্যন্ত গুণলে দেখা যাবে, পাতাগুলির সংখ্যা ফিবোনাশি শ্রেণীর কোন না কোন একটি পদ। আরও আশ্চর্যের বিষয়, যদি ডাল বরাবর ঘড়ির কাঁটার দিকে 2 বার পাক খেয়ে 5 নম্বর পাতাটি ঐ অবস্থানে পাওয়া যায়, তাহলে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে 3 বার (অর্থাৎ 5 − 2 = 3) পাক খেলে ঐ পাতাটি পাওয়া যাবে। এই বিন্যাসকে বলা হয় 5/2 সর্পিল (Spiral) বিন্যাস।

সূর্য্যমুখী ফুলের বীজগুলি সর্পিলভাবে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং বিপরীত দিকে—দুভাবেই সাজানো। দুদিকে সাজানো সর্পিলগুলি গুণলে দেখা যাবে, সংখ্যাগুলি ফিবোনাশি শ্রেণীর পর পর দুটি পদ এবং তাদের অনুপাত স্বভাবতঃই ঐ স্বর্ণ সংখ্যার সমান। এখন দেখা যাক মানব দেহের গঠনে 'স্বর্ণ-সংখ্যার' প্রয়োগ কি ভাবে চলতে পারে। আমরা যদি মাপজোখ করে পাই যে, কোন ব্যক্তির নাভি থেকে স্তনের দূরত্ব a, স্তন থেকে মাথা b, নাভি থেকে মাথা c, নাভি থেকে পা d, এবং পা থেকে মাথার দূরত্ব e, তাহলে আমরা দেখব, $\frac{b}{a}, \frac{c}{b}, \frac{d}{c}, \frac{e}{d}$ অনুপাতগুলির প্রতিটির মান প্রায় 1·61; অর্থাৎ স্বর্ণ-সংখ্যার সমান। ফিবোনাশি শ্রেণী নিয়ে গবেষণা কালে প্রায় 250 জন যুবকের দেহবিন্যাস পরীক্ষান্তে ভারতীয় বিজ্ঞানী টি এ. ডেভিস উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অনেকেই মনে করেন, এই স্বর্ণ-সংখ্যা বা স্বর্গীয়-সংখ্যা প্রানী বা উদ্ভিদের গঠনের মধ্যে যেমন বৈষম্য জানতে সাহায্য করবে, তেমনি তাদের নিজেদের গঠনের মধ্যে যে সুশৃঙ্খল নিয়ম বিরাজ করছে সে সম্পর্কেও অদূর ভবিষ্যতে আলোকপাত করবে।

একটি অরণ্য সমস্যার পরিসংখ্যানভিত্তিক আলোচনা

কল্যাণ চক্রবর্তী*

কোন একটি সাম্প্রতিক কলিত অর্থনৈতিক গবেষণায় জানা যায়, ভারতবর্ষের বর্তমান প্রায় 56 কোটি জনসমষ্টির বছরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ 300 টাকা, আর এ জনসংখ্যার শতকরা প্রায় 80 ভাগই গ্রামের বাসিন্দা। মাথাপিছু খরচের শতকরা প্রায় 70 ভাগ খাদ্য ও 7 ভাগ জ্বালানী ক্রয়ের জন্যে ব্যয়িত হয়। গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজন বেশির ভাগই মেটান হয় জ্বালানী কাঠের যোগান দিয়ে।

ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশে সম্পদের এমন সুসম বন্টন হওয়া দরকার যাতে গ্রামের মানুষ বেশি উপকৃত হয়। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুণানুসারে সাজালে দেখা যাবে 'খাদ্যে' এর পরেই হচ্ছে জ্বালানী। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হলেও এদেশের মানুষের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী যে জ্বালানী, তার যোগানে কিন্তু এদেশের মানুষ দুঃখজনকভাবে পিছিয়ে আছে। রান্না, আলো হাওয়ার যোগান, শক্তি ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্পের জন্যে এ জ্বালানী শক্তির প্রয়োজন। বর্তমান জ্বালানী শক্তির মাথাপিছু খরচের পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেহেতু জনসমষ্টির শতকরা প্রায় 80 ভাগই গ্রামে বাস করে আর যেহেতু মাথাপিছু ব্যয়ের শতকরা প্রায় 70 ভাগই ব্যয়িত হয় খাদ্য যোগান দেওয়ার তাগিদে, গ্রামীন মানুষের জ্বালানী শক্তির জন্যে খরচ করার প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য নেই।

জ্বালানী শক্তি নিম্নবর্ণিত সামগ্রীর যোগান থেকে পাওয়া যায়। যথা—কয়লা, তেল, জল অন্তভাবে প্রাপ্ত শক্তি, গোবর, কৃষিভিত্তিক অব্যবহৃত দ্রব্যাদি, জ্বালানী কাঠ এবং সদ্য উদ্ভাবিত পরমাণু শক্তি।

জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি—1971 সালের গণনা অনুসারে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল 547, 367, 926। যোজনা কমিশনের হিসেবে 1981 সালে জনসমষ্টির এ সংখ্যা দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

জনসংখ্যা (10 লক্ষ হিসাবে)

সাল	1961	1971	1981
মোট	436	547	702
শহর	78	109	143
গ্রাম	358	438	559

শতকরা হিসেবে নিম্নরূপ

মোট	100·0	100·0	100·00
শহর	17·8	19·9	19·8
গ্রাম	87·2	80·1	80·2

বার্ষিক বৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ 1948-'49 থেকে 1985-'86 পর্যন্ত

---

* ভি. আই. পি. রোড গভর্ণমেন্ট হাউসিং এষ্টেট, [illegible]-0, ফ্ল্যাট-1, কলিকাতা-700 054

পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় :

বছর	বার্ষিক বৃদ্ধির শতকরা হার	বার্ষিক মাথাপিছু আয় (টাকার হিসেবে)
1948-49	—	289·00
1961-62	0·4	294·00
1975-76	1·5	323·00
1980-81	1·75	351·00
1985-86	2·00	382·00

1980-81 ও 1985-86 সালের জন্যে সংখ্যাগুলি পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে পাওয়া যায়।

এবার গ্রামীণ মানুষের খরচের (সর্বভারতীয়) হিসেব নিলে দেখা যাবে, খরচের শতকরা হার খাদ্যসামগ্রী দ্রব্যাদির সংগ্রহের জন্যে 70·09 ও খাদ্যসামগ্রী নয় এরূপ দ্রব্যাদির সংগ্রহের জন্যে 29·91 ভাগ। একজন ভারতীয়—যার বার্ষিক আয় 300 টাকার মত, সে তার খরচের শতকরা প্রায় 7 ভাগ খরচ করে জ্বালানী বা আলোর জন্যে।

গৃহস্থালী কাজে জ্বালানী কাঠের চাহিদা—রান্না করা বা অন্যান্য কাজে জ্বালানী কাঠের চাহিদা গ্রামীণ মানুষের কাছে কিন্তু দিন দিনই বেড়ে চলেছে। এর পরিসংখ্যান তারই প্রমাণ বহন করে :

বছর / সামগ্রী	চাহিদার পরিমাণ 10 লক্ষ টন হিসেবে		
	1960-61	1970-71	1975-76
জ্বালানী কাঠ	87·5	112·0	118·0
কয়লা (জ্বালানীর প্রয়োজন হিসাবে)	0·9	0·8	0·8
গোবর	52·4	59·7	63·9
শাকসব্জীর অবশিষ্টাংশ	38·9	47·9	52·6

কাজেই পরিসংখ্যানের হিসেবে দেখা যায়, জ্বালানী কাঠের চাহিদার পরিমাণ 15 বছরে বেড়েছে প্রায় শতকরা 35 ভাগ।

এ বিরাট ও ক্রমঃবর্ধমান জ্বালানী কাঠের চাহিদা মেটান ভারতবর্ষের বনসম্পদের পরিস্থিতিতে প্রায় অসম্ভব, কারণ বনসম্পদের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত বিনিয়োগই হচ্ছে জাতীয় নীতি। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় 5 লক্ষ 50 হাজার গ্রাম আছে, আর প্রতিটি গ্রামের গড় ক্ষেত্র হচ্ছে প্রায় 400 হেক্টরের মত ; এর মধ্যে আনুমানিক 320 হেক্টরে রয়েছে কৃষিক্ষেত্র। বাকি 80 হেক্টরের মধ্যে রয়েছে মনুষ্য বসতি, রাস্তা, বাগান, পুকুর প্রভৃতি। আনুমানিক প্রায় 440 লক্ষ হেক্টরের মত জমি উদ্বৃত্ত হিসাবে যেখানে পাওয়া যেতে পারে, সেখানে জ্বালানী কাঠের প্রয়োজনে কৃত্রিম বন গড়ে তোলা যায়। এ কাজ অবিলম্বে হাতে নেওয়া দরকার। অন্যথায় সমস্যার ব্যাপকতার সমাধানের পথ জটিলতর হবে।

সময়ের পিছু হটা

দুলাল কুমার সাহা*

অতীতের কোন বিশেষ ক্ষণকে ফিরে পাওয়ার বাসনা মানুষের বহুদিনের। কবির কবিতায়, গায়কের কণ্ঠে, অনেক সময় সে বাসনার প্রকাশ পায়। কিন্তু সে তো শুধু আক্ষেপমাত্র! কেউ কি ফিরে যেতে পেরেছে তার অতীতের সেই বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটিতে? —সময়ের একমুখী নিষ্ঠুরতা আজও কাউকে দেয়নি সে সুযোগ।

প্রখ্যাত দার্শনিকদেরও সময়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সময়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। আর্থার এডিংটনের মতে সময় যেন ভবিষ্যতের দিকে গতিশীল একটা তীর। সময় যদি সত্যিই গতিশীল হয়, তবে তার একটা গতিবেগ থাকবে আশা করা যায়। গতিবেগ বলতে যেমন 60 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ইত্যাদি। এরূপে সময়ের ক্ষেত্রেও আশা করা যেতে পারে—এত ঘণ্টা প্রতি······। সেই ······ কি? আবার কারও মতে সময় তার নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে; দূরে সরে যাচ্ছি বা এগিয়ে যাচ্ছি আমরাই।

প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক যে, সময়ের পথ ধরে আমরা কি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি অতীতের কোন একটি ক্ষণে? অর্থাৎ সময়ের পথ ধরে পিছু হটা কি সম্ভব? সময় সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা থেকে এর উত্তর পাওয়া যাবে না। উত্তর পেতে হলে সমস্যাটার দিকে একটু অন্যভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সময়কে যদি সত্যি সত্যি কোন ভাবে বিপরীতমুখী করে দেওয়া যায়, তবে কি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা তলিয়ে দেখতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে—সময়ের বিপরীতমুখীতা ভৌত সূত্রগুলির উপর কি কি পরিবর্তন আনবে?

পদার্থ বিদ্যার মূল সূত্রগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে সময় কোন্ দিকে ধাবমান সে সম্বন্ধে সূত্রগুলি সম্পূর্ণ উদাসীন। শুধুমাত্র সূত্রগুলির প্রয়োগের সময় প্রারম্ভিক অবস্থা দুই ক্ষেত্রে আলাদা হবে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারেও সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা স্থান ও কালের পরিবর্তন নিরপেক্ষ। এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার, ভৌত সূত্রগুলির নিরপেক্ষতা (Invariance of Physical Laws) আর শুধুমাত্র স্থান ও কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পদার্থ বিদ্যার মূল সূত্রগুলির কাল নিরপেক্ষতা অত্যন্ত সহজভাবে পরীক্ষা করেও দেখা যেতে পারে। কোন একটা প্রাকৃতিক নিয়মের গাণিতিক প্রকাশনায় t (সময়)-কে যদি $(-)t$ দিয়ে বদল করা যায়, তবে দেখা যাবে—পরিবর্তিত সূত্রটি সেই প্রাকৃতিক ঘটনাকেই প্রকাশ করছে। শুধু প্রক্রিয়াটাই বিপরীত ভাবে সমাধা হচ্ছে। ব্যাপারটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

পৃথিবীসহ অন্যান্য সমস্ত গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সময় বিপরীতমুখী হলে গ্রহগুলি আগের মতই উপবৃত্তাকার পথে কিন্তু উল্টো দিকে ঘুরবে। এ ধরনের ঘটনা অর্থাৎ বিপরীতমুখী ঘূর্ণন প্রকৃতিতে নিষিদ্ধ নয়। গ্রহগুলি যে দিকেই ঘুরুক—দুই ক্ষেত্রেই গতিবিদ্যার একই সূত্র খাটে (চিত্র 1)।

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি গতিশীল ট্রেনের চলচ্চিত্র তোলা হল। এখন সেটিকে

---

* পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ? পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

যদি উল্টোভাবে অর্থাৎ শেষ থেকে শুরু করে চালানো যায়, তবে পর্দায় আমরা দেখব—একটা উল্টোমুখো ইঞ্জিন কতকগুলি বগিকে ঠেলে নিয়ে

চিত্র 1
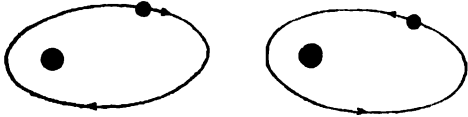
চলেছে। এ ঘটনাও দুর্লভ নয়। এক্ষেত্রেও গতি-সূত্রগুলির সময় বিবর্তন (time reversal) নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হল (চিত্র 2)। একটা প্রশ্ন রয়ে গেল—যে ঘটনা সময় বিবর্তন নিরপেক্ষ নয় তাকে কিভাবে চেনা যাবে ? কোন ঘটনার সময় বিবর্তনের পর যদি দেখা যায়, সেই ঘটনাটি ঘটা প্রকৃতিতে একেবারেই অসম্ভব—তবেই আমরা বলতে পারব ঘটনাটি সময় বিবর্তন নিরপেক্ষ নয়। এবার একটা অপেক্ষাকৃত জটিল উদাহরণ নেওয়া যাক

একটি ছেলে একটি রবারের বলকে কিছুটা উপর থেকে মাটিতে ছুঁড়ে দিল। বলটি লাফাতে লাফাতে এক সময় মাটিতে স্থির হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটির একটি চলচ্চিত্র তুলে যদি তা উল্টোদিক থেকে চালান হয়, তবে কি দেখা যাবে ? একটি স্থির রবারের বল নিজেই একসময় লাফাতে শুরু করল—প্রথমে আস্তে ও পরে জোরে এবং শেষে ছেলেটির হাতে উঠে এল (চিত্র 3)। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলে মনে হতে পারে ; কিন্তু ঘটনাটি প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ নয়। কেননা বলটি যদি ঠিক জায়গা এবং সময় মত সঠিক পরিমান ঘাত (impulse) পায়, তবে সে ঐ রকমের গতি দেখাতে পারে।

চিত্র 2

চিত্র 3

বলটির গতি যে সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তা সময় বিবর্তন নিরপেক্ষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সময়কে বিপরীত-মুখী করা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে না হলেও প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী নয়। এবার আমরা সময়কে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতার দিক থেকে বিচার করব। একটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা যাক। দুটো প্রকোষ্ঠের কথা চিন্তা করা যাক—যার একটার মধ্যে উচ্চচাপে গ্যাস রাখা হয়েছে এবং অন্যটি শূন্য (চিত্র 4)। এখন কোন একটি নলের দ্বারা

চিত্র 4

দুটিকে সংযুক্ত করলে উচ্চচাপের প্রকোষ্ঠ থেকে গ্যাস শূন্য প্রকোষ্ঠে আসতে থাকবে যতক্ষণ না দুটি প্রকোষ্ঠের চাপ সমান হয়। এবার যদি দুটো প্রকোষ্ঠেই গ্যাস, সমান চাপে থাকে, তবে একটা প্রকোষ্ঠ থেকে সমস্ত গ্যাস অন্য প্রকোষ্ঠে চলে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু 'অসম্ভব' নয়। সম্ভব হলেও তার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

পদার্থ বিদ্যায় এনট্রপি (entropy) শব্দটি দ্বারা কোন তন্ত্রের বিশৃঙ্খলতার পরিমাপ বুঝায় এবং তাপ-গতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এনট্রপি বেড়েই চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে—জগৎ সর্বোচ্চ এক বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবমান। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই সময় আর বিশৃঙ্খলা পাশাপাশি হাঁটে। তাই আর্থার এডিংটনের ভাষায় এনট্রপি হচ্ছে সময়ের তীর। এই বক্তব্য থেকে সময় সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে নেওয়া যেতে পারে। যদি সমস্ত বিশৃঙ্খলতার বৃদ্ধি থেমে যায়, অর্থাৎ সমস্ত গতির অবসান হয়, তবে আমরা বলতে পারব সময় থেমে গেছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে তা হল—বিশৃঙ্খল কোন তন্ত্রের বিশৃঙ্খলা যদি কমতে থাকে অর্থাৎ তন্ত্রটি সময়ের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল হতে থাকে, তবে সে তন্ত্রের জন্যে সময় বিপরীতমুখী বলা যাবে। উদাহরণের সাহায্যে উপরের ধারণাটাকে আরও একটু প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। যদি 10টি পয়সাকে উপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তবে হিসাব করে দেখা যায় যে, সবগুলির একপিঠ (tail) বা সবগুলির অপরপিঠ (head) পাওয়ার সম্ভাবনা প্রতি 1024 বারে মাত্র এক এবং 5টি একপিঠ ও 5টি অপরপিঠ পাওয়ার সম্ভাবনা 1024 বারে 252 (উপরের সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলা হল)। সুতরাং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার এনট্রপি প্রথম প্রক্রিয়ার থেকে বেশি। যদি 100টি পয়সা নিয়ে উপরের প্রক্রিয়াটি করা যায়, তবে দেখা যাবে যে 50টি হেড এবং 50টি টেল পাওয়ার সম্ভাবনা সবগুলি হেড বা টেল পাওয়ার থেকে 10^{30} গুণ বেশি। সুতরাং সবগুলি টেল বা হেড পাওয়া কিন্তু অসম্ভব নয়; তবে সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। এভাবে দেখানো যেতে পারে, প্রকৃতিতে যে কোন প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খল পরিণতির সম্ভাবনা সুশৃঙ্খল পরিণতির সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি। কাজে কাজেই, অসংখ্য কণিকা সম্বলিত কোন তন্ত্রের

ক্ষেত্রে সময়ের দিক সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

এবার আমরা দেখব মৌলকণিকার রাজ্যে উপরে বর্ণিত ধারণাগুলি কতখানি প্রযোজ্য। প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভৌতসূত্রগুলির নিরপেক্ষতা স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সময় বিবর্তন নিরপেক্ষতা ছাড়াও মৌলকণিকার রাজ্যে আরও দু-ধরণের নিরপেক্ষতার সন্ধান পাওয়া যায়। তা হল তড়িতান্তর নিরপেক্ষতা (Invariance under Charge Conjugation) এবং স্থান-বিবর্তন নিরপেক্ষতা (Invariance under Space-inversion).

সাধারণ বস্তুর মধ্যে আমরা যদি প্রত্যেকটি কণার তড়িতান্তর ঘটাই, অর্থাৎ যদি প্রত্যেকটি ধণাত্মক আধানকে ঋণাত্মক এবং ঋণাত্মক আধানকে ধণাত্মক করি, তাহলে কোনভাবেই নতুন বস্তুকে পুরাতন বস্তু থেকে পৃথক বলে ধরা যাবে না। একেই বলা হয় পদার্থের তড়িতান্তর নিরপেক্ষতা। তড়িতান্তর প্রক্রিয়াটিকে ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয় C-অপারেশন (C-operation)।

এবার দেখা যাক স্থান-বিবর্তন নিরপেক্ষতা বলতে আমরা কি বুঝি? যখন কোন প্রক্রিয়ার দর্পণ বিম্ব নিয়ে দেখা যায় যে সে প্রক্রিয়াটিও প্রকৃতিতে অসম্ভব নয়, তখন বলা হয় প্রক্রিয়াটির সাম্য (Parity) সংরক্ষিত (conserved) বা অন্যভাবে বলা যায় প্রক্রিয়াটি স্থান-বিবর্তন নিরপেক্ষ। এই স্থান-বিবর্তনকেই ইংরেজীতে সংক্ষেপে P-অপারেশন (P-operation) বলা হয়।

উপরিউক্ত দুটি প্রক্রিয়ার সংঙ্গে মিল রেখে সময় বিবর্তন (Time-revensal) প্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে সংক্ষেপে T-অপারেশন (T-operation) বলা হয়। 195৭ সালের আগে পর্যন্ত এই ধারণাই বিজ্ঞান জগতে প্রচলিত ছিল যে, জগতের সমস্ত প্রক্রিয়াই তড়িতান্তর নিরপেক্ষ এবং স্থান-বিবর্তন নিরপেক্ষ—যেহেতু মৌলিক কণিকার রাজ্যে বর্তমান চার রকমের বিক্রিয়ার (interaction) মধ্যে সবল (strong), তড়িৎ-চুম্বকীয় (electromagnetic) এবং মহাকর্ষীয় (gravitational)—এই তিন প্রকার বিক্রিয়াই মাত্র উক্ত দুই প্রকার নিরপেক্ষতা মেনে চলে। কিন্তু একটি বিক্রিয়ার পরীক্ষা তখন পর্যন্ত হয়নি। সেটি হল দুর্বল বিক্রিয়া (weak interaction)। এসম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন দুজন বিজ্ঞানী লী এবং ইয়াং (T. D. Lee, C. N. Yang)। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এঁরা 1958 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

তাঁদের প্রস্তাব মত মাদাম বু (C. S. Wu) এবং তাঁর সহকর্মিবৃন্দ বিশ্ববিখ্যাত কোবাল্ট-60 (Cobalt-60) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমান করলেন যে, দুর্বল বিক্রিয়ায় সমতা সংরক্ষিত হচ্ছে না এবং সেই সংগে বিক্রিয়াটি তড়িতান্তর নিরপেক্ষও নয়।

বিক্রিয়াটি পৃথক পৃথক ভাবে তড়িতান্তর নিরপেক্ষ নয় এবং এতে সমতা সংরক্ষিত হয় না; কিন্তু মজার ব্যাপার, যদি বিক্রিয়াটির উপর তড়িতান্তর প্রক্রিয়া এবং স্থান বিবর্তন প্রক্রিয়া একই সংগে প্রয়োগ করা যায়, তবে এই যুগ্ম প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়াটি নিরপেক্ষ থাকে (Invariant under combined C-and P-operation)। কিন্তু CPT প্রতিপাদ্য অনুসারে C, P এবং T—এই তিনটি অপারেশন একই সংগে কোন বিক্রিয়ার উপর প্রয়োগ করলে তা সম্পূর্ণভাবে C, P এবং T অপারেশন নিরপেক্ষ হবে। সুতরাং উপরের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিক্রিয়াটি যেহেতু যুগ্মভাবে CP-প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ, CPT-প্রতিপাদ্য অনুসারে তা T-অপারেশন নিরপেক্ষ হবে বা সময় বিবর্তন নিরপেক্ষ হবে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে K-মেসনের ক্ষয় (decay) নিয়ে। যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি যুগ্মভাবে CP-অপারেশন নিরপেক্ষ নয় এবং CPT-প্রতিপাদ্য অনুসারে একে যুগ্মভাবে CPT-অপারেশন নিরপেক্ষ হতে হবে, সুতরাং প্রক্রিয়াটি (K-meson decay) কিছুতেই সময়-পরিবর্তন নিরপেক্ষ নয়। এই পরীক্ষার তাৎপর্য ব্যাখায় হয়ত বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত; কিন্তু আমাদের ভাবনা অন্য। তা হল—কোন দিন কি কোন মানুষের পক্ষে তার সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত সোনালী অতীতকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে?

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে নৌ অভিযান

সুব্রত পাল*

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু হয় বড় বড় সামুদ্রিক অভিযান এবং শতাব্দীর পরিসমাপ্তির আগেই আবিষ্কৃত হয় নতুন সমুদ্রপথ ও স্থলভূমি। শতাব্দীর গণ্ডি অতিক্রম করে অব্যাহত ও ক্রমবর্দ্ধমান উদ্দীপনায় চলতে থাকে সামুদ্রিক তৎপরতা।

1543 সালে প্রকাশিত হয় নিকোলাস কোপারনিকাসের যুগান্তকারী গ্রন্থ De Revolutionibus Orbium Coelestium,—যদিও ধর্মযাজক এবং বিদ্যমান সামন্ত শাসনের দিক থেকে প্রচণ্ড বাধা-বিরোধিতা ও বিপদের আশঙ্কায় বইটি দীর্ঘ তিরিশ বছর অপ্রকাশিত ছিল। বইটিতে উপস্থাপন করা হয় (1) 'সূর্যকেন্দ্রিক' বা 'heliocentric' বিশ্ব-চিত্র—নাড়িয়ে দেওয়া হয় প্রায় দু'হাজার বছর পুরনো অ্যারিস্টোটলীয় 'ভূকেন্দ্রিক' বা 'geocentric' ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার ভিত। এই নতুন পরিকল্পিত চিত্রটিকে একমাত্র নতুন পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্যেই সমর্থন এবং ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল। তাই এই সময় থেকেই সূচনা হয় এক 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব'-এর। বিজ্ঞান বিশেষ করে গতি-বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞান, অভূতপূর্ব দ্রুততায় বিকাশ লাভ করে। নতুন যন্ত্র ও নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার হয়। প্রাচীন ধ্যান-ধারণাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গড়ে ওঠে নতুন ধারণা। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন ভিত্তির উপর।

সামুদ্রিক অভিযানগুলির সাফল্য এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা—এই দুয়ের সমসাময়িকতা লক্ষণীয়। এটা কি নিতান্তই আকস্মিক, না দুয়ের মধ্যে এক হেতুবাদী সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়? অবশ্যই ভাববার কোন কারণ নেই যে, সেই সম্পর্ক এক সরল সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যাবে। অন্যান্য কিছু কারণের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলে এই সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই জটিল হবে। কিন্তু একটির উপর অন্যটির স্পষ্ট নির্ভরতার সন্ধান সহজেই পাওয়া যাবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নৌ-অভিযান—14৮3 সালে অটোম্যান তুর্কীদের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটে। গ্রীকদের পরাস্ত করে অটোম্যান সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করেন। ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্বদিকে তুর্কীদের চাপ থাকার ফলে লোহিত সাগরের পথে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করা আর ইউরোপীয়দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা বিকল্প পথের কথা চিন্তা করতে হয়। ইউরোপীয়দের কাছে তখন দুটো পথ খোলা ছিল।

একটি পথ ছিল আফ্রিকা মহাদেশকে দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করা। ঐ পথ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ছিল—মহাদেশটি দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা সেই সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব ছিল। যাই হোক 1486 সালে পর্তুগীজ নাবিক বার্থোলেমিউ ডায়াজ এই পথ পরিক্রমা করেন। আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তবিন্দুর নামকরণ হয় উত্তমাশা অন্তরীপ (The Cape of Good Hope)। এর এগার বছর পরে 1497 সালে ভাস্কো-ডা-গামা এই পথেই ভারতে পৌঁছান।

আরেকটি পরিকল্পিত পথ ছিল পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে

* বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700009

করে সমুদ্রপথে চীনে পৌঁছনো। তখনও কিন্তু পৃথিবী যে গোল এ সত্য প্রমাণিত হয় নি। তাই লোকজনদের মধ্যে এরকম একটি অভিযান সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা ছিল—এই যাত্রা অনন্তকাল চলতে পারে বা পৃথিবীর প্রান্তভাগে পৌঁছে জাহাজগুলি 'পড়ে' যেতে পারে। অথচ কেউই একটা জিনিষ ভাবতে পারে নি যে মাঝপথে একটি মহাদেশও থাকতে পারে।

মধ্যযুগের এক পণ্ডিত তস্কানেলির এইরূপ একটি পরিকল্পনার কথা ক্রিস্টোফার কলম্বাস শুনেছিলেন। এ পথের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় ছিল। উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও সামর্থ্য ছিল না—তাই তাঁকে বিভিন্ন দেশের রাজদরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। পর্তুগীজরা যেহেতু 'কেপ'-এর পথেই নিরত ছিল, কলম্বাসের প্রস্তাব তাদের কাছে গ্রাহ্য হয় নি। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দরবারেও তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্পেনীয় বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হন।

স্পেনের এই সাহায্যদানের পিছনে ছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য—এই অভিযান সফল হলে এক বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (hypothesis) প্রমাণিত হবে এবং তার ফলে যথেষ্ট লাভজনক প্রতিদান পাওয়া যাবে—যদিও শেষ পর্যন্ত কলম্বাস নয়, এই প্রমাণ হাজির করেন পর্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলান (Magellan)। স্পেনের সহযোগিতায় তিনি 1519 সালে সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন (যদিও তিনি নিজে ফিলিপাইনে নিহত হন এবং একজন মালয়ের ক্রীতদাস এই অভিযান শেষ করেন)।

1492 সালের 12ই অক্টোবর কলম্বাস 'নতুন দুনিয়া'র তীরে এসে হাজির হন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্তও জানতেন না যে, তিনি এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন—পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এশিয়া মহাদেশে পৌঁছে গেছেন এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি মারা যান। যাই হোক কলম্বাসের অভিযান ইউরোপীয় শক্তিগুলি বিশেষভাবে পর্তুগাল এবং স্পেনের কাছে এক নতুন মহাদেশের দ্বারোদ্ঘাটন করে দেয়।

নৌ-অভিযানগুলির অর্থনৈতিক প্রভাব— এই সকল অভিযান নিছক কৌতূহলবশত পরিচালনা করা হয় নি। এর পেছনে ছিল এক অর্থনৈতিক স্বার্থ। কলম্বাসের ভাষায়, 'সোনাই সৃষ্টি করে সম্পদ এবং এই জিনিষ যার কাছে রয়েছে, এই পৃথিবীতে নিজের সকল চাহিদা পূরণের ও আত্মাকে প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে স্বর্গোপভোগের জন্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উপায় তার রয়েছে। সম্পদবৃদ্ধিই ছিল অভিযানগুলির মূল উদ্দেশ্য।

একদিকে লাভবান হয় পর্তুগাল। সম্পূর্ণ সমুদ্রপথে বাণিজ্য পর্তুগীজদের প্রচুর মুনাফা এনে দেয়। ভারত ও মালয়ে পৌঁছবার পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেই এই দেশগুলিতে বাণিজ্যিক আধিপত্য আরবদের হাতে চলে যায়।

অন্যদিকে স্পেন একের পর এক অভিযান চালিয়ে আমেরিকার এক বিরাট অংশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। সেখানকার নেটিভদের নির্মমভাবে দমন করা হয়। তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় এবং বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করিয়ে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। আর আমেরিকার সোনা এবং রূপোয় স্পেনের ধনভাণ্ডার ফুলতে থাকে। এছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই আফ্রিকা থেকে দাস শ্রমিকদের চালান করে আমেরিকায় খনির কাজে এবং চিনি ও তামাক উৎপাদনে নিযুক্ত করা হয়। এর সাহায্যে স্পেন প্রচুর ধন উপার্জন করে।

সামুদ্রিক অভিযানের সূচনায় ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড যদিও বেশ কিছু বছরের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু স্পেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পশ্চাদ্‌পদতার কারণে তাদের হাতে প্রাধান্য চলে যায়। 1537 সালে ইংল্যাণ্ডের হাতে স্পেন পরাস্ত হলে ইউরোপে

শক্তির নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। খনি ও বাণিজ্যের ফসলে ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যে মূলধন বা ক্যাপিটাল সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃই ধনতন্ত্র বিকাশের পথ পরিষ্কার হয়। 1500 সালের আগে থেকেই অবশ্য কিছু কিছু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন চালু ছিল, কিন্তু 1700 সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে ধনতন্ত্র প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধনতন্ত্রের মুনাফাপ্রবণতা তখনকার ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনে উৎসাহ দেয় ও আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

বৈজ্ঞানিক প্রভাব - সামুদ্রিক অভিযানগুলির প্রাথমিক সাফল্যের মূলে ছিল তখন পর্যন্ত নৌ-কারিগরিবিদ্যা (navigational technology)। এর বিকাশের স্তর তখন অবশ্য বিশেষ উন্নত ছিল না। নাবিকদের কিছু পরম্পরাগত জ্ঞান (traditional knowledge), কিছু প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত নক্সা ও তালিকা এবং আনুমানিক 1000 খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে নিয়ে আসা কম্পাস—এগুলি অভিযানে খুব সাহায্য করে। তখনও নৌ-যাত্রায় বিজ্ঞানের ব্যাপক পরিকল্পিত এবং সুসংবদ্ধ প্রয়োগ শুরু হয় নি।

অভিযানগুলির প্রাথমিক সাফল্য ইউরোপীয় দেশগুলির সামনে যে সুযোগ ও সম্ভাবনা (প্রধানত অর্থনৈতিক) হাজির করে, তার জন্যে প্রয়োজন-হয়ে পড়ে সমুদ্রযাত্রাকে আরও ব্যাপক ও সহজতর করার। স্বাভাবিকভাবেই প্রকাণ্ড চাহিদা সৃষ্টি হয় জাহাজ নির্মাণ (ship-building) ও নৌ-বিদ্যা (navigation)-র দ্রুত উন্নতির। প্রয়োজন ছিল আরও নিখুঁত নক্সা-তালিকা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির সূক্ষ্মতর জ্ঞানের। এমনকি হল্যাণ্ড ও স্পেনের মত দেশের অধিকর্তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন কোন আবিষ্কারের উপর পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বার্ণালের উক্তি—'নক্ষত্রদের গতিবিধির এখন এক নগদ মূল্য ছিল'।[৯]

প্রয়োজন মেটাতে গড়ে উঠল গণিতবিদ্যায় শিক্ষিত কারিগরদের (craftsmen) এক নতুন বুদ্ধিজীবী সমাজ। তাদের কাজ ছিল কম্পাস মানচিত্র এবং বিভিন্ন যন্ত্রের নির্মাণ। 1484 সালে পর্তুগালের দ্বিতীয় জন জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম চালাবার জন্যে গণিতবিদ্ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক কমিশন গঠন করেন। ইউরোপের প্রথম নৌ-বিদ্যার ম্যানুয়াল Regimento do Astrolabic e de Quadrante-তে 1509 সাল থেকে ওই কমিশনের কাজের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে নৌ-বিদ্যা শিক্ষাদানের স্কুল গড়ে ওঠে। এমনকি নাবিকদের পর্যন্ত প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষা দেওয়া হত। নৌ-শিল্পকলার বাস্তব খুঁটিনাটি বর্ণনা করে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত বই—উইলিয়াম বুর্নের A Regiment of the Sea (1573) স্বভাবতঃই আর উপেক্ষিত অনাদৃত হয়ে থাকা তো দূরের কথা, জ্যোতির্বিজ্ঞান হয়ে উঠল 'বিজ্ঞানের রাণী'।

সাময়িকভাবে হলেও শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার ব্যবধান সঙ্কুচিত হল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, যখনই তত্ত্ব এবং প্রয়োগের ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে দ্রুতহারে। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক বড় অংশই ছিল মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা। এমনকি প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বিজ্ঞানকেও ইউরোপীয়রা পুনরাবিষ্কার করতে সক্ষম হন আরবদের মাধ্যমে। তথাপি তারা তখন বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং পরবর্তী দু'শো বছরের মধ্যে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে পেরেছিলেন। অথচ মধ্যযুগে ভারতবর্ষ এবং চীনে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নত থাকা সত্ত্বেও এখানে সে সময় তেমন কিছু ঘটল না। এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন অধ্যাপক নরসিম্হান তাঁর এক প্রবন্ধে।[৪] কারণ হিসাবে তিনি নির্দেশ করেছেন চিন্তার

উৎপাদক বা তাত্ত্বিক এবং দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদক বা কারিগরদের মধ্যেকার ব্যবধান। কিন্তু যেটা তিনি দেখান নি তা হচ্ছে এই ব্যবধানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি। ইউরোপের তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক পটভূমিই সেখানে চিন্তাবিদ্ বা বিদ্বান এবং কারিগরদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। এমনকি কোন কোন সময় একই লোককে দুয়ের ভূমিকায় পাওয়া গেছে।

এদিকে নিখুঁত ও সূক্ষ্মতর নিরীক্ষণের জন্যে দরকার হল নিখুঁত পরিমাপ পদ্ধতির—পুরনো যন্ত্রগুলির উন্নতি ও নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেখা দিল সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণগুলির (observation) নতুনভাবে বিশ্লেষণের। প্রাচীন গ্রীক বা অ্যারিস্টোটেলীয় ধারণার সঙ্গে নতুন আবিষ্কৃত তথ্যগুলির দ্বন্দ্ব বাড়তে লাগল। ফলে প্রাচীন ধ্যান-ধারণাগুলির উপর আঘাত এল প্রথমে এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই। মানব চিন্তা ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত জ্যোতিবিজ্ঞানেও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু হল এক অভূতপূর্ব আলোড়ন—সার্বিকভাবে যাকে 'রেনেসাঁস' (Renaissance) আন্দোলন বলা হয়। কোপারনিকাসের সময় থেকে অ্যারিস্টোটেলীয় বিশ্ব-পরিকল্পনার ছবিটাকে ধ্বংস করে এক নতুন ছবি গড়ে তোলার যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয় নিউটন তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটান।

স্পষ্টতই দেখা গেল, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, যে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী তখনকার দিনে শক্তিশালী হচ্ছিল, সেই শ্রেণীর স্বার্থেই এই পরিবর্তন প্রয়োজনীয় ছিল। নিচের উদ্ধৃতি এই বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

'রেনেসাঁস বৈশিষ্ট্যমূলক ব্যক্তি তার নিজের সমাজ ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। নৌ-চালক, রাজবংশীয় পুরুষ বা মূলধন বিনিয়োগকারীদের প্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাসমূলক (hierarchial) জগৎটাকে উল্টে ফেলার কোন ইচ্ছা ছিল না। – এমনকি অনেকে একে শক্তিশালী করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উচ্চাশা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী হিসাবে পরম্পরাগত বাধ্যবাধকতাগুলিকে অবজ্ঞা করার পথে নিয়ে গেছে।'[4]

ফলে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় সামন্তবাদ ও গির্জার লালিত-পালিত প্রাচীন বিশ্বদর্শন। পরিবর্তে গড়ে ওঠে যান্ত্রিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও বুর্জোয়া বা মানবতাবাদী দর্শন। আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন হয়।

তথ্যপঞ্জী

(1) এইচ জে ফিরথ্ ও এম্ গোল্ডস্মিথ, সায়েন্স, হিস্ট্রি অ্যাণ্ড টেকনোলজি, খণ্ড-1, ক্যাসেল, লণ্ডন, 1965, পৃঃ 29

(2) জে ডি. বার্ণেল, সায়েন্স ইন হিষ্ট্রি, খণ্ড-2, পেন্‌গুইন বুকস্, 1965, পৃঃ 403;

(3) সায়েন্স-টু-ডে, আগষ্ট, 1977;

(4) এইচ, জে, ফিরথ্ ও এম, গোল্ডস্মিথ, অপ্. সিট. (op. cit.), পৃঃ 39.

মঙ্গলগ্রহ অভিযানে বেতার যোগাযোগের ভূমিকা

অরুণকুমার সেন*

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বেতার যোগাযোগের সাফল্যই আজ সম্ভব করেছে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে গ্রহান্তর অভিযান। কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণের সময় থেকে শুরু করে মধ্যপথে তার গতি নিয়ন্ত্রণ, গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার পর পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, সেখানকার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রেরণ, এমনকি কোন অভিযাত্রীর কণ্ঠস্বর প্রেরণ—এ সবই সম্ভব হয়েছে বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে।

এহেন যোগাযোগে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দূরত্ব। বলাবাহুল্য, দূরত্বকে অতিক্রম করতে গিয়ে বেতার-তরঙ্গ ঠিক আলোক-রশ্মির মতই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। চাঁদের দূরত্ব হল প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার আর মঙ্গলগ্রহের বেলায় তা প্রায় সাড়ে তিন কোটি কিলোমিটার। স্বভবতঃই চন্দ্র অভিযানের তুলনায় মঙ্গলগ্রহ অভিযানে বেতার যোগাযোগ সমস্যা অনেক বেশি। বিশেষত কৃত্রিম উপগ্রহ করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত প্রেরকযন্ত্রের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। কেননা, যন্ত্রটি চালাবার জন্যে যে শক্তির উৎস দরকার হয়, সেজন্যে নির্ভর করতে হয় সৌর-কোষের উপর। তাছাড়া, যন্ত্রটির তথা সৌর-কোষের ওজন ও আয়তন খুব ছোট করতে হয়। না হলে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের আনুষঙ্গিক খরচ বেড়ে যাবে অনেক। এমতাবস্থায়, সমস্যার সমাধান করা হল একটি অতিরিক্ত কৃত্রিম উপগ্রহে রিলে কেন্দ্র (relay centre) স্থাপন করে।

আজকাল পৃথিবীর দুই অংশের মধ্যে দূর-পাল্লার বেতার যোগাযোগ স্থাপনে কৃত্রিম উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর একটি বিশেষ কক্ষ-পথে স্থাপন করা হয়, যার ফলে উপগ্রহটির আবর্তন ও ঘূর্ণনের বেগ সমান হয়। এই আবর্তন ও ঘূর্ণন যদি একই দিকে করা যায়, তাহলে উপগ্রহটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে আপাত-স্থির বলে মনে হবে। তাই এরকম উপগ্রহকে আপাতস্থির (geostationary) উপগ্রহ বলা হয়। আপাতস্থির উপগ্রহের সাহায্যে বেতার যোগাযোগের সুবিধা হল, প্রেরক বা গ্রাহক যন্ত্রের বিশালাকার এরিয়ালের দিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। ঐ আপাতস্থির উপগ্রহের দূরত্ব অনেক বেশি। প্রায় 35,6000 কিলো-মিটার। মঙ্গলগ্রহ অভিযানের ক্ষেত্রে আপাত-স্থির উপগ্রহের এই দূরত্বজনিত সমস্যার সমাধান করা হয় এক অভিনব উপায়ের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে কক্ষপথটিকে করা হয় ডিম্বাকৃতির (চিত্র 1)। আসলে মঙ্গলগ্রহ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলি পৃথিবীর দিকে রিলে করবার জন্যে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে 'অরবিটার' নামে একটি আপাতস্থির কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে তার সাহায্য নেওয়া হয়। অরবিটার প্রতিবার আবর্তনকালে মঙ্গলগ্রহের সবচেয়ে কাছে প্রায় 1,500 কিলোমিটার ও সবচেয়ে দূরে প্রায় 32,000 কিলোমিটার উচ্চতায় এসে পড়ে। পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণকালে ঐ অরবিটারের সঙ্গে সংযুক্ত, 'ল্যাণ্ডার' (Lander) নামে একটি যন্ত্রপাতিবহুল উপগ্রহও পাঠান হয়—

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স এণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

যাদের একযোগে বলা হয় ভাইকিং মহাশূন্য-যান। মঙ্গলগ্রহের কাছে পৌঁছনোর পর ভাইকিংকে মঙ্গলগ্রহের ঐ ডিম্বাকৃতি কক্ষপথটিতে স্থাপন করা হয় পৃথিবী থেকে নির্দেশ করে সেগুলি বেতার মারফৎ অরবিটারে প্রায় 40 মিনিট ধরে পাঠান হয় যখন অরবিটার মঙ্গলগ্রহের জমির সবচেয়ে কাছে প্রায় 1,500 কিলোমিটার উচ্চতায় এসে পড়ে। ঐ সময় তথ্য-

চিত্র 1
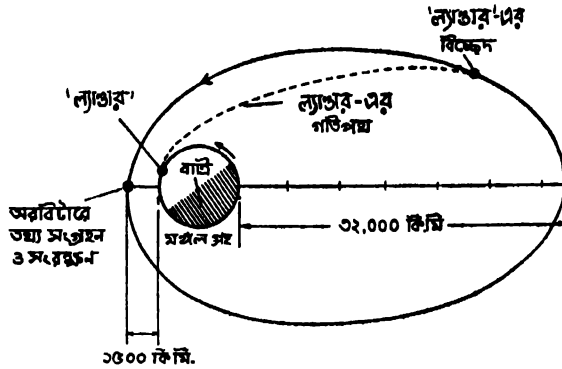
বহনকারী বেতার সংকেত পাঠিয়ে। তারপর দ্বিতীয় এক বেতার সংকেত পাঠিয়ে অরবিটার থেকে ল্যাণ্ডার-কে বিযুক্ত করে মঙ্গলগ্রহের গুলি অরবিটারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে আবার তথ্যগুলি অরবিটার থেকে পৃথিবীর দিকে রিলে করে পাঠান হয়। বলা
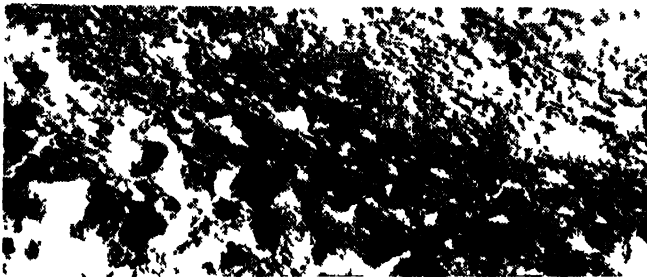
চিত্র 2

ল্যাণ্ডার এর টেলিভিশন ক্যামেরায় গৃহীত মঙ্গলগ্রহের জমির একটা খুব কাছ থেকে নেওয়া দৃশ্য চিত্র 2-এ দেখান হয়েছে। ছবিটিতে নানা রকমের পাথরের টুকরো পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলগ্রহের মাটিতে। মাঝারি একটা টুকরোর ব্যাস প্রায় 10 সেণ্টিমিটারের মত।

জমিতে ধীরে ধীরে অবতরণ করান হয়। ল্যাণ্ডার-এর মধ্যেকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের জমি (চিত্র 2), অভ্যন্তর এবং আবহাওয়ার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ বাহুল্য, এইভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রিলের মাধ্যমে দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ খুব জোরালো করা যায়। বিশেষত, ল্যাণ্ডার ও অরবিটার-এর বেতার সংযোগ এমন সময়ে করা

হচ্ছে, যখন তাদের দূরত্ব মাত্র 1,500 কিলোমিটার। আবার অরবিটার ও পৃথিবীর মধ্যে সংযোগের জন্যে রয়েছে একটি এক মিটার ব্যাসবিশিষ্ট মাইক্রোওয়েভ এরিয়াল—যেটি অরবিটার থেকে সবসময়ে নিখুঁতভাবে চেয়ে রয়েছে পৃথিবীর দিকে। এর জন্যে অবশ্য বিশেষ ধরণের তিনঅক্ষ-স্থিরিকৃত জাইরোস্কোপের ব্যবহার করতে হয়। মঙ্গল গ্রহ থেকে তথ্যাদি রিলে করতে গিয়ে সেখানে যে পরিমাণ শক্তি প্রেরক যন্ত্রে লেগেছিল তাতে দেখা গেছে, বৈদ্যুতিক শক্তির মূল উৎস সৌর-কোষ অরবিটারে উৎপন্ন করে প্রায় 800 ওয়াট শক্তি আর ল্যাণ্ডার-এ করে 70 ওয়াট শক্তি। এথেকে সহজেই বোঝা যায়, এই প্রেরকযন্ত্রের শক্তি কত সীমাবদ্ধ।

পৃথিবী থেকে নির্দেশবাহী সঙ্কেত পাঠাতে আধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেসন (digital communication) পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে দূরপাল্লায় নির্ভুলভাবে সংকেত পাঠান অনেক সহজ; তবে এ ব্যবস্থায় প্রেরক যন্ত্রের শক্তি যথেষ্ট হওয়া দরকার। অপর পক্ষে ল্যাণ্ডার-এ উৎপাদিত মাত্র 70 ওয়াট শক্তি দিয়ে ল্যাণ্ডার থেকে টেলিভিশন ক্যামেরায় গৃহীত মঙ্গল গ্রহের ছবি ডিজিট্যাল কমুউনি-কেশন পদ্ধতিতে পাঠানো সম্ভব নয়। একজন্যে ব্যবহার করা হয় ফ্রিকয়েন্সি মডুলেশন (frequency modulation) পদ্ধতি।

ল্যাণ্ডার-এর নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিচের বিভিন্ন তথ্যগুলি পৃথিবীতে বসে জানা গেছে :

(i) মঙ্গলগ্রহের আকাশে ভাসমান ধূলিকণা থাকায় আকাশের রং গোলাপী ;

(ii) মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন, আরগন ও জলীয় বাষ্প উপস্থিত ;

(iii) মঙ্গলগ্রহের মাটি লৌহপ্রধান এবং তা নানাপ্রকার খনিজ পদার্থের মিশ্রণে তৈরি ;

(iv) মঙ্গলগ্রহে জৈব পদার্থ অনুপস্থিত ইত্যাদি।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এ জাতীয় অভিযান যে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। কাজে কাজেই মঙ্গল-গ্রহের ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে জানবার জন্যে অপেক্ষা করা যাক।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকূট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে হাতে বা ডাকযোগে লেখা পাঠাতে হবে। পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি কর্তৃক লেখা মনোনীত হলে তা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ সময়মত প্রকাশ করা হবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ইউরেনাসের নতুন উপগ্রহ

পথিক চট্টোপাধ্যায়*

10ই মার্চ 1977, সবে সন্ধ্যে হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের কাভালুর মানমন্দিরে তুমুল উত্তেজনা; বেশ কিছুদিন আগে টেলিস্কোপিক ক্যামেরার চোখে আব্‌ছা চিহ্ন রেখে যাওয়া একটি নক্ষত্র, SAO-158687, দেখতে পাবার আজ আবার সমূহ সম্ভাবনা। নক্ষত্রটির উজ্জ্বলতা 8·8, কিন্তু অসুবিধে হল প্রায় একই জায়গায় অবস্থিত ইউরেনাস গ্রহটি। যার উজ্জ্বলতা প্রায় 6. ফলে প্রায় 16 গুণ বেশি উজ্জ্বল ইউরেনাসের জন্যে ক্যামেরার চোখে নক্ষত্রটির ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম।

তাই বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করলেন ফিল্টার, ফলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অবলোহিত রশ্মিরই কেবলমাত্র প্রবেশাধিকার মিলল ক্যামেরার বুকে। যেহেতু বর্ণালী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নক্ষত্রটি K-5 গোষ্ঠীর, তাই বিজ্ঞানীরা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উজ্জ্বলতার প্রভাব কমিয়ে আনতে অনেকটা সক্ষম হন। প্রায় $\frac{1}{8}$ ভাগ কমল। নির্দিষ্ট সময়ে চালু হল ক্যামেরা। টানা ত্ু'ঘণ্টা চলার কথা; ইতিমধ্যে ক্যামেরার চোখে ধরা পড়তে শুরু করেছে নক্ষত্রটি। ক্রমশ নক্ষত্রটি, ইউরেনাস এবং টেলিস্কোপ প্রায় এক আপাত সরলরেখার দিকে এগিয়ে চলেছে। সবই ঠিকমত চলছে। নক্ষত্রটির উজ্জ্বলতা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার কথা, যেহেতু নক্ষত্রটির আলো ইতিমধ্যেই প্রতিসরিত হতে স্বরু করেছে ইউরেনাসের আবহমণ্ডল দ্বারা। কিন্তু ইউরেনাস এবং নক্ষত্রটি একই আপাত সরলরেখায় আসার মিনিট চল্লিশেক আগে ঘটল সেই ঘটনাটা।

হঠাৎ ফটো-ইলেকট্রিক রেকর্ডারে ধরা পড়ল—নক্ষত্রটির উজ্জ্বলতা একেবারে কমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 102 সেন্টিমিটার টেলিস্কোপের সঙ্গে লাগান 20 সেন্টিমিটার গাইড টেলিস্কোপে ধরা পডল নক্ষত্রটি নেই; কি ব্যাপার! এরই মধ্যে আবার ধরা পড়ল নক্ষত্রটি টেলিস্কোপে এবং তা বোঝা গেল রেকর্ডারে! মাত্র 9 সেকেণ্ড সময় সে হারিয়ে গেছল।

এই ঘটনা ঘটিয়েছে সম্ভবত কোন উপগ্রহ, বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন ঐ সময়ে ইউরেনাসের 5টি আবিষ্কৃত চাঁদের কেউই তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাহলে? এটা কি ঘটিয়েছে কোন অনাবিষ্কৃত উপগ্রহ? যদি তাই হয় তাহলে সম্ভবত এটাই হবে ইউরেনাসের সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ।

যেহেতু নক্ষত্রটির এবং ইউরেনাসের অবস্থান নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব, তাই উপগ্রহটির নির্ভুল অবস্থানও জানা সম্ভব। উপগ্রহটির ইউরেনাসের চারপাশে ঘুরতে কত সময় লাগবে, তা বের করতে বিজ্ঞানীরা সাহায্য নিলেন কেপ্‌লারের সূত্রের এবং উপগ্রহের ছায়ার গতিবেগের। বিজ্ঞানীরা সমস্ত গণনা বেসেল তলে করেন এবং গ্রহণের সময় থেকে উপগ্রহের ব্যাসও মাপলেন। মাত্র একবার পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা দেখলেন উপগ্রহটির ব্যাস 32 কি. মি-এর মত এবং গ্রহের চারপাশে ঘুরতে সময় নিচ্ছে 10 ঘণ্টার মত।

যদি এটা উপগ্রহ-ই হয়, তবে কেন এতদিন দেখা যায় নি? তার কারণ, টেলিস্কোপে এই ধরণের প্রায় অদৃশ্য মহাজাগতিক বস্তুর ছবি তোলার অনেক

*179/5, কালীঘাট রোড, কলিকাতা-700 026

অসুবিধে আছে, বিশেষ করে উজ্জ্বল বস্তুকে পিছনে রেখে।

এই নতুন উপগ্রহটি আশা করা যাচ্ছে, উজ্জ্বলতায় প্রায় 18 এবং গ্রহের কিনারায় থাকায়, কমপিউটারের সাহায্যে গ্রহের প্রান্তের ফটোর বিশ্লেষণে এই উপগ্রহ সম্বন্ধে আরও খোঁজ পাওয়া যাবে। অথবা অপেক্ষা করতে হবে পাইওনীয়ার-10 এবং-11 থেকে ছবি পাওয়া গেলে সেই ছবির বিশ্লেষণের রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত।

ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব অ্যাষ্ট্রো-ফিজিক্সের প্রফেসর জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ডঃ এস কুপ্পুস্বামী এই কৃতিত্ব লাভের অধিকারী। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই উপগ্রহের বিশদ তথ্য জানা যাবে। স্বীকৃত হবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের কথা।

অলিম্পিক খেলাধুলা ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

শ্যামসুন্দর দে*

24শে সেপ্টেম্বর, 1977.

বিকেল সাড়ে তিনটেয় ইডেন গার্ডেনে আমেরিকার কসমস ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের যে ফুটবল খেলাটা হয়ে গেল সে সম্বন্ধে নানান খবর তার আগের কয়েক দিনের খবরের কাগজে, ঘরে-বাইরে, স্কুলে-কলেজে, অফিসে-আদালতে, রেস্তোরায়, চায়ের দোকানে—সর্বত্রই সবাইকে জমিয়ে রেখেছিল। এই খেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল ফুটবল সম্রাট পেলেকে কেন্দ্র করে। পেলেকে দেখবার জন্যে বা তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখবার জন্যে সকলের চোখই ইডেন বা টেলিভিশনে আবদ্ধ ছিল। পেলেদা কখন আসবেন, কি ভাবে আসবেন, কি তাঁর নেশা, তিনি কেমন দেখতে, কি খান, কখন অনুশীলন করেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খবর ইত্যাদি জানবার জন্যে ছোট থেকে বড় কারোরই উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। ফুটবলে যেমন পেলে, হকিতে ধ্যানচাঁদ, ক্রিকেটে ব্রাডম্যান কিংবা সোবার্স, মুষ্টিযুদ্ধে মহম্মদ আলি, সাঁতারে মার্ক স্পিন প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিগণ সারা পৃথিবীর লোকের কাছে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন—তা কোন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ বা শিক্ষাবিদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। রক্তমাংসে গড়া মানুষ হয়েও তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে অজেয় বা ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী বলে প্রতিভাত।

আজকের দিনে পৃথিবীতে বহু রকমের খেলা-প্রচলিত। তবে, প্রধানত ইনডোর ও আউটডোর—এই দু'প্রকারেই সমস্ত খেলাকে মোটামুটিভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। নিয়মিত অনুশীলন ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার মাধ্যমেই দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নত হয়। তবে ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী প্রতিযোগীদের সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সারা পৃথিবীর মানুষের মনোযোগ তখন ঐ খেলার দিকে আবদ্ধ থাকে। নিজের দেশের সম্মান রক্ষায় তখন লোকের মনে শুধু জিজ্ঞাসা ও আশংকা। আজকের দিনে একথা অনেকেই মনে করেন, অলিম্পিক খেলাধুলায় সাফল্য যে কোন দেশের উন্নতির মাপকাঠি।

এই অলিম্পিক খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জানবার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কথিত

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

আছে যে, খৃষ্টপূর্ব 776 অব্দে গ্রীক দেশের অলিম্পিয়া নামক স্থানে সর্বপ্রথম এই খেলাধুলা শুরু হয়। শুরুর পর থেকেই প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর এই খেলা অনুষ্ঠিত হবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হবার বহু বছর আগে থেকেই গ্রীকদের শিক্ষা-দীক্ষায়, সৈনিক শিক্ষণে এবং নানারকম উৎসবে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলার চর্চা এবং পরিবেশনের প্রথা চালু ছিল। প্রাচীন গ্রীসকেই প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার জন্মস্থান বলা হয়। গ্রীকদের ধর্মীয় ও পৌরাণিক গ্রন্থে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার উল্লেখ আছে। ঐ দেশে তখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানার্থেও বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করার রীতি প্রচলিত ছিল। তৎকালীন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সম্পর্কীয় বহু কথাই পাওয়া যায় কবি হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যে। আজকের দিনের মত প্রাচীনকালে গ্রীকদেশে খেলোয়াড়রা সাধারণ লোকের কাছে দার্শনিক বা রাজনীতিবিদদের চেয়ে অধিকতর জনপ্রিয় ছিলেন—গ্রীক সাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ঐ প্রাচীনকালে গ্রীকদেশে কি কি খেলাধুলা চালু ছিল, কোন্ খেলাধুলায় খেলোয়াড়রা কিরূপ দক্ষ ছিল বা খেলোয়াড়দের রীতিনীতি ও অনুশীলন সম্পর্কিত কোন তথ্য এতে পাওয়া যায় নি। তবে যা কিছু জানা সম্ভব হয়েছে তার সবই সংগৃহীত হয়েছে হোমারের যুগ থেকে শুরু করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রোমান সাম্রাজ্যের সময়কার গ্রীক সাহিত্য, ছবি, খোদাই করা বিভিন্ন কারুকার্য প্রভৃতি থেকে। কোন বিশেষ খেলা শেষ হতে কত সময় লাগে বা সেই সময়ের সঙ্গে পূর্বের রেকর্ডের তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি জানা এগুলি থেকে সম্ভব হয় নি—কেননা আজকের দিনের মত সূক্ষ্মভাবে সময় পরিমাপের পদ্ধতি তখন জানা ছিল না।

গ্রীকদেশে খেলাধুলা ছিল ধর্মীয় ব্যাপার। প্রাচীন গ্রীকরা ধারণা পোষণ করত, শারীরিক দক্ষতা ও পটুতা দিয়ে তারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শবযাত্রায় বিভিন্ন খেলাধুলা প্রদর্শনের আয়োজন করত এবং এই উপায়ে মৃতের শরীরে কিছু ক্ষমতার সঞ্চার হয় বলে তারা মনে করত। ইলিয়াড মহাকাব্যে এজাতীয় খেলার উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, ঐ মহাকাব্যে এও উল্লিখিত আছে যে, খেলা শেষে বিজয়ীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হত। তৎকালীন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত খেলাধূলা প্রাধান্য পেত, তা হল—যুদ্ধরথ (Chariot, বিশেষ ধরণের চার চাকার গাড়ী) চালানো, দৌড়, কুস্তি, তীর ও বর্শা ছোঁড়া, লং জাম্প, বিশেষ চক্রাকৃতি বস্তু ছোঁড়া ইত্যাদি। যুদ্ধরথ টেনে নিয়ে যায় 2টি ঘোড়া। গ্রীক দেশের পৌরাণিক গল্পে আছে, যুদ্ধরথের দৌড়ের মাত্রা ঘোড়ার উপর আদৌ নির্ভর করে না, তা ঘোড়সওয়ারের সুচিন্তিত দক্ষতার উপরই নির্ভরশীল।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সময় প্রাচীনকালে গ্রীকেরা শুধু তেল মাখতো এবং শরীরে পরিধেয় কোন বস্ত্র রাখতো না। প্রতিযোগীরা একসঙ্গে বেশ দূর থেকে দৌড়ে কোন নির্দিষ্ট খুঁটিকে পাক খেয়ে তবেই যুদ্ধরথ টানতে পারত। প্রতিযোগীদের জন প্রতি দুটি 'ঘোড়াবিশিষ্ট' যুদ্ধরথ ঠিক করা থাকত। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গাড়ি চালানোর জন্যে ঘোড়া বাছাই করে দিতেন। হোমারের কাব্যে এ জাতীয় ঘটনা বিশদভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ ধরনের পাত্রের গায়ে প্রতিযোগীদের দূর থেকে ছুটে আসার ঠিক আগের মুহূর্তের অঙ্কন চিত্র পাওয়া গেছে (চিত্র 1)। এটি খৃষ্টপূর্ব 500 অব্দের সমকালীন চিত্রলিপি। পাঁচজন প্রতিযোগী দৌড় শুরু করার ঠিক আগে যেভাবে দাঁড়ায়—চিত্রে তাই বোঝানো হয়েছে। দৌড়নোর আগে একটা অদ্ভুত দার্শনিক ভঙ্গীতে যুদ্ধরথের চালকরা দাঁড়ায়। এই কারুকার্যটি এথেন্সের একটি পাত্রের গা থেকে পাওয়া গেছে।

মুষ্টিযুদ্ধ ছিল সেকালের খুবই ভয়াবহ খেলা। এই খেলায় কখন কে হারবে বা জিতবে তা নির্দিষ্ট

থাকত না। কোন একজনের যখন একেবারে নড়বার ক্ষমতা থাকত না, তখনই খেলার নিষ্পত্তি হত। ফলে খেলায় যে হেরে যেত, বিজয়ীর আক্রমণে কোন কোন ক্ষেত্রে সে মারা যেত। গ্রীসের মুষ্টিযোদ্ধারা মুষ্টিতে নরম আবরণ ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে রোমে ঐ মুষ্টিযুদ্ধ চালু হয়, তবে রোমের মুষ্টিযোদ্ধারা মুষ্টিতে সীসা বা লোহার পুরু আবরণ ব্যবহার করত; ফলে বিজয়ীর আক্রমণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজিত মারা যেত।

চিত্র 1

চিত্র 2

সেখানকার আর একটি পাত্রের গায়ে খেলোয়াড়দের অনুশীলনকালীন অঙ্কিত চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে (চিত্র 2)। এটি খৃষ্টপূর্ব [illegible]2 থেকে [illegible]0 অব্দের ঘটনা বলে অনেকে মনে করেন। চিত্রে প্রথম জন (বাঁদিক থেকে) লং-জাম্পের আগে, দ্বিতীয় জন বল্লম ছোঁড়বার আগে এবং তৃতীয় জন চক্রাকৃতি পাত্র ছোঁড়বার আগে অনুশীলন করছেন—দেখানো হয়েছে। বল্লমবীর (দ্বিতীয় জন) বল্লম ছোঁড়বার আগে সঠিক লাইনে সমতা রক্ষার অনুশীলনে ব্যস্ত।

প্রাচীন গ্রীকদেশে কুস্তিখেলাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা বলে ধরা হত। গ্রীক সাহিত্যে এর বহু উপমা আছে। সেকালের হারকিউলিস, থেসিয়াস প্রমুখ বীরদের নৈপুণ্যের বর্ণনা নানাভাবে (চলচ্চিত্র, গল্প) এখন পরিবেশিত হয়। মুষ্টিযুদ্ধের মত কুস্তিখেলা মোটেই ভয়াবহ ছিল না। কুস্তি খেলায় দৈহিক শক্তির সমতা ও পটুতা প্রদর্শনেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। প্রতিযোগীরা একে অপরকে পরপর তিনবার ধরাশায়ী করতে পারলে তবে ঐ খেলার নিষ্পত্তি হত।

পরবর্তীকালে গ্রীকেরা দৌড়বার জন্যে ডেলপি নামক স্থানে একটি স্টেডিয়াম তৈরি করে (চিত্র 3)।

গ্রীক শব্দ স্টেডিয়ন (stadion) থেকেই স্টেডিয়াম শব্দটি চালু হয়েছে। আসলে এটি দৈর্ঘ্যের পরিমাপক। স্টেডিয়ামের ঐ মাঠ লম্বায় 580 ফুট এবং চওড়ায় 63 ফুট। দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়ের ব্যবস্থা থাকত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এটিকে মেরামত করে প্রাচীন ঐতিহ্য হিসাবে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তবে এখনকার মত সেকালে কোন দৌড়ের সময়কালের নিখুঁত পরিমাপ সম্ভব ছিল না।

চিত্র 3

লং-জাম্প দেওয়ার সময় প্রতিযোগীরা হু'হাতে, বাঁকানো ডাম্বেল আকৃতির ওজন ব্যবহার করতো এবং জাম্প দেওয়ার সময়কালে ঐ ওজনকে বিভিন্ন অবস্থানে আগুপিছু করে প্রতিযোগীরা সুবিধে করে নিত (চিত্র 4)। এর ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি দূরত্ব পর্যন্ত জাম্প দিতে পারত বলে বর্ণিত আছে। ঐ ডাম্বেলগুলির ওজন পাউণ্ড থেকে। পাউণ্ড পর্যন্ত, তবে যে কোন দৌড়-বারই দুটি সমান ওজনের ডাম্বেল ব্যবহার করত।

চক্রাকার চাকতি ছোঁড়াটাও বিশেষ পদ্ধতিতে কার্যকরী করা হত। ঐ চক্রের ওজন প্রায় পাঁচ পাউণ্ড। চক্রটিকে জোরে ছুঁড়তে হলে ছোঁড়বার ঠিক আগে খেলোয়াড় কয়েকটি ধাপে চক্রটিকে হাত দিয়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে তবেই ছুঁড়ত (চিত্র 5)। ছোঁড়বার আগের মুহূর্তে এমনই অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেলোয়াড় ঘুরে পড়ত। এই খেলায় খেলোয়াড়দের শরীরের বিশেষ কতকগুলি স্থানের পেশী

চিত্র 4

অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হত এবং তা থেকে সাধারণভাবে খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য যাচাই করা হত। কুস্তিখেলার মত চক্র এবং বল্লম ছোঁড়ার খেলাও প্রাচীন গ্রীকদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। অনেক সময় এগুলি প্রতীক হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

বল্লম নিক্ষেপ খেলায় প্রতিযোগীদের মাটিতে বা উঁচু কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বল্লম ছুঁড়ে মারতে হত। ঐ বল্লম প্রতিযোগীদের দৈহিক উচ্চতার সমান দৈর্ঘ্যের

এবং প্রায় আধইঞ্চি থেকে একইঞ্চি মোটা ; কিন্তু হাল্কা কাঠ দিয়ে তৈরী। এতে দৈহিক পটুতার ততটা

কিন্তু দূরত্বের সাপেক্ষে বল্লমটি নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে।
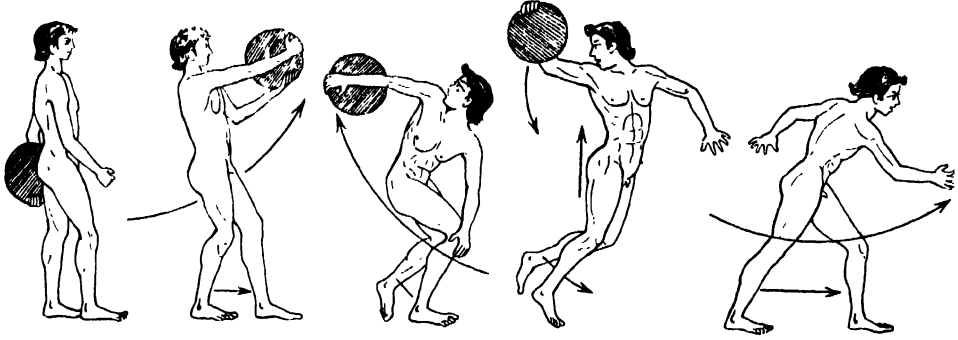
চিত্র 5

প্রয়োজন ছিল না, কেননা প্রতিযোগীরা কত দূর পর্যন্ত বল্লম ছুঁড়তে পারে তা প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত হত না। তবে প্রয়োজন ছিল দক্ষতা ও নৈপুণ্যের। প্রায় দু'ফুট লম্বা চামড়ার দড়ি দিয়ে বল্লমকে
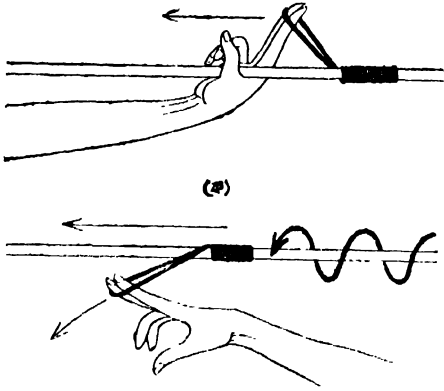
চিত্র 6

বিশেষ ভাবে পাকানো হয় [চিত্র 6 (ক)]। বল্লম নিক্ষেপকারী হাতের তালুতে বল্লমটি অনুভূমিকভাবে রেখে ঐ জড়ানো চামড়ার প্রান্তদেশকে আঙুল দিয়ে টানটান করে ধরে রাখে। এরপর লক্ষ্য বস্তুর দিকে সজোরে নির্খুতভাবে ছুঁড়ে দেয় [চিত্র 6 (খ)]। এভাবে ছুঁড়লে বল্লমটি ঘুরতে ঘুরতে আগিয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় আঙুলের উপর খুবই জোর পড়ে ঠিকই,

প্রাচীন গ্রীকদেশে এই সমস্ত খেলা সাধারণত অলিম্পাস পর্বতের দেবতা, জিউয়াস এবং হেরা (Zeus & Hera)—এঁদের সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত হত।

শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যেই নয়—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যেও খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল এবং ছোট বড়োর কোন ভেদাভেদ থাকত না। এমনকি, বড় বড় গীর্জার সামনে সফল প্রতিযোগীদের মূর্তি নিয়মমাফিক স্থাপন করার প্রচলনও ছিল।

গ্রীকদের এই খেলার ধারা পরবর্তীকালে ইটালী এবং রোমে বিস্তারলাভ করে। গ্রীকদেশের ঐতিহ্য ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিক খেলাধুলার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। রোমে এই জাতীয় খেলাধুলাকে সাধারণ লোকে সার্কাস হিসাবে গ্রহণ করত এবং তাও ক্রমশ লোপ পেতে থাকে এবং 393 খৃষ্টাব্দের পর অলিম্পিক খেলা উঠে যায়। প্রায় 1,500 বছর পরে অর্থাৎ, 1896 খৃষ্টাব্দে ফরাসী শিক্ষাবিদ ব্যারণ পিয়ের দ্য ক্যুবেরটিন এথেন্সে আধুনিক অলিম্পিক খেলার পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক খেলা বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মর্যাদার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

উপরের আলোচনা প্রসঙ্গে মনে হয়, অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা—যাঁরা বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা সবাই তো সাধারণ মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেই ভবিষ্যৎ জীবনে অসাধারণত্ব অর্জন করেছেন; এ কারণে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এঁদের ক্রীড়া পারদর্শিতার উৎস কোথায়? একথা প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে, খেলাধূলায় পারদর্শিতার মূলে প্রধান ভিত্তি হচ্ছে শারীরিক পটুতা। শারীরিক গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ বিভিন্ন দিকে কুশলতা অর্জন করেন। যেমন, অপেক্ষাকৃত ছোট শরীর এবং দীর্ঘ হাত-পা যাঁদের, তাঁরা দীর্ঘসময় ব্যাপী পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলায় পারদর্শী হতে পারেন না—তবে হালকা খেলাধুলায় তাঁরা যোগ্যতা দেখান। বেঁটে লোকেরা লম্বা লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভার উত্তোলনকারীরা ভারী ও খর্বাকৃতির হয়ে থাকেন। যাঁরা দ্রুত দৌড়তে বা লাফাতে পারেন, তাঁরা রোগা এবং তাঁদের পা বেশ লম্বা হয়ে থাকে। বল খেলা এবং কুস্তিতে পারদর্শী প্রতিযোগীরা সাধারণত মধ্যমাকৃতির হয়ে থাকেন।

1932 ও 1936 খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সাঁতারুদের দেহের গঠন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, দূরপাল্লার সাঁতারুরা শক্তিশালী এবং দীর্ঘদেহী; তাঁদের হাত-পা যথেষ্ট বড়। জলে ভাসবার জন্যে প্রতিযোগীদের দেহের পেশী কম ঘনত্বের টিস্যুযুক্ত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ যে বিভিন্ন ক্রীড়ায় দক্ষ—সেটা হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। তবুও, শরীরকে যে কোন ক্রীড়ায় কুশলী করে তোলার জন্যে উপযুক্ত তালিমের দরকার।

শারীরিক পটুতার মূলে রয়েছে শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিপাক ক্রিয়া। শরীর ও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিপাক ক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে শরীর চর্চার দ্বারা অভীষ্ট খেলায় পারদর্শী হওয়া যায়।

দেখা গেছে, শরীর চর্চার ফলে দেহের বিভিন্ন তন্তুগুলি আকারে বৃদ্ধি পায় এবং সেজন্যে পেশী-সমূহে অধিকতর রক্ত সরবরাহ হয়ে থাকে যা খেলোয়াড়দের পক্ষে অনুকূল।

বর্তমান যুগে খেলার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। মানুষের মানসিক চাহিদা পূরণের জন্যে খেলাধুলায় বৈচিত্র্যও সংযোজিত হয়েছে অনেক। এই বৈচিত্র্যময় খেলাধুলার জগতে যোগ্য স্থান অধিকার করে নেবার জন্যে প্রতিযোগীদের উপযুক্ত পুষ্টি, শারীরিক গঠন এবং অনুশীলনই বিশ্বখ্যাতি অর্জনের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

বাবল্ চেম্বার

শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়*

নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যায় 1950 সালের পর যে কটি আবিষ্কার খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ, তাদের মধ্যে বাবল্ চেম্বার (Bubble Chamber) বা বুদ্‌বুদকক্ষ অন্যতম। আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ডোনাল্ড আর্থার গ্লেজার। এজন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন 1960 সালে। বিভিন্ন মৌলিক কণার আচরণ ও প্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের নানা সমস্যার সমাধানে আজকের দিনে এই যন্ত্রটি অপরিহার্য।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বহু মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেছে। কিন্তু এদের আচরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা। তাছাড়া বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে সমস্ত কণা বের হয় তাদের গতিপথের বৈশিষ্ট্য, শক্তি ইত্যাদি নিয়েও নানা সমস্যা। উপরন্তু, মহাজাগতিক রশ্মিজাত কণাদের স্বরূপ নির্ণয়েও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান অসম্পূর্ণ।

মৌলিক কণার স্বরূপ যতটা জানা সম্ভব তা কার্যকর হত সাধারণত উইলসন আবিষ্কৃত ক্লাউড চেম্বার বা মেঘ-কক্ষ, ক্রিষ্টলে ও পাওয়েল প্রমুখ আবিষ্কৃত ফটোগ্রাফিক অবদ্রব (emulsion) এবং গাইগার-মুলার আবিষ্কৃত গণক যন্ত্র বা পদ্ধতির মাধ্যমে। কিন্তু এ সমস্ত পদ্ধতি ছিল খুবই সীমিত। উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণাদের বেলায় এসব পদ্ধতি অকেজো। অন্যদিকে মহাজাগতিক রশ্মি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন কণাদের শক্তি প্রচণ্ড। পৃথিবীতে ঐ কণা মাধ্যমের সঙ্গে সংঘাতে নতুন নতুন কণা সৃষ্টি করে। 1949 সালে অবদ্রবের মাধ্যমে একটি ভারী মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া যায় —যা ভেঙে তিনটি পাই (π)-মেসন সৃষ্টি হয়। এর নামকরণ হয় টাউ (τ)-মেসন। দেখা গেছে, ঐ জাতীয় কণার সৃষ্টি হতে গেলে কমপক্ষে বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির সংঘাত হওয়া দরকার। মহাজাগতিক রশ্মিতে এরকম শক্তি রয়েছে—তাই ঐ কণার সন্ধান পাওয়া গেল।

অন্যদিকে পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জানা গেল (1951-52), অতি উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণার সংঘাতে নতুন মৌলিক কণার সৃষ্টি সম্ভব হয়। উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা পাওয়া যায় বিভিন্ন কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রে। পরমাণুর সঙ্গে এদের সংঘাতে পরমাণুর ভিতরকার খবর জানা যায়। 1953 সালে ব্রুকহাভেন জাতীয় গবেষণাগারে কসমোট্রন যন্ত্রে উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা পাওয়া যায়, সুতরাং পরীক্ষাগারেও উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন কণা তৈরি সম্ভব বলে প্রমাণিত হল। এখন প্রয়োজন হল—ঐ কণাদের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে জানবার, যা সম্ভব হচ্ছিল না মেঘকক্ষে, গাইগার-মুলার যন্ত্রে বা অবদ্রবে। দেখা গেল, অধিকাংশ কণার গতিপথ মেঘ-কক্ষে অত্যন্ত কম এবং এদের সংখ্যাও খুব কম। তার উপর মেঘ-কক্ষে গ্যাসের ঘনত্ব অত্যন্ত কম বলে পর্যবেক্ষণযোগ্য যথেষ্ট ঘটনা সেখানে ঘটে না। স্বভাবতঃই প্রয়োজন হল এমন এক পর্যবেক্ষণ কক্ষের—যার ঘনত্ব যথেষ্ট বেশি হবে। এই ধারণাই বিজ্ঞানী ডোনাল্ড আর্থার গ্লেজারের মাথায় ঢুকেছিল। তখন তিনি বিজ্ঞানী এণ্ডারসনের কাছে মৌলিক কণা নিয়ে কাজ করছেন। সে সময় তিনি এক মজার ঘটনা লক্ষ্য করেন। বোতলের মধ্যে হুইস্কি ভরা থাকে

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, সেন্ট পলস কলেজ, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-700 009

অধিক চাপে। বোতলের ছিপি খুললেই তা থেকে বুদ্‌বুদ উঠে। একদিন তিনি আরও দেখলেন, হুইস্কির বোতলের ছিপি খোলবার সঙ্গে সঙ্গে বুদবুদ উঠে না—কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। কেননা বুদবুদ তৈরী হতে কিছু সময় লাগে। তখন তিনি ভাবলেন, যদি ঐ সময়ের মধ্যে তরলের ভিতর দিয়ে উচ্চশক্তিসম্পন্ন কোন কণা পাঠানো যায়, তবে ঐ কণা মাধ্যমের সঙ্গে সংঘাতে যে আয়নের সৃষ্টি করবে তা তরল পদার্থটিতে বুদ্‌বুদ তৈরি করবে এবং সময়মত ফটো-গ্রাফ নিতে পারলে ঐ কণার গতিপথ ধরা পড়বে। এই ধারণা থেকেই বুদ্‌বুদ কক্ষের উৎপত্তি হল যা মৌলিক কণাদের গবেষণায় যুগান্তর এনেছে। এ সম্বন্ধে একটু গুছিয়ে বলা যাক।

কোন তরল পদার্থের স্ফুটনাংক নির্ভর করে বাইরের চাপের উপর। চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে তরলের স্ফুটনাংকও বৃদ্ধি পায়। এভাবে অত্যন্ত উচ্চ চাপে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থের উপরে চাপ যদি হঠাৎ কমিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে স্ফুটনাংক স্বভাবতঃই অনেক কমে যাবে এবং তরলের তখনকার তাপমাত্রা স্ফুটনাংকের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় তরলের মধ্যে স্বতঃই স্ফুটন আরম্ভ হয়। তরলের ঐ অবস্থাকে বলা হয় অতি উত্তপ্ত (super heated) অবস্থা। দেখা গেছে অতি উত্তপ্ত অবস্থায় তরল পদার্থের স্ফুটন সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় না। স্ফুটন আরম্ভ হতে একটু সময় লাগে। ঐ সময়ের মধ্যে অতি উত্তপ্ত তরলে কোন উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আয়ননকারী কণা প্রবেশ করলে যে আয়নের সৃষ্টি হবে—সেই আয়নে তরল পদার্থটির মধ্যে বুদবুদ জন্মায় এবং ফটোগ্রাফে ঐ কণার গতিপথ ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা আর একটু বিশদভাবে বলা যাক। একটি আয়ননকারী কণা অতি উত্তপ্ত তরলের (স্বতঃস্ফূটন আরম্ভ হবার পূর্বে) ভিতর দিয়ে চলে গেলে তার গতিপথে মাধ্যম-অণুর আয়ন জমা হয়। ঐ আয়নগুলি সমতড়িৎ যুক্ত। আয়নগুলি তখন স্ফুটন আরম্ভ করার উত্তেজক হিসাবে কাজ করে। এদের কেন্দ্র করে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য বুদ্-বুদের সৃষ্টি হয়। বুদ্‌বুদগুলির পারস্পরিক টানের ফলে আয়তনে অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং দৃশ্যমান বুদ্‌বুদে পরিণত হয়। এ অবস্থায় আয়নের পুরো পথের ছবি তোলা যায়। এবার তরলটিতে পুনরায় চাপ প্রয়োগ করে আবার নতুন করে ব্যবহার করবার জন্যে তাকে প্রস্তুত রাখা হয়। সময়ও কম লাগে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মূলত মেঘ-কক্ষ ও বুদ্‌বুদ কক্ষের মধ্যে নীতিগত ভাবে কোন প্রভেদ নেই। মেঘকক্ষে ব্যবহৃত হয় গ্যাস আর বুদ্‌বুদ কক্ষে ব্যবহৃত হয় তরল—যার ঘনত্ব গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশি। ঘনত্ব বেশি বলে আয়ননকারী কণার সঙ্গে মাধ্যমের কণার সংঘাত হয় খুব তাড়াতাড়ি, ফলে প্রচুর পরিমাণে আয়ন তৈরি হয়। বুদ্‌বুদ কক্ষে সৃষ্ট আয়নকে চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে বিক্ষিপ্ত করা সম্ভব এবং তা হয় বলেই মাধ্যমের অণুর কেন্দ্রীনের খবর অনেক ভালভাবে পাওয়া যায়—যা অবদ্রব পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। সুতরাং বুদ্‌বুদ কক্ষে, মেঘ-কক্ষ ও অবদ্রব—উভয়েরই কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। 1959 সালে ক্যালিফোর্ণিয়ায় বিজ্ঞানী অ্যালভারেজ 6 ফুট লম্বা ও 150 গ্যালন তরলের যে বুদ্‌বুদ কক্ষটি তৈরি করেন—তার লম্বালম্বি প্রস্থচ্ছেদ এখানে দেখানো হয়েছে (চিত্র 1)। তরল হাই-ড্রোজেন ব্যবহৃত হয় এই কক্ষে। এই কক্ষে চাপ হ্রাস বৃদ্ধির অতি দ্রুত ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থা রয়েছে। নিচে চুম্বক ক্ষেত্রের একটি মেরু দেখান হয়েছে। বাঁদিক থেকে আয়ননকারী কণার স্রোত তরলে প্রবেশ করে। তরলের মধ্যে ঐ কণার গতিপথের ফটোগ্রাফ উপরের ক্যামেরার সাহায্যে নেওয়া

হয়। সমস্ত কক্ষটি একটি বায়ুশূন্য আধারে ঝুলান থাকে এবং এটিকে চারদিক থেকে প্রথমে তরল হাইড্রোজেন ও পরে তরল নাইট্রোজেন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে; এর ফলে কক্ষস্থিত তরল হাইড্রোজেনের তাপের সঞ্চালন মাত্রা কম থাকে।

চিত্র 1

বুদ্বুদ কক্ষে অপরিবাহী তরল ব্যবহৃত হয়—যাতে আয়নগুলি তাদের বৈদ্যুতিক আধান বজায় রাখতে পারে। ব্যবহৃত তরলের পৃষ্ঠটান (surface tension) খুব কম হতে হবে, যাতে উৎপন্ন বুদ্বুদ ভেঙ্গে না যায়। উৎপন্ন বুদ্বুদগুলি খুব তাড়াতাড়ি আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। এজন্যে খুব বেশি বাষ্পচাপবিশিষ্ট তরলই এই কক্ষে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্যে তরলের ঘনত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা, প্রয়োজন। সাধারণত তরল হাইড্রোজেন, ডয়টেরিয়াম, হিলিয়াম, প্রপেন, ফ্রেয়ন ও জেনন বুদ্বুদ-কক্ষে ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞানী অ্যালভারেজ তাঁর বুদ্বুদ-কক্ষে বিভাট্রন থেকে অত্যন্ত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অ্যান্টি-প্রোটন কণিকা পাঠিয়ে পদার্থের ভিতরকার অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করেন। উচ্চশক্তির প্রোটন কোন স্থির প্রোটনকে আঘাত করলে যে অ্যান্টি ল্যামডা কণিকা উৎপন্ন করে, তাদের উৎপত্তি ধ্বংস ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি নির্দিষ্ট হদিশ দেন।

অন্যান্য পরীক্ষায় তিনি বিভাট্রন থেকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকা দিয়ে কক্ষের পরমাণুকে আঘাত করে মিউ (μ)-মেসন উৎপন্ন করেন—যাদের গতিপথের ছবি তুলতে তিনি সক্ষম হন। এরকম একটি ছবি এখানে দেখান হয়েছে (চিত্র 2)। অ্যালভারেজ এই ছবির সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। মিউ মেসনগুলি ঋণ আধানযুক্ত এবং ইলেকট্রনের তুলনায় প্রায় 200 গুণ ভারী। এগুলি ধন আধানযুক্ত হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় ও তাদের চারদিকে ইলেকট্রনের মত ঘুরতে থাকে। যেহেতু মেসনগুলি ইলেকট্রনের তুলনায় 200 গুণ ভারী, অতএব তাদের কক্ষপথ ইলেকট্রনের কক্ষপথের তুলনায় 200 গুণ ছোট হবে এবং তারা কেন্দ্রীনের কাছাকাছি ঘুরবে। মেসন-কণা হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় যে পরমাণু তৈরি হল, তাকে

মেসিক পরমাণু বলা হয়। এ অবস্থায় মেসন-গুলি কোন বুদ্‌বুদ তৈরি করে না। চিত্র 2-এ শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই যন্ত্রের প্রয়োজন। না হলে এই পদ্ধতিটি বিরাট
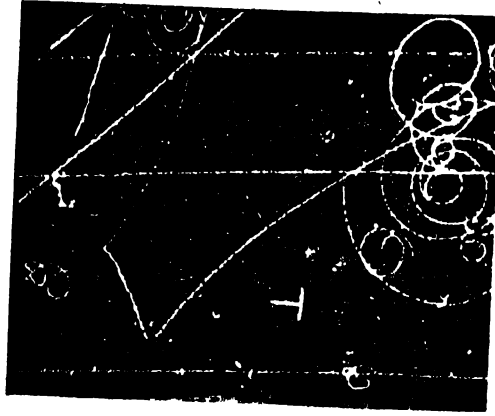
চিত্র 2

মিউ-মেসনটি ডান দিকের উপর থেকে কক্ষে প্রবেশ করে এবং বেশ কিছুটা গিয়ে (দীর্ঘ মোটা গতিপথ, সামান্য নিচের দিকে বাঁকা) মেসিক পরমাণু উৎপন্ন করে। এ অবস্থায় বুদ্‌বুদ্‌ তৈরি হয় না বলে কিছু অংশ বুদ্‌বুদবিহীন। এই মেসিক পরমাণু সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণুকে আঘাত করে। এখন উভয় কেন্দ্রীন সংযোজিত হয়ে একটা হিলিয়াম-3 পরমাণুর সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় 5·4 Mev শক্তি বেরিয়ে আসে। হিলিয়াম থেকে যে মেসনটি বেরিয়ে আসে, তার গতিবেগই ঐ শক্তি বহন করে। এই মেসনটি আবার ইলেকট্রনে ভেঙে যায়। বুদ্‌বুদবিহীন জায়গার বাঁদিকে সংযোজিত হিলিয়াম-3 থেকে উৎপন্ন মেসনটির গতিপথ দেখা যাচ্ছে (চিত্র 3)। এটি কিছুক্ষণের মধ্যে ভেঙে গিয়ে ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়ে উপরের দিকে বাঁকা সরু পথ রচনা করেছে। মেসন কণা এখানে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে।

উক্ত মেসন তৈরি করতে শক্তিশালী বিভাট্রন পদ্ধতিতে দামী জ্বালানী লাগত না, তেজস্ক্রিয়তারও ভয় থাকত না।

একটি π-মেসন ও বুদ্‌বুদ কক্ষের হাইড্রোজেনের সংঘাতে সৃষ্ট বিভিন্ন কণিকাগুলি চিত্র 3-এ দেখানো হয়েছে। এটিও 6 ফুট হাইড্রোজেন বুদ্‌বুদ-কক্ষ থেকে তোলা ছবি। A বিন্দুতে সংঘাতের ফলে একটি Σ°-মেসন ও একটি K°-মেসন উৎপন্ন হয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই Σ°-মেসনটি একটি ল্যামডা মেসন (λ°) ও একটি π°-মেসনে ভেঙে যায়। π°-মেসনটি তৎক্ষণাৎ গামারশ্মি ও একটি ইলেকট্রন জোড়ায় ($e\pm$) পরিণত হয়। উভয় প্রক্রিয়াই এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে, ছবিতে মনে হচ্ছে ইলেকট্রন জোড়াটিও যেন A বিন্দু থেকে বেরিয়ে আসছে। K°-মেসনটি গতিপথে আয়ন তৈরি করে না, তাই কিছু অংশ ফাঁক রয়েছে। এটি B বিন্দুতে একজোড়া π-মেসনে ভেঙে যায়।

ল্যামডা মেসনটিও গতিপথে আয়ন সৃষ্টি করতে

পারে না এবং C বিন্দুতে একটি প্রোটন ও একটি π-মেসনে ভেঙে যায়; অর্থাৎ সমস্ত ঘটনাটি এভাবে লেখা যেতে পারে:

চিত্র 3

$$\pi^- + p^+ \longrightarrow \Sigma^0 + K^0$$

C: $\longrightarrow \pi^- + p^+$

$\dashrightarrow \Lambda^0 + \pi^0 \rightarrow \gamma + e^+ + e^-$

B: $\longrightarrow \pi^- + \pi^+$
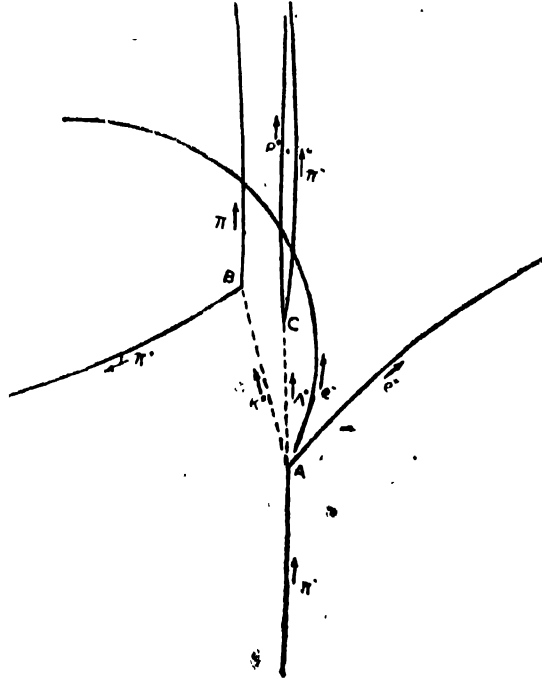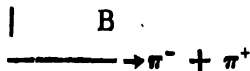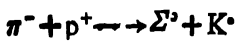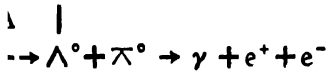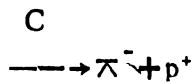
প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে ধনতড়িৎ ও ঋণতড়িৎযুক্ত কণাগুলি পরস্পর বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। প্রচলিত অন্যান্য কণাবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে এর উপযোগিতা কতগুণ বেশি তা নিচের তথ্যগুলি থেকেই স্পষ্ট হবে:

(1) জানা গেছে, একটা 140 ফুট মেঘ-কক্ষে যতগুলি ঘটনা ধরা সম্ভব, মাত্র ছয় ইঞ্চি বুদ-বুদ কক্ষ ব্যবহার করে তার চেয়ে বেশি ঘটনার নজির পাওয়া সম্ভব।

(2) বিভিন্ন ধরনের গবেষণা-ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা অনেক বেশি। কক্ষকে অত্যন্ত হালকা তরলে ভর্তি করা যেতে পারে, যাতে কণিকাগুলি বিক্ষিপ্ত না হয় এবং বিভিন্ন ধরনের তরলে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে—ঠিক যেমন করে মেঘ-কক্ষে করা হয়।

(3) গ্যাসে পরিচলন স্রোতের জন্যে গতি-পথ ঠিক থাকে না, কিন্তু বুদবুদ কক্ষে এটা এড়ানো যায়।

মৌলিক কণার রহস্যের শেষ নেই। আধুনিক নিউক্লীয় গবেষণাগারে বুদ্‌বুদ-কক্ষের জয়-জয়কার। এর মাধ্যমে অনেক কিছুই জানা গেছে, ভবিষ্যতেও অনেক অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।
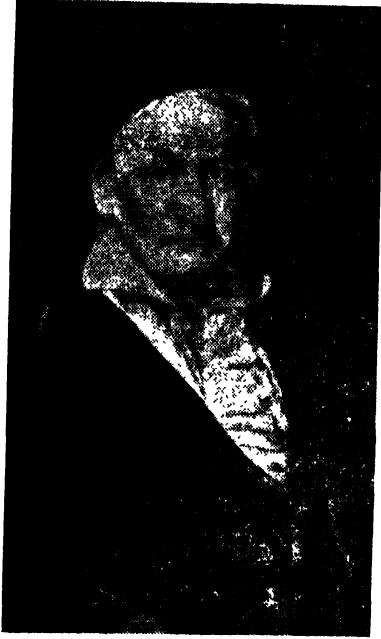
> বিখ্যাত গণিতবিদ গাউসের 200 বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষ্যে কিশোরদের লক্ষ্য করে তাঁর কাজের কিছু আভাস দেওয়া হল—কেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলা হয়। কোন কঠিন তত্ত্ব বা তথ্যের অবতারণা করা হয় নি। ছাত্রদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগানই এর উদ্দেশ্য।

কার্ল ফ্রেডরিচ্ গাউস

জন্ম : 30শে এপ্রিল, 1777
মৃত্যু : 23শে ফেব্রুয়ারী, 1855

Panca sed matura (Few, but ripe)—Gauss

কেউ বলেছেন গণিতের রাজকুমার, কেউবা ক্রিকেটের ভাষায় বলেছেন গণিতের অলরাউণ্ডার। কিন্তু উনি যে একজন কেউকেটা হবেন তা ছেলেবয়স থেকে বোঝা গেছল।

তখন বয়স কতই বা হবে, 5-6 বছর। বাবার হাত ধরে প্রায়ই তাঁদের ইটের খোলায় যেতেন। সেদিন ছিল মজুরদের মাইনে দেবার দিন। ওঁর বাবা হিসেব করে যখন মাইনে দিতে যাবেন, ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, "ঠিক হয় নি, ওরা পাবে এত করে।" বাবাত' অবাক—ছেলে বলে কি! যাহোক আবার হিসেব করে দেখলেন একটু ভুল

ছিল ছেলের কথাই ঠিক। স্কুলেই একদিন মাষ্টার মশাই সব ছেলেকে 1 থেকে 100 পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা লিখে যোগফল বের করতে বলেন। প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি তার শ্লেটে জবাব লিখে মাষ্টার মশাই-এর সামনে দিল। আশ্চর্য ছেলে, ঠিকই করেছে। তোমরা যারা সমান্তর শ্রেণী (A P.) সংখ্যার যোগফল বের করবার নিয়ম জান, তাদের কাছে কতই না সহজ মনে হবে। সেদিন কিন্তু ছেলেটি নিজ থেকেই মনে মনে বের করেছিল। ওর মাষ্টার মশাইকে বলতে হয়েছিল, "এ ছেলেকে আমার শেখাবার কিছু নেই।" এই ছেলেটিই কার্ল ফ্রেড্রিচ গাউস্। গাউস 1777 সালের 30শে এপ্রিল জার্মানীর ব্রানসউইক শহরে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন ছোট এক ইঁটখোলার মালিক। ছেলেকে বেশি পড়ান তাঁর একদম ইচ্ছে ছিল না। মা কিন্তু ঠিক উল্টো। তিনি ছেলের প্রতিভা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তাই একরকম জোর করেই ওকে স্কুলে ভর্তি করে দেন।

স্কুলে থাকতেই গাউসের প্রতিভার স্বাক্ষর মিলেছে। মার্টিন বারলেটস্ নামে এক তরুণ মাষ্টার মশাই-এর সঙ্গে তিনি অনেক কঠিন বিষয়ে চিন্তা করেন। এখানেই দ্বিপদ শ্রেণীর (binomial series) যোগ নির্ণয় করেন এবং নিজে থেকেই অসীম শ্রেণীর (infinite series) যোগফল নতুনভাবে বের করেন যা অভিসারী তত্ত্ব (theory of convergence) হিসাবে আজও রয়েছে।

স্কুলের পড়া শেষ হল। বাবার কিন্তু এক জেদ ছেলেকে মিস্ত্রি করবেন। মা বেঁকে বসলেন। ইতিমধ্যে গাউসের প্রতিভার খবর ওখানকার ডিউক ফার্ডিনাণ্ডের কাছে পৌঁচেছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। গাউসের সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন এছেলে বিস্ময়কর। তাই নিজে থেকেই গাউসের পড়াশুনার ভার নেন। ওঁরই অর্থ সাহায্যে গাউস্ কেরলিন কলেজে ভরতি হন। তখন তাঁর বয়স 15 বছর। গাউস্ ফার্ডিনাণ্ডের ঋণ কোনও দিন ভুলতে পারেন নি। নিজের প্রথম বই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে উৎসর্গ করেন।

কেরলিন কলেজে গাউস তিন বছর ছিলেন। কিন্তু এর ভিতর তিনি সংখ্যাতত্ত্বে (theory of numbers) অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। প্রথম অবদানই এক নতুন কথা সাদৃশ্য তত্ত্ব (congruence), এক সাঙ্কেতিক প্রতীক বের করেন, যথা $a \equiv b \pmod{m}$ যেমন $12 \equiv 2 \pmod{5}$ অর্থাৎ 12-কে 5 দিয়ে ভাগ করলে 2 অবশিষ্ট থাকবে। এর সাহায্যে বিশুদ্ধ গণিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এ থেকে তিনি এমন একটি সমস্যার সমাধান করেন যা অনেক বিখ্যাত গণিতবিদ্‌ও সমর্থ হন নি। সমস্যাটা হল দ্বিঘাত বৈপরীত্য তত্ত্ব (law of quadratic reciprocity)।

কলেজে থাকতে তিনি একটি সুন্দর উপপাদ্য বের করেন। যে কোনও সংখ্যা,

তিনটি ত্রিমাত্রিক সংখ্যার যোগফলের সমান। যে সব সংখ্যা ত্রিভুজের আকারে লেখা যায় তাদের ত্রিমাত্রিক সংখ্যা বলে (triangular numbers)। যেমন

```
6 =    |          15 =     |
      | |                 | |
     | | |               | | |
                        | | | |
                       | | | | |
```

কলেজে আরও একটি বিষয় তিনি মাথা ঘামিয়েছেন। কি করে শুধু রুলার ও কম্পাস দিয়ে সুষমচিত্র (regular figure) আঁকা যায়।

1795 খৃঃ গাউস্ বিখ্যাত গটিংজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গাউস্ গণিতের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেন। অনেক ভাষা তিনি জানতেন, সংস্কৃতও কিছুদিন পড়াশুনা করেন। তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না গণিত, না ভাষাতত্ত্ব—কোন্‌টা হবে তাঁর মুখ্য পাঠ্য। কিন্তু এই সময় তাঁর এক অপূর্ব আবিষ্কার মানসিক সমস্যার সমাধান করে দেয়। মাত্র 19 বছর বয়সে বের করেন কি করে 17 বাহুবিশিষ্ট এক সুষম বহুভুজ (regular polygon) এক বৃত্তের ভিতর আঁকা যায়। এতে উৎফুল্ল হয়ে তখনই ঠিক করেন গণিতই তাঁর একমাত্র ধ্যানের বিষয়। বিজ্ঞানের জগতে এটা এক বিশেষ ভাগ্যের কথা। 1798 সালে তিনি ডিগ্রিলাভ করেন এবং পরের বছরই হেমস্টেড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান। পরে গটিংজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। 1807 সালে ওখানকার মানমন্দিরের প্রধান ও জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এর পর গাউসের প্রতিভা গণিত ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে প্রতিভাত হয়। এমন কোন বিষয় নেই যাতে তাঁর যুগান্তকারী অবদান নেই।

অঙ্কশাস্ত্রের একটি মূলসূত্র হল (the fundamental theorem of arithmetic), যে কোন সংখ্যাকে শুধু এক রকম ভাবেই বিভিন্ন মৌলিক সংখ্যার (prime number) গুণফল হিসাবে লেখা যায়। যদিও গাউসের পূর্বেকার গণিতবিদ্‌রা এ সূত্রের কথা জানতেন, গাউসই এটাকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। একটি বৃত্তের পরিধিকে সমান ভাগে ভাগ করার উদ্দেশ্যে তিনি এক নতুন সমীকরণের কথা বলেন যথা $x^n - 1 = 0$ যা থেকে $i = \sqrt{-1}$-এর উদ্ভব। মিশ্র বা কল্পিত (complex or imaginary) সংখ্যা, বীজগাণিতিক সমীকরণ (algebraic equation), অসীম শ্রেণী (infinie series), উপবৃত্তিক অপেক্ষক (elliptic function) প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে তিনি চর্চা করেন। বিশেষ ধরণের মিশ্র সংখ্যাকে গাউসিয়ান সংখ্যা নাম দেওয়া হয়েছে।

মানচিত্র আঁকার সমস্যা নিয়ে তিনি প্রচুর কাজ করেছেন। কি করে সমতল মানচিত্রের উপর যে কোন দুই স্থানের ভিতরের কোণ ঠিক রাখা যায় তার সমাধান তিনি দিয়েছেন। অনুরূপ মান চিত্রাঙ্কন (conformal mapping) পদ্ধতি তিনি বের করেন। পরবর্তীকালের টপোলজি (topology) এসব কাজেরই পরিণতি বলা চলে।

ইউক্লিডের সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধটি (parallel axiom) তিনি মেনে নিতে পারেন নি। এই স্বতঃসিদ্ধটি তোমরা সবাই জান। কোন সরলরেখার বাইরে অবস্থিত কোন বিন্দু থেকে একটিমাত্রই সমান্তরাল রেখা আঁকা যায়। একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180^0 এটাও তিনি মেনে নেন নি। তিনি দেখিয়েছেন যোগফল 180^o-র কম। এসব নিয়ে কাজ করতে করতেই বক্রতলের জ্যামিতির দিকে নজর যায়—যার ফলে বক্রতল তত্ত্বের (theory of curved surfaces) উদ্ভব। পরে গণিতজ্ঞ রিম্যান রিম্যানিয়ান জ্যামিতি সূত্রপাত করেন এবং আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বে তা প্রয়োগ করেন।

জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) এবং ভূ-তত্ত্ব বিভাগে (geodesy) তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সেরেস (Ceres) নামে এক নতুন গ্রহের পথ তিনি সঠিকভাবে বের করেন। 1821 সালে তাঁকে উত্তর-পশ্চিম জার্মানী ও ডেনমার্কের জরীপ করতে বলা হয়। এটা করতে গিয়ে তিনি এক নতুন যন্ত্র তৈরি করেন—হেলিওগ্রাফ (Heliograph) নামে যা বিখ্যাত।

এর পর তিনি পদার্থবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বিদ্যুৎ-চৌম্বকত্ব নিয়ে তাঁর অনেক গবেষণা রয়েছে। এমনকি তাঁর সহকর্মীর সহযোগে একটি টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু গাউসের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল না তাহলে হয়ত ওঁকেই টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কারক বলে জানা যেত। ভূ-চৌম্বকত্ব (terrestrial magnetism), কৈশিকতা (capillarity), উপবৃত্তিক পদার্থের আকর্ষণ (attraction of ellipsoid), বিদ্যুৎ-যন্ত্রের তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর অবদান রয়েছে।

সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন। গণিতের এক বিষয় নিয়ে চর্চা সুরু করেন। নাম দেন 'রাজনৈতিক' গণিত (political arithmetic)। আজকে আমরা যাকে সাংখ্যায়ন (statistics) বলি, তারই উৎস এই গণিত। গাউসের পদ্ধতি অনুসরণ করে নমুনা বিশ্লেষণের (sampling) উন্নততর নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে।

গাউস অত্যন্ত প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর আবিষ্কার এক ডায়েরীতে লিখে রাখতেন, তাও সাঙ্কেতিক ভাষায়। ছাপাবার প্রয়োজন মনে করতেন না। তাঁর জীবনের আদর্শ বাণী হল "ফল কম হোক, কিন্তু পাকা হওয়া চাই।" অন্য গণিতজ্ঞরা হয়ত মনে করতেন তাঁরা নতুন কিছু করেছেন। কিন্তু দেখা যেত গাউস আগেই সে সবের সমাধান করেছেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ জেকবি ত' বিরক্তই হয়েছিলেন। যখনই তিনি গাউসের কাছে তাঁর কোনও নতুন কাজ নিয়ে গেছেন—গাউস সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে দেখিয়ে দেন অনেক আগেই গাউস তা চিন্তা করেছেন। এ নিয়ে একবার এক

গণিতজ্ঞের সঙ্গে তিক্ততারও সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবিশ্যি গাউসের প্রাধান্যই সবাই মেনে নিয়েছেন। গাউসের ডায়েরী তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তখনই দেখা যায় তিনি কি গভীর দূরদর্শী ছিলেন।

মাঝে মাঝে তিনি মজার কাজও করতেন। বিখ্যাত এক উপন্যাস পড়তে গিয়ে দেখলেন, সেখানে একটি বাক্যে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভুল রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যে কটা খণ্ড তিনি যোগাড় করতে পেরেছিলেন, নিজের হাতে তা শুদ্ধ করে দেন।

কর্মময় জীবনের এই আভাস থেকেই তোমরা বুঝতে পার কেন তাঁকে গণিতের রাজকুমার বা অলরাউণ্ডার বলা হয়। তাই তাঁর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর্কিমিডিস ও নিউটনের সঙ্গে একই মর্যাদায় লিখিত রয়েছে।

1855 সালের 23 ফেব্রুয়ারী এই কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

[যারা গাউস সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে চাও, এ বইগুলি পড়তে পার—

i) Men of Mathematics—E T. Bell

ii) 100 Great Scientists—Ed. Dr. Jay E. Green

iii) Men and Discoveries in Mathemathcs—Bryan Morgan]

অরুণকুমার দাশগুপ্ত*

* কম্‌ফোর্ট, 2/1/B, Hiudusthan Park, Calcutta-700 029

প্রবাল

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দেশে প্রবালের ব্যবহার সুপ্রচলিত। বিখ্যাত পণ্ডিত প্লিনির একাধিক পুস্তকে ভারতীয় প্রবালের উল্লেখ আছে। প্রবালকে ইংরাজীতে কোরাল (coral) বলে। কোরাল শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ থেকে। প্রাচীন গ্রীসের রাজা এবং যুদ্ধবিদ্‌রা অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্রে প্রবালের ব্যবহার করতেন।

প্রবাল আসলে একধরনের জলজ প্রাণী। আজ পর্যন্ত প্রায় 2500 জাতের জীবন্ত ও প্রায় 5,000 জাতের অবলুপ্ত প্রবালের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রবালের উৎপত্তিকাল হিসাবে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগকে ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের প্রবালের মধ্যে উঁচুজাতের প্রবালের বৈজ্ঞানিক নাম (Corallium nobile বা Corallium rubrum)। প্রথমটির রং গোলাপী এবং পরেরটির রং লাল। এই শ্রেণীর প্রবাল দুর্লভ ও মূল্যবান। প্রবাল একনালী শ্রেণীর (Phylum-Coelenterata) অ্যানথোজোয়া গোষ্ঠীর (Anthozoa-Class) মাড্রেপোরারিয়া বর্গের (Madreporaria-Order) অন্তর্গত। এছাড়াও আলসিওনারিয়া (Alcyonaria) ও হাইড্রোকোরালিয়া (Hydrocorallia) বর্গের প্রবালও দেখতে

পাওয়া যায়। প্রবালকীটের দেহ নলাকৃতি, এই নলের মুখ থেকে খাদ্যনালী সুরু হয়ে নলের ভিতর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। নলের গায়েই প্রবাল কীটের জননাঙ্গ থাকে। প্রবাল-কীটের স্নায়ু ও পেশী পুষ্ট নয়। এরা দেহ থেকে একপ্রকারের আঠালো রস নিঃসরণ করে এবং সমুদ্র থেকে রং ও চুন দিয়ে দেহের চারিদিকে একটা শক্ত আবরণ গড়ে তোলে। নলাকৃতি প্রবাল কীটগুলি পরস্পর যুক্ত থাকায় একই স্থানে জন্ম ও লয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে সেই স্থানেই স্তূপীকৃত হয়। এদের দেহ বিশ্লেষণ করলে শতকরা 85 ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট, 14 ভাগ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ও আয়রন অক্সাইডসহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ এবং 1 ভাগ জৈব পদার্থ পাওয়া যায়। জৈব পদার্থের রঙই আসলে প্রবাল রঞ্জন। সুতরাং একথা সহজেই বলা যায়, সমুদ্রের রঙ ও খনিজ পদার্থের আধিক্য এবং সেই সব স্থানের বৈশিষ্ট্য প্রবালের উপর ক্রিয়া করতে বাধ্য।
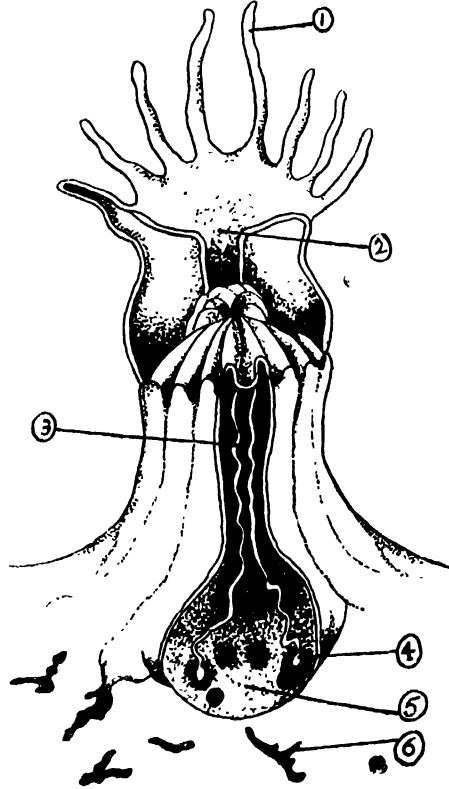
1. ধারালো হুলবিশিষ্ট শুঁড় বা কর্ষিকা 2 মুখগহ্বর, 3. মধ্যবর্তী কোমল নালীসমূহ,
4. গোনাডস্ (Gonads), 5. উদর 6. কোনেনকাইমা (Coenenchyma)

প্রবাল-কীটের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্যে জলের গভীরতা ও উষ্ণতার প্রয়োজন। সাধারণত 28^0 উত্তর অক্ষাংশ থেকে 28^0 দক্ষিণ অক্ষাংশে 14^0 সেঃ থেকে 22^0 সেঃ তাপমাত্রায় সমুদ্রের

80 ফুট গভীরে প্রবালকীট বিচরণ করে। যদিও এরা ঠাণ্ডা ও গভীর জলের প্রাণী, কিন্তু মজা এই যে প্রবাল দ্বীপ ও প্রাচীরগুলি প্রায়শ অগভীর ও উষ্ণজলে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, এইসব দ্বীপ ও প্রাচীরগুলি তৈরি করতে প্রবাল কীটগুলির যে উদ্ভিদ প্রাণীর (Zooxanthelle) প্রয়োজন তা কেবলমাত্র উষ্ণ ও অগভীর জলেই জন্মায়। প্রবালকীট ছোট ছোট বহুপদী প্রাণী—অনেকটা হাইড্রার মত, প্রথমে তারা জড়াজড়ি করে থাকে। ঐ অবস্থায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যু হলেও স্তূপীকৃত হতে থাকে। সমুদ্রবাহিত বিভিন্ন পদার্থ ক্রমে ক্রমে ঐ স্তূপের ওপর জমতে থাকে যার ফলে স্থলভাগের সৃষ্টি হয়। এই হল প্রবাল দ্বীপের জন্মকথা।

প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে বহু প্রবালদ্বীপ আছে। 1837 খৃঃ চার্লস ডারউইন এই বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবাল দ্বীপ কিন্তু আগ্নেয়দ্বীপের মত অতটা উঁচু হয় না। বাতাসে প্রবালকীটগুলি বাঁচতে পারে না বলে প্রবালদ্বীপ কখনই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 10 থেকে 12 ফুট উঁচুতে হতে পারে না। প্রবালদ্বীপ অঞ্চলে সচরাচর বৃষ্টিপাত কম হয়ে থাকে এবং উদ্ভিদের মধ্যে তাল, নারিকেল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। চার্লস ডারউইন প্রবালদ্বীপগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: (ক) বেলা শৈল (fringing reef)—এই স্তূপগুলি উপকূলের নিকটে গঠিত হয়। সাধারণভাবে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এর উৎস। যথা—সিংহল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ ইত্যাদি।

(খ) প্রবাল প্রাচীর (barrier reaf)—এই স্তূপ উপকূলভাগের অদূরে অবস্থান করে ও উপকূলে প্রাচীরের ন্যায় কাজ করে। যথা—অষ্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রীফ।

(গ) বলয়াকার প্রবালদ্বীপ (atoll)—বলয়াকৃতি প্রবালদ্বীপকে অ্যাটল বলে। চওড়ায় এই সব স্তূপ সাধারণত এক মাইলের মত হয়ে থাকে। অ্যাটলের মধ্যস্থিত জলরাশিকে উপহ্রদ (lagoon) বলে। সাধারণত এই সব উপহ্রদের একটি প্রবেশমুখ থাকে। এই দ্বীপগুলির আয়তন বিভিন্ন রকম হতে পারে। কখন কখন 100 মাইল চওড়াও হয়। ডারউইনের মতে সমস্ত প্রবাল দ্বীপই একদা বেলাশৈল ছিল। পরে কালপ্রবাহে কোন কোনটি প্রবাল প্রাচীর অ্যাটলে পরিণত হয়েছে। ডারউইনের মতবাদ এখনও পর্যন্ত খণ্ডন করা যায় নি। উপরন্তু 1952 খৃঃ এ্যানিওটক (Eniwetok) অ্যাটল খননকালে এই মতবাদ আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

আমরা যেসব প্রবাল ব্যবহার করি—তা আলজিরিয়া, মরকো, সিসিলি, কোরসিকা প্রভৃতি সমুদ্র অঞ্চল থেকে আসে। প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগর থেকে ভারতবর্ষে প্রবাল আসত—তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে প্রবালের প্রচলন আছে। প্রবাল সাদা, কালো, নীল, হলুদ, ধূসর, গোলাপী ও লালবর্ণের হয়ে থাকে। এর রঙ যত লাল হয় তত মূল্যমান বাড়ে। অকঠিন, মসৃণ-পৃষ্ঠ,

ছিদ্রহীন প্রবাল মূল্যবান। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 2·6 থেকে 2·7 এবং কাঠিন্য 3½ মোহ'র (Moh's standard) মান। অম্লের সঙ্গে এর বিক্রিয়া ঘটে। বাজারে প্রবাল, পুঁতি বা ডিম্বাকার অবস্থায় বিক্রয় হয়। পরে অবশ্য নানা আকারে এসব অলংকারে ব্যবহৃত হয়। প্রবাল অত্যন্ত সাবধানে পালিশ করা হয়। পালিশের সময় অকাঠিন্যজনিত কারণে যাতে ভেঙে বা ফেটে যেতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। গ্রহ-শান্তির জন্যে প্রবাল ধারণের রীতি এদেশে প্রচলিত। প্রাচীন-কাল থেকে আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিভিন্ন রোগে প্রবাল ও তার ভস্ম ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

শ্রীশশধর বিশ্বাস*

* ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, 160, বমুনালাল বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-700 007

আবর্তন

আমরা জানি, একটি লাট্টুকে পাক দিয়ে মাটিতে ছেড়ে দিলে তা খাড়াভাবে বা কিছুটা কাত হয়ে ঘুরতে থাকে। কিন্তু একটি স্থির লাট্টুকে মাটিতে খাড়া বা কিছুটা কাত অবস্থায় রাখা একেবারেই সম্ভব নয়। তেমনি একটি খেলনার চাকাকে ঘুরিয়ে মাটিতে ছেড়ে দিলে তা কিছুটা দূর গিয়ে তারপর পড়ে যায়। কিন্তু স্থির অবস্থায় খাড়াভাবে রেখে ছেড়ে দিলে চাকাটি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। কেন এমন হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে বলবিদ্যার কতকগুলি মৌলিক ধারণা পরিষ্কার থাকা দরকার। নিউটনের গতিসূত্রে ভরবেগের (রৈখিক) কথা আছে। ভরবেগ হল ভর এবং বেগের গুণফল। বেগের মত ভরবেগও একটি ভেক্টর রাশি। এর দিক সংশ্লিষ্ট বেগের দিকে। নিউটনের গতিসূত্র অনুসারে বল প্রযুক্ত হলেই ভরবেগ পরিবর্তিত হবে এবং ভরবেগের পরিবর্তনের হারকেই ঐ পরিবর্তন সৃষ্টিকারী বলের মাপ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, বলের অনুপস্থিতিতে ভরবেগের পরিবর্তন ঘটবে না—একটি ধ্রুব ভরবেগ নিয়ে বস্তু চলতে থাকবে অথবা স্থির থাকবে। একাধিক অংশের সমন্বয়ে সৃষ্ট কোন বস্তুর মোট ভরবেগ ঐ ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভরবেগগুলিকে ভেক্টর পদ্ধতিতে যোগ করে পাওয়া যায়।

আবর্তনশীল বস্তুর গতি বিশ্লেষণে কিন্তু এই ভরবেগের ধারণা সরাসরি খুব একটা কাজে লাগে না। বস্তুত ভরকেন্দ্রকে স্থির রেখে যদি আবর্তন ঘটে, সেক্ষেত্রে বস্তুর মোট ভরবেগ হয় শূন্য—আবর্তন যে ধরণেরই হোক না কেন। এই ধরণের গতির

আলোচনায় যে ধারণাগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল কৌণিক ভরবেগ (angular momentum) এবং টর্ক (torque)। এই দু'ধরণের রাশিকেই কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে মাপা হয়। ঘূর্ণনশীল কোন কণার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ বলতে ঐ কণার রৈখিক ভরবেগ এবং ঐ নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ভরবেগ রেখার (ভেক্টরের) লম্ব দূরত্বের গুণফল বোঝায়। কৌণিক ভরবেগও একটি ভেক্টর রাশি। রৈখিক ভরবেগ এবং ঐ নির্দিষ্ট বিন্দু যে সাধারণ তলে অবস্থান করে, কৌণিক ভরবেগ তার অভিলম্বমুখী। এই সংজ্ঞা থেকে এটা বোঝা কঠিন নয় যে, কণার অবস্থান এবং বেগের অভিমুখ পরিবর্তিত হলেও (যা ঘূর্ণনশীল অবস্থায় সর্বদাই হবে) কৌণিক ভরবেগের মান এবং দিক অপরিবর্তিত থাকা সম্ভব। একটি গোটা বস্তুর কৌণিক ভরবেগ বের করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন কণার কৌণিক ভরবেগগুলিকে ভেক্টর পদ্ধতিতে যোগ করতে হয়।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা যাক। ধরা যাক m ভরের একটি কণা একটি নির্দিষ্ট গতি (v) নিয়ে এই কাগজের তলে একটি বৃত্তাকার পথে ঘুরছে এবং এই বৃত্তের কেন্দ্রের সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করতে হবে। কণাটির যে কোন অবস্থানে তার রৈখিক ভরবেগের মান mv এবং দিক ঐ অবস্থানে বৃত্তের স্পর্শক বরাবর। সুতরাং কেন্দ্র থেকে ভরবেগ রেখার লম্ব দূরত্ব সব সময়েই বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান; ধরা যাক তা r. কাজেই কণাটির কৌণিক ভরবেগের মান সর্বদাই m v r. আবার, বৃত্তের কেন্দ্র এবং ভরবেগ ভেক্টর সব সময়ই কাগজের তলে অবস্থান করছে। কাজেই কৌণিক ভরবেগের দিক প্রতি মুহূর্তেই কাগজের তলের অভিলম্বমুখী [উপরের দিকে কিংবা নিচের দিকে তা নির্ভর করে কণাটির গতি দক্ষিণাবর্ত কি বামাবর্ত তার উপর]। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে উপরিউক্ত কণাটির কৌণিক মান এবং দিক পরিবর্তনশীল নয়।

কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে কোন বস্তু বা বস্তুকণার উপর ক্রিয়াশীল কোন বলের টর্ক বলতে ঐ বলের মান এবং নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে বলরেখার উপর লম্ব-দূরত্বের গুণফল বোঝায়। টর্কও একটি ভেক্টর রাশি, ঐ নির্দিষ্ট বিন্দু এবং বলরেখা যে সাধারণ তলে অবস্থান করে, টর্ক সেই তলের অভিলম্বমুখী। কৌণিক ভরবেগের মত টর্কের বেলাতেও দেখানো যায়, বলরেখার অবস্থান পরিবর্তিত হলেও টর্ক ভেক্টর অপরিবর্তিত থাকতে পারে। একাধিক ক্রিয়াশীল বলের সম্মিলিত টর্ক বের করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন বলের টর্কগুলিকে ভেক্টর পদ্ধতিতে যোগ করতে হয়।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে এটা প্রমাণ করা যায়—ঘূর্ণনশীল কোন বস্তুর (কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে) মোট কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলসমূহের (ঐ বিন্দুর সাপেক্ষে) মোট টর্কের সমানুপাতিক। কোন টর্ক

ক্রিয়াশীল না থাকলে, মোট কৌণিক ভরবেগের মান এবং দিক অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে যতক্ষণ টর্ক কাজ করবে, কৌণিক ভরবেগ মানে এবং/অথবা দিকে প্রতি-নিয়ত পরিবর্তিত হবে। তা ছাড়া টর্ক যেদিকে কাজ করবে, কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটবে।

এটা বোঝা দরকার, কৌণিক ভরবেগ রৈখিক ভরবেগের চেয়ে অনেক জটিল ব্যাপার। কোন দৃঢ় বস্তু যখন একটি নির্দিষ্ট বেগে কোন দিকে ছুটতে থাকে, সেই বস্তুস্থিত প্রতিটি কণাই তখন ঐ বেগে সেদিকে ছুটতে থাকে। কাজেই বস্তুটির মোট ভরবেগ তার মোট ভর এবং বেগের গুণফলের সমান। ভরবেগের দিক এবং বেগের দিক একই। কিন্তু ধরা যাক একটি দৃঢ় বস্তু (একটি লাট্টু) কোন এক অক্ষের চারিদিকে একটি নির্দিষ্ট কৌণিক গতিতে ঘুরছে এবং ঐ অক্ষের উপর কোন বিন্দুর সাপেক্ষে বস্তুটির কৌণিক ভরবেগ বের করতে হবে। এক্ষেত্রে বস্তুর কণাগুলির রৈখিক ভরবেগ, নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরত্ব—সবই ভিন্ন। কাজেই, কৌণিক ভরবেগের মান এবং দিক এক এক একটি কণার বেলায় এক এক রকম হবে এবং এগুলিকে সব ভেক্টর পদ্ধতিতে যোগ করলে তবে মোট কৌণিক ভরবেগ নির্ণীত হবে। এই মোট কৌণিক ভরবেগ ঘূর্ণনের অক্ষ বরাবর হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে —তা নির্ভর করে বস্তুর আকারের উপর। ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে যদি বস্তুটির সৌসাদৃশ্য (symmetry) থাকে, অর্থাৎ অক্ষটি যদি সুষম হয়, তা হলে কৌণিক ভরবেগ এই অক্ষ বরাবর হবে, অন্যথায় হবে না। অনেক জটিল ঘূর্ণন গতির মূলে রয়েছে এই সত্য।

এবারে লাট্টু প্রসঙ্গে আসা যাক। লাট্টুর ঘূর্ণন অক্ষটি একটি সুষম অক্ষ। অতএব ঘূর্ণনশীল অবস্থায় লাট্টুর কৌণিক ভরবেগ এই অক্ষ বরাবর অবস্থান করবে। অর্থাৎ ঘূর্ণনের ফলে কৌণিক ভরবেগের দিক পরিবর্তন হবে না। কাজেই এই নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন বজায় রাখার জন্যে কোন টর্কের প্রয়োজন নেই। উল্টোভাবে লাট্টুটিকে পাক দিয়ে ছেড়ে দিলে যতক্ষণ কোন টর্ক কাজ করবে না (যতক্ষণ শূন্যে থাকবে) লাট্টুটি ঐ অক্ষের চারদিকে একইভাবে ঘুরতে থাকবে এবং অক্ষটি শূন্যে দিক পরিবর্তন করবে না।

কিন্তু লাট্টুটি যখন মাটিতে পড়বে, তখন অন্য রকম ঘটনা ঘটবে। সাধারণত একটু কাত হয়ে পড়বে। ফলে ভরকেন্দ্র দিয়ে লাট্টুটির ওজনের জন্যে যে বল ক্রিয়া করবে তা লাট্টুর পিনের মাথা দিয়ে যাবে না, অর্থাৎ এই বিন্দুর সাপেক্ষে লাট্টুর উপর একটি টর্ক কাজ করবে। ঐ একই বিন্দুর সাপেক্ষে লাট্টুর পাক-খাওয়া গতির (spin) দরুণ কৌণিক ভরবেগ ঘূর্ণন অক্ষ বরাবর অবস্থান করবে। উপরিউক্ত টর্কের প্রভাবে এই কৌণিক ভরবেগ পরিবর্তিত হবে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ঐ টর্ক সর্বদা ঘূর্ণন অক্ষগামী

উল্লম্ব-তলের (vertical plane) সঙ্গে লম্বভাবে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে টর্কের অভিমুখ সেই মুহূর্তের ঘূর্ণন অক্ষের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। কাজেই লাট্টুর যে কোন অবস্থানের কথা চিন্তা করে বলা যায়, ঐ অবস্থানে খুব সামান্য সময় ধরে ঘূর্ণন অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে একটি টর্ক ক্রিয়া করবে এবং ঐদিকে কিছুটা কৌণিক ভরবেগ উৎপন্ন করবে। ফলে লাট্টুর মোট কৌণিক ভরবেগের দিক পরিবর্তন হবে। যেহেতু মোট কৌণিক ভরবেগ লাট্টুর ঘূর্ণন অক্ষ বরাবর, অতএব ঘূর্ণন অক্ষটিই ঘুরে গিয়ে কৌণিক ভরবেগের নতুন দিকের সঙ্গে এক রেখায় চলে আসবে। এই অবস্থানেও উপরিউক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবং ঘূর্ণন অক্ষ আবার নিজ অবস্থানের সঙ্গে লম্বভাবে (টর্কের অভিমুখে) সামান্য সরে যাবে। এইভাবে ঘূর্ণন অক্ষ ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে। ইতিমধ্যে লাট্টু অবশ্য সর্বদাই নিজ অক্ষের চারিদিকে পাক খেতে থাকবে (চিত্র 1 'ক' ও 'খ')।

(১ক)- ঘূর্ণনশীল লাট্টু

(১খ)- কৌনিক ভরবেগের আবর্তন
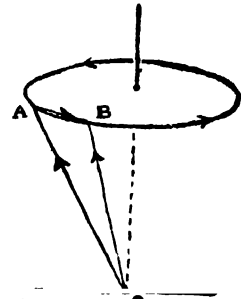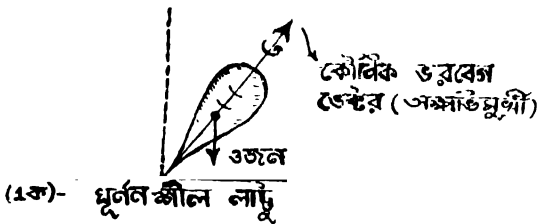
OA, প্রারম্ভিক কৌণিক ভরবেগ
AB, সামান্য সময়ে কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন
OB, অন্তিম কৌণিক ভরবেগ

এবারে দেখা যাক—লাট্টুকে স্থির অবস্থায় মাটিতে রাখলে কি হতে পারে! লাট্টু অবশ্য একেবারে খাড়াভাবে বসানো সম্ভব নয়। বসালেও সামান্যতম বলের প্রভাবেই একটু কাত হয়ে যাবে। উপরিউক্ত টর্ক তখন কার্যকরী হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু লাট্টুর কোন পাকখাওয়াজনিত কৌণিক ভরবেগ নেই। কাজেই এই টর্ক কোন কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন ঘটাবে না—কেবলই কৌণিক ভরবেগ উৎপন্ন করবে। এখন এই কৌণিক ভরবেগ সৃষ্টি হতে পারে কেবলমাত্র যদি লাট্টুটি মাটিতে পড়ে যায়। এই পতনে কিন্তু টর্কের কোন দিক পরিবর্তন ঘটে না। ফলে কৌণিক ভরবেগ এবং পতনের গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে যতক্ষণ না লাট্টুটি মাটিতে পড়ে যায়। অবশ্য সমস্ত ঘটনাটিই ঘটে অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

চাকার বেলাতেও ব্যাখ্যা প্রায় একই রকম। চাকাটি যদি ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়, চাকার তলের সঙ্গে লম্বভাবে একটি কৌণিক ভরবেগ সৃষ্টি হয় (ধরা যাক চাকার কেন্দ্রের সাপেক্ষে)। এখন চাকাটি যদি একটু কাত হয়ে চলে (ধরা যাক বাঁ-দিকে), তাহলে মাটির প্রতিক্রিয়া বল চাকার কেন্দ্রে একটি টর্ক সৃষ্টি করবে যার অভিমুখ হবে—চাকা যে দিকে এগোচ্ছে তার উল্টোদিকে। যার ফলে ঐ দিকে কিছুটা কৌণিক ভরবেগ সৃষ্টি হবে এবং মোট কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন ঘটবে। যেহেতু মোট কৌণিক ভরবেগ চাকার তলের অভিলম্বমুখী, সুতরাং চাকাটি একটু ঘুরে যাবে এবং তার গতির অভিমুখ পাল্টে যাবে। পরবর্তী অবস্থানেও একই ঘটনায় পুনরাবৃত্তি ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে চাকাটি একটি বৃত্তাকার পথে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারপর পড়ে যাবে। পড়ে যাওয়ার আগে ঘর্ষণের দরুণ চাকার বেগ প্রায় শূন্য হয়ে আসবে।

স্থির চাকাকে খাড়াভাবে রাখতে গেলে ঠিক লাট্টুর মতই ঘটনা ঘটবে। চাকা সামান্য কাত হলেই পূর্বে বর্ণিত টর্ক কার্যকরী হবে। এই টর্ক কেবলই কৌণিক ভরবেগ উৎপন্ন করবে চাকাকে মাটির দিকে ফেলে দিয়ে। চাকা পড়তে থাকলেও টর্ক সর্বদা একই দিকে কাজ করবে। কাজেই চাকাটি ক্রমবর্ধমান গতিতে মাটিতে পড়বে।

এবারে অসম (asymmetric) অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনের কথা আলোচনা করা যাক। আগেই বলা হয়েছে—এই ধরণের ঘূর্ণনে কৌণিক ভরবেগের অভিমুখ ঘূর্ণন অক্ষ বরাবর হয় না। তবে প্রত্যেক ঘূর্ণন অক্ষের জন্যে সংশ্লিষ্ট কৌণিক ভরবেগের অভিমুখ ঘূর্ণনশীল বস্তুর সাপেক্ষে নির্দিষ্ট। সুতরাং উপরিউক্ত ধরণের কোন অক্ষের চারদিকে যদি বস্তুটি ঘুরতে শুরু করে, কৌণিক ভরবেগের অভিমুখ পাল্টে যাবে; কারণ কেবল অক্ষটি ছাড়া বস্তুর সাপেক্ষে স্থির অন্য সমস্ত অভিমুখই বস্তুটি ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যায়। কিন্তু কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন সম্ভব কেবলমাত্র যদি কোন টর্ক ক্রিয়াশীল থাকে। কাজেই কোন অসম অক্ষের চারিদিকে কোন বস্তুর ক্রমাগত ঘূর্ণন বজায় রাখতে হলে প্রতিনিয়ত টর্ক প্রয়োগ করতে হবে।

কিন্তু যদি এই ধরণের কোন অক্ষের চারদিকে কোন বস্তুকে একটি কৌণিক বেগ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? বস্তুটি ঐ অক্ষের চারদিকে বেশিক্ষণ ঘুরতে পারবে না। কারণ ঘুরলেই কৌণিক ভেক্টরটিও ঘুরে যাবে। কিন্তু টর্কের অনুপস্থিতিতে তা সম্ভব নয়। কাজেই বস্তুটি পরমুহূর্তেই তার ঘূর্ণন অক্ষ এমনভাবে পরিবর্তন করে নেবে যাতে নতুন অবস্থানে নতুন অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের দরুণ কৌণিক ভরবেগ ঠিক আগেকার কৌণিক ভরবেগের অভিমুখে থাকে এবং তার মানও অপরিবর্তিত থাকে। এই নতুন অক্ষটিও একটি অসম অক্ষ। কাজেই এই অক্ষের চারদিকেও বস্তুটি বেশিক্ষণ ঘুরতে পারবে না এবং উপরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আসলে, কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণের তাগিদে বস্তুটি প্রতিনিয়ত তার ঘূর্ণন অক্ষ পরিবর্তন করে চলবে।

মজার ব্যাপার, লাট্টু যখন ঘোরে তখনও তার ঘূর্ণন অক্ষ ক্রমাগত ঘুরে যায়। কিন্তু তা ঘোরে টর্কের প্রভাবে এবং ঘূর্ণন অক্ষটি লাট্টুর সাপেক্ষে স্থির থাকে। কিন্তু উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রে ঘূর্ণন অক্ষটির পরিবর্তন ঘটে টর্কের অভাবে এবং ঘূর্ণন অক্ষটি বস্তু এবং দর্শক উভয়ের সাপেক্ষেই পরিবর্তিত হয়। লাট্টুর বেলায় তার সুষম অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন বজায় রাখার জন্যে কোন টর্কের দরকার হয় না। অন্যদিকে কোন অসম অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন টর্কের অভাবে বজায় থাকতে পারে না।

অসম অক্ষ-আশ্রয়ী বিচিত্র ঘূর্ণনের সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ পৃথিবী নিজে। মোটা-মুটিভাবে ধরা যায় পৃথিবীর উপর কোন টর্ক কাজ করছে না। পৃথিবী যদি একেবারে গোলাকার হত, তাহলে কেন্দ্রগামী যে কোন রেখার সাপেক্ষে তার সৌসাদৃশ্য থাকত এবং এই ধরণের কোন রেখাকে অক্ষ করে সে 'অনন্তকাল' ধরে আবর্তিত হত। কিন্তু আসলে পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণ একটু চাপা। কাজেই কোন অক্ষই সুষম নয়। মোটামুটিভাবে ধরা হয়, পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে মেরু সংযোজক সুষম অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। যদি তাই হত তাহলে পৃথিবী চিরকালই ঐ অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে থাকত এবং তার আবর্তনে কোন জটিলতা থাকত না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ এই উত্তর-দক্ষিণ অক্ষের সঙ্গে ঠিক মিলে যায় না। তার অর্থ—ঘূর্ণন অক্ষ সুষম নয়। কিন্তু টর্কের অনুপস্থিতে এই ধরণের অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন স্থায়ী হতে পারে না। সত্যি সত্যিই—উপরে বণিত কারণে এবং উপায়ে—পৃথিবী ক্রমাগত তার ঘূর্ণন অক্ষ পরিবর্তন করে। এই সমস্ত ঘূর্ণন অক্ষ পৃথিবীর ভরকেন্দ্রগামী। ভরকেন্দ্রটিই এই বিচিত্র গতিতে একমাত্র স্থির বিন্দু। টাল খেতে খেতে (wobbling) ঘুরে চলেছে। গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখান যায় যে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ তার উত্তর-দক্ষিণ অক্ষের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কোণ বজায় রেখে ঘুরছে। উত্তর-দক্ষিণ অক্ষের চারদিকে একবার পুরো ঘুরে আসতে ঘূর্ণন অক্ষের যে সময় লাগে তাও হিসেব করা হয়েছে এবং জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা তা মোটামুটি সমর্থিত হয়েছে। এই সময় 300 দিনের মত।

দৃঢ় বস্তুর আবর্তন গতির বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক। তবে এর গাণিতিক বিশ্লেষণের ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। এই ধরণের বিশ্লেষণ থেকে যে চিত্র ফুটে ওঠে তাই সংক্ষেপে এই যে নিবন্ধে বিবৃত হল। তবে এই চিত্র যে সর্বপ্রকারে নিখুঁত তা নয়। প্রকৃতপক্ষে গাণিতিক বিশ্লেষণ ছাড়া এই বিষয়টির সত্যিকার অনুধাবন বা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

প্রণবরঞ্জন চৌধুরী*

* রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়, 24 পরগণা

বিজ্ঞানের গল্প ঃ প্লাষ্টিক সার্জারী

সালটা 1942

ডাক্তারবাবু, আমি এই কুৎসিত মুখ নিয়ে বাঁচতে চাইনা, মেয়েটি কেঁদে উঠল। কি হয়েছে ? ডাঃ আইভারসন গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন। মেয়েটির মুখ দেখলে বোঝা যায়, সে এককালে সুন্দর ছিল; এখন তার মুখ ভরতি বসন্তের দাগ। ডাক্তার আইভারসন কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে তারপর ধীর স্বরে বললেন—তুমি কয়েকদিন পরে এস। এর মধ্যে ভেবে দেখি কি করা যায়। মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

ডাক্তার প্রেসটন্ আইভারসন অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন, আর ভাবছেন কি করে মেয়েটির মুখের সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনা যায়। তিনি কোন মেয়ের মুখে কুৎসিত দাগ সহ্য করতে পারতেন না। মনে পড়ে তাঁর একমাত্র মেয়ে রেবেকার কথা। ইউনিভারসিটির ছাত্রী ছিল। রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করত। ফুলের মত সুন্দর দেখতে। একজন অধ্যাপকের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা দুজনে যখন আইভারসনের সামনে এসে দাঁড়াত, তাঁর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

হঠাৎ একদিন! রেবেকা ল্যাবোরেটরীতে কাজ করছে। একটা রাসায়নিক ফ্লাস্ক ফেটে গিয়ে তপ্ত অ্যাসিডের কিছুটা অংশ রেবেকার মুখে গিয়ে পড়ল, যন্ত্রণায় চিৎকার করে রেবেকা জ্ঞানহীন হয়ে মুহূর্তের মধ্যে টুল থেকে লুটিয়ে পড়ল।

ডাক্তার ছুটে এল। খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে আইভারসন ছুটে এলেন। রেবেকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। দীর্ঘ দুমাস পরে সে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু রেবেকার ফুলের মত সুন্দর মুখ বীভৎস হয়ে গেল, আইভারসন বাবা হয়ে তাকাতে পারলেন না। জন একদিন দেখতে এসেছিল। ফিরে গিয়ে জানিয়েছিল যে, সে রেবেকাকে বিয়ে করতে অক্ষম। আইভারসন কিছু বলতে পারেন নি। রেবেকা কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবাকে বলেছিল—পারো না বাবা আমার মুখটা আবার আগের মত করে দিতে? একটা অসহায় যন্ত্রণায় তাঁর সমস্ত শরীর নীল হয়ে গেল, নিঃশব্দে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

রেবেকা কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল —ল্যাবোরেটরীতে যাচ্ছি। সেই শেষ যাওয়া।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ ল্যাবোরেটরী থেকে ফোন পেয়ে আইভারসন ছুটে ল্যাবোরেটরীতে গেলেন। রেবেকার রিসার্চরুমে প্রবেশ করে দেখলেন একটা লম্বা টেবিলের উপর রেবেকাকে শোয়ান হয়েছে। সাদা চাদরে সমস্ত শরীর ঢাকা। চাদর সরিয়ে আইভারসন

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বিষের ক্রিয়ায় রেবেকার মুখ নীল হয়ে গেছে। তবু তিনি অবশ হাতখানি তুলে নাড়ী দেখলেন, হৃৎপিণ্ডের গতি পরীক্ষা করলেন। নিস্তব্ধ নিঝুম, চরম অভিমানে সে বিদায় নিয়েছে। লিখে রেখে গেছে একটা চিঠি। জলভরা চোখে আইভারসন পড়ে দেখলেন ঃ

"বাবা—

এই সুন্দর পৃথিবীটাকে কুৎসিত করে তোলার অধিকার আমার নেই,

তাই বিদায় নিলাম……।

—রেবেকা"

ডাক্তার আইভারসনের দু চোখে জল। ভাবছিলেন—ঐ মেয়েটিও রেবেকার মত অসহায় হয়ে তাঁর কাছে এসেছে; কিন্তু সে জানে না—বহু ক্ষেত্রেই চিকিৎসক যে তার চেয়েও অসহায়।

পরদিন সকালে চেম্বারে গিয়ে দেখলেন, সেই মেয়েটি বসে আছে। আমার জন্যে কিছু ভেবেছেন ?—মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো। তোমার কথাই তো চিন্তা করছি—বললেন আইভারসন। মেয়েটি বলল—আমি আগে সুন্দর দেখতে ছিলাম। পাঁচ বছর আগে আমার বসন্ত হয়। তারপর থেকেই মুখ এমনি হয়ে যায়। আমি লোক সমাজে বার হতে পারি না। তার চেয়ে আমি ভাবছি…।

না, না—প্রেসটন আইভারসন চিৎকার করে উঠলেন। এভাবে তোমাদের আমি মরতে দিতে পারি না, তুমি আমায় একমাস সময় দাও মা। আমি তোমাদের বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দেব।

—বেশ দিলাম। মেয়েটির পরের প্রশ্ন—কিন্তু তার পরেও যদি নিরাশ হয়ে ফিরি ? তার আগে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব—উত্তরে বললেন আইভারসন।

সারা পৃথিবী জুড়ে তখন বিশ্বযুদ্ধ। রণক্লান্ত সৈনিকের দল আহত অবস্থায় প্রতিনিয়তই আইভারসনের চেম্বারে এসে ভিড় করছে। সুন্দর সুন্দর যুবকদের মুখগুলি বোমার স্প্লীন্টারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। চিন্তায় বিভোর। রাস্তার ধারে দেখলেন কতকগুলি লোক একটি গ্রাম্য লোকের কাছে বসে হাতে উলকি আঁকছে।

কি মনে হল, আইভারসন দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকগুলি উলকি আঁকিয়ে নিয়ে খোস মেজাজে চলে গেল। উলকির লোকটি বলল—আসুন বাবু উলকি পরবেন, ভালভালো নকশা……… !

আইভারসন বললেন—পরতে পারি, তবে একটা শর্তে।

—বলুন কি শর্ত ?

—তুমি যদি আবার উলকিটা তুলে দিতে পার তবেই।

—এটা কোন কাজই নয়, কিন্তু তুলেই যদি ফেলবেন তাহলে পরছেন কেন বাবু?

—সে তোমায় পরে বলব, বললেন আইভারসন।

—বেশ, বসুন।

আইভারসন রাস্তার উপর বসে পড়লেন। লোকটি তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে আইভারসনের দুহাতে উলকি এঁকে দিয়ে বলল—কোন্ হাতেরটা উঠিয়ে দেব? আইভারসন বাঁ-হাত এগিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন—লোকটি তার থলি থেকে একখণ্ড সিরিশ কাগজ বের করে তার উলকির ওপর ঘষতে লাগল। আইভারসনের মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠল। কিন্তু একটি শব্দও তিনি করলেন না। ঘষতে ঘষতে উলকির দাগ যখন মিলিয়ে গেল, তখন একটা ন্যাকড়া বের করে হাতে জড়িয়ে দিয়ে বলল লোকটি—তিনদিন পরে খুলে দেখবেন উলকি উঠে গেছে।

তিন দিন পরে ন্যাকড়া খুলে পরম বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, সত্যই কোন উলকির দাগ নেই। নতুন চামড়াও গজিয়েছে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর মাথায়। উলকির দাগ চামড়ার নিচে যতটা গেছে, ততখানিই লোকটি ঘষে তুলে দিয়েছে। তারফলে স্বাভাবিক চামড়াই গজিয়েছে।

তখন-ই ডান হাতের উলকির খানিকটা কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন। চামড়ার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উলকির দাগ বড়জোর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত গিয়েছে। তাই সিরিশ কাগজের সার্জারীও তৃতীয় স্তর পর্যন্ত। আরও দেখলেন, নতুন চামড়া গজাবার সময় স্বাভাবিক চামড়াই গজিয়েছে।

নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলেন আইভারসন। শুরু হল পরীক্ষামূলক অপারেশন। পরিষ্কার বিশুদ্ধ সিরিশ কাগজ দিয়ে সৈন্যদের মুখের ক্ষতস্থানগুলি ঘষে তুলে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

বুকের মধ্যে অসীম ভয় আর মনের মধ্যে অসীম বিস্ময় নিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুললেন আইভারসন। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। স্বাভাবিক চামড়া গজিয়েছে, সে চামড়ায় পূর্বের ক্ষত চিহ্ন পর্যন্ত নেই। একের পর এক অপারেশন করে চললেন। সাফল্যের পর সাফল্য।

ঠিক এক মাস পরে মেয়েটি এল। বলল—আমি এসেছি। আইভারসন বললেন—এসো মা। রেবেকার জন্যে যা আমি করতে পারিনি, তোমার জন্যে তাই করব।

মেয়েটির অপারেশন করলেন আইভারসন। তিনদিন পরে যখন ব্যাণ্ডেজ খুললেন, গোলাপী রঙের স্বাভাবিক চামড়া দেখা গেল। আগের ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ডাক্তার প্রেসটন আইভারসনের দু-চোখ জলে ভরে গেল মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে। মনে ভেসে উঠল রেবেকার মুখ। আট দিন পরে মেয়েটি ছুটি নিয়ে চলে গেল। এক মাস পরে সে চিঠি দিয়ে জানাল যে, সে নতুন একটা চাকরি করছে। অনেক

টাকা মাইনে পাচ্ছে। হয়ত, শীগগির তার বিয়ে হবে। এসবের জন্যে আইভারসনের ধন্যবাদ-পাওয়া উচিত।

না, না, না—থর থর করে বৃদ্ধের হাত কেঁপে উঠল। বিড় বিড় করে বলে উঠলেন—না, না, এর জন্যে আমার ধন্যবাদ পাওয়া উচিত নয়। ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয় তো—সেই উলকিওয়ালাকে-ই দিতে হয়।

আইভারসন ধন্যবাদ দেবার জন্যে উলকিওয়ালার কাছে গেলেন, দেখা পেলেন না। উলকিওয়ালা কখনও এক জায়গায় বসে না, ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরে এলেন।

পরবর্তীকালে সার্জেনরা এই অপারেশনেরই নাম দিল—প্লাস্টিক সার্জারী।

কৃতজ্ঞ রইল বিশ্বের চিকিৎসকগণ সেই উলকিওয়ালার কাছে, যে নিজের অজান্তে বর্তমান চিকিৎসা জগতের অন্যতম বিস্ময়—প্লাস্টিক সার্জারীর সূচনা করে দিয়ে গেল।

সুব্রত ঘোষ*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

মেঘডাকা, বজ্রপাত ও বজ্রনিবারক

মনে করা যাক, একটি লোকের কাছে 100 টাকা আছে। অন্য একটি লোকের 100 টাকা ঋণ আছে। তাহলে দু'জনের মধ্যে টাকার মোট ফারাক দাঁড়াল 200. ঠিক তেমনি দুটি মেঘের মধ্যে একটিতে যখন ঋণাত্মক আধান ও অপরটিতে ধনাত্মক আধান জমা হতে থাকে, তখন ক্রমশ তাদের মধ্যে তড়িৎবিভবের ফারাক বাড়তে থাকে। তারা যখন পরস্পরে মিলিত হয়, তখন সেখানে তড়িৎ মোক্ষণ হয়, ফলে তড়িৎআধানগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তড়িৎ মোক্ষণের সময় এত প্রভূত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় যে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার বাতাস হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়। তখন সেই ফাঁকা স্থান পূর্ণ করতে আশপাশ থেকে বাতাস ছুটে আসে। তাছাড়া তড়িৎমোক্ষণের সময় উচ্চ তাপে বায়ুর আকস্মিক প্রসারণ ঘটে। বলা বাহুল্য, মোক্ষণের সময় যে আলোর উৎপত্তি হয় তাকে বিদ্যুৎ চমকানো এবং ফাঁকা স্থান পূর্ণ করার সময় আশপাশ থেকে বাতাস ছুটে আসা এবং মোক্ষণের সময় বায়ুর আকস্মিক তীব্র প্রসারণের ফলে যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে মেঘডাকা বলা হয়। আলোর গতিবেগ শব্দের তুলনায় অনেক গুণ বেশি, তাই শব্দ শোনার অনেক আগেই আলো দেখা যায়।

বজ্রপাত কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। ধরা যাক মাটি থেকে কিছু উপরে একটি মেঘে ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক আধান জমা হচ্ছে। যে ধর্মের দ্বারা কোন চুম্বকের যে কোন একটি মেরু যেমন তার কাছে অবস্থিত চুম্বকীয় পদার্থকে বিপরীত মেরুতে আবিষ্ট করে,

ঠিক তেমনভাবে ঐ ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক আধানযুক্ত মেঘটি তার নিচেকার পৃথিবীর মাটিকে ঠিক তার বিপরীত আধান দ্বারা আবিষ্ট করে। তখন এদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণী বল ক্রিয়া করে এবং কোন কোন সময় তার ফলে পৃথিবীর মাটি ও ঐ মেঘের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ হয়। এর মাত্রা এত বেশি যে, এ জাতীয় মোক্ষণক্রিয়ার সময় মেঘ ও মাটির মধ্যে কোন জীবজন্তু বা গাছপালা পড়লে তার মৃত্যু অবধারিত।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক বড় বাড়ির মাথায় বজ্রনিবারক (lightning arrester) থাকে। বজ্রপাতের ফলে যাতে এই সব বাড়ির কোন ক্ষতি না হয় তার জন্যে বজ্রনিবারক দরকার হয়। একটি পুরু তামার পাত বাড়ির গা বরাবর আটকানো থাকে। এই পাতের উপর প্রান্ত বাড়ির উচ্চতম অংশ থেকে আরো খানিকটা উঁচু'ত রাখা হয়। পাতের উপর প্রান্তে কয়েকটি সূচীমুখ থাকে। যখন কোন তড়িৎগ্রস্ত মেঘ বাড়ির উপর আসে, তখন তা ঐ সূচীমুখগুলিকে বিপরীত আধান দ্বারা আবিষ্ট করে এবং অপর প্রান্তে সমতড়িৎ আবিষ্ট করে; কিন্তু অপর প্রান্তটি মাটিতে পোঁতা থাকে বলে ঐ আবিষ্ট সমতড়িৎ মাটিতে চলে যায়। পাতের উপরপ্রান্ত সূচীমুখ বলে ঐ স্থানে আধান বেশি পরিমাণে জমা হয় এবং সূক্ষ্মমুখ দিয়ে আস্তে আস্তে আধান নির্গত হয়। বায়ুকণাগুলি ঐ আধান পেয়ে তড়িৎগ্রস্ত মেঘের বিপরীত আধান কর্তৃক আকর্ষিত হয় ও মেঘের দিকে ধাবিত হয় এবং মেঘের আধানকে প্রশমিত করে। এজন্যে মেঘের ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিভব প্রভেদ বৃদ্ধি পেতে পারে না ও বজ্রপাতেরও ভয় থাকে না। ভাল বজ্রনিবারকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন:

(i) তড়িৎমোক্ষণের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয় তাতে বজ্রনিবারক তামার পাতটি যেন গলে না যায়;

(ii) পাতের উপর প্রান্তকে কতকগুলি সূচীমুখের সমষ্টি করা প্রয়োজন;

(iii) সূচীমুখ থেকে মাটি পর্যন্ত পাতটি একটানা হওয়া প্রয়োজন। মাঝখানে কাটা থাকা চলবে না এবং তা মাটির বেশ গভীরে পোঁতা দরকার।

লোহার কাঠামোতে তৈরী বাড়ি, বজ্রনিবারকযুক্ত গৃহ—বজ্রবিদ্যুতের সময় নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তারের জাল, বিভিন্ন উঁচু গাছ, টেলিফোন পোষ্ট ইত্যাদি ঐ সময়ে খুবই বিপজ্জনক।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ্য, বজ্রপাত ও বজ্রনাদ একই সময়ে হয়। কিন্তু শব্দের গতিবেগ আলোর গতিবেগ অপেক্ষা অনেক কম বলে বজ্রপাত হলে শব্দ আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। এই কারণে বজ্রনাদ শুনলে বজ্রাহত হবার ভয় থাকে না বলে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। কারণ বজ্রপাতে মৃত্যু হলে তা সঙ্গে সঙ্গে হয়, বজ্রনাদ শুনবার আর সময় থাকে না।

অসিত ঘোষ*

* ন' পাড়া কালিবাড়ী রোড, 24-পরগণা

শব্দকূট

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে শব্দকূট দুটি সমাধান কর :

(1)

1	2		X	3		4	5
6				X	7		
X	8			9		X	
10			X	11		12	X
13		X	14		X		X
	X	15			X	16	
17	18		X	X	X	19	
X		X	20				X

পাশাপাশি

1—মাংসপেশী ও স্নায়ুর জীবাণুঘটিত একটি রোগ ;

3—অনেকগুলি বাহুবিশিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্র ;

6—সমকোণী ত্রিভুজের দীর্ঘতম বাহু ;

7—পাইন কানাডাবালসাম প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত প্লাস্টিকের মত পদার্থ ;

8—একটি মৌলিক পদার্থ যার বহুরূপতা ধর্ম বর্তমান ;

10—সোডা তৈরির অধিকতর সুবিধাজনক প্রচলিত পদ্ধতি ;

11—কাচের মত স্বচ্ছ একরকম স্তরীভূত কঠিন পদার্থ ;

13—ভরের একটি বহুল প্রচলিত একক ;

14—পরমাণুর সমবায়ে গঠিত পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ ;

15—প্রাণীর দুগ্ধ থেকে প্রাপ্ত জান্তব শর্করা ;

16—টেলিগ্রাফ আবিষ্কারক ;

17—অ্যাসিড ও ক্ষারের মিলনে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ ;

19—সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ভরের একক ;

20—যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠান হয়।

উপর থেকে নিচে

2—কোনো মসৃণ তলে আপতিত আলোকরশ্মির ভিন্ন পথে প্রত্যাগমনকে যা বলা হয় ;

4—অনুভূমিক অক্ষ বরাবর কোন বিন্দুর স্থানাংক নির্দেশকারী দৈর্ঘ্যাংক ;

5—প্রাণীদেহের অন্যতম একটি তন্ত্র যা প্রাণীর বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখে ;

9—বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ ;

10—যে তল বক্র নয় ;

12—শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন প্রভৃতির গতি নির্দেশকারী যন্ত্র ;

14—সাধারণত আটগুণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় ;

18—স্থির বস্তুকে গতিশীল ও গতিশীল বস্তুকে স্থির করতে যা দরকার হয়।

(2)

1		2		X	3	4	5
	X	6		7	X		
X	8		X		9	X	X
10			X	11			X
12		X	X	X	13		
14		X	15	16		X	X
X	X	17				X	18
19					X	20	

পাশাপাশি

1—আলকাত্‌রা থেকে প্রাপ্ত বর্ণহীন তরল হাইড্রোকার্বন ;

3—সি. জি. এস. পদ্ধতিতে বলের একক ;

6—যে জৈবাধারে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় ;

8—বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী যিনি তাপ-তড়িৎ শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন ;

10—অপুষ্পক উদ্ভিদ বিশেষ ;

11—মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী যিনি গণিতের ত্রিকোণমিতি শাখার প্রবর্তন করেন ;

12—পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ ;

13—একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস যা নিওন আলো তৈরি করার জন্যে ব্যবহৃত হয় ;

14—ইংলণ্ডীয় ওজনের একটি বহুল প্রচলিত একক ;

17—একটি মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাস ;

19—রামধনুর সাতটি রঙকে একত্রে ইংরাজীতে যা বলা হয় ;

20—কোয়াণ্টামবাদ উদ্ভাবনকারী বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ;

উপর থেকে নিচে

1—টেলিফোন আবিষ্কারক ;

2—বিজ্ঞানের যে শাখা পাথর, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে ;

4—উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচনক্রিয়া সংগঠিত হয় যে জৈব পদার্থের দ্বারা ;

5—সামুদ্রিক দূরত্ব বুঝাতে যা ব্যবহৃত হয় ;

7—ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে শিশুদের যে রোগ হয় ;

9—যে মৌলিক পদার্থ ফটো-ইলেকট্রিক সেলে ব্যবহৃত হয় ;

10—অত্যন্ত কঠিন একমের প্রস্তর যা সহজে ক্ষয়ে যায় না ;

15—ভাইরাসঘটিত দুরারোগ্য ব্যাধি যা সাধারণত শিশুদের হয় ;

16—ইঞ্জিনের গতিবেগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো হয় যে যান্ত্রিক সমন্বয়ের সাহায্যে ;

18—একটি মৌলিক ধাতু যা সংকর ধাতু তৈরি করতে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

(সমাধান ডিসেম্বর,'77 সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)

অসিতকুমার চক্রবর্তী*

* ব্লক-2, ফ্ল্যাট-10, 242 দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-700 033

মডেল তৈরি

নষ্ট টিউব লাইট পুনর্ব্যবহার

বাড়িতে অনেক সময় টিউব-লাইটের ফিলামেণ্ট কেটে গিয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তখন টিউবটিকে ফেলে না দিয়ে অল্প খরচায় পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন হয় একটি মাত্র কনডেন্সার, যার মান $2\mu F$. টিউব লাইটে শক্ত কাঁচের টিউবের ভিতরের দিকের দেওয়ালে ফ্লুরেসেণ্ট রং-এর প্রলেপ লাগান থাকে। টিউবের ভিতরে খুব নিম্নচাপে কিছু নিয়ন বা আর্গন গ্যাস ও কিছু পারদ বাষ্প রাখা হয় এবং দু'প্রান্তে দুটি ফিলামেণ্ট বায়ুনিরুদ্ধভাবে আটকান থাকে।

এই টিউব লাইট জ্বালাবার জন্যে চিত্র 1-এর মত বর্তনী সজ্জার ব্যবস্থা থাকে।
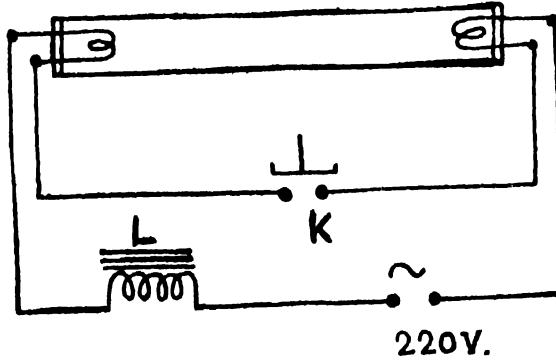
চিত্র 1

যখন ঠেলা চাবি K টেপা হয়, তখন টিউবের ভিতরের দুই দিকের ফিলামেণ্ট তড়িতের সাহায্যে উত্তপ্ত হয় এবং তা থেকে ইলেকট্রন কণা নির্গত হতে থাকে। ঠেলা চাবি ছেড়ে দিলে হঠাৎ ফিলামেণ্টের তড়িৎবর্তনী ছিন্ন হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে চোকের, L, দ্বারা উপযুক্ত বিভব-প্রভেদ বর্তমান থাকে। তার ফলে টিউবের এক প্রান্তের ফিলামেণ্ট থেকে অন্য প্রান্তের ফিলামেণ্টের মধ্যে ক্রমাগত ইলেকট্রন-কণা প্রবাহিত হবে। ঐ ইলেকট্রন কণার প্রবাহ টিউবের মধ্যে যে আর্গন বা নিয়ন গ্যাস ও পারদ বাষ্প থাকে তাকে ভীষণ ভাবে ধাক্কা দেয়, ফলে তা আয়নিত হয়ে পড়ে। আয়নিত গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণে শক্তি বিকিরিত হয়। কাচের গায়ে ফ্লুরেসেণ্ট প্রলেপের উপর ঐ বিকিরণ পড়ে উজ্জ্বল দৃশ্য আলোর উদ্ভব হয়।

কিন্তু ফিলামেন্ট কেটে গেলে, ঐ ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না এবং তাকে ইলেকট্রন কণা নির্গত করার জন্যে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা যায় না। এ অবস্থায় চিত্র 2-এর মত করে বর্তনীসজ্জার ব্যবস্থা করলে ঐ ফিলামেন্ট কাটা টিউব লাইটও ভাল টিউব লাইটের মত জ্বলবে।

চিত্র 2
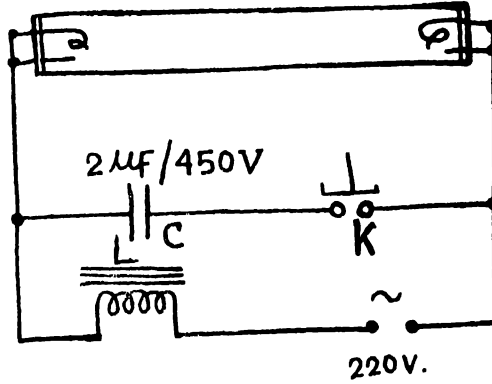
এখানে যখন K চাবি টেপা হয়, তখন ফিলামেন্ট দুটির সঙ্গে কনডেনসার C ও চোক L যুক্ত থাকার জন্যে ফিলামেন্টের দু' প্রান্তের মধ্যে উচ্চ বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় টিউবের এক প্রান্তে ফিলামেন্ট থেকে অন্য প্রান্তের ফিলামেন্টের মধ্যে আহিত কণা প্রবাহিত হতে থাকে। চাবি ছেড়ে দিলে ঐ উচ্চ বিভব হঠাৎ কমে যায়। কিন্তু ফিলামেন্টদ্বয়ের মধ্যে ইলেকট্রন কণা প্রবাহিত করার মত বিভব চোকের মাধ্যমে বজায় থাকে। সেজন্যে নষ্ট টিউব থেকেও নতুন টিউবের মত আলো পাওয়া যায়। তবে বেশ কিছুদিন টিউবটি ব্যবহার করার পর যদি তা কাজ না করে, তখন বর্তনীতে উক্ত কনডেনসারটির বদলে 3 বা 4µF-এর কনডেনসার লাগাতে হবে।

(পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে প্রবন্ধের লেখক এই মডেলটি তৈরি করেছেন)

কল্যাণ দাস*

---

*পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

ভেবে কর

1 মনে কর, আমি এক থেকে একশোর মধ্যে কোন একটি সংখ্যা ভেবেছি, এখন যদি আমি তোমায় এই সংখ্যাটি সম্বন্ধে সাতটি প্রশ্ন করতে দিই, তাহলে সেই উত্তরগুলির সাহায্যে সংখ্যাটিকে সনাক্ত করতে পারবে কি? অবশ্য তোমাকে শুধু এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর হ্যাঁ বা না। যেমন--সংখ্যাটি কি কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে? বল দেখি কি কি প্রশ্ন করে এবং তার উত্তরের সাহায্যে কি ভাবে সংখ্যাটি পাওয়া যেতে পারে?

2.
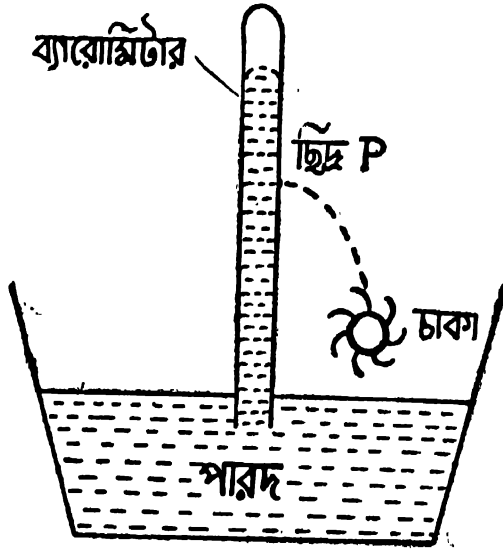
চিত্রে যেমন দেখান আছে সেরকম একটি ব্যারোমিটারের নলে পারদ তলের নিচে P বিন্দুতে একটি ছিদ্র করে দেওয়া হল যা টরিসেলীর শূন্যস্থান নয়। সুতরাং বাইরে থেকে বায়ু এসে ব্যারোমিটারে ঢুকে পারদতলকে নামিয়ে দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। এখন ভাবা যাক, ছিদ্র দিয়ে পারদ মৃদুভাবে পড়তে থাকবে। যদি চিত্রের মত করে সবকিছু রাখা যায়, তাহলে পারদ সর্বদা পড়েই চলবে, কেন না বায়ুমণ্ডলীয় চাপের জন্যে পারদ সর্বদাই নির্দিষ্ট 76 সে. মি. উচ্চতায় থাকবে।

এখন ধরা যাক, এভাবে দরকার মত একটি মোটা ব্যারোমিটার নেওয়া হল এবং তার ঐ ছিদ্রের পারদের ধারা দিয়ে একটি চাকা ঘোরানো হল। এ থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় যদি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে কি বলতে পার যে, কোন শক্তি ব্যয় না করেই এ থেকে অনন্তকাল ধরে অন্তহীন শক্তি উৎপাদিত হয়ে চলবে?

দেবব্রত সরকার*

*পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

3. বৈজ্ঞানিক কাগামাছি তাঁর লেবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় হঠাৎ এক ধরণের আজব কণিকার সন্ধান পেলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তিনি দেখলেন, কণিকাগুলির প্রকৃতি খুবই আশ্চর্য রকমের। তিনি লক্ষ্য করলেন, এক একটি কণিকা যতটুকু শক্তি নিয়ে জন্মায় ঠিক ততটুকু শক্তি সে বাইরে থেকে নেয়। এরপর কণিকাটি গতিপ্রাপ্ত হয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (ধ্রুবক) শক্তি ব্যয় করে থেমে যায়। এবার যতটুকু শক্তি কণিকাটির অবশিষ্ট রইল ঠিক ততটুকুই সে আবার বাইরে থেকে সংগ্রহ করে এবং আবার গতিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্বের নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে থেমে যায়। এভাবে তৃতীয়বার থেমে যাওয়ার পর দেখা যায়, কণিকাটির শক্তি অবশিষ্ট নেই। আরও দেখা গেছে কণিকাটির প্রাথমিক শক্তি 10 ইলেকট্রন-ভোল্ট (একক)-এর কম এবং কণিকাটির শক্তি আদানপ্রদানের শক্তির পরিমাণ সবসময়েই ইলেকট্রন ভোল্টের পূর্ণসংখ্যার গুণিতক।

তাহলে কণিকাটির প্রাথমিক শক্তি কত এবং প্রত্যেক বার গতিশীল অবস্থার জন্যে তার কতশক্তি ব্যয় হয় ?

(ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান 544 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রকুমার সাহা*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

ভাসমান বস্তু

ধনঞ্জয় পাল*

ওজন কমে
　　সব বস্তুর
ডুবে গ্যাসে
বা তরলে
মনে হয়
　　পুরাদস্তুর।
গ্যাস বা তরল যতখানি
আয়তনে সরে জানি—
ওজন তার যত
　　কম্‌তি ওজন তত।
'প্লবতা' এরেই কয়
　　(যা) উর্ধ্বমুখী ঘাত ছাড়া
অন্য কিছুই নয় ;
ভারকেন্দ্রে ক্রিয়া করে
　　গ্যাসের ভেতর বা তরলে
আয়তনে যেমন সরে
　　বস্তুর ডুব হ'লে।**

**প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের নীতি অবলম্বনে
*8/2।স, রতন বাবু রোড, কলিকাতা-700 002

ইলেকট্রনিক চিড়িয়াখানা

ইলেকট্রনিক চিড়িয়াখানা দেখতে যাবার আগে, চলুন আর একবার ঘুরে দেখে আসি আলিপুরের মস্ত চিড়িয়াখানাটাকে। গেট পেরিয়েই ডানদিকে আর বাঁদিকে রাস্তা, তারপর একের পর এক পশু আর পাখির খাঁচা। কোথাও হরিণ কোথাও শেয়াল, কোথাও হাতি আবার কোথাও বাঘ বা ভল্লুক। জলের পাশে বড় কচ্ছপটা রোদ পোহাচ্ছে আর তার পাশেই ভোঁদড় আপন মনে নাচছে—এমনি বিচিত্র আরও জন্তু-জানোয়ার নিয়ে তৈরী এই চিড়িয়াখানা। কিন্তু ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে—এমন একটা চিড়িয়াখানা হবে যেখানে জন্তু-জানোয়ার ওরা কেউ জীবন্ত থাকবে না। ওরা হবে এক একটা যন্ত্র দিয়ে তৈরী, অথচ চেনা যাবে না।—ওরা ডাকবে, মানুষ কাছে গেলে জীবন্ত পশুর মতই সাড়া দেবে, বাঘ বা সিংহ সত্যিকারের মত গর্জন করে উঠবে, পাখিগুলি ডালের ফাঁক থেকে একেবারে জীবন্ত পাখির মত ডেকে উঠবে। পৃথিবীতে চিড়িয়াখানা না হোক এমন বাগান আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাতে, সেখানে একটা কুকুর আছে, মানুষ এলেই সে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। একজন মনীষীর মূর্তি আছে, তিনি চেয়ারে বসে থাকেন—তার কাছে লোকজন গেলেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার জীবনের মূল বক্তব্যের উপর একের পর এক বক্তৃতা দেন। কিন্তু এরা কেউ জীবন্ত নয়। এরা সবাই এক-একটা যন্ত্র দিয়ে তৈরী। কিন্তু এই যন্ত্রগুলি কিভাবে জীবন্ত প্রাণীর মত ব্যবহার করে এবার সেকথায় আসি।

যে কুকুরটা মানুষ কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ওঠে তার গঠনটা মোটামুটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। দক্ষ কারিগর দিয়ে তৈরি করান হয় একটি রবারের কুকুরের দেহ আর তার উপর পরিয়ে দেওয়া হয় আসল কুকুরের চামড়া কিংবা ঐ জাতীয় জিনিষ—যাতে কাছে থেকেও লোকে চিনতে না পারে। কুকুরটির চোখ দুটিতে থাকে দুটি ফটো-ইলেকট্রিক সেল বা আলোক-তড়িৎ কোষ। সঙ্গে যুক্ত থাকে দেহের মধ্যেকার ইলেকট্রনিক বর্তনী সজ্জা—যার কাজ, কুকুরের মধ্যে তার স্বাভাবিক চরিত্র-গুলিকে ফুটিয়ে তোলা। কুকুরটি যেখানে বসে আছে তার চার পাশের নির্দিষ্ট জায়গা এমনভাবে তড়িৎ-বর্তনী দিয়ে সাজান আছে যে, ঐ জায়গায় কোন লোক আসলে তাদের দেহের ওজনের চাপে কয়েকটি তড়িৎ-বর্তনী সুইচের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হবে বা লোকের ছায়া যদি কুকুরের চোখে গিয়ে পড়ে তবে আলোক-তড়িৎ-কোষ তার বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সংবাদ পৌঁছে দেবে রিলে বর্তনীতে। কুকুরের দেহের ভিতর রিলে বর্তনী তখন সক্রিয় করে তুলবে আরও কয়েকটি বর্তনীকে। কোন বর্তনী বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে কুকুরটিকে আস্তে আস্তে দাঁড় করিয়ে দেবে এবং

অন্য কোন বর্তনীর মাধ্যমে টেপ-রেকর্ড বেজে উঠবে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে আসল কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ—এই আওয়াজ শুনে যারা কাছে এসেছিল তারা যদি দূরে সরে যায় তবে যে সুইচগুলি মানুষের ছায়া বা মানুষের চাপের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছিল, তাদের হঠাৎ আগের অবস্থায় ফিরে যাবার কথা। কিন্তু হঠাৎ আগের অবস্থায় যাতে ফিরে না যায় তার ব্যবস্থাও আরেকটি রিলে বর্তনীর মাধ্যমে করা হয়। কিন্তু কাছের লোক যদি সরে না যায় তবে টেপ রেকর্ড কিছুক্ষণ বাজার পর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি রিলে বর্তনী সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুকুরটির জিভ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে এবং কুকুরটি হাঁপাতে থাকে।

এভাবে যদি আলিপুরের চিড়িয়াখানার খাঁচার ভিতর থেকে পশু-পাখিগুলিকে সরিয়ে প্রতিটি পশুর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এরকম ইলেকট্রনিক বর্তনীযুক্ত নকল পশু সাজান হয়, তবে বাঘের খাঁচার কাছে গেলে যান্ত্রিক বাঘও গর্জন করে উঠবে। জলের পাশে ভোঁদড়ও নাচতে থাকবে, কাচের আলমারির ভিতর সাপও মানুষ দেখে ফোঁস করে ফণা তুলে উঠবে, কাকাতুয়া তাকে শেখানো বুলি আগের মতই বলবে, আর যন্ত্র দিয়ে তৈরী ভল্লুকও বিভিন্ন খেলা দেখাতে ভুলবে না। এই প্রসঙ্গে ভল্লুকের নক্সাটি লক্ষণীয়। চিড়িয়াখানার এসব কাণ্ডকারখানা দেখতে
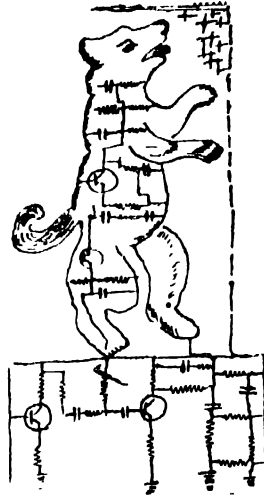
দেখতে যদি আইসক্রিম বা খাবার প্রয়োজন হয় তবে, চিড়িয়াখানার ভিতরে কোন দোকানে পয়সা দিলে যান্ত্রিক মানুষ (রোবট) সে খাবার দিয়ে দেবে, সেখানেও আসল মানুষের প্রয়োজন হবে না।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এই যান্ত্রিক পশুগুলি আসল পশুর সকল আচরণ নকল করতে কি পারবে? যে যান্ত্রিক কুকুর মানুষ এলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, কাঁচা মাংস চুরি করে পালাতে পারে, সে কি কাঁচা মাংস আর কাঁচা ছোলার মধ্যে ঠিকমত পার্থক্য করতে পারবে?—হয়ত না। অন্তত ইলেকট্রনিক্স বর্তমানে যে পর্যায়ে রয়েছে এমনটি সম্ভবপর নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না। বলতে পারি না ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ারিং-এর উন্নতি কতদূর প্রসারিত হবে, কেমন ভাবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে জীবজন্তুর স্বভাবচরিত্রকে হুবহু অবিকল নকল করা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, 1976 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কিংকং' নামে একটি চলচ্চিত্র করবার জন্যে ইঞ্জিনীয়াররা একটি 40 ফুট উঁচু গরিলা তৈরি করে—যার হাত, পা, দাঁত এবং দেহের প্রায় প্রতিটি অংশ চালনার তত্ত্বাবধান করেছে কমপিউটার। আর এই আপাতদৃষ্টিতে জীবন্ত গরিলার সঙ্গে অভিনয় করেছেন অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ।

এ বিষয়ে নানা দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির গবেষণাগারে তৈরী প্রাণীর নিউট্রন সজ্জাকে বিশ্লেষণ করে এবং তার সঙ্গে ইলেকট্রনিক বর্তনী সজ্জার সামঞ্জস্য খুঁজে মানুষ চাইছে তারই অনুকৃতি নকল মানুষ তৈরি করতে তার নিজস্ব গবেষণাগারে।

শ্রীবিজয় বল*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান

1. **প্রথম সমাধান—**

প্রথমে যতগুলি সম্ভাব্য সংখ্যা আছে অর্থাৎ 100, তাকে মনে মনে সমান দুভাগে ভাগ করে নেওয়া হল; অর্থাৎ 1 থেকে 50. এবার জিজ্ঞেস করা হল সংখ্যাটি 1 থেকে 50 এর মধ্যে আছে কিনা? উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটির সম্ভাব্য মানের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। এরপর যে ভাগে সংখ্যাটি পাওয়া গেল তাকে আগের মতই সমান দুভাগে ভাগ করে সংখ্যাটি কোন্ অর্ধে আছে জিজ্ঞেস করা হল এবং এখন সংখ্যাটির সম্ভাব্য মান পঁচিশটি মাত্র হতে পারে। কাজেকাজেই দুটি প্রশ্নের দ্বারা সংখ্যাটির সম্ভাব্য মান 100-র চারভাগ, অর্থাৎ পঁচিশটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হল। দেখা যাচ্ছে—প্রতিবার সম্ভাব্য মানগুলিকে অর্ধেক করে গেলে সবক্ষেত্রেই সংখ্যাটির সম্ভাব্য মানের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। এভাবে সাতবারের মধ্যেই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে; কেননা তখন সংখ্যাটির

সম্ভাব্য মান $= \frac{100}{128}$ টির মধ্যে কোন একটি। অর্থাৎ সাতবারের পর মাত্র একটি সংখ্যাই বাকি থাকবে—সেটাই উদ্দিষ্ট সংখ্যা।

দ্বিতীয় সমাধান—

সংখ্যাটিকে কয়েকবার প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বাইনারীতে (binary) রূপান্তরিত করা হল। এক্ষেত্রে সাতটি প্রশ্ন দরকার হবে, কেননা 100-কে ঐ পদ্ধতিতে লিখতে সাতটি সংখ্যা (bit) অর্থাৎ 1 বা 0 দরকার। এরপর বাইনারী সংখ্যাটিকে দশমিকে পরিণত করলেই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

প্রশ্নগুলি এরূপ হবে—

(1) সংখ্যাটি কি 64 থেকে ছোট ?

(a) যদি 1 নং প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে সংখ্যাটি কি 32 থেকে ছোট ?

(b) যদি 1 নং প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়, তবে সংখ্যাটি থেকে 64 বাদ দিলে যে বিয়োগফল পাওয়া যায়, তা কি 32 থেকে ছোট ?

3, 4,……7নং প্রশ্ন এভাবে করতে হবে। উত্তরগুলির দ্বারা সংখ্যাটিকে বাইনারীতে লিখতে পারা যায়। এভাবে যে কোন প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে ঐ বিট (bit) 1 হবে এবং প্রথম প্রশ্নটি থেকে সপ্তম বিট, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ, তৃতীয় থেকে পঞ্চম……ইত্যাদি বিট পাওয়া যাবে। এরপর বাইনারী সংখ্যাটিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে দশমিকে পরিণত করতে হবে।
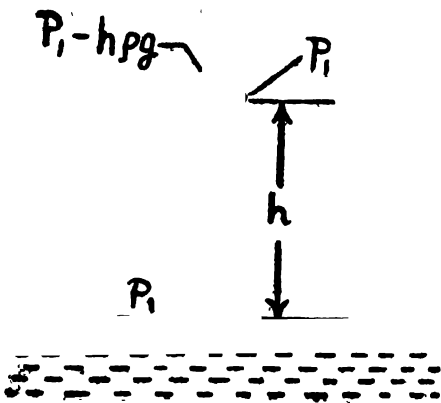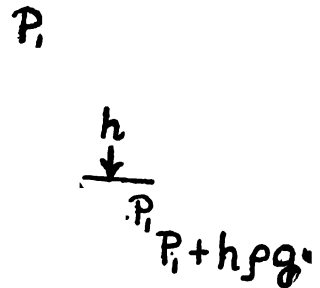
চিত্র 1 চিত্র 2

বাইনারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এমন কোন চলতি অংকের বই দেখলে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে।

2. চাকা এভাবে ঘোরানো সম্ভব নয়। কেননা ফুটো করলে পারদ আদৌ বের হবে না। বাইরের চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান, P_1. তাহলে তরলের ঘনত্ব, ρ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ, g হলে পাত্রের পারদ তল থেকে h উচ্চতায় ঐ একদিক আবদ্ধ নলের পারদস্তম্ভের ভিতরের চাপ হবে $P_1 - h\rho g$ (চিত্র 1)। ভিতরের চাপ কম বলে তরল বের হবে না।

সাধারণত তরলযুক্ত কোন উন্মুক্ত পাত্রে তরলতল থেকে h গভীরতায় ফুটো থাকলে পাত্রের বাইরের চাপ P_1 এবং ঐ গভীরতায় তরলের চাপ $P_1 + h\rho g$ হবে (চিত্র 2)। এ অবস্থায় তরল বাইরে পড়ে যায়। এই ধরণের ঘটনার সঙ্গে সকলের পরিচিতি থাকায় ব্যারোমিটা'রের ঐ ছিদ্র দিয়েও তরল বাইরে পড়ে যাবে—এভুল চিন্তা থেকে প্রশ্নটির ব্যাখ্যা শুরু করলে ঐ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক।

দেবব্রত সরকার

3. মনে করা যাক কণিকাটির প্রাথমিক শক্তি x eV (ইলেকট্রন-ভোল্ট) এবং প্রত্যেক বার গতিশীলতার জন্যে যে শক্তি হয় তা y eV

প্রশ্নানুসারে প্রথমবার প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট শক্তি $= 2x - y$

দ্বিতীয়বার প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট শক্তি $= 2(2x-y)-y$

তৃতীয় বারের শেষে অবশিষ্ট শক্তি $= 2[2(2x-y)-y]-y$ এবং প্রশ্নানুসারে এর মান শূন্য।

অর্থাৎ, $$2[2(2x-y)-y]-y=0$$

বা, $$8x=7y$$

$$\therefore \quad x=\frac{7y}{8}$$

সর্তানুসারে যেহেতু শক্তি ভগ্নাংশ হবে না এবং প্রাথমিক শক্তি 10 eV-এর কম, y-এর মান শুধুমাত্র 8 eV হতে পারে এবং তখন x = 7 eV

রবীন্দ্রকুমার সাহা

জেনে রাখ

গরম বরফ

সাধারণত 0°C উষ্ণতার উপরে বরফ আর কঠিন অবস্থায় থাকে না। রাশিয়ার পদার্থবিদ্ ব্রিড্‌জম্যান প্রমান করেছেন, 20,600 বায়ুমণ্ডলীর চাপে বরফকে তার কঠিন অবস্থায় 76°C উষ্ণতায়ও রাখা সম্ভব। এত উষ্ণতায় বরফকে তাই গরম বরফ বলা হয়। জলের সবচেয়ে ঘন অবস্থা 4°C উষ্ণতায় তখন জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1. স্বাভাবিক বরফের ঘনত্ব এর চেয়ে কম। কিন্তু উল্লিখিত গরম বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·05 অর্থাৎ তা সাধারণ বরফের মত জলে না ভেসে ডুবে যাবে। অতিরিক্ত চাপের দরকার হয় বলে এই বরফ ইস্পাতের পাত্রে তৈরি করা হয়; ফলে তা চোখে দেখা সম্ভব হয় নি। এর ধর্ম যা জানা গেছে—তা সবই পরোক্ষভাবে সম্ভব হয়েছে।

·বলরাম সিংহরায়*

---

*পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

থার্মোগ্রাফ

এটি একপ্রকার বিশেষ ধরনের তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার। এর বৈশিষ্ট্য হল—এর সাহায্যে কোন উষ্ণ পদার্থের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতার বিভিন্নতা বা তাপমাত্রার তারতম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদার্থের উষ্ণতার যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা এই যন্ত্রে রেখাঙ্কিত হয়ে যায়।

ঐ রেখচিত্র থেকে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন পদার্থের তাপমাত্র কত ছিল তা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

কাইমোগ্রাফ

এটি হৃদ্‌স্পন্দন, শ্বাসকার্য প্রভৃতির গতির হার নির্দেশক যন্ত্র। এই যন্ত্রে ভুষাকালি মাখান একটি গোলাকার পাত্রের গায়ে একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র দণ্ড লাগান থাকে। যন্ত্রটি প্রয়োগে ঐ জাতীয় স্পন্দন বা ক্রিয়া বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে দণ্ডটিকে কম্পিত করে। এর ফলে, দণ্ডটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘূর্ণায়মান গোলাকার পাত্রটির গায়ে রেখাপাত করে। উৎপন্ন ঐ রেখচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস প্রভৃতির স্পন্দনের গতি নির্ণয় করা যায়।

ইলেকট্রো-এনসেফ্যালোগ্রাফ

যন্ত্রটির প্রধান কাজ হল মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের বিশেষ বৈদ্যুতিক স্পন্দনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশক রেখচিত্র অঙ্কন করা। মস্তিষ্কের কোষগুলির অতি মৃদু স্পন্দন বহু সহস্রগুণ বর্ধিত হয়ে এই যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়। ঐ রেখা দেখে মস্তিষ্কের স্নায়ুর কার্যকারিতা নির্ণয় করা যায়। দেখাগেছে, একজন সুস্থ লোকের মস্তিষ্ক থেকে সেকেণ্ডে 7 থেকে 13টি তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, অথচ একজন মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা সেকেণ্ডে 7টির বেশি কখনই হয় না। মস্তিষ্কের স্নায়ুবৈকল্য নিরূপণের জন্যে বিভিন্ন অবস্থায় রোগীর মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের এইরূপ রেখচিত্রের প্রকৃতির বিভিন্নতা লক্ষ্য করা হয়।

এক্সটেন্সোগ্রাফ

এটি ধাতুনির্মিত তার বা পাতের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সম্প্রসারণ ক্ষমতা পরিমাপক যন্ত্র। কতটা শক্তি প্রয়োগে কোন্ ধাতু কতটা সম্প্রসারিত হতে পারে, অর্থাৎ তার স্থিতি-স্থাপকতার পরিমাণ কত—তা এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

অভিজিৎ বর্দ্ধন*

*তালতলা হাই স্কুল, দ্বাদশশ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা-700 014

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুর্বার অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে না পেরে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র দিনদিন পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু এই তো সেদিনও দেখেছি বাড়ীর ঠাকুরদা, ঠাকুরমা ও দিদিমাদের ছোটখাট অসুখ-বিসুখে এমন সব পাতা-শিকড়-তেল তারা বাত্‌লে দিতেন, যাতে আশ্চর্য রকম কাজ হত। হাজার হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই শাখাটিতে প্রচুর গবেষণা হয়েছে—এই ভারতেরই মাটিতে; হয়েছে তার ব্যাপক প্রচারও। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত এটি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যেও। এমন একদিন ছিল যখন আমাদের প্রতিটি পরিবারই ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসালয় এবং এই জ্ঞান বংশপরাম্পরায় আরও বিস্তারলাভ করেছিল—কতকটা উত্তরাধিকার সূত্রে, কতকটা শিক্ষার মাধ্যমে, আর কিছুটা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পরিবেশের কাছ থেকে।

কিন্তু সেই বিদ্যা এখন কি আয়ত্ত করা গেছে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে? বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জৌলুষে আমাদের আগের পুরুষ যখন চোখ ধাঁধিয়ে ফেলেছেন, ঠিক তখনই আমরা ভুলতে বসেছি আমাদের প্রাচীন শিক্ষাকে। শুধু তাই-ই নয়—সামাজিক জটিলতা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের অভাব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি কারণে মানুষের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে বসেছে। সামান্য মামুলি ব্যাধিগুলিও আজ আর সহজে ছেড়ে যেতে চায় না। উপরন্তু আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির চমকপ্রদ 'দ্রুত ফললাভ' মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে।

বস্তুত উপরিউক্ত দু'টি মূল কারণই প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে—যার ফল, এর উপর ক্রমশ বর্তমান অবিশ্বাস ও অনীহা।

কিন্তু আজও ঝড়-জলে ভেজার পর হাত-পায়ের পাতায় গরম তেল মালিশ করলে যে কোন ওষুধের চেয়ে যথেষ্ট উপকারী। থানকুনি পাতার রস কোন কোন পেটের অসুখে আজও অমৃতসম।

গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির দুরবস্থা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবনযাত্রার জটিলতা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দহীনতার আলোকে প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যাকে বিশ্লেষণ করা যাক।

অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দহীনতা গ্রামীণ রোগীদের দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে

দিয়েছে। দামী দামী ওষুধ ইত্যাদি কেনবার, উপযুক্ত 'ফী' দিয়ে ডাক্তারকে দেখাবার সামর্থ তাদের অনেকেরই নেই। ফলে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছে। গ্রামের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, ওষুধ ইত্যাদির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই এর কারণ, ফলে রোগীদেরই দুরবস্থা। প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস না করে, বরং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাশাপাশি সঠিকভাবে তার প্রয়োগ প্রচলন করতে পারলে গ্রামীণ জনস্বার্থঘটিত অনেক সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হবে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াও বায়ু-চিকিৎসা, জলচিকিৎসা, যোগ চিকিৎসা, আকুপাংচার ইত্যাদি জটিলতামুক্ত ও স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে বহুলাংশে প্রচলিত করার দিকে নজর দিতে হবে।

গ্রামের যে কোন চিকিৎসা কেন্দ্রেই শতকরা 60 থেকে 70 জন রোগীর অসুখই অতি সাধারণ, অর্থাৎ পেটের গণ্ডগোল, সর্দিজ্বর, মাথাধরা, দাঁতব্যথা ইত্যাদি। বাকি 30 থেকে 40 শতাংশ রোগী জটিল রোগের শিকার (প্লুরিসি, টি. বি., টাইফয়েড, আলসার, জনডিস ইত্যাদি)

সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাটিকে দুভাগে ভাগ করে—"সাধারণ রোগীদের" প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রমতে এবং "জটিল রোগীদের" আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রমতে চিকিৎসা করা চলতে পারে। প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার মূলধন ফুল, পাতা, শেকড়, তেল ইত্যাদি। এগুলি মোটেই দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নয়। বলা যেতে পারে প্রায় বিনা খরচেই চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। এটা গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই খুব লাভের।

দ্বিতীয়ত জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে অসুখবিসুখও জটিলতর হতে আরম্ভ করছে। তার বড় কারণ আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার পার্শ্ব ক্রিয়া। সামান্য মাথাধরা সহ্য করতে না পেরে আমরা যখন ট্যাবলেট খাই তখন ভুলে যাই যে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক রক্ষা ক্ষমতা (potency) অনেকখানি কমে যেতে পারে। মামুলি জ্বরে শক্তিশালী ক্যাপসুল খেয়ে আমরা শুধু নিজেদেরই নয়, আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরও দুর্বল করে ফেলছি।

প্রাচীন চিকিৎসার বড় রকমের কোন পার্শ্বক্রিয়া নেই; এর কৃতিত্ব এখানেই। হাত-পা মচকে গেলে গরম চুন-হলুদের প্রলেপ অথবা চোখের অস্বস্তিকর যন্ত্রণায় গরম ভাপের সেঁক দিলে কোন পার্শ্বক্রিয়া হয় না।

আগেই বলেছি জটিল রোগগুলির ক্ষেত্রে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার না করে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে হবে। এর ফলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে এবং তাকে অপেক্ষাকৃত কম রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

অর্থাৎ প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রকে 'প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসা' হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে। এজন্যে চাই আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা জ্ঞানের পূর্ণ জাগরণ। লুপ্তপ্রায় জ্ঞানকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে প্রচুর গবেষণা করতে হবে। উপযুক্ত বই ও পত্রপত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলাটা মোটেই শক্ত কাজ হবে না, বিশেষ করে যেখানে এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক বা প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির কোনোটিকেই পক্ষপাতিত্ব না করে, বরং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে প্রয়োজন অনুসারে উভয়কেই সমমর্যাদায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মোহে আমরা যদি প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যাকে জলাঞ্জলি দিই সেটা বোকামি-ই হবে। দুই-ই চাই এবং পাশাপাশি।

পূর্ণেন্দু সরকার*

---

*গ্রাঃ+পোঃ খাটুরা, 24 পরগণা, পিন 743 273

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : (ক) আমরা যে পেঁপে খেয়ে থাকি তার উপাদান কি কি ?

(খ) পেঁপে গাছের মধ্যে স্ত্রীগাছ, পুরুষ গাছ এবং মিশ্র গাছ কিভাবে চেনা যায় ?

(গ) পেঁপে চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু জানালে খুশি হব।

বিপ্লব কুণ্ডু, অলোক কুণ্ডু, বহরমপুর

উঃ (ক) কাঁচা পেঁপে এবং পাকা পেঁপে—এ দু'অবস্থাতেই পেঁপে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় যথেষ্ট সমাদৃত। একারণে স্বভাবতঃই মনে হয়—পেঁপে কি কি উপাদানে তৈরি! বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জেনেছেন, এক কিলোগ্রাম ওজনের একটি পেঁপেতে যে সমস্ত উপাদান মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়, তা হল—

জল :	800—900 গ্রাম
শর্করা :	80—100 গ্রাম
প্রোটিন :	5—7 গ্রাম
চর্বি :	0·5—1·2 গ্রাম
খনিজ পদার্থ :	50—70 গ্রাম
ক্যালসিয়াম :	প্রায় ·2 গ্রাম
ফসফরাস :	প্রায় 0·15 গ্রাম
ক্যারোটিন :	12,000—16,000 মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন A :	প্রায় 1000 মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন B_1 :	প্রায় 500 মাইক্রোগ্রাম

এছাড়াও পেঁপেতে খুব অল্প মাত্রায় ভিটামিন C এবং রিবোফ্লাবিন থাকে।

কাঁচা পেঁপে কাটলে যে সাদা আঁঠাল পদার্থ বের হয়, তাতে প্যাপেইন নামে একটি উপাদান থাকে যা পরিপাকক্রিয়ার সহায়ক।

(খ) পেঁপে গাছ পুরুষ, স্ত্রী ও মিশ্র—এই তিন জাতের হয়ে থাকে। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই পেঁপে গাছের মধ্যে পুরুষ স্ত্রী বা মিশ্রজাতের গাছকে পৃথকভাবে চেনা যায়। স্ত্রী গাছের ফুল বেশ লম্বা (প্রায় দু-তিন সে.মি.) হলদে রঙের এবং পাঁচটি পুরু পাপড়িবিশিষ্ট হয়ে থাকে। পুরুষ গাছের ফুল স্ত্রী গাছের তুলনায় ছোট এবং এই গাছের লম্বা বোঁটার মাথায় একসঙ্গে অনেক ফুল হয়। মিশ্র জাতের গাছের ফুল স্ত্রীগাছের ফুলের মতই, তবে ঐ ফুলের বোঁটা তুলনামূলক ভাবে ছোট হয়ে থাকে।

(গ) অন্যান্য গাছের তুলনায় পেঁপে গাছের বাড় বেশি এবং পেঁপের ফলনও যথেষ্ট বেশি। একারণে বিশেষ কোন তদারকি ছাড়াই পেঁপের চাষ মোটামুটি সুবিধা-জনক। তবে উপযুক্ত সার প্রয়োগ ও যত্ন করলে খুব ভাল চাষ করা যায়।

পেঁপের বীচি থেকেই চারাগাছ জন্মায়। সাধারণত পাকা পেঁপের বীজ টাট্‌কা অবস্থায় সার দেওয়া কোপানো জমিতে এক এক জায়গায় একসঙ্গে তিন চারটে বসিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়ি বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোয়। যতদিন না পর্যন্ত বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোয় ততদিন উক্ত স্থানে যাতে চড়া রোদ না লাগে বা বৃষ্টির জল না দাঁড়ায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুকূল আবহাওয়া পেলে দেড় থেকে দু'মাসের মধ্যে বীজ থেকে যে চারাগাছ জন্মায়, তা ক্ষেতে লাগানোর উপযুক্ত হয়ে ওঠে। জমিতে পেঁপের চারাগুলি খুব কাছাকাছি লাগালে গাছগুলি খুব সরু, লম্বা আকৃতির এবং কম জোরালো হয়। একারণে জমিতে চারাগাছ প্রায় সাত আট ফুট অন্তর অন্তর লাগানো উচিত। চারাগাছ বসানোর সময় জমিতে দেড়ফুট গভীর গর্ত করে একভাগ সার ও তিনভাগ মাটি ভাল করে মিশিয়ে ঐ গর্তে ঢেলে দিয়ে তাতে চারা বসালে গাছ খুব ভাল হয়। বর্ষার সময় ছাড়া অন্যান্য সময় মাসে অন্তত দুই তিন বার জলসেচ করা প্রয়োজন। মাটিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হলে পেঁপে গাছ ভাল ফল দেয় না; তখন চুন মিশিয়ে জলসেচ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে ফলন বাড়াতে হলে ফসফরাস ও চুনের মিশ্র সার ব্যবহার করা হয়। গাছের বৃদ্ধির সময় নির্দিষ্ট অনুপাতে পটাশ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। গাছের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার প্রয়োগের মাত্রাও বাড়াতে হয়।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা-700 009

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনা সভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শুভানুধ্যায়ী ও সদস্যদের মধ্যে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীঅশোককুমার মিত্র এবং শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে ভারত সরকারের শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ ও যোজনা দপ্তরের মন্ত্রী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে যোগদান করায় 22শে আগষ্ট 1977 তারিখের সন্ধ্যায় পরিষদ ভবনে তাঁদের বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি অধ্যাপিকা শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে এবং বিধান সভায় স্থানীয় সদস্য শ্রীনিখিল দাস বিশিষ্ট অতিথিরূপে যোগদান করেন।

প্রারম্ভে পরিষদ সভাপতি শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং শ্রীঅশোককুমার মিত্র মহাশয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরিষদের তরফ থেকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মাল্যভূষিত করে অভ্যর্থনা জানানো হয়। শ্রীবিদ্যানিকেতনের ছাত্রীগণ সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সম্বর্ধনা সমিতির আহ্বায়ক শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন।

শ্রীধীরাজ বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর প্রেরিত বাণীটি সভায় পড়ে শোনান :

"বাংলা ভাষায় অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার ও তাদের বিজ্ঞান সচেতন করে তুলবার যে প্রয়াস বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বিগত 31 বছর ধরে নিয়ে চলেছেন তা খুবই প্রশংসার্হ এবং বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় এই সংস্থা থেকে অতি প্রাঞ্জলভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ও বিজ্ঞানভিত্তিক লোকরঞ্জক নানা পুস্তকও প্রকাশিত হয়। জেনে সুখী হলাম যে আগামী 2শে আগষ্ট, 1977 পরিষদের তিনজন কৃতী সদস্যকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি কামনা করি।"

20শে আগষ্ট, 1977 স্বাঃ জ্যোতি বসু

পরিষদ-সভাপতি শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য, বর্তমান কর্মধারা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বিশেষভাবে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র, পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা এবং পরিষদের গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেন। গ্রামীণ উন্নয়নে— বিশেষ করে কৃষি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী উন্মেষের জন্যে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পরিষদের শাখা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং শ্লাইড ও ফিল্ম সহযোগে প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা দানের যে পরিকল্পনা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ রূপায়িত করার জন্যে আগ্রহী ও সচেষ্ট, সে বিষয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গ্রামে বিজ্ঞান প্রচারের আগ্রহের কথা স্মরণ করা হয়। যথোপযুক্ত অর্থসংস্থান হলে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি মোবাইল ইউনিট বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হবে, একথা তিনি ঘোষণা করেন। তাছাড়া পাঠাগারে পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান সংগ্রহশালার

প্রসার, ইত্যাদি পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান। তিনি বলেন, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভাষণদানে পরিষদ সভাপতি

জনশিক্ষা, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন, পরিষদের কর্মসূচী সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকারী উদ্যোগের কিছু কিছু অংশ রূপায়ণে পরিষদকে সহজেই নিয়োজিত করা যেতে পারে। তিনি আশা করেন, বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আনুকূল্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হবে এবং জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এই সমাবেশে উপস্থিত হতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা গত শতাব্দী থেকেই শুরু হয়। আমরা বঙ্গদর্শনের পাতায় বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ দেখতে পাই এবং তাতে যে সব গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হত তা থেকেও জানতে পারি যে, সে সময়েও কিছু কিছু প্রয়াস হয়েছে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নানান গ্রন্থ রচনা করবার জন্যে। কিন্তু সেই সমস্ত গ্রন্থের ভাষা সব সময়ে সাধারণের কাছে সুবোধ্য ছিল না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে যখন বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়, তখন থেকেই বাংলা ভাষাতেই বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। জগদানন্দ রায় প্রমুখ মনীষীরা এগিয়ে এলেন। তাঁদের লেখা আমরাও বাল্যকালে পড়েছি। অতি সুললিত ও মনোজ্ঞ ছিল সেই ভাষা। কত সহজ করে তাঁরা আমাদের সামনে বিজ্ঞানের তথ্য

মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

তুলে ধরতেন। আরও অনেকে এই রকম কাজ করতেন—কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপক ভাবে শুরু করলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু।" ডঃ চন্দ্র তাঁদের ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করে বলেন, "আমরা আমাদের কলেজ জীবনের শেষ

প্রান্তে এসে 'শনিবারের বৈঠক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করলাম। তাতে অনেকে সদস্য ছিলেন। তাঁরা পরবর্তীকালে নানান দিকে তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়ে দেন। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের বাড়ীতেই ছিল। আমরা তখন সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঠিক করলাম যে, বাংলায় বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা সম্মেলন ডাকবো। এ বিষয়ে উৎসাহ দিলেন ডঃ বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যিনি ব্যাপকভাবে গণশিক্ষার জন্যে ব্রতী হয়েছিলেন। এখনও তাঁর সেই 'বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস স্কীম' চালু আছে। এঁদের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমরা কয়েক বছর ধরে জনপ্রিয় বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করলাম—ইংরাজীতে যার নামকরণ হয়েছিল Popular Science Conference. তাতে বড় বড় বিজ্ঞানীরা সব আসতেন। আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ অনেকেই আসতেন। এসে বাংলা ভাষায় তাঁরা বক্তৃতা দিতেন বিজ্ঞান সম্পর্কে;—খুব সুন্দর লাগতো।" বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সম্ভাব্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ডঃ চন্দ্র বলেন, "আমাদের ছেলেবেলায়ও আমরা যখন প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান পড়েছি তখনও বাংলা ভাষায় আমরা বিজ্ঞান পড়েছি। আমরা সেই আমলে যখন চেষ্টা করে ইংরাজীর মাধ্যমে পড়তাম তখনও নিচের ক্লাসে আমরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়েছি। কাজেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পঠন কঠিন সেকথা ঠিক নয়; এবং সেটাকে আরও স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দিতে অগ্রণী হলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।" তিনি বলেন, "যদি দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে হয়, বিজ্ঞান চর্চাকে জনপ্রিয় করতে হয়, তাহলে বাংলা ভাষাতেই বা স্থানীয় ভাষাতেই তা করতে হবে—কেননা মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে আমরা যতটা সত্যের কাছাকাছি আসতে পারি, অন্য ভাষার মারফতে আসা শক্ত। শিক্ষার উচ্চস্তরে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার অভ্যাস যদি পরিবর্তন করে দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত এই জেনারেশনেই ঐ অভ্যাস পাল্টে যাবে না, কিন্তু এর পরে যাঁরা আসছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এগুলি সম্যকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন।"

তিনি একথাও বলেন, "বিজ্ঞান চর্চার জন্যে আরও পুস্তকাদি প্রণয়ন করা দরকার। বিজ্ঞান পরিষদ তো কতকগুলি ছোট ছোট বই প্রণয়ন করেছেন। এগুলো খুব ভাল হয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এক কোটি টাকা প্রত্যেক প্রধান ভাষার জন্যে রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যখন শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন হচ্ছিল তখন আমরা জানতে পারলাম, পশ্চিমবাংলা মাত্র 17 লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। কাজেই এখনও 83 লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের, অর্থাৎ আমাদের দপ্তরে মজুত আছে। তাতে অনেক বই লেখানো যেতে পারে। এখানে অর্থমন্ত্রীও রয়েছেন, এখানে শিক্ষামন্ত্রীও রয়েছেন। তাঁদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা ব্যবস্থা নিন এই সব বিজ্ঞানী বন্ধুদের নিয়ে বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উচ্চস্তরের বই লেখানোর জন্যে, যা দিয়ে জ্ঞান বিস্তার করা সহজ হয়ে উঠে। তাহলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত অর্থ পাওয়ার অসুবিধা হবে না। ঐ অর্থ ব্যয় হয়ে গেলে আরও অধিক অর্থ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। এই অর্থ উপযুক্তভাবে ব্যয় হোক, তখন দেখা যাবে।" ডঃ চন্দ্র আরও বলেন, ভাল কাজ করলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকার যে অনুদান দেন তার পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তিনি আশা করেন, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি হলে জনমানসে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীঅশোক কুমার মিত্র মহাশয় এই সম্বর্ধনাকে "ব্যক্তিগতভাবে গৌরবের বিষয়" বলে মনে করেন। যেহেতু তিনি বিজ্ঞানী নন, তিনি এই গৌরবকে "অনুপার্জিত উপার্জন বলে বর্ণনা করেন।"

"পয়সা-কড়ির জন্যে সবসময় মন্ত্রীদের দ্বারস্থ" হওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার মতন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যেও অর্থাভাব হয়, এটা আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি। যত তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, সেজন্যে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমিত্র আরও বলেন, "আপনাদের যা চেষ্টা তার উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে।" তিনি জানান, বিজ্ঞানের জ্ঞান গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত হলে জনজীবনে একটা আলোড়ন আসবে এবং এই আলোড়ন সৃষ্টির মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা সামাজিক বিপ্লবের সহায়তা করবেন।

রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র

শ্রীপার্থ দে তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন—ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে পরিবর্তন এসেছে, সেই পরিবর্তিত পরিবেশ বিজ্ঞান পরিষদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তিনি মনে করেন, শুধু-নিম্নস্তরেই নয়, উচ্চস্তরেও সকল বিষয়েই বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া শুধু সম্ভবই নয়—এটা উচিতও। দেশের দারিদ্র্য, শিক্ষকের অভাব, ভাঙ্গা স্কুল-বাড়ী—এসব রাতারাতি পরিবর্তিত হবে না; কিন্তু এর মধ্যেই, শিক্ষার প্রকল্পগুলিকে প্রসারিত করতে হবে। তিনি বিশেষ করে খেটে-খাওয়া বাড়ীর ছেলেদের কথা উল্লেখ করেন—যারা আছে লাখে-লাখে, কোটিতে

রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপার্থ দে

কোটিতে। এরাই কাজ করবে, সৃষ্টি করবে। এদের শেখানো দরকার "বিজ্ঞানের মূল ব্যাপারগুলো"। তারা জানবে সবকিছুরই একটা কারণ আছে, কিছুই অলীক নয়। শ্রীদে নতুন শিক্ষা প্রকল্প প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্রদিকে পরিবেশ, সমাজ-বিজ্ঞান, অঙ্ক—এগুলি যতটা সম্ভব পড়িয়ে দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে। তিনি বলেন, পরিষদের কর্মসূচীর সঙ্গে সরকারের গ্রামে ও শহরে শিক্ষা বিস্তারের প্রকল্পের অনেক মিল আছে। তিনি আশা করেন, এ বিষয়ে উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে।

অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। পরিষদের পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষদের কাজ এগিয়ে যাবে। তিনি

পরিষদ সহসভাপতি শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পাশে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়

বলেন, "বিজ্ঞান মানসিকতা যদি গড়তে পারি আমরা তবেই দেশকে যেভাবে গড়তে চাইছি, তিনি বলেন, "মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়টি কেবলমাত্র যে সেন্টিমেন্টের ব্যাপার তা নয়"। তাঁর মতে এটি খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা বিজ্ঞান শেখা যায় না; পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্ত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এই "মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে…বিজ্ঞান সম্ভব নয়।" তিনি বিজ্ঞান-মানসিকতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেন এবং গ্রামাঞ্চলের জন্যে বিজ্ঞান সংক্রান্ত মোবাইল ইউনিট-এর প্রকল্পটিকে স্বাগত জানান।

শ্রীনিখিল দাস বলেন, আমাদের সরকার যেহেতু জনগণের সরকার, সুতরাং তাঁরা পরিষদের কাজে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। তিনি আশা করেন, বিজ্ঞান কর্মীরা বিজ্ঞান প্রচারকে "ফ্যাসন" হিসাবে না নিয়ে, মন-প্রাণ দিয়ে একে সফল করবার চেষ্টা করবেন। তিনি আরও আশা করেন, পরিষদের অর্থাভাব সরকারী আনুকূল্যে দূর হবে, কর্মীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়বে এবং সরকার,

আমন্ত্রিত অতিথি শ্রীনিখিল দাস

সেভাবে গড়তে পারবে পরিষদের কাজকর্ম যাতে প্রসারিত হয়ে সাধারণ লোকের কাছে গিয়ে পৌছব, সে কথা মনে রাখার জন্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

হাতে-কলমে কেন্দ্রে ভেজাল সনাক্তকরণ শিক্ষার আসরে শ্রীঅশোক মিত্র

এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্যামসুন্দর দে-র পরিচালনায় পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার বিভাগ কর্তৃক অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, তা দেখে আমন্ত্রিত অতিথিরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিশোর-কিশোরীদের উদ্দীপনা ও অবদান এবং সম্বর্ধনা সমিতির সদস্যবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা উল্লেখ্য।

আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বক্তৃতাশেষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লিখিত বিবরণটির সংযোজন ও প্রণয়নের জন্যে শ্রীসুনীলকুমার সিংহকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই

শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়
আহ্বায়ক
সম্বর্ধনা সমিতি

বিশেষ নিবেদন

পরিষদের কার্যকরী সমিতির গত 16ই সেপ্টেম্বর, 1977 তারিখের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অনুযায়ী পরিষদের ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিবরূপে নিম্নস্বাক্ষরকারীর উপর যে কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি সচেতন। পরিষদের বহুবিধ কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে এবং নিজ কর্ম ও দায়িত্ব সম্পাদনে পরিষদের সকল সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট তিনি আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

রতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিষদের বিভিন্ন উপসমিতির সঠিক নাম ও সদস্য তালিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার জুলাই, 1977 সংখ্যায় পরিষদের বিভিন্ন উপসমিতির যে নাম ও সদস্য তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি। কার্যকরী সমিতির নির্দেশানুযায়ী ঐ সমস্ত উপসমিতির নাম ও সদস্য তালিকা যথাবিহিত শুদ্ধিকরণ করে এখানে মুদ্রিত হল:

অর্থ উপসমিতি

(1) শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
(2) ,, সুনীলকুমার সিংহ (আহ্বায়ক)
(3) ,, মহাদেব দত্ত
(4) ,, শ্যামসুন্দর দে
(5) ,, রতনমোহন খাঁ
(6) ,, বিজয় বল
(7) শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
(8) ,, ধীরাজ বসু
(9) ,, গৌরদাস মুখোপাধ্যায়
(10) ,, যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
(11) ,, অডিট অফিসের প্রতিনিধি
(12) ,, একজন চ্যার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট

প্রকাশনা উপসমিতি

(1) শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক)
(2) ,, শংকর চক্রবর্তী
(3) ,, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা
(4) ,, বলাইচাঁদ কুণ্ডু
(5) ,, সুনীলকুমার সিংহ
(6) ,, সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
(7) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(8) ,, রতনমোহন খাঁ
(9) ,, শ্যামসুন্দর দে
(10) ,, মহাদেব দত্ত
(11) ,, শ্যামাপ্রসাদ সরকার
(12) ,, মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র উপসমিতি

(1) শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু (সভাপতি)
(2) ,, সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক)
(3) ,, শ্যামসুন্দর দে
(4) ,, শ্যামসুন্দর পাল
(5) ,, পার্বতী পাল
(6) ,, সুব্রত ঘোষ
(7) ,, অসীম দত্ত
(8) ,, নিখিলেশ মিত্র
(9) ,, দিলীপ পাঠক
(10) ,, দুলালকুমার সাহা
(11) শ্রীশংকর চক্রবর্তী
(12) ,, মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
(13) ,, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী
(14) ,, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
(15) ,, রতনমোহন খাঁ
(16) ,, বিজয় বল
(17) ,, হরপ্রসাদ মিত্র
(18) ,, অজিতকুমার মেদ্দা
(19) ,, রবীন্দ্রনাথ রায়

গ্রন্থাগার উপসমিতি

(1) শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি)
(2) ,, বিজয় বল (আহ্বায়ক)
(3) ,, দেবব্রত সিংহ
(4) ,, শ্যামসুন্দর দে
(5) ,, ঊষা ঘোষদস্তিদার
(6) ,, যুগলকান্তি রায়
(7) ,, শ্যামসুন্দর পাল
(8) ,, রতনমোহন খাঁ
(9) ,, দেবেশ রায়
(10) ,, পার্বতী পাল
(11) শ্রীঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায়
(12) ,, বিপ্লব দাশ
(13) ,, দুলালকুমার সাহা
(14) ,, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী
(15) ,, সুব্রত ঘোষ
(16) ,, ধীরাজ বসু
(17) ,, পদ্মনাভ বসু
(18) ,, শিবব্রত ভট্টাচার্য
(19) ,, অজিতকুমার সাহা (ডালিমতলা)

জনসংযোগ উপসমিতি

(1) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাহা (সভাপতি)
(2) ,, দেবব্রত সিংহ (আহ্বায়ক)
(3) ,, ধীরাজ বসু
(4) ,, শ্যামসুন্দর দে
(5) ,, রতনমোহন খাঁ
(6) শ্রীসাধন পাণ্ডে
(7) ,, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(8) ,, শ্যামাপ্রসাদ সরকার
(9) ,, দিলীপকুমার চক্রবর্তী

গৃহনির্মাণ উপসমিতি

(1) শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি
(2) ,, রতনমোহন খাঁ (আহ্বায়ক)
(3) ,, সুনীলকুমার সিংহ
(4) ,, মহাদেব দত্ত
(5) ,, শ্যামসুন্দর দে
(6) ,, বলাইচাঁদ কুণ্ডু
(7) ,, ধীরাজ বসু
(8) শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
(9) ,, প্রদীপ ঘোষ
(10) ,, সুকুমার মিত্র
(11) ,, পরিমলকান্তি ঘোষ
(12) ,, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
(13) ,, সুনীলকুমার দে

যোজনা ও উন্নয়ন উপসমিতি

(1) শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)
(2) „ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী (আহ্বায়ক)
(3) „ গৌরদাস মুখোপাধ্যায়
(4) „ সাধন পাণ্ডে
(5) „ অজিতকুমার মেদ্দা
(6) „ সুনীলকুমার সিংহ
(7) শ্রীমহাদেব দত্ত
(8) „ শ্যামসুন্দর দে
(9) „ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
(10) „ রতনমোহন খাঁ
(11) „ বীরেন্দ্রনাথ সাহা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী

(1) শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
(2) „ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
(3) „ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়
(4) „ বলাইচাঁদ কুণ্ডু
(5) „ গৌরদাস মুখোপাধ্যায় (সহযোগী সম্পাদক)
(6) „ শ্যামসুন্দর দে (সহযোগী সম্পাদক)
*(7) „ রতনমোহন খাঁ (কার্যকরী সম্পাদক)
(8) „ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
(9) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
(10) „ শংকর চক্রবর্তী
(11) „ বিজয় বল
(12) „ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
(13) „ অজিতকুমার সাহা
(14) „ অর্চনা শর্মা
(15) „ দিলীপ চক্রবর্তী
(16) „ নীতীশকুমার সেন
(17) „ সুব্রত পাল
(18) শ্রীনিখিলেশ মিত্র

গৃহনির্মাণ তদারক উপসমিতি

*(1) শ্রীরতনমোহন খাঁ (আহ্বায়ক)
(2) „ মাখনলাল বসু
(3) „ ধীরাজ বসু
(4) „ বলাইচাঁদ কুণ্ডু
(5) শ্রীশ্যামসুন্দর দে
(6) „ শংকর দত্ত
(7) „ প্রদীপ ঘোষ
(8) „ গোপাল মুখোপাধ্যায়
(9) শ্রীসুনীলকুমার সিংহ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত

বিজ্ঞান পরিষদ কাটোয়া, কর্তৃক আয়োজিত নিখিল বঙ্গ বিজ্ঞান, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার 'খ' বিভাগে পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শ্রীঅভিজিৎ বর্দ্ধন এবং শ্রীবলরাম সিংহরায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদিকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং বিজ্ঞান শিক্ষা-লাভে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন পুরুলিয়ার শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

* কার্যকরী সমিতির 1.10.77 তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

পরিশিষ্ট

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শুভানুধ্যায়ী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকা, পরিষদের সভ্যবৃন্দ, হাতে-কলমে কেন্দ্রের বিজ্ঞানোৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী, এবং বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ—শারদোৎসবের শুভারম্ভে পরিষদের তরফ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রীতি। বহু বিপত্তি ও অসুবিধা সত্ত্বেও পরিষদ সভাপতি এবং কার্যকরী সমিতি ও প্রকাশনা উপসমিতির সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশনা করতে পারায় আমরা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। এ বিষয়ে পরিষদ দপ্তরের কর্মীবৃন্দের সহযোগীতাও উল্লেখ্য। গুপ্ত প্রেসের স্বত্বাধিকারী এবং কর্মীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদান প্রশংসনীয়। ব্লক, বাঁধাই ও আনুষঙ্গিক বিবিধ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরও ধন্যবাদ জানাই।

এই সংখ্যায় প্রবীণ ও নবীন লেখকদের রচিত প্রবন্ধাদিতে বিজ্ঞান মানসিকতা ও নিষ্ঠা এবং মাতৃ-ভাষার প্রতি দরদ লক্ষণীয়। তাঁদের সহযোগিতায় পরিষদ আনন্দিত। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুশীলন, প্রচার ও ব্যাপক প্রসারের আশু প্রয়ো-জনীয়তা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা অগ্রজপ্রতিম শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার প্রকাশনায় প্রকাশনা উপসমিতি করণীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরবর্তী সংখ্যা থেকে কয়েকটি নতুন ধাঁচের বিজ্ঞান-রচনা এবং প্রয়োজনভিত্তিক—কারিগরী, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও গ্রামীণ-বিজ্ঞান বিভাগের সংযোজন আশা করা যেতে পাবে। পাঠক-পাঠিকার দপ্তর, বিজ্ঞান সংবাদ, গবেষণা পত্রাদিও অন্তর্ভূক্ত হবে। পত্রিকার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পটক্ষেপে জনমানষে বিজ্ঞানের-কল্যানমূলক দিগন্তের পরিচয় প্রসারের চেষ্টাও চলছে।

বিজ্ঞান- বন্ধের উৎকৃষ্ট সাধনের প্রচেষ্টায় বন্ধ রচনার ক্ষেত্রে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, আঙ্গিক সজ্জা ও সাবলীল ভাষার স্বচ্ছ ব্যবহারের উপর দৃষ্টি দেওয়া হবে।

পত্রিকা পকাশনায় সহকর্মি শ্রীশ্যাম সুন্দর দের অত্মনিয়োগ, অক্লান্ত শ্রম ও স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ঠা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সাহায্য ও ধন্যবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিনয়াবনত
আহ্বায়ক
প্রকাশনা উপসমিতি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান যাচ্ছে যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1977 সালের কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 1978 সালের সভ্যপদ প্রার্থীদের নতুন মুদ্রিত আবেদন পত্রে আবেদন করতে হবে। পরিষদ কার্যালয়ে উক্ত আবেদন-পত্র পাওয়া যাবে। পুরাতন আবেদন- পত্র যদি কারও নিকট থাকে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

1লা অক্টোবর, 1977

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পরিষদের সভ্যরা যদি ইংরাজি মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকার মাসিক সংখ্যাটি ডাকযোগে বা সরাসরি না পান, তা হলে ঐ মাস শেষের পূর্বে পরিষদ দপ্তরে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ অবশ্যই অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দিন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

●

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগে বিনা খরচে লেখাপড়া করবার সুযোগ আছে।

১ ১ *

ছাত্র - ছাত্রীদের জন্যে এটি বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

●

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রধান উপদেষ্টা : শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কার্যকরী সম্পাদক : শ্রীরতনমোহন খাঁ

সহায়তায় : পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন : 55-0660

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

মাসিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	পূর্ণপৃষ্ঠা	অর্ধপৃষ্ঠা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
তৃতীয় প্রচ্ছদপট	175·00 টাকা	100·00 টাকা
চতুর্থ প্রচ্ছদপট	250·00 টাকা	—
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপটমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
পঠনীয় বিষয়বস্তুমুখী পৃষ্ঠা	140·00 টাকা	75·00 টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	125·00 টাকা	65·00 টাকা
সাধারণ সিকিপৃষ্ঠা	40·00 টাকা	

বিজ্ঞাপনের এই হার কেবলমাত্র এক রঙের জন্যে। বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চুক্তিবদ্ধ হলে যথাক্রমে $7\frac{1}{2}\%$ এবং 5% রিবেট দেওয়া হয়।

বি. দ্র. এই হার নতুন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চুক্তিবদ্ধ পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হারই বহাল থাকবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানতে হলে পরিষদ চলাকালীন পরিষদের অফিস-তত্ত্বাবধায়ক শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু জানতে হলে উক্ত কেন্দ্রের আহ্বায়ক শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডঃ শ্যামসুন্দর দে কিংবা শ্রীদুলালকুমার সাহার সঙ্গে ঐ কেন্দ্র চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, চিঠিপত্র কর্মসচিব বা বিভাগীয় আহ্বায়কদের নামে যথাবিধি পাঠানো যাবে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে কর্মসচিব বা বিভিন্ন আহ্বায়কদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ বিষয়ে সভ্য/সভ্যাদের সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে। ইতি—

1লা, অক্টোবর, 1977
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; যাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'প্যাকেট মেল সার্ভিস'-এর সহযোগিতায় পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানান বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: কার্যকরী সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

কার্যকরী সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মডেল প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়বস্তুর উপর একটিমাত্র পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করে অংশগ্রহণ করতে পারে। পরিষদ থেকে মডেল পরিচালনার জন্যে প্রতিযোগী প্রয়োজনমত 220 ভোল্ট পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। অন্য কিছু প্রয়োজন হলে প্রতিযোগীকেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। বিচারকদের নিকটে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তাদের মডেল সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে। মডেলের মৌলিকত্ব, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক (প্রয়োজনভিত্তিক) উৎকর্ষ, সংগঠন ইত্যাদির উপর প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ভর করবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত আবেদনপত্র সংগ্রহ করবার শেষ তারিখ 31শে জানুয়ারী, 1978 এবং মডেলসহ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 15ই মার্চ, 1978. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে আবেদনপত্র পরিষদের কার্যালয়ে বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত পাওয়া যাবে। মডেলও এই ঠিকানায় ঐ সময়ের মধ্যে জমা নেওয়া হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 009

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিঃ দ্রঃ (i) পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত মডেল বিবেচিত হবে না;

(ii) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র"-এর কোন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রিংশত্তম বর্ষ ডিসেম্বর, 1977 দ্বাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার হাল ও গণশিক্ষা

স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর কেটে গেল। এই তিরিশ বছরে শিক্ষা সংস্কারে কর্মকর্তাদের কোন ক্লান্তি নেই। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা জগতে বার বার নানা পরিবর্তন এসেছে এবং এখনও 'সেই ট্রাডিসন (tradition) সমানে চলেছে'। বার বার পরিবর্তন এটাই প্রমাণ করেছে—শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণে কোন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। শিক্ষার উৎকর্ষের নামে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করা হয়েছে; তাদের ভালমন্দের দিক, তাদের ভবিষ্যৎ ও জাতীয় স্বার্থ সবই হয়েছে উপেক্ষিত। এত পরীক্ষা, এত পরিকল্পনা করেও এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা মূল বিষয়ের কোন সমাধান সম্ভব হল না। এখানে মূল বিষয় বলতে গণশিক্ষার কথাই বলা হচ্ছে, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নিরক্ষরতা দূরীকরণ। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এ দুটির অন্তরায় ছিল বিদেশী শাসন ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পর তাই এক বিরাট কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হল; গ্রামে-গঞ্জে শহরে স্থাপিত হল প্রাথমিক বিদ্যালয়। উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ছেলেমেয়েকে অন্তত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 42,000 প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগই গ্রামাঞ্চলে। প্রায় প্রতি গ্রামে অন্তত একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং প্রতি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে তিনজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন। প্রাথমিক শিক্ষা পুরোপুরি অবৈতনিক এবং বহু পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এত আয়োজন সত্ত্বেও গ্রামের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ আজও নিরক্ষর কেন? গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার মানই বা দিন দিন অবনতির দিকে কেন?

বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষক, কিছু বই-পত্রের সুবিধা

এবং মাহিনা ছাড় থাকলেই কি সব শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনায় আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং বিদ্যালয়ে ভিড় জমাবে? বাস্তব ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্রই চোখে পড়ছে। এর কারণ কি? গত তিরিশ বছরে বহু শ্লোগান শোনা গেছে—ভারত ক্রমশ সমাজতান্ত্রিকতার পথে এগিয়ে চলেছে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ধীরে ধীরে কমে যাবে; গরিবী হঠাতে হবে; জোতদার-মজুতদার-কালোবাজারী-মুনাফাবাজ শ্রমিক শোষকদের দিন শেষ হতে চলেছে; ইত্যাদ। এগুলি সবই ফাঁকা আওয়াজ। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ধনী আরও ধনী হয়েছে বা হচ্ছে এবং গরীব আরও গরীব হয়েছে ও হচ্ছে। এ কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য যে বহুলাংশে ব্যর্থ, সেই পটভূমিতে এ আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। গত কয়েক বছরে গ্রামীণ উন্নয়নের নামে বিভিন্ন কর্ম-সূচী এমন ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যার ফলে গ্রামের জমি ও ছোটখাট ব্যবসা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের করায়ত্ত। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে এবং স্বাধীনতার অনতি পরেও যে সমস্ত চাষীর দু-পাঁচ বিঘা জমি ছিল, তারা এখন ভূমিহীন চাষী বা অন্যের ক্ষেতে দিন মজুর। ভূমি-সংস্কার নীতি এমন ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে যে, চাষী ও ভাগচাষীদের বাধ্য করেছে দিন মজুরের দলে ভিড় জমাতে। এরাই গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ, এদের দু-বেলা খাবার জোটে না, লজ্জা ঢাকার সামান্য আবরণও এদের দেহে নেই বললেই চলে। এই সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনাহার, অনাদর ও অবহেলার মধ্যে দিয়ে যখন সামান্য কাজ করবার মত ক্ষমতা অর্জন করে, তখন তারা পেটের জ্বালায় ও অন্যান্য সমস্যার তাড়নায় অন্যের বাড়িতে দাসখত লেখায়। লেখাপড়া করার জন্যে সরকারী আয়োজন যতই থাকুক না কেন, যেখানে সমাজব্যবস্থার এহেন পরিণতিতে বেঁচে থাকাই বিরাট সমস্যা, সেখানে লেখাপড়া করা বিলাস বাসনা ছাড়া কিছুই নয়।

এই হল গ্রামের একটি বিরাট শ্রেণীর কথা। আর একটি শ্রেণী আছে—যারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে সমর্থ। এদের মধ্যেও বেশ কিছু অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে উৎসাহ বোধ করেন না। চোখের সামনে বেকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের করুণ পরিণতিই এর উৎস। এর জন্যেও দায়ী আমাদের দেশের বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং ঐ সম্পর্কীয় দূরদর্শিতার অভাব। অবশ্য সামাজিক কাঠামোও তার সঙ্গে জড়িত।

এবার গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার মানের কথায় আসা যাক। শিক্ষক শিক্ষিকাকে বাদ দিয়ে শিক্ষার কোন গুণগত পরিবর্তন করা যায় না। স্বাধীনতার পরে এক দশকের মধ্যে গ্রামে গ্রামে যে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে শিক্ষকশিক্ষিকা নিয়োগের সময় তাঁদের শিক্ষক-জনিত মনোভাবের দিকটা একেবারেই উপেক্ষা করা হয়। সেই নীতি আজও অব্যাহত। অন্য কোন কাজকর্ম না পেয়ে বা গ্রামের নিজস্ব-সম্পত্তির দেখাশুনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হবার জন্যে গ্রামের যুবক-যুবতীরা এই স্বল্প মাহিনার চাকুরী গ্রহণ করেন। শিক্ষকতাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ না করায় এ পেশা হয়েছে গৌণ, মুখ্য হল অনেক রকম কাজ কারবার (বিষয়সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণ, বাঁধ কারবার, চাষবাস প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনা, দোকানপাট চালানো, ফসলের সময় তার আমদানি-রপ্তানি, ব্যবহৃত সার, বীজ প্রভৃতির ব্যবসা, গ্রাম্য রাজনীতি, ছাত্র পড়ানো ইত্যাদি), যার মাধ্যমে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করা যায়। বিদ্যালয় চলাকালীন সময়েও শিক্ষকেরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অনেক গ্রামাঞ্চলে এ জাতীয় কাজ কারবারে তাঁরা সিদ্ধ। অধিকাংশ শিক্ষকশিক্ষিকা আজ তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। ছাত্র-ছাত্রীদের শুভাশুভ ও সেই সঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ যে তাঁদের উপর কতখানি নির্ভরশীল—তা এখন বাণী ছাড়া কিছুই নয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বহু অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের জন্যে ভাল পুস্তক পর্যন্ত চয়ন করা হয় না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় কোন পুস্তক-বিক্রেতার হাতে এই চয়নের ভার তুলে দেওয়া হয়। অধিক লাভের আশায় বহু নিচু মানের পুস্তকের সমারোহ অনেক বিদ্যালয়েই দেখা যায়।

জানি না আরও কতদিন পরে এই অশিক্ষা এবং প্রায় নেতিবাচক প্রচেষ্টার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে নব সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণশিক্ষার অভিযান শুরু করা সম্ভব হবে।

ভারতবর্ষের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখনই উচিত জনজীবনের প্রয়োজন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সম্যক প্রচেষ্টা। সেজন্যে শিক্ষার পাঠক্রম ও বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যার ন্যূনতম প্রয়োগ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমাজসচেতনতা উন্মোচিত করবে; শিক্ষার প্রতি বাড়বে তাদের আগ্রহ। এই গণ-শিক্ষামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হলে বর্তমান নেতিবাচক শিক্ষকদের যথোপযুক্ত-ভাবে শিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষাদান করতে হবে এবং সরকার ও সমাজকে সর্বতোভাবে সচেতন থাকতে হবে যাতে প্রাথমিক স্তরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের ঐ শিক্ষাই তাদের তরুণ বয়সে জীবনধারণের মান উন্নয়নে এবং দেশোন্নয়নের কাজে প্রধান সহায়ক হিসাবে প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষালাভই হবে—পরবর্তীকালের গণ-শিক্ষার প্রধান হাতিয়ার।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর মত প্রতিষ্ঠান দেশের এই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করবার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মানবদেহের চৌম্বক ক্ষেত্র

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

প্রায় 00 বছর আগে দেহে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগে রোগ নিরাময় হতে পারে বলে ফরাসীরা বিশ্বাস করত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানবদেহে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং তা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে—এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। বর্তমান প্রবন্ধে মানবদেহের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির কারণ, তা পরিমাপের সমস্যা এবং পরিমাপ সংক্রান্ত গবেষণা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা—আজ থেকে প্রায় 200 বছর আগেকার কথা। তখন ডঃ মেসমার প্রচার করতেন, দেহের চৌম্বক. ক্ষেত্র মানবদেহের অভ্যন্তরে একটি তরলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যখন কোনভাবে এই প্রবাহ বাধা-প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। দেহে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে এই বাধা অপসারিত করলে রোগমুক্তি ঘটে। তাই সে

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী

সময় রোগমুক্তির জন্যে ফরাসীরা একটি বড় পাত্রে সম্মোহিত জল ও লৌহচূর্ণ রেখে সেই পাত্রটিকে দলবদ্ধভাবে ঘিরে বসত। এই সম্মোহিত জল ও লৌহচূর্ণের চৌম্বক প্রভাব তাদের রোগমুক্তি ঘটাবে—এই ছিল তাদের আশা। আজকের দিনে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাদের বিশ্বাস অমূলক ছিল। কিন্তু এ কথা সত্য, দেহের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবদেহেই চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। অবশ্য প্রাচীনকালে ফরাসীরা যা বিশ্বাস করত এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রকৃতি তার থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। দেহের চৌম্বক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা কাজে লাগাতে পারবেন এমন সম্ভাবনা খুবই বেশি—কিন্তু তাতে জল ও লৌহচূর্ণের কোন ভূমিকা নেই। আজকের গবেষকেরা দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ এবং কিভাবে তার থেকে দেহের অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে তথ্যাদি নির্ণয় করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা করছেন।

দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির কারণ—দুটি কারণে দেহে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। প্রথম কারণটি হল—দেহাভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক বিদ্যুৎ প্রবাহ। কেননা বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে সবদাই চৌম্বক ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট থাকে। এই বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় মাংসপেশী ও স্নায়ুর [যা উত্তেজক কলা (excitable tissue) নামে অভিহিত] সঙ্কোচন প্রভৃতির ফলে সৃষ্ট সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্লোরিন আয়নের জন্যে। এই বিদ্যুৎ দেহাভ্যন্তরস্থ তরল ও কলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। সৃষ্ট বিদ্যুৎ পরিবর্তী (fluctuating) হতে পারে বা স্থির মানের কিংবা সমপ্রবাহের (d.c.) হতে পারে। স্বভাবতঃই চৌম্বক ক্ষেত্র প্রথম ক্ষেত্রে পরিবর্তী এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমপ্রবাহের হবে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, উত্তেজক কলা স্থির মানের আয়ন প্রবাহের (steady ion current) সৃষ্টি করে; ফলে স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এরূপ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহের অভাব।

হৃৎপিণ্ডে সৃষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহকে বিশেষ তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে পরিমাপ করলে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম (electrocardiogram) বা ECG পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের এই বিদ্যুৎ প্রবাহ ধরের (torso) চারদিকে যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তা পরিমাপ করলে ম্যাগনেটোকার্ডিওগ্রাম বা MCG, মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করলে ইলেকট্রোয়েনসেফ্যালোগ্রাম (electroencephalogram) বা EEG, এবং মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ প্রবাহ মাথার চারিদিকে যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তা পরিমাপ করলে ম্যাগনেটোয়েনসেফ্যালোগ্রাম (magnetoencephalogram) বা MEG পাওয়া যায়। রক্ত তড়িৎ-নিরপেক্ষ। তাই রক্ত প্রবাহের ফলে কোন বিদ্যুৎ প্রবাহের তথা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় না।

মানবদেহে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণটি হল—দেহাভ্যন্তরস্থ চৌম্বক পদার্থ। সাধারণভাবে কোন চৌম্বক পদার্থ তখনই চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যখন তাতে কোন চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়। এই চৌম্বক পদার্থগুলি তিরশ্চৌম্বক (diamagmetic), অয়শ্চৌম্বক (ferromagnetic) বা পরাচৌম্বক (paramagnetic) হতে পারে। যদিও দেহে তিরশ্চৌম্বক এবং অয়শ্চৌম্বক পদার্থও উপস্থিত থাকে, তবু স্বাভাবিক কারণেই এখানে কেবলমাত্র অয়শ্চৌম্বক পদার্থ নিয়ে এবং বিশেষ করে অয়শ্চৌম্বক পদার্থে প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের অপসারণের পর পদার্থের অবশিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র (remanant field) নিয়ে আলোচনা করা হবে; কারণ তিরশ্চৌম্বক ও পরাশ্চৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারণের পর তাদের মধ্যে কোন অবশিষ্ট চুম্বকত্ব (residual magnetism) থাকে না।

দেহের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ—যে পদ্ধতিতেই দেহে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হোক না কেন, তা খুবই দুর্বল। দেহের যে সব অঙ্গে মাংসপেশী এবং স্নায়ু রয়েছে, সেগুলি থেকেই

পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে হৃৎপিণ্ডেই সবচেয়ে জোরালো পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্নায়ু ও মাংসপেশী দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের তুলনায় যে কোন স্থানের পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের মান বেশ কয়েক গুণ বেশি। শহরাঞ্চলে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি, বিদ্যুদ্বাহী তার, গতিশীল যানবাহন প্রভৃতির জন্যে যে পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তার মান দেহের পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। গ্রামাঞ্চলে এই পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের মান শহরাঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের তুলনায় অনেক কম হলেও তবুও তা দেহের পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক হয়ে থাকে। সুতরাং দেহের পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করতে হবে তার তুলনায় উচ্চমানের পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বা পটভূমিতে (background)।

দেহের স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় ফুসফুসে চৌম্বক পদার্থের কণাসমূহের উপস্থিতি এবং কয়েকটি অঙ্গে স্থির বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে। কোন কোন পেশার মানুষের ক্ষেত্রে ফুসফুসে Fe_3O_4 এর পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের মানও বেড়ে যায়। কিন্তু দেহে স্থির চৌম্বক ক্ষেত্র যে ভাবেই সৃষ্ট হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই তা পৃথিবীর স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের (0·5 গাউস) তুলনায় প্রায় 10^4 ভাগ কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেহের পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রই হোক বা স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রই হোক, তা পরিমাপ করতে হবে তার তুলনায় অনেক বেশি মানের চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বা পটভূমিতে। এটাই দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের প্রধান সমস্যা।

প্রাণীদেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ শুরু হয় মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ দ্বারা। রিচার্ড ম্যাক ফি-এর নেতৃত্বে কয়েকজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম সফলভাবে হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করতে সক্ষম হন। এজন্যে তাঁরা নির্দেশক (detector) হিসাবে শ্রেণীসমবায়ে যুক্ত দুটি একই ধরণের বড় কুণ্ডলী ব্যবহার করেন। প্রত্যেকটি কুণ্ডলীতে একটি করে ভারি ফেরাইট কোরের (ferrite core) উপর লক্ষাধিক পাক ছিল। এই কুণ্ডলী দুটিকে বুকের উপর পরস্পরের সমান্তরালে এমন ভাবে রাখা হয় যাতে উপস্থিত চৌম্বক ক্ষেত্রের পটভূমিতে (magnetic background) (অর্থাৎ পরিমেয় চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া উপস্থিত অন্য পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র) কুণ্ডলীর মধ্যে আবিষ্ট বিভবের মান সমান ও বিপরীত হয়ে বিলুপ্ত হয় অর্থাৎ নির্দেশক চৌম্বক ক্ষেত্রের পটভূমির প্রভাব মুক্ত হয়। আবার হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্রের নতিমাত্রার (gradient) ফলে তা কুণ্ডলীতে পরিমাপযোগ্য বিভবের সৃষ্টি করে। তাই হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্রের নতিমাত্রার মান গণনা করা যায়। এই পদ্ধতির অসুবিধা হল: (i) কুণ্ডলীর নিজস্ব রব (noise) হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপে অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং (ii) কুণ্ডলী দুটিকে উপযুক্ত স্থানে বসানো (যাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের পটভূমির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়) যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

ডেভিড কোহেন (David Cohen) চৌম্বক ক্ষেত্রের পটভূমির সমস্যা সমাধানের জন্যে অন্য ধরণের পরিকল্পনা করেন। এজন্যে তিনি ও তার সহকর্মী লেস্‌টার উইংগস্‌বার্গ (Lester Wingsberg) এমন একটি ঘর তৈরি করেন যা চৌম্বকীয় ভাবে আবদ্ধ (magnetically shielded)। এই ঘরের মধ্যে বাইরের কোন চৌম্বক ক্ষেত্র প্রবেশ করতে পারে না। ঘরের চৌম্বক ক্ষেত্রের পটভূমি এতই কম, তা পরিমাপ সীমার নিচে থাকে। তিনি দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করার জন্যে যে নির্দেশক ব্যবহার করেন তা একটিমাত্র কুণ্ডলী। এটি চৌম্বক ক্ষেত্রের নতিমাত্রা পরিমাপের পরিবর্তে চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন একটি উপাংশ (component) পরিমাপ করে। এই পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের সংকেত (signal) সরাসরি পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্য অঙ্গ থেকে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রও পরিমাপ করা যায়

পরবর্তীকালে কোহেন ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ম্যাসাচুসেটস্ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে আরও উন্নত ধরণের চৌম্বকীয়ভাবে আবদ্ধ ঘর তৈরি করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘরে দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের উপযোগী একটি নির্দেশক আবিষ্কৃত হয়। এটি সংক্ষেপে SQID (Superconducting Quantum Interference Device) নামে পরিচিত। পূর্বে ব্যবহৃত কুণ্ডলী নির্দেশকের তুলনায় এটির সুবেদিত্ব (sensitivity) অনেক বেশি এবং এটি স্থির চৌম্বক থেকে শুরু করে 500 হার্জ কম্পাংক বিশিষ্ট পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করতে সক্ষম, যা কুণ্ডলী নির্দেশকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন একটি উপাংশ পরিমাপের কিংবা নতিমিটার (gradiometer) রূপে ব্যবহার করা যায়। এর আভ্যন্তরীণ রব এত কম যে, মস্তিষ্কের ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া দেহের সকল চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ এই নির্দেশক দ্বারা করা যায়।

যদিও SQID নির্দেশক দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশি সক্ষমভাবে দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করা যায়, তবুও বর্তমানে নতিমিটারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ চৌম্বকীয়ভাবে আবদ্ধ ঘর ছাড়াই কিংবা স্বল্প আবদ্ধকরণ হলেই নতিমিটারের সাহায্যে দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করা যায়। এগুলি দুই বা ততোধিক ম্যাগনেটোমিটারের সমবায়ে গঠিত; যাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের পটভূমির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লোপ পায়।

দু'ধরণের নতিমিটার ব্যবহৃত হয়—ফ্লাক্স-গেট (flux-gate) এবং SQID. এদুটির মধ্যে প্রথমটি ঘরের তাপমাত্রাতেই ব্যবহার করা যায় এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য। কোহেনের মতে ফুসফুসে Fe_3O_4-এর উপস্থিতির জন্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 5×10^{-7} গাউসের চেয়ে বড় হলে ফ্লাক্স-গেট নতিমিটার ব্যবহার করা ভাল। SQID ম্যাগনেটোমিটারের তুলনায় কম সুবেদী।

হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্র—দেহের যে কোন অঙ্গের তুলনায় হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ ব্যাপকভাবে হয়েছে। এর কারণ প্রধানত তিনটি: (i) হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্রের মান অন্য অঙ্গের চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের তুলনায় বেশি, ফলে অপেক্ষাকৃত সহজে তা পরিমাপ করা যায়; (ii) হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, ফলে MCG-এর প্রাথমিক বিশ্লেষণে সুবিধা হয়; (iii) হৃৎপিণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করে হৃৎপিণ্ডের রোগ নির্ণয়ের কোন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে পারলে অনেক অমূল্য জীবন রক্ষা পেতে পারে।

ECG থেকে পাওয়া যায় না এমন তথ্য সংগ্রহের জন্যে অনেক স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে পরিবর্তী MCG গ্রহণ করা হয়েছে। এই MCG-গুলি বিশ্লেষণের জন্যে কোহেন ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। একটি পদ্ধতিতে তাঁরা অস্বাভাবিক MCG-এর সঙ্গে স্বাভাবিক MCG এবং ECG-এর তুলনা করেন। ECG-তে ধরা পড়ে না এমন কয়েকটি অস্বাভাবিকতা MCG-তে ধরা পড়ে—এও দেখা গেছে। অন্য পদ্ধতিগুলি এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। তাই এ নিয়ে বর্তমানে কোন আলোচনা করা হল না।

ঠিক মত রক্ত সরবরাহ না হলে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তখন MCG ব্যবহার করা হয়। এই স্থির ক্ষেত্র নিরবচ্ছিন্ন নয়; প্রতিটি হৃৎপিণ্ড চক্রে (heart cycle) স্বল্পক্ষণের জন্যে এই ক্ষেত্র অনুপস্থিত থাকে। ফলে এর একটি পরিবর্তী উপাংশ থাকে, যা ECG-তে ধরা পড়বে। এই উপাংশ এঞ্জিনা (angina) ও ইনফারকৃসান (infarction) সংক্রান্ত রোগ নির্ণয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

মস্তিষ্কের চৌম্বক ক্ষেত্র—ECG যেমন হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারে, তেমনি নানা কারণে EEG মস্তিষ্কের তত বেশি তথ্য সরবরাহ করতে পারে না। ফলে MEG-এর ভূমিকা হৃৎপিণ্ডের

MCG-এর ভূমিকার চেয়ে ব্যাপক। কোহেন ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ স্বাভাবিক মস্তিষ্ক এবং মৃগীরোগী, উন্মাদগ্রস্ত প্রভৃতি বিভিন্ন অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে MEG নির্ণয় করেন। তাঁরা দেখেন, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের MEG ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের EEG থেকে ভিন্ন প্রকারের তথ্য নির্দেশ করে। EEG এবং MEG একত্রে বিশ্লেষণ করলে এমন তথ্য পাওয়া যায় যা শুধুমাত্র EEG বিশ্লেষণের দ্বারা পাওয়া যায় না।

ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গের চৌম্বক ক্ষেত্র—কোহেন দেখেন, অনেক সময় ধরের (torso) চারদিকে একটি স্থির মানের চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে যা সৃষ্টি হয় ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতি অঙ্গে অয়শ্চৌম্বক পদার্থের কণাসমূহের উপস্থিতির জন্যে। দেহে এদের অনুপ্রবেশ ঘটে খাদ্য ও বায়ুর মাধ্যমে। এই কণাগুলি খুব সহজেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বা অন্য কোন বহিঃস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। আবার ম্যাগ্‌নেটিক টেপ ইরেজার (magnetic tape eraser)-এর সাহায্যে তাদের বিচুম্বিত (demagnetise) করা যায়। সুতরাং ধরের চারিদিকে আভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া অন্য যে স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা হল দেহে উপস্থিত অয়শ্চৌম্বক পদার্থের অবশিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র। এই সব কণা যেহেতু দেহের স্বাভাবিক উপাদান নয়, এবং বাইরে থেকে দেহে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটে, তাই এদের বলা হয় অয়শ্চৌম্বক কলুষ (ferromagnetic contaminant)। দেহে অয়শ্চৌম্বক কলুষের পরিমাণ খুব বেশি হলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই দেহে এই কলুষের পরিমাণ নির্ণয় চিকিৎসকদের কাছে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে।

কোহেন প্রায় 30 জন ব্যক্তির ধরের চারদিকে স্থির চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করেন। তিনি সাধারণত তিনটি ক্রমিক পর্যায়ে প্রতিটি ব্যক্তির ধরের সম্মুখভাগের চৌম্বক মানচিত্র (magnetic map) নির্ণয় করেন। এজন্যে তিনি ত্বক থেকে প্রায় 3 সেন্টিমিটার দূরে ত্বকের উপর উল্লম্ব-অভিমুখে স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের উপাংশ B_n পরিমাপ করেন। প্রথমে একটি 60 হার্জের ম্যাগ্‌নেটিক টেপ ইরেজার ধীরে ধীরে ধরের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ধরের বিভিন্ন বিন্দুতে B_n পরিমাপ করা হয়। B_n-এর এই মান স্থির বিদ্যুতের ফলে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র এবং যে কণাগুলির সম্পূর্ণ বিচুম্বকন হয় নি তাদের চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের সমষ্টি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্বকের উপর প্রায় উল্লম্ব-অভিমুখে একটি 300 থেকে 1,000 গাউসের স্থির চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে তারপর তা অপসারিত করা হয়। এর পর ধরের বিভিন্ন বিন্দুতে B_n পরিমাপ করা হয়। এ অবস্থায় যে মানচিত্র পাওয়া যায়, তা স্থির বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র এবং অয়শ্চৌম্বক কলুষের কণাগুলির অবশিষ্ট চুম্বকত্বের ফলে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের সমষ্টি। তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় মানচিত্র থেকে প্রথম মানচিত্র বিয়োগ করে তৃতীয় মানচিত্র তৈরি করা হয়। স্পষ্টতঃই এই মানচিত্র কেবলমাত্র অয়শ্চৌম্বক কলুষের চৌম্বক ক্ষেত্রের ফল। B_n ধনাত্মক হলে মানচিত্রের কোন বিন্দুতে B_n-এর মান ঐ বিন্দু অয়শ্চৌম্বক কলুষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেহের স্বাভাবিক লোহার কোন ভূমিকা এই পরিমাপের ক্ষেত্রে নেই। কারণ দেহের স্বাভাবিক লোহা অয়শ্চৌম্বক নয়।

দেহের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপের সার্থকতা—দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করা বেশ কষ্টসাধ্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের কোন সার্থকতা আছে কিনা? এক কথায় উত্তর হল—আছে। কারণ এর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা অন্যভাবে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ফুসফুস ও মস্তিষ্কের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ

বলে বিবেচিত। রোগ নির্ণয়, দেহে কোন ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি (যেমন অয়শ্চৌম্বক কলুষ) সম্পর্কে সতর্কীকরণ, শারীরবৃত্তীয় গবেষণা প্রভৃতির জন্যে দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করা হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সফলভাবে প্রয়োগের জন্যে দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ পদ্ধতি সহজসাধ্য হওয়া প্রয়োজন। এদিক থেকে ফুস্‌ফুসে ম্যাগ্‌নেটাইটের উপস্থিতি নির্ণয় যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সম্ভাবনার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল MCG.

ফুস্‌ফুসের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করে দেহে ম্যাগ্‌নেটাইটের (Fe_3O_4) পরিমাণ নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ফুস্‌ফুসে অ্যাস্‌বেসটস কণার উপস্থিতি, বিশেষ করে বেশি পরিমাণে, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলে জানা গেছে। প্রায় সব অ্যাস্‌বেসটসই যথেষ্ট পরিমাণে অয়শ্চৌম্বক; ফলে ফুস্‌ফুসের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের উপরিউক্ত পদ্ধতি দ্বারা ফুস্‌ফুসে এদের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। উল্লেখযোগ্য, অ্যাস্‌বেসটসের অয়শ্চৌম্বকত্ব তার নিজস্ব (intrinsic) ধর্ম নয়; অ্যাস্‌বেসটস তন্তুর সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে Fe_3O_4 কণা লেগে থাকে। অ্যাস্‌বেসটসের অয়শ্চৌম্বকত্ব এই Fe_3O_4 কণাগুলির জন্যে। যখন অ্যাস্‌বেসটস কর্মীর ফুস্‌ফুসে ক্রিসোটাইল (chrysotile) অ্যাস্‌বেসটসের পরিমাণ খুব বেশি হয়ে যায় কিন্তু ফুস্‌ফুসে ঐ উপস্থিতি রঞ্জন-রশ্মির মাধ্যমে ধরা পড়ে না, তখন ফ্লাক্স-গেট নতিমিটারের সাহায্যে ফুস্‌ফুসে অ্যাস্‌বেসটসের উপস্থিতি জানা সম্ভব। যদি ফুস্‌ফুসে উপস্থিত অ্যাস্‌বেসটস কণার মধ্যে ম্যাগ্‌নেটাইট ও অ্যাস্‌বেসটসের অনুপাত জানা থাকে, তবে ফ্লাক্স-গেট নতিমিটারের সাহায্যে ফুস্‌ফুসের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করলে অ্যাস্‌বেসটস কর্মীর ফুস্‌ফুসে অ্যাস্‌বেসটসের পরিমাণ মোটামুটিভাবে জানা যায়। অ্যাস্‌বেসটস শিল্পাঞ্চলে যেখানে অ্যাস্‌বেসটসের মধ্যে ম্যাগনেটাইটের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেখানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুবিধাজনক হবে বলে আশা করা যায়।

ফুস্‌ফুসের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ফুস্‌ফুসের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে ফুস্‌ফুসের রোগ নির্ণয়ের যে সব পদ্ধতি রয়েছে তাতে সাধারণত রোগের যথেষ্ট অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত রোগ ধরা পড়ে না। তাই ফুস্‌ফুসের রোগ নির্ণয়ের জন্যে কোন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক ভাবেই অনুভূত হয়। এজন্যে ম্যাগ্‌নেটাইটকে ফুস্‌ফুসে ট্রেসার (tracer) রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফুস্‌ফুসে ট্রেসাররূপে ব্যবহৃত ম্যাগনেটাইটের বণ্টন (distribution), ঘূর্ণীয়মান অবস্থা (rotating state) প্রভৃতি ফ্লাক্স-গেটের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় এবং তা ফুস্‌ফুসের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে।

উপসংহার—দেহের চৌম্বক ক্ষেত্র সংক্রান্ত গবেষণা মাত্র কয়েক বছর শুরু হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই তা যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে দেহের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ চিকিৎসকদের কাছে এক মূল্যবান হাতিয়াররূপে পরিগণিত হবে।

তথ্যপঞ্জী

1. ডি. কোহেন, IEEE Trans. Magnetism, II (1975) পৃ. 694
2. ডি. কোহেন, ঐ, 6 (1970) পৃ. 346
3. ডি. কোহেন, ফিজিক্স টু-ডে, জুন, (1970) পৃ. 56
4. ডি. কোহেন, ঐ, আগষ্ট, (1975) পৃ. 35
5. ডি. কোহেন, ঐ সেপ্টেম্বর, (1973) পৃ. 20
6. ডি. কোহেন, সায়েন্স, 175 (1972) পৃ. 664
7. ডি. কোহেন, ঐ, 180 (1973) পৃ. 745

রামন-ক্রিয়া

রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়*

1923 সালে বিজ্ঞানী স্মেকাল (Smekal) ফোটন-কণা এবং পদার্থের অণুর মধ্যে সংঘাত-সমন্বিত একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। স্মেকাল প্রদত্ত তত্ত্ব স্যার রামনকে ঐ তত্ত্বের পরীক্ষাগত প্রমাণ করবার কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এ ছাড়াও আকাশ এবং সমুদ্রের জলের মত প্রাকৃতিক উপাদানের নীল-রংয়ের ব্যাখ্যাকার্যে আলোকের সাধারণ বিক্ষেপ (ordinary scattering) প্রক্রিয়ার প্রয়োগ স্যার রামনকে তাঁর পরীক্ষাকার্যে আরও অনুপ্রাণিত করে। এভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে স্যার রামন 1928 সালে এক পরীক্ষাকার্য চালান। তিনি লক্ষ্য করেন, বেন্‌জিন (benzene), টলুইন (toluene) প্রভৃতি বিভিন্ন তরলের মধ্য দিয়ে একবর্ণী দৃশ্যমান আলোকরশ্মি পাঠালে, আপতিত রশ্মির অভিলম্বে বিক্ষিপ্ত বিকিরণের মধ্যে আদি তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন বিকিরণ ছাড়াও ক্ষুদ্রতর এবং দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন বিক্ষিপ্ত বিকিরণ পাওয়া যায়। স্যার রামনের নাম অনুসারে এই সংঘটনের নাম হয় 'রামন-ক্রিয়া' (Raman Effect)। এই বিখ্যাত পরীক্ষাটি স্যার রামন মাত্র কয়েক-শ' টাকা ব্যয়ে 210, বৌবাজার ষ্ট্রীটের 'The Indian Association for the Cultivation of Science' এর পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করেন। পরীক্ষাটির সাফল্য ও মৌলিকত্বের জন্যে স্যার রামন 1930 সালে নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন।

স্যার রামনের প্রাথমিক পরীক্ষাটি ছিল অতি সাধারণ। পরীক্ষার যান্ত্রিক বিন্যাস চিত্র 1-এ দেখান হয়েছে। এখানে পারদের আর্ক-বাতি (arc-lamp) আলোকের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই উৎসের 3650Å, 4046Å, 4358Å ($1Å = 10^{-8}$ সে. মি.) প্রভৃতি তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন রেখাগুলিকে কাচপাত্রে রক্ষিত পরিস্রাবক (filter), আম্লিক কুইনিন সালফেট দ্রবণ (acidulated quinine sulphate solution)-এর মধ্য দিয়ে পাঠালে 4358Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একবর্ণী রশ্মি নিঃসৃত হয়। (অপর পক্ষে কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে দ্রবীভূত আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করলে 4046Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একবর্ণী আলোক পাওয়া যায়)। এই রশ্মিকে একটি গোলতল ফ্লাস্কে রক্ষিত তরল বেন্‌জিনের (liquid benzene) মধ্যে আপতিত করা হয় এবং আপতন দিকের অভিলম্বে একটি বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালা চিত্র নেওয়া হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় একটি সম্পূর্ণ বর্ণালী পেতে স্যার রামনকে প্রায় এক-শ' ঘণ্টা ধরে বর্ণালী গ্রহণ করতে হয়েছিল।
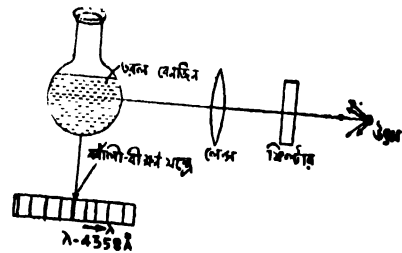
চিত্র 1

স্যার রামনের প্রাথমিক পরীক্ষার পর এই ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্যে অনেক উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এ সম্পর্কীয় (প্রধানত) রবার্ট উড (R. W.

*484/1, জপুর রোড, কলিকাতা-700 074

Wood) কর্তৃক উদ্ভাবিত পরীক্ষা পদ্ধতিটি নিম্নরূপ (চিত্র 2):

এখানে গোলতল ফ্লাস্কের পরিবর্তে (প্রায় ½ সে. মি ব্যাস এবং 10 সে. মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট) দীর্ঘ নলাকৃতি কাচের পাত্র নেওয়া হয়। কাচপাত্রের একদিকে লম্বা শিংয়ের মত কৃষ্ণবর্ণের পশ্চাদ্পট এবং অন্যদিকে আলোকের প্রবেশ পথ থাকে। রামনের প্রাথমিক পরীক্ষার মত একইভাবে এক-বর্ণী আলোক কাচনলে রক্ষিত তরলের মধ্যে আপতিত হয় এবং একইভাবে লম্বদিকে অবস্থিত বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে বর্ণালী চিত্র গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষাধীন তরলটি আপতিত রশ্মির প্রভাবে যাতে উত্তপ্ত না হতে পারে সেজন্যে নলটি জলপ্রবাহ দ্বারা ঠাণ্ডা রাখা হয়।
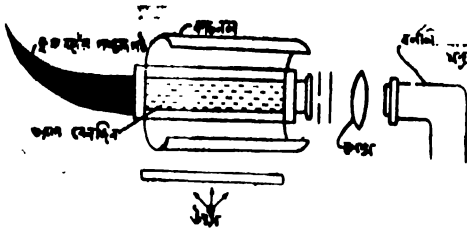
চিত্র 2

রামন-ক্রিয়ার ভৌত কারণ—সনাতন তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব (classical electromagnetic theory)-এর সাহায্যে রামন-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য-গুলির শুধুমাত্র আংশিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। (বস্তুতপক্ষে এই তত্ত্বের সাহায্যে বিপরীত স্টোক্স্ রেখার উৎপত্তির কোন কারণ দেখান যায় না)। এই ক্রিয়ার কোয়াণ্টাম তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানী স্মেকাল 1923 সালে। এই তত্ত্ব অনুসারে $h\nu$ (প্লাঙ্কের ধ্রুবক, $h=6{\cdot}62\times10^{-27}$ আর্গ-সেকেণ্ড) শক্তি- সম্পন্ন ফোটনকণা কোন অণুর উপর আপতিত হলে নিম্নবর্ণিত তিন প্রকার বিক্রিয়া ঘটতে পারে: (ক) ফোটনটি অপরিবর্তিত শক্তি এবং কম্পাংক নিয়ে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। অর্থাৎ তা অণুর কোয়াণ্টাম অবস্থায় (quantum state) কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করে না, (খ) ফোটনটি অণু দ্বারা এমনভাবে শোষিত হয় যাতে অণুটি বিভিন্ন অলীক (virtual) শক্তি স্তরে উঠে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অলীক স্তর থেকে ভৌম-স্তরের (ground state) একটু উপরে কোন বাস্তব স্তরে নেমে আসে। এই ভাবে নেমে আসার সময় কমশক্তির বা কম কম্পাংকে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফোটন নির্গত হয়। (গ) অণুটি যদি উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে ভৌম-স্তরের একটু নিচে অন্য বাস্তব স্তরে নেমে আসে তবে বেশি শক্তি বা বেশি কম্পাংকের, অর্থাৎ কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফোটন নির্গত হয়।

এইরূপে উপরে বর্ণিত ভৌত কারণ অনুসারে প্রথম ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রেখা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্টোকস্ রেখা এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে বিপরীত স্টোকস্ রেখার উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ পরিবর্তিত কম্পাংক ν হলে এই রেখাসমূহকে $\nu=\nu\pm\Delta\nu$ এই সম্বন্ধ দ্বারা সূচিত করা যায়। এখানে $\Delta\nu=$ মূলরেখা থেকে পরিবর্তিত রেখার কম্পাংক ব্যবধান, $\nu=$ আপাতন কম্পাঙ্ক এবং $\nu'=$ নির্গমন কম্পাংক।

রামন-বর্ণালীর বিশেষত্ব—(i) রামন ক্রিয়ার ফলে, আপতিত বর্ণালী রেখা ছাড়া দীর্ঘতর এবং ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন কয়েকটি ক্ষীণ বর্ণালী রেখা রামন-বর্ণালীতে দেখা যায়; (ii) দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন রেখাগুলি (Stokes lines) এবং ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘসম্পন্ন রেখাগুলি (Anti-Stokes lines) উৎপাদক রেখার দু'পাশে সমান কম্পাংক ব্যবধানে অবস্থিত থাকে। এই কম্পাংক ব্যবধান পরীক্ষাধীন পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, আপতন কম্পাংকের উপর নির্ভর করে না।

বিশদ বিশ্লেষণের পর দেখা যায়, রামন-ক্রিয়া আলোকের সাধারণ বিক্ষেপ (ordinary scattering), অনুপ্রভা (phosphorescence) বা প্রতিপ্রভা (fluorescence) অপেক্ষা স্বতন্ত্র।

এই ক্রিয়া কম্পটন-ক্রিয়া অপেক্ষাও স্বতন্ত্র। কারণ: (i) রামন-ক্রিয়া বিক্ষেপকের (scatterer) অণুর সঙ্গে ফোটন-কণার সংঘাতজনিত ক্রিয়া কিন্তু কম্পটন-ক্রিয়া ইলেকট্রনের সঙ্গে ফোটন-কণার সংঘাতের ফলে উৎপন্ন হয়; (ii) এই ক্রিয়ায় বর্ণালীরেখার সরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষণের দিক সম্পর্কহীন কিন্তু কম্পটন-ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ দুটি সম্পর্কযুক্ত; (iii) কম্পটন-ক্রিয়া বিক্ষেপকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু রামন-ক্রিয়া নির্ভর করে; (iv) কম্পটন বর্ণালীতে আপতন রেখার সঙ্গে শুধুমাত্র স্টোকস্ রেখাগুলি দেখা যায় কিন্তু রামন-বর্ণালীতে মূল রেখার সঙ্গে স্টোকস্ এবং বিপরীত স্টোকস্ উভয়ই দেখা যায়।

রামন-ক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ—তত্ত্বগতভাবে, রামন-ক্রিয়া আলোর বিকিরণের এবং আণবিক গঠনের কোয়াণ্টাম তত্ত্বকে প্রমাণ করেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে নানা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আছে। আণবিক গঠন নির্ণয়ে রামন-ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন—কোন অণুর ঘূর্ণন গতি (rotational motion) এবং কম্পন গতি (vibrational motion) রামন তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

সম্প্রতি 'লেসার রামন-ক্রিয়া' এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। লেসার রশ্মির উপর গবেষণায় দেখা গেছে, রুবি লেসার (ruby laser) থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেসার রশ্মিকে নাইট্রোবেন্‌জিনের মধ্যে পাঠালে মূল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে তা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন বিভিন্ন রেখা পাওয়া যায়। পরিবর্তিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান নাইট্রোবেন্‌জিন অণুগুলির স্পন্দন কম্পাংকের উপর নির্ভর করে। রুবি লেসার রশ্মিকে নাইট্রোবেন্‌জিনের মধ্যে পাঠালে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল যে রেখাগুলি দেখা যায়, সেগুলিকে রামন লেসার রেখা (Raman laser lines) বলে। এক্ষেত্রে যে রেখাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি সংহত (coherent) কিন্তু সাধারণ রামন-ক্রিয়ায় প্রাপ্ত রেখাগুলি অসংহত (incoherent)।

রামন-ক্রিয়া আণবিক বিদ্যা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে এবং বিজ্ঞানের নানান প্রয়োগের ক্ষেত্রে নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের পক্ষ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিকে জনসাধারণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আরও বেশি নিয়োজিত করার চেষ্টা চলছে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর উপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এবং ফিচার (মডেল তৈরি, বিজ্ঞানীদের জীবনী, প্রয়োজন-ভিত্তিক বিজ্ঞান, জেনে রাখ, ভেবে কর, শব্দকূট ইত্যাদি) লিখে সহযোগিতা করার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদকের নামে পরিষদ কার্যালয়ে হাতে বা ডাকযোগে লেখা পাঠাতে হবে। পরিষদের প্রকাশনা উপসমিতি কর্তৃক লেখা মনোনীত হলে তা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ সময়মত প্রকাশ করা হবে।

সমুদ্র সুলতান

হরিমোহন কুণ্ডু

'লোমশ শীল'কে (fur-seal) সাধারণত সমুদ্র-সুলতান বলা হয়। শীল হল এক ধরণের সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিজ্ঞানীরা এদের দেহের অঙ্গসমূহ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, এরা এককালে স্থলচর প্রাণী ছিল। এদের স্বভাব ছিল হিংস্র এবং এরা ছিল মাংসাশী প্রাণী।

জীববিদ্যায় শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এদের কারনিভোরা বর্গের (order-carnivora) এবং পিনিপিডিরা উপবর্গের (S. O.—pinnepedia) মধ্যে গণ্য করা হয়। এরা ওটার পরিবারের (Fam.—Otaridae) অন্তর্ভূক্ত। এই পরিবারের মধ্যেই হল এবং তা লেজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পিছন দিকে বাঁকানো। তাই তারা ডাঙ্গায় হাঁটতে পারে না।

বর্তমানে যদিও শীল গোষ্ঠীর প্রাণীরা জীবনের অধিকাংশ সময় সমুদ্রে বাস করে, তথাপি তিমির মত এরা পুরোপুরি সামুদ্রিক প্রাণী নয়। বছরের কোন এক সময় বংশ-রক্ষার জন্যে ডাঙ্গায় আসে। দীর্ঘদিন ধরে বংশ-পরম্পরায় জলে বাস করার ফলে, জলজ অভিযোজনের মাধ্যমে, খানিকটা মাছের মত অঙ্গসমূহের রূপান্তর হয়েছে বটে, তবে পুরোপুরি নয়। কারণ এরা বছরের কিছু সময় ডাঙ্গাতেও বিচরণ করে।
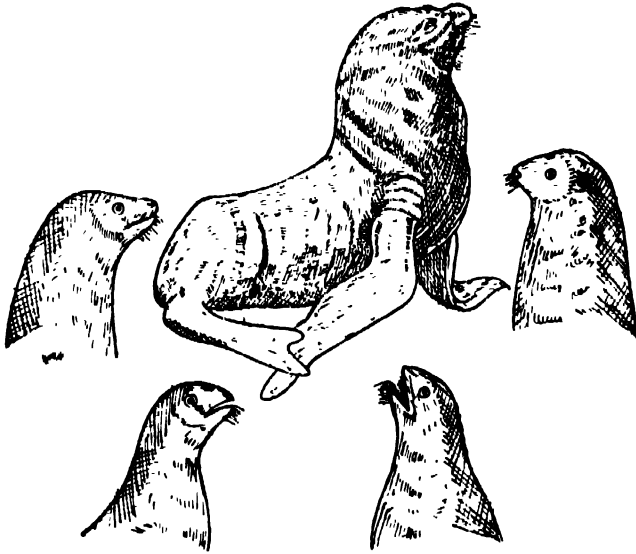
স্ত্রীপরিবৃত পুরুষ লোমশ শীল

সমুদ্র-সিংহ (sea-lions) এবং লোমশ-শীল। প্রকৃত শীল ফোসিডি পরিবারের (Fam.—Phocidae) অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃত শীলদের পশ্চাদ্‌পদ লুপ্তপ্রায়, জলে সাঁতার কাটার জন্যে দেহের আকৃতি ক্রমবিবর্তনে অগ্র ও পশ্চাদভাগ সরু হয়ে গেছে। সামনের ও পিছনের পদযুগলের অধিকাংশটাই

* প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

চামড়ার মধ্যে আবৃত। যেটুকু বেরিয়ে থাকে, তা সাঁতার কাটার জন্যে প্যাডেল (paddle)-এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং হাঁসের মত আঙ্গুলের ফাঁকে পাতলা চামড়া থাকে। নখ অবলুপ্তির পথে। হাতের তলে এবং পায়ের পাতায় অনেক সময় লোম থাকে। অনেকের দেহের উপরেও লোম আছে। লেজ ছোট। চোখ দুটি মাথার উপরের দিকে অবস্থিত। নাসারন্ধ্রের সামনে ভাল্‌ভ্‌ থাকে যাতে জল ঢুকে না যায়। বহিঃকর্ণ খুবই ছোট এবং অবলুপ্তির পথে। পুরুষ জনন অঙ্গে এক খণ্ড হাড় থাকে। স্ত্রী জনন অঙ্গ ও স্তন একখণ্ড চামড়া দিয়ে ঢাকা। দুধে-দাঁত দুর্বল ও তাড়াতাড়ি খসে গিয়ে যে স্থায়ী দাঁত বের হয় তাও মোটামুটি একই রকমের (homodont)। সুতরাং দেহের গঠন দেখলে বোঝা যায় এরা তিমির মত এখনও পুরোপুরি সামুদ্রিক প্রাণী হয়ে উঠতে পারে নি।

শীল গোষ্ঠীর অনেক প্রজাতি (species) আছে। অধিকাংশই কুমেরু অঞ্চলের বাসিন্দা। উত্তর মেরুতে যে অল্প কিছু প্রজাতির শীল আছে, এদের মধ্যে লোমশ শীলকে বলা হয় সমুদ্র সুলতান। এদের বৈশিষ্ট্য হল—পেটের তলে ঘন নরম লোম আছে। এই লোমের জন্যে এদের চামড়ার বাণিজ্যিক চাহিদা অত্যন্ত বেশি। লোমশ শীল উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং আলাস্কা অঞ্চলের বাসিন্দা। পুরুষেরা 6 ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং 500 পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন হয়। এদের মাথায় ও ঘাড়ে প্রচুর লম্বা চুল থাকে। স্ত্রীরা 3 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং মাথায় ও ঘাড়ে চুল থাকে না। ওজন 300 পাউণ্ড পর্যন্ত।

এদের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা (migration) এবং সাংসারিক জীবনযাত্রা বড় বৈচিত্র্যময়। শীতকালে উত্তর মেরু অঞ্চলে দ্বীপসমূহে এদিকে খুব কমই দেখা যায়। তখন এরা হাজার হাজার মাইল দক্ষিণে নীল সমুদ্রে মৎস্য শিকারে ব্যস্ত। কিন্তু মে মাসের গোড়ার দিকে এরা আবার উত্তর দ্বীপগুলিতে সাঁতরে ফিরে আসে এবং নিজ নিজ পুরানো আবাস স্থানগুলি খুঁজে নেয়।

প্রথমে বয়স্ক পুরুষেরা এসে উপস্থিত হয়। দু'তিন দিন ধরে তারা উপকূলে সাঁতার কাটে। চারদিক বেশ ভাল করে দেখে নেয় স্থানটা তাদের পক্ষে নিরাপদ কিনা। নিশ্চিন্ত হলে পর তারা খুব সাবধানে ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং যেখানে সমুদ্রের ঢেউ উপকূল ভাগের খাড়া পর্বত গাত্রে আছড়ে পড়ে সেখানকার পাথরের গা বেয়ে উঠতে থাকে।

পাহাড়ে উঠে এলে তাদের দৃষ্টি থাকে চতুর্দিকে। বাতাসের গন্ধ শোঁকে। নিথর করে দেয় দেহকে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে কান পেতে শুনতে থাকে বিপদ সঙ্কেত। ঠিক যেন গুপ্তচর! তারা দেখতে আসে স্থানটিতে তাদের বসবাস, সন্তান পালনের অনুকূল পরিবেশ আছে কিনা।

সব কিছু বেশ ভাল করে বুঝে নিয়ে তারা আবার সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দেয়। পর্বতসঙ্কুল নির্জন উপত্যকা তখন পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে লোমশ শীলের এক বিরাট দল সমুদ্র থেকে হাজির হয় সেখানে। এরাও কিন্তু সবাই পুরুষ। তবে এদের মধ্যে থাকে কিছু প্রবীণ ও কিছু তরুণ। প্রবীণেরা তরুণদের পথ নির্দেশ দিয়ে সঙ্গে আনে বটে, তবে তটে উঠতে দেয় না। প্রবীণেরা কালো শিলার গা বেয়ে চুপিসারে পাহাড়ে উঠতে থাকে; আর তরুণেরা কাছাকাছি কোথাও একটু স্থান করে নিতে পারলে ডাঙ্গায় রাত্রিবাস করে একটু ঘুমিয়ে নেয়। উষার আবছা আলো ফুটে উঠার আগেই সাবধানী প্রবীণের দল আবার তাদের ঠেলে সমুদ্রে নামিয়ে দেয়। কি জানি কি হয় এই আশঙ্কায়। কারণ ছ'বছর বয়স না হলে কোন তরুণ শীলের ঘাড়ে উপর প্রবীণেরা বিয়ের বোঝা চাপাতে চায় না। কিন্তু পরিণত বয়সে সংসারের খুঁটিনাটি সব যাতে

শিখে নিতে পারে—তাই প্রবীণেরা তাদের সঙ্গে আনে।

অভিজ্ঞ সুলতানের 'হারেম'টি খুব ছোট হলে চলবে না। প্রতি পুরুষের জন্যে প্রায় 25 বর্গ মিটার স্থান চাই—যেখানে সে পাহাড়ের গায়ে সংসার পাতবে। সংসারটি তো খুব ছোট নয়। এক একটি প্রবীণ শীলের 10 থেকে 15টি স্ত্রী থাকে। কখন কখন 50 থেকে 6 টি। আর প্রত্যেক স্ত্রী এসময়ে একটি করে সন্তান প্রসব করে।

স্বামীদের তখন অনেক কাজ। তবে তাদের প্রথম কাজ এটা দেখা যে, তার স্ত্রীদের কেউ যেন ছিনিয়ে না নেয়। দেখা গেছে যদি কোন পুরুষ অপরের একটি স্ত্রীকে দাঁত দিয়ে ধরে সকলের চোখের সামনে টানতে টানতে নিয়ে যায়, তাহলেও স্বামী বেচারা এই অপহরণের প্রতিবাদ করে না। কারণ, একটির জন্যে ঝগড়াঝাটি মারামারি করতে গিয়ে সেই ফাঁকে যদি সবগুলোই বেহাত হয়ে যায়। তাই একটির আশা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু এসব তো পরের কথা। এখন পর্যন্ত ডাঙ্গায় তো কোন স্ত্রী উঠে আসে নি। পুরুষেরা কেবল তাদের ভবিষ্যৎ 'হারেম' রচনা করার স্থান নিয়ে মারামারি করতেই ব্যস্ত! প্রতিটি প্রবীণ পুরুষ সাধারণত আগেকার বছরের স্মৃতিঘেরা স্থানটি পেতেই ব্যস্ত থাকে। এমনও শোনা যায়, একটি লোমশ শীল তার পুরনো স্মৃতি দিয়ে ঘেরা খাড়া পর্বতগাত্রের হারেমটুকু পাবার জন্যে একটানা দীর্ঘ 17 বছর সাঁতার কেটে আসতো। এটা চেনা গিয়েছিল এক দাগী প্রবীণকে দেখে—যে হাঙ্গরের আক্রমণে একটি কান হারিয়েছিল।

স্থান খোঁজার কলকোলাহল এক সময় থিতিয়ে পড়ে। এবার নিজের নিজের হারেমে চুপচাপ শুয়ে থেকে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের আগমন আশায় অপেক্ষা করে। কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীদের গতি একটু ধীর। আসতে কয়েক দিন সময় লাগে। তবে স্বামীদেরও ধৈর্যের সীমা নেই।

জুনের মাঝামাঝি সময় স্ত্রীদল এসে পৌঁছয়। দলে দলে তারা পুরুষের মতই সাঁতার কাটে। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের পুরনো দিনের স্বামী-দের খোঁজে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে। অনুরাগী দৃষ্টি মেলে খুঁজে ফেরে চারদিকে। ডাক দেয় তীক্ষ্ণ স্বরে। কান পেতে শোনে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—স্বামীরা প্রত্যুত্তরে এগিয়ে আসে কিনা! প্রায়ই সাড়া মেলে। আবার মাঝেমধ্যে পায়ও না। হয়তো তাদের স্বামী সমুদ্রঝঞ্ঝায় কোথাও ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন নিরুপায় বেচারী স্ত্রীরা অন্য স্বামীর সন্ধানে ফেরে এবং ডাক দেয় সেই সমস্ত তরুণদের যারা তটভূমে অপেক্ষা করে আছে। দ্বীপে ওঠার কয়েক দিনের মধ্যেই গর্ভবর্তী স্ত্রীরা সন্তানের জন্ম দেয়। সদ্যজাত সব সন্তানই নিশ্চয় এই নতুন সুলতানদের ঔরসজাত নয়। হতভাগ্য সুলতান তখন অপরের সন্তান বহনকারী স্ত্রীদের কটিদেশ বেষ্টন করে রাগে গরগর করতে থাকে। তার নিজের ঔরসজাত কিছু সন্তানও পরের বছর ঠিক সেই সময় খুব সম্ভবত অন্যের হারেমে জন্মগ্রহণ করে।

আগষ্ট মাসে প্রবীণ জনকের দল তাদের স্ত্রীদের ছেড়ে একের পর এক সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুমারী তরুণী এবং গত বছরের জন্মানো পুরুষের দল। মাত্র কয়েকটি প্রবীণ অক্টোবর মাসেও দ্বীপে থেকে যায়।

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লোমশ শীলের দল দ্রুত গতিতে দক্ষিণের প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ অঞ্চলের দিকে সাঁতার কাটতে থাকে। দীর্ঘ তাদের সমুদ্র যাত্রা। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চলে আসে তারা শীতের সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া ছোট ছোট দ্বীপগুলি ফেলে—যেখানে তারা স্বল্পকাল স্থায়ী গ্রীষ্মে জন্মগ্রহণ করেছিল।

তাদের আত্মীয়বর্গ ও সমুদ্র সিংহ (sea lions) দলও সঙ্গে থাকে।

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে গ্রীনল্যাণ্ডের শীলেরা সুদূর উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগরে চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের কিনারায় মাছ শিকার করতে থাকে। হেমন্তে তারা সাঁতরে দক্ষিণে আসে। ডিসেম্বরে তারা হাজারে হাজারে শ্বেত সমুদ্রের বরফের উপর দল বেঁধে বসবাস করে। ফেব্রুয়ারীতে বাচ্চা প্রসব করে। মে পর্যন্ত তিন মাস কাল এই শিশুগুলি ঠাণ্ডা বরফের উপর চুপচাপ শুয়ে থাকে। আবার মে মাসে বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের জনক-জননীর সঙ্গে উত্তর মেরুর দিকে সাঁতরে যায়।

গ্রীনল্যাণ্ড এবং ফ্রাজ যোশেফ (Fraz Joseph) দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী মেরু-তুষার অঞ্চলে তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে—যারা আমেরিকায় শীত কাটিয়ে এল। গ্রীনল্যাণ্ডের শীলের দল যেভাবে তাদের শীত-বাসস্থানের অংশ ভাগ করে নেয় সেটা খুবই অদ্ভুত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শীত কাটায় নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপে; কেউ বা যান-মেয়ান (Jan-Mayen) দ্বীপে, যেটা হল গ্রীনল্যাণ্ড এবং নরওয়ের মাঝামাঝি। আবার কেউ বা শ্বেত সমুদ্রের প্রণালীতে বরফের উপর ভাসতে ভালবাসে। এই তিন রকম উপনিবেশ ছাড়া শীতে অন্য কোথাও গ্রীনল্যাণ্ড শীলদের দেখা যায় না।

বহু এস্কিমোর জীবন এবং জীবিকা শীলদের উপর নির্ভরশীল। এস্কিমোরা ভাসমান বরফের উপর গর্ত করে অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করে। যদি কোন শীল শ্বাস নিতে সেই বরফের গর্তের ফাঁকে মাথা তোলে ওরা তাকে অস্ত্র দিয়ে গেঁথে ফেলে।

শীলের মাংস ব্যবহৃত হয় খাদ্য হিসাবে। চামড়া ব্যবহৃত হয় পোষাক এবং নৌকার ছাউনি হিসাবে। চর্বি ব্যবহৃত হয় জ্বালানি হিসাবে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে শীলের চামড়া দিয়ে তৈরি হয় দামী কোট।

শীলের বংশ যাতে লোপ না হয়, সেজন্যে যুক্তরাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিন বছরের ঊর্ধ্বে কেবলমাত্র সংসারবিহীন তরুণ শীলদের শিকার করা চলবে এবং 40টি স্ত্রী-শীল পিছু একজন পুরুষ-শীল রেখে তবেই বাকিদের শিকার করতে হবে। এর পর তাদের চামড়া খুলে নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি করা যেতে পারে।

সৈরিন্ধ্রী রসায়নী

হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়*

তত্ত্বে ও প্রয়োগে

অতি শীত, অতি গ্রীষ্ম বা আবহাওয়ার বৈষম্য থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে আদিম কাল থেকেই মানুষ কোন না কোন গাত্রাবরণ ব্যবহার ক'রে আসছে। আদিবাসী জাতি গাছের ছাল এবং পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী বেশ ধারণ করত। সাজসজ্জা শরীরের চারদিকে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করে সর্বদা দেহরক্ষী হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আমাদের বস্ত্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বান্ধব, যা নিত্যসহচর। কিন্তু সজ্জা নির্বাচন শুধু শরীর প্রতিরক্ষার উপযোগিতা এবং মূল্যমানের উপরেই নির্ভর করে না—ফ্যাশন, সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞানের পরিচয়ও বহন করে। এই পঞ্চশীল বা পাঁচটি ধর্ম সজ্জা-শিল্পের বিবর্তনের পথে রসায়নীবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতির ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তারই কিছু প্রাযুক্তিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা করছি।

হারাপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মহান আবিষ্কার পাচ হাজার বছর আগেকার সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন। সুতো কাটা, কাপড় বোনা, তখনকার মানুষের উচ্চাঙ্গের রস, রুচি, এবং সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সজ্জাদ্রব্যের মূল উপাদান—তুলো, শণ, পশম ও রেশম। বর্তমান শতকে প্রধান কৃত্রিম রেশম—ভিসকোস ও অ্যাসিটেট রেয়ন এবং কতকগুলি অভিনব বহুযোগ (পলিমার) রাসায়নিক পদার্থ (নাইলন, টেরিলিন ইত্যাদি) আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ তালিকা সমৃদ্ধ হয়েছে।

মার্সারাইজড্ বস্ত্র—অন্যান্য শিল্পের মত বস্ত্রশিল্পের নির্মাণ কৌশল আদিকাল থেকেই কেবল মাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মানুযায়ী চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী কালে (1844) একদা জন মারসার (J. Mercer) নামে একজন বিজ্ঞানী একখণ্ড সুতীবস্ত্রের সাহায্যে ঘন ক্ষার রস (28 শতাংশ কস্টিকসোডা দ্রবণ) ছাঁকবার পর দৈবক্রমে বস্ত্রখণ্ডের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল—তা ঘন-কুঞ্চিত, মসৃণ, উজ্জ্বল কিন্তু মাপে ছোট, মূল আর একখণ্ড বস্ত্রের তুলনায় বেশি শক্ত ও বেশি রং শুষে নেয়। সজ্জাশিল্পে রসায়নী বিদ্যাপ্রযুক্তির এই প্রথম পদক্ষেপ। এর গোড়া-পত্তন করেন মারসার। তাঁর মৃত্যুর পর লৌ (Lowe 1890) দেখালেন যে তন্তুর উপর মারসার প্রক্রিয়া চালালে তা রেশমের মত উজ্জ্বল হয় এবং সাধারণ অবস্থায় দৈর্ঘ্যে কমে, প্রস্থে ও আয়তনে বাড়ে, সে সঙ্গে টান প্রতিরোধ শক্তিও বাড়ে। কিন্তু মূল গঠনের রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। অধিকাংশের মতে এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে সোডা সেলুলোজ (1, 2) তৈরি হয়। পরে আর্দ্র বিশ্লেষণে রূপান্তরিত হয়ে সেলুলোজ পরিণত হয় (চিত্র 1)।

কৃত্রিম রেশম তৈরির সম্ভাবনার কথা (পরীক্ষা নল থেকে ফ্যাশন) খুবই পুরাতন। কৃত্রিম (আধাকৃত্রিম বলাই সমীচীন) রেশম বস্ত্রের প্রথম প্রদর্শনী করেন জোসেফ সোয়ান লণ্ডনে 885 সালে। কাউন্ট সার্ডোনেট-ই প্রথম ব্যবসায়ভিত্তিক কৃত্রিম রেশম-শিল্প স্থাপন করেন 1891 সালে এবং যথার্থভাবেই তাঁকে 'কৃত্রিম রেশম-শিল্পের জনক' বলে অভিহিত করা হয়।

* 602, ব্লক O, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-700 053.

কৃত্রিম রেশম—যাকে রেয়ন (rayon) বা কৃত্রিম সিল্ক্ (artificial silk) বলা হয় তার কাঁচামাল হল তুলোর আঁশ (cotton linters)। সেলুলোজ এই কাঁচা মালের উপাদান। সেলু- হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ সেলুলোজকে দ্রবীভূত করে। এই দ্রবণকে স্পিনারেটের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বের করে নিয়ে যথাক্রমে 5% কষ্টিক সোডা দ্রবণ ও 1·5% সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের মধ্য দিয়ে

$$(1)\ (C_6H_{10}O_5)_2NaOH \xleftarrow[12\text{-}18\%]{NaOH} 2C_6H_{10}O_5 \xrightarrow[20\text{-}40\%]{NaOH} (C_6H_{10}O_5)_2NaOH\ (2)$$

সেলুলোজ

চিত্র 1
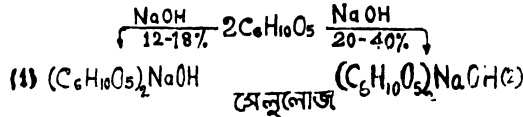
লোজকে উপযুক্ত দ্রবণে দ্রবীভূত করে আবার অপরিবর্তিত বা পরিবর্তিত অবস্থায় উদ্ধার করে যে শ্রেণীর আধা কৃত্রিম তন্তু তৈরি হয় তাকেই রেয়ন বা আর্ট সিল্ক বলা হয়।

রেয়ন সাধারণত চারটি পদ্ধতিতে উৎপন্ন করা যেতে পারে। সব কটি পদ্ধতির মূল কথা হল সেলুলোজকে প্রথমত দ্রবীভূত করা। এই পথে সেলুলোজ অপরিবর্তিত নাও থাকতে পারে। এই দ্রবণকে অতঃপর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে নির্গত করা হয়। পরিশেষে তরল সূক্ষ্ম ধারাগুলিকে কঠিনে পরিণত করে ফাইবার বা তন্তুতে রূপান্তরিত করা হয়। মারসার প্রক্রিয়া থেকে এ পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ এক্ষেত্রে বাস্তব পদার্থ বিকৃত হয়ে এক সমসত্ব, গাঢ় ও সান্দ্র দ্রবণে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

সার্ডোনেটের পদ্ধতি নাইট্রোসেলুলোজ পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে নাইট্রোসেলুলোজকে জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত করে 'কলডিয়ন' দ্রবণ তৈরি করা হয় এবং দ্রবণকে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ফিন্‌কি দিয়ে বের করে নিয়ে উষ্ণ বায়ু দিয়ে শুষ্ক করা হয়। সেলুলোজ এই পদ্ধতিতে অপরিবর্তিত থাকে এবং এই রেয়ন 'নাইট্রোসেলুলোজ রেয়ন' নামে পরিচিত। ইদানিং এই পদ্ধতির প্রচলন বিরল।

1890 সালে কিউপ্রা রেয়ন তৈরি হল কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম রেয়ন পদ্ধতিতে। 'সোয়াইতজার বিকারক' অর্থাৎ কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম

জমাট বাঁধানো হয় এবং মিহি সুতোয় পরিণত করা হয়।

ক্রস্, বেভান ও বীড্‌ল্ (Cross, Bevan, Beadle, 1892) একযোগে কাজ করে কৃত্রিম রেশম—ভিস্‌কোস্ (viscose) তৈরির এমন এক প্রণালী উদ্ভাবন করলেন যাতে বয়নশিল্পে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। উদ্ভিজ্জ তন্তু, যথা—শোধিত তুলো বা কাষ্ঠমণ্ড, যার প্রধান উপাদান সেলুলোজ, কষ্টিক সোডার ঘন (17·5%) দ্রবণে সম্পৃক্ত করে সেই সঙ্গে কার্বন ডাইসালফাইডের বিক্রিয়া ঘটালে যে যৌগ উৎপন্ন হয় তা হল সেলুলোজ জ্যানথেট (cellulose xanthate)। এই যৌগটি কষ্টিক সোডার লঘু দ্রবণে গলিয়ে একটি সমসত্ব এবং সান্দ্র (viscose) দ্রব তৈরি করা হয়। এই দ্রব উচ্চ চাপে পড়ে কাটুনি-যন্ত্রের (spinneret) সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ফিনকি দিয়ে বের হয় এবং গতিপথে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবে জমাট বেঁধে অবিচ্ছিন্ন মিহি সুতোয় পরিণত হয়ে যায়। একে বলে ভিসকোস রেয়ন—সেলুলোজের নবরূপে প্রত্যাবর্তন যা রেশমের একটি অনুকল্প (চিত্র 2)। বর্তমান যুগের ম্যারসারাইজ্‌ড্ তন্তুজ ও ভিস্‌কোস রেয়নের বিরাট বিরাট কারখানাগুলি রূপসজ্জায় সৈরিন্ধ্রী রসায়নীর কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর এল অ্যাসিটেট রেয়ন (1894)। এক্ষেত্রেও শোধিত সেলুলোজ মণ্ড ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে। লব্ধ যৌগটি

আংশিকভাবে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে অ্যাসিটোন দিয়ে নিষ্কাশন করা হয়। এই অ্যাসিটোন নির্যাস থেকে যন্ত্রের সাহায্যে উষ্ণ বায়ুতে রেয়ন সুতো তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে সেলুলোজ পুনরুদ্ধৃত

$$C_6H_{10}O_5\ NaOH \xrightarrow{CS_2} C(=S)(SNa)(OC_6H_9O_4) \xrightarrow[NaOH]{20\%\ \text{লঘু}} \text{ভিসকোস} \xrightarrow{\text{লঘু}\ H_2SO_4} C_6H_{10}O_5\ \text{রেয়ন}$$

চিত্র 2
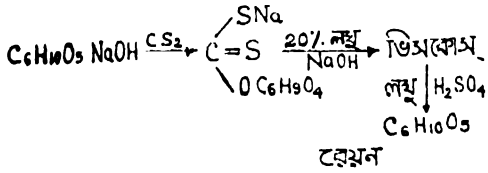
হওয়ার আগে পরিবর্তিত হয়ে সেলুলোজ অ্যাসিটেটে পরিণত হয়ে যায়।

তন্তুর আণবিক গঠন—গাছ-গাছড়া এবং প্রাণী থেকে পাওয়া তন্তু বা আঁশ বয়ন শিল্পের মূল কাঁচা মাল। তুলো এককোষী তন্তু, বীজের গায়ের লোম। বীজ ছাড়িয়ে তা সংগ্রহ করতে হয়। আঁশ থেকে সুতো আর সুতো থেকে বস্ত্র। আবার উদ্ভিজ্জ আঁশের প্রধান যৌগ সেলুলোজ, যার সংযুতি-মূলক সংকেত $C_6H_{10}O_5$ (কার্বো-হাইড্রেট)। প্রকৃতির রসশালায় পত্রহরিতের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থেকে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রথমে গ্লুকোজ, তা থেকে নিরুদন প্রক্রিয়ায় সেলুলোজের উপাদান—গ্লুকোজ বা পুনরাবৃত্ত (repeated) ইউনিট এবং তা পুষ্টিকরণ বা পলিমারিজেশন (polymerisation) প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ $(C_6H_{10}O_5)n$ অণু সংশ্লিষ্ট হয়। ভাবা যাক—সেলুলোজের এক-একটি অণু যেন একেক ছড়া মুক্তা হার, গ্লুকোজ ইউনিট $C_6H_{10}O_5$ একটি মুক্তা। মুক্তার সংখ্যা 100 থেকে 2000—এরূপ শত সহস্র সরল অণু, যার আয়তন 10^{-8} স. মি., পর পর রাসায়নিক সূত্রে গ্রথিত হয়ে যে জটিল আণবিক শৃঙ্খল সৃষ্টি হয় তাকে বলা যায় অতিকায় অণু বা পলিমার (macromolecule)। এর আয়তন হতে পারে $10^{-8} \times 1000\ (=10^{-5})$ সে. মি.। এরূপ এক গুচ্ছ অণু লম্বালম্বি পাশাপাশি সংঘবদ্ধ হয়ে থেকে আঁশ সৃষ্টি করে। আণবিক শৃঙ্খলের প্রতিটি গ্লুকোজ ইউনিটে তিনটি বিক্রিয়াশীল হাইড্রোক্সিল (—OH) গ্রুপ কার্বনের সঙ্গে যুক্ত। কাছাকাছি অণুগুলি একের ষষ্ঠ কার্বন অন্যের তৃতীয় কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা সন্নিবদ্ধ (চিত্র 3)। রঞ্জেন রশ্মি দিয়ে তন্তুর ছবি তুলে পরীক্ষা

হাইড্রোজেন বন্ধনী
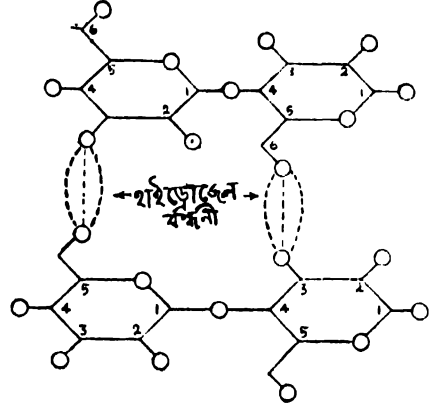
করে দেখা গেছে স্থানে স্থানে কঠিন ও কেলাসিত (crystalline) বা অনিবন্ধী (amorphous) দশা। বিজ্ঞানী মার্কের (H. Mark) মতে কেলাসিত দশায় অণুগুলি যেন লম্বা এক আঁটি পেন্সিল, ঘন সন্নিবিষ্ট আর অনিবন্ধী দশায় যেন এক আঁটি কঞ্চি, ফাঁক ফাঁক। যখন তন্তুজ পদার্থ জলে বা রঙিন দ্রবে ভেজানো হয়, তখন অনিবন্ধী অংশ সহজেই ফেঁপে ওঠে এবং কেলাসিত অংশেও ফাঁক সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় রংয়ের অণুগুলি তন্তুর ভিতরে প্রবেশ করে অণুগুচ্ছের সঙ্গে লম্বালম্বি সটান আটকে যায়।

পশম ও রেশম—উভয়েই প্রোটিন-ঘটিত যথাক্রমে কেরাটিন (keratin) ও ফাইব্রইন (fibroin) তন্তু। কেরাটিনে 3-4% গন্ধকও থাকে। বিশ শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্বারা বিশ্লেষণ করে পশম থেকে আঠারটি অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সরলতম হচ্ছে গ্লাইসিন,

NH_2CH_2COOH (glycin), এদের অণুগুলি একের অ্যামিনো ($-NH_2$) অন্যের কার্বক্সিলের ($-COOH$) সঙ্গে নিরুদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পুষ্টিকরণ বা পলিমারিজেশন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘশৃঙ্খল জটিল কেরাটিন অণু সৃষ্টি করে। দুটি পাশাপাশি সমান্তরাল অণু আড়াআড়িভাবে সালফার-ঘটিত শৃঙ্খল দ্বারা (disulphide link) দৃঢ় সংবদ্ধ, মইয়ের ধাপের মত (চিত্র 4)। ধাপগুলি ভাঙলে মই যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে তেমনি এ বন্ধন ছিঁড়ে গেলে তন্তুজও কমজোরী হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় পশম কোঁকড়ানো হয় এবং তা α-কেরাটিনের দরুণ। সুন্দর কোঁকড়ানো চুলও এই বস্তুটির জন্যে। 7-10% β-কেরাটিনও এতে থাকে, যার জন্যে চুল সোজা হয়।

রেশমের প্রায় আশি শতাংশই ভারি মূলকহীন (radical) ফাইব্রইন অণু, গ্লাইসিন, অ্যালানিন প্রভৃতি সরল অণুর দ্বারা গঠিত। কাজেই অণুগুচ্ছের

$$
\begin{array}{ccc}
\diagdown NH & & NH \diagup \\
CH & & CH \\
CO & & CO \\
NH & & NH \\
CH-CH_2-S & -S- & CH_2-CH \\
CO & & CO \\
NH & & NH \\
CH & & CH \\
CO & & CO \\
NH & & NH \\
CH-(CH_2)_2-COO^- & H_3N^+-(CH_2)_4- & CH \\
CO & & CO
\end{array}
$$
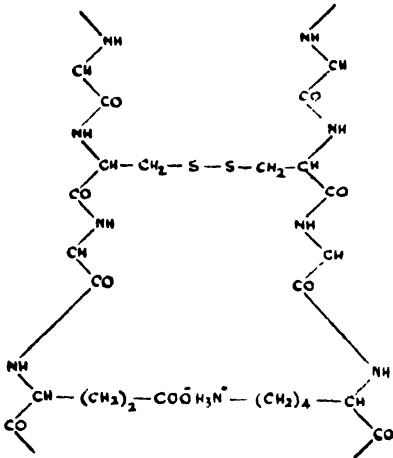
চিত্র 4

অধিকাংশ, শাখা-প্রশাখা (branching) না থাকায়, লম্বালম্বি ঠাসাঠাসি থেকে কেরাটিন অপেক্ষা বেশি মাত্রায় নিয়তাকার (orientation) ও কেলাসিত দশা সৃষ্টি করতে পারে। রেশমের উচ্চ প্রতিরোধ -শক্তির কারণ এটাই।

নাইলন (1935)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ডু পণ্ট এণ্ড কোং (Du Pont & Co)-এর রসশালায় বিজ্ঞানী ক্যারোথার্স (Carothers) পশমের আণবিক গঠন-বৈচিত্র্য এবং তন্তুজ (fibrous) পদার্থের সান্দ্র দ্রবণ থেকে রেয়ন সুতো তৈরির কৌশল বিচার বিবেচনা করে সুতো কাটার প্রথম কৃত্রিম পদার্থ, নাইলন আবিষ্কার করেন। দুটি যৌগ হেক্সামিথীলিন ডায়্যামিন (hexamethylene diamine) ও অ্যাডিপিক অ্যাসিড (adipic acid) থেকে নিরুদন এবং পুষ্টিকরণ প্রক্রিয়ায় তিনি নাইলনের অতিকায় আণবিক যৌগ তৈরি করেন (চিত্র 5)।

$$
NH_2(CH_2)_6NH_2 + HOCO(CH_2)_4COOH \longrightarrow NH_2[CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-NH-CO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CO]_n OH
$$
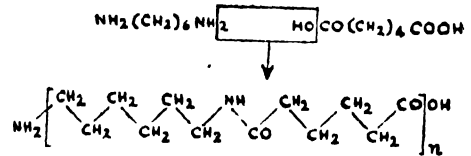
চিত্র 5

গলিত অবস্থায় নাইলনের সুতো তৈরি করা হয় এবং ঠাণ্ডায় এটি সটানে রেখে (cold drawing) সহজেই এর অণুগুচ্ছ স্থায়ীভাবে লম্বালম্বি সমান্তরাল ও নিয়তাকার করে রাখা যায়। এর ফলে তন্তুতে উজ্জ্বলতা ও অন্যান্য গুণ আরোপিত হয়। নাইলন তন্তু অ্যাসিড, কষ্টিক দ্রব, শুষ্ক ধোপের দ্রাবক, বিরঞ্জক দ্রব্য, কীট ও জীবাণু প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এক কথায় এটি সর্বংসহা। এর দৃঢ়তা বা শক্তিও অদ্বিতীয়।

আজকের দিনে 'পলিয়েষ্টার' ফাইবার বা সুতো সম্বন্ধে কিছু না বললে কৃত্রিম তন্তু সম্বন্ধে অনেক কথা বাকি থেকে যায়। দুটি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বা এষ্টার মূলক আছে এমন জৈব যৌগের সঙ্গে দুটি কোহলীয় হাইড্রোক্সিল মূলক আছে এমন জৈব-যৌগের নিরুদন (বা কোহল অপসারণ—এষ্টারের ক্ষেত্রে) ও পুষ্টিকরণ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম সুতো বা

ফিল্মের উপযোগী অতিকায় অণু গঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ডাইমিথাইল টেরিথেলেট ও ইথিলিন গ্লাইকল-এর বিক্রিয়ায় টেরিন বা টেরিলিন বা ডেক্রন তন্তু উৎপন্ন হয় (চিত্র 6)।

$$H_3COOC-⬡-COOCH_3 + 2\,HOCH_2-CH_2OH$$

$$\downarrow \text{ক্ষার অনুঘটক}$$

$$HOCH_2CH_2OOC-⬡-COOCH_2CH_2OH + 2\,CH_3OH$$

$$\downarrow -H_2O$$

$$H-\left[OCH_2CH_2OOC-⬡-COOCH_2CH_2\right]_n-OH$$

টেরিন

চিত্র 6
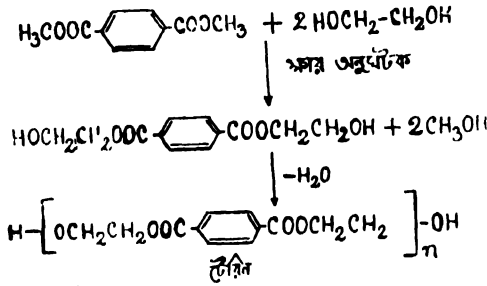
গঠন এবং গুণের সামঞ্জস্য—দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা, প্রসারণীয়তা এবং নম্রতা প্রভৃতি সুতোর গুণাবলীর উপর কাপড়ের গুণাগুণ অনেকটা নির্ভর করে। আবার এসব গুণ পদার্থের রাসায়নিক গতিপ্রকৃতি অনুসারেও কম-বেশি হতে পারে। নতুন নতুন চাহিদা মেটাবার জন্যে তন্তুজ সামগ্রী কোন অবস্থায় (শুষ্ক, ভিজা, ঠাণ্ডা, গরম, অ্যাসিডিক্ বা ক্ষারীয়) নষ্ট না হয় এমন ভাবে ধোয়া-কাচা, রং করা, সাদা করা ইত্যাদি সমস্যার মোটামুটি সমাধান সহজ হয় ওদের রাসায়নিক প্রকৃতি জানা থাকলে। যেমন—ক্ষারীয় দ্রবণ সাবান, সোডা সাধারণত উদ্ভিজ্জ তন্তুর অনিষ্ট করে না; কিন্তু অ্যাসিড এবং জারক রসে এদের অণু বিকৃত হয়ে তন্তু কমজোরী হয়। রেশম এবং পশমের সহনশীলতা এর চেয়ে কম। ক্ষার রস অপেক্ষাকৃত বেশি অনিষ্টকর। ক্লোরিন-ঘটিত বিরঞ্জক উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক। এদেরকে সাদা করবার জন্যে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এবং সালফার ডাইঅক্সাইড দ্রব বিশেষ উপযুক্ত। ক্ষারীয় দ্রবণ, কিছু কিছু জৈব দ্রাবক এবং অতি-উষ্ণতা অ্যাসিটেট রেয়নের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রশমিত সাবান ও অ্যামোনিয়া দিয়ে এ কাপড় কাচা হয়।

চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা মসৃণতাজনিত পৃষ্ঠের ধর্ম। মারসার্ প্রক্রিয়ায় সুতো সটান থাকলে এর ব্যাস ও প্রস্থচ্ছেদে সর্বত্র বেশি সমতা সম্পাদিত হয় এবং ফেঁপে ওঠায় বৃত্তাভাস ধারণ করে। ফলে বেশি উজ্জ্বল, মসৃণ ও শক্ত হয়। এর রঞ্জনীয়তাও (dyeability) বাড়ে।

বিরঞ্জন—বিরঞ্জন (bleaching) শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সহজে বস্ত্রের অবাঞ্ছিত ময়লা বা দাগ দূর করে তা সাদা করা অথচ কমজোর না হয় এরূপ পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ জারক দ্রবে একাধারে একাদিক্রমে সুতীবস্ত্র, রেশম বা পশম ধোলাই ও বিরঞ্জন, সুতী বস্ত্রের জন্যে পরপর সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট এবং পারকসাইড বিরঞ্জক আর পৃথকভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইট বিরঞ্জক আধুনিক বস্ত্র শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

রঞ্জক (Dyeing)—সজ্জাশিল্পে রসায়নীর প্রথম পদক্ষেপ ম্যার্স্যারের আবিষ্কারের (1844) অল্পকাল পর বিজ্ঞানী পার্কিন (1856) প্রথম কৃত্রিম রঞ্জক দ্রব্য, অ্যানিলিন পার্পল্ (aniline purple), আবিষ্কার করেন আলকাত্রা থেকে। বয়ন শিল্পে এই উভয় আবিষ্কারের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং রসায়নীবিদ্যার জয়জয়কার। এর দৌলতে নিত্য নতুন নানা রঙের রঞ্জকদ্রব্য তৈরি এবং শিল্পে তাদের সার্থক বিনিয়োগ সাজসজ্জাকে বিশ্বে বরণীয় ও রমণীয় করেছে। ধোপে ও আলোয় টেকে এমন সব মনোহর রং তৈরি করা হয়েছে। বস্ত্র ছোপানো এবং ছাপানোর নতুন নতুন ডিজাইন চালু হয়েছে। পশম, রেশম উভয়ই অ্যাসিডিক এবং ক্ষারীয়, তাই উভয় রকম রঞ্জকেই এগুলি ছোপানো যায়। এগুলি এবং তুলোর জিনিষ 'ডাইরেক্ট কটন ডাই' প্রশমিত রঙেও লবণ সহযোগে ছোপানো হয়। কিন্তু তুলোর সেলুলোজ-অণুর হাইড্রক্সিল (-OH)গুলি জৈব মূলক দ্বারা আটক করে দিলে এই রঞ্জকের প্রতি তুলোর আসক্তি কমে যায়।

সমাপ্তি প্রকরণ (Finishing Treat-

ments)—ভোজনের পরে যেমন তাম্বুলাদি চর্বণ দ্বারা মুখশুদ্ধি করা হয় তেমনি সজ্জা শিল্পের শেষ পর্বে বিশেষ বিশেষ দোষত্রুটি ঢেকে উৎপন্ন দ্রব্য আরও বেশি ব্যবহারযোগ্য ও জনপ্রিয় করবার জন্যে রসায়নীর বিস্ময়কর অবদান রয়েছে।

কমনীয়তা সম্পাদন—কৃত্রিম রেশমের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা কমিয়ে রুচিসম্মত কমনীয়তা, ঘটাতে টাইটানিয়াম (titanium) ডাই-অক্সাইড, বেরিয়াম (barium) সালফেট ইত্যাদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তন্তুর সঙ্গে মেশান হয়।

আলোকের বিরঞ্জন প্রক্রিয়া—বিরঞ্জিত ও ধৌত বস্ত্রাদির হলদে ভাব দূর করতে নীলের ব্যবহার পুরানো। জৈব কৃত্রিম নীল (Baeyer 1870) ছাড়াও অনেক এ জাতীয় পণ্য (brand) তৈরি হয়েছে যা আপাতদৃষ্টিতে বর্ণহীন হলেও আলোকের অবস্থিতিতে নীলাভ দেখায়।

সঙ্কোচন নিবারণ ও ভাঁজ সংরক্ষণ—নতুন কাপড় জলে কাচলে সঙ্কোচনের দরুণ খাপী হয়। এ প্রক্রিয়ায় 'ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড' ও 'মেল্যামিন ফরম্যালডিহাইড' নামক কৃত্রিম রঞ্জন (resin) তন্তুর মধ্যেই তৈরি হয়। স্যানফোরাইজ্‌ড্‌ (sanforized) বস্ত্রে সঙ্কোচন আরও কমানো গেছে। পশমের সঙ্কোচন নিবারণ ও জমাট বাঁধার কারণ এর গঠন এবং সংস্থিতি। লোমের (wool) পৃষ্ঠদেশ গোড়া থেকে আগার দিক অপেক্ষা আগা থেকে গোড়ার দিকে বেশি খসখসে। পশমের এই ত্রুটি নিবারণের জন্যেও সার্থক রাসায়নিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

পশম কীট ও জীবাণু প্রতিষেধক—পশমের দুটি কাছাকাছি অণুর মধ্যে আড়াআড়িভাবে যে সালফারের বন্ধন রয়েছে—তা ছিঁড়ে গেলে কীটের খাদ্য সহজলভ্য হয়। কিন্তু পূর্বেই রাসায়নিক উপায়ে ঐ বন্ধন ছিন্ন করে অন্য রকম বন্ধনে জুড়ে দিলে এবং আণবিক শৃঙ্খলের প্রান্তের মুক্ত কয়েকটি অ্যামিনো গ্রুপবিশিষ্ট রাসায়নিক গ্রুপ বা মূলক দ্বারা আটকে দিলে (চিত্র 7) পশম কীটের অখাদ্য হয় এবং অম্ল, ক্ষার, জারক প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। প্রযুক্তি রসায়নের এসব সূত্র বয়নশিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

$$>CH-CH_2-S-S-CH_2-CH<$$

$$\downarrow H$$

$$>CH-CH_2-SH \quad [Br|CH_2-CH_2|Br] \quad H|S-CH_2-CH\rightarrow-S-CH_2-CH_2-S\rightarrow$$

চিত্র 7

সুতীবস্ত্রের ভাঁজ বা পাট ভাঙে অতি সহজেই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত টুট্যাল টাই নির্মাতা (Tootal Broadhurst Co. Ltd.) সবাগ্রে এ ত্রুটিগুলি রসায়নের সাহায্যে অনেকখানি সংশোধন করেছে।

[চিত্রগুলির কয়েকটি শ্রীসুনীল শীল ও শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

সংখ্যাসম্বন্ধীয় উপপাদ্য এবং অংক

জগদীশচন্দ্র ঘোষ*

গণিতশাস্ত্রে সংখ্যা বলতে কি বুঝায় তা প্রায় সকলেরই জানা। যেমন 957 একটি সংখ্যা। এই সংখ্যাটির এককের অংক, দশকের অংক,. শতকের অংক হল যথাক্রমে 7, 5 এবং 9. আরও জানা আছে, এটি একটি তিন অংকবিশিষ্ট সংখ্যা। আবার একক, দশক, শতক প্রভৃতি স্থানের অংকগুলি জানা থাকলে সংখ্যাটিকে বের করা যায়। যেমন, কোন সংখ্যার একক, দশক, শতক প্রভৃতি স্থানের অংকগুলি যথাক্রমে 6, 5, 4. তাহলে সংখ্যাটি = 100 × (শতকের অংক) + 10 × (দশকের অংক) + এককের অংক = 100 × 4 + 10 × 5 + 6 = 400 + 50 + 6 = 456. এভাবে নানা অংকবিশিষ্ট সংখ্যার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখানে সংখ্যা ও তার অংক সম্বন্ধে একটি উপপাদ্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। উপপাদ্যটির প্রমাণ দীর্ঘ বলে শুধুমাত্র উপপাদ্যটির প্রতিজ্ঞা এবং কয়েকটি অংক দেওয়া হল। এই উপপাদ্যটি জানা থাকলে অনেক ক্ষেত্রে এমন অংক কষতে পারা যায় যা অন্য নিয়মে কষা জটিল।

উপপাদ্য ঃ

প্রতিজ্ঞা—দুই, তিন, চার ইত্যাদি যে কোন অংকবিশিষ্ট সংখ্যার (ধরা যাক A) সঙ্গে অপর যে কোন সংখ্যা (ধরা যাক B) তা যত অংকবিশিষ্টই হোক না কেন, যোগ করলে যে যোগফল পাওয়া যাবে (ধরা যাক C), তখন M = N হবে···(i)।

M হল A ও B সংখ্যা দুটির মোট অংকগুলির যোগফল এবং N, A ও B সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল অর্থাৎ C সংখ্যাটির অংকগুলির যোগফল।

অথবা P = R হবে ...(ii)

এখানে P ও R প্রত্যেকটি এক অংকবিশিষ্ট সংখ্যা। P হল A ও B সংখ্যা দুটির মোট অংকগুলির যোগফল অর্থাৎ M (কেবলমাত্র যদি M এক অংক-বিশিষ্ট হয়)। যদি M এক অংকবিশিষ্ট না হয় তবে পুনরায় M-এর অংকগুলি যোগ করতে হবে (ধরা যাক এই যোগফল E)। যদি এই যোগফল অর্থাৎ E এক অংকবিশিষ্ট হয় তবে তা (E) হল P. যদি E এক অংকবিশিষ্ট না হয় তবে পুনরায় E-এর অংক-গুলি যোগ করতে হবে। যদি এক অংকবিশিষ্ট হয় তবে তা P হবে। যতক্ষণ না এক অংক-বিশিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় ততক্ষণ এভাবে (ঐ নিয়মে) যোগ করে যেতে হবে এবং সর্বশেষ যে এক-অংকবিশিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যাবে তা P হবে। অনুরূপে R হল A ও B সংখ্যা দুটির যোগফলের অর্থাৎ C সংখ্যাটির অংকগুলি (উপযুক্ত নিয়মে) যোগ করে প্রাপ্ত এক-অংকবিশিষ্ট একটি সংখ্যা।

M = N তখনই হবে, যখন A ও B সংখ্যাদুটির এককের স্থানের অংকের সঙ্গে একক স্থানের অংকের যোগফল, দশক স্থানের অংকের সঙ্গে দশক স্থানের অংকের যোগফল, শতক স্থানের অংকের সঙ্গে শতক স্থানের অংকের যোগফল প্রভৃতি প্রত্যেকটি যোগফলই এক অংকবিশিষ্ট একটি করে সংখ্যা হবে।

A ও B—এই দুটি মাত্র সংখ্যা না নিয়ে A, B, C, D, E,······প্রভৃতি যতগুলি ইচ্ছা সংখ্যা নেওয়া হোক না কেন (তা যত অংকবিশিষ্টই হোক), যদি সেগুলি যোগ করা যায়, তবে উপর্যুক্ত উপপাদ্যটি সর্বদাই প্রযোজ্য হবে।

নিম্নের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে উপপাদ্যটি অনুধাবন করা যায়—

* গ্রাম-চাঁদগ্রাম, ডাকঘর-চাঁদগাঁ (পলাশী), জেলা-বাঁকুড়া

উদা: (ক) 7432
　　　　2567
　　　　9999

এখানে $M=7+4+3+2+2+5+6+7=36$

$N=9+9+9+9=36$

$\therefore M=N$

উদা: (খ) 7321
　　　　1253
　　　　1204
　　　　9778

এখানে, $M=7+3+2+1+1+2+5+3+1+2+0+4=31$

$N=9+7+7+8=31$

$\therefore M=N$

উদা: (গ) 538
　　　　943
　　　　835
　　　　2316

এখানে P বের করতে হবে:

এখন $5+3+8+9+4+3+8+3+5=48$

48—এক অংকবিশিষ্ট সংখ্যা নয়।

$4+8=12$—এটিও এক অংকবিশিষ্ট সংখ্যা নয়

সুতরাং $P=1+2=3$

আবার, $2+3+1+6=12$

তাহলে, $R=1+2=3$

$\therefore P=R$

উদা: (ঘ) 2978
　　　　4456
　　　　7434

P বের করতে হবে:

$2+9+7+8+4+4+5+6=45$

$\therefore P=4+5=9$

আবার, $7+4+3+4=18$

এখন, $R=1+8=9$

$\therefore P=R$

এবার দুটি অংক নেওয়া যাক। তা হল—

অংক 1 দুই অংকবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অংকদ্বয়ের যোগফল 10. সংখ্যাটির সঙ্গে 17 যোগ করলে যোগফলের অংকদ্বয় সমান হয়ে যায়। সংখ্যাটি কত?

যেহেতু নির্ণেয় সংখ্যার অংকদ্বয়ের যোগফল 10, অতএব নির্ণেয় সংখ্যার এবং 17 সংখ্যাটির অংকগুলির সমষ্টি $=10+1+7=18$

এখানে $P=1+8=9$

উপর্যুক্ত উপপাদ্য অনুযায়ী $R=9$ হবে।

প্রশ্নে বলা আছে, যোগফলের অংকদ্বয় সমান। তাহলে যোগফলটি দুই অংকবিশিষ্ট একটি সংখ্যা।

কিন্তু, $9=1+8$

$9=2+7$

$9=3+6$

$9=4+5$

এখানে নির্ণেয় সংখ্যা ও 17-সংখ্যাটির যোগফলের অংকদ্বয়ের যোগফল 9 হতে পারে না। কারণ দুটি একই অংকের যোগফল বিজোড় সংখ্যা নয়।

অতএব ঐ সমান অংকদ্বয়ের যোগফল 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45 ও 54—এগুলির মধ্যে একটি সংখ্যা হবে।

ধরা যাক, সমান অংকদ্বয়ের একটি a তাহলে অপরটিও a.

এগুলির যোগফল $a+a=2a$. এখানে a একটি অংকবিশিষ্ট সংখ্যাই।

সুতরাং, $2a=18$ হবে; অন্যগুলি হবে না। কারণ 81 বা 27 কিংবা 72 ইত্যাদি হলে a এক অংকবিশিষ্ট হবে না

$\therefore a=9$

কাজেকাজেই $10\times9+9=99$ এবং নির্ণেয় সংখ্যা $=99-17=82$.

এ অংকটি অবশ্য অন্য নিয়মেও কষা যায়।

অংক 2. চার অংকবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অংকগুলির যোগফল 19 এবং সংখ্যাটির সঙ্গে 1539

যোগ করলে যোগফলের অংক চারটি সমান হয়ে যায়। সংখ্যাটি কত ?

নির্ণেয় সংখ্যা ও 1539 সংখ্যাটির মোট অংকগুলির যোগফল

$=19+1+5+3+9=37$

এখন $3+7=10$

$\therefore \ P=1+0=1$

অতএব বর্ণিত উপপাদ্য অনুযায়ী R = 1 হবে।

যেহেতু যোগফলের অংক চারটি সমান, তাই ঐ যোগফলের অংকগুলির যোগফল = 4 × একটি অংক। মনে করা যাক—এই একটি অংক = a

অতএব যোগফলের অংক চারটির যোগফল = 4a

উপপাদ্য অনুযায়ী R = 1

এখন $4a \neq 1$, কারণ a ভগ্নাংশ নয়।

সুতরাং, যে সংখ্যার (E) অংকগুলি যোগ করে যোগফল 1 হয়েছে তা অবশ্যই 10, 100 ইত্যাদি।

কিন্তু 4 × একটি অংক ≠ তিন অংকবিশিষ্ট সংখ্যা। অতএব F, 100 হবে না। কারণ চারটি একই অংকের যোগফলের অংকগুলির যোগফল কখনই তিন অংকবিশিষ্ট নয়।

আবার $4a \neq 10$, কারণ তা হলে a ভগ্নাংশ হয়। চারটি একই অংকের যোগফল তিন অংকবিশিষ্ট নয়। আবার দুই অংকবিশিষ্ট সংখ্যার অংকগুলির যোগফল নিচের কোনটিই নয়।

এখন— $10=2+8$

$10=3+7$

$10=1+9$

$10=4+6$

$10=5+5$

$\therefore$ 4a = 28, 37, 82, 73, 19, 91, 46, 64, 55—এগুলির একটি।

এখন এমন একটি সংখ্যা নিতে হবে যেখানে a একটি মাত্র অংক হয়।

স্পষ্টতঃই $4a=28$ হবে।

$\therefore \quad a=\frac{28}{4}=7$

$\therefore$ নির্ণেয় সংখ্যা ও 1539 সংখ্যাটির যোগফল

$=1000\times7+100\times7+10\times7+7$

$=7777$

সুতরাং নির্ণেয় সংখ্যা $=7777-1539=6238$

[এভাবে অনেক অংক কষা যায় যা অন্য নিয়মে কষা শক্ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যত বেশি অংকবিশিষ্ট সংখ্যা লেখা হবে ততই জটিলতা দেখা দেবে ; কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তার সমাধান সম্ভব]

[সাধারণ নিয়মে কষা যোগটি (বাঁদিকে) ঠিক আছে কিনা দেখা যাক—

925 এখন, $9+2+5+7+2+4+4$

724 $+1+2=36$

412 $P=3+6=9$

2261 এবং $2+2+6+1=11$

$R=1+1=2$

দেখা যাচ্ছে, $P \neq R$

অতএব বাঁদিকে কষা যোগটি ঠিক হয় নি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান যাচ্ছে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1977 সালের কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 1978 সালের সভ্যপদপ্রার্থীদের নতুন মুদ্রিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে। পরিষদ কার্যালয়ে উক্ত আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। পুরাতন আবেদনপত্র যদি কারও নিকট থাকে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রয়োজন-ভিত্তিক বিজ্ঞান

সর্পগন্ধা বা চন্দ্রা

সর্পগন্ধা বা চন্দ্রা একটি ওষুধ প্রদানকারী দ্বিবীজপত্রী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। সর্পগন্ধা অ্যাপোসাইনেসী (apocynaceœ) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর আদি বাসভূমি ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে হলেও পুরাকাল থেকে ভারতবর্ষে অনিদ্রা ও বিভিন্ন স্নায়বিক রোগে ওষুধ হিসেবে সর্পগন্ধার ব্যবহার হত। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা সর্পগন্ধার উপরে প্রচুর গবেষণা করে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। বর্জ্য পদার্থ হিসেবে সর্পগন্ধার মূলের ছালে, রেসিন্নামাইন (rescinnamine), রেসারপিন (reserpine) ডেসারপিডিন (deserpidine), অ্যাজমালিন (ajmaline), আইসো-অ্যাজমালিন (iso-ajmaline), রউলফিনিন (rauwolfinine), সার্পেনটাইন (serpentine) প্রভৃতি উপক্ষার পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই উপক্ষারগুলি মানুষের উচ্চ-রক্তচাপজনিত এবং কিছু সংখ্যক স্নায়ুঘটিত রোগের উপশম করতে সাহায্য করে।

সর্পগন্ধার বা চন্দ্রার বৈজ্ঞানিক নাম রউলফিয়া (rauwolfia)। সর্পগন্ধা সমভূমিতে এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। এদেশে রউলফিয়া-গণের (genus) রউলফিয়া সার্পেনটিনা (rauwolfia serpentina) এবং রউলফিয়া ক্যানেস্‌সেনস rauwolfia cannessens)—এই প্রজাতি দুটি-ই সাধারণত বেশি পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছোট সর্পগন্ধা বা ছোট চাঁদর রউলফিয়া সার্পেনটিনার মূলে প্রচুর পরিমাণে উপক্ষার থাকার জন্যে এর চাষ-ই বেশি হয়।

সর্পগন্ধা দুই থেকে তিন ফুট লম্বা হয়। গাছের কাণ্ড মসৃণ। সবৃন্তক সরল পাতাগুলো আবর্তভাবে কাণ্ডের উপরে সাজানো থাকে। পাতা দেখতে লম্বা বা ডিম্বাকৃতি হয় (চিত্র 1)। পাতার নিচের দিক ফিকে সবুজ এবং উপরের দিক মসৃণ উজ্জ্বল এবং গাঢ় সবুজ

চিত্র 1

বর্ণের হয়। সাদা কিংবা ফিকে গোলাপী ফুল গ্রীষ্মকালে থোকায় থোকায় ফোটে এবং বর্ষাকালে ফল হয়। ফলগুলি সবুজ, লাল আর কালো মিশ্রিত অবস্থায় একসঙ্গে দেখা যায়। সর্পগন্ধার গাছের প্রধান মূল মোটা, শক্ত এবং সাপের মত প্যাঁচানো হয় (চিত্র 2)। সাপের মত প্যাঁচানো মূল থেকেই

চিত্র 2

বোধ হয় এর নাম হয়েছে সর্পগন্ধা। সুস্পষ্ট মোটা ছাল দিয়ে মূল আবৃত থাকে। মূল প্রায় দেড় ফুট লম্বা হয়।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি সর্পগন্ধার চাষ হয়। পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং জেলায়, উত্তর প্রদেশ এবং আসামের পাহাড়ী এবং সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে সর্পগন্ধার চাষ হয়। এছাড়া কলকাতায় অবস্থিত ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, লক্ষ্ণৌয় অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, দেরাদুনের বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত আঞ্চলিক গবেষণাগার এবং তামিলনাড়ুতে অবস্থিত সিনকোনা খামারে পরীক্ষামূলকভাবে সর্পগন্ধার চাষ হয়। সর্পগন্ধা চাষের পক্ষে উর্বর দো-আঁশ ও কর্দমাক্ত মাটিই উপযুক্ত। যে কোন পরিমাণ বৃষ্টিপাতে সর্পগন্ধার চাষ হতে পারে।

মূল বা কাণ্ডের অংশ রোপণ করে অথবা বীজ বপন করে সর্পগন্ধার চাষ হয়। তবে বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ থেকেই বেশি পরিমাণে উপক্ষার পাওয়া যায়। সর্পগন্ধার চাষের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই, স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে এর চাষ হয়। তবে, সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। জমিকে ভালভাবে চাষ এবং সবুজ সার দিয়ে তৈরি করে আশ্বিন-কার্তিক মাসে চারাগুলোকে নতুন করে রোপণ করা হয়ে থাকে। তিন-চার বছর পরে শীতকালে ছালসহ মূল সংগ্রহ করা হয়। কারণ শীতকালেই ছালে সবচেয়ে বেশি উপক্ষার সঞ্চিত থাকে। সংগৃহীত মূলগুলোকে জল দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার এবং শুকনো করে বায়ুহীন পাত্রে ভর্তি করা হয়। তার পরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গবেষণাগারে ওষুধ তৈরির জন্যে। বর্তমানে ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে সর্পগন্ধা বিদেশে রপ্তানি হয়।

সর্পগন্ধা, বিভিন্ন রকমের ব্যথা-বেদনা প্রশমন করে এবং অনিদ্রাজনিত রোগ দূর করে। মানসিক, স্নায়বিক এবং উচ্চ-রক্তচাপজনিত রোগে এর ব্যবহার হয়। বিহারে সর্পগন্ধা 'পাগলা দাওয়াই' নামে পরিচিত। ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা সর্পগন্ধাকে কৃমিনাশক, জ্বরনাশক ও বলকারক বলে মনে করেন।

সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়*

*আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা-700 004

"পৃথিবীতে বাঁচতে হলে বিবেক ও বিচারশক্তিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চিরাগত অনেক বিষয়ের মূলে কুঠারাঘাত করে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্য কোন পথে শ্রেয়ের সন্ধান মিলবে না।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

"পরিবর্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে বুদ্ধিকৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে; জীবনসংগ্রামে তারাই টিঁকে যায়।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিজ্ঞান-সংবাদ

অভিজিৎ বর্ধন*

চৌম্বকীয় একক মেরুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি?

পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল—যেদিন বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল প্রকাশ করলেন তাঁর তড়িৎ-চুম্বকীয় সমীকরণ। ম্যাক্স্ওয়েল দেখালেন বিদ্যুৎ এবং চুম্বক এরা যেন সমসূত্রে গাঁথা দুটি ভিন্ন সত্তা; যেখানেই বিদ্যুৎ কণা সেখানেই চুম্বকের অস্তিত্ব অনিবার্য। বিদ্যুৎ-এর আধান নিয়ে পরীক্ষা করলে পাওয়া যাবে দু'ধরনের বিদ্যুৎ আধান—ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক। এখন প্রশ্ন হল বিদ্যুৎ-আধান—সে ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক যাই হোক, তার যেমন পৃথক অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব, চুম্বকের বেলায় একই ভাবে একক চুম্বক-আধান বা একক চুম্বক মেরুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব কি?

প্রত্যেক চুম্বকেরই দুটি মেরু বর্তমান—একটি বড় চুম্বকের খণ্ডকে ভাঙতে ভাঙতে যখন আণবিক পর্যায়ে আনা যায়, তখন দেখা যায় সেই অণুর মধ্যেও রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু। বিজ্ঞানীরা পরমাণুর মধ্যেও ধরে নেন এই দুই ধরনের মেরুর অস্তিত্ব। এর এক একটির মধ্যে থাকে একক পরিমাণ চৌম্বক শক্তি। একক শক্তি সমন্বিত এই চৌম্বক মেরুকেই বলা হয় 'মোনো-পোল' বা একক মেরু। এই একক মেরুদ্বয়ের মধ্যে একক চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন উত্তর মেরুকে বলা হয় ধনাত্মক চৌম্বক মেরু, এবং একক চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন দক্ষিণ মেরুকে বলা হয় ঋণাত্মক চৌম্বক মেরু। পরিমাণগতভাবে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক—এই দুই প্রকার মেরুশক্তির শক্তিমাত্রা সমান। তবে এদের আচরণ ও প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের বিপরীত-ধর্মী। ঠিক যেমনটি চোখে পড়ে বিদ্যুৎ-আধানের ক্ষেত্রে। শুধু পার্থক্য এই, বিদ্যুৎ শক্তিকে যেমন পৃথক দুই প্রকার আধান হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, চৌম্বক শক্তির ক্ষেত্রে সেটা আজ অবধি সম্ভব হয় নি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—তাত্ত্বিক দিক দিয়ে মোনোপোল বা চৌম্বকীয় একক মেরুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব আজও পাওয়া যায় নি বা প্রকৃতিতে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রমাণও এতদিন ছিল না।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেল অনেকটা আকস্মিক ভাবেই। সময়টা 1973 সাল। টেকসাসের হিউসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লরেন্স পিন্স্কি ও ডঃ ডব্লু জ্যাক অস্বর্ণ এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ প্রাইস ও ডঃ এডওয়ার্ড মার্ক—এই চারজন বিজ্ঞানী আইওয়ার সিওকস শহরের ঊর্ধ্বাকাশে একটি বিশেষ ধরনের বেলুন পাঠিয়ে কসমিক পার্টিকেল্ বা মহাজাগতিক কণা সম্পর্কে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। বেলুনটির সঙ্গে পাঠানো বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল কয়েকটি বিশেষ প্লাষ্টিকের পাত এবং ছবি তোলার সাজসরঞ্জাম। ওদের উদ্দেশ্য ছিল মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকে পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে কি কি ধরনের ভারি কণা বা পদার্থের কেন্দ্রীন ছুটে আসে তার অনুসন্ধান করা।

তাঁরা ভেবেছিলেন, ঐসব কণা বা পরমাণু-কেন্দ্রীন প্লাষ্টিকের পাতের উপর দিয়ে ছুটে যাবার

---

* তালতলা হাই স্কুল, কলিকাতা-700 014

সময় আঁচড় কেটে যাবে পাতের গায়ে। সেই সঙ্গে বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় লাগানো ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর কোন কোন কণার সঞ্চারপথের ছবিও ধরা পড়বে। পরে গবেষণাগারে ঐ সব ছবি পরীক্ষা করে তাঁরা জানতে পারবেন ঐ সময়ে সেখানকার উর্ধ্বাকাশে কি কি কণার আগমন ঘটেছিল। সেই সঙ্গে জানা যাবে তাদের শক্তির পরিমাণ, গতি-প্রকৃতি এবং আরো অনেক তথ্য। এভাবে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে চমকে উঠলেন চার বিজ্ঞানী। প্লাষ্টিকের পাতের উপর আঁচড় পড়েছিল ঠিকই, ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ছবিও উঠেছিল অসংখ্য সঞ্চারপথের, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ আঁচড়ের দাগ তাঁদের বেশি আকৃষ্ট করল। শেষোক্ত এই দাগ এবং সঞ্চারপথ পরীক্ষা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এগুলি তথা-কথিত অধিপারমাণবিক (subatomic) বা প্রাথমিক কণিকার জন্যে নয়। এসব আঁচড় চৌম্বকীয় মৌলিক কণা বা একক মেরুর। যাদের অপর নাম 'ম্যাগ্নেটিক মোনোপোল।'

চৌম্বক মোনোপোলের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী পি এ. এম. ডিরাক—1931 সালে। সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি একক চৌম্বক মেরুর শক্তির পরিমাণ কি হবে সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী (ক) একটি চলমান চৌম্বক একক মেরু নিজের গতিবেগের সমানুপাতিক হারে তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে এবং (খ) চৌম্বক আধান হবে ইলেকট্রনের আধানের 68·5-এর অখণ্ড গুণিতক।

পরে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা 1936 সালে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করেন, একক চৌম্বক মেরুর মধ্যে চৌম্বক শক্তির যে পরিমাণের কথা ডিরাক বলেছেন তা সঠিক। এরও পরে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে একক চৌম্বক মেরুর শক্তির মান নির্ণয়ের কথা আলোচনা করেন অধ্যাপক এইচ. এ উইলসন। বলা বাহুল্য এঁরা প্রত্যেকেই কাজটি করেছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যুক্তির উপর নির্ভর করে; যদিও এ সম্পর্কে কোন পরীক্ষাগত সিদ্ধান্ত নেওয়া তখন সম্ভব হয় নি।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বছর সাতেক আগে নতুন এক প্রকার মৌল কণার কথা ঘোষণা করেন বিজ্ঞানী জুলিয়ান সুইংগার। এই কণিকাটির মধ্যে নাকি বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক—উভয় আধানই যুগপৎ অবস্থান করে। সুইংগার এই কণার নাম দেন 'ডায়ওন'। সুইংগার বললেন, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মৌল কণিকার সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই ডায়ওন। তিনি আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে দেখান—পরমাণুর কেন্দ্রীন-বলের চেয়ে বিপরীত-ধর্মী দুটি একক মেরুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া বলের পরিমাণ প্রায় চার-শ' গুণ বেশি। হয়ত এই কারণেই কোন চুম্বক পরমাণু থেকে তার ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক চৌম্বক আধান আলাদা করা সম্ভব হয় না। তার বক্তব্য: একটি ডায়ওন কণার মধ্যে $\frac{2}{3}$ এবং $\frac{1}{3}$ অংশ মৌল বিদ্যুৎ শক্তি অথবা মৌল চৌম্বক শক্তি বর্তমান। এখানে মৌল বিদ্যুৎ শক্তি বলতে ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান এবং মৌল চৌম্বক শক্তি বলতে দক্ষিণ অথবা উত্তর মোনোপোলের শক্তির কথাই বলা হয়েছে যদিও ডায়ওনের অস্তিত্ব পরীক্ষিত সত্য হিসাবে প্রমাণিত নয়, তবু এর তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে চৌম্বক মোনোপোলের সংযোজন মৌল কণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন একটি চিন্তাসূত্র খুলে দিয়েছে।

মৌলিক কণার বিজ্ঞানে অনেক ব্যাখ্যা যোগানোর জন্যে চৌম্বক মোনোপোলের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু পৃথকভাবে এই বস্তুটিকে নিয়ে পরীক্ষা করার সৌভাগ্য আজও কারো ঘটে নি। তবে হিউস্টন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তাঁদের যুক্তির সপক্ষে যে সব প্রমাণ দাখিল করেছেন তাতে কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। অন্তত এথেকে জানা গেল মহাকাশ পরিমণ্ডলে অসংখ্য

মৌল কণার মত একক চৌম্বক কণাও বিচরণ করে। অর্থাৎ বলা চলে, সেই 1950 সাল থেকে বিজ্ঞানীরা যে রহস্যজনক অদ্ভুত কণাটির পিছনে ধাওয়া করেছিলেন, অবশেষে সত্তর দশকের শেষ ভাগে এসে সেটিকে প্রায় ধরে ফেলে রহস্য উদ্ঘাটন করতে চলেছেন। এই অদ্ভুত চরিত্রের কণাটি সম্পর্কে শেষ অবধি যা জানা গেছে তা হল—এই একক মেরুর গতি আলোর গতির প্রায় অর্ধেক। এর চৌম্বক আধান ইলেকট্রনের আধানের প্রায় 137 গুণ এবং এর ভর প্রোটনের ভরের প্রায় 200 গুণ।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইলেকট্রনের আবিষ্কার যেমন বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারকে সম্ভাবনাপূর্ণ করে তুলেছিল, একক চুম্বক মেরু পৃথক করা সম্ভব হলে ঠিক তেমনি এক সম্ভাবনপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হবে।

এর ফলে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন কণা-ত্বরায়ক যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে; আরও সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের। হয়ত এর সাহায্যে বিজ্ঞানের বহু নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

পুস্তক-পরিচয়

খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম পুস্তকটির লেখক—**শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত**; প্রকাশক—এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং; 5, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট; কলিকাতা —700 012, পৃষ্ঠা—48, মূল্য—3.30 টাকা।

আজকের এই সভ্যজগতে বিভিন্ন রকম তেলের ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমান সভ্যতাকে তেল এবং তৈলজাতীয় পদার্থ বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। এরকম আরও বহু উপকরণ আছে যা আজকের দিনের সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে জানা বা মনে রাখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সুগঠিত রূপের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এত বিশাল যে প্রতিটি বিষয় ও তার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ভাল করে পড়াশুনা করে সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল থাকা অসম্ভব। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে সহজ ও সরলভাবে এর পরিবেশনা থাকলে ঐ সুগঠিত রূপের অনেক বিষয়েই জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন এ জাতীয় প্রচেষ্টার অন্যতম পরিপূরক। বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ মাত্রই তা স্বীকার করে থাকেন। খনিজ তেল ও তৈলজাতীয় পদার্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জানার কৌতূহল থাকলেও উপযুক্ত পরিবেশনার অভাবে এ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। গ্রন্থকার 'খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম' গ্রন্থে সাধারণ পাঠকদের জন্যে বিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটি সাবলীল ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর এই গ্রন্থে কোন জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজ ও সরল ভাষায় কিভাবে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হল, কিভাবে এই তেলের খনির সন্ধান মেলে, কিভাবে তৈলকূপ খনন করা হয় ও সেখান থেকে তেল সংগ্রহ করে তা শোধন করা হয়—এ সমস্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, সাধারণ এমনকি শুধুমাত্র আক্ষরিক পাঠকমাত্রই তা বুঝতে পারবেন। সরল ও বোধগম্য ভাষায় সুন্দরভাবে বর্ণনা, বিষয়বস্তুর জটিলতা হ্রাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনামূলক

আলোচনা এবং বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা—এগুলিই হল গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য।

তবে বিষয়বস্তু প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করবার প্রচেষ্টায় গ্রন্থকার দু-একটি ক্ষেত্রে যে উপমার আশ্রয় নিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনে তা উপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়; নতুবা বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যহানি হয়। তাছাড়া যে চিত্রগুলি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিই বিষয়বস্তুর মধ্যে পাশাপাশি দেখানো এবং নির্দিষ্টভাবে প্রাসঙ্গিক অর্থে বর্ণিত হলে তা গ্রন্থটির কদর বৃদ্ধির আরও সহায়ক হত। কয়েকটি অংশে বিভিন্ন শব্দের বানান ভুল রয়ে গেছে।

উল্লিখিত সামান্য কতকগুলি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই জনপ্রিয় গ্রন্থটির প্রতি পাঠকমাত্রই আকৃষ্ট হবেন এবং গ্রন্থটি পাঠ করে শুধুমাত্র সাধারণ পাঠকই নন, বিশেষজ্ঞরাও লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। আশা করি যোগ্যভাবেই গ্রন্থটি সমাদৃত হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

চিঠিপত্র

অপপ্রয়োগ

প্রথমেই বলে রাখি, এ বিষয়ে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তার উৎস মাত্র দুটি স্কুল। কাজেই এমনি ঘটনা সব জায়গাতেই যে ঘটেছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু একই শহরের ছেলে আর মেয়েদের সবচেয়ে ভাল দুটি স্কুলেই যখন এমনি অবস্থা, তখন গ্রামের দিকের স্কুলগুলোর দশা যে আরো শোচনীয়—তা বলাই বাহুল্য। বিষয়টা স্কুলে নতুন শিক্ষাক্রমের অপপ্রয়োগ প্রসঙ্গে। আমি শুধু গোটা দুয়েক গল্প শোনাব। পাঠকগণ অনায়াসেই অবস্থাটা বুঝতে পারবেন (কিন্তু প্রতিকারের জন্যে কি সচেষ্ট হবেন?)।

বছর দুয়েক আগে আমাদের নোনা লাগা শিক্ষা ব্যবস্থার এই ইমারতের গায়ে দু-পোচড়া রঙ চড়ানো হয়েছে।

নতুন (?) এই শিক্ষা পদ্ধতির মুখবন্ধে বলা হল, "ছোট ছেলেকে বিজ্ঞান পড়াবার নামে যজমানের মন্ত্রপাঠ করিয়ে কি কোন লাভ আছে? ছেলেকে প্রকৃতির দিকে তাকাতে শেখাও। বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু প্রকৃতির বুকে কান পাতুক, বিজ্ঞান আপনি এসে ধরা দেবে।" অতি বড় নিন্দুকও মেনে নেবেন, প্রস্তাবটা শুভ। কিন্তু প্রকৃতি কোন্‌টা, আর কান পাতাটাই বা কেমনতরো, সেটুকু তো শেখাতে হবে। শেখাবেন কে?

যাক এবারে গল্প শুনুন—আমার ভাই ক্লাশ সিক্সে পড়ে। তাদের কর্মশিক্ষা পর্যায়ের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে রয়েছে 'পাখি চেনা'। হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে সে ফর্দ নিয়ে এসে হাজির—(i) দোয়েল, (ii) শকুন. (iii) শ্যামা। আমি বললাম, সে কিরে এসব পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তাও আবার দু'দিনে। জানতে হবে কত কি! সাইজ, ওজন, ডিমের সাইজ, রঙ, কি খায়, কোথায় থাকে ইত্যাদি। এর উপরেই আবার নাকি নম্বর দেওয়া হবে। কাজেই আমি বইপত্তর ঘেঁটে পর্যবেক্ষণ 'টুকে দিলাম', আর বলে দিলাম মাষ্টার মশায়কে বলিস পায়রা, শালিক, চড়াই (এসবগুলো আমাদের বাড়িতে সহজেই দেখা যায়)—এই সব পর্যবেক্ষণ

করতে বললে করা সম্ভব। তাওতো শেখাতে হবে। নাকি পর্যবেক্ষণের 'হোম টাস্ক' দিলেই সমস্যা মিটে যাবে। আবার ওজন চাই! পাখিটাকে কি মেরে কিম্বা ধরে দাঁড়িপাল্লায় চড়াব? তারপর আরো আছে, যদি বলি সাইজ এত থেকে এতর মধ্যে হয়—তা সে মানতে নারাজ। এ যেন হিন্দুস্থান কোম্পানীর গাড়ি যে এত মিটার এত সেন্টিমিটার হবেই। এর নাম কি প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকানো?

এর পর দ্বিতীয় গল্প—বিজ্ঞানের মৌখিক পরীক্ষা হচ্ছে আমার বোনের। যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার দু-একটা উদাহরণ দিই—নিউটনের সূত্র কি, জলের ফরমূলা কি, কোষ কাকে বলে ইত্যাদি। ভাবখানা এমন যে, মৌখিক পরীক্ষা মানে লেখার পরীক্ষায় যে প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে হয় এখানে তা মুখে বলতে হবে। বোদ্ধা পাঠক ভেবে দেখুন ব্যাপারটা কি তাই। না প্রশ্ন হওয়া উচিত এই রকমের—বিজ্ঞান কেমন লাগে, জনপ্রিয় বিজ্ঞানের কোন বই ছাত্রী পড়ে কিনা, আকাশের কোন্ কোন্ তারা সে চেনে, নতুন কোন্ গ্রহের বলয় আবিষ্কার হয়েছে? এমনি আরো কত, এর কি শেষ আছে।

আমাদের শিক্ষাক্রম একবার পাল্টেছে, সামনে আবার পাল্টাবে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতির তো কোন পরিবর্তনই হয় নি। আখেরে লাভ তাই কিছুই নেই। কর্মশিক্ষার যেটা মূল পর্যায়, অবস্থাটা সেখানে আরো অদ্ভুত। আমি যতটুকু বুঝি তাতে মনে হয়, কর্মশিক্ষার দুটি উদ্দেশ্য থাকবে; হয়তো এমন সুন্দর জিনিষ তৈরি করা শেখাবে, যার আর্ট হিসেবে যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। আর নয়তো এমন কিছু করতে শিখতে হবে যার ব্যবসায়িক মূল্য আছে। যেমন পাট দিয়ে ব্যাগ তৈরি, উল বোনা, ফুলদানি তৈরি, ফটো তোলা, ডার্করুমের কাজ, ইলেকট্রিক ওয়্যারিং জাতীয়। অবশ্য সবচেয়ে ভাল হয়—লেদ মেসিন চালাতে, ওয়েলডিং করতে শেখালে। কিন্তু সে ব্যাপারে তো অর্থের অসুবিধা রয়েছে। যাই হোক এবার আমার ভাইবোনের তৈরী জিনিষের একটা ফর্দ দিই। প্রসঙ্গত বলি, আমি এক-আধটা উপদেশ দিয়ে দেখেছি; স্কুল সেগুলো চায় না তাই ওদের কাছে তা বাতিল। ভাইয়ের প্রথম প্রচেষ্টা ইঞ্চিচারেক সাইজের পাটকাঠি আর লাল নীল কাগজ দিয়ে তৈরী ফুল। এটাও ছিল হোম টাস্ক। যাই হোক পাঁচ মিনিটের কাজ, গোটা আষ্টেক তৈরি হল, তার একটা স্কুলে গেল বাকি সাতটা ভাঙ্গা হল। আর তার জন্যে পঞ্চাশ গ্রাম ময়দা আর দু' চামচ চিনি দিয়ে আঠা তৈরি হল এক বাটি। আমার মনে হয় ঐ সময়ে খাম আর ঠোঙ্গা তৈরি করালে কাজে দিত। তারপর মেয়েদের স্কুলে বোনের কর্মশিক্ষা। একটা পেস্ট বোর্ডের টুকরোর উপর একটা পশ্চিম বঙ্গের ম্যাপ এঁকে তার বর্ডারে পুঁতি আটকানো হল। দেখতে যা হল তা, আর কি বলব। আরকি, না দিন পাঁচেকের প্রচেষ্টায় একটা কাগজের প্লেট তৈরি হল। সবটাই না হোমে না যজ্ঞের ব্যাপার! সবটাই প্রায় এমনি চলেছে। আমার তো মনে হয় একটু বড় ছেলে মেয়েদের নিয়ে রেডিওর কাজ, গ্লাস ব্লো করা, মাটি পরীক্ষা (মেকানিক্যালি)—এসব করানো যেতে পারে। কিন্তু কিছুই প্রায় হয় না। অন্তত আমার সামনে যেটুকু রয়েছে তার মধ্যে

এই অবস্থা আর কতদিন চলবে? কতদিন আর আমরা জুতো সেলাই করার লোকটাকে দেখে নাক কুঁচকোব, আর নিজের বাড়িতে ফিউজ তারটা পাল্টাতেই গলদঘর্ম হব!

গৌতম বিশ্বাস*

*69, কে. পি. চট্টরাজ রোড, বহরমপুর-742 101, মুর্শিদাবাদ

পরিষদের খবর

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নিউ ব্যারাকপুরের নবাকাঙ্খী সব পেয়েছির আসর 16ই অক্টোবর থেকে 2[illegible]শে অক্টোবর পর্যন্ত একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীর বিজ্ঞান বিভাগে পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা হয়। প্রদর্শনীটি প্রত্যহ বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সাধারণ দর্শকদের জন্যে খোলা থাকত। স্থানীয় জনসাধারণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

শারদীয় সংখ্যার ঘোষণা অনুযায়ী 6ই ডিসেম্বর 1977 তারিখে অধ্যাপক তপেন রায় 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে' 'ঘূর্ণন' বিষয়ে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার প্রতি অংশেই মডেলের মাধ্যমে তিনি বিষয়বস্তুকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন, তাতে মনে হয়—ফরাসী অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, রয়েল সোসাইটি প্রভৃতির আয়োজিত বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন ঐতিহাসিক বক্তৃতা ও আলোচনা যা খুবই সমাদৃত হত বলে শোনা যায়, হয়ত সেগুলি এরকম-ই। বহু আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণ বক্তৃতা শোনেন।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

পূর্ব-নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী 27শে নভেম্বর 1977 তারিখে পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে' ডঃ শ্যামসুন্দর দে 'হলোগ্রাফি' বিষয়ে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণ উক্ত বক্তৃতা সাগ্রহে শোনেন।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে বিজ্ঞান বিষয়ক নিম্নোক্ত জনপ্রিয় বক্তৃতাটি প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে :

বক্তা : শ্রীদীপংকর রায়*   বিষয় : নিউটনের গতিসূত্র

সময় : 8ই জানুয়ারী, 1978   বিকেল 5-30টা

আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণকে উক্ত বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

* ভিজিটিং সায়েন্টিষ্ট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

স্যার জেমস্ হপ্‌উড্‌ জীন্‌স্

জন্ম : 11ই সেপ্টেম্বর, 1877

মৃত্যু : 15ই সেপ্টেম্বর, 1946

(চিত্র—বৃটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে)

স্যার জেমস্ হপ্‌উড্ জীন্‌স্

শুধুমাত্র তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে, সাহিত্যে এবং দর্শনশাস্ত্রেও বিজ্ঞানী জীনস্ ছিলেন বিশ্ববরেণ্য।

"The Universe can be best pictured, although still very imperfectly and inadequately, as consisting of pure thought, the thought of what, for want of a wider word, we must describe as a mathematical thinker." The Mystrious Universe —**James Jeans**

মায়ের সঙ্গে ছোট্ট ছেলেটি বেড়াতে যাচ্ছে। ট্রেনে চেকার বাবু এসে টিকিট চাইলেন। টিকিট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—মা তো ভীষণ বিব্রত। ছেলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাদের টিকিট দুটোর নম্বর এত, অমুক ষ্টেশন থেকে কেনা।" মা ও চেকার বাবু দু'জনেই অবাক। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল—ছেলের কথাই ঠিক। ঘড়ির সময় একেবারে সেকেণ্ড পর্যন্ত বলতে পারত। মাত্র ন' বছর বয়সে ঘড়ি সম্বন্ধে ন'পাতার এক চটি বইও লিখে ফেলেছিল। এই প্রতিভাধর ছেলেটিই ভবিষ্যতে স্যার জেমস্ হপ্‌উড্ জীন্‌স্ নামে সারা বিশ্বে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। এবছর এঁর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব দেশ-বিদেশে পালিত হল।

স্যার জেমস্ জীন্‌স্ 1877 সালের 11ই সেপ্টেম্বর ল্যাঙ্কাশায়ারের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'মার্চেন্ট টেইলর' স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে 1896 সালে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গণিতশাস্ত্র পড়তে ভর্তি হন। তখন গণিতে ট্রাইপস্ পাশ করে 1901 সালে ট্রিনিটির ফেলো হিসেবে মনোনীত হন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন আর একজন বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ জি. এইচ্. হার্ডি। দু'জনে একই সঙ্গে ট্রাইপস্ পাশ করেন ও ফেলো হন এবং একই সঙ্গে স্মিথ্ পুরস্কার পান।

এরপর তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চারার হিসেবে যোগ দেন এবং 1924

সাল পর্যন্ত এখানে ছিলেন। তবে মাঝে 4 বছরের জন্যে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। পরে রয়াল ইনষ্টিটিউসনে জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন—যেখানে তিনি 1946 সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

ছাত্রাবস্থা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাত্র 29 বছর বয়সে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো হন এবং 1919 সাল থেকে একটানা 10 বছর রয়াল সোসাইটির সম্পাদকের কাজ করেন। অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন। যেমন—স্মিথ, আদম, হপ্‌কিন্স ইত্যাদি পুরস্কার। 1929 সালে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়।

জীন্‌স্ 1938 সালে কলকাতায় এসেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে। কথা ছিল বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড আসবেন; কিন্তু হঠাৎ অধিবেশনের কিছুদিন আগে রাদারফোর্ড মারা যান। তখন জীন্‌স্‌কে অনুরোধ করা হয় এবং উনি কলকাতায় আসেন। এ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান-সূচক ডক্টরেট উপাধি দেয়।

1946 সালের 15ই সেপ্টেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

জীন্‌সের লেখা প্রথম বই হল তত্ত্বীয় বলবিদ্যা সম্বন্ধে। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের গণিত-তত্ত্ব নিয়ে লেখা পরের বই "দি ম্যাথামেটিক্যাল থিওরী অব ইলেকট্রিসিটি অ্যাণ্ড ম্যাগনেটিজ্‌ম্" (The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism) আজও স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য। প্রথম দিকে তিনি গ্যাসের তাপগতিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। গ্যাসের অণুগুলি সব সময় এলোমেলো ভাবে ঘুরতেফিরতে থাকে এবং তাতে যে তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয় তা নিয়েই তাঁর গবেষণা। তিনি বিভিন্ন অণুর পারস্পরিক গতি ও অনুপ্রবেশ বিষয়ক ম্যাক্সওয়েলের সূত্রের গাণিতিক প্রমাণ দেন। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ (black body radiation) সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা করেন। পরি-সংখ্যায়ন তত্ত্ব দিয়ে জীন্‌স্ বিভিন্ন অণুর ভিতর শক্তির ভাগবাটোয়ারা কিভাবে হয় তা দেখান। তবে এর সঠিক ব্যাখ্যা প্লাঙ্ক-এর কোয়াণ্টাম সূত্র দিয়ে পরে করা হয়েছিল। বিকিরণ বিষয়ক একটি বিখ্যাত সূত্র—'র‍্যালে-জীন্‌স্' সূত্র নামে পরিচিত। তিনিই প্রথম বিকিরণ ও প্লাঙ্ক আবিষ্কৃত কণাতত্ত্ববাদের পরস্পর সম্পর্ক নির্দেশ করেন। তাঁর লেখা বই 'রেডিয়েসন অ্যাণ্ড কোয়াণ্টাম থিওরি' (Radiation and Quantum Theory) বিশেষ প্রশংসালাভ করে। বলতে গেলে কণাতত্ত্ববাদের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা সম্বন্ধে যুদ্ধোত্তর জগতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তিনিই সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন।

এর পর জীন্‌স্ তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিদ্যায় মন দেন। বিশ্বে অবিরত পদার্থ সৃষ্টির (continuous creation of matter) কথা তিনি বলেন। ছায়াপথ (gallaxy) ও সৌরজগতের উদ্ভব নিয়ে জীন্‌স্ কয়েকটি তত্ত্ব বের করেন। এসব বিষয়ে তাঁর গবেষণা

'কসমোগনি ও ষ্টেলার ডায়নামিক্‌স্' (Cosmogony and Stellar Dynamics)—বই আকারে বের হয়।

ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় গোলকের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের যে সূত্র তিনি বের করেন তা ছায়াপথ সৃষ্টির ব্যাখ্যায় কাজে লাগানো হয়েছে। অতীতে এই বিশ্ব শুধু এক ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় পদার্থ ছিল। আস্তে আস্তে তা কুঁকড়ে যেতে থাকে—আকারে যত ছোট হচ্ছে, গতিবেগও বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমে সেটা একটি চাপা উপবৃত্তীয় গোলকের (ellipsoid) মত হয়। কোন এক বিশেষ আয়তনে আসবার পর তা থেকে গ্যাসীয় পদার্থ ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে। এরকম করেই সব ছায়াপথের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জুটি তারা (twin star), সর্পিল নীহারিকা (spiral nebula)-র সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা করেছেন।

জীন্‌সের আর একটি অবদান সৌরমণ্ডল সৃষ্টি তত্ত্ব। দুটি মতবাদ তখন চলছিল। বাফনের (Comte-de-Buffon) সঙ্ঘর্ষ মতবাদ (collission hypothesis) আর কাণ্ট-লাপ্‌লাসের মতবাদ। বাফনের মতে কোন সময়ে সূর্যের উপরে বাইরের কোন ধূমকেতু এসে ধাক্কা লাগাতে কিছু অংশ সূর্য থেকে বেরিয়ে এসে ওর চারপাশে মহাকর্ষের জন্যে ঘুরতে থাকে—তা থেকেই গ্রহদের সৃষ্টি। কিন্তু কাণ্ট-লাপ্‌লাস বলেন, সূর্য নিজেই তার গ্রহদের তৈরি করেছে। সূর্য ছিল একটি বিরাট গ্যাসীয় ঘূর্ণায়মান বস্তুর দ্বারা পূর্ণ। তখন তাপও অনেক কম ছিল। নিজের আভ্যন্তরীণ মাধ্যাকর্ষণের জন্যে এই গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ আকারে ছোট হতে থাকে। মাঝে মাঝে এর গা থেকে কিছু কিছু গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে যায় এবং তা আস্তে আস্তে ঘনীভূত হয়ে গ্রহ হিসেবে মহাকর্ষের ফলে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে।

জীন্‌স্ কিন্তু বাফনের মতই মানতেন। কিন্তু তিনি বলেন, বাইরে থেকে কোন ধূমকেতু সূর্যকে ধাক্কা মারে নি। কোন অতিকায় নক্ষত্র সূর্যের কাছ দিয়ে ওর গতিপথে চলে যাবার সময় সূর্যের গা থেকে কিছু পদার্থ টেনে নেয়—সেগুলোই গ্রহ হিসাবে কাজ করে। এই মতবাদকে জোয়ার-ভাটা তত্ত্ব (tidal theory of origin of solar system) বলা হয়।

পরবর্তীকালে অবশ্য কাণ্ট-লাপ্‌লাস মতবাদেরই সমর্থন মেলে। জীন্‌স্ নক্ষত্রের ভিতরের গঠন সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা ছিল, নক্ষত্রদের ভিতরে রয়েছে তরল পদার্থ। কিন্তু একথা অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্‌রা মেনে নেন নি। এসব ব্যাপার নিয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিংটনের সঙ্গে তাঁর অনেক বাকবিতণ্ডা চলে। অবশ্য এডিংটনই জয়ী হন।

এর কিছু পরেই জীন্‌স্ গবেষণা ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞানকে কি করে জনপ্রিয় করা যায় তাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। একের পর এক বই লিখে যান। এগুলির মধ্যে চারটি খুবই উল্লেখযোগ্য—(i) The Mysterious Universe, (ii) The Stars

in their Courses (iii) The New Background of Science (iv) Physics and Philosophy. স্ত্রীর সহযোগিতায় সায়েন্স অ্যাণ্ড মিউজিক (Science and Music) নামেও একখানি বই লেখেন। এই সব বইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। উপরের চারটির মধ্যে প্রথমটি নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আজও এর পাঠক সংখ্যা একটুও কমে নি। এখানেই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে এক মহান গণিতজ্ঞ হিসেবে দেখেছেন। এই বিশ্বপ্রকৃতিতে যে গাণিতিক শৃঙ্খলা রয়েছে তাতে তাঁর এই মনে হয়, কোন জীব-বিজ্ঞানী বা বিশিষ্ট কারিগর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন নি—এই বিচিত্র বিশ্ব এক গণিতজ্ঞ মনের চিন্তার প্রকাশ। এ মতবাদ প্রকাশ করাতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে অনেক বিদ্রূপ ওঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি এসেছিল—বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছ থেকে। রাসেল ওঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন "ভগবান এক বিরাট গণিতজ্ঞ আর তাঁর চিন্তার প্রকাশ এই বিশ্ব। কিন্তু আর একটা সমস্যা তুমি অঙ্ক কষে সমাধান করে দাও—কেন ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন ? আর করলেনই যদি, তবে এরকম খাপছাড়া বিপজ্জনক সব সমস্যা দিয়ে ভর্তি করলেন কেন ?"

জান্‌স্ আর বেঁচে নেই। দেখা যাক কে পারে—এ সমস্যার সমাধান করতে !

অরুণকুমার দাশগুপ্ত*

* কমফোর্ট, 2/1/B হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-700 029

অক্টোবর-নভেম্বর (শারদীয়), '77সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এ প্রকাশিত 'শব্দকট'-এর সমাধান

(1)

লে[1]	প্র[2]	সি	X	ব[3]	হু	ভূ[4]	জ[5]
অ[6]	তি	ভূ	জ	X	র[7]	জ	ন
X	ফ[8]	স	ফ	রা[9]	স	X	ন
স[10]	ল	ভে	X	মা[11]	ই	কা[12]	X
ম[13]	ণ	X	অ[14]	ণু	X	ই	X
ত	X	ল্যা[15]	ক্টো	জ	X	মো[16]	র্স
ল[17]	ব[18]	ণ	X	X	X	গ্রা[19]	ম
X	ল	X	টে[20]	লি	গ্রা	ফ	X

(2)

বে[1]	ন	জি[2]	ন	X	ডা[3]	ই[4]	ন[5]
ল	X	ও[6]	ভা	রি[7]	X	ষ্ট	ট
X	জু[8]	ল	X	কে	সে[9]	X	X
অ্যা[10]	ল	জি	X	ট[11]	লে	মি	X
গে[12]	জ	X	X	X	নি[13]	য়	ন
ট[14]	ন	X	পো[15]	গি[16]	য়া	X	X
X	X	হি[17]	লি	য়া	ম	X	জি[18]
ভি[19]	ব	জি	ও	র	X	প্ল্যা[20]	ঙ্ক

মৌমাছির ভাষা

সন্ধিপদ প্রাণীদের অর্থাৎ জোড়া-পা এমন প্রাণীদের সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের ভিতর সবচেয়ে বেশি, কেননা তাদের রাজত্ব সব জায়গায় অর্থাৎ জল, স্থল এবং বাতাসেও। তাদের অভিযোজনের ক্ষমতাও অদ্ভুত ধরনের। বিভিন্ন জায়গার থাকার জন্যেই তাদের জীবনযাত্রাও অদ্ভুত। আর সেই জন্যেই ওদের সম্বন্ধে মানুষের জানবার চেষ্টাও বেশি। ওদের ভিতর কেউ বা উপকারী, কেউ বা আবার অপকারী। যাই হোক না কেন, তারা অত নিম্নস্তরের প্রাণী হওয়া সত্বেও বোবা মানুষের মত শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত দেহ দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় খবর একজন অন্যজনকে বুঝিয়ে দেয়—তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। এখানে সন্ধিপদ প্রাণীদের অন্তর্গত মৌমাছির যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হবে।

যখন মৌচাকের থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহের জন্যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মধু বা পরাগের সন্ধান পায় এবং নিজেরা তা খেয়ে এসে ঐ মৌচাকেরই অন্যান্য মৌমাছিদের ঐ মধু বা পরাগ কত দূরে আছে তা বোঝাবার জন্যে উড়তে থাকে, তখন তাদের উড়বার পদ্ধতি প্রধানত দু'প্রকার।

যদি মধুর অবস্থান খুব কাছেই হয়, তবে ঐ মৌমাছিটি মৌচাকের কাছে এসে বৃত্তাকারে উড়তে (round dance) থাকে (চিত্র 1)। এই পদ্ধতির আবার বিশেষত্ব
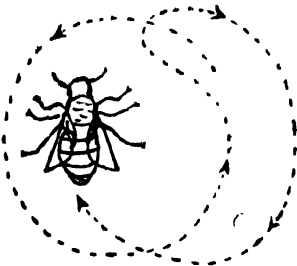
বৃত্তাকার নাচ
চিত্র 1
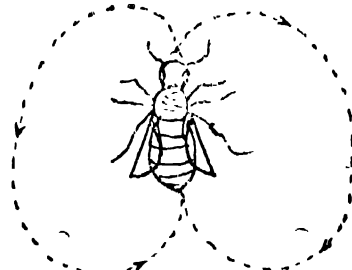
হেলে-দুলে নাচ
চিত্র 2

এই যে, একবার বামদিকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে ঘোরার পর আবার ডানদিকে বৃত্তাকারে ঘোরে এবং ক্রমাগত প্রায় আধ মিনিট কাল এক জায়গায় উড়তে থাকে যাতে ঐ মৌচাকের সমস্ত মৌমাছি বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। আর যদি মধুর অবস্থান অপেক্ষাকৃত দূরে হয়, তবে ঐ মৌমাছিটি মৌচাকের কাছে এসে লেজ নাড়তে থাকে বা হেলে-দুলে (tail wagging dance) উড়তে থাকে (চিত্র 2)। এ ধরণের ওড়ার বিশেষত্ব হল—যখন মৌমাছিটি মৌচাকের সামনে আসে, কিছুক্ষণ

স্থির থাকবার পরেই একটু সামনের দিকে গিয়ে প্রায় 360° কোণে প্রথমে বাঁদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে আবার ঐ সোজাপথে গিয়ে এবার ডানদিকে ঐ একই কোণে বৃত্তাকারে ঘুরে ঠিক আগের মতই সোজাপথে যায় এবং কিছুক্ষণ এই পদ্ধতি বার বার চালায়।

এই দু'ধরনের নাচের ভঙ্গিমা মৌচাকের সমস্ত মৌমাছি (বিশেষভাবে শ্রমিকরা) খুব ভালভাবে দেখতে থাকে এবং ঐ নাচ তাদের খাদ্য আনার কাজে সাহায্য করে। সন্ধিপদ প্রাণীদের এই অদ্ভুত রকম ভাষা সর্বপ্রথম যাঁর চোখে ধরা পড়ে তিনি হলেন অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভন ফ্রীস্‌চ্ (Von Frisch)।

শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়*

* 22, প্রফুল্ল চাকী রোড, কলিকাতা-700 036

রসায়ন তথা জৈব রসায়নের সহজলভ্য তথ্যাদি

বিজ্ঞানের কল্যাণ বা ধ্বংস যাই আলোচনা করা হউক না কেন রসায়নশাস্ত্র তার মধ্যে অন্যতম এবং এব্যতীত বিজ্ঞানকেও আলোচনা করা যেতে পারে না। তাই, বিজ্ঞানের প্রারম্ভেই রসায়ন কি, তা জানা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী অতি স্বল্পায়াসে বলতে গেলেও বলা যায়, রসায়ন মানেই রসবিদ্যা। এর আর কোন সংক্ষেপ নেই। তবুও এই রসায়ন শাস্ত্র, অধ্যয়নের সুবিধার্থে (ক) অজৈব (খ) জৈব—এই দুটি অংশে পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে। অজৈব অংশ বলতে বোঝায় সাধারণত সকল অজৈবনিক (non-living) তথা জড় বস্তু সকলকে অর্থাৎ যার উৎস বা উৎপত্তি হয়ে থাকে কোন অচেতন পদার্থের বিশ্লেষণের বা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে। যেমন মার্বেল, সাধারণ লবণ, সোডা, নানা প্রকারের অজৈব গ্যাস তথা কার্বন-ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার অজৈব যৌগ। পক্ষান্তরে জৈব অংশ বলতে সেই সমস্ত যৌগকেই বোঝায় যার ব্যবহার আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং যার মূল উৎপত্তি হয়ে থাকে জীবন্ত জৈবনিক (living) উৎসের মাধ্যমে। যেমন ভিনিগার থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, মাদক দ্রব্য থেকে অ্যালকোহল, আঙ্গুর থেকে টারটারিক অ্যাসিড, আখ থেকে চিনি ও বিভিন্ন শ্রেণীর কিটোন প্রভৃতি। অবশ্য রসায়ন অর্থেই রস বিশ্লেষণ তথা বৈজ্ঞানিক পদার্থের বিশ্লেষণ বা জৈব রসায়নকেই (organic chemistry) বোঝায়।

এ তো গেল রসায়নের মূল অংশবিশেষ। এবারে আসা যাক মূল দৈনন্দিন

রসায়নে। একেই বলে জৈব রসায়ন। এর প্রতিনিয়ত ক্রিয়াকলাপ স্বতঃই পদার্থের মধ্যে সীমাহীন গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। আর সেটাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খুঁজে বের করাটাও সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যদি একটু বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা যায়।

জৈব রসায়ন—নামটা যখন কানে আসে, তখন তাকে কার্বন-হাইড্রোজেন রসায়ন বা হাইড্রোকার্বন রসায়ন বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। কেননা, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা উৎস হল হাইড্রোজেন ও কার্বন পরমাণু। সুতরাং জৈব রসায়নের অপর আর এক নাম হাইড্রোকার্বন রসায়ন। তবে হাইড্রোকার্বনের কার্বন-হাইড্রোজেন পরমাণুর যোজ্যতা ও তার কতকগুলো নির্দিষ্ট ধর্মের [সম্পৃক্ততা, অসম্পৃক্ততা, জৈব মূলক (organic radical), কারকপুঞ্জ (functional group), সমগণীয় সারি (homologous series), সমাংশ বা আইসোমার (isomer) ও সমাংশ ধর্ম বা আইসোমেরিজ্‌ম (isomerism) প্রভৃতি] উপরে হাইড্রোকার্বন রসায়ন বহুলাংশেই নির্ভরশীল। কেননা, এই কার্বন পরমাণুর যোজ্যতার সম্পৃক্তির উপরে নির্ভর করেই হাইড্রোকার্বন তথা জৈব রসায়নকে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনে বিভাজিত করা হয়। আবার সমস্ত জৈব যৌগে—অ্যালিফেটিক (aliphatic) ও অ্যারোমেটিক (aromatic) হাইড্রোকার্বন তথা মুক্ত-শৃঙ্খল (open chain) ও সংবৃত্তাকার বা আবদ্ধ-শৃঙ্খল (cyclic chain) হাইড্রোকার্বন—এই দু'ভাগে বিভক্ত। অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনগুলি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারকপুঞ্জে সুসজ্জিত। এই সমস্ত কারকপুঞ্জের সাহায্যে সহজেই সমগ্র অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনগুলি জানা যায়। যেমন (ক) অ্যালকোহলিক গ্রুপ

(alicoholic group) বা অ্যালকোহল তথা, $\mathrm{H{-}\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}{-}OH}$ বা হাইড্রোক্সিল (OH)—
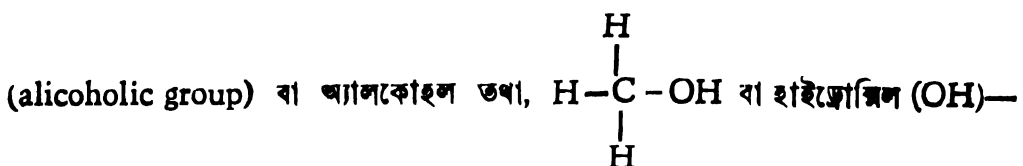
এই ফাংশনাল গ্রুপ বা কারকপুঞ্জ; (খ) অ্যালডিহাইড গ্রুপ (aldehyde group) বা অ্যালডিহাইড তথা, $[-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}=O]$ বা অ্যালডিহাড $[-CHO]$ এই ফাংশনাল গ্রুপ; (গ)

কার্বনিল গ্রুপ (carbonil group) বা কিটোন তথা, $[-\underset{|}{C}=O]$ বা কার্বনিল $[-CO-]$

এই ফাংশনাল গ্রুপ; (ঘ) কার্বক্সিল গ্রুপ (carboxyl group) বা জৈব অ্যাসিড (organic acid) তথা $[-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=O]$ বা কার্বক্সিল $[-COOH]$ এই ফাংশনাল গ্রুপ এবং (ঙ) কার্ব-

ইথোক্সি (carbo-ethoxy group) বা এষ্টার শ্রেণী তথা, $[-\underset{OC_2H_5}{\underset{|}{C}}=O]$ বা কার্ব-ইথোক্সি

$[-CO-OC_2H_5]$—এই ফাংশনাল গ্রুপ।

উপরিউক্ত এই সমস্ত ফাংশনাল গ্রুপের সাহায্যে প্রায় সমগ্র অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন রসায়নকে অধ্যয়ন করা সম্ভব। কেননা, এই সমস্ত ফাংশনাল গ্রুপগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। অর্থাৎ একের পর এক গ্রুপের যে কোন যৌগ—তথা, হাইড্রোকার্বনের পর্যায়ক্রমিক জারণের [সমমুখী পদ্ধতিতে (direct process)] এবং বিজারণের [প্রতিমুখী পদ্ধতিতে (reverse process)] ফলে পরবর্তী ফাংশনাল গ্রুপের হাইড্রোকার্বনগুলি অনায়াসেই বিশ্লেষণ করা যায়। অর্থাৎ, প্রথমোক্ত যে অ্যালকোহলীক গ্রুপ বা অ্যালকোহল তার জারণের ফলে পরবর্তী গ্রুপের অ্যালডিহাইড বা কিটোন (অর্থাৎ প্রাইমারী অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে জারণের ফলে অ্যালডিহাইড গ্রুপের অ্যালডিহাইড এবং সেকেণ্ডারী অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে জারণের ফলে কার্বনিল গ্রুপ তথা কিটোন) পাওয়া যায়। অনুরূপে অ্যালডিহাইড বা কিটোন তথা কার্বনিল গ্রুপের জারণের ফলে কার্বক্সিল গ্রুপ এবং শেষত যে কোন জৈব বা অজৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পাওয়া যায় কার্বইথোকসি গ্রুপের এষ্টার শ্রেণী। অর্থাৎ

হাইড্রোকার্বন $\xrightarrow[+[O]]{\text{জারণ}}$ প্রাইমারী অ্যালকোহল [RCH_2OH] $\xrightarrow[+[O]]{\text{জারণ}}$ অ্যালডিহাইড [$RCHO$] $\xrightarrow[+[O]]{\text{জারণ}}$ কার্বক্সিল বা অ্যাসিড [$RCOOH$]

CH_4 [মিথেন] CH_3OH [মিথাইল অ্যালকোহল] $HCHO$ [ফরম্যালডিহাইড] $HCOOH$ [অ্যাসিটিক অ্যাসিড]

অনুরূপে,

হাইড্রোকার্বন $\xrightarrow[+[O]]{\text{জারণ}}$ সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল [$R-CHOH-R'$]* $\xrightarrow[+[O]]{\text{জারণ}}$ কিটোন [$R-CO-R'$] $\xrightarrow[+[O]]{\text{জারণ}}$ কার্বক্সিল বা অ্যাসিড [R বা R' COOH]
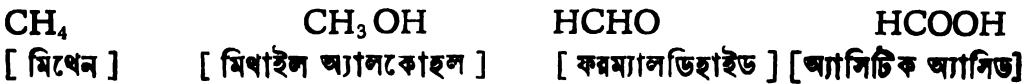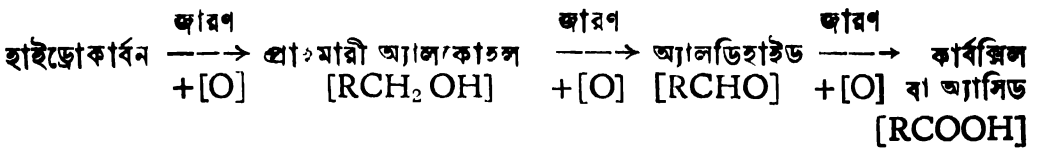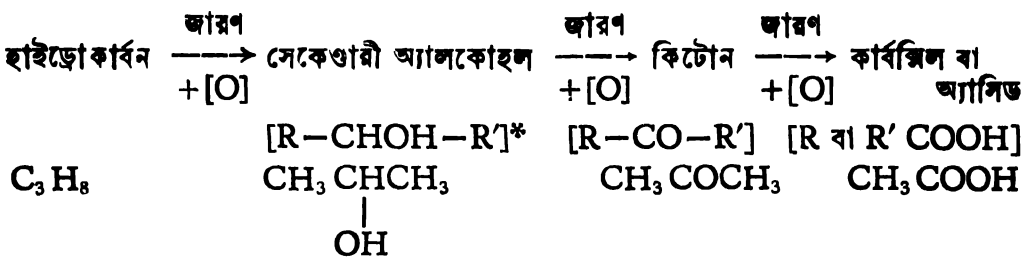
C_3H_8 [প্রোপেন] $CH_3\underset{OH}{\underset{|}{C}}HCH_3$ [আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল] CH_3COCH_3 [অ্যাসিটোন] CH_3COOH [অ্যাসিটিক অ্যাসিড]

* এখানে R ও R´ দুটি পৃথক অ্যালকিল মূলক ; এগুলি একও হতে পারে।

আবার,

অ্যাসিড + অ্যালকোহল ⇌ এষ্টার + জল

$CH_3COOH + C H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

[অ্যাসিটিক এ্যাসিড] [ইথাইল অ্যালকোহল] [ইথাইল অ্যাসিটেট]
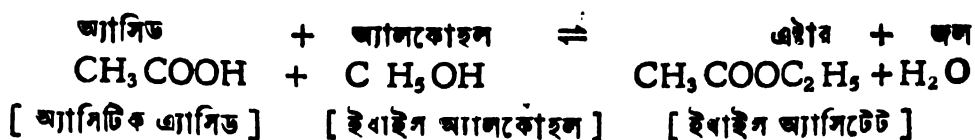
যদিও অ্যালডিহাইড ও কিটোন পৃথকিত, তবু অ্যাল ডিহাইড ও কিটোন উভয়েই কার্বনিল [>CO] গ্রুপের অন্তর্গত। কেননা, উভয়েরই গঠন কাঠামোয় (structural formula) কার্বনিল গ্রুপ বর্তমান। অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে কার্বনিল গ্রুপের সঙ্গে একটি অ্যালকিল মূলক ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্তাবস্থায় থাকে [R—C—H] (C=O) এবং কিটোনের ক্ষেত্রে কোন হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে না। বরং তৎপরিবর্তে আরও একটি (মোট দুটি) অ্যালকিল মূলক [R—C—R′] (C=O) যুক্ত থাকে।

অনুরূপে, বিজারণের ফলেও অ্যালডিহাইড, কিটোন এবং অ্যাসিড থেকে অ্যালকোহল পাওয়া যায়। অবশ্য অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হয়। কেননা, অ্যাসিটিক অ্যাসিডের কোন বিজারণ ক্ষমতা নেই।

ফরম্যালডিহাইড —বিজারণ→ অ্যালকোহল

$[HCHO] + [2H] \longrightarrow [CH_3OH]$

এবং

অ্যাসিটোন —বিজারণ→ আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল

$[CH_3-CO-CH_3] + [2H] \longrightarrow [CH_3CHOH-CH_3]$
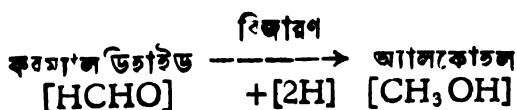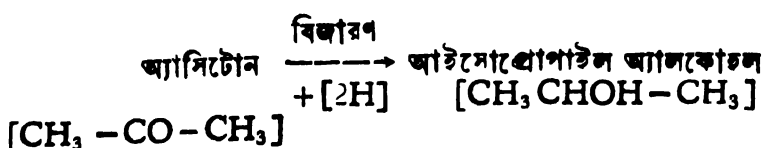
উপরিউক্ত তথ্যানুযায়ী পরিলক্ষিত হয়, কিভাবে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের প্রতিটি ফাংশনাল গ্রুপ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ। অনুরূপভাবে প্রতিটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়। রসায়নের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে—প্রতিটি জৈব রসায়ন যেমতাবস্থায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, ঠিক তেমনি সমস্ত জৈব, অজৈব রসায়নও সুশৃঙ্খলাবস্থায় আবদ্ধ। এই শৃঙ্খলাবস্থা কেবলমাত্র সামগ্রিক ভাবে নয়, পদার্থের অবিনাশিতা বা নিত্যতা সূত্রের মত তা চির ভাস্বর।

প্রাণতোষ পাল*

* 29/7/7, রাণা প্রতাপ রোড, দুর্গাপুর-1

মডেল তৈরি

ইলেকট্রিক ক্যালোরিমিটার

ইলেকট্রিক ক্যালোরিমিটার দিয়ে তাপের যান্ত্রিক সমতা মাপা যায়। কিভাবে যায় তা বলবার আগে এর গঠন সম্পর্কে কিছু বলা যাক। এই ধরনের ক্যালোরিমিটারের গায়ে দুটি আস্তরণ থাকে এবং ভিতরে সাধারণ ক্যালোরিমিটারের মতই জল এবং তার মধ্যে একটি থার্মোমিটার ও একটি কুণ্ডলী থাকে (চিত্র)। এছাড়া একটি অ্যাম্মিটার—প্রবাহমাত্রা পরিমাপের জন্যে শ্রেণীসমবায়ে এবং একটি ভোল্টমিটার—বিভব-প্রভেদ পরিমাপের জন্যে সমান্তরাল সমবায়ে উক্ত কুণ্ডলীর সঙ্গে লাগানো হয়। এটাই হল এর গঠন-প্রণালী। এবারে কি করে এই ইলেকট্রিক ক্যালোরিমিটারের সাহায্যে তাপের যান্ত্রিক সমতা মাপা যায় তা বলা হবে। ধরা যাক, একটি পরিবর্তনীয় রোধের সাহায্যে ক্যালোরিমিটারের প্রবাহ মাত্রা (I) t-সময়ের জন্যে অপরিবর্তিত রাখা হল। এখন যদি ক্যালোরিমিটারের ভিতরের কুণ্ডলীর রোধ জানা থাকে কিংবা ভোল্টমিটার দিয়ে কুণ্ডলীটির দুই প্রান্তের বিভব-প্রভেদ মাপা থাকে, তবে কতটা তড়িৎশক্তি (electrical energy) খরচ হয়েছে তা পাওয়া যাবে। তাপমাত্রার পরিবর্তন, জল ও ক্যালোরিমিটারের ওজন থেকে উদ্ভূত তাপশক্তি জানা যাবে (H=m.s.t). এখন, $H=\frac{W}{J}=\frac{I^2Rt}{J}$ [H=তাপ, I=প্রবাহমাত্রা, R=রোধ, t=সময় এবং J=তাপের যান্ত্রিক সমতা]—এই সমীকরণে উপরিউক্ত মান বসালে তাপের যান্ত্রিক সমতা (J)-র মান জানা সম্ভব।

অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে এটি একটি বিকল্প পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেবাশীষ ভট্টাচার্য*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

(2)

কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ পরীক্ষা

কৌণিক ভরবেগের নীতি অনুযায়ী বলা যায়—কোন পৃথক বস্তুতন্ত্রে (isolated system) বাহ্যিক টর্ক প্রযুক্ত না হলে তার কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।

নিম্নোক্ত মডেলটির সাহায্যে ভরবেগের ঐ সংরক্ষণ সূত্রটি প্রমাণ করা যায়। মডেলটি তৈরি করতে বেশ কিছু খরচ পড়বে। তবে ঐ মডেলে উপরিউক্ত সংরক্ষণ সূত্র ছাড়া বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি নিয়ম এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, সত্যিই এর জন্যে ব্যয়িত অর্থের কথা তৈরির পরে আর মনেই থাকবে না।

মডেলটি শুধুমাত্র একটি ঘূর্ণায়মান টেবিল (চিত্র)। বিশেষভাবে এটিকে তৈরি করতে হয়। প্রায় 5 সে.মি. পুরু একটি গোলাকার কাঠ নেওয়া হয়—যার ব্যাসার্ধ প্রায় 0·75 মিটার। আর একটি প্রায় 4 সে.মি. পুরু ও প্রায় 30 সে.মি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলাকার কাঠ বা লোহার পাত নিতে হবে। তবে লোহার পাত হলে তা 4 সে.মি. না হয়ে 0·4 থেকে 0·5 সে.মি. পুরু হলেই চলবে। আরও লাগবে একটি 5 বা 6 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বিয়ারিং এবং বিয়ারিং-এর মাপমত প্রায় 15 থেকে 20 সে.মি. লম্বা একটি লোহার দণ্ড।
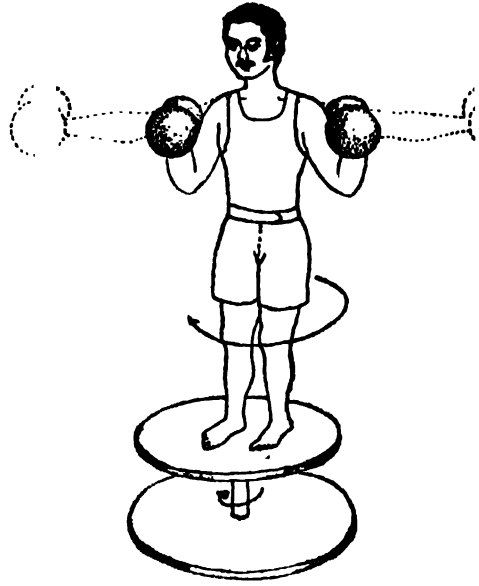
বেশি ব্যাসবিশিষ্ট কাঠটির ঠিক মাঝখানে একটি মাপমত ছিদ্র করে সেখানে বিয়ারিংটিকে মজবুত করে আটকে নিতে হবে। এবার কম ব্যাসার্ধের কাঠ বা লোহার পাতের কেন্দ্রে ছিদ্র করে সেখানে লোহার দণ্ডটির একপ্রান্ত এবং অপর প্রান্তটি বিয়ারিং-এর মধ্যে লম্বাভাবে এঁটে দেওয়া হল। এ অবস্থায় কম ব্যাসার্ধের কাঠ বা পাত ও বেশি ব্যাসার্ধের কাঠ দুটি অনুভূমিকভাবে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে দুটি সমান্তরাল তল তৈরি করবে। উপরের তলটিকে বলপ্রয়োগ করে ঘোরাবার চেষ্টা করলে ঘুরবে। এই হল মডেলটি তৈরির যাবতীয় ব্যবস্থা। লোহার দণ্ডের পরিবর্তে শালকাঠের তৈরী দণ্ডও ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দণ্ডটি আরও মোটা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ব্যবস্থায় দণ্ডটির মাঝখানে দ্বিতীয় একটি বিয়ারিং লাগাতে পারলে মডেলটি আরও মজবুত হত। তবে তখন বিয়ারিং দুটি একই মাপের না হয়ে কিছুটা কম-বেশি মাপের হওয়া উচিত; কেননা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিখুঁতভাবে যদি তৈরি না হয়, একই মাপের বিয়ারিং বিভিন্ন দূরত্বে সংযুক্ত করতে যথেষ্ট অসুবিধা হবে।

দু-হাতে ডাম্বেল নিয়ে কোন ব্যক্তি ঐ ঘূর্ণায়মান টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে

দুহাত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে ঘুরতে চেষ্টা করলে টেবিল সমেত ঐ ব্যক্তি ঘুরতে থাকবে। এ অবস্থায় হাত দুটিকে বুকের কাছে গুটিয়ে আনলেই ব্যক্তিটির ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ অনেকটা কমে যাবে।

ঘূর্ণন-অক্ষ বা কেন্দ্রের যত কাছে ডাম্বেল দুটি আনা যাবে ততই গতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। ডাম্বেল দুটিকে কাছে আনতে যে কাজ করা হয় সেজন্যেই কৌণিক বেগ বৃদ্ধি পায়।

জড়তা-ভ্রামকের ধারণা থেকে জানা যায়, টেবিলটির উপর যখন কোন ব্যক্তি তার হাত দু'টিকে ডাম্বেলসমেত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে রাখে, তখন সমগ্র বস্তুতন্ত্রটির জড়তা-ভ্রামকের মান (I_1) ব্যক্তিটির হাত গুটিয়ে নেওয়া অবস্থায় জড়তা-ভ্রামকের মান (I_2) অপেক্ষা বেশি। যেহেতু ব্যক্তিটির ঘূর্ণনের জন্যে কোন বাহ্যিক বল প্রয়োগ করতে হয় না, হাত দুটি প্রসারিত অবস্থায় টেবিলটির ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ (ω_1) হাত দুটি গুটিয়ে নেওয়া অবস্থায় কৌণিক ভরবেগ (ω_2) অপেক্ষা কম হবে। দেখানো যায়—ঐ দু'অবস্থাতেই ঘূর্ণনের সময় বস্তুতন্ত্রটির কৌণিক ভরবেগ সমান অর্থাৎ,

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

$I_1 > I_2$ হলে $\omega_1 < \omega_2$ হবে। কাজেকাজেই উপরিউক্ত বস্তুতন্ত্রে বাহ্যিক টর্ক প্রযুক্ত না হওয়ায় তার কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যক্তিটি তাঁর প্রসারিত হাত দুটি ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনলে টেবিলটির কৌণিক বেগ সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং, কৌণিক-ত্বরণ বোঝাবার পক্ষে এই পরীক্ষাটি খুবই আকর্ষণীয়।

স্কেটিং করার সময় শুরুতে স্কেটাররা দুটি হাত ও কোন একটি পা প্রসারিত করে ঘুরতে শুরু করে এবং পরে ঐ প্রসারিত হাত ও পা গুটিয়ে নেয়; এর মাধ্যমে স্কেটাররা আরও বেশি কৌণিক বেগ নিয়ে ঘুরতে পারে। আপাত-দৃষ্টিতে স্কেটারদের ঘূর্ণনের তীব্র গতি ম্যাজিক বলে মনে হলেও তা কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক—উপরের আলোচনা থেকেই তা অনুমেয়। অর্থাৎ এ সমস্ত ব্যবস্থায় কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বস্তুতন্ত্রের জড়তা-ভ্রামকের মান কমলে তার কৌণিক বেগ বৃদ্ধি পাবে।

মহুয়া দে*

* ডি. আই. পি. রোড গভর্ণমেন্ট হাউসিং এষ্টেট, ব্লক-R, ফ্ল্যাট-6, কলিকাতা-700 054

ভেবে কর

1. পতনশীল স্পুল

চিত্রে দেখানো স্পুল দুটির মধ্যে নিচের স্পুলটিতে 40 মিটার ফিতে জড়ানো আছে এবং উপরের স্পুলটির সঙ্গে ফিতেটির একটি প্রান্ত আটকান আছে। এবার উড়ন্ত একটি বিমান থেকে উপরের স্পুলটি হাতে রেখে নিচের স্পুলটি ছেড়ে দেওয়া হল এবং ঠিক এক সেকেণ্ড পরে উপরেরটিও ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথম স্পুলটি ছেড়ে দেওয়ার 5 সেকেণ্ড পরে পতনশীল স্পুল দুটির মধ্যে দূরত্ব কত হবে?
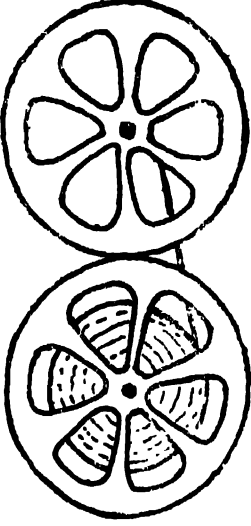
2. জলবেষ্টিত গ্রহ

কল্পনা করা যাক, নতুন একটি গোলাকৃতি গ্রহ আবিষ্কৃত হল—যা চারদিক থেকে জল দ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্রহটি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য নিচে দেওয়া হল—

গ্রহটির ব্যাসার্ধ $= R$

গ্রহটির নিজস্ব অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ $= \omega$

মেরু অঞ্চলেই জলের গভীরতা $= d_1$ এবং নিরক্ষ অঞ্চলে জলের গভীরতা $= d_2$

তাহলে গ্রহটির অভিকর্ষের মান কত?

(সমাধান 609 পৃষ্ঠায়)

মহাকর্ষ

ছোট-বড় সকল কণা
পরস্পরে দিচ্ছে টানা
ন্যুটন নিয়ম মতে।
আকর্ষণী বলটি তাতে
কণা দুটির ভরের সাথে
গুণফলেরই অনুপাতে
দূরত্বের বর্গলেখার
ব্যস্ত অনুপাতে
বদল হয়ে যায়
জানিও নিশ্চয়।*

বাসুদেব সিংহ**

* বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অবলম্বনে

** 13, রামচাঁদ মুখার্জি লেন, কলিকাতা-700 036

জেনে রাখ

মধু

মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে এ ধারণা ঠিক নয়। তারা যা সংগ্রহ করে তা হল একপ্রকার মিষ্টি স্বাদযুক্ত রস। ঐ রস মৌমাছিরা খায় এবং বাচ্চাদের জন্যে সযত্নে রেখে দেয়। মৌচাকে রক্ষিত রসকে তারা ডানা দিয়ে নিয়মমাফিক হাওয়া দেয়। ক্রমশ ঐ রস ঘন হয়ে যায়—এটাই মধু হিসাবে বাজারে পাওয়া যায়। রস গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। কয়েক ফোঁটা মধু যে রস থেকে উৎপন্ন হয়, তা তারা কয়েক শ' ফুল থেকে সংগ্রহ করে এবং সেজন্যে তারা সমবেতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে; বহু পথ উড়ে বেড়ায়।

বহু কৃষিজাত ফসলে মৌমাছির দ্বারা পরাগ সংযোগের কাজ সম্পন্ন না হলে ফলের পুষ্টি হয় না। ফলের জন্যে গাছে যে কুঁড়ি হয়—পরাগ সংযোগের অভাবে ঐ কুঁড়ি অবস্থাতেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়; ফল আর ধরে না। এমনকি, ঠিকমত পরাগ-সংযোগ না হলে বীজ পুষ্ট হয় না—যা বংশবৃদ্ধি ও উন্নত ধরণের ফসল ফলানোর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মৌমাছি ছাড়া বিভিন্ন জাতের প্রজাপতি, মথ, বোলতা, মাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গও পরাগ সংযোগের কাজ সুসম্পন্ন করে থাকে।

বাগানের কেঁচো

তরিতরকারীর জন্যে বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে লঙ্কা, পেঁয়াজ, মূলো, বেগুন, কপি, উচ্ছে, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদির চাষ অনেকেই করে থাকেন। এর সঙ্গে ফুলের গাছও লাগানো হয়ে থাকে। দেখা যায়, এই সমস্ত গাছ যেখানে বসানো হয়, সেই স্থানের মাটিতে বহু কেঁচো বাস করে। এই কেঁচো ঐ সমস্ত গাছের পক্ষে প্রচুর উপকারী।

শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে উদ্ভিদের যথেষ্ট বায়ুর প্রয়োজন হয়। গাছের শিকড় দিয়েও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে। শিকড় দিয়ে এই ক্রিয়া চলার জন্যে সেখানে যথোপযুক্ত বায়ু চলাচল দরকার। তাই, কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করে দেওয়া হয়; ফলে শিকড়ের সঙ্গে বায়ুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে শিকড়ের মধ্যে বায়ু চলাচল খুবই প্রয়োজনীয়। বাড়ির তৈরী বাগানেও যেখানে শাক-সবজি বা ফুলের চাষ করা হয়, সেখানে অসংখ্য কেঁচো বিভিন্ন স্থানে মাটির নিচে গর্ত করে বাস করে। এর ফলে বাগানের জমি কিছুটা কর্ষিত হয়ে যায় এবং তখন মাটির নিচে গাছের গোড়ায় বায়ু চলাচলের পথ তৈরি হয়। কেঁচো বাগানের

ঝরা ডাল-পাতা ও মাটি খেয়ে বেঁচে থাকে। ঝরা ও পচা পাতা থেকে খাবার নিয়ে মাটির নিচে তৈরী গর্তের সুড়ঙ্গ পথে চলার সময় তার কিছু অংশ মাটির সঙ্গে লেগে যায়; এতে ঐ মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও কেঁচো যে মলত্যাগ করে— যা ক্রমশ চক্রাকারে জমাট বেঁধে ঢিপির আকারে দেখতে পাওয়া যায়, তা জৈব রাসায়নিক সার হিসাবে খুবই উপকারী। কাজে কাজেই বাগানে যে সমস্ত কেঁচো দেখা যায় তা বিনা পরিশ্রমেই যথেষ্ট উপকার সাধন করে। বাগানের মালিককে শ্রমদান করতে হয় না।

পার্বতী পাল* ও ঝুমা ব্যানার্জী*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

সংখ্যাকূট

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে সংখ্যাকূটটি সমাধান কর:

পাশাপাশি

a—যে খৃষ্টাব্দে মাদাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পান,

e—বেরিলিয়াম-এর পারমাণবিক ওজন;

f—প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা;

g—স্যার রোনাল্ড রস যে খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান;

i—বুধগ্রহের নিরক্ষীয় ব্যাস যত কিলোমিটার (প্রায়)।

a	b	c	d
e	■	f	
g	h		
i			

উপর থেকে নিচে

a—যে খৃষ্টাব্দে পিতাপুত্র (উইলিয়াম ব্রাগ ও লরেন্স ব্র্যাগ) মিলিতভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান;

b—বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা;

c—যে খৃষ্টাব্দের ঠিক পরের খৃষ্টাব্দ থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়;

d—শব্দের বেগ যত ফুট প্রতি সেকেণ্ডে (সাধারণত);

h—থোরিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা।

অসিতকুমার চক্রবর্তী*

247, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, ব্লক-2 ফ্ল্যাট-10, কলিকাতা-700 033

ভেবে কর প্রশ্নাবলীর সমাধান

1. ধরা যাক, প্রথম প্লাগটি 5 সেকেণ্ডে S_1 দূরত্ব যায়—

$$\therefore\ S_1 = 0 + \frac{1}{2}\ 980 \times (5)^2 = 490 \times 25 = 12250 \text{ সে.মি.}$$

আরও ধরা যাক, দ্বিতীয় প্লাগটি $(5-1) = 4$ সেকেণ্ডে S_2 দূরত্ব যায়—

$$\therefore\ S_2 = 0 + \frac{1}{2}\ 980 \times (5-1)^2 = 490 \times 16 = 7840 \text{ সে.মি.}$$

∴ 5 সেকেণ্ড পরে দুটি প্লাগের মধ্যে দূরত্ব হওয়া উচিত—

$$= 12250 - 7840 = 4410 \text{ সে.মি.} = 44{\cdot}10 \text{ মিটার}$$

কিন্তু যেহেতু ফিতের দৈর্ঘ্য 40 মিটার, এক্ষেত্রে দুটি প্লাগের মধ্যে সর্বাধিক দূরত্ব হবে 40 মিটার।

2. ধরে নেওয়া যাক, জলের তল সাম্যাবস্থায় আছে। তবে সহজেই লেখা যায়—

$$\rho g d_2 = \rho g d_1 + \frac{1}{2}\rho\ \omega^2 R^2$$

$$g(d_2 - d_1) = \frac{1}{2}\ \omega^2 R^2$$

$$\therefore\ g = \frac{\frac{1}{2}\omega^2 R^2}{d_2 - d_1};$$

ρ = জলের ঘনত্ব
g = গ্রহটির অভিকর্ষ

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 (ক) দাঁতের ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

(খ) ক্যাভিট্রন কি?

অমলকুমার চক্রবর্তী, হুগলী

2. পদার্থের ম্যাগনেটোস্ট্রিকসন ধর্ম বলতে কি বুঝায়? এর প্রয়োগ কি?

দীপ্তিকণা রায়, 24-পরগণা।

উত্তর 1 (ক) অনেক সময় দেখা যায়, দাঁত ক্ষয়ে গেছে কিংবা দাঁতের অভ্যন্তরে ফাটল বা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষয় ক্রমশ বেড়ে দাঁতের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছয়। তখন দাঁত নড়ে এবং পড়েও যায়। নড়া অবস্থায় কোন খাদ্যবস্তু ঐস্থানে ঢুকে গেলে যন্ত্রণা হয়। তাছাড়া ঐ দাঁত দিয়ে কোন কঠিন জিনিষ চিবানো যায় না। তখন ঠাণ্ডা জলে দাঁত শির শির করে উঠে। এ অবস্থায় বলা হয়, দাঁতে ক্ষয়রোগ হয়েছে।

দাঁতের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। দাঁতের যে অংশ দেখতে পাওয়া যায় তাকে ক্রাউন বা শিরোদেশ বলে। এনামেল নামক এক প্রকার কঠিন এবং মসৃণ পদার্থের আবরণ দিয়ে এই শিরোদেশ আবৃত থাকে। খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসারের পরিমাণের কমবেশি এবং বিভিন্ন প্রকার অম্লের প্রভাবে উদ্ভূত নানান রাসায়নিক বিক্রিয়া কিংবা আঘাতজনিত কারণে এই এনামেল অনেক সময় ভেঙে যায়। এনামেলের ভিতর দিয়ে এক প্রকার জৈব রজ্জু লম্বালম্বি-

ভাবে দাঁতের শিরোদেশ থেকে একেবারে ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখের মধ্যে যে সমস্ত জীবাণু থাকে তা এনামেলের ফাটল দিয়ে ঐ ক্ষেত্র রন্ধ্র বেয়ে দাঁতের ভিতরে চলে যায় এবং দাঁতের মধ্যে ক্ষয়ের সৃষ্টি করে।

এ অবস্থায় দন্ত-চিকিৎসকেরা জিংক ফ্লোরাইড ও পটাশিয়াম ফেরোসাইয়ানাইডের মিশ্রণে তৈরী একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণ ঐ ক্ষয়মুখে ঢেলে দেন। দ্রবণটি পরে জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে যায় এবং তখন রন্ধ্রপথে জীবাণু দাঁতের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করতে পারে না। দাঁতের ক্ষয় কম হলে বা ফাটল কম হলে তখন সে পথে ঐ দ্রবণ ঢালা যায় না। তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ রন্ধ্রপথকে বড় করে সেখানে দ্রবণ ঢেলে জমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে দাঁত আর ক্ষয় হয় না।

এই ক্ষয়রোগ খুব দ্রুতহারে দাঁতের অভ্যন্তরের মজ্জাপূর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে স্নায়ুতন্ত্রের আধিক্য থাকায় যন্ত্রণা হয়। ঐ জীবাণু চোয়ালের রক্তথলিতে প্রবেশ করে দেহের অন্য অংশকেও আক্রমণ করে। অতএব, যথাসময়েই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

(খ) দাঁতের মধ্যে কোন গর্ত করতে হলে যে বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে ক্যাভিট্রন বলে। এই যন্ত্রের সূচ্যগ্র অংশকে অতি উচ্চ কম্পাংকে (শব্দোত্তর তরঙ্গ) কম্পিত করা হয়। দাঁতের যেখানে গর্ত করা দরকার, দন্ত-চিকিৎসকেরা সেখানে ক্যাভিট্রনের সূচ্যগ্র অংশটি ধরে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শব্দোত্তর তরঙ্গের বিশেষ ধর্ম অনুযায়ী ঐ অংশে গর্তের সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনমত বিভিন্ন আকৃতির গর্ত তৈরি করা হয়।

দাঁতের ভিতরে কোন অপ্রয়োজনীয় পদার্থ প্রবেশ করলে এইভাবে গর্ত করে তা বের করা হয়ে থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত অংশে কঠিন পদার্থের আবরণ দেওয়ার জন্যে উপযুক্ত জায়গার প্রয়োজন। তখন ক্যাভিট্রন যন্ত্রের সাহায্যে ঐ অংশে প্রয়োজনমত বড় গর্ত করে নেওয়া হয়। তাছাড়া কঠিন পদার্থ দিয়ে গর্ত ভরার কাজে এবং দাঁতের বাইরে কঠিন আস্তরণ তৈরি করতেও ক্যাভিট্রন যন্ত্র বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

উত্তর 2 ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিকসন হল পদার্থের একটা বিশেষ ধর্ম। যখন কোন ধাতু বা একাধিক ধাতুর সংকরকে চুম্বকিত করা হয়, তখন তার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। চুম্বকিত হওয়ার সময় পদার্থের আকৃতিগত পরিবর্তনকেই ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিক-সন ক্রিয়া কিংবা ধর্ম বলা হয়। চৌম্বকীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী সংকর ধাতুর ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াটি খুবই লক্ষণীয়। দেখা গেছে, এই ক্রিয়ায় কোন পদার্থের অনুদৈর্ঘ্য আকৃতির পরিবর্তন পদার্থটির উপর প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিক।

পদার্থের ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিকসন ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ ধরনের আন্দোলক যন্ত্র তৈরি করা হয়—যাকে বলে ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিকটিভ অসিলেটর (magnetostrictive oscillator). যে নীতির উপর ভিত্তি করে সেটি তৈরি করা হয় তা আলোচনা করা যাক।

কোন চুম্বকীয় পদার্থের একটি দণ্ডকে অন্তরিত তারের কুণ্ডলীর মধ্যে রেখে ঐ তারের মধ্য দিয়ে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘটালে দণ্ডটি একবার চুম্বকে পরিণত হবে আবার পরক্ষণেই তার ঐ চৌম্বক ধর্ম অন্তর্হিত হবে। ফলে দণ্ডটির আকৃতিও প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তী প্রবাহের কম্পাংক অনুযায়ীই ঐ পরিবর্তন সাধিত হবে। এই অবস্থায় দণ্ডটির দু-প্রান্তের পার্শ্ববর্তী মাধ্যমে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অবশ্য তরঙ্গের কম্পনের তীব্রতা বা শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে দণ্ডটির ঐ কম্পন তার যান্ত্রিক অনুনাদী কম্পনের সমান হতে হবে। ঐ অনুনাদী কম্পন পদার্থের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে; কাজেই পরিবর্তী প্রবাহের কম্পাংক এবং দণ্ডের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করে বিভিন্ন কম্পাংকের শব্দ তৈরি করা যায়। দণ্ডটি বিশেষ ব্যবস্থায় যদি কোন তরলে নিমজ্জিত থাকে তাহলে ঐ তরলে তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। কম্পনের সময় দণ্ডটি গরম হয়ে যায়, সেজন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থায় তাকে ঠাণ্ডা করা হয়। দণ্ডটিকে খুব ছোট করলে অনুনাদী কম্পাংকের শব্দ তৈরি করা খুবই জটিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে দণ্ডটি খুব ছোট না হলে অনুনাদী কম্পাংকের মানও বেশি হয় না। তাই ম্যাগ্‌নেটোস্ট্রিকসন পদ্ধতিতে পাওয়া শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাংকের মান সাধারণত খুব বেশি নয়। সেজন্যে উচ্চ-কম্পাংকের শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদনে এই পদ্ধতি ততটা কার্যকর হয় না। সে অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে পিজো-ইলেকট্রিক আন্দোলক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অপেক্ষাকৃত কম কম্পাংকের শব্দোত্তর তরঙ্গ তৈরি করার কাজে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। হাইড্রোফোন যন্ত্রে ম্যাগ্‌নেটোস্ট্রিকসন ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমুদ্রের নিচে বিভিন্ন স্থানের গভীরতা পরিমাপ (bathogram), সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আহরণ প্রভৃতি কাজে যে সুপারসনিক ইকো-সাউণ্ডার (supersonic echo sounder) নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেখানেও প্রয়োজনীয় তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় পদার্থের ম্যাগ্‌নেটোস্ট্রিকসন ধর্মকে কাজে লাগিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর অংশটির দূরত্ব এইভাবে তৈরী শব্দোত্তর তরঙ্গ দিয়ে মাপা হয়েছে।

ডুবে-যাওয়া কোন বস্তুর সন্ধান করা, মাছ ধরা, দুধ থেকে মাখন তোলা, গ্যাসের মিশ্রণকে আলাদা করা, কোন স্থানের ফাটল নির্ণয় করা প্রভৃতি নানা কাজে ম্যাগ্‌নেটো-স্ট্রিকসন ধর্মের প্রয়োগে শব্দোত্তর তরঙ্গ তৈরি করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

কার্যকরী সম্পাদক—শ্রীরতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

প্রকাশক— বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 700 006

ফোন : 55-0660

একমাত্র পরিবেশক : ওরিয়েন্ট লঙ্‌ম্যান অ্যাণ্ড কোং লিঃ

17, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি 700 072

ফোন : 23-1601

JNAN-O-BIJNAN

Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta.)

December, 1977

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক বিভাগে বিনা খরচে লেখাপড়া করবার সুযোগ আছে।

* ১ ১ *

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এটি বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

আচ্ছাদপট মুদ্রণ—[illegible], কলিকাতা-700 009

মূল্য—1·50 টাকা